স্বাধীনতা ৫০ পেরিয়ে

কমল চৌধুরী
সম্পাদিত

১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা-৭৩

প্রিয় লেখক
বুদ্ধদেব গুহকে

প্রকাশকের নিবেদন

স্বাধীনতার পর ৫০ বছর পেরিয়ে গেছে। এই ৫০ বছরে আমরা কী পেয়েছি, আর কী পাইনি — এ প্রশ্নটা বারবার মন নাড়া দিয়ে যায়। একটা আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন অনুভব করেছি। আর সেই তাগিদেই বর্তমান গ্রন্থের পরিকল্পনা। দেশের বিদগ্ধ ব্যক্তিরা নানাভাবে বিস্তর বিশ্লেষণ করে চলেছেন। বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত মূল্যবান আলোচনা সংরক্ষণের অভাবে হারিয়ে যায়। কিন্তু ভবিষ্যৎ গবেষণার কাজে আলোচনাগুলির গুরুত্ব অসীম। সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই রচনাগুলি সংকলিত হয়েছে। লেখকদের প্রায় সকলেই পুনর্মুদ্রণের অনুমতি দিয়েছেন। 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদক অমিতাভ দাশগুপ্ত, 'কোরক' পত্রিকার সম্পাদক তাপস ভৌমিক এবং 'যুবমানস' পত্রিকার সম্পাদক সৌমিত্র লাহিড়ীর কাছ থেকে মিলেছে কয়েকটি আলোচনার পুনর্মুদ্রণের সম্মতি। সকলের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। যারা বিষয়টি সম্পর্কে আগ্রহী তাদের সকলেই, কোন না কোনভাবে উপকৃত হবেন। সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছেন সাংবাদিক কমল চৌধুরী। তাঁর সহযোগিতার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

ডিসেম্বর ১৯৯৮ — সুধাংশুশেখর দে

সূচিপত্র

প্রথম পর্ব

দ্বিতীয় পর্ব

মধ্যরাতে আত্মনিয়োগের অঙ্গীকার

ভাগ্যের সঙ্গে এই কাঙ্ক্ষিত সাক্ষাৎকারের অপেক্ষা আমাদের বহুকালের। আজ সেই মহালগ্ন সমাগত। আমাদের পবিত্র প্রতিশ্রুতি আজ রূপায়িত কবতে হবে সামগ্রিকভাবে যা পূর্ণমাত্রায় না হলেও বহুলাংশে তো বটেই। ঠিক মধ্যরাত্রির এই প্রহরে সারা পৃথিবী যখন নিদ্রা নিমগ্ন ভারতবর্ষ জেগে উঠবে জীবনের মুখরতায় মুক্তির জয়গানে। একটি সময় আসে, যদিও ইতিহাসে তার আবির্ভাব বড়ই বিরল, যখন আমরা রিক্ত অতীতকে পিছনে ফেলে নবজীবনের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হই। যখন একটা যুগের অবসান ঘটে, এবং একটা জাতির সুদীর্ঘকালের অবদমিত অন্তরাত্মা বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। এটা তাই সময়োচিত যে, এই পবিত্র মুহূর্তে আমরা ভাবতবর্ষের সেবায়, এ দেশের আপামর জনসাধারণের সেবায় তথা বৃহত্তর মানবজাতির সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করার জন্যে অঙ্গীকারবদ্ধ হচ্ছি।

ইতিহাসের সেই উষালগ্নে ভারতবর্ষ তার অন্তহীন জিজ্ঞাসার যাত্রাপথে পা বাড়িয়েছিল। কালের গহ্বরে হারিয়ে যাওয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে সেই মহাযাত্রার চরণচিহ্ন মুদ্রিত হয়ে আছে সেই ইতিহাস কোথাও সাফল্যর স্মৃতিতে ভাস্বর, কোথাও বা তা ব্যর্থতার গ্লানিতে ম্রিয়মান। ভাগ্যদেবীর এই প্রসন্নতা অথবা বিমুখতার মধ্যে কোনদিনই ভারতবর্ষ তার অন্তহীন জিজ্ঞাসার নির্দিষ্ট পথ পরিহার করেনি, বিস্মৃত হয়নি তার সকল শক্তির উৎস — কালজয়ী আদর্শকে। আজ আমাদের দুর্ভাগ্যের দিনলিপি শেয হলো। ভারতবর্ষ আবারও আবিষ্কার করল নিজেকে। যে সাফল্যের উৎসব আজ আমরা পালন করছি, তা একটি পদক্ষেপ মাত্র যা ভবিষ্যতের আরও বড় সাফল্য, আরও বড় জয়ের নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিল। এই সুযোগকে কাজে লাগাবার মতো এবং ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করার মতো যথোচিত সাহস ও প্রজ্ঞা কি আমাদের রয়েছে?

স্বাধীনতা ও ক্ষমতা আমাদের কাঁধে দায়িত্ব তুলে দেয়। ভারতবর্ষের সার্বভৌম জনগণের প্রতিভূ এই সার্বভৌম আইনসভার উপরই এই দায়িত্ব বর্তেছে। স্বাধীনতার এই জন্মমুহূর্তের আগে, আমরা শ্রমের অনেক বেদনা ভোগ করেছি এবং সেই দুঃখবহ স্মৃতিতে আমাদের হৃদয় ভারাক্রান্ত। কিছু কিছু বেদনার দহন এখনও রয়েছে। সে যাই হোক, সে অতীত অতিক্রান্ত। আজ ভবিষ্যৎ আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আমাদের ভবিষ্যতের পথ সহজ নয়। ভবিষ্যৎ আমাদের আরামের জন্য নয়। আমরা বার বার যে অঙ্গীকার করেছি বা আজও যে অঙ্গীকার করবো, তা রূপায়িত করতে আমাদের নিরন্তর সংগ্রাম করে যেতে হবে। ভারতবর্ষেব সেবা হচ্ছে তার লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত মানুযের সেবা। এর অর্থ হচ্ছে দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, ব্যাধি ও সুযোগের অসাম্যের অবসান। আমাদের প্রজন্মের সবচেয়ে বড় মানুযটির স্বপ্ন হচ্ছে প্রতিটি আঁখির অশ্রু বিমোচন করা। এ হয়ত আমাদের সাধ্যের

বাইরে। কিন্তু যতদিন আঁখিপাতে অশ্রু ঝরবে, যতদিন মানুষের যাতনাভোগ থাকবে, ততদিন আমাদের প্রয়াস অব্যাহত থাকবে। অতএব আমাদের পরিশ্রম করতে হবে, কাজ করতে হবে, দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করতে হবে যাতে আমাদের স্বপ্নকে আমরা সার্থক করে তুলতে পারি। এই স্বপ্ন ভারতবর্ষের জন্যে হলেও তা হবে বিশ্ববাসীর কল্যাণের জন্যেও। কেননা, সমগ্র জাতি, সমগ্র বিশ্ববাসী আজ এক অবিচ্ছেদ্য সূত্রে গ্রথিত। কারও পক্ষেই সেই গ্রন্থী ছিন্ন করে একা বেঁচে থাকার যে-কোন চিন্তাই বাতুলতা মাত্র। বলা হয়ে থাকে শান্তি অবিভাজ্য। ঠিক তেমনি আজকের এই 'এক বিশ্বে' স্বাধীনতা, প্রগতি এমনকি বিপর্যয়ও সমভাবে সকল বিভেদ রেখার উর্ধ্বে। একে টুকরো টুকরো আলাদা সত্তায় ভাগ করার কোন অবকাশ নেই।

যে ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণের আমরা প্রতিনিধি, সেই ভারতবর্ষের জনগণের কাছে আমরা আজ একটি আবেদন রাখছি — এই রোমাঞ্চকর অভিযানে তাঁরা যেন পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভরতায় আমাদের সহযাত্রী হোন। ক্ষুদ্র নেতিবাচক সমালোচনার সময় এটা নয়। অন্যের প্রতি বিরূপ মনোভাব বা অপবাদের সময় এটা নয়। স্বাধীন ভারতের নবীন সৌধ আমাদের গড়তে হবে যেখানে তার সকল সন্তানের আশ্রয় হবে নিশ্চিত। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি তাই আপনার অনুমতি প্রার্থনা করে বলতে চাই যে আজকের এই সভা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুক —

১) মধ্যরাত্রির চূড়ান্ত প্রহর অতিক্রান্ত হলে সংবিধান প্রণয়নকারী এই আইনসভার উপস্থিত সকল সদস্য এই অঙ্গীকার গ্রহণ করছে যে — আজকের এই পবিত্র মুহূর্তে যখন ভারতবর্ষের মানুষ তাঁদের নির্যাতন ও আত্মত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছে তখন আমি সংবিধান প্রণয়নকারী আইনসভার সদস্য হিসেবে অত্যন্ত বিনম্রতার সঙ্গে নিজেকে উৎসর্গ করছি ভারতবর্ষ ও তার জনগণের সেবায়। যাতে এই প্রাচীন ভূমি জগৎসভায় তার যথাযোগ্য আসন গ্রহণ করতে পারে এবং বিশ্বশান্তি ও বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্যে তার পূর্ণ সানুরাগ অবদান রাখতে পারে।

'ভারতবর্ষের জনগণের প্রথম সেবক'
প্রধানমন্ত্রী
জওহরলাল নেহরু
১৪ আগস্ট, ১৯৪৭-এর মধ্যরাত্রি : কান্তিলগ্নে।

অ ন্ন দা শ ঙ্ক র রা য়

ভারতভাগ কি অনিবার্য ছিল?

ভারত সরকারে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়ে অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম সাহেব অনুভব করেছিলেন যে সরকারের কার্যকলাপের উপর নজর রাখার জন্য ব্রিটেনের মতো ভারতেরও একটি প্রতিনিধি সভা চাই। No taxation without representation — এই নীতি অনুসারে প্রতিনিধিসভা প্রয়োজন। তিনি সরকারি পদ ছেড়ে দিয়ে ভারতের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে তাঁদের নিয়ে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ছিলেন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দাদাভাই নৌরজী, বদরুদ্দিন তৈয়বজী প্রমুখ ভারত বিখ্যাত গুণিজন। এঁদের মতে ব্রিটেনের মতো ভারত একটি নেশন। অতএব ব্রিটেনের মতো ভারতেরও একটি পার্লামেন্ট চাই। সেটি হবে হিন্দু-মুসলমান-শিখ-খ্রিস্টান নির্বিশেষে যাবতীয় ভারতবাসী দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি সমূহের প্রতিষ্ঠান।

স্যর সৈয়দ আহমদ খান ছিলেন মুসলিম সম্প্রদায়ের একজন অগ্রগণ্য নেতা। তাঁর সমর্থন চাওয়ায় তিনি বললেন, ভারত একটা নেশনই নয়। তার জন্য একটা পার্লামেন্টের তো কথাই ওঠে না। নির্বাচনের ব্যবস্থা করলে হিন্দু প্রতিনিধিরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হবেন। পরে তাঁরা চাইবেন ইংলন্ডের মতো একটা সরকার গঠন করতে। সেই সরকারে হিন্দুরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে। তাঁদের ভোট বেশি থাকায় তাঁরা যা বলবেন তা-ই হবে। মুসলমানদের তাতে কী লাভ? ব্রিটিশরাজের চেয়ে হিন্দুরাজ কিসে ভালো? মুসলমানরা নির্বাচন চায় না, চায় নমিনেশন। তাঁর আপত্তি থাকায় মুসলমানরা বড় একটা কংগ্রেসে যোগ দিতে রাজি হন না।

তবে একেবারে যোগ দেন না তা নয়। যাঁরা যোগ দেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মহম্মদ আলি জিন্না বা ঝীণা। তিনি স্বীকার করতেন যে ভারত একটি নেশন এবং তার জন্য চাই একটা পার্লামেন্ট। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকালে হিন্দুদের মধ্যে একটা পুনরুজ্জীবনাদী আন্দোলন চলছিল। সেই আন্দোলনের দ্বারা আকৃষ্ট হন কংগ্রেসের এক দল সদস্য। তাঁদের মধ্যে ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ, বাল গঙ্গাধর টিলক, লালা লাজপত রায়, বিপিনচন্দ্র পাল ও তাঁদের অনুগামিগণ। তাঁদের প্রিয় সঙ্গীত ছিল 'বন্দেমাতরম'। সেটিকে তাঁরা কংগ্রেসের উদ্বোধনী সঙ্গীত করেন। তাঁদের কর্মপদ্ধতি ক্রমশ সরকার-বিরোধী হয়ে ওঠে। তাঁরা বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে যে কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেন তার মধ্যে ছিল বিলিতী পণ্য ও বিদেশী শিক্ষা পরিহার। তাঁদের কারও কারও প্রশ্রয়ে ছেলেছোকরারা বোমাবাজি শুরু করে দেয়। সরকারকে বাধ্য হয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে এক প্রকার সমঝোতা করতে হয়। কিন্তু সরকার স্বীকার করেন না তারা সব সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব।

কংগ্রেসের সঙ্গে তাল রাখার জন্য আবশ্যক হয় একটি নতুন প্রতিষ্ঠানের। তার নাম মুসলিম লিগ। নেতারা বলেন, তাঁরা আইনসভার নির্বাচনে রাজি, যদি তাঁদের দেওয়া হয় স্বতন্ত্র নির্বাচন কেন্দ্র। এইটেই ছিল সরকারের মনের কথা, কিন্তু মুখের কথা মুসলিম লিগ নেতাদের। প্রবর্তিত হয়ে গেল সেপারেট ইলেকটরেট। একজন প্রতিবেশী ভোট দেবেন মুসলিম কেন্দ্র থেকে, আর একজন প্রতিবেশী ভোট দেবেন অমুসলিম কেন্দ্র থেকে। কংগ্রেসকে এটা হজম করতে হল।

কংগ্রেসপন্থী মুসলমানরা নির্বাচন প্রার্থী হলেন মুসলমান কেন্দ্র থেকে আর কংগ্রেসপন্থী হিন্দুরা অমুসলমান কেন্দ্র থেকে। কংগ্রেসপন্থী মুসলমানদের মধ্যে ছিলেন জিন্না সাহেব। কিন্তু মুসলমানদের ভোট পাওয়ার জন্য তাঁকে হতে হল মুসলিম লিগের সদস্য। তিনি কংগ্রেস লিগ দুই প্রতিষ্ঠানের সদস্য হয়ে একপ্রকার সেতুবন্ধনের কাজ করেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দেন, আমি কংগ্রেসে রয়েছি ভারতের জাতীয় স্বার্থের খাতিরে আর মুসলিম লিগে যোগ দিয়েছি মুসলিম সম্প্রদায়ের বিশেষ স্বার্থের রক্ষার্থে। তাঁর সেতুবন্ধনের ফলে ১৯১৬ সালে লখেনৌ শহরে কংগ্রেস ও লিগের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির বিষয় হল weightage অর্থাৎ প্রাপ্য আসনের উপরে বাড়তি আসন। হিন্দুপ্রধান প্রদেশগুলিতে মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট আসনগুলির উপরে আরও বাড়তি আসন দেওয়া হয় হিন্দুর খরচে। আর মুসলিমপ্রধান প্রদেশগুলিতে অমুসলমানদের বাড়তি আসন দেওয়া হয় মুসলমানের খরচে। তাছাড়া কেন্দ্রীয় আইনসভায় মুসলমানদের দেওয়া হয় শতকরা ত্রিশটি আসন, যদিও তাদের লোকসংখ্যা শতকরা বাইশ। এটা হিন্দুদের ভাগ থেকে কেটে নেওয়া হয় হিন্দুদের সম্মতিতে।

সেই সময় কংগ্রেসের সদস্যদের মধ্যে হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদীর সংখ্যা কম ছিল। জিন্না সাহেব ছাড়াও কয়েকজন বিশিষ্ট মুসলমান কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। একবার সভাপতি হয়েছিলেন হাসান ইমাম, জেনারেল সেক্রেটারি ফজলুল হক। মহাযুদ্ধে তুরস্কের পরাজয়ের পর যখন তার সাম্রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে যায় তখন মুসলিম দুনিয়ার খিলাফত বিপন্ন হয়। কারণ তুরস্কের সুলতানই ছিলেন ইসলামের খলিফা। সেই বিপদে ভারতের মুসলমানরা গান্ধীজীকে বলে তাদের আন্দোলনের পরিচালক হতে, যদিও তিনি মুসলমানই নন।

গান্ধীনেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য ছিল সত্যাগ্রহ নামক একটি পদ্ধতি ব্যাপক আকারে প্রয়োগ। এই পদ্ধতি তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুসরণ করে অনেকটা সফল হয়েছিল। ভারতেও কয়েকবার পরীক্ষা করেছেন। তখন সেই গান্ধীকেই কংগ্রেস থেকে আহ্বান করা হয় স্বরাজের দাবিতে আন্দোলন পরিচালনা করার। মহাযুদ্ধের পর ব্রিটিশ সরকার স্বরাজ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করায় কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্য হতাশ ও বিক্ষুব্ধ। গান্ধী তাঁদের প্রতিশ্রুতি দেন যে তিনি এক বছরের মধ্যে স্বরাজ এনে দেবেন। তার জন্য তাঁদের ব্যাপক আকারে সরকারের সঙ্গে অহিংস অসহযোগ করতে হবে ও প্রয়োজন হলে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে সঙ্ঘবদ্ধভাবে আইন অমান্য করতে হবে।

গান্ধীজীর প্রবর্তনায় খিলাফতপন্থীরা স্বরাজপন্থীদের সঙ্গে একজোট হয়ে কংগ্রেসের সভ্য হন। দেখা গেল মুসলিম লিগে যত মুসলমান তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি কংগ্রেসে। আর লিগপন্থীরা খিলাফত আন্দোলনে যোগ না দেওয়ায় ও জেল থেকে দূরে সরে থাকায় তাঁদের প্রভাবও খর্ব হয়। জিন্না সাহেব যদিও গান্ধীর পরমবন্ধু তবু তিনি অসহযোগ সমর্থন করেন না। আর গান্ধীজী যখন গণ-আইনঅমান্য আরম্ভ করতে উদ্যত হন তখন জিন্না সাহেব স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বোম্বাই থেকে বরদৌলিতে গিয়ে রাত্রিবেলা

উপস্থিত হন। গান্ধীজীকে সাবধান করে দেন যে তাঁর গণ আন্দোলন অঙ্কুরে বিনষ্ট করে দেওয়ার জন্য ফৌজ প্রস্তুত। সুতরাং বিপজ্জনক পন্থা পরিহার করে গান্ধীজীও চললেন জিন্নাসাহেব ও মালবীয়জীর সঙ্গে মিলে বড়লাট লর্ড রীডিং এর বৈঠকে যোগ দিতে। মিটমাটের একটা উপায় খুঁজে পাওয়া যাবেই। গান্ধীজী জিন্নার পরামর্শ অগ্রাহ্য করেন। কিন্তু চৌরিচৌরা হত্যাকাণ্ডের বিবরণ শুনে বুঝতে পারেন যে দেশ অহিংসার জন্য প্রস্তুত নয়। সুতরাং গণ-আইনঅমান্যের কর্মসূচি ত্যাগ করেন।

এরপর তাঁকে রাজদ্রোহসূচক রচনার জন্য কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ক্রমে ক্রমে অসহযোগ আন্দোলন স্তিমিত হয়। একদল কংগ্রেসি জেদ ধরেন যে তাঁরা আইনসভায় যাবেন। তাঁদের বলা হয় Pro-changer, আর একদল কংগ্রেসপন্থী গান্ধীজীর প্রোগ্রাম থেকে কোনরকম বিচ্যুতি সমর্থন করেন না। তাঁদের বলা হয় No-changer. একদিকে অসহযোগ আন্দোলন স্তিমিত হয়, অপরদিকে খিলাফত আন্দোলন আবশ্যকতা হারায়। কারণ কামালপাশা তুরস্কের সুলতানকে সিংহাসনচ্যুত করেন। তুরস্কের সুলতানই শেষ খলিফা। ওদিকে Pro-changerরা নির্বাচনে আইনসভায় যান এবং সেই প্রক্রিয়ায় স্বরাজ অর্জন করতে চান। পরে দেখা গেল, স্বরাজ পাওয়া অত সহজ নয়। তখন আবার সেই গান্ধীজীকেই স্মরণ করা হয়। আবার তিনি গণ আন্দোলনে নামেন। লবণ সত্যাগ্রহে নরনারী নির্বিশেষে জনগণ ঝাঁপিয়ে পড়ে। বড়লাট আরুইনের সঙ্গে গান্ধীজীর একটা চুক্তি হয়। সাধারণ মানুষ লবণ তৈরি করার অধিকার পায়।

গান্ধীজী দ্বিতীয় রাউন্ড টেবল কনফারেন্সে গিয়ে দেখেন জিন্না প্রভৃতি মুসলিম নেতারা সমবেত হয়েছেন এবং সকলের দাবি আরও বেশি weightage বা বাড়তি আসন। তার মানে হিন্দুদেরকে ওদের ভাগ থেকে আরও বেশি আসন ছেড়ে দিতে হবে। গান্ধীজী বললেন, তাঁর সে অধিকার নেই। মুসলমানরা খুবই অসন্তুষ্ট হন। কেমব্রিজে পঠনরত একটি ছাত্র চৌধুরী রহমত আলি ইংরেজি বর্ণমালার থেকে সাত অক্ষর নিয়ে একটি শব্দ উদ্ভাবন করেন। পাকিস্তান। সেই শব্দটি কেউ কোনও দিন শোনেনি। তার তাৎপর্য পাঞ্জাব, আফগান, কাশ্মীর, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান এই প্রদেশগুলি মিলে হবে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র যেখানে মুসলমানরাই হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও স্বাধীন। 'আফগান' মানে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। জিন্না সাহেব এটি হেসে উড়িয়ে দেন। তিনি মনে করেন, এটি অবাস্তব। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনিই হয়ে ওঠেন এর নাছোড়বান্দা দাবিদার।

এর কারণ কংগ্রেসের নো-চেঞ্জার ও প্রো-চেঞ্জার সবাই মিলে স্থির করেন যে ১৯৩৫ সালের শাসন সংস্কার আইন অনুসারে যেসব আইনসভা গঠিত হবে তার জন্য অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস যোগ দেবে। গান্ধীজী যেহেতু অসহযোগী সেহেতু কংগ্রেস থেকে নাম কাটিয়ে নেন। কিন্তু কংগ্রেসকে প্রয়োজনমত পরামর্শ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। প্রাদেশিক নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে কংগ্রেস ছয়টি প্রদেশে সরকার গঠন করেন। কোন কোন মুসলিম নির্বাচন কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসপন্থী মুসলমানও জয়লাভ করে মন্ত্রী পদ পান। কংগ্রেসের জয়লাভ ও কংগ্রেসপন্থী মুসলমানের মন্ত্রিত্বলাভ মুসলিম লিগের তৎকালীন দলপতি জিন্না সাহেব সহ্য করতে পারেন না। তাঁর প্রত্যাশা ছিল মুসলিম নির্বাচন কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী খাড়া করবে না ও নির্বাচিত মুসলিম প্রার্থীকে মন্ত্রী করবে না। কিন্তু কংগ্রেস তাঁকে সে রকম কোনও অঙ্গীকার দেয়নি। আর তিনিও অঙ্গীকার দেননি যে কংগ্রেসপন্থী মুসলমানদের মতো গান্ধী পরিচালিত আন্দোলনে যোগ দেবেন ও তাঁর অনুগামীদের যোগ দিতে বলবেন। আর মুসলিম লিগের লক্ষ্যও নয় কংগ্রেসের মতো স্বাধীন ভারত। যেখানে উদ্দেশ্য এক নয় সেখানে কোয়ালিশন সম্ভবপর নয়। সম্ভবপর হলেও

দীর্ঘস্থায়ী নয়। কংগ্রেস এরপর আরও দুটি প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন করে। তাদের মধ্যে একটি মুসলিমপ্রধান। কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলীর নেতা খান আবদুল গফ্ফর খানের ভ্রাতা ডক্টর খান সাহেব। জিন্না সাহেবের আশঙ্কা হয় যে কেন্দ্রীয় সরকার পুনর্গঠিত হলে সেখানেও কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে ও একজন কংগ্রেসপন্থী মুসলমানকে শাসন পরিষদের সভ্য করবে। কংগ্রেসের দিক থেকে মুসলিম লিগের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ার চেষ্টা হয়। কিন্তু মুসলিম লিগের দলপতি জিন্না সাহেব সাফ জানিয়ে দেন যে কংগ্রেসকে প্রথমেই স্বীকার করতে হবে যে একমাত্র মুসলিম লিগই মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান। তার মানে কংগ্রেস প্রকারান্তরে কেবলমাত্র হিন্দুদেরই প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেস তা স্বীকার করতে রাজি হয় না। সুতরাং দুই দলের মধ্যে ১৯১৬ সালের মতো কোনও চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় না। ব্রিটিশ সরকারের পলিসি ছিল হিন্দুপক্ষে কংগ্রেস ও মুসলিম পক্ষে মুসলিম লিগ প্রথমে একমত হবে। তারপরে ভারত ও ব্রিটেন একমত হবে।

তার মানে দাঁড়াল এই : মুসলিম লিগ যদি কংগ্রেসের সঙ্গে একমত না হয় তাহলে ব্রিটেন কখনও ভারতের সঙ্গে একমত হবে না। জিন্না সাহেব বুঝতে পারলেন, তাঁর হাতেই চাবি। তিনি যদি বলেন, তিনি সংযুক্ত ভারত চান না তাহলে সংযুক্ত ভারত হবে না। কংগ্রেসকে খণ্ডিত ভারত মেনে নিতে হবে, মুসলিম লিগকে পাকিস্তান ছেড়ে দিতে হবে। গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন না যে ইংরেজরা জিন্নার দাবি মেনে নিয়ে ভারত ভাগে রাজি হবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যোগ দেওয়ার শর্ত হিসাবে কংগ্রেস চেয়েছিল আপাতত একটি সম্মিলিত সরকার ও যুদ্ধের পরে স্বাধীনতা। বড়লাট রাজি না হওয়ায় কংগ্রেস মন্ত্রীরা প্রাদেশিক সরকার থেকে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন ও গান্ধীজীর নেতৃত্বে কারাবরণ করেন।

জাপানী আক্রমণের সময় ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার সদস্য ক্রিপস একটি অস্থায়ী কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার প্রস্তাব করেন। যুদ্ধকালে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা না থাকলে যুদ্ধে যোগদান করা সমীচীন নয়। কংগ্রেস ক্রিপস প্রস্তাব খারিজ করে। তখন গান্ধীজী ইংরেজদের বলেন, 'কুইট ইন্ডিয়া' আর জিন্না সাহেব বলেন, 'ডিভাইড অ্যান্ড কুইট'। যুদ্ধের পর একটা সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তখন মুসলিম লিগ পাকিস্তানের ইস্যুতে স্বতন্ত্র নির্বাচন কেন্দ্রে মুসলমানদের ভোট চায়। প্রায় সব কটি কেন্দ্রেই মুসলিম লিগের জয় হয়। যেমন প্রদেশগুলিতে তেমনই কেন্দ্রে। কংগ্রেসপন্থী মুসলমানরা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ছাড়া অন্যত্র হেরে যান! ব্যতিক্রম কয়েকটি প্রাদেশিক আসন। বঙ্গপ্রদেশে মুসলিম লিগ সরকার গঠন করে। সিন্ধু প্রদেশেও। কিন্তু পাঞ্জাবে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় এককভাবে সরকার গঠন করতে পারে না। হিন্দু ও শিখ প্রতিনিধিরা মুসলিম লিগের সঙ্গে যোগ না দেওয়ায় গভর্নর শাসনভার গ্রহণ করেন।

প্রাদেশিক স্তরে সরকার পুনর্গঠন সমাপ্ত হলে কেন্দ্রেও বড়লাটের শাসন পরিষদ পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা হয়। কেন্দ্রীয় আইন সভায় মুসলিম লিগের শতকরা ত্রিশটি আসন ছিল। মুসলিম লিগ কেন্দ্রীয় সরকারে সেই অনুসারে আসন আশা করতে পারত। কিন্তু মুসলিম লিগ চায় হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে Parity অর্থাৎ সমান সমান আসন বণ্টন। কংগ্রেস কিছুতেই রাজি হয় না। শেষ পর্যন্ত ঠিক হয় মোট চৌদ্দটি আসনের মধ্যে হিন্দুরা পাবে ছয়টি, মুসলমানরা পাঁচটি, শিখ খ্রিস্টান ও পার্সিদের মধ্যে একটি একটি করে মোট তিনটি। এর পরে কংগ্রেসকে হিন্দুদের প্রাপ্য ছয়টি আসন আর মুসলিম লিগকে মুসলমানদের প্রাপ্য পাঁচটি আসন দেওয়া হয়। কংগ্রেস সেই ছয়টি আসনের একটিতে কংগ্রেসপন্থী মুসলমানকে নিতে চায়। তাতে হিন্দুর সংখ্যা কম হয়, মুসলমানের সংখ্যা বাড়ে। কিন্তু তাতে মুসলিম লিগ প্রচণ্ড আপত্তি জানায়। কারণ শুধু মুসলিম লিগই

মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে, কংগ্রেস তা পারে না। বড়লাট ওয়াভেল কংগ্রেসকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন তারা যেন কংগ্রেসপন্থী মুসলমানকে তাদের বরাদ্দ থেকে একটি আসন না দেয়, যদিও সে অধিকার তাদের আছে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে বড়লাটের অনুরোধ গৃহীত হতে চলেছিল।

এমন সময় গান্ধীজীর প্রবেশ। তিনি বললেন, সে কি কথা! কংগ্রেস তো কেবলমাত্র হিন্দুদের দল নয়, কংগ্রেস হচ্ছে হিন্দু-মুসলমান সকলের দল। তার জন্য বরাদ্দ আসনের থেকে সে যদি একটি আসন কংগ্রেসপন্থী মুসলমানকে দেয় সেটা অপরের কাছে আপত্তিকর হবে কেন? কংগ্রেসী মুসলমানরা বারবার জেলে গেছে, প্রচুর ত্যাগ স্বীকার করেছে, কংগ্রেস কি তাদের বাদ দিতে পারে?

সুতরাং কংগ্রেস থেকে পাঁচজন হিন্দুর সঙ্গে একজন মুসলমানকেও রাখা হল। সেই মুসলমানের নাম আসফ আলি। অনেকে জানেন না দিল্লীতে যৌথ নির্বাচন পদ্ধতি ছিল। সেটাই একমাত্র ব্যতিক্রম। আসফ আলি সাহেব হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের দ্বারা নির্বাচিত কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য। বড়লাট আর কী করেন? অগত্যা কংগ্রেসের কোটায় আসফ আলি সাহেবকেও নিতে হয়। জিন্না সাহেব তো রেগেমেগে টং। তিনি বলে পাঠালেন যে মুসলিম লিগ বড়লাটের আইন সভায় যোগ দেবে না, সংবিধান সভাও বর্জন করবে।

বড়লাট ওয়াভেল কিংকর্তব্যবিমূঢ়। শাসন পরিষদ পুনর্গঠিত না করলে নয়। মুসলিম লিগকে বাদ দিয়ে যদি করেন তাহলে মুসলিম সম্প্রদায় প্রতিনিধিবিহীন হবে। সেই পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি সাহেব বড়লাটকে নির্দেশ দেন কংগ্রেস নেতা জওহরলাল নেহরুকে শাসন পরিষদ গঠনের ভার অর্পণ করতে। ইতিমধ্যে মুসলিম লিগ ডাইরেক্ট অ্যাকশনের ডাক দিয়েছে এবং তার ফলে কলকাতায় দাঙ্গা বেধে গিয়েছে। হাজার হাজার লোক হতাহত হয়েছে। বড়লাট গান্ধীজী ও জওহরলালজীকে বলেন, আপনারা মুসলিম লিগকে কিছু কনসেসন দিন। তাঁরা বলেন, সে কথা আপনার বিবেচ্য নয়। আপনি আমাদের ডেকেছেন শাসন পরিষদ গঠনের জন্য। আপনি এটা না করলে আমরা ফিরে যাচ্ছি। বড়লাট নেহরুর পরামর্শমতো চলেন। শাসন পরিষদ গঠন করতে রাজি হন।

জিন্নাসাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নেহরু অনুরোধ করেন শাসন পরিষদে সদলবলে যোগ দিতে। জিন্না বলেন, আমি আপনার আহ্বানে যোগ দেব কেন? আপনি কি বড়লাট? নেহরু ফিরে গিয়ে বড়লাটকে বলেন, মুসলিম লিগ আসছে না। মুসলিম লিগের জন্য বরাদ্দ আসনগুলিতে অন্যান্য দলের মুসলমানদের নিতে হবে। কিন্তু তিনি অন্যান্য দলের কাছ থেকেও সায় পেলেন না। দুজন বন্ধুস্থানীয় মুসলমানকে লিগের পরিবর্তে গ্রহণ করেন।

শাসন পরিষদ করার পরে দেখা গেল সব কটি ভাল ভাল আসন বেহাত হয়ে গেছে। বল্লভভাই পটেল পেয়েছেন হোম আর বলদেও সিং ডিফেন্স। শোনা গিয়েছিল, জিন্না সাহেবের বাঞ্ছিত আসন ছিল ডিফেন্স আর লিয়াকৎ আলির হোম। কিন্তু একবার ভাগ বাঁটোয়ারা হয়ে যাওয়ার পরে বড়লাটের বিশেষ অনুরোধে, জিন্না সাহেব নন, লিয়াকৎ আলি সাহেব এলেন আর তিনজন লিগপন্থী মুসলমান ও একজন তপশিলি হিন্দুকে নিয়ে। তাঁর নাম যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। গান্ধীজী হতচকিত। বলেন, ভালই হল, তপশিলিদের দুজন থাকলেন। লিয়াকৎ আলি সাহেব যখন হোম চাইলেন তখন বড়লাট তাঁকে হোম দিতে গেলে বল্লভভাই পটেল বললেন, আমি চললুম। বলে তলপি গোটাতে আরম্ভ করলেন। বল্লভভাই মানে কংগ্রেস হাইকম্যান্ড। তাঁকে হাতছাড়া করতে বড়লাট নারাজ। অগত্যা লিয়াকৎ আলিকে দেওয়া হল অর্থ দপ্তর। সেই পদে ছিলেন একজন খ্রিস্টান অর্থনীতিবিদ।

তাঁকে সরানো হল। ডিফেন্স থেকে গেল বলদেও সিং-এর হাতে। কাজেই জিন্না সাহেব পরে মত পরিবর্তনের সুযোগ পেলেন না।

কংগ্রেসে আর লিগকে শাসন পরিষদে আনা হয়েছিল ঘরোয়া আলাপ-আলোচনার সূত্রে একটা বোঝাপড়ায় পৌঁছতে। ব্রিটিশ পলিসিই ছিল প্রথমে হিন্দু-মুসলমানের অর্থাৎ কংগ্রেস-লিগের বোঝাপড়া। কিন্তু নাটের গুরু গান্ধী আর জিন্না দুজনেই বাইরে। তাঁদের মুখ দেখাদেখি নেই। বিয়াল্লিশের আন্দোলনের পরে কারামুক্ত হয়ে গান্ধীজী সতেরো দিন জিন্না সাহেবের বাড়িতে দরবার করেছিলেন। জিন্নার সেই এক কথা। মুসলিম নেশন চায় তার হোমল্যান্ড পাকিস্তান। গান্ধীজী বলেন, আপনি কি সেই ন্যাশনালিস্ট নেতা যিনি ভারতের একতায় বিশ্বাস করতেন? জিন্নার বোধহয় অভিপ্রায় ছিল কেন্দ্রের তথা প্রদেশগুলিতে কংগ্রেস লিগ কোয়ালিশন প্রতিষ্ঠা। কিন্তু গান্ধীজী বলেন, আগে তো কংগ্রেস নেতারা কারামুক্ত হোন, তারপর তাঁদের সঙ্গে আপনারা কথাবার্তা বলুন। আমি কংগ্রেসের মেম্বার নই। আমি কথা দিতে পারিনে। জিন্না সাহেবের ধারণা ছিল গান্ধীই সর্বেসর্বা, হাইকম্যান্ড তাঁর হাতের পুতুল। কিন্তু হাইকম্যান্ডের সঙ্গে গান্ধীর এই মর্মে একটা সমঝোতা হয়েছিল যে সত্যাগ্রহের প্রয়োজন হলে গান্ধীজী হবেন তার সর্বাধিনায়ক। পার্লামেন্টারি ক্ষমতা গ্রহণের সময় হাইকম্যান্ড যা করবার করবে। তাঁর কাছে পরামর্শ চাইলে তিনি পরামর্শ দিতে পারেন। কিন্তু তাঁর সেই পরামর্শ মান্য করা না করা হাইকম্যান্ডের ইচ্ছাধীন।

বড়লাটের শাসন পরিষদ পুনর্গঠনের পর ঘরোয়াভাবে আলাপ-আলোচনার সুযোগ মেলে নেহরু পটেল ও লিয়াকৎ আলি খানের মধ্যে। গান্ধী জিন্নাকে কী পরামর্শ দেন জানা যায় না। তবে এইটুকু শোনা গেল কংগ্রেস ও লিগ 'পয়েন্ট অব নো রিটার্ন'-এ পৌঁছে গেছে। অর্থাৎ মিটমাট হল না। ঘটে গেল চিরবিচ্ছেদ। একে বলা হয় 'মোমেন্ট অব ট্রুথ'। সত্যের মুহূর্ত। ভারত ভাগ অনিবার্য।

ভবিষ্যতে ক্ষমতার অংশ পাওয়ার আশা নেই দেখে হিন্দু-শিখরা স্বতন্ত্র প্রদেশের দাবি তোলেন। কিছুদিন পরে বাংলাদেশের হিন্দুরা, বিশেষ করে বর্ণহিন্দুরা ক্ষমতা লাভের সম্ভাবনা নেই দেখে স্বতন্ত্র প্রদেশ চায়। গান্ধীজী কোন প্রকার পার্টিশন সমর্থন করেন না। না বাংলা দেশের পার্টিশন, না পাঞ্জাবের পার্টিশন। এই ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে নেহরু ও পটেল দুই কংগ্রেস নেতার মত মেলে না। তাঁরা পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পাঞ্জাব কংগ্রেসের ভাগে রেখে অবশিষ্ট মুসলিম প্রধান অঞ্চল ও প্রদেশ মুসলিম লিগের ভাগে ছেড়ে দিতে চান। তার মানে দুই কেন্দ্র দুই প্রস্থ প্রদেশ। জিন্না সাহেব রাজি হন না। কিন্তু বড়লাট মাউন্টব্যাটেন প্ল্যান তৈরি করেন। তাতে দেশ ও প্রদেশ পাকাপাকিভাবে ভাগ করা হয়। তবে মুসলিম লিগ পায় উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও অসমের সিলেট জেলা। কংগ্রেস মন্ত্রীদের দ্বারা শাসিত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ চলে যায় লিগ মন্ত্রীদের দখলে।

তার আগে একটি গণভোট হয়। তাতে খান আবদুল গফ্‌ফর খান-এর দলবল ভোট দেন না। গান্ধীজী তাঁর শিষ্য ও বন্ধু খান আবদুল গফ্‌ফর খান-এর দলকে নেকড়ে বাঘদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হন। কিন্তু কী করবেন! পার্টিশন মেনে নিলে সীমান্ত গান্ধীকে বিসর্জন দিতে হয়। গান্ধীজীর পক্ষে এটা এক প্রকার পরাজয়। তা না হলে মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনা পক্ষপাতদুষ্ট নয়। অধিকাংশ হিন্দুর ইচ্ছায় খণ্ডিত ভারতে কংগ্রেস রাজ হয়েছে, অধিকাংশ মুসলমানের ইচ্ছায় খণ্ডিত পাকিস্তানে মুসলিম লিগ রাজ হয়েছে। এই দুই বৃহৎ দলকে একজোট করার সামর্থ্য গান্ধীজীর ছিল না। তিনি মেনেই নিলেন যে হিন্দু-মুসলমানকে একসঙ্গে মেলাতে তিনি ব্যর্থ। তবে তাঁর মতে হিন্দুরা যে যেখানে আছে সে সেখানে থাকবে, মুসলমানরা যে যেখানে আছে সে সেখানে থাকবে। কাউকেই জোর করে

দেশান্তরে পাঠানো হবে না। তবে যদি কেউ স্বেচ্ছায় যেতে চায় তো সে তা পারবে। এই নীতি গান্ধীজী আপ্রাণ অনুসরণ করেন। এইজন্যই প্রাণ দেন।

গান্ধীজীর জীবনের কাজ ছিল ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটানো। সেই কাজ তিনি সম্পন্ন করেছেন। কিন্তু কংগ্রেসকে সমগ্র ভারতের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা ছিল তাঁর সাধ্যের বাইরে। অন্তত গণ-সত্যাগ্রহের দ্বারা সে উদ্দেশ্য সাধন করতে কেউ পারত না। সেটা অবশ্যকরণীয় হলে তার জন্য গৃহযুদ্ধ বাধাতে হত ও অনেক রক্তপাতের পর ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা হয়ত বিজয়ী হত। কংগ্রেস তার জন্য প্রস্তুত ছিল না। কংগ্রেস চেয়েছিল ক্ষমতার শান্তিপূর্ণ হস্তান্তর।

কংগ্রেস যা চেয়েছিল তা-ই পেয়েছে। মুসলিম লিগকে একটা ভাগ না দিলেই নয়। হয় শাসন ব্যবস্থার এক ভাগ, নয় দেশের মাটির এক ভাগ। কংগ্রেস নিষ্কণ্টক হতে চেয়েছিল বলেই দেশের মাটি ভাগাভাগি করে। এত বহু লোকের জীবনে নেমে আসে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো বিপদ। কিন্তু আরও অনেক লোকের আরও অনেক বেশি বিপদ হত। সারা ভারতটাই হত একালের কুরুক্ষেত্র।

মৌর্য বা গুপ্ত বা মোগল কোনও আমলেই ভারত এক শাসনাধীন ছিল না। এটা ব্রিটিশ আমলেই সম্ভব হয়েছিল। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের মূলতত্ত্ব ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিজম ব্রিটিশ ন্যাশনালিজমেরই মানস সন্তান। মানস সন্তান আশা করেছিল শান্তিপূর্ণ উত্তরাধিকারী হবে কংগ্রেস সমগ্র ভারতে। হতেও পারত, যদি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কংগ্রেসকেই একমাত্র উত্তরাধিকারী বলে স্বীকৃতি দিতেন। কিন্তু সেটা তাঁদের পলিসি ছিল না। তাঁরা মুসলিম লিগকেও অপর উত্তরাধিকারী বলে মনে করতেন। তাঁরা চেয়েছিলেন ভারতের অখণ্ডতার ফ্রেমে কংগ্রেস ও লিগকে স্বতন্ত্রভাবে ক্ষমতার ভাগ দিতে। সেটা কোনও দলের পছন্দ না হওয়ায় অবশেষে দেশ ভাগ ও বাংলা ভাগ করতে হলো। যেটা হলো সেটা হলো ভারত রাষ্ট্র ও পাকিস্তান রাষ্ট্র। কংগ্রেস রাজ ও মুসলিম লিগ রাজ। গান্ধীজী আপনাকে শূন্যে পরিণত করলেন। তিনি কারও উত্তরাধিকারী হলেন না। তাঁর রাজনৈতিক ভূমিকা সাঙ্গ হলো। বাকি রইল তার নৈতিক ভূমিকা।

১৯৯৫

হী রে ন্দ্র না থ মু খো পা ধ্যা য়

স্বাধীন ভারতে সংসদীয় ব্যবস্থা

আঠারো শতকের ইংরেজি সাহিত্যে বিখ্যাত বনেদি উপন্যাস "টম্ জোন্স্"-এ "Rev. Mr. Thwackum" নামধারী এক পাদ্রি সাহবের মুখে লেখক ফিলডিং একটি মজাদার বচন জুগিয়েছিলেন : "আমি যখন বলি 'ধর্ম', তখন আমি বোঝাতে চাই 'খ্রিস্টান ধর্ম', আর শুধু খ্রিস্টান নয়, 'প্রটেস্টান্ট' ধর্ম, আর শুধু 'প্রটেস্টান্ট' নয়, 'চার্চ অফ্ ইংলন্ড'-এর 'ধর্ম'।" নিজের দেশ নিয়ে সহজ সাদাসিধে স্বাভাবিক মমতা ও অহংকার যে মাঝে মাঝে একটু বাড়াবাড়ি "হম বড়া" ভাবকে টেনে আনে আর বিপদের আশঙ্কা ঘটায়, তার সাক্ষ্য দেয় ইতিহাস। মহাকবি মিল্টন-এর মতো মানুষও তাই বলে ফেলেন "God's Englishmen"-এর কথা, যাদের কাছেই নাকি ঈশ্বর সবার আগে তাঁর মনোবাঞ্ছা জানিয়ে থাকেন ! এরই জের টেনে সাম্রাজ্যবাদের কবি কিপলিং ভারতে বিজয়ী ইংরেজসেনা সম্বন্ধে বলে ফেলেন : "Pride in thier mien, defiance in their eye/You see the lords of humankind pass by !" আমাদের কালে উইনস্টন চার্চিল-এর মতো মহারথী সংকোচবোধ করেননি ঘোষণা করতে যে, পার্লামেন্ট বস্তুটি বাস্তবিকই ইংরেজ জাতের 'পেটেন্ট'-করা একচেটিয়া এক্তিয়ারের মধ্যে, আর সেখানে নাক গলাবার 'হক্' কিংবা 'হিম্মৎ' অন্য কারও নেই। তাঁরই শিষ্য লর্ড Hailsham অকুণ্ঠে জানিয়ে গেছেন যে পার্লামেন্ট বলতে বোঝায় "আলোচনার মারফত প্রশাসনের যে-প্রক্রিয়া সেটা হল ঈশ্বর-সৃষ্ট ইংরেজদেরই বিশিষ্ট অবদান" (a device for government by discussion being the specific contribution of God's Englishmen !) ব্রিটেনের বিদ্যাক্ষেত্রে একদা বিখ্যাত অধ্যাপক এ-এফ্-পলার্ড তাঁর "The Evolution of Parliament" গ্রন্থে সাড়ম্বরে লিখেছিলেন যে, "The Hindu and the Hottentot", "the Semitic and Negroid communities" সংসদীয় ব্যবস্থা পরিচালনায় অক্ষম, কারণ তারা "রাজনৈতিকভাবে অপারগ" ("political incapacity")। তবু ভালো যে এদের মতে আমরা একা নই। আমাদের মতো দুর্ভাগ্য আরও অনেকেরই ! বৌদ্ধযুগে গণরাজ্য আর কৌটিল্য-এর অর্থশাস্ত্র এবং কাশীপ্রসাদ জয়স্ওয়াল থেকে উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল, বিনয়কুমার সরকার প্রমুখের গবেষণা ইত্যাদি যতই আমাদের আশ্বস্ত করুক না কেন, Karl Wittfogel-এর মতো দারুণ পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা কেবলই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন "the despotic heritage of the Oriental race"-এর কথা (প্রাচ্যজাতির স্বৈরাচারী পরম্পরা")।

১৯৮৯-এর ১৪ই জুলাই বিপ্লবকালে 'বাস্তিল্'-দুর্গের পতন (১৭৮৯) স্মরণ করে

প্যারিসে যে উৎসব হয়েছিল সেখানে তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার ঔদ্ধত্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে, সবাইকে স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন ফরাসি বিপ্লবের তুলনায় ইংলন্ডে 'ম্যাগনা কার্টা'র (১২১৫) উৎকর্ষ ঘোষণা করে। পার্লামেন্ট বিষয়ে আমরা যে নাবালক, অকমর্ণ্য, অপকৃষ্ট, ইত্যাদি 'বচন' শুনতে বহুকালই অভ্যস্ত। বিশেষত সম্প্রতি বেশ কিছুকাল ধরে আমাদের সংসদীয় ক্ষেত্রে এমন জঘন্য জঞ্জালের দেখা পাওয়া গিয়েছে যে তাকে শুধু জগৎজোড়া সার্বিক সামাজিক-রাষ্ট্রিক-মানবিক অবক্ষয়ের অজুহাত তুলে নিজেদের দোষক্ষালন সহজ নয়। আমাদের এই উপমহাদেশ যখন দেশবিভাগের মূল্যে সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে ভারত ও পাকিস্তানের স্বাধীনতা ("ক্ষমতার হস্তান্তর" বলেছিল ইংরেজ) ক্রয় করেছিল তখন সাম্রাজ্যগরিমা অন্তর্ধানের ক্ষোভে রোষে যন্ত্রণায় চার্চিল বলতে ছাড়েননি যে অচিরে এদেশের 'স্বাধীনতা' লোপ পাবে। কিছু "খড়ের মানুষ" ("men of straw") রাজাসনে বসে দেশটাকে লণ্ডভণ্ড করে দেবে। এ কথার উত্থাপন অনিচ্ছাসত্ত্বেও করছি কারণ স্বাধীনতাপ্রাপ্তি থেকে পঞ্চাশ বছর পূর্তি নিয়ে যে আনন্দ স্বাভাবিক তা দেখা যায়নি, বরঞ্চ কোথাও কোথাও ওই চার্চিল ধরনের কুবাক্য উচ্চারিত হচ্ছে, আর "গোলামের জাতি শিখেছে গোলামি," হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই কবি-বাক্য স্মরণ করিয়ে কেউ কেউ বলেই ফেলছেন যে — বুঝি ইংরেজ রাজত্ব চালু থাকলেই মন্দ হত না ! আর সঙ্গে সঙ্গে শোনা যাচ্ছে যে আমাদের 'পার্লামেন্ট' নামে যে বিলাসিতা তা একটি 'বর্জ্য পদার্থ' বই কিছু নয়, এটিকে 'সামলে' উঠতেই আমরা পারছি না — 'হিন্দু আর হটেন্টট্', 'সেমিটিক আর নিগ্রয়েড্', আমরা বাস্তবিকই বুঝি 'সাহেব'-দের কথা অনুযায়ী 'পার্লামেন্ট' চালাবার যোগ্য নই। এর মীমাংসা করবে ইতিহাস, কিন্তু ইতিমধ্যে আমাদের সংসদীয় প্রশাসনের অভাবিতপূর্ব ন্যক্কারজনক দুর্দশা সত্ত্বেও আত্মশক্তি পুনরুদ্ধারের প্রয়াস হল দেশের কর্তব্য।

সংসদীয় ব্যাপারে সারা দেশে প্রায় সর্বত্র যে অধঃপাতের চেহারা মারাত্মক হয়ে উঠেছে তা অস্বীকারের কোনও প্রশ্ন নেই। বহুকাল আগে বিলাতে একটি প্রবচন ছিল যে "হাউস্ অফ্ লর্ডস্" বিষয়ে কারও মনে সম্ভ্রমবোধ থাকলে একবার তার অধিবেশনে উঁকি দিতে পারলেই তা কেটে-যাবে। তবু তো এর কারণ ছিল সচরাচর হাউস অব লর্ডস্-এ মধ্যযুগীয় ধরনধারণ আর সারগর্ভ ভাষণের মধ্যেও অতি-গাম্ভীর্য আর তারই ফলে যেন এক ইচ্ছাকৃত নীরস নিষ্প্রাণ পরিবেশ। সম্প্রতি টেলিভিশন-এর অ-কল্যাণে লোকসভায় সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থার মতো একান্ত গুরুতর আর গভীরভাবে চাঞ্চল্যকর বিষয়ের আলোচনাতে জনগণের প্রতিনিধিদের যে 'মূর্তি' দেখা গিয়েছিল তা অন্তত আমাদের মতো অনেককে যন্ত্রণা দিয়েছে। 'ধরণী, দ্বিধা হও'-ধরনের চিন্তা মনে জেগেছিল, বলে উঠতে হয়েছিল "Cry, my Beloved Country !" এই তুমুল তাণ্ডব হঠাৎ-ঘটে-যাওয়া কিছু নয়, এর সূত্রপাত বেশ কয়েক দশক আগে থেকেই। কিন্তু সম্প্রতি দশ-বারো বছর ধরে যেন রেওয়াজই দাঁড়িয়েছে যে 'দু কান-কাটা' হতে না পারলে রাজনীতির এলাকায় বিচরণ সম্ভব নয়, চারদিকে প্রায় অবলীলাক্রমে ঘটে চলেছে কেলেঙ্কারির পর কেলেঙ্কারি, কলুষ-কল্মষের কর্দমে মূল্যবোধ বস্তুটিই বুঝি অবলুপ্ত। গোটা দুনিয়াতেই কমবেশি চলছে এরকম ঘটনা আর তাই মার্কিন সংবাদপত্রে দেখি রাজনীতিকদের সম্বন্ধে উক্তি, তারা সাধারণত শুধু যে অকর্মণ্য আর অপদার্থ তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই হল "filthy crooks" (জঘন্য জুয়াচোর)। কতদূর চলে এসেছে দুনিয়া ১৮৪৮ সাল থেকে, যখন কার্লাইল বিলাতের কমন্স সভার ("talking shop") সদস্যদের "six hundred talking assess" বলে তিরস্কার করেছিলেন। দোষত্রুটি গ্লানি অপরাধ সব কিছুই অল্পাধিক সর্বদা থেকেছে কিন্তু

বর্তমানের মতো সামগ্রিকভাবে সমাজ সংসারের সর্বনাশকর পরিস্থিতি কখনও এক্ষেত্রে দেখা দেয়নি বললে অত্যুক্তি হবে না।

সংসদের চরিত্রভ্রংশ শুধু নয়, তার প্রকরণে তার কর্মপদ্ধতিতে, তার নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি ব্যাপারে যে অবনতি গত দু-তিন দশকের মধ্যে অত্যন্ত কটুভাবে কুৎসিত চেহারায় দেখা দিয়েছে তা নিয়ে দুশ্চিন্তা 'জন-প্রতিনিধি'দের মধ্যে যখন প্রায় নেই, তখন দেশবাসীকে দোষ দিয়ে পার পাওয়া যাবে না। শুধু কেন্দ্রশাসন ব্যাপারে নয়, বিভিন্ন রাজ্যে বিধানসভায়, এমনকি 'স্পিকার' পদের মর্যাদায় অধিষ্ঠিতদের মধ্যেও যে-বিচ্যুতি যে-অনাচার প্রবৃত্তি যে-অশালীনতা আর প্রশাসনে নীতিবিবর্জিত নৈরাজ্যরোধে যে-অক্ষমতা (হয়তো বা অনিচ্ছা ও অপ্রবৃত্তি) এত বেশি দেখা যায় যে তা পুরোনো কেতায় বলা যায় — আর 'কহতব্য' নয়। নিছক কাজের পরিমাণের দিক থেকে তবু দিল্লিতে সংসদের দুই কক্ষে প্রশ্নোত্তর-এর মধ্য দিয়ে প্রতিদিন অজস্র প্রয়োজনীয় তথ্য সংগৃহীত হয় আর বিতর্কের বিবরণ (পূর্বের তুলনায় ক্রমশ পরিমাণ ও গুণগত অবনতি এক্ষেত্রে ঘটে চললেও) নিয়মিত ছাপা হয়ে আসে, প্রকাশ্যে তা নিয়ে আলোচনা সম্ভব হয়। দেশের অন্যান্য রাজ্যের বিধানসভার দৈনন্দিন পূর্ণ বিবরণ যথাসময়ে ও নিয়মিত প্রকাশ হয়ে চলেছে কি না, তা প্রত্যক্ষ জানি না, কিন্তু গত দশ বছর ধরে জেনে এসেছি যে পশ্চিমবঙ্গের মতো বাস্তবিকই অগ্রসর রাজ্যের বিধানসভা বিশ বৎসরের বেশিকাল ধরে তার দৈনন্দিন অধিবেশনের কার্যবিবরণী ছাপিয়ে উঠতে পারেনি! সংসদীয় রীতিনীতির দিক থেকে যা অবশ্য মান্য। আরও অকাট্য, তা এত বৎসর ধরে অমার্জনীয় অবহেলা ও কর্মকুণ্ঠার ফলে লঙ্ঘিত হয়ে চলেছে। এমন ঘটনা নিয়ে কোথাও কোন চেতনাই নেই।

না বলে পারছি না যে পার্লামেন্টারি ব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত করে এই অপকর্ম যে আজও স্তব্ধ করা গেল না, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বর্তমান অধ্যক্ষমহোদয়ের আন্তরিক আগ্রহ সত্ত্বেও (যার সাক্ষ্য আমি দিতে পারি) কিছুতেই এই অপরাধের অবসান ঘটল না, মন্ত্রীরা সমেত বিধানসভার সদস্যবৃন্দের এ-ব্যাপারে অকল্পনীয় ঔদাসীন্যের বিরুদ্ধে কারও কণ্ঠ উত্তোলিত হল না (বিশেষত 'বিরোধী' দল সংস্কারের সমালোচনা প্রসঙ্গেও যে এমন অকর্মণ্যতার বিরুদ্ধে মুখর হবার মতো সামর্থ্য, কাণ্ডজ্ঞান, সংসদীয় কৌশল, জনপ্রতিনিধিত্বের মর্যাদা ও চরিত্র দেখাতে পারল না) — এই সবই আমার কাছে রহস্য। পার্লামেন্টারি শাসনের একেবারে প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সংসদীয় আলোচনা সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হবার চূড়ান্ত বাধ্যবাধকতা। অথচ দেশের মধ্যে সবচেয়ে 'সচেতন' বলে যে রাজ্যের দাবি, সেখানেই এই দুর্দশা! এ রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যায়তনে গবেষণারত যাঁরা, তাঁরাও বুঝি বিচলিত নন যে বিধানসভায় কী ঘটছে তার মূল বিশ্বাসযোগ্য অবিকল বিবরণ প্রায় বিশ বছর ধরে অপ্রাপ্য ! বিধায়করা নিজেদেরই ভাষণ কিংবা প্রশ্নোত্তর-এর সঠিক বয়ান সম্বন্ধেও আগ্রহ রাখেন না ! এমন ঘটেছে এ জন্য যে, কোনও রকম বৌদ্ধিক পরিশ্রম বিনাই সংসদে বা বিধানসভায় 'তোলপাড়' তোলা যায় ধারণা নিয়ে লেখাপড়ার ঝামেলা থেকে রেহাই পেয়েই বিধায়কবৃন্দ খুশি ! এ জন্যই শুধু যে দেশের দৌলত লুটপাট করেও দুর্বৃত্তেরা পার পেয়ে যাচ্ছে তা নয়, সংসদীয় রীতিনীতি-পদ্ধতিগত সতর্কতার সদ্ব্যবহারও আশানুরূপ হতে পারছে না। এ জন্যই কারও আগ্রহ নেই খোঁজ করার যে কেন্দ্রীয় সংসদের উভয় কক্ষের সদস্যদের প্রত্যেকে এক কোটি টাকা ব্যয়ের যে অধিকার পেয়েছেন, তা নিয়ে অডিটর-জেনারেলের দুশ্চিন্তা সত্ত্বেও যথোচিত সতর্কতা অবলম্বিত হচ্ছে কি না। সম্প্রতি রাজ্যের তোষাখানা ('treasury') থেকে টাকা নয়-ছয় করার কথা এমনভাবে রটছে তাতে মনে হয় সংসদ এবং বিধানসভায় যাঁরা আছেন তাঁরা

যথাযোগ্য ব্যবস্থা বিষয়ে মনোযোগী হলে এ সব কেলেঙ্কারি নিবারণ করা যেত। গোড়ায় গলদ যদি থেকে যায়, 'সর্ষের মধ্যে ভূত'-কে যদি তাড়াতে না পারা যায় তো দেশেরই সর্বনাশ ঘটবে। সংসদীয় শাসনে অনেক গলদ, অনেক ফাঁকফোকর, অনেক আমলাতান্ত্রিক দৌরাত্ম্যের ফুরসত, অনেক দুর্জনের কারসাজির সুযোগ আছে। কিন্তু সংসদীয় পদ্ধতি ও প্রকরণেই যে অন্তত বেশকিছু পরিমাণে এর সুরাহাও অসম্ভব নয়, তা ভুলে যাওয়া সুবিবেচনার কাজ নয়। এ ব্যর্থতার মাশুল গোটা দেশকেই দিতে হচ্ছে।

স্মৃতিভারাতুর মনে দিনের পর দিন খবরের কাগজ মারফত প্রায়-যেন-সীমাহীন কলঙ্ককাহিনীর অভিঘাত পড়ছে বলেও বোধ হয় এই লেখাটার যে ছক ঠিক করেছিলাম তা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছি। পাঠকদের মার্জনা চেয়ে নিয়ে বলি যে অন্তত স্বাধীনতার পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি বছরে একটু গর্ব না হয় করি যে আমাদের মতো মান্ধাতাগন্ধী আর অনেকটাই 'মনুবাদী' দেশে সংসদীয় ব্যবস্থা আপাতবিচারে বেমানান হলেও খানিকটা 'গুরু মারা' বিদ্যার জোরে আমরা দেখাতে পেরেছি যে প্রকৃত সুযোগ পেলে পার্লামেন্টারি খেলায় আমরা যে কোনও দেশের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারি। বেশ মনে পড়ছে ১৯৫৫ সাল নাগাদ চার্চিল-এরই শিষ্য প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি ইডন অস্ট্রেলিয়া ঘুরে ফেরার পথে দিল্লিতে লোকসভা অধিবেশন দেখে বলেছিলেন যে ভাবছিলেন যেন Westminster-এই রয়েছেন, অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্ট যেন অচেনা লাগছিল ! আমাদের মধ্যে নকলনবিশি একটু বেশি হয়তো, কিন্তু সংসদীয় পরীক্ষায় আমরা যে সসম্মান সাফল্য পেয়েছি আর ইচ্ছা থাকলে আজও পেতে পারি, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। মনে পড়ছে আর একজন ব্রিটিশমন্ত্রী, জন স্ট্রেচি (যিনি লেবার থেকে ফ্যাসিস্ট থেকে কম্যুনিস্ট থেকে ফের লেবার পার্টিতে বিচরণ করেছিলেন আর কয়েকটি দামি বইও লিখে ফেলেছিলেন) স্বাধীন ভারতের সংবিধান অনুসারে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ভাষা-লিঙ্গ ভেদ অতিক্রম করে প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের সমান ভোটাধিকার ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিসভার মাধ্যমে দেশশাসন ব্যবস্থার সাফল্য বিষয়ে মন্তব্য করেন যে এটা হল "a magnificent, if also precarious, achievement"। কথাটার মধ্যে খোঁচা খুব স্পষ্ট ; আমাদের কৃতিত্ব বিপুল ; কিন্তু সাফল্যের মধ্যে বিপদেরও সংকেত তিনি দেখেছিলেন। সংসদীয় ব্যবস্থা অনেক চিন্তার পর আমরা গ্রহণ করেছি। সাফল্যও কিছু যে পাইনি তা নয়, এত বৃহৎ এত জটিল এত সমস্যাসঙ্কুল দেশে যে সে-ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে পেরেছি, এটা সার্থকতার পরিচায়ক সন্দেহ নেই। যে বিপদের প্রতীক্ষায় এ দেশের শত্রুরা উল্লসিত, সেই বিপদ আসতে পারে এবং আসার বহু লক্ষণ ইতিমধ্যে দেখা দিয়েছে কারণ আমরাই যথেষ্ট সতর্ক হইনি আর অধুনা সংসদীয় ব্যবস্থার বিড়ম্বিত ও কলঙ্কক্লিষ্ট মূর্তি দেখে ভয় হয় যে স্বখাতসলিলেই যেন ডুবতে চলেছি। এ বিষয়ে যথোচিত চিন্তা ও কর্মোদ্যোগ যদি দেখা যায় তো মঙ্গল।

স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনাকালে বহু বিতর্ক ফলেই পার্লামেন্টারি শাসনপদ্ধতিকে বেছে নেওয়া হয়। দুনিয়ার নানা দেশে প্রচলিত শাসনতন্ত্র নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা আর আমাদেরই দেশের ঐতিহ্য অবলম্বন করে গান্ধী, বিনোবা, জয়প্রকাশ প্রমুখের 'সর্বোদয়' সমাজ নির্মাণ বিষয়েও কথা ওঠে। শেষ পর্যন্ত স্থির হয় যে সব দিকে থেকে বিচার করলে দোষেগুণে ইংরেজদেরই সংসদীয় পদ্ধতির ভারতীয়করণ হল সঙ্গত। এটা ঠিক কিংবা ভুল, তা যথাকালে স্থির হবে, কিন্তু এখনই, এই মুহূর্তে, আধুনিক জাগতিক পরিবেশ, আর নানা কারণে সামাজে রাষ্ট্রে মূলগত বিপ্লব সম্ভাবনা থাকুক বা না থাকুক, বিপ্লবসাধনে আমাদেরই ব্যর্থতা স্পষ্ট হওয়ায়, পার্লামেন্টারি প্রশাসন প্রথাকেই বাছাই করা হয়েছে। মনে পড়ছে, চার্চিল-এর মতোই পার্লামেন্ট-গর্বী ইংরেজের কথা : "সংসদীয় শাসন হল সব চেয়ে

নিকৃষ্ট -- তবে কি না বাকি সবকিছু হল আরও ওঁচা!" রহস্যাসিক্ত মন্তব্যে যে সায় দিতে চাই তা নয়। পার্লামেন্টারি ব্যবস্থা মনোমত হোক বা না হোক, বিপ্লবের পথে যেতে যখন দেশ পারেনি তখন আপাতত একে নিয়েই সর্ববিধ সুষ্ঠু প্রয়াস চলতে থাকুক।

দুশো বছরের ইংরেজ শাসন আমাদের নানাদিক থেকে নিঃস্ব করেছে, সৃষ্টিশীলতাকে নষ্ট করেছে, সমাজ ও সভ্যতার প্রাণবস্তুকে বিকৃত করতে সহায়ক হয়েছে। এ কথা শুধু আমার নয়, ১৯২৯ সালে কংগ্রেস থেকে গোটা দেশের যে 'স্বাধীনতার শপথ' রচিত হয় (২৬ জানুয়ারি ১৯৩০ থেকে যা সাড়ম্বরে উচ্চারিত হয়ে আসছে) তাতে এ কথা ঘোষিত হয়েছিল। কিন্তু ইংরেজি ভাষা (যার বিপুল বৈভব বিস্ময়কর) আর পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রচিন্তা (সংসদীয় প্রথা যার অন্তর্গত), এই দুটো জিনিস থেকে যে উপকার পেয়েছি তা অস্বীকার করার জো নেই। তাই আমাদেরই দাদাভাই নওরোজি বিলাতের সংসদে নির্বাচিত হয়ে ধীরস্থির সজ্জন বলে সুনাম করেছিলেন অসম্ভব প্রতিকূলতার মধ্যে। বিলাতের, 'লিবারাল'-দের পক্ষ থেকে নির্বাচনে যদি আমাদেরই লালমোহন ঘোষ জিততেন, তা হলে ব্রিটিশ সংসদ অন্তত জানতে পারত তাদেরই নিজস্ব ভাষায় বিদেশি লালমোহনের বাগ্মিতা কী আশ্চর্য ঘটনা ! বিশ শতাব্দীর বিশের দশকে ভারতীয় পার্সি শাপুরজি সাকলাতওয়ালা একমাত্র কমিউনিস্ট সদস্যরূপে প্রচণ্ড প্রতিঘাতকে পরাজিত করে সংসদীয় ওজস্বিতার ও সাহসিকতার চমৎকার পরিচয় দিয়েছিলেন। আমাদের দেশে কূটবুদ্ধি চাতুর্যের জোরে আমাদের ভুলিয়ে রাখার জন্য ধীরে ধীরে স্বায়ত্তশাসন দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ইংরেজ শাসকরা ১৮৬১, ১৮৯২, ১৯০৯, ১৯১৯, ১৯৩৫ সালে আইন করে সংসদীয় কেতারই অনুকরণে অথচ একান্ত সীমিতভাবে শাসনব্যবস্থায় প্রবেশের অতি সংকীর্ণ যে অধিকার দিয়েছিল, তার অজস্র বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও এ দেশের রাজনীতিকরা তখন তাঁদের নৈপুণ্য, তাঁদের নাগরিক চেতনা, স্বদেশের ভার স্বহস্তে তুলে নেবার সামর্থ্য উপহসিত ও অস্বীকৃত হলেও তার সুপ্রচুর প্রমাণ রেখেছিলেন নানা স্তরের ব্যবস্থাপক সভায় তাদের কৃতিত্বের অসংখ্য প্রমাণ রেখে। স্বাধীনতাপূর্ব যুগেই নিরন্তর প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বিপুল অবদান রেখে গেছেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আর গোপালকৃষ্ণ গোখলে, মদনমোহন মালব্য আর মহম্মদ আলি জিন্নাহ, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী আর তেজবাহাদুর সপ্রু, চিত্তরঞ্জন দাশ আর মতিলাল নেহরু, ভিঠলভাই পটেল, নওশের আলি, মভলঙ্কর, ফজলুল হক, শরৎচন্দ্র বসু, ভুলাভাই দেশাই, ইব্রাহিম রহমতুল্লাহ, কে এফ নরিমান, সচ্চিদানন্দ সিংহ, বি আম্বেদকর, সত্যমূর্তি আর শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, তুলসীচন্দ্র গোস্বামী, গোবিন্দবল্লভ পন্থ, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—তালিকা বাড়াতে গেলে কাগজ ফুরিয়ে যাবে ! স্বদেশী ভাষায় সংসদীয় গরিমা কোন স্তরে উঠতে পারে তার পরিচয় মওলানা আবুল কালাম আজাদের উর্দুতে, আন্না দুরাইয়ের তামিলে, বঙ্কিম মুখার্জি, হেমপ্রভা মজুমদার, মণিকুন্তলা সেন, সোমনাথ লাহিড়ীর বাংলায় আর কমলাপতি ত্রিপাঠী, প্রকাশবীর শাস্ত্রী (এঁরা ছিলেন আজকের অটল বিহারী বাজপেয়ীর পূর্বসূরী) প্রমুখের হিন্দিতে। বিপ্লব-সামর্থ্য আমাদের তেমন না থাকতে পারে কিন্তু বাগ্‌বিভূতিতে কারও কাছে হার আমরা মানি না! তাই পার্লামেন্ট যখন হল "talking shop" ("কথা নিয়ে দোকানদারি"), তখন অন্তত সে-পরীক্ষায় আমাদের ঠেকায় কে?

শুধু কৌতুকের সুরে নয়, বেশ গুরুত্ব নিয়েই বলতে চাই যে আমাদের মতো দেশে ব্যাপক মূলীভূত সমাজ রূপান্তরে সংসদীয় ব্যবস্থার গুণাগুণ যাই হোক না কেন, প্রচলিত পার্লামেন্টারি পথে যাত্রা করে স্বাধীন ভারতবর্ষ যে-কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছে, তার ঐতিহাসিক মূল্যায়ন যেন সঙ্গতভাবেই করা হয়। আর সেই চেষ্টায় নামলে অন্তত বলা উচিত যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধান্তের জটিল বিশ্ব পরিস্থিতি, ১৯৪৬ সাল থেকে ট্রুমান-চার্চিল

ঘোষিত সোভিয়েতের বিরুদ্ধে "শীতল যুদ্ধ" ঘোষণা, মহা চিনের অভ্যুদয়, কঠোর কঠিন দোটানার মধ্যে ভারতের মতো দেশে বহুবিধ সংকট, দেশবিভাগের যন্ত্রণা প্রশমনের প্রয়াসে সাফল্য-অসাফল্যের পরিমাণ ইত্যাদি নানা প্রতিবন্ধকের কথা মনে রাখলে স্বাধীন ভারতের নবনির্বাচিত সংসদের প্রথম দশক নিয়ে (১৯৫২-৬২) একটু অহঙ্কার আজ না হয় করলাম আমরা। জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে আমাদের নীতিগত লড়াই তখন তুঙ্গে ; বেশ মনে আছে আমরা ১৯৫২ সালের প্রথম লোকসভায় বলেছিলাম যে সরকারের নীতি হল যেন "দেশবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা"। তখন কমিউনিস্টদের দিকে আঙুল তুলে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, "তা হলে ওদের আর আমাদের মধ্যে চলবে যুদ্ধ ("War between them and us")। ঝগড়া চলেছে বারবার, আমরা বলেছি যে ক্ষমতার লোভে প্রধানমন্ত্রী "ইতিহাসে তাঁর স্থান হারিয়ে বসেছেন," বলেছি যে কথার মায়াজাল বুনতে পারেন বটে কিন্তু তিনি "a minor poet who has missed his vocation" ("এক হ্রস্ব স্তরের কবি যিনি তাঁর পেশা হারিয়ে বসেছেন")। থাক এই স্মৃতি নিয়ে রোমন্থন, তবে জানাতে চাই সবাইকে যে দেশের প্রথম সার্বভৌম সভায় সদস্য হবার একটা গর্ব তখন অনুভব করা যেত, একেবারে প্রথম সারির দেশনেতাদের সঙ্গে হয়তো বালখিল্য সংগ্রামে লিপ্ত হবার একটা মর্যাদা ছিল, মজাও ছিল। সেদিনের পার্লামেন্টে মাঝে মাঝে হইচই যে হত না, তা নয়। দৃষ্টিকটু, শ্রুতিকটু ঘটনাও যে হত না, তা নয়। কিন্তু সেটাই 'রীতি' হয়ে দাঁড়ায়নি, প্রকৃত আগ্রহ নিয়ে, পরিশ্রম সহকারে, চিন্তা ও কাজের চেষ্টা হত, যা আজকের তুলনায় স্মরণ করার প্রয়োজন হয়তো আছে।

প্রথম পার্লামেন্টে (১৯৫২-৫৭) আমাদের দেশের এ-যাবৎ সবচেয়ে গভীরতাস্পর্শী ও মূল্যবান 'যোজনা' (তা নিয়ে আজকের পণ্ডিতরা যতই কুবাক্য উচ্চারণ করুন না কেন) রচিত, ঘোষিত ও কার্যকর হবার সূচনা ঘটে। অর্থনীতিক্ষেত্রে জাতীয়করণ আজ শুধু বিতর্কিত নয়, প্রায় যেন ধিক্কৃত। কিন্তু দোষে-গুণে অন্তত গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী এই প্রযত্নের সূচনাও হয় তখন। সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে অন্তত হিন্দুদের মধ্যে মেয়েদের সম্পত্তিগত ও অন্যান্য অধিকার বিষয়ক আইন তখন রচিত হয়, প্রাচীনপন্থীদের প্রচণ্ড আপত্তি সত্ত্বেও। ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যগুলির পুনর্গঠন মারফত স্বাধীন ভারতের নতুন মানচিত্র রচনাও সেদিনের কীর্তি। আমাদের মতো দেশে অগ্রগতি যে কিভাবে ঘটতে পারে তার অপূর্ব নিদর্শন তৈরি হল যখন প্রথম পার্লামেন্ট 'দশমিক' (decimal) মুদ্রা প্রচলন ও মেট্রিক ('metric system') মাপ ও ওজনের প্রবর্তন করল — এ বিষয়ে ইংল্যান্ডের মতো দেশের চেয়ে আমরা এগিয়ে আর আমাদের নিরক্ষর দেশবাসী সাড়া দিয়ে প্রমাণ করলেন তাঁদের অবহেলিত স্বভাবনৈপুণ্য ও পরিবর্তনস্পৃহা যার কোনও মূল্যই দেশ দেয় না। ফিরিস্তি দেবার জায়গা এখানে নেই। কিন্তু উল্লেখ করতেই হবে আন্তর্জাতিক ব্যাপারে সবচেয়ে শক্তিমানদের বৈরিতাকে অগ্রাহ্য করে ভারত রাষ্ট্র ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও অভূতপূর্ব মর্যাদার অধিকারী হতে পেরেছিল। হয়তো একটু বিদ্রূপ শুনতে হবে, কিন্তু কে অস্বীকার করবে মহা চিনকে সোভিয়েতের পরই স্বীকৃতি দিয়ে ভারত মৈত্রী বন্ধন স্থাপনে নামল, "পঞ্চশীল" নীতির নির্ঘোষ জগৎ শুনল, এশিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্য গতিতে আফ্রিকার নবজাগৃতি সূচিত হল, ভারতের পররাষ্ট্রনীতিতে গলদ থাকলেও তার গরিমা স্বীকৃত না হয়ে পারল না, ভবিষ্যতে বিখ্যাত 'জোট নিরপেক্ষতার' নীতি প্রচারে ভারত অগ্রণী ভূমিকা নিল, ১৯৫৫ সালে বান্দুং সম্মেলনে নাসের, সুকর্ণ, নক্রুমা প্রমুখের সঙ্গে দেখলাম চিনের অন্যতম প্রধান চৌ এন লাই-কে, প্রায় যেন জওহরলালের প্রিয় অনুজের মতো ব্যবহার করতে। আবার বলি চলুক এ সব কথা নিয়ে কিছু ব্যঙ্গবিদ্রূপ। কিন্তু সন্দেহ নেই যে

এশিয়া আফ্রিকার জাগৃতির সূচক হয়ে রইল বান্দুং (১৯৫৫)। যা প্রায় যেন দশ বছর আগে হিরোশিমা-নাগাসাকির মাটিতে পাশ্চাত্য দম্ভের দস্যুতায় এশিয়ার যে আত্মমর্যাদা সমাধিস্থ হতে চলেছিল তার প্রত্যুত্তর। এই জন্যই জওহরলাল নেহরুর জীবনে ও কর্মে অগণিত ব্যর্থতা সত্ত্বেও একটা সার্থকতার সন্ধানে সদাপ্রবৃত্ত থাকার সংকল্প ও যথাসাধ্য কর্মব্যাপৃতি তাঁর স্মৃতিকে অসম্মান থেকে বাঁচিয়ে রাখবে। ভুলতে পাবি না যে ১৯৬৪ সালের মে মাসে তাঁর মৃত্যুর পর ইউনাইটেড নেশনস-এ স্মৃতিসভায় তৎকালীন মরক্কোর প্রতিনিধি বলেন যে নেহরু ছিলেন "the sculptor of the ethics of our part of the world".

জওহরলালকে নাজেহাল হতে হয়েছিল ১৯৫৯ সালে, যখন মার্কিন দেশ থেকে ওয়ালটার লিপমান চিন সফর সেরে এ দেশে এসে বলেন যে "জবরদস্তি" ("coercion") দ্বারা হোক না কেন, চিনের মতো অত বিরাট একটা দেশে যে-আমূল পরিবর্তন এল সে-রকম কিছু এখানেও দরকার কিন্তু গণতান্ত্রিক "সম্মতি" ("consent") নিয়ে। অথচ প্রায় সেই মহারানি ভিক্টোরিয়া আমলের প্রশাসনের জোরে পার্লামেন্টারি শাসন কী-ই বা করতে পারবে? বিশ্ববিখ্যাত 'লিবারাল' সাংবাদিকের মুখে এমন কথা উচ্চারিত হওয়ায় নেহরু সাংবাদিকদের ডাকলেন আর প্রায় যেন আমতা আমতা করে বললেন যে সংসদীয় পদ্ধতিতে বাধাবিঘ্ন অনেক। কিন্তু আমরা ঠিক করেছি যে সেটাকে দরকার মতো মেরামত করে নেওয়া হবে। হয়তো চেষ্টা একটু করেছিলেন— Community Development, National Extension Scheme ইত্যাদির মাধ্যমে। কিন্তু কাজের কাজ হল না। স্বাধীনতার পূর্বে যাঁর দৃপ্ত ঘোষণা ছিল যে মুনাফাবাজ আর চোরাকারবারিদের পাকড়ে ফাঁসিকাঠে লটকানো হবে, তিনি সে সংকল্পের ধারকাছেও যেতে পারলেন না। সন্দেহ নেই যে মানসিক ধাক্কা অনেক পেলেন আর শেষ পর্যন্ত অবিরাম ধকল সহ্য করতে পারলেন না। "আমাদের এই প্রজন্ম দেশের জন্য কঠোর পরিশ্রমের শাস্তি পেয়েছে" যিনি বলেছিলেন, তাঁকে যে-পার্লামেন্ট বিষয়ে উচ্চাশা তাঁর ছিল সেই পার্লামেন্টেই নাস্তানাবুদ হতে হল। দুনিয়াটাও এমনভাবে বদলাতে শুরু করল যে "miles to go" বাকি রয়েছে জেনেও তাঁকে চলে যেতে হল। দেশের ইতিহাসের একটা অধ্যায় শেষ হল।

প্রথম দশ বছরে পার্লামেন্ট 'আহামরি' ধরনের কাজ দেখাতে না পারলেও দুর্গত দুনিয়ার পশ্চাৎপদ একটা দেশের পক্ষে চলনসই কাজ নিশ্চয়ই করেছিল। দোষেগুণে যাই হোক, চিনের মতো বিরাট বিপ্লব আমাদের সাধ্যের বাইরে ছিল আর তার ফল ভোগ করতেই হবে। ইংরেজ বিপ্লব (১৬৪১), আমেরিকান বিপ্লব (১৭৭৬), ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯), রুশ দেশে বলসেভিক বিপ্লব (১৯১৭) ইত্যাদিতে বহু লক্ষ মানুষের প্রাণ গেছে। আরও কত মূল্য ইতিহাসকে দিতে হয়েছে। কিন্তু বিপ্লব ব্যতিরেকেই এবং বিপ্লবের উন্মাদনায় অধিকাংশ দেশবাসীর মনকে নতুন রঙে রাঙাবার সম্ভাবনা বিনাই নিজেদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ও অন্যান্য সংঘর্ষের ফলে অজস্র যন্ত্রণা আমরা পেলাম। কিন্তু বিপ্লবের মতো কোন 'যজ্ঞফল' সংগ্রহের সুযোগ আমরা পেলাম না। এটা নিয়ে গান্ধী-নেহরুকে দোষ না দিয়ে আমরা যারা বিপ্লব কামনার কথা বলে এসেছি তাদেরই দোষ দিতে হবে বেশি। গান্ধী-নেহরুরা তো নিজেদের 'বিপ্লবী' বলে দাবি করতেন না। যাই হোক, বিপ্লব 'বনাম' মৃদুগতিতে বিবর্তনের ঐতিহাসিক লড়াই নিয়ে চূড়ান্ত ধারণা এখনও আমরা পাইনি। তবে সংসদীয় ব্যবস্থার বেশ কিছু সদ্‌গুণ থাকলেও তার জোরে সমাজ রূপান্তর যে ঘটবে না, এটা আমাদের অভিজ্ঞতাই বলে দিল।

পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে সোভিয়েত-চিন বিসংবাদ দুনিয়ার চেহারা বদলাতে আরম্ভ করল। ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিধা, পরে ত্রিধা ও বহুধা বিভক্ত হল। ১৯৬৪

থেকে পার্লামেন্টে আমাদের ঘরোয়া ঝগড়ার ফলে শক্তিক্ষয় দেখা দিল। চিন-ভারত মতান্তর থেকে মনান্তর থেকে সীমান্তে অল্পাধিক সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়ার ফলে নেহরুর বিদেশনীতি ও সমাজতন্ত্র সম্পর্কে সহানুভূতি অনেকের কাছে ভ্রান্ত ও বিপজ্জনক মনে হল। এর সুযোগ নিয়ে পার্লামেন্টে নেহরুনীতির নিন্দায় মুখর হতে দেখা গেল শুধু ধনিকপুষ্ট 'স্বতন্ত্র' পার্টি নয়, সঙ্গে সঙ্গে (এবং আরও সজোরে) প্রতিবাদ এল বিশেষ করে রামমনোহর লোহিয়ার নেতৃত্বে 'সোসালিস্ট' দল থেকে। এদের মধ্যে প্রকৃত গুণধর সাংসদও ছিলেন কয়েকজন। যেমন মধু লিমাইয়ে। লোহিয়ারও এক প্রকার প্রতিভা ছিল নিঃসন্দিগ্ধ, কিন্তু কেমন যেন 'maverick' মনোবৃত্তি মুশকিল ঘটাল। সংসদে এঁরাই অগ্রণী হয়ে প্রায় একটা রেওয়াজ বানিয়েছিলেন যে প্রচণ্ড গোলমাল সৃষ্টি করে সরকারকে সর্বদা বাধা দেওয়া। হয়তো একটু বাড়িয়ে বলা হল। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শী ও শ্রোতারা ভুলতে পারেন না কীভাবে সংসদীয় শৃঙ্খলার 'বারোটা বাজিয়ে' দেবার কাজ সেই ১৯৫৯-৬০ থেকে চালু হয়ে গেল। নিজেদের কথা বলতে সংকোচ কাটিয়ে বলি যে একবার আমি লোহিয়ার সামনেই না বলে পারিনি যে তাঁর মধ্যে profundity ('গভীরস্পর্শিতা') আর 'perversity' ('উদ্ভট ভাব') একই সঙ্গে বিরাজ করছে। ঠাট্টাটা লোহিয়া নিজে উপভোগ করলেও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা অবশ্য করেনি। যাই হোক, তখন সংসদে 'বে-ধড়ক' হইচই আর প্রায় অকারণ গোলমাল ক্রমশ নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। জনসঙ্ঘের এক অতি সুশিক্ষিত সদস্য একদিন নিজেকে গণ্ডগোলের 'hero' বানাবার পর স্বীকার করলেন যে বাড়িতে বউ রোজ বলে পার্লামেন্টে যাও অথচ কাগজে নাম বেরোয় না, তাই চেঁচামেচি করে কাগজে নামপ্রকাশ নিশ্চিত করাই ছিল তাঁর মতলব! লোহিয়া খাড়া করলেন একটি 'তত্ত্ব', যা পুরোপুরি ভুল না হলেও ছিল বিপজ্জনক। তিনি বললেন দুনিয়ার কোন পার্লামেন্ট আমাদের দেশের মতো 'decorum-obsessed' নয় (শালীনতা বোধের আতিশয্যে ভারাক্রান্ত)। এটা মার্জিত যুক্তি তর্কের বিষয়, কিন্তু বেপরোয়া হয়ে বাজারে নাম কুড়োবার প্রলোভন এড়াবার প্রবৃত্তি বা ক্ষমতা রাজনীতিওয়ালাদের মধ্যে কম বলে দেখা গেল যে সংসদে গণ্ডগোল সৃষ্টি করাই হল খ্যাতি অর্জনের সোজা রাস্তা। খবরের কাগজওয়ালারা এই ধারণাকে উৎসাহিত করায় ফল ক্রমশ আরও বিষময় হতে লাগল। এই রেওয়াজ আজও চলেছে, সংবাদমাধ্যমে সংসদের গুরুত্বপূর্ণ খবর বড় একটা বার হয় না, কিন্তু দৌরাত্ম্যের খবর সবাই মজা করে পড়তে যায়। এ জন্যই আজও বিশেষ করে দেখা যায় যে, সংসদীয় বৃত্তান্তে দামি কাজ বা কথার বিবরণ প্রায় একেবারে নেই, কেচ্ছা-কেলেঙ্কারির ফলাও খবর বরঞ্চ আছে। দুঃখ হয় আজ প্রয়াত জ্যোতির্ময় বসুর মতো সাংসদ নেই যিনি decorum বা অতিরিক্ত শালীনতার তোয়াক্কা না রেখেও সংসদের ভিতরে ও বাইরে দুর্নীতি আবিষ্কার ও দমনে ছিলেন অদ্ভুতকর্মা। সংসদের 'বিবেক' বলে যে একটা বস্তু একদা ছিল, তা সবাই এখন ভুলে গেছি। যে-ভূমিকায় চন্দ্রশেখর বা অটলবিহারী বা ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত নামতে পারতেন, তা তাঁরা পারেননি। অদ্ভুত এক অন্ধকার সংসদ চরিত্রকে আজ আচ্ছন্ন করে রেখেছে, একটা গোটা বই লিখেও এর পূর্ণ পরিচয় সম্ভব নয়।

নেহরুর পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন অতি সজ্জন, তাই কোনক্রমে সংসদকে সামলে চলেছিলেন তিনি। ইন্দিরা গান্ধীর আমলে শুরু হল আর এক বিপদ। অর্থাৎ সরকারের দিক থেকে সংসদের প্রতি অবজ্ঞা। নেহরু আমলে প্রধানমন্ত্রী সংসদে প্রতিদিন সর্বদা প্রায় হাজির — ফলে আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকত সচরাচর। প্রধানমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে গণ্ডগোলের মাত্রা ও চরিত্র বদলে গেল (রাজীবের আমলে এই কাণ্ড আরও বেড়ে উঠেছিল)। ইন্দিরা নিজে না থাকায় তার দলের সবাই চিৎকারের লড়াইয়ে বিরোধীদের

টেক্কা দেওয়ার 'লাইসেন্স' যেন পেয়ে গেল, হট্টচক্রের চাপে সংসদ কুঁকড়ে যেতে থাকল। 'স্পিকার হিসাবে মভলঙ্কর, যা সহ্য করতে পারতেন না, অনন্তশয়নম আয়েঙ্গার তার মোকাবিলা কোনক্রমে করতেন, হুকম সিংহ তার চোটে জেরবার হয়ে হাল ছাড়ার উপক্রম করতেন, সাধারণ বুদ্ধিতে পারঙ্গম সঞ্জীব রেড্ডি 'স্পিকার' আসন থেকে নিজেকে অসহায় ঘোষণা করতে বাধ্য হলেন, তারপর গুরুদয়াল সিংহ ধীলন প্রকাশ্যে ওষুধের 'বড়ি' গিলে মাথা ঠাণ্ডা রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন — এ সব ভাবলে অবাক হতে হয়। বর্তমান লোকসভাধ্যক্ষ সাংমা-র মহাগুণ সর্বাবস্থায় হাসিমুখে কিছু বলার ক্ষমতা। কিন্তু তাঁকেও যে কী অগ্নিপরীক্ষা দিতে হচ্ছে তা বোঝা শক্ত নয়। সংসদ যে রয়েছে আর কিছু কাজের চেষ্টা করছে এটাই যেন একটা প্রাপ্তি।

আশি আর নব্বইয়ের দশকের সংসদের চেহারা নিয়ে বেশি কথা না বলাই শ্রেয়। তা ছাড়া অপরাধ আর দুর্নীতি আর দুর্বৃত্তির চূড়ান্ত যেভাবে ঘটে যেতে পারছে অথচ সংসদীয় ব্যবস্থা পরিস্থিতি সামলাবার শক্তি রাখে না তা মোটামুটি সবাই দেখছি। 'দু কান কাটা'-র মতো রাজনীতিক্ষেত্রে বিচরণকে যেন দেশ মেনেই নিতে বসেছে। তবু ভালো যে বিচার বিভাগ এ ব্যাপারে অগ্রসর হবার ফলে দুষ্টের দমন সহজ না হলেও যে সম্ভব, তা অনেকে বুঝেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, জনপ্রতিনিধিরা যদি ব্যর্থ হন তো বিচারপতিরা দেশকে বাঁচাতে পারেন না। সংবিধান অনুযায়ী সংসদেরই সামর্থ্য আছে দুর্নীতি দূরীকরণ ও আনুষঙ্গিক সর্ববিধ প্রচেষ্টার। দুঃখের বিষয় সেদিকে তেমন প্রকৃত অগ্রগতি দেখা যায়নি। আছে কিছু ঢক্কানিনাদ কিন্তু নাম না করেই বলা ভালো, দুর্বৃত্তের দুর্দান্ত ক্ষমতা আজও দেশের অগ্রগতি দূরে থাক, প্রকৃত কল্যাণের পথকেই রুদ্ধ করে রেখেছে।

১৯৫০ সালের ছাব্বিশে জানুয়ারি স্বাধীন ভারত গণরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা দিবস বলে ঘোষিত হল। তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে জানান যে দিনটি পঞ্জিকাশাস্ত্রীদের মতে অশুভ। সুতরাং তাঁর অনুরোধ যে অন্য কোনদিন পাঁজিপুঁথি দেখে স্থির হোক। এতে স্বভাবতই রুষ্ট হয়ে নেহরু জানান যে কুসংস্কারের কাছে মাথা নত করে ঐতিহ্যবন্দিত দিবসটির অবমাননা সহ্য করা যায় না। তুচ্ছ অথচ অর্থবহ এই ঘটনাটি সম্ভবত বিশ্ব হিন্দু পরিষদ আর শিবসেনা ধরনের কাণ্ডকারখানার পাণ্ডাদের জানা নেই (লেখাপড়ার চর্চাও যে এখন লাটে উঠেছে!), নইলে একথা বলে বেড়ানোর এমন মওকা মিলেছিল যে ভারত রাষ্ট্রের দুর্ভাগ্যের কারণ হল নাস্তিক নেহরুর গ্রহনক্ষত্রের ওপর অবিশ্বাস! যাই হোক, এখন তো জাল-জোচ্চুরি-বদমায়েসির হাজার নালিশে জেরবার নেতা প্রবরেরা ভগবানের দয়া ভিক্ষা করে মন্দিরে মসজিদে গুরুদ্বারায় ধরনা দিচ্ছেন, যাগযজ্ঞ করাচ্ছেন (মারন-উচাটন ইত্যাদি কত কী!), "ভক্তের ভগবান" যদি মুখ তুলে চান তো এই দুর্বৃত্তদেরই ভালো— চালিয়ে যাক তারা দেবদ্বারে আর্জি। কিন্তু দেশের ভার তো নিতে হবে দেশের মানুষকে, 'পঞ্চায়েত' থেকে 'পার্লামেন্ট' যে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক শাসনপদ্ধতি ও প্রকরণ ও প্রথা, তাকেই তো জাগিয়ে তুলতে হবে — "পঞ্চমে পরমেশ্বর" এই প্রবাদ বাক্য তো সর্বদাই সত্য। এ কাজে নামতে হবে সবাইকে। নামতে হবে সাধারণ মানুষকে, জানতে হবে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা : 'দেব-আরাধনে ভারত উদ্ধার/হবে না হবে না খোলো তরবার/এ সব দৈত্য নহে তেমন।" সংসদের মতো প্রকরণের যথাসম্ভব ও যথোচিত সদ্ব্যবহার এ জন্যই প্রয়োজন। সাম্প্রতিক কলঙ্ককাহিনী যতই নিদারুণ স্বভাব, স্বধর্ম, সাহস, সংকল্প, সংগ্রামশক্তির পরাভব নেই।

শ ং ক র ঘো ষ

বিদেশনীতি এখনও নেহরুর পথে

স্বাধীনতা দিবস যেমন ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট হঠাৎ ভূমিষ্ঠ হয়নি, তার অনেক পূর্বপ্রস্তুতি ও উদ্যোগ ছিল তেমনই ভারতের বিদেশনীতিও জওহরলাল নেহরু প্রধানমন্ত্রী ও বিদেশমন্ত্রী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিকশিত হয়নি। স্পেনের গৃহযুদ্ধই সম্ভবত নেহরুকে প্রথম সচেতন করে যে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধকে আন্তর্জাতিক ঘটনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা ভুল হবে, কেননা শান্তির মতো স্বাধীনতাও অবিভাজ্য। এই প্রসঙ্গে স্বাধীনতার বেশ কয়েক বছর আগে, ১৯৪০ সালে তাঁর আত্মজীবনীতে নেহরু লিখেছিলেন ফ্যাসিবাদ-নাৎসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ যমজ ভাই। তফাত কেবল এইটুকু যে সাম্রাজ্যবাদ পরদেশে, উপনিবেশ ইত্যাদিতে কাজ করে আর ফ্যাসিবাদ-নাৎসিবাদ একইভাবে স্বদেশে কাজ করে। তাই পৃথিবীতে স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করতে হলে শুধু ফ্যাসিবাদ-নাৎসিবাদ অবসান হলেই চলবে না, সাম্রাজ্যবাদেরও উচ্ছেদ করতে হবে।

অন্যত্র নেহরু বলেছিলেন স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় তাঁর বয়স যদি অল্প হত তা হলে তিনি ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেডে যোগ দিয়ে ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য স্পেন যেতেন।

প্রধানমন্ত্রী হওয়ার অনেক আগেই নেহরুর স্থির করা হয়ে গিয়েছিল যে স্বাধীন ভারত ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ এই দুই যমজ ভাইয়ের বিরোধিতা করবে। কেবল এই নেতিবাচক মনোভাবের উপর কোন দেশের বিদেশনীতি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। বিদেশনীতিতে কী থাকবে না তা যেমন বলা দরকার তেমনি কী থাকবে তাও পরিষ্কার হওয়া দরকার। নেহরুর বিদেশনীতির এই সদর্থক দিকটি প্রথম প্রকাশ পায় তাঁর কার্যভার নেওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই। কংগ্রেস ১৯৪৬ সালের ২ সেপ্টেম্বর অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দেয় এবং ওই মাসেরই ৭ তারিখে তিনি এশিয়ার দেশগুলিকে নতুন দিল্লিতে প্রস্তাবিত আন্তঃএশীয় সম্পর্ক সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ পাঠান।

প্রস্তাবিত আন্তঃএশীয় সম্মেলনটি হয়েছিল নতুন দিল্লিতে ১৯৪৭ সালের ২৩ মার্চ থেকে ২ এপ্রিল পর্যন্ত। সম্মেলনে অংশ নিয়েছিলেন এশিয়ার ২৮টি দেশের ২৪৩ জন প্রতিনিধি। এই সম্মেলনে চিনও প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল। চিনে তখন কুওমিনটাং সরকার।

সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে নেহরু বলেন যে রাজনৈতিক দাবাখেলায় এশিয়ার দেশগুলিকে আর বোড়ের মতো ব্যবহার করা চলবে না। বিশ্ব রাজনীতিতে তারা নিজেদের নীতি অনুসরণ করবে। একটি মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরই আর একটি যুদ্ধের সম্ভাবনার কথা শোনা যাচ্ছে। এই পারমাণবিক যুগে এশিয়াকে শান্তি রক্ষার জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা

করতে হবে। এশিয়া যদি তার ভূমিকা পালন না-করে তা হলে শান্তি প্রতিষ্ঠাও হবে না।

এশিয়া সম্মেলন ইউরোপ ও আমেরিকার অনেকের মনে সংশয়ের সৃষ্টি করেছিল যে এই দুই মহাদেশের বিরুদ্ধে একটি সর্ব এশিয়া আন্দোলনের সূত্রপাত হতে চলেছে। নেহরু বলেন তাঁদের কারও বিরুদ্ধে কোনও অভিসন্ধি নেই। তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল সারা বিশ্বে শান্তি ও প্রগতির প্রসার।

এশিয়া সম্মেলনের আট বছর পরে ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসে হয় আফ্রিকা ও এশিয়ার নব স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ২৯টি দেশের সম্মেলন। অংশগ্রহণকারী দেশগুলির প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতিদের এই সম্মেলন ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল বলে আফ্রিকা ও এশিয়ার স্বাধীন দেশগুলির এই সম্মেলন বান্দুং সম্মেলন নামে বেশি পরিচিত। সাত দিনে এই সম্মেলনের মধ্যমণি ছিলেন চিনের প্রধানমন্ত্রী ঝাও এন লাই। বান্দুংয়ে নেহরুর সঙ্গে সচিব পর্যায়ের যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন তদানীন্তন কমনওয়েলথ সচিব সুবিমল দত্ত। পরবর্তিকালে তিনি তাঁর স্মৃতিচারণে লিখেছেন যে বান্দুংয়ে নেহরু বড় ভাইয়ের মতো আচরণ করতেন ঝাও এন লাইয়ের সঙ্গে এবং চীনা প্রধানমন্ত্রীও নেহরুকে বড় ভাইয়ের মতো দেখতেন।

প্রসঙ্গত বলি, যে জনা ছয়েক সাংবাদিক এদেশ থেকে বান্দুং সম্মেলন রিপোর্ট করতে গিয়েছিল তাঁদের মধ্যে আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসাবে এই লেখকও ছিল। সম্মেলন শুরু হওয়ার আগের রাতে নেহরু ভারতীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে সম্মেলন সম্পর্কে আলোচনা করেন। রাতের আলোচনা মোটেই জমেনি। নেহরু এলেন বেশ দেরি করে, বললেন, তাঁর বলার কিছু নেই, দেখা যাক আগামী সাত দিনে কী হয়। নেহরু সে রাতে বিমর্ষ, চিন্তিত, হতোদ্যম।

তার একটি বড় কারণ অবশ্য বান্দুংয়ের পথে এয়ার-ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনালের চার্টার্ড বিমান 'দ্য কাশ্মীর প্রিন্সেস'-এর ভারত মহাসাগরের উপর ভেঙে পড়া। এই বিমানে বান্দুং সম্মেলনে চিনা প্রতিনিধিদের একটি অগ্রবর্তী দল ছিল, কয়েক জন পোলিশ সাংবাদিকও ওই বিমানে ছিলেন। প্রায় সকলেই মারা যান।

দ্বিতীয় যে কারণে নেহরু উদ্বিগ্ন ছিলেন সেটি হল সম্মেলনের সাফল্য। সম্মেলনের আগেই প্রচার আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল যে নেহরু তাঁর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সম্মেলনের উদ্যোগ নিয়েছেন এবং সম্মেলন আরম্ভ হওয়ার আগেই নেহরু বিরোধীরা একটি জোট বেঁধে ফেলেছিলেন। এই জোটে পাকিস্তানের মহম্মদ আলি, সিংহলের জন কোটেলাওয়ালা, ফিলিপিন্স-এর জেনারেল রমুলো ইত্যাদি জন আষ্টেক প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রনেতারা ছিলেন। তাঁরা নেহরুর সামরিক জোট বিরোধিতাকে মার্কিন বিরোধিতা ও কমিউনিজম প্রীতির লক্ষণ ধরে নিয়ে সম্মেলনে নেহরু বিরোধিতার নীতি নেবেন স্থির করে ফেলেছিলেন।

বান্দুং সম্মেলনের আগে বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটে যার পূর্ণ সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করেছিল এই নেহরুবিরোধী শিবির। নেহরু তখন চিনের রাষ্ট্রসংঘে অন্তর্ভুক্তি ও তাইওয়ানের বহিষ্কারের দাবিতে আন্তর্জাতির রাজনীতিক ক্ষেত্র তোলপাড় করছেন, তিনি তিব্বতের উপর চিনের সর্বময় কর্তৃত্ব মেনে নিয়ে এবং ব্রিটিশ আমল থেকে ভারত তিব্বতে যে সব বিশেষ সুবিধা ভোগ করে আসছিল সেগুলি বিসর্জন দিয়ে চিনের সঙ্গে 'চিনে তিব্বত অঞ্চল সম্পর্কে চিন-ভারত চুক্তি', 'সিনো-ইন্ডিয়ান এগ্রিমেন্ট অন টিবেট রিজিয়ন অব চায়না' সম্পন্ন করেছেন, সবচেয়ে বড় কথা, তিনি চিন সফর করে এসেছেন। মাও জে দঙের সঙ্গে দীর্ঘ রাজনৈতিক আলোচনার পর তিনি সার্টিফিকেট দিয়েছেন যে চিন শান্তি চায়। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও তিনি কংগ্রেসের নতুন লক্ষ্য স্থির করেছেন সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের

সমাজ, 'সোশ্যালিস্টিক প্যাটার্ন অব সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করা। কাজেই তখন নেহরুকে প্রচ্ছন্ন কমিউনিস্ট বলে আমেরিকার স্নেহধন্য হওয়ার প্রবণতা বেশ কয়েকটি রাষ্ট্রে প্রবল ছিল।

মার্কিন ছাতার তলায় আশ্রয় নিয়ে এশিয়া ও আফ্রিকার যে সব দেশ তাদের স্বাধীনতা ভোগে আগ্রহী ছিল তারা নেহরুর সামরিক জোট বিরোধিতার জন্য তাঁকে কমিউনিস্ট বলবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু বান্দুংয়ে সবচেয়ে বিস্ময়জনক ভূমিকা নিয়েছিলেন চিনের প্রধানমন্ত্রী, নেহরুর 'ছোট ভাই' ঝাও এন লাই। বান্দুংয়েই তাঁর সঙ্গে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বাঙালি মহম্মদ আলির যোগাযোগ স্থাপিত হয়। মহম্মদ আলি ঝাও এন লাইকে বলেন, পাকিস্তান চিনের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন নয়, চিনা আগ্রাসনের ভয়ও পাকিস্তানের নেই, এবং আমেরিকা ও চিনের মধ্যে যুদ্ধ বাধলে পাকিস্তান তাতে জড়াবে না।

মহম্মদ আলি এ সব কথা বলতেই পারেন কিন্তু ঝাও এন লাই তাঁকে যা বলেছিলেন তা তখনকার দিনে ছিল অবিশ্বাস্য। ঝাও বলেন, পাকিস্তান ও চিনের মধ্যে এমন কোনও স্বার্থের সংঘাত হতে পারে না যাতে দুই দেশের মিত্র-সম্পর্ক বিপন্ন হবে কিন্তু ভারত-চিন সম্পর্ক সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না।

সম্মেলন শেষ হওয়ার পরদিন সকালে নেহরু ভারতীয় সাংবাদিকদের ডেকেছিলেন। এ দিন নেহরুর মেজাজও ঝকঝকে সকালটির মতো ঝকঝকে। হোল্ডারে বিলিতি সিগারেট ধরিয়ে খাচ্ছেন। আমাদের বললেন, সম্মেলনের সবচেয়ে বড় সার্থকতা যে সম্মেলনটি হয়েছে এবং সম্মেলনের শেষে একটি সর্বসম্মত ঘোষণাও প্রকাশিত হয়েছে। এই ঘোষণাটি, যার নাম দেওয়া হয়েছিল বান্দুং ডিক্লারেশন তার জন্য সব কৃতিত্ব তিনি কৃষ্ণ মেননকে দেন, বলেন মেননের অসীম সহিষ্ণুতার জন্যই এই সর্বসম্মত ঘোষণা সম্ভব হয়েছে।

বান্দুং সম্মেলনের কয়েক সপ্তাহ পরে নেহরু তিন সপ্তাহের সফরে সোভিয়েত ইউনিয়ন, পোল্যান্ড ও যুগোস্লাভিয়া গিয়েছিলেন। স্তালিনের মৃত্যুর পর লোকসভায় নেহরু স্তালিনকে 'ম্যান অব পিস' বলায় পশ্চিমী দেশগুলিতে টি-টি পড়ে গিয়েছিল। ভারত কমনওয়েলথে যাবার জন্য ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে স্তালিনের সংশয় ছিল, কিন্তু মস্কোতে ভারতের রাষ্ট্রদূত সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণনের সঙ্গে আলোচনার পর স্তালিনের সংশয় দূর হয়।

নেহরুর মনে হয়েছিল দুটি মহাযুদ্ধ ও গৃহযুদ্ধে দেশের অগ্রগতি যেভাবে ব্যাহত হয়েছে তাতে গঠনমূলক কাজের জন্য সোভয়েত ইউনিয়নের দীর্ঘ শান্তি চাই। কয়েক মাস পরে, ১৯৫৫-র ডিসেম্বর ক্রুশ্চেভ ও বুলগানিন ঘোষণা করেন যে জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

প্রধান কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে নেহরুর এই সুসম্পর্ক সত্ত্বেও তাঁর গণতন্ত্রের প্রতি নিষ্ঠা কমেনি। রাধাকৃষ্ণন যখন মস্কোতে রাষ্ট্রদূত তখন থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের সঙ্গে একটি শান্তি মিত্রতা ও সহযোগিতার চুক্তি সম্পাদনে বিশেষ আগ্রহী ছিল। কিন্তু নেহরু সম্মত হননি।

নেহরুর সোভিয়েত সফরের চেয়ে বেশি ফলপ্রসূ হয়েছিল তাঁর যুগোস্লাভিয়া সফর। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের নেতা হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়নকে মানলেও যুগোস্লাভিয়ার তখনকার নেতারা তাঁদের নিজেদের পথে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাইছিলেন। এ সময় নেহরু টিটোর সঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অনেক মতে মিল খুঁজে পান এবং তাঁদের মধ্যে নিয়মিত অভিমত আদানপ্রদান শুরু হয়। হাঙ্গারিতে ১৯৫৬ সালে সোভিয়েত সেনা প্রেরণ নিয়ে নেহরুকে তাঁর নীতির জন্য দেশে ও দেশের বাইরে যে সমালোচনার সম্মুখীন হতে

হয়েছিল তার অন্যতম কারণ ছিল মার্শাল টিটোর প্রভাব। কিন্তু নেহরু যখন হাঙ্গারির অভ্যুত্থানের গভীরতা বুঝলেন তখন তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের সমালোচনায় পশ্চাৎপদ হননি।

সুয়েজ ও হাঙ্গারি সমস্যার মধ্য দিয়ে টিটো, নাসের ও নেহরুর মধ্যে যে-সহযোগিতার সূত্রপাত হয়েছিল তাই পরে নির্জোট আন্দোলনের আকার নেয়। নেহরুর এই বিদেশ নীতিই মোটামুটিভাবে এখনও পর্যন্ত এ দেশে চালু আছে। নেহরুর পরে যাঁরা প্রধানমন্ত্রী ও বিদেশমন্ত্রী হয়েছেন তাঁদের নেহরুর দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতা না-থাকার জন্য কেউ কেউ হয়তো তাঁর নীতি থেকে সামান্য বিচ্যুত হয়েছেন কিন্তু সে বিচ্যুতি সাময়িক।

জ্যোতি বসু তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, ১৯৫১ সালে যখন তেলেঙ্গানার আটক বন্দিদের মুক্তির জন্য পার্টির পক্ষ থেকে মৃদুলা সরাভাইয়ের সাহায্যে নেহরুর সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেন তখন নেহরু তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তাঁর বিদেশনীতি সম্পর্কে কমিউনিস্টদের ধারণা কী। জ্যোতিবাবু বলেছিলেন, মোটামুটি ঠিকই আছে— তবে কাশ্মীর সমস্যা ভারতের অভ্যন্তরীণ সমস্যা, এখানে একজন বিদেশি (মার্কিন) নাগরিক পর্যবেক্ষক হিসাবে আছেন কেন, এটাই প্রশ্ন। উত্তরে একটু চটে গিয়ে নেহরু বলেছিলেন 'আমি কমিউনিস্ট নই, সকলের সঙ্গে আমাকে যোগাযোগ ও সম্পর্ক রাখতে হবে।'

এই সকলের সঙ্গে যোগাযোগ ও সম্পর্ক রাখা নেহরুর ও ভারতের বিদেশ নীতির মূল কথা। দুটি ক্ষেত্রে এই নীতি অনুসরণ করে নেহরু সফল হননি — পাকিস্তানের সঙ্গে কাশ্মীর বিরোধ ও চিনের সঙ্গে সীমান্তবিরোধ। এই দুটি বিরোধের মীমাংসা আজও হয়নি।

নির্জোট নীতির এই দুই অসাফল্যই তার নিরপেক্ষতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। আজকের একমেরু পৃথিবীতেও ন্যাটো রয়েছে, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তি ও চিনে খোলা বাজারের অর্থনীতি চালু হওয়ার পরও আদর্শের লড়াই বন্ধ হয়নি। জোট যতদিন থাকবে জোট নিরপেক্ষতার নীতিও ততদিন থাকবে।

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি

স্বাধীনতার পরবর্তীতে পঞ্চাশ বছর আমরা পেরিয়ে এসেছি, তারই একটা হিসেব-নিকেশ চলছে। স্বাধীনতার আগে মানুষের স্বপ্ন ছিল, কিছু প্রত্যাশা ছিল, সেই প্রত্যাশার কথা আমরাও জানি। এক বিশাল বৈপ্লবিক আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিল যার জন্য আমরা গর্ববোধ করি। শহরে-গ্রামে কত মানুষের বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, চোয়াড় বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহ, তেলেঙ্গানা, তেভাগার আন্দোলন, কত কৃষক নেতা রক্তাক্ত হয়েছেন, ইংরেজদের হাতে ফাঁসি হয়েছে। সেই কৃষক বিদ্রোহগুলোকে আমরা ভুলি না। তারপর আমরা জানি আমাদের দেশের সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন, তৎকালীন বাংলাদেশে চট শ্রমিকদের আন্দোলন, বোম্বাইয়ের সুতাকল শ্রমিকদের আন্দোলন, কত লাঠি-গুলি কত রক্তপাত। এ সবই আমাদের আন্দোলনের ধারা। গান্ধীজির ঐতিহাসিক ভূমিকাকে স্মরণে রেখেও আমরা কখনই একথা স্বীকার করিনি বা এখনও করি না যে আমাদের দেশে গান্ধীজি এলেন, ডাক দিলেন — আর স্বাধীনতা হয়ে গেল।

আমাদের দেশে কৃষক বিদ্রোহের এই অজস্র ধারা স্বাধীনতার শক্তিকে জাগিয়েছিল। আমরা মনে করি আমাদের দেশের শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষমতা, সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন স্বাধীনতার আন্দোলনের শক্তিকে বাড়িয়েছিল। আমরা মনে করি কলকাতার রাস্তায় যে ছাত্র আন্দোলন বারবার শ্লোগান তুলেছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, সেই ছাত্র আন্দোলন, লেখক বুদ্ধিজীবীদের আন্দোলন, শিক্ষকদের আন্দোলন, এই সমস্ত ধারা একত্রিত হয়েছিল আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে। আমরা সেই সমস্ত বিপ্লবীদেরও ভুলি না। ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, সূর্য সেন, ভগৎ সিং প্রমুখ যাঁরা বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ নিয়ে এসেছিলেন, যাঁরা বিশ্বাস করতেন যে এইভাবেও ইংরেজদের এই দেশ থেকে বিতাড়িত করা সম্ভব, সেই বিপ্লবীদেরও দেশপ্রেমকে আমরা শ্রদ্ধা করি।

আজকে যদি আমরা ইতিহাসে একটু পিছিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করি, তাঁরা কি স্বপ্ন দেখেছিলেন ভারতের? ক্ষুদিরাম ফাঁসির মঞ্চে যাবার আগে কি ভেবেছিলেন। দেশ স্বাধীন হবে তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল। ফাঁসির মঞ্চে যাবার আগে একবিন্দুও তিনি বিচলিত হননি। ঐ তাঁর বয়স — তিনি কি ভেবেছিলেন? কি রকম স্বাধীনতা চেয়েছিলেন? অনন্ত সিং কি ভেবেছিলেন? ভারতের কি রকম স্বাধীনতা চেয়েছিলেন? যে শ্রমিকরা বোম্বাইয়ের রাস্তায় লুটিয়ে পড়েছিলেন ইংরেজদের গুলিতে, নৌ-বিদ্রোহীদের সঙ্গে লড়াইয়ের সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে — কি ভেবেছিলেন তাঁরা — স্বাধীনতার মানে কি হবে? আজকে তাঁরা যদি এই

দেশকে পঞ্চাশ বছর পরে এসে দেখতেন, তাঁদের কি অভিজ্ঞতা হত। তাঁদের কি প্রতিক্রিয়া হত। তাঁরা কি দেখতেন? এই প্রশ্নটি তাই আমাদের বার বার ভাবায় স্বাধীনতার স্বপ্ন কি সফল হয়েছে? পঞ্চাশ বছর অতিক্রম করেছে। এক বছর দু'বছর নয়। পাঁচটি দশক আমরা অতিক্রম করে এসেছি। এই পাঁচটি দশক অতিক্রম করে আজকে বিশ্বের দরবারে আমাদের বিচার হচ্ছে। আমরাও নিজেদের বিশ্লেষণ করছি। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পর ভারতের অবস্থান কি? আমরা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি। আমি বলতে চাই না যে, সবটাই আমাদের ব্যর্থ হয়েছে, আমরা কিছুই পাইনি? কিন্তু বিতর্কটা যদি এইভাবে করা যায় যে কি পেয়েছি আর কি পাইনি যোগফল করলে কোন্‌টা বেশি? যদি আমরা এ বিতর্কের মধ্যে যাই যে কেন ব্যর্থ হয়েছি, কে তার জন্য দায়ী, কি রাজনৈতিক দর্শন তার জন্য দায়ী, কি করা উচিত ছিল, কি করা হয়নি ইত্যাদি নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সব রাজনৈতিক দল একটা ব্যাপারে একমত হতে বাধ্য যে, দলমত নির্বিশেষে আমরা যে দেশ চেয়েছিলাম তা হয়নি। আমাদের স্বপ্নের ভারত এমনকি গান্ধীজিও যা ভেবেছিলেন তাও হয়নি। বিপ্লববাদীরা যা ভেবেছিলেন তাও হয়নি। বামপন্থীরা যা ভেবেছিলেন তা তো হয়ইনি। এ কথা কে অস্বীকার করতে পারবে। স্বাধীনতার আগের যুগের কংগ্রেসের অধিবেশনের সমস্ত প্রস্তাব, স্বাধীনতা পরবর্তী যুগের প্রস্তাবগুলো যদি আমরা বিচার বিশ্লেষণ করি আর দেশের দিকে তাকাই তাহলে কি মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে? আমরা দেখছি বিরাট ফারাক। যা প্রত্যাশা সেই প্রত্যাশার খুব কাছাকাছিও আমরা পৌঁছাতে পারিনি। এই হচ্ছে আমাদের প্রাপ্তির যোগফল। কিন্তু আমরা কি কিছুই পাইনি? এই প্রশ্ন অনেকেই সঠিকভাবে করেন। বামপন্থীরাও স্বীকার করি যে, উপনিবেশ থেকে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসা যে দেশগুলি এই শতাব্দীর তৃতীয় চতুর্থ দশক থেকে, বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু থেকে বা তার পরবর্তীতে, পৃথিবীর মানচিত্রে পালটে দিল। একের পর এক একশোর ওপর নতুন দেশ, ঔপনিবেশিক দেশ স্বাধীন হয়ে দাঁড়াল, বিশেষ করে এশিয়াতে, আফ্রিকাতে, ল্যাটিন আমেরিকাতে। এই দেশগুলোর মধ্যে গণতন্ত্রের পরীক্ষা বিপজ্জনকভাবে পিছু হঠেছে। এখন একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে তাকান। ল্যাটিন আমেরিকার যে দেশগুলির কথা আমরা বলি — বলিভিয়া, উরুগুয়ে, প্যারাগুয়ে, পানামা, এমনকি চিলি, আর্জেন্টিনা, মেক্সিকো, ব্রাজিল যে কোন সময় সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, অথবা সামরিক শাসন সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। সেখানে সামরিকচক্রের সঙ্গে মাফিয়াচক্রের যোগসাজশে সরকার চলছে। গণতন্ত্রের পরীক্ষা সেখানে বারবার ব্যর্থ হয়েছে। এবং বারবার সেখানে স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্র ফিরে ফিরে এসেছে, যার একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে কিউবা। ল্যাটিন আমেরিকার এই দেশগুলিতে গণতন্ত্রের ভিত্তিই দুর্বল হয়ে গেছে। আমরা যদি আমাদের এশিয়ার দিকে তাকাই দেখুন যে দেশগুলি এখন হয়তো অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে সম্মান পাচ্ছে, পৃথিবীতে কিন্তু সেই দেশগুলোতে — সাউথ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইনস — মায়ানমার কী গণতন্ত্র সেখানে। সেখানে গণতন্ত্রের নেতারা সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন — পেছনে বন্দুক ঠেকিয়ে রেখেছেন সামরিকবাহিনীর কর্তারা। বন্দুকের মুখে অর্থনীতি-রাজনীতি চলছে। তার বেশি কিছু না। মধ্যপ্রাচ্যে সেই আফ্রিকার এতগুলি দেশ — উত্তর আফ্রিকা, মুসলিম আফ্রিকা যাকে বলা হয়, আর নিচে কালো আফ্রিকা — এই সমস্ত দেশেও গণতন্ত্রের অনেকরকম পরীক্ষা হয়েছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত একটা রক্তাক্ত জাতিগত সংঘর্ষ, সামরিক একনায়কত্বে পরিণত হয়েছে। গণতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে। আমাদের উপমহাদেশেও আমাদের অভিজ্ঞতা আছে, পাকিস্তান-বাংলাদেশ। আমরা এই মুহূর্তে জানি পাকিস্তান-বাংলাদেশে এখনও গণতন্ত্র নিজের

পায়ে দাঁড়ায়নি। এখনও সেখানে সামরিক শাসনের বিপদ বাস্তব বিপদ। সেই দিক থেকে বলতে পারি যে, ভাবত হয়তো সত্যিই ব্যতিক্রম। সংসদীয় গণতন্ত্র এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ ভোটাধিকার পেয়েছেন, আমাদেব সংসদীয় গণতন্ত্র আছে। আমাদের বিচাব-ব্যবস্থা আছে। বিচারব্যবস্থা, আইনসভা এবং সরকার -- এই তিনটি স্তম্ভ গণতন্ত্রের স্বাভাবিক নিয়মেই তাবা পরস্পর সংযোগ রক্ষাকারী স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেই আছে। আমাদের এখানে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আছে। এই সব মিলিয়ে গণতন্ত্রের খানিকটা কাঠামো আমাদের তৈরি হয়েছে। অনেকটা ঝড়ঝাপটা পেরিয়ে এসেও এখনও পর্যন্ত আছি। এর মাঝখানে বিচ্যুতি হয়নি তা আমরা কেউ বলতে পারব না। জরুরী অবস্থার সময় আমরা, এমনকি বিদেশীরাও অনেকে ভাবতে আরম্ভ করেছিলেন যে, ভারতবর্ষের গণতন্ত্র ও সংবিধান কি আর থাকবে। শাসক কংগ্রেস দলের মধ্যেই অনেকে এর বিরোধিতা করে সরে এসেছিলেন। জরুরী অবস্থার সময় যেভাবে গণতন্ত্রকে আক্রমণ করা হয়েছে আমরা দেখেছি সেই বিপদ। গণতন্ত্রের অন্যতম শর্ত অবাধ গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ব্যবস্থা। আমাদের দেশে সর্বস্তরের গরিব মানুষ কি নির্বাচনে স্বাধীনভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন সব রাজ্যে। আমরা দেখেছি এখনও অনেক জায়গায় অবাধ নির্বাচনের পরিবেশই তৈরি হয়নি। সেখানে লাঠি-যার-বন্দুক-যার তার হাতে ভোট। এটা গণতন্ত্রের বিচ্যুতি। সংবাদপত্রও যতক্ষণ পর্যন্ত বৃহৎ পুঁজির হাতে বাঁধা থাকছে ততক্ষণ পর্যন্ত তার স্বাধীনতা সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত নই। বিশেষ করে এখন যখন কথা উঠছে সংবাদপত্র ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া-টেলিভিশন, বিদেশীর সঙ্গে আমাদের যোগসাজশ কবে একসঙ্গে করা হবে। আমরা বুঝতে পারছি বিপদ আসছে। আমরা এর বিরুদ্ধে। আমরা চাই সংবাদপত্র স্বাধীন থাকবে। আমরা চাই আমাদের টেলিভিশন স্বাধীন থাকবে। যদি না থাকে তাহলে আমাদের দেশের স্বার্থবিরোধী বিদেশী শক্তির সামনে দাঁড়িয়ে দেশের স্বার্থ রক্ষিত হবে না। এইসব সমস্যা আমাদের সামনে আছে। আমাদের বিচারবিভাগকে আমরা সম্মান করি। কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের দেশে প্রশ্ন উঠেছে যে, বিচারবিভাগ কি অতিরিক্ত সক্রিয়তা দেখাচ্ছেন না। এ মানুষই বিচার করবেন। একটা দেশে যখন 'এক্সিকিউটিভ' যাদের বলে শাসক, বিপজ্জনকভাবে যখন তাদের দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হন এবং শাসকরাই যদি অপরাধী হয়ে যান, তখন বিচারালয় খানিকটা অতিমাত্রায় সক্রিয়তা দেখাতেই পারেন। কিন্তু এটাই যদি একটা স্থায়ী নীতি হয়ে যায় তা বিপজ্জনক। শাসকরা দেশ শাসন করবেন, আইনসভা আইন প্রণয়ন করবে এবং সেই আইনের শাসনকে রূপায়িত করবে বিচারবিভাগ। যদি তিনটির মধ্যে একটা মেলবন্ধন না থাকে, মতৈক্য না থাকে, যদি একে ডিঙিয়ে অন্যটি উঠতে চায় তাহলে গণতন্ত্রের বিপদ দেখা দেয়। আমরা কিন্তু এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে চলেছি। সর্বোচ্চ স্তরে ব্যাপক দুর্নীতির ফলে একটি বিপদও এদেশে সূচিত হচ্ছে। দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার দীর্ঘ ইতিহাস আছে, স্বাধীনতার আগে থেকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া ব্রিটিশের সংবিধান, তারপরে কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলির লড়াই, কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি তৈরি হবার পর আমাদের নতুন সংবিধান, নতুন সংবিধানের ভিত্তিতে আমাদের দেশে যে গণতন্ত্র সে গণতন্ত্রের পেছনে আমাদের দেশের হাজার হাজার মানুষের অবদানই সবচেয়ে বড়। ক'জন সংবিধান রচয়িতা ছিলেন, তার চেয়েও বড় কথা আমাদের দেশের মানুষ গণতন্ত্র চেয়েছিলেন — সাধারণ মানুষ এই অধিকার চেয়েছিলেন। এর আগে পরাধীন ভারতে জনসংখ্যার মাত্র চৌদ্দ-পনেরো ভাগ ভোট দিতেন। ইংরেজ আমলে যে আইনের

ভিত্তিতে আমাদের দেশে ভোট হ'ত। আর আজকে সেই ভোট পাল্টেছে, আজকে মানুষের হাতে গণতন্ত্র সম্প্রসারিত হয়েছে।

গণতন্ত্রের ইতিবাচক দিক স্মরণ করেও দুটি ভয়ঙ্কর বিপদের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। আমাদের দেশের ভেতরের থেকে তৈরি হয়েছে অশুভ শক্তি, ঐতিহাসিক অনেক কারণে যাদের বাইরে থেকেও পুষ্ট করা হচ্ছে। যারা আমাদের দেশে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে, সংসদীয় কাঠামোকে, এমনকি সংবিধানকেও আক্রমণ করতে চায়। অন্যান্য দেশে যে বিপদ আসে সামরিক বাহিনীর দিক থেকে, এদেশে আমাদের সমাজের মধ্যেই এই ভয়ঙ্কর শক্তি কাজ করছে যারা সরাসরি আঘাত হানতে পারে সংবিধানের বিরুদ্ধে। মৌলবাদী শক্তি আমাদের দেশে তারা কখনও স্বদেশী কখনও অযোধ্যা, কখনও রাম এইসব বলে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু এই শক্তির যে রাজনৈতিক দর্শন সাংবিধানিক কাঠামোকে ভাঙতে উদ্যত, আমাদের সংবিধানের অন্যতম স্তম্ভ ধর্মনিরপেক্ষতা, সেই মূল স্তম্ভটিকেই তারা ভেঙে ফেলতে চায়। এদের হাতে আমাদের দেশে গণতন্ত্র কি থাকবে? তারা আমাদের দেশকে আর একটা পাকিস্তান বানাতে চায়। এই বিপদ কিন্তু আমাদের সামনে খুব বাস্তব বিপদ। গণতন্ত্রের শক্তি যদি এই বিপদকে আটকাতে না পারে, এই অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে যে সারা দেশের মানুষ দাঁড়াবেন একদিকে আর এই মৌলবাদীরা দাঁড়াবেন অপরদিকে। পাকিস্তান থেকে আফগানিস্তান, সেখান থেকে একেবারে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে মৌলবাদ সক্রিয়। কি হচ্ছে আফগানিস্তানে, কারা এই তালিবান মধ্যপ্রাচ্যের এই প্যান-ইসলামিজম, একটা ভয়ঙ্কর ধরনের গণতন্ত্রবিরোধী প্রতিক্রিয়ার শক্তি যা আমাদের দেশের মধ্যেও হাত দিতে চাইছে। তারই যমজভাই হচ্ছে আমাদের দেশের হিন্দুত্ববাদীরা। আমাদের দেশের গণতন্ত্র ধ্বংস করে দেবার জন্য এরা তৎপর। কারণ দেশটা বড় পিছিয়ে পড়া দেশ। এই বিপদের সঙ্গে আরও একটা বিপদ এসে যুক্ত হয়েছে। স্বাধীনতার সংবিধান রচয়িতাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন ডাঃ আম্বেদকর। যাঁকে লাঞ্ছিত হতে হ'ল কিছুদিন আগে বোম্বাইতে। তিনি স্বাধীন ভারতের সংবিধানের অন্যতম রূপকার। তিনি একথা বুঝেছিলেন যে, ভারতের আসল সমস্যা হচ্ছে পিছিয়ে পড়া মানুষদের। অর্থনীতির সমস্যা শুধু নয়, গণতন্ত্রের সমস্যাও দেখা দেবে পিছিয়ে পড়া বর্গকে যদি আমরা সামনের সারিতে না আনতে পারি। সেকথা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আছে যে, পেছনের মানুষদের সামনে টেনে না আনলে তারাও সামনের মানুষদের পেছনে টেনে রাখবে। ডাঃ আম্বেদকর মূল সমস্যা বুঝে বলেছিলেন যে, পিছিয়ে পড়া মানুষের মৌলিক সমস্যার সমাধানের শর্ত হচ্ছে ভূমিসংস্কার। ভারতের মতন দেশে আদিবাসী এবং তফসিলী জাতি-উপজাতি, এখন আরেকটি বর্গ এসেছে আদার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস বা অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী তাদের সমস্যার মৌল সমাধান হচ্ছে দেশের ভূমিব্যবস্থার পরিবর্তন। এখন ভূমিব্যবস্থা যা আছে তাকে ঠিক উল্টে দিতে হবে। ওপরতলার জমি নিচে নিয়ে আসতে হবে। এছাড়া এই সমস্যার মৌলিক সমাধান কোনদিন হবে না। তিনি বলেছিলেন, যতক্ষণ না সমাধান হচ্ছে ততক্ষণ অন্তত দশ বছরের জন্য রিজার্ভেশন করা হোক, কিন্তু মূল সমাধান হচ্ছে ভূমিসংস্কার। আমরা উল্টো করলাম, ভূমিসংস্কার করলাম না। আর আমরা রিজার্ভেশন শুধু বাড়িয়েই চললাম। মণ্ডল কমিশন আমাদের কি উপকার করেছে জানি না, কিন্তু দেশের মধ্যে অন্ধ বিদ্বেষের উত্তেজনাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। নিচুজাতের আশা-আকাঙক্ষা ন্যায়সঙ্গত, আর তার বিরুদ্ধে তথাকথিত উঁচুশ্রেণীর একটা জিঘাংসা একটা প্রতিহিংসা, এই উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলাফল আমাদের সমাজের পক্ষে গণতন্ত্রের পক্ষে ভাল নয়। এবং

এটাও গণতন্ত্রবিরোধী একটা শক্তি। যেমন মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা একটা গণতন্ত্রবিদ্বেষী শক্তি, তেমনি এই বর্ণভেদ একটা গণতন্ত্র বিধ্বংসী শক্তি। সারা দুনিয়ার সামনেই আমাদের এই পরীক্ষা হচ্ছে — ভারতের গণতন্ত্র কি টিকবে? ভারতের সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি কি রক্ষা পাবে? ভারতের ঐক্য-সংহতি কি থাকবে? এই প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত আছে ভারতবাসী এই মৌলবাদকে, বর্ণবিদ্বেষকে পরাজিত করতে পারবে কি পারবে না।

বিগত পঞ্চাশ বছরে আমাদের দেশের মানুষ, সাধারণ মানুষ কি পেয়েছেন। আমরা কি চেয়েছিলাম আর কি পেয়েছি — আমাদের অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনে। আমরা সকলে চেয়েছিলাম মোটা ভাত-কাপড়ে আমাদের ভারতবাসী বাঁচবে। যে প্রশ্নটা আমাদের কংগ্রেসকে করতে হয় যে সত্যিই কী দেশের সব মানুষের জন্য মোটা ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা করা যেত না। এটাই কি আমাদের নিয়তি ছিল? এটা কি প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতই অনিবার্য ছিল? ভূমিকম্পকে ঠেকানো যায় না, পৃথিবীর দুর্বল দেশগুলোতে বন্যাকেও ঠেকানো যায় না, সেইরকম কোন নিয়তি কি কাজ করেছে আমাদের এখানে যার জন্য স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরেও সত্যি এই দারিদ্র্য নিয়ে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। এটাই কি অনিবার্য ছিল? ছোট্ট দেশ তাকিয়ে দেখি কিউবার দিকে। এক কোটি ত্রিশ লক্ষের কাছাকাছি সে দেশের অধিবাসী। আমাদের বিরোধীরা বলেন, ওইটুকু দেশ দিয়ে কোন উদাহরণ নয় নাকি, আমরা বলি এটা একটা ন্যায়সঙ্গত সমাজ। ন্যায়সঙ্গত, আমেরিকার মত বড়লোক নয়। কিন্তু যেটুকু সম্পদ তারা পেয়েছে, মার্কিনীদের মারাত্মক অবরোধের সামনে দাঁড়িয়ে ন্যায়সঙ্গত সমাজ, শতকরা একশ' ভাগ শিক্ষিত, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মানুষ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। ল্যাটিন আমেরিকার একমাত্র দেশ যেখানে সাধারণ মানুষের জীবনে শোষণ-বঞ্চনা নেই, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের ক্ষমতা নেই সেখানে হাত ঢোকাবার। এটা ঠিকই, কিউবা ছোট্ট একটা দেশ আমাদের হাওড়া জেলার মতন। আমরা বলি চলুন তাহলে চীনে-একশ' আঠারো কোটির দেশে। আজকে চীনের অর্থনীতি, সমাজ মানুষের চেতনা কি বলছে। আমাদের থেকে দু'বছর পর স্বাধীন হয়ে (অবশ্য আমাদের মতন হস্তান্তরিত স্বাধীনতা নয়) ১৯৪৯ সালে চীন মুক্ত হয়ে যে পথে এগিয়েছে আজ সকলে একমত যে ৪৯ বছরে তারা বিপুল সাফল্য নিয়ে এগিয়েছে। কিছু টালমাটাল হয়েছে, কিছু ক্ষতি হয়েছে রাজনৈতিক স্তরে। তার ফলে কিছু সমস্যাও হয়েছে। কিন্তু আজকের এই মুহূর্তে তারা কি বিপুল শক্তিধর। একশ' আঠারো কোটির দেশ যা করতে পেরেছে, সত্যিই কি আমরা ভারতবাসীরা ওদের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে যাই না। আমাদের বিরোধীরা বলবেন, না এটা হচ্ছে একনায়কত্ব। সেটা আপনাদের পছন্দ নয়, আপনার পছন্দ মাল্টিন্যাশানালের একনায়কত্ব, যেটা আমরা চাই না। তিব্বতে একটা ক্রীতদাসদের সমাজ ছিল, সেই সমাজ শিক্ষিত হয়েছে, এখন তারা ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার তৈরি করেছে। এই তথ্য সবাইকে মানতে হবে, নাকি মানবেন না। আজকে চীন দাঁড়িয়ে বলতে পারছে যে, আমেরিকা একটা চড় মারলে আমিও তিনটে চড় মারব। কিসের শক্তিতে বলছে? নিজের শক্তিতে। এই বিশাল শক্তি তৈরি করল তারা, আর আমরা কি করলাম। কেন পারলাম না। কিন্তু আমরা কি পঞ্চাশ বছর শুধু দাঁড়িয়ে থেকেছি। দাঁড়িয়ে থাকি নি। পঞ্চাশ বছর পরেও আমাদের দেশের পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশভাগ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। দারিদ্র্যসীমার সংজ্ঞাটাও আবার অদ্ভুত। যে সংজ্ঞাতে মনে করুন ওরা বলে এমন খাওয়া পাচ্ছে যাতে করে প্রয়োজনীয় দু'বেলা খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে। এই খাওয়া পেলে সে দারিদ্র্যসীমার ওপরে। কিন্তু যে সেই খাওয়াটাও পাচ্ছে না, তার থেকেও নিচে তারা গরিব। সেই হিসেব করলেও প্রায় চল্লিশ শতাংশ মানুষ এখনও দারিদ্র্যসীমার নিচে। ১৯৯১ সালের হিসেব

অনুযায়ী বাহান্ন শতাংশ। পুরুষ চৌষট্টি ভাগ শিক্ষিত, মহিলারা উনচল্লিশ ভাগ। মোট গড় বাহান্ন ভাগ হয়। পৃথিবীর সবচেয়ে গরিব মানুষ বেশি সংখ্যায় কোথায় আছে -- ভাবতে। পৃথিবীর সবচেয়ে অশিক্ষিত মানুষ কোথায় আছে -- ভারতে। পৃথিবীতে সবচেয়ে শিশু মৃত্যুর হার বেশি -- ভারতে। পৃথিবীতে সবচেয়ে কম বয়সে সবচেয়ে বেশি মানুষ কোথায় মারা যায় -- ভারতে। পৃথিবীর কোন্ দেশের সবচেয়ে বেশি মানুষ ওষুধ না খেয়ে মারা যায় --- ভারতে। আর পৃথিবীর মধ্যে কোন্ দেশ সবচেয়ে বেশি ধার করেছে — ভারত। অদ্ভুত, অবশ্য আমরা সাত-আটটা দেশের মধ্যে আছি ওপরে, ধার করা দেশগুলির মধ্যে। আর সর্বদিক তুলনা করলে সব দিক দিয়েই আমরা ১৩৩টি দেশের মধ্যে দ্বিতীয় কি তৃতীয় নীচের দিক দিয়ে। এ হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের রিপোর্ট। তাহলে আমরা কোথায় চলেছি। এই যে বেপরোয়া দারিদ্র্যের মধ্যে একদল মানুষ পঞ্চাশ বছর রয়ে গেলেন, একটা-আধটা বছর না, আমরা এক থেকে দুই হয়ে তৃতীয় চতুর্থ-পঞ্চম-ষষ্ঠ-সপ্তম-অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পেরিয়ে এসেছি। কত কথা। কত ঘোষণা, কত প্রতিশ্রুতি, সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প — আমরা এগোচ্ছি। আমরা জহরলাল নেহরুর সময় থেকে ইন্দিরা গান্ধী পর্যন্ত শুনেছি — আমরা এগোচ্ছি। আমরা সমাজতান্ত্রিক ধাঁচ থেকে সমাজতন্ত্রের, কি প্রায় তার কাছাকাছি। কিন্তু বাস্তব চেহারাটা কি? এই যে নির্মম দারিদ্র্য, অশিক্ষা, শিশুমৃত্যু এসব কি গোপন করার বিষয়?

একটা ভয়ঙ্কর জিনিস এর মধ্যে হয়েছে, পঞ্চাশ বছর তো দেশ দাঁড়িয়ে থাকেনি, শ্রমিকদের হাত তো দাঁড়িয়ে থাকেনি, কৃষকদের হাত তো দাঁড়িয়ে থাকেনি। বুদ্ধিজীবীদের মাথাও দাঁড়িয়ে থাকেনি। পঞ্চাশ বছর মানুষ যে মেহনত করেছে, কায়িক বা মানসিক, সেই মেহনতের ফল বিপজ্জনকভাবে ওপরতলার সাত থেকে দশভাগ মানুষের হাতে গেছে। স্বাধীনতার সময় যারা হাঁটি হাঁটি পা পা করত, টাটা বিড়লারা ২০ কোটি ৪০ কোটি ৬০ কোটি সম্পত্তি ছিল। আজ তারা কয়েক হাজার কোটির সম্পত্তি জমিয়েছে। আজকে শুধু টাটা-বিড়লার মত আঠারো কুড়িটা পরিবারের কথা নয়, স্বাধীনতার এই পঞ্চাশ বছর পরে, বিশেষ করে গত দেড় দশক তথাকথিত নতুন অর্থনীতি চালু হবার পরে আমাদের দেশে একটা বিশেষ বিত্তবান শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে। সেই সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মান ইউরোপের মত আন্তর্জাতিক মানের। তাদের হাতে বিরাট টাকা-পয়সা ও সাদা এবং কালো। তাদের হাতে বিদেশী গাড়ি, তাদের হাতেই সম্পদ। তারা যা ইচ্ছে তাই করতে পারে এবং এই সম্পদ তারা বেপরোয়াভাবে বাড়িয়েছে দিনের পর দিন। এই অংশের সঙ্গে চল্লিশ ভাগের দারিদ্র্যসীমার নিচে ব্যবধানটা ক্রমান্বয়ে বেড়েছে। দারিদ্র্য দূর হয়নি, অশিক্ষা দূর হয়নি, অস্বাস্থ্য দূর হয়নি, কিন্তু যদি এটা হতো যে সারা দেশের কোথাও কিছু হয়নি তা তো না। দেশ বা দেশের মানুষ যে পরিশ্রম করেছে তার ফল পেয়েছে ওপরতলার দশ ভাগ মানুষ। এই অবস্থা থেকেই আমরা মুক্তি চাইছি।

আমাদের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরেই আমাদের ইতিহাস শেষ হয়ে যাবে না। আমরা বিশ্বাস করি ইতিহাস শেষ হয় না। 'শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে'। আমরা এগিয়ে চলব, এই দ্বন্দ্ব বিরোধের মধ্য দিয়েই এগিয়ে চলব। আমাদের সামনে আজকে একবিংশ শতাব্দী। কোন সন্দেহ নেই এই একবিংশ শতাব্দীতে আমাদের সামনে বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যা অভূতপূর্ব কাজ করবে। আমাদের কারো কারো মধ্যে ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, বিশ্বায়ন ব্যাপারটাই বোধহয় অসঙ্গত বা অন্যায়। বর্তমান দুনিয়ায় কোন দেশই একা বাঁচতে পারবে না। সম্ভব না। আজকে লড়াইটা হচ্ছে এই যে একবিংশ শতাব্দীতেও কি এই বিশ্ব পরিস্থিতি থাকবে? পৃথিবীটা উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে ভাগ হয়ে গেছে। উত্তরের কিছু দেশ প্রচণ্ড

বড়লোক, দক্ষিণের দেশগুলি শহরের বস্তির মতো গরিব। আমরা কি এইভাবেই থাকব। বিশ্বায়নের নামে উত্তরের দেশগুলি যা ইচ্ছা আমাদের দেশের ওপর চাপিয়ে দেবে? সেটাই মেনে নেওয়া মানে গ্লোবালাইজেশন? আমরা এই বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে। নিজেদের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে, আমরা এর বিরুদ্ধে। আমরা মনে করছি একবিংশ শতাব্দী আসছে, পৃথিবীতে চমৎকার পরিবর্তন হবে। মূলত বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার বৈপ্লবিক সব আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে। ইতিমধ্যেই হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে বিজ্ঞান কি একাই সমাধান করতে পারবে মানবিক সমস্যার। বিজ্ঞান তা পারে না, কোনদিন পারবে না। এ সমস্যার সমাধান হতে হবে রাজনৈতিক দর্শনের মধ্য দিয়ে। এই দারিদ্র্যের ব্যবধান কে ঘোচাবে? কিভাবে ঘুচবে? পারমাণবিক অস্ত্র যা জমা রয়েছে পৃথিবীতে তার মীমাংসা কি করে হবে? যদি মীমাংসা না হয় তাহলে পৃথিবী ধ্বংস হতে পারে। আর আমাদের মতন দেশের সামনে সমস্যা থেকে যাবে, ভারতের ন্যায়সঙ্গত সমাজ কোনটি হবে? একদল বেপরোয়াভাবে আমাদের বোঝাচ্ছেন কোন পথ নেই। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে পড়েছে, পূর্ব ইউরোপ ভেঙে পড়েছে, বাস্তবতাকে মেনে নাও। ঐ টোপ তো তোমাকে খেতেই হবে। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক-আই এম এফ-মাল্টিন্যাশনাল — যেভাবে চলতে বলছে সেই কাঠামোতেই চলো। আর কোন পথ নেই। কি কাঠামো? যে কাঠামোকে আমরা বিরোধিতা করে আসছি। আমরা বলছি কখনোই না। আমাদের দেশের শক্তিশালী সরকারি সংস্থাগুলোকে ভেঙে দেওয়া আমাদের স্বার্থবিরোধী। কয়লাখনির শ্রমিকরা ধর্মঘট ডেকেছে তিনদিন। কয়লাখনি বিজাতীয়করণ করার জন্য একটা ভয়ঙ্কর পথে পা দিচ্ছে শাসকদল। যেই করুক আমরা বিরোধিতা করব। আমরা বিরোধিতা করব আমাদের দেশের যে কোন জায়গায় যে কোন মাল্টিন্যাশনাল ঢুকলে। যেখানে ইচ্ছে তোমরা চলে এসো এই নীতি আমাদের দরকার নেই। আমাদের বিকল্প শ্লোগান হচ্ছে স্বনির্ভরতা। নিজের পায়ে দাঁড়াও। নিজের পায়ে না দাঁড়ালে কখনও বাঁচতে পারবে না। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতেও আমাদের এই অভিজ্ঞতা। যদিও সেগুলি সমাজতান্ত্রিক দেশ নয়। দক্ষিণ কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান, মালয়েশিয়া, এই দেশগুলির যেটুকু সাফল্য আমরা দেখতে পাচ্ছি তার তিনটি ভিত্তি।

এক, যতসম্ভব সার্বিক শিক্ষা, একটা দেশের জনগোষ্ঠীর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ সাক্ষর না হলে কিছুই হতে পারে না। দেশ এগুতে পারবে না। আর সেই সাক্ষর শিক্ষিত মানুষের মধ্যে একটা বড় অংশের কারিগরি শিক্ষা না থাকলে শিল্পের ভিত্তিটা স্থায়ী হবে না। সর্বোপরি মূল প্রশ্ন, সেই দেশে ভূমিসংস্কার না করতে পারলে সেই দেশে উন্নয়ন স্থায়ী হবে না। ভূমিসংস্কার, কারিগরি শিক্ষা এবং সামগ্রিক সাক্ষরতা এই তিনটিকে ভিত্তি করেই তথাকথিত এশিয়ান টাইগাররা গজরাচ্ছে। আমরা সে অভিজ্ঞতাটাও দেখছি। কিন্তু আমরা শেষপর্যন্ত বিশ্বাস করি আধুনিক সমাজের বিবর্তনে সমাজতন্ত্রের বিকল্প কিছু নেই। আমরা বিশ্বাস করি যে, যুদ্ধে সাময়িক পরাজয় হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের কিন্তু সোভিয়েত আদর্শ কি পরাজিত হয়েছে? পরাজিত হতে পারে? যে সমাজ মানুষকে শোষণমুক্ত করে সমানভাবে মাথা তুলে দাঁড়াতে সক্ষম হয়, যে সমাজ সমাজের সম্পদকে ন্যায়সঙ্গতভাবে বণ্টন করে, যে সমাজ মানুষকে মানুষের মত দাঁড় করাবার পরীক্ষা দিয়েছে, নির্মম পরীক্ষা দিয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে দু'কোটি মানুষের প্রাণের বিনিময়ে, সেই সমাজতন্ত্রের আদর্শ কি ব্যর্থ হতে পারে।

যে চীন একশো আঠারো কোটির দেশ, একদা দারিদ্র্য, বুভুক্ষা, আফিম খাওয়া দেশ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আজ পৃথিবীকে বিস্মিত করে দিয়েছে। আজকে চীনের কোন আদর্শ

এই জায়গায় নিয়ে গেছে? ছোট্ট একটা গরিব কৃষকের দেশ। আমাদের রাজ্যের মত সাত কোটি মানুষ ভিয়েতনামে। পৃথিবীতে মহাশক্তিধর আমেরিকা একবারই পরাজিত হয়েছে ঐ সরল কৃষক গরিব কৃষকদের দেশ ভিয়েতনামের হাতে। আমরা সেই আদর্শকে বিশ্বাস করি, যা কখনও পরাজিত হতে পারে না। একবিংশ শতাব্দীতে আমাদের নতুন করে বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হবে এবং সমাজতন্ত্রের শক্তিগুলির ওপর নির্ভর করেই। পৃথিবীতে সমাজতন্ত্রের সমস্যা ও সাফল্যের সূত্রগুলিকে আমাদের আবার নতুন করে সাজাতে হবে। তাহলেই আমাদের যা মূল প্রত্যাশা, যে প্রত্যাশা আমরা আজও পূরণ করতে পারিনি, সমাজতন্ত্রের পথেই ইতিহাসের সেই মঞ্চে আমরা প্রবেশ করতে পারব।

শৈ বা ল মি ত্র

৫০ বছরের আত্মানুসন্ধান

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হল। ১৯৪৭ সালে ১৫ আগস্ট প্রথম স্বাধীনতাদিবসের স্মৃতি অস্পষ্ট মনে আছে। তখন আমার বয়স চার। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার এক অজ পাড়াগাঁয়ে থাকতাম। গ্রামে বিদ্যুৎ ছিল না। কাঁচা মাটির রাস্তা। কলকাতা যাবার বাস ধরতে এক মাইল হাঁটতে হত। রেডিও, গ্রামোফোন তখনও গ্রামে ঢোকেনি। তার মধ্যে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট সকালে গ্রামে প্রভাতফেরি বেরোল। প্রভাতফেরির সামনে ছিল আমার বাবা, গাঁয়ের কিছু ভদ্রলোক। সবাইকে মনে নেই। চার বছরের শিশু স্মৃতিতে কিন্তু একজন মানুষ থেকে গেছে। তার নাম যোগীন ভঞ্জ। যোগীনের গলায় ঝুলছিল আমার মায়ের লালপাড় শাড়ি দিয়ে বাঁধা হারমোনিয়াম। সমবেত গলায় গানের কিছু লাইনও মনে আছে।

"বন্দেমাতরম, বন্দেমাতরম, বন্দেমাতরম
নতুন যাত্রা শুরু এবার, মিলেছে সুযোগ জনসেবার
মৃত্যুসাধনা সফল হয়েছে, গাও সবে মিলি
জীবনগান।"

চার বছরের শিশুর স্মৃতিতে গানের এই কলিগুলো সুরসমেত থেকে গিয়েছিল। আজও রয়েছে। গ্রামে হিন্দু মুসলমান দু'সম্প্রদায়ের লোক ছিল সংখ্যায় সমান। প্রভাতফেরিতে মুসলমান কেউ ছিল কি না, মনে করতে পারি না। থাকতে পারে। না-ও থাকতে পারে। সত্যি কথা বলতে কি, গ্রামের মানুষকে তখনও ধর্মীয় পরিচয়ে আলাদা করে চিনতে শিখিনি। দেশভাগের খবর গ্রামে পৌঁছুলেও উত্তেজনা ছিল না। উত্তেজক কিছু ঘটলে শিশুর স্মৃতি, তা ধরে রাখত। শিশু বয়সে শোনা গান, গল্প মানুষ আজীবন মনে রাখে। আর মনে রাখে, উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা। কিশোর বয়স পর্যন্ত গ্রামে ছিলাম। ধর্মবিদ্বেষ কখনও দেখিনি। গ্রাম যে স্বর্গ ছিল তা নয়। চুরি, ছাঁচড়ামো ছিল, জমি নিয়ে মামলা মাথাফাটা-ফাটি ছিল, অভাব, অনটন, দারিদ্র্য, আত্মহত্যা, কোঁদল, ইতরতা, কিছুর অভাব ছিল না, কিন্তু কাছাকাছি কোথাও হিন্দু মুসলমানে খুনোখুনি করছে, শুনিনি। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, 'রায়োট্' শব্দটা শুনলাম, বারো বছর বয়সে কলকাতায় এসে। 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দের সঙ্গে তখনই পরিচয় হল। আরও অনেক নতুন শব্দ চিনলাম। চোখের সামনে শব্দের অর্থান্তর ঘটল। পরিবর্তিত অর্থ আবার বদলাল এবং ক্রমাগত বদলাতে থাকল। সভ্যতা মানে, কিছু শব্দের উদ্ভব, কিছু

শব্দের বিলুপ্তি, শব্দের অর্থবিস্তার, অর্থসংকোচ এবং আপাদমস্তক রূপান্তর, বুঝতে পারলাম। তার মধ্যে অতিক্রান্ত হল স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর। প্রথম স্বাধীনতা দিবসের সকালে যারা প্রভাতফেরির সামনে ছিল, তাদের অনেকেই আজ পৃথিবীতে নেই। সেদিনের চার বছরের শিশু মধ্যপঞ্চাশ ছুঁয়ে ফেলেছে।

পঞ্চাশ বছর ধরে স্বাধীনতা শব্দটি নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বুঝেছি, স্বাধীনতা এমন এক অনুভূতি, যার অভাব ঘটলে যতটা বোঝা যায়, সহজলভ্য হলে ততোটাই অগোচর থেকে যায়। স্বাধীনতা অনেকটা বাতাসের মতো। শ্বাসকষ্ট না হওয়া পর্যন্ত বাতাসের অভাব টের পাওয়া যায় না। স্বাধীনতা পাওয়ার পর ভারতবাসীর একাংশ বিশ্বাস করেনি, দেশ স্বাধীন হয়েছে। তারা ভেবেছিল, ইংরেজ শাসন আবার ফিরে আসবে। একদল ভেবেছিল, নকল স্বাধীনতা এল, এ আজাদি ঝুটা হ্যায়। শ্বেতশাসকরা আড়াল থেকে দেশ শাসন করবে।

'স্বাধীনতা' শব্দের অর্থ দেশবাসীর কাছে নানাভাবে হাজির হল। 'স্বাধীনতা' শব্দের অর্থ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ বুঝতে পারল না। তাদের বলা হল, ইংরেজরা দেশ ছেড়ে চলে গেছে। তাদের চলে যেতে বাধ্য করেছে দেশের মানুষ। তারা এখন দেশ চালাবে। তাই শুনে কেউ খুশি হল, ভয়ে শুকিয়ে গেল কারও মুখ, দেশের ভবিষ্যৎ ভেবে হায় হায় করল অনেকে। জনসমাজের শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, নাগরিক, আধানাগরিক, মফস্বলী বড় অংশ হৈ হৈ করে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করল। স্বাধীনতা বলতে তারা বুঝল, সুসজ্জিত সভা, ভাষণ, জলসা, আনন্দোৎসব, বাড়ির ছাদে পতাকা ওড়ানো। দেশবিভাগের অভিশাপ জর্জরিত কোটি কোটি নিরাশ্রয় মানুষের কাছে স্বাধীনতার অর্থ দাঁড়ালো, পরিচয়হীনতা কাটাতে তারা যে নতুন আত্মপরিচয় তৈরি করল, তার নাম 'রিফিউজি কালচার'— উদ্বাস্তু সংস্কৃতি। নতুন সংস্কৃতির মূল কথা, জোর যার, মুলুক তার। আত্মরক্ষার জন্যে জীবনাচরণ বদলাতে তারা বাধ্য হল। স্বাধীনতার আর একটা অর্থ পাওয়া গেল, স্বেচ্ছাচার। স্বাধীনতা মানে যা খুশি তাই করার অধিকার। স্বাধীনতা হয়ে দাঁড়াল 'আমার স্বাধীনতা', 'আমার পরিবারের স্বাধীনতা।' স্বেচ্ছাচারী এই মনোভাব, সমাজ কাঠামোর প্রতি কোষে, গ্রন্থিতে ছুঁচের মতো বিঁধতে থাকল। রাস্তার যত্রতত্র পেচ্ছাব করার অধিকার যেমন স্বাধীনতা, তেমনই বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে প্রতিবেশীর অসুবিধের কথা না ভেবে তারস্বরে চেঁচানোও স্বাধীনতা। কাজ করাটা যেমন স্বাধীনতা, কাজ না করা, অকাজ-কুকাজ করাও স্বাধীনতা। 'তলানি' বা 'আন্ডারক্লাস' শব্দটি সমাজ বিজ্ঞানে ঢুকে পড়ল। তলানি জনগোষ্ঠী, তলানি মানসিকতা, মনস্তত্ত্ব সমাজ কাঠামোর বড় অংশে ছড়িয়ে গেল। স্বাধীনতার কবচকুণ্ডল, যার নাম শৃঙ্খলা, সংযম, আত্মবিকাশের গভীর অনুভূতি, স্বাধীনতার শরীর থেকে কেটে বাদ দেওয়া হল। জনজীবনের তলানি কর্মসূচিকে আস্কারা দিয়ে নিরাপদ করল সংগঠিত তলানি রাজনীতি।

স্বাধীনতার আগে থেকে তলানি রাজনীতি সংগঠিত হতে শুরু করে। দেশভাগের পর যারা ক্ষমতায় এল, তারা ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার তলানি। প্রকৃত স্বাধীনতাসংগ্রামীরা পিছু হঠে যেতে বাধ্য হল। নানা রচনায় স্বাধীনতা সম্পর্কে তাদের মোহমুক্তি, মনের আফসোস নথিবদ্ধ আছে। স্বাধীন দেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, সর্বজনীন ভোটাধিকার চালু হল। এখনও পর্যন্ত এটাই রাষ্ট্রচালনার সেরা পথ। কিন্তু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব যাদের হাতে গেল, তারা চিন্তায়, মানসিকতায়, রুচিতে, আচার-আচরণে দুশো বছরের ইংরেজ শাসনের তলানি। তারা ক্ষমতাসীন হতে 'স্বাধীনতা' শব্দের আরও নানা অর্থ হাজির হল। একটা অর্থ, সাধারণ মানুষকে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি শোনানো, জনসাধারণকে প্রতারণা, নির্যাতন,

লুঠ করা তাদের উলঙ্গ করে দেওয়া। রাজনীতি, অর্থনীতি, কোথাও শৃঙ্খলা, সংযম থাকল না। গত পাঁচ বছরে দেশের সম্পদ লুঠ হওয়ার যে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, সেটাকে লুণ্ঠনের গড় ধরে, পঞ্চাশ বছরে কি ঘটেছে, তার হিসেব সহজে করা যায়। স্বাধীনতার সঙ্গে 'ভ্রষ্টাচার', 'দুর্নীতি' একার্থক হয়ে গেছে। ওপর তলার ভ্রষ্টাচারী কাঠামোর সঙ্গে নিচের তলার বিশৃঙ্খল, স্বেচ্ছাচারী কাঠামো মিলে চমৎকার এক ঐক্য গড়ে তুলেছে। যাকে 'বিবিধের মাঝে মিলন মহান' বলা যায়।

স্বাধীনতার চিত্তচমৎকারী বিবিধ অর্থ তৈরির জন্যে সমাজ গবেষকদের একাংশ ওপরতলাকে দায়ি করে। তাদের মতে নীতি, আদর্শ, আচরণ হল জলস্রোতের মত। সবসময়ে ওপর থেকে নিচের দিকে বহে যায়। প্রতিপক্ষ সমাজতান্ত্রিকরা উল্টো কথা বলে। তাদের মতে রাষ্ট্রকাঠামোর সঙ্গে জলস্রোতের মিল নেই। জীবন্ত মানুষ মিলে রাষ্ট্রকাঠামো গড়ে তোলে। রাষ্ট্রকাঠামোতে, মানবিক নিয়ম, তা ভাল, মন্দ যাই হোক, যুক্ত থাকে। প্রাকৃতিক নিয়মে প্রবাহমান, প্রাণহীন জলস্রোতের সঙ্গে, রাষ্ট্রকাঠামোর তুলনা করা ভুল। দুটো দৃষ্টিকোণই কিছুটা একপেশে। রাষ্ট্রকাঠামো হল ফুটন্ত জলের মতো।

ফুটন্ত জলের ওপরের অংশ আর নিচের অংশ যেমন ক্রমাগত জায়গা বদলায়, রাষ্ট্রবিন্যাসেও তাই ঘটে। ভারতীয় রাষ্ট্রকাঠামো হল, আবর্জনা মেশানো জলের মতো। ওপরদিকে, ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার তলানি আর নিচের দিকে, ছত্রভঙ্গ সামাজিক জীবনের তলানি প্রসূত আবর্জনা, কাঠামোর সারা শরীর ছড়িয়ে গেছে। রাষ্ট্রকাঠামোর জাতীয়তাবাদী অংশে মিলেছে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের আবর্জনা, ধর্মীয় অংশে রয়েছে মধ্যযুগীয় মানববিদ্বেষী অন্ধকার জঞ্জাল এবং বামপন্থায় ঢুকে গেছে ধড়হীন মুণ্ডতন্ত্র বা গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা। 'সহজ ভাষায়, সবার উপর দল সত্য।' আগে দল, তারপর মানুষ, তারপর দেশ। আবর্জনা হিসেবে কোনটা কম ক্ষতিকর, সেটাই এখন গবেষণার বিষয়।

১৯৪৭ সালে, প্রথম স্বাধীনতা দিবসে যে শিশু বিস্মিত চোখে প্রভাতফেরি দেখেছিল, পরের পঞ্চাশ বছরে, সে কোথায় পৌঁছল, এ প্রশ্ন উঠতে পারে। তার কাছে আজ স্বাধীনতার অর্থ কি? তার কাছে স্বাধীনতা একটি অনুভূতি। বাইরের স্বাধীনতা, স্বশাসন, গণতন্ত্র, খেয়ে পরে বাঁচার স্বাধীনতা ছাড়া স্বাধীনতার অনুভূতি যেমন গড়ে ওঠে না, তেমনই এই অনুভবকে বাদ দিয়ে স্বাধীনতা হয়ে ওঠে পদ্মবনে মত্ত হাতির দাপাদাপি। পঞ্চাশ বছরে নানা কাঠামো, বিন্যাস, সাজপোশাকে স্বাধীনতাকে দেখলাম। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ, মিশ্র অর্থনীতি, রাষ্ট্রায়ত্ত অর্থনীতি, লগ্নিপুঁজির রাষ্ট্রীয়করণ ইত্যাদি হরেক অর্থনৈতিক পরিচালনার পর এখন এসেছে মূলধনের ভূমায়ন তত্ত্ব। কারিগরি, প্রযুক্তির প্রবল প্রতাপে পুঁজিবাদী অর্থনীতির সঙ্কট সাময়িকভাবে কাটলেও, পায়ের তলায় টলটলায়মান মাটি তাকে স্বস্তিতে থাকতে দিচ্ছে না। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির তত্ত্ব প্রায় মুখ থুবড়ে পড়েছে। মূলধন রাষ্ট্রীয়করণে, সমবায় অথবা সামাজিকীকরণের সুবাদে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মোক্ষ মিলবে না, ধরা পড়ে গেছে। পুঁজিবাদের বাঘ, আর সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির নামে রাষ্ট্রীয়করণের কুমীর, দুটোই যে সমান মাংসাশী, তত্ত্বকাররা বলতে শুরু করেছে। তত্ত্বকাররা বলার আগেই অবশ্য ইতিহাস তা ঘোষণা করেছিল। ইতিহাসের কণ্ঠস্বর বিচ্ছিন্ন মতবাদের শিবিরভুক্ত তত্ত্বকারদের শুনতে দেরি হয়। দেরি করতে তারা বাধ্য হয়। স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় তাত্ত্বিকেরও সব কথা বলার স্বাধীনতা থাকে না। বলার মতো আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলতে সময় লাগে। স্বাধীনতার অর্থ তাই অনেক সময় 'ইয়েস স্যার', 'জো হুজুর', 'হেঁ হেঁ'-তে গিয়ে দাঁড়ায়।

বর্তমানে সেই পর্ব চলছে। স্বাধীনতার সাম্প্রতিকতম অর্থ, ভণ্ডামি, কথা, কাজে অমিল,

ন্যক্কারতম ক্ষমতালিপ্সা, দলবাজি। স্বাধীনতার অর্থ, চমচাতন্ত্র। চামচা সত্য, জগৎ মিথ্যা, এবং সর্বব্যাপী মিথ্যার তত্ত্বায়নের নানা স্বাধীনতা।

'ত্রয়ী শক্তি ত্রিস্বরূপে প্রপঞ্চে প্রকট
সংক্ষেপে বলিতে গেলে হিং টিং ছট।'

হিং টিং ছট স্বাধীনতার মধ্যে দেশটা চলছে কীভাবে? ফুটন্ত নোংরা জলের ওপর নানা কসরতে মুণ্ডুটা ভাসিয়ে রেখে, মাঝে মাঝে এই পর্বে উপলব্ধি করছি, স্বাধীনতা একটা বড় জিনিস দিয়েছে। তা হল, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। তাকে আগলে রেখেছে পাঁচ হাজার বছর ধরে তিলে তিলে তৈরি ভারতীয় সভ্যতা। সে সভ্যতা শুধু বৈদিক সভ্যতা নয়, প্রাক্‌বৈদিক দেশজ উপকরণ সেখানে প্রচুর। তৃণমূল থেকে গাছের চূড়ো পর্যন্ত বিস্তৃত সেই সভ্যতা গণতন্ত্রের মাথায় ছাতা ধরে আছে। স্কন্ধকাটা, কনিষ্ক, চণ্ডাশোক, ধর্মাশোক, মুঘল, আকবর, ঔরংজেব, চেঙ্গিস খান, তৈমুর লঙ, লর্ড ক্লাইভ, কেউ সেই সভ্যতার গায়ে আঁচড় কাটতে পারেনি। গৌতম বুদ্ধ, মহাবীর জৈন, চৈতন্যদেব, নানক, কবির, সেলিম চিস্তি, দাদু, সহজিয়া, আউলবাউল, সাধু, ফকিরদের সঙ্গে সমস্ত রাজ্য সাম্রাজ্যের মহারথীদের ভারতীয় সভ্যতা আত্মস্থ করেছে। স্বৈরতন্ত্র, স্বেচ্ছাচার, ধর্মান্ধতা, সংকীর্ণ মতাদর্শ, সবকিছুকে ধীরে ধীরে পরিস্রুত করে নিচ্ছে ভারতীয় সভ্যতা। পাশ্চাত্য থেকে আমদানি করা গণতন্ত্রও ভারতীয় সভ্যতার আশ্রয়ে নতুন তাৎপর্য পেয়েছে। রাজনৈতিক কাঠামোতে ধর্মান্ধতার অনুপ্রবেশ ঘটলেও ভারতের মুসলমান বিদেশ সচিব, ইসলাম ধর্মাবলম্বী পাকিস্তানে শান্তি আলোচনা করতে যায়। জাকির হুসেন, ফকরুদ্দিন আলি আহ্‌মেদ ভারতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হতে পারেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে এ ঘটনা ঘটত না। কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করার কথা আমেরিকা কি কখনও ভাবতে পারবে? ইংল্যান্ডের একজন অশ্বেত কি কোনদিন প্রধানমন্ত্রী হবে? হবে না আপাতত ভারতবর্ষে যা সম্ভব, সভ্য শ্বেতগোলার্ধে তা সম্ভব নয়। ভারতীয় রাষ্ট্রকাঠামো বা ভারতীয় রাজনীতিবিদদের সদিচ্ছাতে এ ঘটনা ঘটেনি। ভারতীয় সভ্যতার সর্বংসহা নমনীয় ধারণক্ষমতার জন্যে এ ঘটনা সম্ভব হয়েছে। মনে রাখা দরকার। বাদশাহ্‌ আকবরের প্রধান সেনাপতি ছিলেন হিন্দু মানসিংহ।

'আমার' আত্মা, বলে যদি কোন বস্তু থাকে, তাকে ছায়া দিয়ে রেখেছে ভারতীয় সভ্যতা। প্রতিদিনের খোরাক জোটাচ্ছে গণতন্ত্র। পঞ্চাশ বছর ধরে তাই খাদ্য, পোশাক, দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব ঘটেনি। দু এক ঢোক নোংরা জল খেলেও নর্দমায় ভেসে যাইনি। মনে রাখবেন 'আমি' অর্থে এখানে কোটি কোটি ভারতীয়। সবাইকে লালন করছে ভারতীয় সভ্যতা, আর গণতন্ত্র। স্বাধীনতার বিবিধ অর্থ না বুঝেও তাই ক্ষেতে, কলকারখানায় যারা কাজ করে, তারা উৎপাদন আর জোগান অব্যাহত রেখেছে। পঞ্চাশ বছরে যতো ভল বই পড়েছি, ভাল গান শুনেছি, অসাধারণ ছবি, শিল্পকর্ম দেখেছি, পুণ্যবান, মহৎ মানুষের সংসর্গ পেয়েছি, তারা যেন তৃণমূল থেকে তরুশিখর পর্যন্ত প্রসারিত ভারতীয় সভ্যতার অংশ, বুঝতে অসুবিধে হয়নি। সভ্যতার এ মহাস্রোতে স্বাধীনতার যাবতীয় কদর্থ ধুয়ে যাবে। আত্মানুসন্ধানও কখনও আমাকে বিমর্ষ করে না।

র ত ন খা স ন বি শ

এক পঙ্গু প্রযুক্তির আঁস্তাকুড়

এদেশের শিল্পায়নে রাষ্ট্রের কী ভূমিকা থাকা উচিত, তা নিয়ে নতুন করে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। পঞ্চাশ বছর আগে, জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে নতুন ভারত গড়বার যে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়, সে কর্মসূচিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ভাবা হয়েছিল, স্বাধীন ভারতে রাষ্ট্র নেবে ভারী বা বুনিয়াদি শিল্প গড়বার দায়িত্ব। সে দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্র যতই সফল হবে, এদেশে শিল্পের বনিয়াদ ততই মজবুত হবে। মজবুত বনিয়াদের ওপর দাঁড়িয়ে যে শিল্পায়ন ঘটবে, এদেশে তা নিয়ে আসবে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি।

এই ভাবনাচিন্তার পিছনে অবশ্যই ছিল সোভিয়েত রাশিয়ার ইতিবাচক অভিজ্ঞতা। একটি পশ্চাদপদ দেশে রাষ্ট্রের নেতৃত্বে শিল্পায়নের কর্মসূচি যে অতিদ্রুত সে দেশের অর্থনৈতিক মানচিত্রই বদলে দিতে পারে, অবিশ্বাস্য কম সময়ে বৃটেন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সে দেশ যে পাল্লা দেওয়ার শক্তি অর্জন করতে পারে, সে সময়ে — অর্থাৎ ১৯৪৭ সালে সোভিয়েত রাশিয়া ছিল তার উজ্জ্বল উদাহরণ। সদ্য স্বাধীন বহু দেশের রাষ্ট্রনায়করা সে সময় সোভিয়েতের অনুকরণে অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাষ্ট্রের ভূমিকার গুরুত্ব আরোপ করতেন। ভারতবর্ষের 'নেহরু মডেল'ও ছিল সমসাময়িক সেই চিন্তারই ফসল। ভাবা হত, রাষ্ট্রের নেতৃত্বে শিল্পায়নের কর্মসূচিই ভারতবর্ষকে সমৃদ্ধ করে তুলবে।

পাঁচ থেকে পরের ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনায়করা চাইছেন, উন্নয়নের এই ছকটি বাতিল করতে। তাঁদের এই চিন্তার অভ্যন্তরীণ প্রেক্ষাপট হল অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাঙ্ক্ষিত স্তর অর্জনে ভারতবর্ষের ব্যর্থতা। একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে পাঁচ দশকে আটটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরও উন্নয়নের কাঙ্ক্ষিত মান অর্জনে ভারতবর্ষ ব্যর্থ। উন্নয়নের আন্তর্জাতিক মানচিত্রে ভারতের স্থান হল দরিদ্রতম কুড়িটি দেশের মধ্যে। উন্নয়নের পুরনো ছক বাতিল করার চিন্তার আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট হল রাষ্ট্রব্যবস্থা হিসেবে সোভিয়েতের ব্যর্থতা। বৃটেন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পাল্লা দিত যে সোভিয়েত রাশিয়া, সে সোভিয়েতের পতন ঘটেছে। পৃথিবী জুড়ে রাজত্ব করছে বাজার অর্থনীতির মতাদর্শ— যে মতাদর্শ চায় অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা খর্ব করতে। মতাদর্শের প্রভাব থাকে নীতি নির্ধারণে। বাজার অর্থনীতির মতাদর্শ এই প্রজন্মের রাষ্ট্রনেতারা চাইছেন, বিশ্বব্যাঙ্কের পরামর্শ অনুসারে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প বেসরকারি হাতে তুলে দিয়ে উন্নয়নের দায় থেকে রাষ্ট্রকে অব্যাহতি দিতে।

এদেশে সরকারি উদ্যোগে গত পাঁচ দশকের যেসব অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে দেশের অর্থনীতিতে তাদের গুরুত্ব অপরিসীম। শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের ডিপার্টমেন্ট অফ

পাবলিক এন্টারপ্রাইজ-এ নথিভুক্ত সংস্থার সংখ্যাই হল ২৪৩টি। এই সংস্থাগুলিতে যা পুঁজি বিনিয়োগ করা আছে টাকার অঙ্কে তার পরিমাণ হল ১.৭৮,৬২৮ কোটি টাকা। এই সংস্থাগুলিতে কাজ করেন ২০ লক্ষ ৫১ হাজার শ্রমিক কর্মচারী। সংস্থাগুলির ব্যবসার পরিমাণ ১,৮৭,৩৫৫ কোটি টাকা। এগুলি ছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকার, বিভিন্ন রাজ্য সরকার এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলির অধীনস্থ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির বিপুল পরিমাণে পুঁজি নিযুক্ত আছে। এদেশের জাতীয় আয়ের এক পঞ্চমাংশ আসে সরকারি সংস্থাগুলি থেকে। পুঁজির ৩২.৩ শতাংশ সৃষ্টি হয় এই সরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে। এগুলিকে বাতিল করে দেওয়ার আগে তাই ভাল করে ভাবা দরকার, এগুলির সমস্যা কী ; চটজলদি কোন উপায়ে সে সমস্যার সমাধান খুঁজতে গেলে তার পরিণাম কী হবে, সে নিয়েও চিন্তাভাবনার প্রয়োজন আছে।

সরকারি সংস্থা মানেই লোকসান এবং এ লোকসানের দায় মেটাতে গিয়ে রাজকোষ নিঃস্ব হয়ে পড়ছে — এমন একটা কথা চালু আছে। এই কথাটা ঠিক নয়। সরকারি সংস্থাগুলিতে নিযুক্ত পুঁজির উপর আয়ের একটা হিসাব দিয়েছেন ডিপার্টমেন্ট অফ পাবলিক এন্টারপ্রাইজ। তাঁদের নথিভুক্ত ২৪৩টি সংস্থার মধ্যে ২৩৯টি বর্তমানে চালু আছে। সব মিলিয়ে এগুলিতে লোকসান তো হয়ইনি, বরং বিনিয়োগের ওপর লাভ হয়েছে ৫.৬৮ শতাংশ। এ হিসেব ১৯৯৫-৯৬ সালের। সমালোচকরা অবশ্য বলতেই পারেন, ৫.৬৮ শতাংশ লাভ। লাভ হিসেবে যৎসামান্য। কিন্তু এখানেও কথা আছে। লাভের এই গড় হিসেবের পিছনে আছে এমন বহু সরকারি প্রতিষ্ঠান, যেগুলিতে লাভের হার যথেষ্ট বেশি, অন্যদের লোকসানের ধাক্কায় যাদের কথা মানুষের মনে থাকে না। মনে থাকে না যে ও এন জি সি-তে ১৯৯৫-৯৬ সালে লাভ হয়েছিল ২৩৫৪.৩২ কোটি টাকা, স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার লাভের অঙ্ক দাঁড়িয়েছিল ১৩১৮.৬১ কোটি টাকা। আসলে, বেসরকারি সংস্থার মতই সরকারি সংস্থাও কিছু চলে লাভে, কিছু চলে লোকসানে। ব্যুরো অফ পাবলিক এন্টারপ্রাইজ-নথিভুক্ত ২৩৯টি চালু সরকারি সংস্থার মধ্যে ১৯৯৫-৯৬ সালে লাভের মুখ দেখেছিল ১৩৮টি সংস্থা। এদের মোট লাভের পরিমাণ ছিল ১৪৭০৪ কোটি টাকা। ক্ষতিতে চলেছে ১০১টি সংস্থা। এদের মোট লোকসানের পরিমাণ ছিল ৪৮২৬ কোটি টাকা। সব মিলিয়ে লাভের অংশ ৫.৬৮ শতাংশ দাঁড়াবার কারণ হল, লাভজনক সরকারি সংস্থাগুলি অন্যদের লোকসানের দায় মিটিয়েছে। এই দায় মিটিয়ে সরকারি কোষাগারে সরকারি সংস্থাগুলো ১৯৯৫-৯৬ সালে নীট লাভের টাকা যা জমা দিয়েছে তার অঙ্ক হল ৯৮৭৮ কোটি টাকা। আরও উল্লেখ করা উচিত, সরকারি সংস্থাগুলিতে যে ১৪৭০৪ কোটি টাকা লাভ হয়েছিল তার মধ্যে ৮৪৭১ কোটি টাকাই এসেছিল এমন সব সরকারি সংস্থা থেকে, যেগুলিকে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে রীতিমত প্রতিযোগিতা করে মুনাফা অর্জন করতে হয়েছিল।

সুতরাং সরকারি-সংস্থা মানেই লোকসান, কিংবা বেসরকারি-সংস্থার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সরকারি সংস্থার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী — এই দুই ধারণাই অমূলক। অথচ এই অমূলক ধারণাই জনমানসে বদ্ধমূল করে দেওয়া হয় কিছু কিছু মিথ্যা বা অর্ধসত্য ক্রমাগত প্রচার করে।

একথা অনস্বীকার্য যে সরকারি সংস্থাগুলো নিয়ে সমস্যা আছে। যেসব সরকারি সংস্থা লোকসানে চলে, তদন্ত করে দেখা যাবে এদের লোকসানের বড় কারণ পরিচালন ব্যবস্থার গলদ। প্রকল্প নির্বাচন থেকে প্রকল্প পরিচালনা করা — সর্বত্র থাকে সরকারি আমলাতন্ত্রের খবরদারি। যারা খবরদারি করেন তাদের অধিকাংশরই প্রকল্পটি নিয়ে খুব ভাল ধারণা থাকে

না। খবরদারির অধিকার অর্জন করেন রাজনৈতিক মহলে ভাল যোগাযোগ থাকার সূত্রে। সরকারি প্রশাসনের আমলারা যখন এইসব প্রকল্পে খবরদারি করার অধিকার অর্জন করেন, তখন বিষয়টি নিয়ে তাদের অজ্ঞতার সঙ্গে আমলাসুলভ ঔদ্ধত্যের সমাহার গোটা প্রকল্পটিকেই বিপন্ন করে তোলে। এর সঙ্গে জোটে রাজনৈতিক কর্তাদের লুণ্ঠনের কর্মসূচি। তার উপরেও আমলারা কর্তাদের এই লুণ্ঠনে শুধু সহায়কের ভূমিকা পালন করে প্রকল্পটিতে নিজের ক্ষমতা রক্ষা করেন, এমনটি নয়। সুযোগ ও সুবিধামত তারাও এই লুণ্ঠনে শামিল হন। শুধু তাই নয়, বিদেশী কারিগরি ও অন্যান্য সহযোগিতা খোঁজার নামে এইসব সংস্থায় চলে বিদেশী সংস্থার কাছে ঘুষ নিয়ে তৃতীয় শ্রেণীর প্রযুক্তি আমদানি করে সংস্থাগুলিকে চিরকালের মত পঙ্গু করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র। এই ষড়যন্ত্রে যারা সফল হন, তাদের সুইস ব্যাঙ্কে টাকা জমে। সংস্থাগুলি থেকে অবসর গ্রহণের পর জুটে যায় 'কনসালটেন্সি'র কাজ। আর দেশের জন্য পড়ে থাকে এক পঙ্গু প্রযুক্তির আঁস্তাকুঁড়।

এত সবের পরও ব্যুরো অফ পাবলিক এন্টারপ্রাইজের অধীনস্থ ২৪৩টি সংস্থা যখন লাভের মুখ দেখে, তখন বোঝা যায় এদেশে সরকারি সংস্থাগুলিতে দক্ষতার কোন অভাব নেই। অভ্যন্তরীণ প্রতিকূলতা প্রবল হওয়া সত্ত্বেও এইসব সংস্থাগুলি প্রতিযোগিতামূলক বাজারে সত্যিই টিকে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে। এগুলি বেঁচে থাকতে পারে, এগুলি আরও শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে, যদি এগুলির পরিচালনব্যবস্থাকে ত্রুটিমুক্ত করা যায়। বলা বাহুল্য, সেটি করতে হলে প্রয়োজন হল সরকারি আমলাতন্ত্রের ফাঁস থেকে এগুলিকে মুক্ত করা। ন'টি সংস্থা বা 'নবরত্ন'র জন্য এরকম একটি পরিকল্পনার কথা কিছুদিন আগেই ঘোষণা করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার যদি এ বিষয়ে সফল হন তবে তা এইসব সংস্থার পক্ষে মঙ্গলজনক হবে।

কিন্তু সরকার সত্যিই কী চান তা নিয়ে সন্দেহ আছে। সরকারি সংস্থাগুলো যখন ভালভাবে চলে, আমলাতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত চাপিয়ে সরকার সেগুলোকে রুগ্‌ণ করে ফেলে। রুগ্‌ণ কারখানা যখন পুনরুজ্জীবনের প্রকল্প পেশ করে, নানা অছিলায় সরকার সেগুলিকে বানচাল করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, এন টি সি-র মিলগুলোর লোকসান কাটাবার জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ ছিল এগুলির প্রযুক্তির আধুনিকীকরণ, কমিটি এটাও বলেছিলেন যে আধুনিক প্রযুক্তির জন্য যে অর্থের প্রয়োজন, মিলগুলির উদ্বৃত্ত জমি বিক্রি করেই তা জোগাড় করা সম্ভব। বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশে ধুলো জমছে। এখনও পর্যন্ত সরকার এ বিষয়ে কিছুই করেনি।

ইদানীং আবার সরকারি সিদ্ধান্তগুলো এমন দিকে যাচ্ছে, যাতে করে সরকারি সংস্থাগুলো বেশি করে বিপাকে পড়ে। কিছুদিন আগে রেলমন্ত্রক সিদ্ধান্ত নিয়েছে, স্টিল অথরিটি থেকে তারা আর রেলের চাকা কিনবে না। কোল ইন্ডিয়াকে বঞ্চিত করে কয়লা আনা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া থেকে। সরকারি দীর্ঘসূত্রতার কারণে রুগ্‌ণ কারখানার পুনরুজ্জীবনের কর্মসূচি যেখানে বন্ধ, অসম্ভব ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সেখানে সেন্ট্রাল ইলেকট্রিসিটি অথরিটিকে বাধ্য করা হয়েছে 'এনরণের' জন্য সবুজ সংকেত দিতে।

পাঁচ দশক আগে যারা ভেবেছিলেন শিল্পায়নে সরকারের ইতিবাচক ভূমিকা থাকা দরকার, তারা সরকারি সংস্থা নিয়ে রাজনীতির যে এই চেহারা দাঁড়াবে তা কল্পনাও করতে পারেননি। সে যুগে যারা বুনিয়াদি শিল্পের ভার রাষ্ট্রের হাতে ছাড়তে চেয়েছিলেন তাদের চিন্তাভাবনা হয়তো একেবারে নির্দোষ ছিল না। বুনিয়াদি শিল্প গড়ার ভার রাষ্ট্রের হাতে ছেড়ে দিয়ে দেশী বেসরকারি পুঁজিপতিদের বিনিয়োগ ভার লাঘব করার পরিকল্পনা হয়তো তাদের ছিল। দেশী পুঁজি যাতে সস্তায় বিদ্যুৎ, ইস্পাত কিংবা ভারী যন্ত্রপাতি পেতে পারে,

সরকারি উদ্যোগে শিল্পায়নের পিছনে হয়তো সেটাও ছিল অভিসন্ধি।

কিন্তু সে যাই হোক, কালক্রমে এই সরকারি সংস্থাগুলিই যে এইভাবে কায়েমি স্বার্থের কূট-রাজনীতির রঙ্গমঞ্চ হয়ে উঠবে, পাঁচ দশক আগের রাজনীতির নেতারা তা কল্পনাও করতে পারেননি। অবস্থাটা এমন দাঁড়িয়েছে যে এইসব সংস্থা যখন ভালভাবে চলে — লাভের মুখ দেখে, প্রতিনিয়ত তখন সরকারি কর্তাদের অন্যায় আবদার ও জুলুম কিংবা লুণ্ঠনের টার্গেট হয়ে পড়ে এই সংস্থাগুলি। যখন রুগ্‌ণ হয়ে পড়ে তখন তাদের রুগ্‌ণতাকে অজুহাত করে এইসব সংস্থায় তালা লাগিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ইদানীং আবার তার সঙ্গে এসেছে কাঠামোগত সংস্কারের কর্মসূচি — যে কর্মসূচি অনুসারে শিল্পবাণিজ্যে সরকারি ভূমিকা যত কমানো যায়, ততই মঙ্গল। লাভজনক সংস্থাও তাই তুলে দিতে হবে বেসরকারি হাতে।

এসবের কারণ আছে। নেহরু-যুগে যদি শিল্পায়নে রাষ্ট্রের ইতিবাচক ভূমিকা খোঁজার পিছনে সোভিয়েত থেকে শিক্ষা নেওয়ার বাসনা থেকে থাকে — যে বাসনা সে যুগে জাতীয়তাবাদীদের একাংশের মধ্যেও বিদ্যমান ছিল, সে বাসনা ইদানীং দুর্বল হয়ে পড়েছে। দেশি শিল্পপতিরা যদিও এখনও চায় যে বিদ্যুৎ, ইস্পাত, কয়লা কিংবা ভারী যন্ত্রপাতি সস্তাদামে যোগান দেওয়ার দায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতেই থাকুক, আন্তর্জাতিক পুঁজির প্রবল চাপে তাদের সে বাসনা দমন করতে হচ্ছে। জাতীয়তাবাদ ভারতের মত দুর্বল দেশে বিলাসিতা হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। আর সমাজতন্ত্রের অঙ্গ হিসেবে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প গঠনের কর্মসূচি প্রাগৈতিহাসিক বিষয়ে রূপান্তরিত হয়ে পড়ছে। এমতাবস্থায় সরকারি সংস্থাগুলিকে জোরদার করার প্রশ্নই ওঠে না। বাজার অর্থনীতিতে মতাদর্শগত পরিমণ্ডল সর্বব্যাপী হয়ে সরকারি হস্তক্ষেপের সীমানা সঙ্কুচিত করার কাজে নীতি প্রণেতাদের এমন উৎসাহী করছে যে লাভজনক সরকারি সংস্থাও বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করতে তারা সংকোচ বোধ করছেন না। একাজে উৎসাহ বোধ করার অতিরিক্ত কারণ এই সে সরকারি সংস্থায় লুঠপাঠ চালিয়ে যে অর্থ তারা উপার্জন করতেন, সরকারি সংস্থা বিক্রি করার দালালির টাকা তার তুলনায় কম হবে না এমন ইঙ্গিত বিদ্যমান। বিশেষত মূলধনী খাতে টাকা আন্তর্জাতিক মুদ্রার সঙ্গে বিনিময়-যোগ্য হয়ে উঠলে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা যদি সরকারি সংস্থাগুলিকে কুক্ষিগত করার চেষ্টা করে তবে এই লেনদেন-এ ভাল দালালি জোটার সম্ভাবনা আছে। আর বিদেশি বিনিয়োগকারীরা যে ইতিমধ্যেই লাভজনক সরকারি সংস্থাগুলোর শেয়ার কেনার চেষ্টা করছে এ তথ্য তো সর্বজনবিদিত। 'ভেল'-এর শেয়ারের ১৬ শতাংশ ইতিমধ্যেই বিদেশি বিনিয়োগকারীদের হাতে চলে গেছে।

এই পরিস্থিতিতে একথা স্মরণ করা বৃথা যে, কোন শিল্পোন্নত দেশই সরকারের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া শিল্পে তার উন্নতি ঘটাতে পারেনি। ইদানীং দক্ষিণ কোরিয়া থেকে শিক্ষা নেওয়ার কথা উঠছে। যে কথা এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে তা হল দক্ষিণ কোরিয়ার উন্নয়নের অনেকটাই এসেছে সেখানকার সরকারের হাত ধরে। দক্ষিণ কোরিয়া সরকারি উদ্যোগেই যে ইস্পাত এবং জাহাজ নির্মাণ কারখানা খুলেছিল, সমস্ত অর্থনীতিকে সরকারি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসে পরিকল্পিত উপায়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল — এসব কথা অনুচ্চারিত থেকে যাচ্ছে। এগুলি অনুচ্চারিত থাকার কারণ হল — স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরের ভারতবর্ষের নীতি-প্রণেতাদের মতাদর্শে স্বদেশ এবং তার উন্নয়নের কোন স্থান নেই।

কৌশিক চক্রবর্তী

সব থেকে বেশি এগিয়েছে প্রযুক্তি

"Discovery Application. Impact, Discovery. We see here a chain reaction of change, a long, sharply rising curve of acceleration in human social development." — *Alvin Toffler, Future Shock*

একটা ছোট দেশলাই বাক্স। দূর থেকে দেখলে দেশলাই বাক্স বলেই মনে হবে। কাছে এলে বোঝা যাবে ওটা দেশলাই বাক্স নয়। প্লাস্টিকের খাপে মোড়া দেশলাই বাক্সের আকারেরই একটি বস্তু। দেখলে বিশ্বাস করতে অবাক লাগবে যে এই বস্তুটিই কমপিউটারের হৃদপিণ্ড। সেকেন্ডে ৬০ কোটি স্পন্দনের মাধ্যমে যা নির্ধারণ করে কমপিউটারের প্রতিটি হিসেব নিকাশের মূল বিষয়টি। এই বস্তুটিই ঠিক করে দেয় কমপিউটার স্ক্রিনের কয়েক কোটি আলোক কণা, যারা মিলেমিশে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে তৈরি করে ছবি, তারা, প্রতি সেকেন্ডের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ সময়ে কী করবে। কোনও একটি মুহূর্তে নয়, দেশলাই বাক্সের মত ওই বস্তুটি এ ধরনের মারাত্মক সব জটিল জটিল কাজ করে যায় বছরের পর বছর।

এর নাম প্রযুক্তি। আদিম মানুষ আগুনের ব্যবহার শেখার পর থেকে দিনের পর দিন মাথা খাটিয়ে, যন্ত্রকে কাজে লাগিয়ে, যন্ত্রকে জটিল থেকে জটিলতর করে তুলে জীবনকেই সহজতর করার যে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে সেই প্রয়াসেরই এক রূপ এই প্রযুক্তি। বিরাট শক্তিকে ছোট্ট একটা জায়গায় কেন্দ্রীভূত করে তাকে মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহারেই প্রযুক্তির সার্থকতা। প্রযুক্তি উন্নয়নের ক্ষেত্রে মানুষের সবচেয়ে বড় অস্ত্র তাই তার বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি। আর উৎপাদন পদ্ধতিতে প্রযুক্তির প্রয়োগে অবশ্যই যেমন লাভবান হচ্ছে মানুষ, তেমনই প্রযুক্তির সার্থক রূপায়ণে বদলে যাচ্ছে সনাতন সামাজিক সম্পর্ক। বদলে যাচ্ছে আর্থ-সামাজিক কাঠামো। তারই হাত ধরে, তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে বদলে যাচ্ছে মূল্যবোধ। বদলে যাচ্ছে চিন্তা-ভাবনার ধরন-ধারণ। একটা কথা আজকের পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে তাই খুব সহজেই বলে দেওয়া যায়। পৃথিবীর আহ্নিক গতি আর বার্ষিক গতি যেমন ছিল ঠিকই আছে কিন্তু কোথায় যেন পৃথিবীতে আরও একটি গতি যুক্ত হয়েছে। গোটা পৃথিবীটা যেন আজ ঘুরতে ঘুরতে ভীষণ জোরে সামনের দিকে ছুটেছে। এই মুহূর্তে যা আছে পরের মুহূর্তে তা অতীতের বিষয় হয়ে যাচ্ছে। জীবনের গতি হয়েছে দ্বিগুণ। পিছনে তাকানোর সময় নেই। সামনে না তাকালে ছুটতে ছুটতে হোঁচট খেতে হবে। স্মৃতি রোমন্থনের সুযোগ

নেই। শুধু আগামীকালের ভাবনা। আগাম সমস্যাগুলিকে চ্যালেঞ্জ জানানোর তাড়না। ভাল হচ্ছে না খারাপ হচ্ছে সেটা পরের কথা। কিন্তু ঘটনা হল, এটা হচ্ছে।

কাজেই জঙ্গম এই পৃথিবীতে প্রযুক্তিও থেমে নেই। আজকের প্রযুক্তির কাছে কালকের প্রযুক্তি অতীতের বিষয়। প্রযুক্তির গতির সঙ্গে পাল্লা দিতে নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড়। গোটা পৃথিবীতে উন্নত প্রযুক্তি যারা কাজে লাগাচ্ছেন তারাই উন্নত মানুষ হিসেবে চিহ্নিত। যারা সেই প্রযুক্তি আবিষ্কার করছেন তারাই সারা পৃথিবীর চালকের আসনে আসীন। এটাই বাস্তব। এটাই সত্য।

বিশ্বের কোথাওই আজ আর প্রযুক্তি কোনও একটা ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকছে না। বিশ্বের এক প্রান্তে আবিষ্কৃত সর্বশেষ প্রযুক্তি নিমেষে পৌঁছে যাচ্ছে বিশ্বের অপর প্রান্তের কোনও প্রত্যন্ত গ্রামে। একটা কথা অবশ্য ঠিকই যে, কোনও কোনও শক্তি আজ প্রযুক্তির এইভাবে দ্রুত ছড়িয়ে যাওয়ার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু পাশাপাশি একথাটাও মানতে হবে যে প্রযুক্তির গতি রোধ করা যায় না। কাজেই আজ না হোক কাল প্রযুক্তি, মহাদেশের বেড়া টপকে পাড়ি জমাবেই। প্রযুক্তির বিশ্বায়ন রোখা যাবে না। প্রকৃতপক্ষে সেই বিশ্বায়ন শুরু হয়ে গেছে বেশ কিছুকাল আগেই।

এখন দেখতে হবে প্রযুক্তির এই বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে ভারতবর্ষের অবস্থান ঠিক কোথায়। যদি ধরে নেওয়া হয় স্বাধীনতার পর থেকেই ভারতবর্ষে প্রকৃত অর্থে প্রযুক্তির উন্নয়নের সূচনা, তাহলে বুঝতে হবে কোন কোন ক্ষেত্রে সে উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়েছে এবং কেনই বা হয়েছে। কিংবা অন্যান্য ক্ষেত্র, যেগুলি প্রযুক্তি উন্নয়নের সুফল থেকে বঞ্চিত হয়েছে তাদেরই বা খামতিটা কোথায় ছিল।

এসব প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে ফিরে যেতে হয় ১৯৪৭-৪৮ সালের ভারতের অর্থনীতির দিকে। চোখ ফিরিয়ে একবার তাকাতে হয়। দৃশ্যটা বড় করুণ। অর্থনীতির ছবিটা মনকে ভারাক্রান্ত করে। এমন হওয়ার কথা ছিল না। তবু হয়েছিল। পিছিয়ে যাওয়া দরকার আরও বেশ কিছু বছর।

তখন বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রাজত্ব করছে ভারতে। মাথা গুঁজে পড়ে থাকা ভারতীয় অর্থনীতির ভাগ্য নিয়ন্তা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। জওহরলাল নেহেরু লিখেছিলেন, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশে আসার আগে ভারতীয় অর্থনীতিতে এমন বেশ কিছু লক্ষণ নজরে আসছিল যা থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে ভারতে ধীরে ধীরে পূর্ণাঙ্গ পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশ ঘটছিল। কিন্তু এমন অবস্থায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আগমন সব ভেঙেচুরে দিল। ভারতীয় অর্থনীতির স্বাভাবিক গতিপথ বদলে দিল। নেহেরুর মতামতের সঙ্গে একমত হতে পারেননি অনেক ঐতিহাসিক এবং অর্থনীতিবিদ। তবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে জাঁকিয়ে বসার পর যে ভারতীয় অর্থনীতি তার স্বাভাবিক চলার ছন্দ হারিয়ে ফেলেছিল একথা স্বীকার করেছেন সকলেই। প্রশ্ন উঠতে পারে এটা সম্ভব হয়েছিল কীভাবে। কয়েকটা পরিসংখ্যান থেকেই বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে যেতে পারে।

প্রথমত, যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য শুরু করে তখন ভারতকে দেওয়ার মত খুব কম জিনিসই ছিল বৃটিশ অর্থনীতিতে। কাজেই ভারত থেকে কেনাকাটা সারার পর তার দাম চোকাতে মুশকিলে পড়তে হত কোম্পানিকে। সমস্যাটা বুঝতে পেরে গোড়ার দিকে সোনা রূপার মুদ্রায় বিনিময়ে কেনাকাটা করত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। বছরে ৩০,০০০ পাউন্ডের সোনা, রূপা আসত ভারতে। স্বাভাবিক, ব্যাপারটা গায়ে লাগছিল। পরিস্থিতিটা বদলে গেল পলাশীর যুদ্ধের পর। দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা কোম্পানির হাতে যাওয়ায় এবার তারা বসল ভারত-বৃটেন বাণিজ্য সম্পর্কের গতিপথ

নির্ধারণের ঠিকা নিয়ে। কত কম অর্থের বিনিময়ে কত বেশি পণ্য ভারত থেকে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে তারই প্রতিযোগিতা শুরু হল।

দ্বিতীয়ত, কৃষককে শোষণ করে ভূমি রাজস্ব আদায় ছিল কোম্পানির লাভের আর একটা পথ। যে টাকাটা এইভাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আদায় হত সেই টাকাটা কিন্তু জনকল্যাণ বা ভারতের উন্নতির কাজে খরচ করা হত না। এই অর্থকে ধরা হত কোম্পানির লাভের খাতায় এবং পাঠিয়ে দেওয়া হত ইংলন্ডে। হিসাব বলছে শাসনের প্রথম ছয় মাসে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এহেন 'লাভের' পরিমাণ ছিল শুধুমাত্র বাঙলা থেকেই ৪০,৩৭,০০০ পাউন্ড।

তৃতীয়ত, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অফিসারদের অকল্পনীয় দুর্নীতিতে ভারতকে খোয়াতে হয়েছে কয়েক হাজার কোটি টাকার সম্পদ। রবার্ট ক্লাইভ যখন ভারতে আসেন তখন তিনি এমন কিছু বিত্তবান ছিলেন না। কিন্তু অল্প কিছুদিন এদেশে থেকে যখন তিনি ফিরে যান তখন তিনি সঙ্গে নিয়ে যান আড়াই লক্ষ পাউন্ড। এছাড়া এখানে তিনি যে জমি কিনেছিলেন তা থেকে বছরে তাঁর আয় দাঁড়িয়েছিল ২৭,০০০ পাউন্ড।

চতুর্থত, বাংলা, বিহার, ওড়িশার দেওয়ানি পাওয়ার পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কৃষকদের ওপর অত্যাচার শুরু করল সরাসরি। রাজস্ব আদায়ের জন্য শোষণ চরমে উঠল। ততদিনে ভারতীয় কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির কফিনে পেরেক পোঁতার কাজ শুরু হয়ে গেছে। এতে কোম্পানির যেমন রাজস্ব আদায় একদিকে অস্বাভাবিক বেড়ে গিয়েছিল, তেমনই কৃষকেরও পিঠ ঠেকে যায় দেওয়ালে। দুর্দশার চরম সীমায় পৌঁছেছিল কৃষক।

কর্ণওয়ালিস সমস্যার গোড়াটা বুঝতে পেরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পথে গেলেন। জমিদারী প্রথা চালু করে ১৭৯৩ সালেই ঠিক করে দিলেন বছরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ৩৪,০০,০০০ পাউন্ড রাজস্ব পেলেই চলে যাবে। এ থেকে জমিদাররা প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হলেন।

এত কথা বলার উদ্দেশ্য একটাই, তা হল, পরিভাষায় যাকে বলে 'Drain of capital'. অর্থাৎ ভারত থেকে পুঁজির ইংলন্ড যাত্রার একটা আভাস দেওয়া। ইংলন্ডে শিল্প বিপ্লবে এই পুঁজিই কিন্তু সে দেশকে অনেক সাহায্য করেছিল। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, ইংলন্ডে শিল্প বিপ্লবের পর কিন্তু ভারতকে অন্যভাবে ব্যবহারের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কারণ তখন দরকার ছিল ইংলন্ডে উৎপন্ন পণ্যের বিরাট বাজার। কাজেই তখন অর্থনৈতিক শোষণের মাধ্যমে ভারতকে বৃটেনের বাজারে পরিণত করার চেষ্টা শুরু হল।

ইংলন্ডে ভারতীয় বস্ত্রের কদর ছিল খুব। কারণ তখন সেখানে যে বস্ত্র তৈরি হত তার গুণমান ছিল অত্যন্ত খারাপ। দামও ছিল বেশি। কাজেই পাছে ভারতীয় বস্ত্র ইংলন্ডের বাজারে ঢুকে সেদেশের বাজারে জাঁকিয়ে বসে, সেই আশঙ্কায় ইংলন্ডে ভারত থেকে আমদানি করা বস্ত্রের ওপর কর চাপানো হল ৭৮ শতাংশ। অন্যদিকে ইংলন্ড থেকে ভারতে আমদানি করা পণ্যকে করমুক্ত ঘোষণা করা হল। প্রযুক্তি তো দূরের কথা, ভারতে শিল্পোৎপাদনের কোনও আগ্রহই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ছিল না। সেই সব শিল্পোৎপাদন ইউনিটই এখানে কোম্পানি তৈরি করেছিল যেগুলির উৎপাদন তারা আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রি করে মোটা মুনাফা করতে পারবে। সেজন্যই বাংলায় তৈরি হয়েছিল জুট মিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চা, কফি, নীল চাষে উৎসাহ প্রকাশ করার কারণও ছিল এটাই। ভারতীয় রেল তৈরির সময় বৃটিশ পুঁজি আমদানি করা হয়েছিল এবং তার সুদ দেওয়ার জন্য কর চাপানো হয়েছিল ভারতীয় করদাতাদের কাঁধে। কাজেই কোনও দেশের রেলওয়ে

নির্মাণ সে দেশের অর্থনীতির ওপর যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে ভারতীয় অর্থনীতিতে তা ছিল একেবারে অনুপস্থিত। এর জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় মূলধনী পণ্য আমদানি করা হয়েছিল ইংলন্ড থেকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রেলওয়ে নির্মাণের সুবাদে সেদেশের লৌহ, খনিজ, কয়লা অন্যান্য যন্ত্রপাতির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় ওইসব শিল্পের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়েছিল। ভারতেও এমন হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তা হতে দেওয়া হয়নি। পরিসংখ্যান দিয়ে বলা যায়, বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় ভারতে যে পরিমাণ বৃটিশ পুঁজি বিনিয়োগ করা হয়েছিল তার ৯৭ শতাংশই ছিল ইংলন্ডের বাণিজ্যের প্রয়োজনে, ভারতে আধুনিক শিল্প স্থাপনের প্রয়োজনে নয়।

কাজেই স্বাধীনতা লাভের সময় যে ভারতবর্ষ স্বাধীন ভারতবাসীর হাতে এল তার না ছিল জোরদার কৃষির ভিত্তি, না ছিল কড়া শিল্পের বনিয়াদ। অপরের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হতে হতে নিঃস্ব হয়ে যাওয়া এক অর্থনীতি নিয়ে দেশের নেতারা পড়লেন সমস্যায়। কোন পথে দেশের অর্থনীতিকে চালিত করলে সবচেয়ে ভাল হয় তা নিয়েই সমস্যা দেখা দিল। তবে তা সাময়িক। ভারতবর্ষের তৎকালীন পরিস্থিতিতে অর্থনীতিকে খোলা বাজারের শক্তির হাতে ছেড়ে দিলে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উন্নয়ন স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল যথেষ্ট। কাজেই পরিকল্পিত পথেই ভারতীয় অর্থনীতিকে চালিত করার ব্যাপারে একমত হওয়া গেল।

ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হয় তখন দেশের প্রযুক্তির কথা যত কম বলা যায় ততই ভাল। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এদেশে যে প্রযুক্তি ব্যবহার করা হত তা একদিকে যেমন উন্নত দুনিয়ার কাছে বহু প্রাচীন, বাতিল করা প্রযুক্তির তালিকায় পড়ত, অন্যদিকে তেমন ওই প্রাচীন সনাতন প্রযুক্তি প্রয়োগের ফলে উৎপাদন ব্যয় যেত বেড়ে। Cost of production বেড়ে যাওয়ায় একই গোত্রের বিদেশী পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এঁটে ওঠা মুশকিল হত। কাজেই আধুনিকীকরণের প্রয়োজনটা অনুভূত হচ্ছিল তখন থেকেই। যে জন্য প্রথম থেকেই গবেষণা ও উন্নয়নের ওপর জোর দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। অবশ্য এর আরও একটা কারণ ছিল। ভারতের পরিকল্পনামাফিক উন্নয়নে যে প্রযুক্তির প্রয়োজন হবে তা যোগাড় করতে ভারতকে প্রযুক্তি আমদানির আশ্রয় নিতেই হবে, একথাটা বেশ বোঝা গেছিল। প্রযুক্তি আমদানির সমস্যাগুলি সম্পর্কে পরিকল্পনার রূপকাররা ওয়াকিবহাল থাকার জন্যই আমদানির ওপর নির্ভরতা কমাতে দেশের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে গবেষণা ও উন্নয়ন (R and D)-এর ওপর জোর দেওয়ার কথা বলেছিলেন।

ভারতীয় অর্থনীতির প্রয়োজনেই আধুনিকীকরণের গুরুত্ব অনুভূত হলেও এই বিষয়টি কখনও পরিকল্পনায় প্রথম থেকে আলাদা একটি বিষয় হিসেবে ঠাঁই পায়নি। অনেক পরে পরিকল্পনায় আলাদাভাবে একটি বিষয় হিসেবে আধুনিকীকরণের কথা বলা হয়। তবে আধুনিকীকরণের কথা বলা হলেও আলাদাভাবে প্রযুক্তির উন্নতির কথা না এনে আধুনিকীকরণের পরিধিটা বিস্তৃত করার কথা হল।

সপ্তম পরিকল্পনায় পৌঁছে আধুনিকীকরণ বিষয়টিকে অনেক ছোট গণ্ডির মধ্যে বাঁধার চেষ্টা চলে। উৎপাদনে উন্নততর প্রযুক্তি প্রয়োগ করেই আধুনিকীকরণ সম্ভব, এ'কথাটা খোলসা করে বলে দেওয়া হল। সেই অনুযায়ী কৃষিতে উচ্চফলনশীল বীজের ব্যবহার, সারের ব্যবহার বৃদ্ধি ইত্যাদিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিল্পে উৎপাদন পদ্ধতিতে কম্পিউটার এবং ইলেকট্রনিক্সের ব্যবহার বৃদ্ধি, জ্বালানি সাশ্রয় শিল্পে নতুনতর উপাদান ব্যবহারের কথা বলা হল। সমস্যা হল, উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের অন্যতম শর্তই হল উৎপাদন পদ্ধতিতে কম

শ্রমিকের ব্যবহার। ভারতবর্ষের মতো উদ্বৃত্ত শ্রমিকের দেশে সেটা কতখানি যুক্তিযুক্ত তা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই বিতর্ক শুরু হল দেশ জুড়ে। তবে সেটা অন্য প্রসঙ্গ।

মোটামুটিভাবে একটা কথা বলা যেতে পারে যে প্রযুক্তির উন্নতি ঘটিয়ে, উৎপাদন পদ্ধতিতে সেই উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদন বৃদ্ধির পথে আলাদাভাবে প্রথম পদক্ষেপ নেওয়া হয় সপ্তম পরিকল্পনাতেই।

সেই অনুযায়ী কৃষি, শিল্পে উন্নততর প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়। তারপর থেকে আধুনিকীকরণ এবং স্বনির্ভরতার লক্ষ্যকে সামনে রেখে অর্থনীতির সবকটি ক্ষেত্রেই উন্নততর প্রযুক্তি কাজে লাগানোর চেষ্টা চলেছে। সমস্যা যে প্রযুক্তিকে ঘিরে কিছু কম জমেছে এমন নয়। প্রযুক্তির উন্নয়নের সুফল অর্থনীতির একেবারে ওপরের স্তর থেকে চুঁয়ে পড়েনি নিচের স্তরগুলিতে। কাজেই সেই উন্নতির সুফল যখন সমাজের ওপরতলার মানুষ উপভোগ করেছেন, তখন সমাজের তথাকথিত নিচের তলার মানুষ, ক্রয়ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার কারণে যারা সেই সুফল উপভোগ করতে পারেননি, তাদের মধ্যে জমেছে ক্ষোভ। নির্দিষ্টভাবে কাউকেই এজন্য দায়ি করা যায়নি। তবে একটা বিষয় বলা যায় যে, ভারতবর্ষের অর্থনীতির জন্য জরুরি প্রযুক্তির তুলনায় এই অর্থনীতির ক্ষেত্রে তুলনায় কম জরুরি প্রযুক্তি অনেক সময়ই ঢুকে পড়েছে এদেশের অর্থনীতিতে। আয়ের অসম বণ্টন এর পিছনে বড়রকম প্রভাব ফেলেছে বলে মনে করলে অযৌক্তিক কিছু বলা হয় না। পৃথিবীর সব দেশের চূড়ান্ত ধনী মানুষেরা নিজেদের একই গোষ্ঠীর মানুষ বলে ভাবতে ভালোবাসেন। সেই অনুযায়ী আয় এবং শিক্ষা দুই-ই একসঙ্গে বাড়লে প্রতিটি দেশের উচ্চ ক্রয়ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষের পরিভাষায় যাকে বলে, Mobility বাড়ে। ফলে হরেক দেশের নতুন নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে তাদের আলাপ-পরিচয় ঘটে যায়। নিজের দেশে, "কেন এমনটি হবে না," বলে তারা তখন মাথা ফাটাফাটি করে থাকেন। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের হয়ত ওই প্রযুক্তিতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার যুক্তি দিয়ে তখন সমাজের ওপরতলার মানুষদের শক্তিশালী লবি দেশেও সেই প্রযুক্তি আনার অথবা নির্মাণের চেষ্টা চালায়। পৃথিবীর বহু উন্নয়নশীল দেশে এ ব্যাপারটা লক্ষ্য করা যায়। ভারতও এ থেকে মুক্ত হতে পারেনি বলে একদিকে ওপেল অ্যাসট্রা, হোন্ডা সিটি, সিয়েলো, মহিন্দ্রা ফোর্ড গাড়ি ঢুকেছে ভারতীয় অর্থনীতিতে, সেলুলার ফোনের ব্যাপক চল বেড়েছে। অপরদিকে পুরুলিয়ার গ্রামে পুকুর থেকে কাদা জল তুলে, পানীয় জল যোগাড় করছে মানুষ। একদিকে চূড়ান্ত বৈভব, অন্যদিকে চরম দারিদ্র্য নিয়ে নিপাট একখানি আধসিদ্ধ অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে ভারতবর্ষ।

তবে সপ্তম পরিকল্পনায় যে আধুনিকীকরণের বীজ বপন করা হয়েছিল সেই বীজ থেকে কিন্তু মহীরূহ হয়েছে ঠিকই। ভারতীয় অর্থনীতির একাধিক ক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থেই আধুনিকীকরণ সম্ভব হয়েছে এবং গবেষণার কাজও হয়েছে উল্লেখযোগ্য রকমের। আর এইসব ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটেছে বড় মাপের। গত ৫০ বছরে মহাকাশ গবেষণায় ভারতের বেশ বড়সড় অগ্রগতি ঘটেছে। এক্ষেত্রে প্রায় সর্বাধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছেন ভারতীয় বিজ্ঞানীরা। পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল (পি এস এল ভি)-র সফল উৎক্ষেপণ, ইন্ডিয়ান রিমোট সেন্সিং স্যাটেলাইট (আই আর এস) এবং ইনস্যাট-এর লাগাতার মহাকাশ পরিষেবা এবং বিশ্বের বাজারে ভারতীয় মহাকাশ প্রযুক্তি সংক্রান্ত হার্ডওয়ার এবং পরিষেবা বিক্রির চুক্তি থেকেই এই ক্ষেত্রে প্রযুক্তির উন্নয়নের আঁচ পাওয়া যায়।

১৯৯৪ সালের ১৫ অক্টোবর পি এস এল ভি ডি-২-এর সফল উড়ানের মধ্য দিয়েই আই আর এস গোষ্ঠীর পাঁচটি কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ ক্ষমতা প্রমাণিত হয়েছে। পি এস এল ভি ডি ২, ৮০৪ কেজি ওজনের আই আর এস পি-২ কৃত্রিম উপগ্রহটিকে ৮১৭ কিলোমিটার উচ্চতায় সান-সিনক্রোনাস কক্ষপথে বসিয়ে দিয়ে এসেছে। তারপর থেকে পরবর্তী উৎক্ষেপণগুলিতে কীভাবে আরও বেশি ওজনের আরও উন্নত কৃত্রিম উপগ্রহ কক্ষপথে পৌঁছে দেওয়া যায় তারই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে। এখানে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, কক্ষপথে উন্নত কৃত্রিম উপগ্রহ বসানোতে একদিকে যেমন ভারতীয় মহাকাশ প্রযুক্তি যাচাই করা গেছে তেমনই উন্নততর ভূপর্যবেক্ষণ এবং অন্যান্য সূক্ষ্ম কাজকর্মে বড় মাপের সাহায্য করেছে এই কৃত্রিম উপগ্রহগুলি। কাজেই ভারতীয় অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রেও মহাকাশ গবেষণা, মহাকাশ প্রযুক্তির সুফল কিছুটা হলেও পৌঁছে গেছে। জিওসিনক্রোনাস স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকেল (জি এস এল ভি) নির্মাণ এবং উন্নয়নেও অগ্রগতি নজরে এসেছে। ক্রায়োজেনিক স্তরে উন্নয়নের জন্য জরুরি ইনটিগ্রেটেড লিকুইড হাইড্রোজেন প্ল্যান্ট তৈরি হয়েছে। এদিকে দেশে তৈরি কৃত্রিম উপগ্রহ ইনস্যাট-২ এ এবং ইনস্যাট-২বি-র সঙ্গে শেষবারের মত বিদেশ থেকে নিয়ে আসা কৃত্রিম উপগ্রহ ইনস্যাট-১ডি সাফল্যের সঙ্গেই কাজকর্ম চালাচ্ছে। ইনস্যাট-২-এ ১৯৯২-এর জুলাই মাসে ইনস্যাট-২বি ১৯৯৩-এর জুলাই মাসে এবং ইনস্যাট-১ডি ১৯৯০ সালে মহাকাশে পাঠানো হয়। টেলিকমিউনিকেশন, দূরদর্শন সম্প্রচার, প্রাকৃতিক বিপর্যয় সঙ্কেত, আবহাওয়া বিজ্ঞান ইত্যাদিতে খুবই সহায়তা করছে এই কৃত্রিম উপগ্রহগুলি। বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়োজিত মানুষদের প্রশিক্ষণ দিতে কৃত্রিম উপগ্রহভিত্তিক যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করার ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর পর এর সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে শুধুমাত্র এজন্যই ইনস্যাটে একটি চ্যানেল বরাদ্দ করা হয়েছে। ১৯৯৫ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি দেশের প্রধামন্ত্রী এই চ্যানেলটি জাতির প্রতি উৎসর্গ করেন। এছাড়া ১৯৯৪ সালের ৪ মে 'স্রস-সি-২' কৃত্রিম উপগ্রহটি এ এস এল ভি-র সাহায্যে উৎক্ষেপণ করা হয় সেই উপগ্রহটিও অ্যাস্ট্রোনমি ও অন্যান্য বিষয়ে বিশেষ মূল্যবান তথ্য যোগানোর কাজে সফল হয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইসরো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইওস্যাট সংস্থার সঙ্গে এক বাণিজ্যিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। আই আর এস-এর পাঠানো তথ্য পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে দিতেই এই চুক্তি হয়েছে। সব মিলিয়ে বলতে গেলে বলতে হয়, দেশীয় প্রযুক্তিতে নির্মিত কৃত্রিম উপগ্রহগুলি ঠিক মত কাজ করে চলায় টেলিযোগাযোগ থেকে শুরু করে বহু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুবিধাজনক অবস্থায় পৌঁছে গেছে ভারতবর্ষ।

অবশ্য প্রযুক্তির উন্নতির সবচেয়ে বড় প্রভাব ভারতীয় অর্থনীতিতে যদি কোথাও পড়ে থাকে তবে তা হয়েছে বোধহয় টেলিকমিউনিকেশন-এর ক্ষেত্রে। চারদিকে একটু চোখ ঘোরালেই বোঝা যায় অল্প কয়েক বছরেই যেন টেলিকমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে একটা বিপ্লব এসেছে ভারতে। ই-মেল, ভয়েস মেল, রেড়িও পেজিং, ভিডিও কনফারেন্স, ই ডি আই, ইরিডিয়াম, এসব নাম ক'বছর আগেও যা শোনা যায়নি, আজ তা মুখে মুখে ঘোরে। আসলে ভারতের মাটিতে এই 'টেলিকমিউনিকেশন বুম'-এর পিছনে যেকটি মাথা কাজ করছে তার মধ্যে 'সি ডট'-এর কর্ণধার শ্যাম পিত্রোদা একশোয় আশি-নব্বই পেয়ে যেতে পারেন। রাজীব গান্ধীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে মার্কিন মুলুক থেকে ছুটে এসে এদেশের টেলিকমিউনিকেশন-এর ক্ষেত্রে তিনি যে জোয়ার আনতে পেরেছিলেন সেজন্যই মানুষ তাঁকে মনে রাখবে, রাখছেও। তাঁকে ঘিরে বিতর্ক অনেক, তবু তাঁর কাজকর্মকে উড়িয়ে দেওয়ার জো নেই।

কাজেই আজকের ভারতে 'হাব' থেকে 'হাব'-এ তথ্য ছুটছে আলোর গতিতে।

কমপিউটার থেকে কমপিউটারে মোডেমের মাধ্যমে তথ্য চালাচালি হচ্ছে ই-মেল মারফত। ভারত সরকার ইতিমধ্যেই তৈরি করেছে আইনেট, র‍্যাপ এম এন (রিমোট এরিয়া বিজনেস মেসেজ নেটওয়ার্ক)। বিদেশ সঞ্চার নিগম লিমিটেড (ভি এস এন এল) বেসরকারি ই-মেল নেটওয়ার্কের ধরনের 'গেটওয়ে নেটওয়ার্ক'-এর মত এক পরিষেবা চালু করেছে। চালু হয়েছে ভয়েস মেল। যাতে প্রেরিত বার্তা রেকর্ড করা যায়। মধ্যযুগে রাজা বা সামন্ত প্রভুরা কোনও অভিযুক্তকে দরবারে হাজির করতে যে সমন জারি করতেন সেই সমন-বাহক বালককে বলা হত 'পেজ'। আজ সেই 'পেজা'র মানুষের পকেটে পকেটে ঘুরছে। দরকার পড়লেই পেজারের মালিককে সঙ্কেত দিয়ে ডাকা যাচ্ছে। 'বিপ বিপ' শব্দের জন্য মার্কিনীরা অবশ্য পেজারকে 'বিপার'ও বলে থাকেন। ভারতে এখন আকছার হচ্ছে ভিডিও কনফারেন্স। এর ফলে দেশের এক প্রান্তে বসে অন্য প্রান্তের মানুষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা, বৈঠক সেরে ফেলা যাচ্ছে। জ্বালানি সাশ্রয় হচ্ছে, হচ্ছে অর্থ সাশ্রয়। বেঁচে যাচ্ছে মূল্যবান সময়। বেঁচে যাচ্ছে পরিশ্রম। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ব্যাপকভাবে ব্যবহার হচ্ছে ই ডি আই বা ইলেকট্রনিক ডাটা ইন্টারচেঞ্জ। স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্যবসায়ীর চাহিদা-যোগান মিলিয়ে দিয়ে খাটনি কমাচ্ছে এই ব্যবস্থা। এটি অবশ্য বেশি ব্যবহার করছেন ট্রেডিং ব্যবসায়ে নিযুক্ত মানুষেরা। হতে হাতে ঘুরছে মোবাইল ফোন। পেপারলেস অফিস-এর দিকে এগিয়ে চলেছে অর্থনীতি। Distance contraction হচ্ছে ঝড়ের গতিতে।

প্রসঙ্গত বলা যায়, এই Distance contraction — প্রায় সর্বশেষ ধাপে পৌঁছে আজ বিশ্বজুড়ে গৃহীত এক উদ্যোগে সামিল হয়েছে ভারতও। এজন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিও রয়েছে ভারতের হাতে। এই উদ্যোগের নাম ইরিডিয়াম সিস্টেম। এককথায় এই সিস্টেম সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় সেলুলার ব্যবস্থারই এক বিশ্ব সংস্করণ এই ইরিডিয়াম সিস্টেম। সহজ ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, পৃথিবীর আকাশে ছাড়া থাকবে ৬৬টি কৃত্রিম উপগ্রহ। যার বেশিরভাগই ইতিমধ্যে উৎক্ষেপণ করা হয়ে গেছে ক্যালিফোর্নিয়ার ভ্যান্ডেনবার্গ, কাজকস্তানের বৈকানুর এবং বেজিং-এর কাছে তাইউয়ান উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে। এই উপগ্রহগুলি পৃথিবী থেকে ৭৮০ কিলোমিটার উচ্চতায় দ্রাঘিমা বরাবর ছটি বিভিন্ন তলে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করবে। অর্থাৎ এক একটি তলে থাকবে ১১টি করে উপগ্রহ। উপগ্রহগুলির মধ্যে যোগাযোগ অর্থাৎ Crosslink থাকবে। এতগুলি উপগ্রহ রাখার কারণ হল, যাতে সবসময়ই পৃথিবীর প্রতিটি এলাকা কোনও না কোনও উপগ্রহের আওতায় থাকে যে ব্যাপারটা নিশ্চিত করা। এই ইরিডিয়াম সিস্টেম যে ব্যবস্থার অন্তর্গত তার নাম "Global Mobile Personal Communication Systems and services by Satellites" এককথায় G. M. P. C. S। ইরিডিয়াম মৌলের পরমাণুতে নিউক্লিয়াসের চারপাশে ৭৭টি ইলেকট্রন রয়েছে। প্রথমে ঠিক ছিল ইরিডিয়াম সিস্টেমেও পৃথিবীর চারপাশে প্রদক্ষিণ করতে ৭৭টি কৃত্রিম উপগ্রহ ছাড়া হবে। সেকারণেই এর নাম দেওয়া হয় ইরিডিয়াম সিস্টেম। এখন অবশ্য এই ব্যবস্থায় ৬৬টি উপগ্রহ ব্যবহার করা হচ্ছে। কেউ যদি এই ব্যবস্থায় বিশ্বের অন্য প্রান্তে কাউকে ফোন করতে চান তাহলে সেই বার্তা ওই ৬৬টি উপগ্রহের মধ্যে প্রয়োজনীয় উপগ্রহগুলিতে পরপর বয়ে যাবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে। প্রেরক যেখানে ফোন করতে চাইছেন সেই এলাকার ওপর যে উপগ্রহটি তখন রয়েছে সেখানে বার্তা পৌঁছালে উপগ্রহটি ওই বার্তা গেটওয়ের মারফত ফিডার লিঙ্ক-এর মাধ্যমে পাবলিক ফোন নেটওয়ার্কে পাঠিয়ে দেবে। চোখের নিমেষে ঘটে যাবে পুরো ঘটনাটা। আনন্দের কথা হল ভারত এই ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেই অনুযায়ী স্টেটব্যাঙ্ক, এল আই সি, জি আই সি, এইচ ডি এফ সি-র মত বড় বেশ কিছু আর্থিক সংস্থা নিয়ে তৈরি

হয়েছে ইরিডিয়াম ইন্ডিয়া টেলিকম লিমিটেড। এই সংস্থা পৃথিবীর ১৬টি বিনিয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে যৌথভাবে ইরিডিয়াম ব্যবস্থায় বিনিয়োগ করেছে। ভারত ও সার্কভুক্ত দেশগুলির জন্য ইরিডিয়াম গেটওয়ে তৈরি হবে। তবে এতে পাকিস্তান নেই। এর মধ্যে প্রযুক্তির বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখবে ভি এস এন এল।

গত ৫০ বছরে ব্যাপক উন্নতি হয়েছে কম্পিউটার সফটওয়ার শিল্পে। সত্যি কথা বলতে কি আজ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভারতীয় সফটওয়ার বিশেষজ্ঞদের যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। ভারতের ইলেকট্রনিক ক্যাপিটাল হয়ে উঠেছে বাঙ্গালোর। তবে কমপিউটার হার্ডওয়ারের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত কিছু সমস্যা রয়ে গেছে এখনও। সম্প্রতি এক বিরাট মার্কিন কমপিউটার কোম্পানি এক বিখ্যাত ভারতীয় কোম্পানির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল। মার্কিন কোম্পানি যন্ত্রাংশ যোগান দেবে আর ভারতীয় কোম্পানি এদেশে সেগুলি জোড়া লাগিয়ে বানানো কমপিউটার বাজারে ছাড়বে, এমনই ছিল কথা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে চুক্তি বাতিল করতে হয়েছে। কারণ দেখা যাচ্ছে কমপিউটারের যন্ত্রাংশ মার্কিন মুলুক থেকে এদেশে নিয়ে এসে তা দিয়ে পুরদস্তুর কমপিউটার বানিয়ে যখন তা বাজারে ছাড়ার মত পর্যায় পৌঁছাচ্ছে ততক্ষণে ওই ধরনের কমপিউটারের ক্ষেত্রে বিশ্বে প্রযুক্তি এগিয়ে গেছে ন'মাস। শেষ পর্যন্ত অবশ্য অন্য আর এক দেশ থেকে তৈরি কমপিউটার ক্রয়ের সিদ্ধান্তে পুরনো প্রযুক্তি দেশে আসার ঝুঁকিটা এড়ানো গেছে। তবে দেশে কমপিউটার হার্ডওয়ার শিল্প সফটওয়ারের মত এত দ্রুত উঠে আসেনি একথাটা সত্যিই।

শুধু কমপিউটার, টেলিকমিউনিকেশন, বা মহাকাশ গবেষণাই নয়, ভারতীয় অর্থনীতির প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই বর্তমানে এমন কিছু উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে যা নির্মিত হয়েছে ভারতেই। পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বড় বড় সেতু, বাঁধ তৈরি হয়েছে ভারতীয় প্রযুক্তিবিদদের কৃতিত্বে। কৃষি, শিল্প, পরিষেবা সর্বত্রই উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। শুধু দেশেই নয়, স্বাধীনতার পর বিদেশেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযুক্তি উন্নয়নে ডাক পড়েছে ভারতীয় প্রযুক্তিবিদদের। এদেশে বৃটিশ শাসন কায়েম না হলে ভারতীয় অর্থনীতিতে প্রযুক্তি উন্নয়নের ওপর তার কী প্রভাব পড়ত সেটা আঁচ করা কঠিন। কারণ একদিকে যখন Drain of Capital আটকানো যেত অন্যদিকে তেমন বিদেশের অর্থনীতি, বিদেশী প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচয় হত একটু কম। দ্বিতীয়ত, বৃটিশ শাসনমুক্ত হওয়ার পর বিশ্বের এগিয়ে যাওয়া অর্থনীতিগুলির সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার যে তাগিদ ভারতীয় অর্থনীতিতে লক্ষ্য করা গেছে, বৃটিশ শাসন কায়েম না হলে সেই তাগিদ থাকতো কি না সে বিষয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। অবশ্য এ থেকে এমন সিদ্ধান্তে আসা ঠিক নয় যে, প্রযুক্তি উন্নয়নের জন্য পরাধীনতাটা ভারতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটা Positive factor হিসেবেই কাজ করেছে। তবে ঘটনা যাই হোক না কেন, স্বাধীনতার পর গত ৫০ বছরে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভারতের যে যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছে একথা অস্বীকারের উপায় নেই। সে প্রযুক্তির সুফল হয়ত ভারতের সর্বত্র সমানভাবে প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়নি। তবে তার জন্য প্রযুক্তিকে দোষ দেওয়া যায় না। প্রযুক্তির উন্নয়নের সর্বশেষ নিদর্শন পোখরানে পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ। একই যুক্তিতে বলা যায়, এহেন প্রযুক্তি উন্নয়নের সুফল হয়ত ভারতের দরিদ্রতম মানুষটির হাতে পৌঁছায়নি। তবে সে দোষটা প্রযুক্তি কিংবা প্রযুক্তি গবেষকের নয়। তার জন্য দায়ী অন্য কেউ, যাদের হাতটা স্বাধীনতার পর গত ৫০ বছরে অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

Reference

1. Space Programme-Reaching Further Height's Independence day feature (PIB) S. Krishnamurthy Director Publication and Public Relation Unit ISRO
2. Government of India Planning Commission Seventh Five Year Plan (1985-90) Vol II
3. Technological Change and Distribution of Gains in Indian Agriculture C H Hanumantha Rao (New Delhi 1975)
4. The New Economics of Growth A Strategy for India and the Developing World (London 1976) John W Mellor
5. Aspects of Economic Change and Policy in India 1900-1960 (Bombay 1963) V V Bhatt
6. Problems of Capital Formation in Underdeveloped countries (Delhi 1973) Ragnar Nurkse

বি প্ল ব দা শ গু প্ত

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে গণতন্ত্র ও পার্টি

কোনো রেলওয়ে স্টেশনে বা এয়ারপোর্টে কেউ যদি আমাকে প্রশ্ন করেন : 'আপনি কি করেন?' আমি প্রথমেই বলে ফেলি না আমি 'এম-পি'। বরং বলি : আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক — যেটা যথেষ্ট সম্মানজনক কাজ। এম-পি বললেই মানুষ ভাববে আরো বেশ কয়েকজন 'স্বনামধন্য' মানুষের কথা — যেমন সুখরাম, সতীশ শর্মা, শীলাকল, কল্পনাথ রাই। ভারত যখন স্বাধীন হয়েছিল তখন যারা রাজনীতি করত তাদের সম্পর্কে বলা হত, "ওরা দেশের কাজ করছে।" বিশের দশকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ যখন নতুন আইনের ভিত্তিতে গঠিত কলকাতা পৌরসভার নেতৃত্বে এলেন তখন একদল মানুষকে সেখানে কাজে ঢুকিয়েছিলেন আসল সময়টা 'দেশের কাজে' ব্যয় করবার জন্য। এখন এই 'দেশের কাজ' কথাটা আর কেউ বলে না, এবং সঙ্গত কারণে। সত্যি-সত্যিই রাজনীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে 'বদমাসের শেষ আস্তানা'।

পঞ্চাশ বছরে ভারতের রাজনীতি নামতে নামতে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে অর প্রমাণ ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ এই পাঁচ বছরের নরসিমা রাও-এর জমানায় প্রতি বছরই একটা করে বড় ঘোটালার কথা, এবং প্রতিটির পিছনে কোনো মন্ত্রী বা বড় মাপের মানুষ। শেয়ার কেলেঙ্কারি, চিনি কেলেঙ্কারি, হাওয়ালা, সার কেলেঙ্কারি, বাড়ি কেলেঙ্কারি, বাইলাডিলা, এম এস সু, তেলের কেলেঙ্কারি, টেলিকমিউনিকেশন কেলেঙ্কারি, আরো কত ঘটনা। এমনকি প্রধানমন্ত্রীর নামে চিটিং কেস, ঘুসের মামলা এবং জালিয়াতির অভিযোগ। পঞ্চাশ বছর আগে, ভারতের স্বাধীনতার লগ্নে, কে ভাবতে পেরেছিল যে এতবড় অধঃপতন হবে? 'রাজনীতি করে' কথাটা একটা গালাগালি হয়ে দাঁড়াবে? অর্ধশতাব্দী আগে রাজনীতি মানে ছিল আত্মত্যাগ, হাসিমুখে ফাঁসির দড়ি নিজের হাতে গলায় জড়ানো, দেশের চিন্তা, জেলে যাওয়া। আজও অবশ্য জেলে যাচ্ছে, তবে সম্মানজনক কোনো কারণে নয়। শোনা যায় দিল্লির তিহার জেলে একটা নতুন উইং খোলা হচ্ছে প্রাক্তন মন্ত্রীদের জন্য। এখন মানুষ বলে 'পার্টি করে' — কিন্তু পার্টিও কি করে?

এই অধঃপতন কেন? এবং এই অধঃপতন আটকাবার পথ কি? আমার এই লেখাতে সেটাই আলোচ্য। কারণ অনেক, কিন্তু মূল কারণ : পার্টি ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। পৃথিবীর যে সমস্ত দেশে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র আছে, সেখানেই তার মূল ভিত্তি পার্টি। মানুষ ভোট দেয় পার্টিকে, তার মানে এই পার্টির নীতি এবং কর্মসূচির পক্ষে। যাকে ভোট দিচ্ছে তিনি ব্যক্তি হিসাবে যতই কেউকেটা হন তাঁর আসল পরিচয় তিনি কোনো একটি দলের প্রার্থী। তাঁকে ভোট দেওয়া মানে সেই দলকে ভোট দেওয়া, এবং দলকে ভোট দেওয়া মানে কিছু নির্দিষ্ট

নীতি বক্তব্য বা কর্মসূচির পক্ষে মত দেওয়া। বহু দেশের নির্বাচনে তালিকা প্রথা রয়েছে, যেমন জার্মানিতে, মানুষ ভোট দেবে সরাসরি পার্টিকে, এবং ভোট অনুযায়ী পার্টির ঘোষিত তালিকা থেকে ক্রমানুসারে সেই ব্যক্তিদের নাম আসবে যাঁরা জিতলেন।

১৯৬৭ সালে ভারতের চতুর্থ নির্বাচন সমাপ্ত হবার পর আমি এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক মরিস-জোন্স যৌথভাবে একটা বই লিখি, যার নাম প্যাটার্নস অ্যান্ড ট্রেন্ডস্ ইন ইন্ডিয়ান পলিটিক্স। এই বইয়ে আমরা দুই ধরনের তথ্য মেলাই — ১৯৬১ সালের আদমসুমারীতে পাওয়া ভারতের সমস্ত জেলার আর্থসামাজিক চরিত্র এবং নির্বাচন কমিশন থেকে পাওয়া প্রতিটি জেলায় প্রতিটি দলের ভোটের হিসাব। ৩০০-র বেশি জেলার প্রায় চল্লিশ রকম চরিত্রের (শিক্ষা, উন্নয়ন থেকে শুরু করে অনেক কিছু) সঙ্গে কম্পিউটার দিয়ে এবং পরিসংখ্যান তত্ত্ব ব্যবহার করে আমরা মেলাতে যাই কোন দল কোথায় বেশি ভোট পেল, কোন আর্থসামাজিক অবস্থা কোন দলের অনুকূলে। সেই বই পরবর্তীকালে দিল্লি এ্যালায়েড পাবলিশার্স প্রকাশ করে। কিন্তু যে কারণে এই বইয়ের কথা লিখছি — আজ এই ধরনের বই আর লেখা যাবে না।

১৯৬৭ অবধি পার্টিগত বৈশিষ্ট্য

ভারতের প্রথম চারটে নির্বাচনে দলগুলো ছিল নির্দিষ্ট, সমস্ত বড় দলই ছিল সর্বভারতীয় ভিত্তিতে পরিচালিত। আঞ্চলিক দল কোথাও কোথাও থাকলেও, এবং কিছু সমর্থন পেলেও সর্বভারতীয় স্তরে তাদের কোন উপস্থিতি ছিল না। মূলত চার ধরনের শক্তি তখন ছিল — কংগ্রেস, সোস্যাল ডেমোক্রাট, কমিউনিস্ট এবং দক্ষিণপন্থী। পরিষ্কার চারটে আলাদা ধরনের শিবির। মানুষ জানতো কোন গোষ্ঠী কী চায় এবং সেই মতো ভোট দিত।

এর মধ্যে সোস্যাল ডেমোক্রাট দল ছিল দুটো — প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টি (পি এস পি) এবং সোস্যালিস্ট পার্টি (এস পি)। আরো পিছনে গেলে চোখে পড়বে কৃষক মজদুর প্রজা পার্টি, যার থেকে হল পি এস পি, পরে পি এস পি ভেঙে রামমোহন লোহিয়ার নেতৃত্বে তৈরি হল এস পি। এদের নেতাদের এক বড় অংশ ছিল একসময় কংগ্রেসেই। প্রাক-স্বাধীনতা কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টিতে। অনেকে কংগ্রেস ছেড়ে এই দিকে আসতেন, আবার অনেকে এদিক ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিতেন। 'সমাজতন্ত্র' কথাটা অবশ্য এঁরা বলতেন, তবে সেই সমাজতন্ত্রের সংজ্ঞা মার্কসবাদী ছিল না। সামাজিক ন্যায়, কিছুটা আর্থিক বৈষম্য কমানো, সমবায়, সাধারণ জীবনযাপন — এই রকম কিছু বক্তব্য এঁদের ছিল। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ বেশ কয়েকবার কংগ্রেসে গিয়েছেন, বনিবনা হয়নি ছেড়ে দিয়েছেন, তারপর আবার ভাব হয়েছে, কংগ্রেসে ফিরে গিয়েছেন — যেমন অশোক মেহেতা, জে বি কৃপালনী। সোস্যালিস্ট পার্টির অবশ্য আর একটা দিক ছিল উগ্র হিন্দি ভাষার প্রচার, এবং পি এস পির তুলনায় মনোভাবও ছিল অনেকটা জঙ্গি।

১৯৬৭ সালে দক্ষিণপন্থী দল ছিল মূলত দুটো — জনসংঘ এবং স্বতন্ত্র পার্টি। এদের মধ্যেও পরিষ্কার দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য ছিল। জনসংঘ ছিল মূলত হিন্দু মৌলবাদী দল — ভারতীয় জনতা পার্টি বা বিজেপির পূর্বসূরি। স্বাধীনতার কিছু পরে, ভারতীয় মন্ত্রিসভা ত্যাগ করে, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এই দল তৈরি করেন। এর আগেও আরো দুটো হিন্দু সাম্প্রদায়িক দল ছিল — হিন্দু মহাসভা এবং রামরাজ্য পরিষদ। কিন্তু ১৯৫২ সালের নির্বাচন থেকে শুরু করে ১৯৭৭ সালের নির্বাচনের ঠিক আগে পর্যন্ত জনসংঘই হয়ে দাঁড়ায় মূল হিন্দু সাম্প্রদায়িক দল। এর মূল কারণ ছিল রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ বা আর এস এস এর সমর্থন। ১৯৪৮ সালে মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের পর কিছুদিনের জন্য আর এস এস বেআইনি ঘোষিত হয়েছিল যেহেতু নাথুরাম গডসে এবং গান্ধী হত্যার অন্য ষড়যন্ত্রকারীরা

ছিল আর এস এস এর কর্মী। কিন্তু ১৯৫২ সালের মধ্যে আর এস এস আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং ওদেরই মদতে জনসংঘ শক্তিশালী হয়।

স্বতন্ত্র পার্টি ছিল মূলত ভারতীয় পুঁজিবাদীদের এক অংশ এবং জমিদারদের দল। কংগ্রেস নেতা চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীর নেতৃত্বে এই দল তৈরির পিছনে একটা সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিল। ১৯৫৬ সাল থেকে পণ্ডিত নেহরু যে প্রথমে 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ' পরে সরাসরি 'সমাজতন্ত্র' বলতে শুরু করলেন তাতে স্পষ্টই ভারতীয় শিল্পপতিদের এক অংশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। অবশ্যই তাদের উদ্বিগ্ন হবার কারণ ছিল না। 'সমাজতন্ত্র' কথাটা বললেও নেহরুর উদ্দেশ্য ছিল 'ভারতীয় ধনতন্ত্র'-এর ভিত্তি তৈরি করা। তার অর্থনৈতিক নীতির সঙ্গে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর বা হংকং, মানে পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর অর্থনৈতিক নীতির কোনো পার্থক্য ছিল না, যদিও ভুল করেও এই দেশগুলো 'সমাজতন্ত্র' বলত না। ভারতে এবং এই সব দেশে সরকারি মালিকানা বেসরকারি মালিকানার বিকল্প ছিল না, বরং দেশীয় পুঁজিপতিদের সাহায্য করবার জন্যই তৈরি হয়েছিল। তবুও সমাজতন্ত্রের কথা, পরিকল্পনার আলোচনা, জোট নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি, সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ভাব এসবই ভারতীয় পুঁজিবাদীদের এক অংশের মনে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছিল। ওরা তাই চেয়েছিল একটা বিকল্প দল, যাতে কংগ্রেস এবং নেহরুকে চাপের মধ্যে রাখা যায়। চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী ছিলেন স্বাধীন ভারতবর্ষের দ্বিতীয় গভর্নর জেনারেল, লর্ড মাউন্টব্যাটেনের পর। তখনো সংবিধান হয়নি এবং রাষ্ট্রপতির পদ তৈরি হয়নি, এবং তখনো রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন ইংল্যান্ডের রাজা এবং গভর্নর জেনারেল ছিলেন তারই প্রতিনিধি। এই তথ্য অনেকের কাছে অদ্ভুত লাগতে পারে — অনেকে ভাবতে পারেন তাহলে ১৯৪৭ সালে কি স্বাধীনতা পেলাম! কিন্তু সেটা অন্য আলোচনা। মোট কথা — রাজাগোপালাচারী একজন এত বড় মাপের কংগ্রেস নেতা ছিলেন যে তাঁকে রাষ্ট্রপ্রধান করা হয়েছিল। সেই রাজাগোপালাচারীর নেতৃত্বে তৈরি হল স্বতন্ত্র পার্টি, ষাটের দশকের প্রথমে। শিল্পপতিরা এর আগে কংগ্রেসকেই টাকা-পয়সা দিত, এখন খানিকটা স্বতন্ত্র পার্টিকেও দিল। একটা সাবধানবাণী যেন — বেশি 'সমাজতন্ত্র', 'সমাজতন্ত্র' করো না, তাহলে স্বতন্ত্র পার্টিকেই আমরা তুলব। ওড়িশা, রাজস্থান এবং অন্যত্র বড় বড় রাজা মহারাজারও যোগ দিল এই দলে।

১৯৬৭ সালে দুটি কমিউনিস্ট পার্টি এবং আরো বেশ কিছু বামপন্থী দল ছিল। ১৯৬৪ সালে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি কেন ভাঙল, এবং কিভাবে সি পি আই এবং সি পি আই (এম) বা মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি এই দুই ধারায় ভাগ হয়ে গেল, সেই ইতিহাস সকলেরই জানা। ভারতের রাজনীতিতে এই দুটি কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে পার্থক্য ছিল কংগ্রেসের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে। সি পি আই মূলত কংগ্রেসের প্রগতিশীল অংশের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করতে চাইতো, যেখানে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নীতি ছিল কংগ্রেস বিরোধিতার। এটা বলা নিষ্প্রয়োজন যে আশির দশকের প্রথম থেকে সি পি আই নীতি পাল্টেছে এবং দুই কমিউনিস্ট পার্টি অনেকখানি পরস্পরের কাছাকাছি চলে এসেছে। কিন্তু ১৯৬৭ সালে এই দুই দলের নীতি এ কর্মসূচিতে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল।

এই দুই কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়াও ছিল ফরোয়ার্ড ব্লক, আর এস পি, এস ইউ সি, আর সি পি আই ইত্যাদি মূলত মার্কসবাদী দল। এদের সকলেরই পশ্চিমবঙ্গে খানিকটা ভিত্তি ছিল। তার সঙ্গে ফরোয়ার্ড ব্লকের ছিল তামিলনাডুতে এবং আর এস পি-র কেরালায়। ১৯৬৭ সালে নকশালবাড়ির ঘটনার কিছু পরে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির এক অংশ বেরিয়ে গিয়ে তৈরি করল সি পি আই (এম এল), পরে তারাও আবার বহু দলে ভাগ হয়ে গেল।

তাছাড়া মহারাষ্ট্রের পেজেন্টস অ্যান্ড ওয়ার্কার্স পার্টিরও (পি ডব্লিউ পি র‌ও) একটা বামপন্থী, প্রায় মার্কসবাদী ভাবমূর্তি ছিল।

আঞ্চলিক দল কি ছিল না? ছিল কিছু কিছু, কিন্তু তাদের শক্তি ছিল সীমিত। মানুষ সাধারণত ভোট দিত সর্বভারতীয় দলগুলোকে। কোথাও কোথাও, যেমন পুরুলিয়া জেলায় লোক সেবক সংঘ, কিছুদিন জেলাভিত্তিক সমর্থন পেয়েছে, তার পর হারিয়ে গিয়েছে। দক্ষিণ বিহারে আদিবাসী রাজা জয়পাল সিং-এর নেতৃত্বে ঝাড়খণ্ড পার্টি তৈরি হয়েছে, বেশ কিছু আসন পেয়েছে, পরে আবার সেই দল কংগ্রেসের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। উত্তরপূর্ব ভারতে দুই একটি আঞ্চলিক দল ছিল — যেমন অল পার্টি হিল লিডার্স কনফারেন্স (এ পি এইচ এল সি)। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে এখানে ওখানে, হাতে গোনা যায় সেইরকম কয়েকটি দল।

দুটো বড় আঞ্চলিক দল তখনো ছিল এখনো আছে, যেহেতু তাদের একটা আর্থ-সামাজিক ভিত্তি আছে। পাঞ্জাবের আকালি দলের শিখ ভিত্তি থাকলেও, সামাজিক উদগ্র সাম্প্রদায়িকতার কণামাত্র তখন শিখদের মধ্যে ছিল না। কেন এই সাম্প্রদায়িকতা পরে এলো সেটা এক বড় প্রশ্ন কিন্তু তার মধ্যে আপাতত যাচ্ছি না। বরং সেই সময় আকালি দলের বৈশিষ্ট্য ছিল ভারতীয় জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে ওদের যোগাযোগ ছিল। আমার মনে আছে, ১৯৭০ সালে একবার কোনো কারণে পাঞ্জাবে গেলাম। এবং কিছু মন্ত্রীর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হল। তখন পাঞ্জাবে আকালি দলের সরকার চলছে, কিন্তু মন্ত্রীদের ঘরে মহাত্মা গান্ধী, নেহরু, নেতাজী, সরোজিনী নাইডু এই সমস্ত নেতার ছবি। এক মন্ত্রী শ্রদ্ধার সঙ্গে বললেন, জাতীয় নেতাদের ছত্রছায়ায় বসে আছি। এক সময় আকালি দল তুলে দিয়ে ওরা কংগ্রেসের সঙ্গে মিশে পর্যন্ত গেল — তারপর অবশ্য আবার বেরিয়ে এল।

দ্বিতীয় বড় আঞ্চলিক দল ছিল দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাঘাম, বা ডি এম কে, যার মূল ভিত্তি তামিল উগ্র জাতীয়তাবাদ, যা উত্তরের উগ্র হিন্দিবাদের প্রতিক্রিয়া। এই উগ্র-জাতীয়তাবাদের প্রথম বড় নেতা ই রামস্বামী নাইকার, যাঁর দলের নাম ছিল দ্রাবিড় কাজাঘাম। তাঁর বক্তব্য ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে, হিন্দি এবং উত্তরাঞ্চলের প্রভুত্বের বিপক্ষে, রাম ও রামায়ণের সমালোচনায় মুখর, এবং দ্রাবিড় মর্যাদাবোধের পক্ষে। নাইকার ছিলেন নিরিশ্বরবাদী, এবং ভারতীয় রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে একজন আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতাবাদী। যখন উগ্র হিন্দিবাদীরা চাইল অন্য ভাষা ও সংস্কৃতি মুছে দিতে, এমনকি দক্ষিণ ভারতেরও রেল স্টেশনের নাম ইংরেজি বা তামিল মুছে শুধু হিন্দিতে লেখা শুরু হলো, তখন যে তামিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হলো তার শীর্ষে ছিল দ্রাবিড় কাজাঘাম এবং আন্নাদুরাই-এর নেতৃত্বে ডিম এম কে। কিন্তু যতদিন গেল এই বিচ্ছিন্নতাবাদী ঝোঁক কমতে লাগল এবং কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা করে আসন রফা করে নির্বাচন করতে শুরু করলো। সত্তরের দশকে অবশ্য ডি এম কে ভাগ হয়ে এম জি রামচন্দ্রনের নেতৃত্বে তৈরি হল আন্না ডি এম কে বা এ ডি এম কে। এই মুহূর্তে অবশ্য ডি এম কে এবং এ ডি এম কে-র মধ্যে সেই বিচ্ছিন্নতাবাদী ঝোঁক খুব কমে গিয়েছে। জয়ললিতা ব্রাহ্মণ, হিন্দুধর্মে তাঁর বিপুল আস্থা, উত্তরবিরোধী নন, কংগ্রেসের দীর্ঘদিনের সঙ্গী, এমনকি তামিলও নন, তবু তিনি এ ডিম এম কের নেত্রী — সমস্ত ব্যাপারে নাইকারের উল্টো মেরুতে থেকেও।

মাতা-পার্টি আর সন্তান-পার্টি : 'এক দল প্রধান' ব্যবস্থা

এই যে এতক্ষণ কংগ্রেস নিয়ে আলোচনা করলাম না তার কারণ কংগ্রেসই এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য। স্বাধীনতার আগে কংগ্রেস দল ছিল না, ছিল জাতীয়তাবাদীদের প্লাটফর্ম।

স্বরাজ পার্টি, সোস্যালিস্ট পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি, সবাই ছিল ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের অংশ। এই সংগঠনের নামের শেষে 'পার্টি' কথাটা অনুপস্থিত --- কেননা অনেক পার্টিকে নিয়েই কংগ্রেস। স্বাধীনতার পর তাই মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন যে কংগ্রেস ভেঙে দাও, কেননা কংগ্রেসের প্রয়োজন মিটে গিয়েছে, ভারত স্বাধীন হয়েছে।

অবশ্যই কংগ্রেসের নেতারা গান্ধীর এই প্রস্তাব এক কথায় বাতিল করে দিয়েছিলেন। কেননা কংগ্রেস নামটার পিছনে ১৮৮৫ সাল থেকে এক দীর্ঘ গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য রয়েছে। এই নামটাকে এঁরা ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন নির্বাচনে, কেননা এই সাইনবোর্ড দেখে বহু মানুষ অন্ধ হয়ে ভোট দেবে। সেই কংগ্রেস নেই, দেশপ্রেমিক, জেলখাটা পুলিশের ওয়ারেন্ট এড়িয়ে লুকিয়ে থাকা, খদ্দর পরা সাধারণ বেশভূষার কংগ্রেসি আর নেই। খোল-নলচে পাল্টে গিয়েছে তবু নামটা রয়েছে, এবং সেই নাম-মাহাত্ম্যে ভোটও আসছে — এখনো আসছে।

স্বাধীনতার পর যখন কংগ্রেস শাসন ক্ষমতায় এল, তখন একটা বড় সুযোগ ছিল ভারতের রাজনীতিতে কতগুলো সুস্থ ধারার প্রবর্তন করবার। সেই সময়টা ছিল আশাবাদের, মানুষ স্বপ্ন দেখত এক শক্তিশালী, সচ্ছল ভারতবর্ষের এবং সরকারে আস্থা ছিল প্রচণ্ড। এবং কিছু কিছু ভালো ধারার প্রবর্তনও হয়েছে সেই সময় — যেমন পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র, নিয়মিত নির্বাচন বা ধর্মনিরপেক্ষতার কথা। ১৯৫৬ সালে যত অনায়াসে পণ্ডিত নেহরু হিন্দু কোড বিল পাস করাতে পেরেছিলেন, আজ চার দশক পর ভারতের কোন সরকার সেটা পারবে না। অথবা জোট-নিরপেক্ষতার বৈদেশিক নীতি, প্রতিবেশী দেশ, আফ্রিকা, এশিয়া, এবং ল্যাটিন আমেরিকার তিন মহাদেশের গরিব দেশগুলো এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক — এ সবই ভারতের দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থে কাজে লেগেছে।

কিন্তু যেটা পণ্ডিত নেহরু করেননি, করতে চাননি বা করতে চেয়েছিলেন কিন্তু পারেননি, সেটা হল এক সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পার্টিব্যবস্থা তৈরি করা, যা ছাড়া পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র চলতে পারে না। সেই সময় কংগ্রেস ভারতীয় সমাজের সমস্ত স্তরেই মূল শক্তি, রাজ্য, মিউনিসিপালিটি, ইউনিয়ন বোর্ড, জেলা বোর্ড পরে পঞ্চায়েত, সমবায়, স্কুল বা কলেজ কমিটি, বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট, ব্যায়াম সমিতি, পাঠাগার, স্কুলের কমিটি, সর্বত্র। সেই থেকে নেহরুসুদ্ধ সমস্ত কংগ্রেস নেতার ধারণা হয়ে গেল কংগ্রেসই সব, এবং কংগ্রেসই চিরকাল থাকবে। অন্য পার্টিগুলো থাকতে হয় থাকুক, তাদের কোনো ভূমিকা নেই। কোনো বিরোধী দলের দরকার নেই।

এই চিন্তাই পরবর্তীকালে একটা তত্ত্ব হয়ে দাঁড়াল, যার নাম এক পার্টি প্রধান ব্যবস্থা, ইংরাজিতে : ওয়ান পার্টি ডমিনেন্ট সিস্টেম। এই বক্তব্যের পুরোধা অধ্যাপক রজনী কোঠারী এবং আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু অধ্যাপক মরিস জোন্স। এরা বলে, কংগ্রেস হচ্ছে 'মাতা দল'-এর মতো, এবং অন্য দলগুলো 'সন্তান'-এর মতো। কংগ্রেস একটা কোয়ালিশন যাতে নানা গোষ্ঠী, নানা স্বার্থ, নানা মত রয়েছে, এবং সেই অসংখ্য স্বার্থের সঙ্গে একটা রাজনৈতিক ভারসাম্য তৈরি করে কংগ্রেস চলছে। কিন্তু যখন কোনো কারণে সেই ভারসাম্য থাকছে না এবং কোনো গোষ্ঠী মনে করছে যে তাদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব কংগ্রেসের মধ্যে হচ্ছে না বা তাদের স্বার্থ দেখা হচ্ছে না, তখন তারা কংগ্রেস ছেড়ে দিয়ে নতুন দল তৈরি করছে। অথবা অন্য কোনো দলে যোগ দিচ্ছে। কিন্তু তার পরেও কংগ্রেস দলের সঙ্গে পুরোপুরি সম্পর্ক ছিন্ন করছে না। এবং কিছু পরে যখন আবার কংগ্রেসে নানা গোষ্ঠী ও স্বার্থের ভারসাম্য ফিরে আসছে তখন তারা আবার কংগ্রেসে ফিরে আসছে, নতুন দল গড়ে থাকলে সেই দল ভেঙে দিচ্ছে। অর্থাৎ 'কংগ্রেস-মাতা' এবং তার 'সন্তান'দের মধ্যে নানা

স্রোত খেলছে, ঢুকছে বেরুচ্ছে, এবং এইভাবেই কংগ্রেসের মাতৃ চরিত্র রক্ষা হচ্ছে, এবং রুষ্ট সন্তানরা আবার মায়ের কোলে ফিরে আসছে।

যদি কেউ প্রশ্ন তোলেন, এইভাবেই ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৭ এই কুড়ি বছর চলেছে কি না, উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ, এইভাবেই চলেছে, বামপন্থী দলগুলো এবং জনসংঘকে বাদ দিলে। অতএব তখনকার রাজনীতি কিভাবে চলত, বিশেষ করে পার্টির সঙ্গে পার্টির সম্পর্ক, তার একটা পরিচ্ছন্ন সহজীকৃত ছবি এই 'এক-পার্টি প্রধান ব্যবস্থা'-র বিবরণে রয়েছে। যদি রজনী কোঠারী বা মরিস-জোন্স ওইটুকু বলে শান্ত হতেন, আমাদের বলবার কিছু ছিল না কিন্তু ওঁরা আর একটু এগিয়ে গিয়ে বলতেন— এই ব্যবস্থাটা ভারতের পক্ষে সঠিক এবং যথার্থ। পাশ্চাত্য পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের মতো দুটো বা তিনটে দল পালা করে সরকার চালাবে, এই মডেল ভারতে চলবে না। 'এক পার্টি প্রধান ব্যবস্থা' ভারতের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ— এটাই চলুক। অন্যদিকে কেনিয়া, টানজানিয়া, আলজিরিয়া ইত্যাদি আফ্রিকার নানা দেশের 'এক পার্টি শাসন' সংগত নয়, তাতে গণতন্ত্র থাকে না। ভারতীয় এই মডেলে ইউরোপের বহু পার্টি ব্যবস্থার সমস্ত গুণই বিদ্যমান— নানা গোষ্ঠী নানা স্বার্থের সংঘাত প্রতিঘাতের সুযোগ থাকছে। অন্যদিকে একদলীয় শাসনের স্থায়িত্বও থাকছে। অতএব ভারতের পক্ষে এর থেকে ভালো ব্যবস্থা কিছু হতে পারে না।

কিছু খারাপ ধারা : নেহরুর আমলেই

এই মডেল পরোক্ষে দলছুট হওয়াতে মদত দিল। তখন দলছুটরা একদিকেই যেতেন — শাসক কংগ্রেস দলের দিকে। নির্বাচনের আগে মনোনয়ন না পেয়ে হয়তো কেউ কেউ নির্দলীয় হয়ে দাঁড়াতেন বা অন্য কোনো দলের চিহ্ন নিতেন। কিন্তু নির্বাচনের পর, খানিকটা মান অভিমানের খেলা খেলে মায়ের কোলে ফিরে যেতেন। অন্য কোনো দলে যাবার দৃষ্টান্ত ছিল বিরল। শাসক দলে যাওয়া মানে ক্ষমতার অংশীদার হওয়া, পরবর্তী নির্বাচনে মনোনয়ন পাওয়া। এবং কংগ্রেসের মনোনয়ন মানেই ছিল প্রায় একশোভাগ সাফল্য — জিতবার পাসপোর্ট। নির্দল বা অন্য দলের লোকেরা যে কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছে, সেটা অন্যায় বলে মনে করা হত না। ধরে নেওয়া হত সেটাই স্বাভাবিক। তাই নেহরু থেকে শুরু করে কোনো নেতাই দলত্যাগ বন্ধ করবার কোনো রকম চেষ্টা করেননি, এই ব্যাপারে কোনো সুস্থ কনভেনশন তৈরি করবার চেষ্টা করেননি।

অন্যদিকে কংগ্রেসের বিরোধী দলগুলো ইউরোপের বিরোধী দলগুলোর মতো গড়ে উঠবে বা সম্মান পাবে এটাও চায়নি কংগ্রেস। ইউরোপে বিরোধী দল মানেই সম্ভাবনা থাকছে শাসক দল হবার। তাই সরকারি শাসন যন্ত্র, আমলা, পুলিশ, বিরোধী দলগুলোকে যথেষ্ট সম্মান দেয়। অনেক সময় সরকার বিরোধী দলগুলোকে ডাকে কোনো প্রশ্নে জাতীয় নীতি নির্ধারণ করতে। ভারতে সেই সব চেষ্টাও হয়নি, কেননা সবাই ধরে নিয়েছে কংগ্রেসের কোনো বিকল্প নেই। চিরকাল এইভাবেই কংগ্রেস সরকারে থাকবে।

কোথাও বিরোধী দলগুলো সরকারে আসার সম্ভাবনা তৈরি হলে সমস্ত শক্তি দিয়ে, সংসদীয় আচার রীতিনীতি বিসর্জন দিয়ে সেই সম্ভাবনাকে অঙ্কুরে বিনাশ করেছে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার। তা সত্ত্বেও যদি কোনো বিরোধী দল সংখ্যাধিক্য পেয়ে রাজ্য সরকারে এসেছে নানা ভাবে চেষ্টা হয়েছে তাকে সরকার থেকে উৎখাত করবার। পঞ্চাশের দশকে মাদ্রাজে, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে এবং পেপসুতে কংগ্রেস হেরে গেলেও বিরোধীদের সরকার করতে দেওয়া হয়নি। যেমন ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে কমিউনিস্টদের ঠেকাবার জন্য ১৮ জন সদস্যের পি এস পি দলকে কংগ্রেস সমর্থন করল পট্টম থানু পিল্লাইর নেতৃত্বে সরকার

করবার জন্য। তৎকালীন কংগ্রেস যদি গণতান্ত্রিক হত যদি অন্য দলের সরকার গঠনকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিত, এবং মানুষ কিনে সংখ্যাধিক্য তৈরির চেষ্টা থেকে বিরত থাকত, তাহলে হয়তো আজ ভারতের গণতন্ত্র অন্য খাতে বইত।

সবচেয়ে বড় অন্যায় ঘটল কেরালায়। ততদিনে ত্রিবাঙ্কুর কোচিন এবং মালাবার যোগ হয়ে কেরালা রাজ্য তৈরি হয়েছে। ১৯৫৭ সালে সেই রাজ্যের প্রথম নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল। ১২৬ জনের বিধানসভায় কংগ্রেস পেল ৪৪, পি. এস. পি. ৯ এবং মুসলিম লিগ ৭, মোট ৬০। কমিউনিস্ট পার্টি পেল ৬০টা আসন, সঙ্গে পার্টি সমর্থিত ৫ জন নির্দল, মোট ৬৫। এছাড়া একজন নির্দল, কংগ্রেসের দিকে, ৬৫ বনাম ৬১। তার মধ্যে স্পিকারকে বাদ দিলে ৬৪-৬১। এর মধ্যে একজন কমিউনিস্ট মারা গেলেন। হল ৬৩-৬১, মানে ২টো আসনের তফাত। সেই উপনির্বাচনে কমিউনিস্ট প্রার্থী রোজেম্মা পুন্নুস জিতে আবার হল ৬৪-৬১, না জিতলে হত ৬৩-৬২, মাত্র একটার পার্থক্য। কিন্তু এই সামান্য পার্থক্য, তার মধ্যে আবার পাঁচজন নির্দল, তবু এই মন্ত্রিসভা কেউ ভাঙতে পারল না। মানুষ কেনার চেষ্টা কম হল না, কিন্তু একজন কমিউনিস্ট বা তাদের কোন সমর্থক এম এল এ-কে কেনা গেল না। অতএব সংসদীয় পদ্ধতিতে এই সরকারকে সরাবার কোনো উপায় থাকল না।

তখন কংগ্রেসে সভাপতি নেহরু কন্যা ইন্দিরা গান্ধী। তিনি সেই সময় যা করলেন পরবর্তী কালে বৃহত্তর সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে সেটাই বেশ বড় করে করলেন। তিনি শুরু করলেন 'গণ অভ্যুত্থান'। অর্থাৎ জাত-পাত ধর্মের রাজনীতি। খ্রিস্টান, ইজাভা, নায়ার, মুসলিম এই সমস্ত সম্প্রদায়ের নেতাদের যুক্ত করে আন্দোলন শুরু হয় ওই সরকারের শিক্ষা ও কৃষিনীতির বিরুদ্ধে। এখন সংসদীয় ব্যবস্থায় একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে জানবার, যে দু'টি নির্বাচনের মধ্যবর্তী সময়ে কোনো সরকারের জনপ্রিয়তা ভাটার দিকে কি না। সেটা হয় উপনির্বাচনের মাধ্যমে। কিন্তু যেটা আগেই বলেছি, উপনির্বাচন একটা হয়েছিল, এবং কমিউনিস্টরাই জিতেছিল। তবু 'গণ অভুত্থান' নাম দিয়ে একটা বড় আন্দোলন ওরা শুরু করল, নায়ার নেতা মান্নাথ পদ্মনাভনের নেতৃত্বে। ভারতে তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ড্যানিয়েল ময়নিহানের পরবর্তীকালে লেখা বই থেকে আমরা জানি যে সি আই এ দুইবার ইন্দিরা গান্ধীকে টাকা দিয়েছিল। একবার ১৯৫৯ সালে এই আন্দোলনের সময় এবং দ্বিতীয় বার ১৯৭০ সালে পশ্চিমবঙ্গে।

যাই হোক, যেটা বলবার, সংবিধানের ৩৫৬ ধারা জারি করে কেরালার নাম্বুদ্রিপাদ সরকারকে সরিয়ে দেওয়া হল, যদিও বিধানসভায় সেই সরকারের সংখ্যাধিক্য অক্ষুণ্ণ ছিল, সরকারের ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনো প্রশাসনিক অনিশ্চয়তা ছিল না। এরপর থেকে বহুবার ৩৫৬ ধারা ব্যবহৃত হয়েছে কংগ্রেসবিরোধী সরকারকে সরিয়ে দিতে, যখন অন্য কোনো কায়দায় সেই সরকারকে সরানো যায়নি। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর মতো একজন গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন কংগ্রেস নেতার আমলেই এই অত্যন্ত খারাপ দৃষ্টান্ত তৈরি হল।

আরো একটা সাংবিধানিক ক্ষতি সেই সময়ই করা হল। ভারতের সংবিধান তৈরির সময়ই প্রশ্ন উঠেছিল ভারত কী ধরনের রাষ্ট্র হবে— যুক্তরাজ্যীয় বা ফেডারেল, না এককেন্দ্রিক। যা শেষ পর্যন্ত দাঁড়াল এর মধ্যে যুক্তরাজ্যীয় বহু বৈশিষ্ট্য থাকলেও, কেন্দ্রিকতার ঝোঁকটাই বেশি থাকলো। যেমন ৩৫৬ ধারা, রাজ্যপাল ঠিক করবে কেন্দ্র, রাজ্যের প্রশাসনিক এবং পুলিশ নেতৃত্ব আসবে কেন্দ্র থেকে, মূল রাজস্ব সংগ্রহের সূত্র থাকবে কেন্দ্রের হাতে, ইত্যাদি ইত্যাদি। অনেকেই মনে করেন যে এই কেন্দ্রিকতার ঝোঁক ভুল, ভারতের মতো বিশাল, বৈচিত্র্যপূর্ণ, বহু ভাষী, বহু ধর্মীয়, বহুজাতিক দেশকে

যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ছাড়া চালানো সম্ভব নয়। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রিকরণ হওয়া উচিত। কেন্দ্র থেকে রাজ্যে, এবং রাজ্য থেকে পঞ্চায়েতে। যাই হোক, সংবিধানেই একটা ব্যবস্থা ছিল, যেটা যুক্তরাষ্ট্রীয় চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, সেটা হল আন্তঃরাজ্য পরিষদের, ইংরাজিতে ইন্টার স্টেট কাউন্সিলের। এই কাউন্সিলের ওপর দায়িত্ব ছিল রাজ্যের সঙ্গে রাজ্যের ঝগড়া মেটাবার (যেমন নদীর জল নিয়ে) এবং কেন্দ্রের সঙ্গে ঝগড়া মেটাবার (যেমন রাজস্ব, পরিকল্পনা বা প্রশাসন নিয়ে)। কিন্তু সংবিধানের এই ব্যবস্থাকে একদম ব্যবহার করা হল না।

আন্তঃরাজ্য পরিষদের সভা যে ডাকা হল না তার এক বড় কারণ এই 'এক পার্টি প্রধান ব্যবস্থা'। কংগ্রেস পার্টি বড় হয়ে উঠল রাজ্য সরকারের থেকে। সমস্ত রাজ্য সরকারই যখন কংগ্রেস চালাচ্ছে, তখন রাজ্যে রাজ্যে দ্বন্দ্ব বা কেন্দ্র-রাজ্য দ্বন্দ্ব আর সাংবিধানিক প্রশ্ন থাকল না, আভ্যন্তরীণ দলগত প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াল। দল ঠিক করল কোন রাজ্য কী পাবে। ঠিক আছে আসামকে আর বিহারকে দুটো তেলের রিফাইনারি দাও, পশ্চিমবঙ্গ ইস্পাতের কারখানা নিক— এইরকম আর কি। মাঝে মধ্যে নিয়মরক্ষার জন্য কোথায় কী হবে তাই নিয়ে উপদেষ্টা কমিটি তৈরি হল। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই রিপোর্ট মানা হল না। অর্থনৈতিক ও সাংবিধানিক প্রশ্নগুলো রাজনৈতিক এবং দলগত আভ্যন্তরীণ প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াল।

দলীয় গণতন্ত্র কী রকম হয়ে দাঁড়াল? কংগ্রেসে সাধারণত নির্বাচন হত না। মহাত্মা গান্ধী নেতৃত্বে আসবার পর থেকে সাধারণত তিনিই ঠিক করতেন কংগ্রেসের সভাপতি কে হবে। মাত্র একবারই, ত্রিপুরী কংগ্রেসে, সুভাষচন্দ্র তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং তাঁর মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জিতেছিলেন। গান্ধীর মৃত্যুর পর কয়েক বছর খানিকটা যৌথ নেতৃত্ব গোছের ছিল, যখন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, আবুল কালাম আজাদ, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং অন্য কয়েকজন বেশ প্রভাবশালী ছিলেন। যদিও নেহরুই ছিলেন নেতা। প্যাটেলের মৃত্যুর পর নেহরু হয়ে দাঁড়ালেন অবিসংবাদী নেতা। কংগ্রেস সভাপতিরা গুরুত্ব হারিয়ে ফেললেন, এবং ইউ এন ধেবরের মতো ভিত্তিহীন নেতাদের কংগ্রেস সভাপতি করা শুরু হল। একটা 'হাই কমান্ড' বলে বস্তু ছিল, এবং কখনো কখনো নেহরুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে কিছু হতো না এমন নয়। তবে সেটা নির্ভর করত নেহরু কতটা জোর দিয়ে বলছেন তার ওপর। সব ব্যাপারে নেহরু সমান জোর দিতেন না। যদিও সত্যিই তিনি যদি কিছু করতে চাইতেন তাঁকে বাধা দেবার কেউ ছিল না।

তবু নেহরুর মানসিক গঠন স্বৈরতান্ত্রিক ছিল না, এবং বুদ্ধিজীবীর মানসিকতা থেকে নানা মত ও বক্তব্য শুনতে চাইতেন। একবার অন্য নামে তিনি এক পত্রিকায় কিছু প্রবন্ধও লিখেছিলেন নিজের নীতির সমালোচনা করে, সেটা সত্যিই প্রশংসনীয়। নেহরুর ধর্মনিরপেক্ষতা, জোটনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস ছিল তার কার্যকলাপের আরো দুটি প্রশংসনীয় দিক। তবু, এই সমালোচনা থেকে যাবে যে তিনি ভারতে বহুদলীয় পার্টি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাননি, অকংগ্রেসি রাজ্য সরকার চাননি, সত্যিকারের যুক্তরাজীয় বিকেন্দ্রিক-প্রশাসনের পক্ষে ছিলেন না, এবং কংগ্রেসকে একটা গণতান্ত্রিক আভ্যন্তরীণ নির্বাচন-ভিত্তিক, আধুনিক দল হিসাবে গড়ে তোলেননি।

ইন্দিরা জমানা—প্রথম দফা (১৯৬৬-১৯৭৭)

নেহরুর পর সামান্য কয়েক মাসের লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মন্ত্রিসভার কথা বাদ দিলে আসবে ইন্দিরা গান্ধীর কার্যকাল। এই কার্যকালকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম কালে,

১৯৬৬ থেকে ১৯৬৯ সালের মাঝামাঝি, কংগ্রেস নেতৃত্ব চলে গেল কয়েকজন বড় নেতার সমষ্টি, 'সিন্ডিকেট' এর হাতে, যার মধ্যে ছিলেন কামরাজ, নিজলিঙ্গাপ্পা, সঞ্জীব রেড্ডি, অতুল্য ঘোষ, এস কে পাতিল এবং আরো দুই এক জন। সত্যি বলতে, ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন সিন্ডিকেট-এর আশীর্বাদে, মোরারজি শক্ত মানুষ এবং ইন্দিরা দুর্বল, অতএব ইন্দিরা প্রধানমন্ত্রী হলে ওরাই ভারত নিয়ন্ত্রণ করবে। স্বভাবতই ওরা ইন্দিরাকে বোঝেননি, এবং ইন্দিরারও প্রায় তিন বছর লেগেছিল ওদের খোলস থেকে বেরিয়ে আসতে।

কিন্তু যখন বেরিয়ে এলেনও, এলেন কংগ্রেস পার্টিকে চূর্ণ করে, নতুন পার্টি তৈরি করে। চূড়ান্ত লড়াই হল প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির মৃত্যুর পর কে রাষ্ট্রপতি হবেন সেই প্রশ্ন নিয়ে। সরকারিভাবে কংগ্রেস প্রার্থী হলেন সঞ্জীব রেড্ডি। বেসরকারিভাবে ইন্দিরার সমর্থন নিয়ে দাঁড়ালেন ভি ভি গিরি। লড়াই হল সিন্ডিকেট-এর সঙ্গে ইন্ডিকেট-এর। সাধারণ মানুষের কাছে লড়াইটা হয়ে দাঁড়াল ক্ষমতালোভী স্বার্থান্বেষী কিছু ঘুঘু নেতা বনাম নেহরু ঐতিহ্যবাহী এক তরুণতর নতুন মুখ। রাষ্ট্রশক্তি পূর্ণভাবে প্রয়োগ হল ইন্দিরা মনোনীত গিরির পক্ষে— দলের থেকে সেটাই বড় হয়ে দাঁড়াল। গিরি জিতলেন, এবং ইন্দিরার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। দুটো কংগ্রেসই চলল, কিন্তু সিন্ডিকেটের কংগ্রেস বা কংগ্রেস (অর্গানাইজেশন) তুলনায় দুর্বল হয়ে পড়ল।

১৯৬৯ থেকে ১৯৭৭ কংগ্রেসে ইন্দিরার অপ্রতিহত শাসন। প্রধানমন্ত্রী পদের সঙ্গে দলের সভাপতি পদ। দল এবং প্রশাসনে তিনিই একমাত্র স্থায়ী, বাকি সবাই অস্থায়ী। তিনমাসে ছয়মাসে একবার করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা পালটাতে লাগল, যাতে কোন মন্ত্রী না মনে করেন তিনি চিরকাল থাকবেন। রাজ্যস্তরে মুখ্যমন্ত্রীদের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। একজনকে মুখ্যমন্ত্রী করা হল, কিন্তু তিনি জাঁকিয়ে বসতে না বসতেই ওই মুখ্যমন্ত্রীর একটা পালটা গোষ্ঠী পার্টির মধ্যে তৈরি হয়ে গেল। দুই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চলতে চলতে বছর দুই পরে ওই মুখ্যমন্ত্রীকে সরিয়ে এক নতুন মুখ্যমন্ত্রী বসানো হল। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে হয়তো সরিয়ে দেওয়া হল দিল্লিতে— এম পি বা মন্ত্রী করে। সেই নতুন মুখ্যমন্ত্রীও ভালো করে বসতে না বসতেই আবার এক নতুন পাল্টা গোষ্ঠী তৈরি হল। এইভাবেই চলল।

নেহরুর সময় বেশ কিছু শক্তিশালী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন, এবং রাজ্যস্তরেও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, গোবিন্দবল্লভ পন্থ, শ্রীকৃষ্ণ সিনহা, কামরাজ বা নিজলিঙ্গাপ্পার মতো মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন যাঁরা বহুদিন প্রশাসনের নেতৃত্বে থেকেছেন। ইন্দিরা জমানায় সেইরকম হবার উপায় ছিল না। অনেকে ইন্দিরার এই অস্থায়ী বিশ্বাসের একটা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেন। শৈশবে ইন্দিরা বাবার সান্নিধ্য বিশেষ পাননি, ইন্দিরার মায়ের সঙ্গে পরিবারের অন্যদের সম্পর্ক ততো ভালো ছিল না। ক্ষীণাঙ্গি, দুর্বল, লাজুক ইন্দিরা প্রায় একা একাই থেকেছেন পুরো শৈশব। তাই অন্যদের ওপর বিশ্বাস, নির্ভর করবার মনোবৃত্তি তার মধ্যে গড়ে ওঠেনি। সেই জন্য তিনি চাননি কোনোরকম প্রতিদ্বন্দ্বী তৈরি হোক, কারো পায়ের তলায় ঘাস গজাতে দেননি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা তো বটেই, এমনকি কেন্দ্রেও তাঁর 'কিচেন ক্যাবিনেট' বা অন্তরঙ্গ বন্ধু বা সাথী বারবার পালটেছেন।

এর ফলে ইন্দিরা জমানায় সংগঠন হিসাবে কংগ্রেসের কোনো আলাদা অস্তিত্ব থাকেনি। তিনিই সভাপতি, তিনিই সব। স্তাবকতা বড় হয়ে উঠেছে। তিনি বিতর্ক চাননি, নেহরুর মতো অন্যমত শুনতে চাননি, এই স্বৈরতন্ত্রী পরিবেশে স্তাবকতা বাদ দিয়ে নেতা হিসাবে চলা সম্ভব ছিল না। কংগ্রেসে আগেও বিশেষ নির্বাচন হত না, তবু কিছু কিছু আনুষ্ঠানিকতা

মানা হত, এখন পার্টির মধ্যে নির্বাচন উঠে গেল। কেন্দ্র থেকে মণ্ডল পর্যন্ত সমস্ত কংগ্রেস কমিটিই হয়ে দাঁড়াল 'অ্যাড-হক', ঠিক ওপরের 'অ্যাড-হক' কমিটি তৈরি করা।

ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হবার এক বছর পরেই ১৯৬৭ সালের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন হল সেই নির্বাচনে কংগ্রেস অর্ধেক রাজ্যে, মানে আটটি রাজ্যে, হেরে গেল। উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, কেরালা, পাঞ্জাব, রাজস্থান, তামিলনাড়ুর মতো রাজ্য নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকল না। এর আগের তিনটে নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে এ যেন রাজনৈতিক ভূমিকম্প। লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতা কমে গেল· স্বভাবতই কংগ্রেস দল এক বিরাট সংকটের মধ্যে পড়ল।

কিন্তু মাত্র তিন বছরের মধ্যে এই সমস্ত রাজ্যে আবার কংগ্রেস ফিরে এল। দুটো পদ্ধতি ব্যবহার করে — সংবিধানের ৩৫৬ ধারা এবং টাকা নিয়ে মানুষ কেনা। সেই প্রথম টাকা নিয়ে দলত্যাগ এক বীভৎস রূপ নিল। হরিয়ানার গয়ারাম নামে এক এম-এল-এ একই দিনে তিনবার দল পালটালেন, সেই থেকে 'আয়ারাম গয়ারাম' কথাটা চালু। যেনতেন প্রকারেণ সরকারে ফিরতে হবে, সেটাই হয়ে দাঁড়াল আপ্তবাক্য। তার সঙ্গে কংগ্রেস-বিরোধী রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে নির্বিচারে ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ। এই সাঁড়াশি আক্রমণে ধ্বংস হয়ে গেল কংগ্রেস-বিরোধী শক্তিগুলি এবং সরকার।

পশ্চিমবঙ্গের কথাই ধরুন। ১৯৬৭ সালে কংগ্রেসকে হারিয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকারে এল। কয়েক মাস না যেতেই রাজ্যপাল ধরমবীরকে দিয়ে তৎকালীন বাংলা কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জির সঙ্গে কংগ্রেস নেতা প্রফুল্ল সেনের কথা বলানো হল। ঠিক হল, অজয়বাবু ২ অক্টোবর যুক্তফ্রন্ট ছেড়ে দলবল নিয়ে কংগ্রেসের সাহায্যে নতুন সরকার করবেন। যখন এই পরিকল্পনা সফল হল না তখন যুক্তফ্রন্টের আর এক নেতা ড. প্রফুল্ল ঘোষকে দিয়ে ফ্রন্টে ভাঙন ধরানো হল, এবং পরে প্রফুল্ল ঘোষ মুখ্যমন্ত্রী হলেন কংগ্রেস সমর্থনে। সেই সরকার যখন চলল না তখন ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করে রাজ্যকে কেন্দ্রের শাসনে আনা হল। ১৯৬৯ সালে যখন আবার নির্বাচন হল তখন আবার যুক্তফ্রন্ট জিতল, এবার আরো অনেক বেশি আসন নিয়ে। সেই সরকারের মধ্যে ভাঙন ধরানো হল এবং তেরো মাস পরে সেই সরকার সরিয়ে দেওয়া হল ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করে।

ইতিমধ্যে মার্কসবাদীদের বিরুদ্ধে নকশালবাদী আন্দোলন শুরু হয়েছে। এই আন্দোলনে পরিকল্পনা নিয়ে ঢুকল পুলিশের এজেন্ট ও সমাজবিরোধীরা। ১৯৭০-৭১ সালে এই আন্দোলন সমাজবিরোধীদের হাতে চলে গেল, যাদের ব্যবহার করা হল মূলত মার্কসবাদীদের বিরুদ্ধে। ১৯৭১ সালের নির্বাচনের ঠিক আগে কিছু বিশিষ্ট কংগ্রেস ও ফরোয়ার্ড ব্লক নেতাকে খুন করে দোষ চাপানো হল মার্কসবাদীদের ওপর। রাজ্যপালও তাঁর প্রাক-নির্বাচনী ভাষণে এইরকম ইঙ্গিত দিলেন, যার ফলে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত জোট মাত্র কয়েকটি আসনের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল না। আমরা আগেই দেখেছি, যে দুবার সি আই এ ইন্দিরা গান্ধীকে টাকা দিয়েছিল, তার মধ্যে দ্বিতীয়বার ছিল এই সময়, পশ্চিমবঙ্গে— প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূতের ভাষ্য অনুযায়ী, যার কোনো প্রতিবাদ কংগ্রেস থেকে বা ইন্দিরা গান্ধীর তরফ থেকে করা হয়নি। ১৯৭২ সালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায়ের তত্ত্বাবধানে হল সেই জাল নির্বাচন, যেখানে এমনকি জ্যোতিবাবু ৬০০০০ ভোটে পরাজিত হলেন। তার পরে পাঁচ বছর পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসের অন্ধকারতম কয়েকটি বছর।

জরুরি অবস্থা ও জনতা শাসনের প্রথম দফা (১৯৭৭-১৯৭৯)

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭১-৭২ সালে যার সূচনা, তারই চরম অবস্থা আমরা দেখলাম ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৭ সালে জরুরি অবস্থার সময়ে। যে কোনো মূল্যে ক্ষমতায় থাকতে হবে, সংসদীয় কোনো রীতিনীতিই বাধা হবে না, এই দৃষ্টিভঙ্গির পূর্ণ প্রতিফলন হল সেই সময়। ১৯৭১ সালের লোকসভা নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধীর জয় অসামান্য। প্রায় সমস্ত রাজ্যেই ততদিনে কংগ্রেসি সরকার। অতএব এই সরকারের পাঁচ বছরের কার্যকাল নিশ্চিন্তে কাটবে সেটা ধরে নেওয়াই সংগত ছিল। তবু ক্ষমতার উদগ্র লোভ, নগ্ন সুবিধাবাদ, পরিবারতন্ত্র, নানারকম দুর্নীতি ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বিদ্রোহের বাতাবরণ তৈরি করল। এই কয়েক বছরে নানারকম রহস্যজনক ঘটনা ঘটেছে যার কোন সদুত্তর পাওয়া যায়নি। যেমন নাগরওয়ালার ঘটনা। একজন লোক ফোন করে দিল্লির স্টেট ব্যাঙ্কের এক শাখাকে বলল ইন্দিরা গান্ধী আমাকে পাঠিয়েছেন, এত কোটি টাকা দিতে হবে, এবং বিনা প্রশ্নে সেই টাকা ব্যাঙ্ক এই লোকটাকে দিল। কেন দিল, কোন তহবিল থেকে দিল, ইন্দিরার এই ব্যাঙ্কে কোনো অ্যাকাউন্ট ছিল কি না, তাকে এইরকম মুখের কথায় এত টাকা দেয়া হয়েছে কি না— এইসব প্রশ্নের মীমাংসা করার আগেই লোকটা পুলিশ হাজতে মারা গেল। এল এন মিশ্র ছিলেন ইন্দিরা গান্ধীর বাণিজ্যমন্ত্রী, কংগ্রেসের মূল তহবিল সংগঠক। যুগটা বফর্সের আগে। তখন কংগ্রেস মূলত যারা বাণিজ্য করত তাদের কাছ থেকে লাইসেন্সের বিনিময়ে টাকা তুলত। সেই মিশ্র হঠাৎ রেল স্টেশনে একজন আততায়ীর হাতে মারা গেলেন— তদন্তে কিছু প্রকাশ হল না। সঞ্জয় গান্ধীর মারুতি কারখানার জমি পাবার জন্য হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী বংশীলাল বিনা নোটিশে কয়েকশো কৃষককে বাস্তুচ্যুত করলেন। এইরকম দুর্নীতির নানা কথা মুখে মুখে ছড়াল। ছড়িয়ে গেল যোগ ব্যায়ামের শিক্ষক ধীরেন্দ্র ব্রহ্মচারী এবং ইন্দিরার আশেপাশের বেশ কিছু মানুষকে নিয়ে নানা কাহিনী।

যদি সংসদীয় গণতন্ত্র ঠিকমতো চলত তাহলে এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা সংসদেই হতে পারত, যেমন খানিকটা ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ হয়েছে নানারকম দুর্নীতি নিয়ে। কিন্তু সত্তরের দশকের মাঝামাঝি এই বিষয় নিয়ে সংসদে আলোচনার বা তার প্রচারের সুযোগ ছিল না। কিন্তু বিক্ষোভ ছিল মানুষের মনে। তাই ১৯৭৪ সনে যখন বিহার ও গুজরাটে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে আন্দোলন শুরু হল, অসংখ্য মানুষ ভিড় করল নানা সমাবেশে। আন্দোলন ছড়াতে লাগল এবং ১৯৭৫ সালের মাঝামাঝি এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে ইন্দিরার নেতৃত্বে কংগ্রেস জিতবে না।

হয়তো সেই কারণেই জরুরি অবস্থা কখনো না কখনো জারি হত। ১৯৭৫ সালের জুনে আর একটা নতুন মাত্রা যোগ হল যখন এলাহাবাদ হাইকোর্ট ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচন অবৈধ ঘোষণা করল। এই সিদ্ধান্ত অন্যায় মনে করলে সংসদীয় নীতি মেনে তিনি সাময়িকভাবে প্রধানমন্ত্রীর পদ ছেড়ে সুপ্রীম কোর্টে আপিল করতে পারতেন। অথবা এই আসনেই আবার দাঁড়িয়ে ভালো করে জিতে প্রমাণ করতে পারতেন যে তাঁর নির্বাচন অবৈধ ছিল না। কিন্তু ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে এই দুটোর ওপরই তিনি ভরসা করতে পারলেন না। যদি সেই নির্বাচনে না জেতেন, যদি যাকে অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী করবেন তিনি পরে তাকে প্রধানমন্ত্রিত্ব ফিরিয়ে না দেন! ইন্দিরা গান্ধীর জীবনের এক বড় সংকট, কিন্তু একান্ত পরিবারের মানুষ ছাড়া কারোকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। অতএব জরুরি অবস্থা জারি করো, বিরোধীদের জেলে পাঠাও, প্রতিবাদ চূর্ণ করো।

জরুরি অবস্থার বিবরণ নিষ্প্রয়োজন, সবার জানা। আমাদের উদ্দেশ্য বোঝা কোন অবস্থায় এবং কারণে জরুরি অবস্থা জারি হয়েছে, এবং ভারতের পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের

আলোচনায় তার তাৎপর্য কি? এখানে এক বড় প্রশ্ন উঠল— সরকারের সঙ্গে বিচার ব্যবস্থার সম্পর্ক। ইন্দিরা গান্ধীর স্তাবক বলল, এটা কেন হবে যে মাত্র একজন বিচারক ঠিক করবে দেশের নেতার ভাগ্য। আরো প্রশ্ন উঠল— ভারতের বর্তমান রাষ্ট্র কাঠামো সঠিক কিনা। আলোচনা শুরু হল, চরণ সিংকে চেয়ারম্যান করে এক উচ্চপর্যায়ের কমিটি হল, দেখতে যে পার্লামেন্টকে শক্তিশালী রাখার বদলে রাষ্ট্রপতিপ্রধান ধরনের সরকার গড়লে কেমন হয়। পার্লামেন্টও ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে গেল— যে যাই বলুক, ভালোমন্দ কিছুই কাগজে প্রকাশ হবে না, মানুষ জানবে না। সংবাদপত্রের ওপর জোরালো সেন্সরশিপ চাপল।

জরুরি অবস্থার দুটো বছর মোটামুটি শান্তই থাকল ভারতবর্ষ। অন্তত ওপরে ওপরে। এখানে ওখানে দু-একটা বিক্ষোভ হলেও ভয় এবং আতঙ্ক ছিল বড় কথা। অধ্যাপক কে এন রাজ বা মৃণাল চৌধুরীর মতো কেউ কেউ সেন্সর সত্ত্বেও তাদের জরুরি অবস্থা বিরোধী বক্তব্য ঘুরিয়ে বললেন। যেটা প্রশংসনীয়, প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিজীবীদের বিপুল সংখ্যাধিক্য সরকারি আনুকূল্যের সন্ধানে ভিড় করলেন না। তারা হয়ত খোলাখুলি প্রতিবাদ করবার মতো সাহস দেখাননি, কিন্তু সরকারি ২০ দফা কার্যক্রমের সাড়ম্বর প্রচারে বিন্দুমাত্র উৎসাহ দেখালেন না। ১৯৭৭ সালে ইন্দিরা নির্বাচন ডাকলেন এই ভেবে যে দেশ শান্ত, নিশ্চয়ই ২০ দফা কর্মসূচি এদের ভালো লেগেছে, এবং এখন বহু ভোট পেয়ে জিতে জরুরি অবস্থার প্রতি জনসমর্থন আদায় করতে পারবেন। তাহলে আর বিদেশে সমালোচনা হবে না।

নির্ধারিত সময়ের এক বছর পরে ষষ্ঠ সাধারণ নির্বাচন হল। দুই বছর সব শান্ত, কিন্তু নির্বাচন ঘোষণা হতেই মুহূর্তের মধ্যে সব কিছু পালটে গেল। ইন্দিরা এবং সঞ্জয়সহ কংগ্রেস ভীষণভাবে হারল, জনতা পার্টি জিতল। ইন্দিরাও দারুণ অবাক হলেন এই ফল দেখে। তিনি তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতায় নির্বাচনের পর বললেন, মানুষরা তো আমার দিকেই ছিল, কিন্তু বিরোধীরা ফিসফিস করে কি সব মিথ্যা প্রচার করল, মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে অবস্থা অন্যরকম হয়ে গেল। স্বৈরতন্ত্রের এটাই দুর্ভাগ্য—ওদের স্তাবকরা ওদের সত্য কথা বলে না।

১৯৭৭ সালের সঙ্গে এবার ১৯৬৭ সালের পার্টি ব্যবস্থাকে মিলিয়ে দেখুন। ১৯৬৭-তে মূল শিবির : কংগ্রেস, সোস্যাল ডেমোক্রাট, বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী। এই দশ বছরে সেই পার্টি বিন্যাস পুরো পালটে গেল। সোস্যাল ডেমোক্রাট, দক্ষিণপন্থী, কংগ্রেসের মধ্যে সিন্ডিকেট ও জগজীবন রামের সমর্থকরা এবং চন্দ্রশেখরের মতো কিছু তরুণ তুর্কীকে সঙ্গে নিয়ে জয়প্রকাশ ও তার গোষ্ঠী তৈরি করলেন জনতা পার্টি। এই পার্টির মূল শ্লোগান হল জরুরি অবস্থা ও স্বৈরতন্ত্রের বিরোধিতা। বামপন্থীরা এদের সমর্থন করল। কংগ্রেস যা রইল ভাঙতেই থাকল, এমনকি ইন্দিরার নেতৃত্ব নিয়েও প্রশ্ন তুলল। শেষ পর্যন্ত ইন্দিরা আলাদা দল তৈরি করলেন— ইন্দিরা কংগ্রেস। নানা ভাঙচুর, দলত্যাগ, ভাগাভাগির পর ১৯৬৭ পর্যন্ত যেভাবে পার্টিব্যবস্থা নিয়ে বিশ্লেষণ হতে পারত এখন সেটা হবার উপায় থাকল না।

১৯৬৭ সালে 'দল' বা 'পার্টি' যেভাবে নির্দিষ্ট করা যেত, সেইজন্য ১৯৭৭ সালে সেটা আর করা গেল না। জনতা পার্টি বিপুল সংখ্যাধিক্য নিয়ে জিতলেও প্রথম থেকেই প্রায় এ পার্টির মধ্যে একটা অস্বস্তির পরিবেশ তৈরি করে রেখেছিল জনসংঘ অনুগামীরা। নির্বাচনের আগে জনতা পার্টিতে যোগ দিলেও ওদের নিজেদের সংগঠন কিন্তু ভেঙে দেয়নি, আর এস এস এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও রেখেছে। আদবানি সাহেবও প্রচারমন্ত্রী হবার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে সংবাদপত্র জগতে জনসংঘের প্রচুর লোক ঢোকালেন। ওরা নতুন পার্টির সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে মিশে গেলেও সত্যি সত্যি মিশল না, এবং সরকারি যন্ত্র ব্যবহার করে আর এস এর প্রচার শুরু করল। তার ফলে ওদের আনুগত্য নিয়ে প্রশ্ন উঠল। এর সঙ্গে যোগ

হল ব্যক্তিগত উচ্চাশা। মোরারজি দেশাই প্রধানমন্ত্রী, কিন্তু চরণ সিং, জগজীবন রাম এই রকম অনেকে চান প্রধানমন্ত্রী হতে।

এই দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ নিলেন ইন্দিরা গান্ধী। সঞ্জয় গান্ধী গোপনে চরণ সিং-এর সঙ্গে দেখা করলেন, এবং জানালেন যে তিনি জনতা পার্টি ছেড়ে নিজের দল তৈরি করলে কংগ্রেস তাকে সমর্থন করবে। সেই উসকানি কাজে দিল। চরণ সিং জনতা পার্টিকে দুইভাগে ভাগ করে ফেললেন। জর্জ ফার্নান্ডেজ সংসদে মোরারজি সরকারের সমর্থনে এক দারুণ ওজস্বিনী বক্তৃতা দিলেন — কিন্তু তার পরদিনই সরকার ত্যাগ করে অন্য পক্ষে চলে গেলেন। মোরারজি দেশাইয়ের বদলে প্রধানমন্ত্রী হলেন চরণ সিং, ইন্দিরা কংগ্রেসের সমর্থনে। কিন্তু লোকসভা ডাকবার আগেই ইন্দিরা সেই সমর্থন প্রত্যাহার করে নিলেন — ওঁর কাজ হয়ে গিয়েছে, চরণ সিংকে আর দরকার নেই। বেচারা চরণ সিং লোকসভাই ডাকতে পারলেন না। এক রেকর্ড হল — একদিনও লোকসভায় না গিয়েও কয়েকমাস প্রধানমন্ত্রী থাকলেন।

১৯৮০ সালের সাধারণ নির্বাচনের আগে ইন্দিরা গান্ধী হঠাৎ সপরিবারে উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এইচ এন বহুগুণার বাড়িতে হাজির হলেন। অথচ এই বহুগুণাকেই জরুরি অবস্থার সময় ইন্দিরা গান্ধী জেলে রেখেছিলেন। যেটা আশচর্যের, বহুগুণা গলে গেলেন, ইন্দিরা কংগ্রেসে যোগ দিলেন, অন্যতম সাধারণ সম্পাদক হলেন এবং নির্বাচনে ভীষণভাবে প্রচার করলেন ইন্দিরার হয়ে। বহুগুণার মুসলিমদের মধ্যে বড় সমর্থন ছিল, জুম্মা মসজিদের ইমাম তাঁর বন্ধু ছিলেন। ইমাম ফতোয়া দিলেন ইন্দিরার পক্ষে। স্বভাবতই বহুগুণা ভাবলেন ইন্দিরা সরকারে কোনো সম্মানের আসন তিনি পাবেন। নির্বাচনে ইন্দিরা জিতলেন, কিন্তু বহুগুণাকে মন্ত্রী করলেন না, তাকে আর ডাকলেনও না। চরণ সিং-এর মতো বহুগুণারও প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছে ততদিনে।

ইন্দিরা গান্ধীর দ্বিতীয় দফা (১৯৮০-১৯৮৪)

এই ছিল ইন্দিরা গান্ধীর নিজস্ব স্টাইল। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত সরকারি ও পার্টিগত নিয়ন্ত্রণ। আনুগত্য ব্যক্তিগত, পার্টিগত নয়, প্রয়োজন হলে পার্টি বদল হবে। সংসদীয় গণতন্ত্র গড়ে উঠুক, সুস্থ কনভেনশন তৈরি হোক, সেটা কখনো ইন্দিরা গান্ধীর অভিপ্রেত ছিল না। এবারও ১৯৮০ সালে জিতেও শেষ পর্যন্ত মানুষের আস্থা রাখতে পারলেন না। ১৯৮৫ সালে অষ্টম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে তাঁর জিতবার কোনো উপায় ছিল না — সবাই সেটা জানতেন। এবং সেই জন্য পরবর্তী নির্বাচন ডাকবার সময় হয়ে এলেও সেরকম ব্যবস্থাপত্র তিনি করেননি। চেষ্টা করেছিলেন কোনো অজুহাতে নির্বাচন পিছিয়ে দেবার। ১৯৮৪ সালে তার হত্যাকাণ্ড দুর্ভাগ্যের, কিন্তু এই হত্যাকাণ্ড না হলে ১৯৮৪ সালে কংগ্রেসের পক্ষে নির্বাচনে জয়লাভ ছিল অসম্ভব।

যে পাঞ্জাবের ঘটনাবলির পরিণতি ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাকাণ্ডে এবং তার পরের ১৯৮৪ সালের শিখবিরোধী দাঙ্গার, সেখানেই ইন্দিরা গান্ধীর একটা বিশেষ স্টাইল আমরা লক্ষ্য করি। সে পাঞ্জাব হোক, কাশ্মীর হোক, আসাম হোক, চেষ্টা থেকেছে সাময়িক কোনো কৌশল অবলম্বন করে সমস্যাকে ধামাচাপা দেবার, যাতে তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্ব না যায়, যার ফলে সমস্যা তীব্রতর হয়েছে। পাঞ্জাবে সত্তরের দশকে মূল প্রশ্ন ছিল সেচের জলের। পাঞ্জাবের উন্নত, উদ্যোগী কৃষক ওই রাজ্যের সমস্ত নদীর জল পূর্ণ ব্যবহার করে 'সবুজ-বিপ্লব' সংঘটিত করেছে। এখন, এই দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে অন্য রাজ্যগুলোর কৃষকও সেচের জল চাইল— রাজস্থান, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ সর্বত্র। অতএব প্রশ্ন হল নদীর জল

কীভাবে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বণ্টন হবে। যখন সেই প্রশ্ন উঠল তখনই যদি দক্ষিণ ভারতের কোনো বিচারককে চেয়ারম্যান করে জলবণ্টনের জন্য একটা কমিশন করে দিতেন, তাহলে হয়তো জল এত ঘোলা হত না। কিন্তু সেটা না করে তিনি সমস্যাটা জিইয়ে রাখলেন। আর একটা প্রশ্ন ছিল চণ্ডীগড় নিয়ে, যা হরিয়ানা এবং পাঞ্জাব দুই রাজ্যের রাজধানী। সেখানেও সমাধান ছিল পাঞ্জাবের কিছু জমি হরিয়ানাকে দেওয়া এবং ওই রাজ্যের জন্য আলাদা রাজধানী তৈরি করে দেওয়া। আকালিদের তৃতীয় প্রশ্ন ছিল, রাজ্যগত ক্ষমতা নিয়ে, কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক নিয়ে। চতুর্থ প্রশ্ন ছিল ধর্ম সংক্রান্ত . যে শিখধর্মকে হিন্দুদের উপ ধর্ম বলা যাবে না। বাকি তিনটি প্রশ্নের সমাধান না করে ইন্দিরা ধর্মগত প্রশ্নটাই নাড়াচাড়া করতে শুরু করলেন। এবং আকালি দলকে জব্দ করবার জন্য কংগ্রেসের সঙ্গে একসময় যুক্ত সন্ত ভিনদ্রেনওয়ালাকে আকাশে তুলে দিলেন। সঙ্গে শুরু হল টেলিভিশনে রামায়ণ, মহাভারত, গ্রন্থসাহেব পাঠ এইসব।

যেখানে ইন্দিরার সাফল্য — ধর্মের প্রশ্নে ভিনদ্রেনওয়ালা আকালিদের ছাপিয়ে গেলেন। কিন্তু যেখানে ইন্দিরার ব্যর্থতা, একটা পর্যায়ের পর ভিনদ্রেনওয়ালা আর তাঁর নিয়ন্ত্রণে থাকলেন না। 'খালিস্তান'-এর শ্লোগান যুবসমাজের এক অংশের মধ্যে এক নিজস্ব গতি পেয়ে গেল। এল পাকিস্তানি অর্থসাহায্য। অন্য আকালি নেতারা কোণঠাসা হল, পবিত্র ধর্মস্থান অমৃতসর স্বর্ণমন্দির সন্ত্রাসবাদীদের নেতৃত্বে চলে গেল। সংগঠিত হল 'অপারেশন ব্লুস্টার', দেশের মধ্যে সৈন্য পাঠিয়ে ট্যাঙ্ক পাঠিয়ে চেষ্টা হল সন্ত্রাসবাদীদের রুখবার। ভিনদ্রেনওয়ালা মারা গেলেন, কিন্তু শিখমানসে এক বিরাট ক্ষত সৃষ্টি করল এই অভিযান। হয়তো ঠাণ্ডামাথায় ভাবলে, এই সমস্যার সমাধান অন্যভাবেই করা যেত। যদি ওই ধর্মস্থানে যাবার সমস্ত পথ পুলিশ ও সৈন্য আটকে রাখত কয়েকদিন খাদ্য পানীয় ইত্যাদি যাওয়া বন্ধ করত, এবং লাউড স্পিকারে বারবার আবেদন করত সাধারণ ধর্মার্থীদের ওই অঞ্চল থেকে চলে যেতে এবং হেলিকপ্টার থেকে যদি নিয়মিত আত্মসমর্পণের দাবি করে হাজার হাজার লিফলেট ছড়ানো হত, তাহলে একদিন না হলেও দু সপ্তাহ তিন সপ্তাহ অবরোধের পরই ওরা বাধ্য হত আত্মসমর্পণ করতে। এটা তো একদিনের মধ্যে জিতবার যুদ্ধ ছিল না বা বহিঃশত্রুর আক্রমণ ঠেকাবার ব্যাপারে ছিল না বা প্রতিহিংসা নেবারও নয়। হাতে সময় ছিল। ওই ভুলের বিরাট মাশুল আমাদের পরে দিতে হল।

কাশ্মীরেও একই স্টাইল। ফারুক আবদুল্লা বলছেন কাশ্মীর ভারতের অংশ এবং আমি ভারতের নাগরিক, যে কথা তাঁর বাবাও কখনো এত স্পষ্ট করে বলেননি। কাশ্মীর এক স্পর্শকাতর জায়গা, সেখানে ফারুকের এই স্পষ্ট আনুগত্যের পূর্ণ সুযোগ ভারত নিতে পারত। কিন্তু ইন্দিরা ফারুককে ক্ষমা করলেন না। ফারুকের কী অপরাধ? না, তিনি তাঁর পার্টি কাশ্মীর ন্যাশনাল কনফারেন্সকে কংগ্রেসের সঙ্গে মেশাবেন না। এখানে ইন্দিরার কাছে দেশের থেকেও পার্টির স্বার্থ বড় হয়ে উঠল। রাজীব গান্ধীকে পাঠানো হল টাকার থলি দিয়ে। রাজীব ফারুকের ভগ্নিপতিকে কিনলেন এবং রাজ্যপাল জগমোহনকে দিয়ে (যিনি এখন বিজেপির এম-পি) ফারুকের মন্ত্রিসভা ভেঙে দিলেন। ফারুকের বদলে তাঁর ভগ্নিপতি গোলাম মহম্মদ শাহ মুখ্যমন্ত্রী হলেন -- সাম্প্রদায়িক ও বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি তার আশ্রয়ে বাড়ল। দুই বছর পর আবার ইন্দিরা গান্ধী বাধ্য হলেন ফারুককে মুখ্যমন্ত্রী করতে, কিন্তু ততদিনে যা সর্বনাশ হবার হয়ে গিয়েছে। কাশ্মীরের মানুষ খেপে গিয়েছে যে দিল্লির সরকার কাশ্মীরে গণতন্ত্র চায় না, চায় তাঁবেদার প্রশাসন। কাশ্মীরের জনমানসের ওই বিদ্বেষের পূর্ণ সুযোগ নিল পাকিস্তানিরা।

কাশ্মীর ও পাঞ্জাবের পরবর্তী সময়ের বিশাল পর্বতপ্রমাণ সমস্যার বীজ ইন্দিরা

জমানায়। এবং সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িকতাবাদেরও বীজ বপন হয়েছে তখনই। নেহরু ছিলেন সত্যিকারের ধর্ম ও জাত নিরপেক্ষ। তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বের সময় কোন ধর্ম বা জাতের ভাববার সুযোগ ছিল না তিনি তাদের পক্ষে বা বিপক্ষে। ইন্দিরা গান্ধী ধর্মকে বিভিন্ন সময় ব্যবহার করেছেন তাঁর নিজস্ব এবং দলীয় স্বার্থে। টেলিভিশনে চালাও রামায়ণ মহাভারত থেকে নানা ধর্মকাহিনী শোনাবার প্রভাবও ক্ষতিকারক হয়েছে। গণতান্ত্রিক ধারা বা প্রতিষ্ঠান তিনি মানতেন না। দল ছিল তাঁর অস্ত্র, কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কংগ্রেস দলের ছিল না। অন্য রাজনৈতিক দল সম্বন্ধে ১৯৫৯ সালের কেরালা থেকে শুরু করে পরের ২৫ বছর, মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর কোনো সহনশীলতা ছিল না।

রাজীব জমানা (১৯৮৪-১৯৮৯)

পাঞ্জাবের সন্ত্রাসবাদীরা ইন্দিরাকে হত্যা করে তাঁর দলের এক মস্ত বড় উপকার করল। যে কংগ্রেস দলের নির্বাচনে জিতবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না, এবং যে নির্বাচন পিছিয়ে দেবার জন্য নানা অজুহাত শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তৈরি করেছিলেন সেই নির্বাচনেই ভীষণভাবে কংগ্রেস জিতল। এমন জয়লাভ কখনো কংগ্রেসের হয়নি।

বিরাট জয়লাভ, কিন্তু 'ডাল মে কুছ কালা' রয়ে গেল। 'কুছ' নয় অনেকখানি। দাঙ্গা করে ভোটের রাজনীতি ভারতে পরে বিজেপি বা শিবসেনা করেছে, কিন্তু প্রথম হবার কৃতিত্বটা রাজীব গান্ধীকেই দিতে হবে। ১৯৮৪ সালের সেই নৃশংস শিখবিরোধী দাঙ্গার পিছনে ছিল ইন্দিরা কংগ্রেস, বিশেষ করে দিল্লিতে যেখানে ৩০০০ শিখকে হত্যা করা হল। যারা দাঙ্গা করল তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হল না। যদিও হরিকৃষ্ণলাল ভগৎ, কুমার সজ্জন, জগদীশ টাইটলার এরাই যে দাঙ্গার নেতৃত্ব দিয়েছে সেই ব্যাপারে সন্দেহ নেই। সেই ট্রাজেডির ১৩ বছর ১৪ বছর পর এখন ওরা গ্রেপ্তার হচ্ছে, জেলে যাচ্ছে। এই দায়িত্ব রাজীব গান্ধী এড়াতে পারেন না।

তারপর দাঙ্গা সত্ত্বেও তিনদিন সৈন্য বাহিনী রাস্তায় নামালেন না। টেলিভিশনে নতুন প্রধানমন্ত্রী কোনো আবেদন করলেন না দাঙ্গা থামাতে। যদি তিনি টেলিভিশনে বলতেন, আমার মায়ের খুনীরা শাস্তি পাবে, কিন্তু কোনো সম্প্রদায়কে এই খুনের জন্য দায়ী করবেন না, তাহলেও হয়তো দাঙ্গা বন্ধ হত। এই দাঙ্গার কয়েক সপ্তাহ পরে যখন ইন্দিরা গান্ধীর জন্মদিনে প্রথম বড় জনসভা করলেন রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে, তখন দাঙ্গার জন্য দুঃখ তো চাইলেনই না বরং সাফাই গেয়ে বললেন, "একটা বড় গাছ উপড়ে পড়লে মাটি তো কাঁপবেই।"

তবু, এই দাঙ্গা সত্ত্বেও কতকগুলো ভালো কাজ রাজীব গান্ধী তার প্রধানমন্ত্রিত্বের প্রথম বছর করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত টানলেন না। টানা প্রায় দুই দশক ম্যাকিয়াভেলিয়ান রাজনীতির পর মানুষ খুশি হয়েছিল যখন রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ এক নতুন মুখ প্রধানমন্ত্রী হল, বলল আধুনিক ভারতের কথা, পরিবেশ দূষণের কথা, একবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছবার কথা, আরো নানা আশার কথা। আরো খুশি হল যখন পাঞ্জাব নিয়ে সন্ত লঙ্গওয়ালের সঙ্গে চুক্তি হল — বললেন দাঙ্গার হত্যাকারীদের বিচার হবে, চণ্ডীগড় পাঞ্জাব পাবে, ইত্যাদি। আরো আরো খুশি হল যখন প্রধানমন্ত্রী বললেন 'ক্ষমতার দালাল'দের উৎপাটিত করবেন কংগ্রেস থেকে, দলের নির্বাচন করবেন।

এই একটা প্রতিশ্রুতিও তিনি রাখলেন না। লঙ্গওয়াল চুক্তি হয়ে দাঁড়াল ছেঁড়া কাগজের টুকরো। পার্টির আভ্যন্তরীণ নির্বাচন হল না। ক্ষমতার দালালরা তাঁকে দখল করল — যার পরিণতি বফর্স।

এই আলোচনার সঙ্গে যেটা প্রাসঙ্গিক, রাজীব গান্ধী দলছুট বিরোধী আইন পাশ করলেন। উদ্দেশ্যটা ছিল তার বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা রক্ষা করা। শুধু আইন যে হল সেটা ভালো। কিন্তু পরে দেখা গেল এই আইনে একশো ছিদ্র। এক তৃতীয়াংশ সদস্য নিয়ে দল ছাড়লে সেই দলত্যাগ আইনত বৈধ এবং সেইজন্য এম পির পদ ত্যাগ করতে হবে না। স্পিকারকে হাতে রাখলে ওই দলত্যাগ একদিনে না হয়ে একটু একটু করে দীর্ঘদিন ধরে হতে পারে, যতক্ষণ না ঠিক সংখ্যা পাওয়া যাচ্ছে। অথচ, একটা ছোট্ট সংশোধনী দিয়েই এই সমস্যার সমাধান করা যেত — দল ছাড়লেই পদ ছেড়ে আবার নির্বাচনে দাঁড়াতে হবে। এই প্রস্তাব বামপন্থীরা দিয়েছে, কিন্তু তার পক্ষে অন্য দলগুলো থেকে বিশেষ সাড়া পাওয়া গেল না।

তবে রাজীব গান্ধীর পাঁচ বছরে দলছুট সমস্যা ছিল না। তার সংখ্যাধিক্য ছিল বিপুল, তার এক-তৃতীয়াংশ ভেঙে অন্য দলে যাওয়া সম্ভব ছিল না। অন্য দলও কিন্তু ভাঙেনি। এক বড় প্রশ্ন ছিল রাজনৈতিক দলগুলোর তহবিল। স্বাধীনতার আগে কংগ্রেসের মূল টাকার উৎস ছিল বিড়লারা। স্বাধীনতার পর শিল্প ও কেন্দ্রের বাণিজ্যমন্ত্রীদের দায়িত্ব ছিল শিল্পপতিদের কাছ থেকে লাইসেন্স ও পারমিটের বদলে টাকা সংগ্রহ। যে কারণে তখন বলা হত 'লাইসেন্স-পারমিট রাজ'-এর কথা। এল, এন মিশ্রর মৃত্যুর সঙ্গে জড়িয়ে ছিল কোম্পানিগুলো থেকে কালো টাকা সংগ্রহের প্রশ্ন। আশির দশকে ডিফেন্স মন্ত্রক-এর কমিশনই বড় হয়ে উঠল। দেশের শিল্পপতিদের দেয়া টাকার তুলনায় প্লেন, সাবমেরিন, বফর্সের কামান এই সবই হয়ে উঠল বড়। পৃথিবীর যেখানে যেখানে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র আছে সেখানেই এই ধরনের পার্টিকে টাকা দেওয়া নিয়ে নানা আলোচনা বা বিতর্ক হয়। সাম্প্রতিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্লিন্টনের নির্বাচনের সময় পূর্ব এশিয়ার শিল্পপতিদের কাছ থেকে টাকা নেবার কথা উঠেছে। ভারতেরও রাজীবের আমলে বফর্স এক বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াল। এখানে সেই আলোচনায় যাব না, শুধু বলব যে গণতন্ত্রের সুষ্ঠু ব্যবস্থার সঙ্গে কোন পার্টি কিভাবে টাকা সংগ্রহ করে সেই প্রশ্নও জড়িত।

রাজীব আমলের আর এক বড় ঘটনা, বড় মাপের সাম্প্রদায়িকতার সূত্রপাত। নেহরুর ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন আসে না। ইন্দিরা নানা সময় নানাভাবে ধর্মকে ব্যবহার করেছেন। তিনি মন্দিরে মন্দিরে ঘুরেছেন, জুম্মা মসজিদের ইমামের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছেন নির্বাচনের আগে। রাজীব জমানার প্রথম বছর মনে হয়েছিল, শিখবিরোধী দাঙ্গা বাদ দিলে, আর যাই হোক তিনি আধুনিক এবং ধর্মের প্রশ্নে তার মাতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন। কিন্তু পরে হয়তো ক্ষমতার দালালদের খপ্পরে পড়ে, তিনি ধর্মকে ব্যবহার করতে শুরু করলেন। ১৯৮৯ সালের নির্বাচনের আগে রামমন্দির নিয়ে অযোধ্যায় শিলান্যাসের ব্যবস্থা করতে দিলেন বিজেপিকে, এবং মাচান-বাবার লাথি আশীর্বাদ গ্রহণ করলেন।

ধর্ম নিয়ে রাজীব গান্ধীর দুটি বিশেষ ভুল বা অন্যায়ের বিরাট মাশুল পরবর্তীকালে আমরা দিয়েছি। এক, সাহবানু মামলা নিয়ে। কোর্ট যখন রায় দিল, হিন্দু হও মুসলমান হও পরিত্যক্ত বউদের খোরপোশ স্বামীদের দিতে হবে, তখন দুই ধরনের প্রতিক্রিয়া ভারতের মুসলিমদের মধ্যে হল। ওই সম্প্রদায়ের মৌলবাদী অংশ চাইল কোর্টের এই বিধানকে বাতিল করে আইন পাস করা হোক। অন্যদিকে, বহু প্রগতিশীল মুসলমান, বিশেষ করে অল্পবয়স্ক মহিলারা, রাস্তায় নামল কোর্টের এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে। সরকার যদি কিছু না করে বসে থাকতেন, তাহলে হয়তো এক শতাব্দীরও বেশি আগে হিন্দুদের মধ্যে রামমোহন বা বিদ্যাসাগর যে সংস্কারের বাতাবরণ তৈরি করেছিলেন সেই রকম ভারতের মুসলমানদের মধ্যে হত এবং মৌলবাদীরা কোণঠাসা হত। রাজীব তা হতে দিলেন না এবং মোল্লা

মৌলভীদের চাপে কোর্টের সিদ্ধান্ত বাতিল করে দিলেন নতুন আইন করে। একটা বড় সামাজিক সংস্কারের সুযোগ চলে গেল যা গণতন্ত্রকে সমৃদ্ধ করতে পারতো।

দ্বিতীয় ভুল বা অন্যায় হল বাবরি মসজিদের দরজা খুলে দেওয়া। স্বাধীনতার ঠিক আগে এই দাবি ওঠে যে এই মসজিদ নাকি রামের জন্মভূমির ওপর তৈরি এবং রাতারাতি ওই মসজিদের দরজা ভেঙে এক অংশে রামের পূজাও শুরু হয়ে যায়। ব্যাপারটা কোর্টে যায় এবং তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেলের হস্তক্ষেপে এই মন্দির-মসজিদের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয় ১৯৪৮ সালে। তারপর প্রায় চল্লিশ বছর চলে যায় এবং মানুষ ভুলে যায় এই বিতর্কের কথা। সম্ভবত সাহবানু মামলার বিতর্ক এড়াতে, এবং সাম্প্রদায়িক হিন্দুদের খুশি করতে, হঠাৎ একদিন কোর্টের আদেশে ওই মসজিদের মন্দির অংশটা খুলবার সিদ্ধান্ত হল এবং টেলিভিসনে দেখানো হল ঢাক-ঢোল পিটিয়ে উদ্দাম নৃত্য করে ওই মন্দির অধিগ্রহণ হল। সবটাই পূর্বপরিকল্পিত --- টিভি. পুরোহিত সবাই জানতো কোর্ট কী বলবে। তার পরের ঘটনা তো ইতিহাস — ১৯৯২ সালে যে সাম্প্রদায়িকতার আগুন সমস্ত ভারতবর্ষে জ্বললো তার সূত্র সেইখানে।

রাজীব গান্ধী নিজে খুব ধার্মিক ছিলেন বা জাতপাতে বিশ্বাস করতেন এমন নয়। মনের দিক থেকে আধুনিকই ছিলেন। কিন্তু দেরি করে রাজনীতিতে এসে রাজনীতির খারাপ দিকগুলো মনের মধ্যে ঢোকাতে বেশি সময় নিলেন না। তাই যেমন ধর্ম নিয়ে খেলা করলেন, তেমনই পুরোপুরি সুবিধাবাদী কারণে ঝাড়খণ্ডি, এল টি টি ই, ঘিসিং, টি এন ভি এদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখলেন। এই ব্যাপারে বিশেষ করে দুটি ভুল বা অন্যায় তিনি করলেন — ত্রিপুরা এবং তামিলনাড়ুতে।

ত্রিপুরায় তখন বামপন্থী সরকার। এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী সি আই এ সমর্থিত টি এন ভি বাংলাদেশ আশ্রয় করে হানা দিচ্ছে এবং নানা খুনজখম করে উপজাতি-বাঙালি দাঙ্গা করাবার চেষ্টা চালাচ্ছে। ১৯৮৭ সালের সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর মাসে মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যস্থতায় তিনি টি এন ভির সঙ্গে একটা চুক্তি করেন, যার মূল কথা : ১৯৮৮ সালের রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনে বামফ্রন্টকে হটাবার পর ওই বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনকে বৈধ ঘোষণা করা হবে এবং ওই সংগঠনের সভ্যদের চাকরি ইত্যাদি দেওয়া হবে। এই চুক্তির কথা কেউ জানল না। তার কয়েক মাস পর যখন ত্রিপুরার নির্বাচন হচ্ছে তখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সন্তোষমোহন দেবকে পাঠানো হল, যাতে রাজ্যের প্রশাসনকে তিনি প্রভাবিত করতে পারেন। ঠিক তার পরই হঠাৎ টিন এন ভির কার্যকলাপ বেড়ে গেল, দিনে দশজন বারোজন বাঙালি খুন হতে শুরু করল। বাঙালিদের মধ্যে এক বিভীষিকা সৃষ্টি করা হল। নির্বাচন দুই তিন দিন আগে রাজীব গান্ধী ত্রিপুরায় এলেন, বাঙালিদের বললেন যে মার্কসবাদীদের সঙ্গে টি এন ভির যোগসাজশ আছে বলে ত্রিপুরার সরকার বাঙালিদের রক্ষা করছে না। কিন্তু তিনি করবেন, সৈন্য পাঠাবেন। চটজলদি বিশাল ফৌজ নামানো হল, নাটকীয়ভাবে টি এন ভির হত্যাকাণ্ড বন্ধ হয়ে গেল। কৃতজ্ঞ বাঙালিদের এক বড় অংশ কংগ্রেসকে ভোট দিয়ে সেই নির্বাচনে বামফ্রন্টকে হারিয়ে দিল। নির্বাচনের পর প্রাক্ নির্বাচন চুক্তি অনুযায়ী টি এন ভি বৈধ বলে ঘোষণা করা হল। এই নারকীয় ষড়যন্ত্র রাজীব গান্ধীর।

সর্বশেষ তামিলনাড়ু ও এল টি টি ই। শ্রীলঙ্কার সরকারের সঙ্গে ওখানকার তামিল সংখ্যালঘুদের বিবাদ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, তথা, সংস্কৃতি এবং অন্যান্য বহু বিষয় নিয়ে। এবং এটাও ঠিক যে ওখানকার মৌলবাদী বৌদ্ধ সংখ্যাধিক্য চেষ্টা করেছে তামিল সংস্কৃতি ও ভাষাকে দাবিয়ে রাখতে। এই ব্যাপারে ভারতীয়দের মনে শ্রীলঙ্কার তামিলদের সম্পর্কে সহানুভূতি থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু ভারতীয় দলগুলোর বক্তব্য ছিল, এই সংখ্যালঘু সমস্যার

সমাধান শ্রীলঙ্কার সংবিধানের চৌহদ্দির মধ্যেই খুঁজতে হবে, নতুন একটা দেশ তৈরি করে নয়।

সত্তর দশকের শেষে এল টি টি ই বা লিবারেশন টাইগার অব তামিল ইলম তৈরি হল। সংক্ষেপে 'টাইগার'। ওদের দাবি হল 'ইলম' বা শ্রীলঙ্কার তামিল-অধ্যুষিত উত্তর অঞ্চলের পূর্ণ স্বাধীনতা। ১৯৮০ সালে প্রধানমন্ত্রী হয়ে ফিরে আসবার পর ইন্দিরা টাইগাদের অস্ত্র ট্রেনিং, খাদ্য, পরিবহন, বেতারযন্ত্র, টাকা সব দিলেন। তখন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম জি রামচন্দ্রন, কংগ্রেসের সহযোগী এ ডি এম কের নেতা, এবং রামচন্দ্রনের মাধ্যমে দৈনন্দিন যোগাযোগ রাখা হল টাইগারদের সঙ্গে। এল টি টি ও তাদের রাজ্যগত রাজনৈতিক সমর্থন পৌঁছে দিল কংগ্রেস ও রামচন্দ্রনকে।

প্রধানমন্ত্রী হবার পর রাজীব গান্ধীও সেই নীতি অনুসরণ করলেন। টাইগারদের সর্বাধিনায়ক প্রভাকরণ হয়ে উঠল তার বন্ধু। যেটা জৈন কমিশনের রিপোর্ট থেকে জানি, এই সময়টা তামিলনাড়ুতে ছিল বিশৃঙ্খলার, আইনহীনতার। টাইগাররা কারোকে মানতো না, রিভলভার নিয়ে তামিলনাড়ুর সর্বত্র ঘুরে বেড়াতো, পুলিশ দেখেও দেখল না। জৈন কমিশনের মনে, এই আইনহীনতা, ভেঙে পড়া প্রশাসনিক শৃঙ্খলাই ১৯৯১ সালে রাজীব মৃত্যুর এক বড় কারণ।

পরে শ্রীলঙ্কা সরকার ও টাইগারদের সম্মতিতে ভারতীয় শান্তিবাহিনী শ্রীলঙ্কায় গেল — কিন্তু, যে কারণেই হোক, এই বাহিনী শেষ পর্যন্ত দুই বিবদমান পক্ষকেই চটিয়ে দিল এবং দুই পক্ষই ঐক্যবদ্ধ হল ভারতীয় শান্তি বাহিনীর বিরুদ্ধে, ওই বাহিনীকে ফিরে আসতে হল। শ্রীলঙ্কার এক নৌ-সৈনিক, এক জাহাজ পরিদর্শনের সময় রাজীব গান্ধীকে আক্রমণ করল। ওই কারণে, এবং শেষ পর্যন্ত এল টি টি ই-র হাতে রাজীবের মৃত্যুর কারণও এই শান্তিবাহিনী। ১৯৮৯ থেকে দুই বছর রামচন্দ্রনকে সরিয়ে করুণানিধির নেতৃত্বে ডি এম কে সরকার চলেছিল। কিন্তু ১৯৯১ সালের প্রথম থেকে তাকে সরিয়ে কেন্দ্রীয় শাসন চালু করলেন রাজীব ও কংগ্রেস-সমর্থিত প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখর। রাজীব মৃত্যুর আগের পাঁচ মাস ধরে কেন্দ্রীয় শাসনের বকলমে রাজীবের শাসনই চলছিল যে সময় তখন তার আততায়ীরা শ্রীলঙ্কায় যথেচ্ছ ঘুরে বেড়িয়েছে। জৈন কমিশন রিপোর্ট থেকে আমরা এটাও জানি যে তার মৃত্যুর দুই মাস আগে, মাত্র দশদিনের মধ্যে দুইবার রাজীব তার নিজের ১০ নম্বর জনপথের বাড়িতে এল টি টি ই নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন। সেই দুই সভায় কী আলোচনা হয়েছিল জানা নেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজীব গান্ধীর মর্মান্তিক মৃত্যুর কারণ হল এই টাইগাররা।

দ্বিতীয় জনতা সরকার (১৯৮৯-১৯৯১)

১৯৮৯ সালের নবম সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস পরাজিত হল, তৈরি হল ভি পি সিং-এর নেতৃত্বে জনতা দলের সরকার, বামপন্থী ও বিজেপির সমর্থনে। সরকার চলছিল ভালোই, এবং প্রসারভারতী, লোকপাল, নির্বাচনী সংস্কার, পঞ্চায়েত ইত্যাদি নিয়ে নানা আইনও পাস করল বা করতে সচেষ্ট ছিল। কিন্তু এবারও ১৯৭৭-৭৯ সালের জনতা পার্টিতে চিরন্তন ব্যাধির আক্রমণ হল। এবার চরণ সিং এবং জগজীবন রামের জায়গায় প্রধানমন্ত্রিত্বের দাবিদার হলেন চন্দ্রশেখর ও দেবীলাল। হরিয়ানার নেতা দেবীলালের ছেলে ওমপ্রকাশ চৌথালাকে নিয়েই গণ্ডগোল শুরু, যার ফলে দেবীলাল অন্যদিকে চলে গেলেন। অন্যদিকে ভি পি সিং মণ্ডল কমিশনের অনুন্নতদের জন্য আসন সংরক্ষণের দাবি সম্পর্কিত রিপোর্ট কার্যকরী করার চেষ্টা করলেন বলে বিজেপিও রুষ্ট হল। এর মধ্যে শুরু হল

ইটপুজো — দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পুজো করে ইট পাঠানো হল রামমন্দির নির্মাণের জন্য। আদবানি তার রথ নিয়ে ভারত পরিক্রমায় নামলেন, এবং গ্রেপ্তার হলেন বিহারের লালুপ্রসাদের মুখ্যমন্ত্রিত্বের জমানায়।

ভি পি সিং-এর সরকার বিজেপি এবং বামপন্থী সমর্থন ছাড়া চলতে পারে না। এখন বিজেপি সমর্থন তুলে নিল, পরবর্তী কালের বিজেপি নেতা এবং তৎকালীন জনতা নেতা যশোবন্ত সিনহার ব্যবস্থাপনায় জনতা দল ভাঙা হল — চন্দ্রশেখর ও দেবীলালের অনুগামীরা বেরিয়ে গেল জনতা দল থেকে। কংগ্রেস ও বিজেপি একসঙ্গে ভোট দিল ভি পি সিং সরকারের বিরুদ্ধে। চন্দ্রশেখর প্রধানমন্ত্রী হলেন, তার সারা জীবনের শখ মিটল রাজীব গান্ধীর সমর্থনে। কয়েক মাস পর রাজীব গান্ধী সেই সমর্থন তুলে নিলেন, যেমন সঞ্জয় ও ইন্দিরা চরণ সিং-এর প্রতি সমর্থন তুলে নিয়েছিলেন। এবার অজুহাত হল — হরিয়ানার দুই পুলিশ কনস্টেবল কেন রাজীব গান্ধীর বাড়ির ওপর নজর রাখবে?

রাজীব গান্ধীর জমানায় কংগ্রেস আরো বেশি পারিবারিক প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়াল। ব্যক্তিগত আনুগত্যই হয়ে দাঁড়াল বড়। প্রণব মুখার্জিকে কংগ্রেস থেকে সরানো হল যেহেতু ইন্দিরার মৃত্যুর পর তিনি স্বভাবসিদ্ধ মৃদুভাবে প্রধানমন্ত্রীর পদে তার দাবির কথা জানিয়েছিলেন। ফলে নির্বাচন হল না। ক্ষমতার দালালরা যেখানে ছিলেন সেখানেই থাকলেন। 'ম্যানিপুলেশন' জায়গা নিল রাষ্ট্র নেতৃত্বের। জাত, ধর্ম, বর্ণ সমস্ত কিছু কাজে লাগানো হল ভোটের স্বার্থে। এমনকি ভি পি সিং-কে বদনাম দেবার জন্য ওয়েস্ট ইন্ডিজের সেইন্ট কীটস দ্বীপে তাঁর ছেলের নামে জাল অ্যাকাউন্ট খোলা হল, এবং তৎকালীন বিদেশমন্ত্রী নরসীমা রাও-এর সহায়তায়, প্রশাসনকে ব্যবহার করে। ভি পির ছেলের পাশপোর্টের আবেদনের ফর্ম সংগ্রহ করে চন্দ্রস্বামী তার সই জাল করল।

হাওয়ালার যুগ (১৯৯১-১৯৯৬)

১৯৯১-৯৬ সালে, এই পাঁচটা বছর, যেটা আগেই বলেছি, ভারতীয় রাজনীতির অন্ধকারতম দিন। হাওয়ালার যুগ। কিন্তু সেই আলোচনা এই প্রবন্ধে প্রাসঙ্গিক নয় — যদিও একটা সম্পর্ক আছে। রাও এর সমর্থকরা দাবি করেন যে এই ঘোটালার টাকা সংগৃহীত হয়েছিল পার্টির নানা প্রয়োজনে। তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে নয়। এখন আমরা জানছি যে বফর্সের টাকার একটা অংশ হাওয়ালার বাজারে পৌঁছেছিল এবং সেই টাকার একটা অংশ কাশ্মীরের সন্ত্রাসবাদীরাও পেয়েছিল। স্বভাবতই ওই টাকার উৎসের সঙ্গে গণতন্ত্র থাকা না থাকার একটা সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু এই নিয়ে ভালো করে লিখতে হলে আরো একটা বড় প্রবন্ধের দরকার — যা আমি ইতিমধ্যেই অন্যত্র লিখেছি।

কিন্তু এই পাচ বছরে কংগ্রেসের দলের মধ্যে আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র ফিরে এল না। অবশ্য একটা পরিবর্তন হল — নেহরু পরিবারের বাইরের একজন প্রধানমন্ত্রী হলেন, এবং পরিবারতন্ত্র খানিকটা দুর্বল হল। পরিবারতন্ত্র একেবারে চলে গেল না, রাও-বিরোধীরা তাদের বিরোধিতার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে প্রায়ই চেষ্টা করল রাজীব গান্ধীর বিধবা সোনিয়া গান্ধীকে তুলে ধরতে। নরসীমা রাও তাঁর দিকে থেকেও অনেক সময় চেষ্টা করতেন আপসের। কিন্তু সম্পর্ক তিক্ত হয়ে গেল যখন সোনিয়ার ধারণা হল যে নরসীমা রাও রাজীব হত্যা তদন্ত নিয়ে গড়িমসি করছেন। অন্যদিকে, পার্টির মধ্যে সোনিয়া পন্থীরা বেশি গণ্ডগোল করলে নরসীমা রাও তিনটি উপায়ে তাদের নিয়ন্ত্রণ করবার চেষ্টা করলেন। এক, সুরিন্দর আলুওয়ালিয়া, সুরেশ পাটোয়ারির মতো সোনিয়াপন্থীদের মুখ বন্ধ হল মন্ত্রী করে। দুই, পার্টি থেকে বিতাড়িত করে — যেমন অর্জুন সিং, তেওয়ারীকে। তিন, মাঝে মাঝে

বফর্সের ভূত দেখিয়ে। ১৯৯৪ সালের শেষে সংসদে পার্টি নেতাদের মিটিং ডেকে বললেন, ১৯৯৫ সালের এপ্রিল-মে নাগাদ বফর্সের কাগজপত্র ভারত সরকারের হাতে এসে যাবে। সবাই অবাক হলেন, হঠাৎ নিজের থেকে রাও এইসব বললেন কেন। সোনিয়াপন্থীরা একটু চুপ মেরে গেলেন তখনকার মতো। কিন্তু সোনিয়া বনাম রাও ঠান্ডাযুদ্ধ চলল।

রাও জমানার সবচেয়ে বড় এবং দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংস এবং তার পরের দাঙ্গা। রাও সরকার চাইলে এই ভয়ঙ্কর ঘটনা এড়ানো যেত। উত্তরপ্রদেশের বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিং যাই বলুন, সবাই জানতো যে করসেবকরা অযোধ্যায় যাচ্ছে একটাই উদ্দেশ্যে - এই মসজিদ ধ্বংস করবার জন্য। কিন্তু তবু মানুষ আসা বন্ধ করা হল না, দাঙ্গা-নিবারক সেনাবাহিনীকে তাদের শিবির থেকে বের করে ওই সৌধ পাহারার কোনো ব্যবস্থা করা হল না। বহুক্ষণ সময় ধরে এই মসজিদ ধ্বংসের উন্মত্ত লীলা চলল, তবু সেটা ঠেকাবার জন্য বিন্দুমাত্র উদ্যোগ কেন্দ্র নিল না। সেই ধ্বংসস্তূপে যখন রামের মন্দির বসানো হল তখনও রাও সরকার ঘুমিয়ে। এই ধ্বংসের দিন টেলিভিশনের মারফত প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিলেন ঠিক ওইখানেই সরকার মসজিদ বানিয়ে দেবে— সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হল না।

অথচ ওই ভয়ানক দিনটার মাত্র কয়েকদিন আগে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের সভায় প্রধানমন্ত্রী যখন মুখ্যমন্ত্রীদের নিয়ে বসেছিলেন, তখন বিজেপি মুখ্যমন্ত্রীরা ছাড়া বাকি সমস্ত মুখ্যমন্ত্রী লিখিতভাবে প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে ওই সৌধ রক্ষার জন্য যে কোনো ব্যবস্থা রাও সরকার নিতে পারেন এবং বিজেপি ছাড়া অন্য সমস্ত দল তাকে সমর্থন করবে। এবং যদিও বামপন্থীরা ৩৫৬ ধারার বিরোধী, তারা জানালেন যে ওই ৫০০ বছরের পুরনো সৌধকে রক্ষা করবার জন্য যদি ৩৫৬ ধারা জারি করে উত্তরপ্রদেশ থেকে বিজেপি সরকারকে উৎখাত করা হয়, তারা আপত্তি করবেন না। অথচ এই বিশাল ও ব্যাপক রাজনৈতিক সমর্থনের কোনো ব্যবহার তিনি করলেন না। স্বভাবতই মূল অপরাধী বিজেপি, শিবসেনা ও অন্যান্য সাম্প্রদায়িক শক্তি — কিন্তু তৎকালীন কংগ্রেস সরকার এই ঘটনার দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারে না।

গত দেড় বছরের যুক্তফ্রন্ট সরকার :

রাও-জমানা পরবর্তী যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রায় দুই বছর বিস্তারিত বলবার প্রয়োজন নেই, যেহেতু এই স্মৃতি এখনও পাঠকের মধ্যে টাটকা, তবু মূল বিশেষত্বগুলি তুলে ধরছি — যার প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে ভারতে গণতন্ত্র প্রসারের প্রশ্নে।

এক, একদলীয় শাসন বনাম কোয়ালিশনের প্রশ্ন। ১৯৭৭-৭৯ এবং ১৯৮৯-৯১ সালের জনতা নেতৃত্বে গঠিত কোয়ালিশন সরকার পুরো পাঁচ বছর কাজ করতে পারেনি। অতএব অনেকে বলছেন কোয়ালিশন নয় একদলীয় শাসন স্থায়ী হবার সুযোগ বেশি। এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে দুইটি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। প্রথমত, ভারতের মধ্যে সবচেয়ে যে স্থায়ী সরকার, যা ২১ বছর চলছে, সেটা কোয়ালিশন — পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার। দ্বিতীয়ত, পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র যে দেশগুলোতে চলে তার বিপুল সংখ্যাধিক্যতেই কোয়ালিশন সরকার। ব্রিটেনের মতো দুই একটা দৃষ্টান্ত বাদ দিলে ইউরোপে বহুদলীয় সরকারই নিয়ম। ওখানে যদি চলে, পশ্চিমবঙ্গে যদি এতো ভালো চলে, তাহলে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারে কেন নয়?

যদি এই দুই দফায় কোয়ালিশন সরকার না চলে থাকে তার কারণ খুঁজতে হবে। পশ্চিমবঙ্গেও প্রথম দুই দফায় — ১৯৬৭-তে এবং ১৯৬৯ এ কোয়ালিশন বেশিদিন চলতে

পারেনি, তারপর স্থায়ী হয়েছে। এবারের কেন্দ্রের যুক্তফ্রন্ট সরকার আগের দুইবারের মতো ভিতর থেকে ভাঙেনি, ভেঙেছে বাইরে থেকে কংগ্রেস সমর্থন চলে গিয়েছে বলে। এবার কারোকে চরণ সিং বা চন্দ্রশেখর বানানো যায়নি, যদিও চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। ১৯৯৬ সালে যে যুক্তফ্রন্ট তৈরি হয়েছিল নির্বাচনের 'পর', এবার, ১৯৯৮ সালের নির্বাচনের 'আগে' এই ফ্রন্ট মোটামুটি ঐক্যবদ্ধ।

এরপর সবচেয়ে বড় কথা এবারের নির্বাচনে কোনো দলই একা দাঁড়াচ্ছে না। এবার তিনটে ফ্রন্টের লড়াই হচ্ছে, অতএব একদলীয় বনাম কোয়ালিশন এই প্রশ্ন উঠছেই না। বরং যারাই জিতুন কোয়ালিশন সরকার হচ্ছে। যদি যুক্তফ্রন্টে থাকে ১৩টা দল, এবারের বিজেপির ফ্রন্টে ৮টা দল। কংগ্রেসও ফ্রন্ট করতে চাইছে, কিন্তু শরিক পাচ্ছে না। কেউ কংগ্রেসের সঙ্গে যেতে চায় না, তবু লালু, অজিত সিং, ঝাড়খণ্ড, বঙ্গারাপ্পা — এইসব নিয়ে এরাও ৭-৮টা দলে একটা কোয়ালিশন খাড়া করবার চেষ্টা করছে।

এবারের লড়াইয়ে তাই কেউ বলছে না যে 'একদল প্রধান' পার্টি ব্যবস্থায় ফিরে যেতে। প্রশ্ন উঠছে কোন কোয়ালিশন বেশি পাকাপোক্ত হবে। যুক্তফ্রন্ট বলতে পারে যে তাদের কোয়ালিশন গত দেড় বছরে দুইবার কংগ্রেস সমর্থন প্রত্যাহারের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এসেছে। এই দুইবারই চেষ্টা হয়েছে যুক্তফ্রন্টের কোনো না কোনো শরিককে তাদের দলে আনবার — কংগ্রেস এবং বিজেপি দুই শত্রু চেষ্টা কম করেনি, তবু পারেনি।

অন্যদিকে, বিজেপি নেতৃত্ব তৈরি ফ্রন্টের সদস্য পার্টির কিন্তু এখনই কেউ কেউ গেয়ে রাখছে যে নির্বাচনের পর তারা বিজেপি সরকার সমর্থন করবেনই এমন কোন গ্যারান্টি ওরা দেবে না। সমতা পার্টি বলছে কাশ্মীর নিয়ে, ৩৭০ ধারা, অভিন্ন দেওয়ানী বিধি, অযোধ্যায় রামমন্দির এই সমস্ত ব্যাপারেই এদের আলাদা মত। আকালি দল প্রধানমন্ত্রী গুজরালকে জলন্ধর আসনে সমর্থন করে বুঝিয়ে দিয়েছে যে আর একটা বিকল্প ওরা খুলে রাখছে, পুরোপুরি বিজেপির হাতে তামাক ওরা খাবে না। এমনকি শিবসেনা, যাদের সঙ্গে বিজেপির নীতিগত মিল সবচেয়ে বেশি, তারাও বলছে যে অযোধ্যায় বাবরি মসজিদের ধ্বংসস্তূপ না করে জাতীয় স্মারক সৌধ করা হোক। অন্ধ্রে লক্ষ্মী পার্বতী, কর্ণাটকে রামকৃষ্ণ হেগড়ে, হরিয়ানায় বংশীলাল, ওড়িশার নবীন পট্টনায়ক এবং পশ্চিমবঙ্গের বিজেপির সঙ্গে যেহেতু তৃণমূল-কংগ্রেস বা যুক্তফ্রন্ট ওদের নেবে না। জয়ললিতাকে যুক্তফ্রন্ট নিল না, কংগ্রেস চেয়েছিল কিন্তু বিজেপি ছিনিয়ে নিয়েছে। এদের কারো সঙ্গেই বিজেপির কোনো তত্ত্বগত মিল নেই, এবং কোনো শক্ত বন্ধনও নেই। সহযোগীরা দাবি করেছিল এক ন্যূনতম কার্যসূচির, কিন্তু বিজেপিও রাজি নয়, এবং প্রকাশ্যেই বলছে যে এটা পুরোপুরি নির্বাচনী সমঝোতা, তার বাইরে কিছু না। কাজেই নির্বাচনের পর ওই ফ্রন্টের শরিকদের কারো কারো এদিক-ওদিক ছিটকে যাবার সম্ভাবনা থাকছে।

দুই, আঞ্চলিক দলগুলোর ভূমিকা। আমরা দেখেছি যে ১৯৬৭ সালে প্রধান সমস্ত দল বা গোষ্ঠীরই আবেদন ছিল সর্বভারতীয়। তিন দশক পরে দেখছি আঞ্চলিক দলগুলো রাজ্য প্রশাসনে এক বড় শক্তি। একদিক দিয়ে ভাবলে, এই পরিবর্তনের কারণ সর্বভারতীয় দলগুলি তাদের কার্যসূচিতে আঞ্চলিক সমস্যাগুলোকে ভালো করে টেনে আনতে পারেনি। অন্যদিকে, আঞ্চলিক দলগুলোর এই প্রতিষ্ঠা ও স্বীকৃতি খানিকটা সাহায্য করছে ভারতবর্ষের ফেডারেল বা যুক্তরাষ্ট্রিক চরিত্রকে ফিরিয়ে আনতে। আমরা দেখেছি যে আন্তঃরাজ্য পরিষদের সাংবিধানিক ব্যবস্থা কংগ্রেস আমলে ব্যবহৃত হয়নি, রাজ্যের সঙ্গে রাজ্যের মতান্তর বা কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের বিবাদ মেটানো হয়েছে কংগ্রেস পার্টির আভ্যন্তরীণ পার্টিগত কাঠামোর মধ্যে। এখন যেহেতু কোনো একটা দল কেন্দ্র, রাজ্য সর্বত্র

বিরাজমান নয়, অতএব এই সমস্যাগুলো সাংবিধানিক সমস্যা হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। ফলত, আন্তঃরাজ্য পরিষদের বেশ কয়েকটি সভা গত বছরে হয়েছে; জাতীয় উন্নয়ন পরিষদও অনেক ঘনঘন বসছে বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের নিয়ে। সাধারণ মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাবার কার্যসূচি — পানীয় জল, স্বাস্থ্য ইত্যাদি এখন রাজ্যকেই দেওয়া হয়েছে। একইভাবে আরো বেশ কিছু কার্যক্রম কেন্দ্র থেকে রাজ্যে সরানো হয়েছে। প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ বাড়ছে এবং যেমন কেন্দ্র থেকে রাজ্য, তেমনিই রাজ্য থেকে পঞ্চায়েতে ক্ষমতা ও দায়িত্ব হস্তান্তর করা হচ্ছে। কংগ্রেসের সর্বত্র উপস্থিতি যে কেন্দ্রিকতার নজির সৃষ্টি করেছিল সেটা এখন নেই।

সেই অর্থে ভারতবর্ষের রাজনীতি এবং সমাজজীবন এখন আগের তুলনায় অনেক বেশি গণতান্ত্রিক। এখানে বিজেপিরও একটা সমস্যা আছে। নীতিগতভাবে বিজেপি চিরকাল ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের পক্ষে। এক ধর্ম, এক দর্শন, এক ভাষা, এক পতাকা, এক দেশ — এই ওদের দৃষ্টিভঙ্গি। ওরা জানে না ভারতবর্ষ বহুজাতিক দেশ। ওরা চায় হিন্দি ভারতের সর্বত্র রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গৃহীত হোক আঞ্চলিক ভাষার পরিবর্তে। ওদের হিন্দুত্বের সংজ্ঞা অনুযায়ী, মুসলমানরা থাকতে পারবে যদি তারা 'হিন্দুত্ব' মেনে নেয়। ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠন ওরা সমর্থন করে না। তবু, নির্বাচনে জিতবার জন্য ওরা বাধ্য হয়েছে কিছু কিছু আঞ্চলিক দলের সঙ্গে গাটবন্ধন করতে। কিন্তু ক্ষমতায় এলে, যথেষ্ট আসন পেলে, কেন্দ্রিকতার স্টিমরোলার চালাতে ওরা কুণ্ঠাবোধ করবে না।

তিন, দলগুলোর আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের অবস্থা। এই বছর থেকে নির্বাচন কমিশন নিয়ম করেছে যে আভ্যন্তরীণ দলগত নির্বাচন না করলে সেই দলকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে না। এই ক্ষেত্রে বামপন্থী দলগুলো বা বিজেপির কোনো অসুবিধে হয়নি, কিন্তু বাকি দলগুলোকে জোড়াতালি দিতে হয়েছে। শিবসেনার বক্তব্য ছিল যে তাদের পার্টির সংগঠনতন্ত্রে নির্বাচনের কোনো ব্যবস্থা নেই, কিন্তু নির্বাচন কমিশনের চাপে ওরাও বাধ্য হয়েছে কোনোরকম একটা নির্বাচন দেখাতে।

নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্ত প্রশংসনীয়। যে পার্টি নিজের দলের মধ্যে গণতন্ত্র মানে না তাদের ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশ নেবার কোনো অধিকার নেই। কিন্তু কোনোমতে নির্বাচন করলেও যে গণতন্ত্র হয়ে গেল এমন নয়। সমস্ত পার্টিতেই নানা প্রশ্নে সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সংখ্যালঘু মত থাকতে পারে। গণতন্ত্র নিশ্চয়ই সংখ্যাগরিষ্ঠের মত অনুযায়ী চলবে। কিন্তু পার্টি যেন এমনভাবে চলে যাতে আজকের সংখ্যালঘুদের সুযোগ থাকে অন্যদের বুঝিয়ে বা বোঝাতে পারলে সংখ্যাগরিষ্ঠ হবার।

গণতন্ত্রের সঙ্গে শৃঙ্খলার প্রশ্নও জড়িয়ে। প্রাক-১৯৬৭ আমলে কংগ্রেসের কোনো শৃঙ্খলার সমস্যা ছিল না। কংগ্রেসের মনোনয়ন ছিল ভোটে জিতবার নিশ্চিত ছাড়পত্র। শৃঙ্খলা না থাকলে মনোনয়ন হবে না, মনোনয়ন না পেলে ভোটে জেতা যাবে না। ১৯৬৭ পরবর্তী অবস্থায় যখন শুধু কংগ্রেসের মনোনয়ন আর নির্বাচনী জয়ের ছাড়পত্র থাকল না তখন শৃঙ্খলা আসতে পারত ভিন্ন পথে। পার্টি পরিচালনায় ব্যাপক অংশগ্রহণ এবং গণতান্ত্রিক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে — যেমন বামপন্থী দলগুলিতে রয়েছে। ১৯৬৭ থেকে ১৯৯৭ এই ত্রিশ বছরে সেই গণতন্ত্র চালু হয়নি, যেটা আমরা দেখেছি। এর মধ্যে আবার গত ৭ বছর বাদ দিলে, বাকি ২৩ বছরই পরিবারতন্ত্র কাজ করেছে। ১৯৯১ সালের পর থেকে পার্টির নেতৃত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে আর নেহরু পরিবারের হাতে নেই — কিন্তু তার ফলে যে অন্যরকমের টেনশন তৈরি হয়েছে সেটা আমরা দেখেছি।

এই নির্বাচনের মুখে এসে দেখছি সোনিয়া গান্ধী ঘোমটা খুলে কংগ্রেসের প্রচারে

হয়েছেন এবং তিনি কার্যত এখন কংগ্রেসের নেতা। সেটা অদ্ভুত। আমি অদ্ভুত এই কারণে বলছি না যে তিনি বিদেশিনী। যখন ভারতের নাগরিকত্ব নিয়েছেন তখন কোথায় জন্ম ইত্যাদি প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক নয়। তাছাড়া, ভারতের সমাজে বহু বিদেশিনী এর আগে বড় দাগ কেটেছেন। এবং মানুষ তাঁকে ভারতীয় বলে মেনে নিয়েছে। যেমন অ্যানি বেসান্ট, সিস্টার নিবেদিতা, নেলি সেনগুপ্তা, বা মাদার টেরিসা। সোনিয়া নিশ্চয়ই ভালো মাতা, ভালো বধূ ছিলেন। কিন্তু সেই কারণে তো কেউ কংগ্রেসের মতো এক ঐতিহ্যশালী দলের নেতা হতে পারে না। যদি বলা হয় তিনি নেহরু ইন্দিরা পরিবারের বধূ তাহলে মনে রাখতে হবে যে মেনকা গান্ধী নামে এই পরিবারের আরেক বধূ রয়েছে। এছাড়া আর কি গুণ আছে এই মহিলার, যার জন্য কেশরী, অর্জুন সিং বা তেয়োরীর মাপের নেতারা তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ছেন?

খুব সম্ভবত কারণ ভারতের বহু মানুষের ইউরোপ সম্বন্ধে হীনম্মন্যতাবোধ এবং সাদা বর্ণের প্রতি মোহ। একই সঙ্গে এই নেতৃত্ব কংগ্রেস পার্টির পূর্ণ দেউলিয়াপনার সূচক। ওদের পার্টিতে কোনো সর্বজনগ্রাহ্য নেতা নেই।

বিজেপি এক সময় দাবি করত তারা কংগ্রেসের মতো নয়। তাদের পার্টিতে শৃঙ্খলা আছে, নীতি আছে এবং একটা দর্শন আছে। এই তিনটে বৈশিষ্ট্যই এই মুহূর্তে গুলিয়ে গিয়েছে। উত্তরপ্রদেশে দলছুটদের নিয়ে ৯৩ জনের মন্ত্রিসভা করবার পর, সেই মন্ত্রিসভায় বেশ কিছু পুলিশের খাতায় নামওলা ব্যক্তিকে ঢোকাবার সময় নীতিবোধ কোনো বাধা হয়নি, যেমন হয়নি গত ডিসেম্বরে ৪৭ জন কংগ্রেস এম পিকে কিনবার চেষ্টায়। অথবা ওদের দীর্ঘদিনের গৃহীত কেন্দ্রিকতার নীতি সত্ত্বেও কিছু আঞ্চলিক দলের সঙ্গে সমঝোতায়, এমনকি মুসলমানদের তোষণ করে আদবানিজীর সাম্প্রতিক ভাষণে। সবচেয়ে খারাপ দৃষ্টান্ত বোধহয় দুর্নীতিগ্রস্ত জয়ললিতার সঙ্গে তামিলনাড়ুতে গাঁটবন্ধন। সংসদে এনরন চুক্তির তীব্র বিরোধিতার পরই মহারাষ্ট্র রাজ্যে সরকারে এসে সেই এনরনের সঙ্গেই চুক্তি। সমস্ত নীতি ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে ক্ষমতার উদগ্র লোভ।

বিজেপির হিন্দুত্বের ধারণার সঙ্গে রামমোহন, বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণদেব, মহাত্মা গান্ধী বা রবীন্দ্রনাথের হিন্দুত্বের ধারণার কোন মিল নেই। যেখানে বৈচিত্র্য এবং পরমতসহিষ্ণুতাই ছিল হিন্দুধর্মের বিরাট বৈশিষ্ট্য সেখানে সংঘ পরিবার চাইছে হিন্দুধর্মকে এককেন্দ্রিক এবং অসহিষ্ণু করতে। তবু ভুল হোক ঠিক হোক, হিন্দুত্বের একটা ধারণা এদের ছিল। ১৯৯০ সালে জনতা দলের সরকার থেকে বিজেপির সমর্থন প্রত্যাহারের কারণ ছিল মণ্ডল কমিশন, এবং ধারণা যে জাতিগত প্রাতিষ্ঠানিক সমাধান হিন্দুত্বের ধারণার পরিপন্থী। বিজেপি, বিশ্বহিন্দু পরিষদ, বজরঙ্গ দল, অর্থাৎ সংঘ পরিবারের সবাই ছিল মনুবাদী, ফলে মনুসংহিতায় এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মে বিশ্বাসী। এখন, ভোটের প্রয়োজনে, অন্তত নির্বাচনী প্রচারের সময় এই কথা বলে না। উত্তরপ্রদেশে মতাদর্শে সম্পূর্ণ বিরোধী, মনুবাদবিরোধী এবং দলিতপন্থী বহুজন পার্টির সঙ্গে দুইবার সমঝোতা করে সরকারে থাকল। বাবরি মসজিদের ধ্বংসলীলার পর দাবি করল 'দুই যাদব' সর্বপ্রথম মসজিদের শীর্ষে উঠেছিল এবং উত্তরপ্রদেশের বিধানসভার নির্বাচনে বহু যাদব ও অনুন্নত গোষ্ঠীর মানুষকে প্রার্থী করল। এখন তাই ফলত রাজ্যে রাজ্যে বিজেপির মধ্যে জাতপাতের বিবাদে নানা গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। উত্তরপ্রদেশে মুরলী মনোহর যোশী ব্রাহ্মণদের নেতা, রাজনাথ সিং ক্ষত্রিয়দের, কল্যাণ সিং অনুন্নতদের এবং দলিতদের গোষ্ঠীর নেতা রাজ্যসভার এক প্রাক্তন এম পি সংঘপ্রিয় গৌতম।

সেই শৃঙ্খলা বিজেপিতে আর নেই। তাহলে ১৯৯৫ সালে ভাগেলার কাছে আত্মসমর্পণ

করে গুজরাটে মুখ্যমন্ত্রী পালটাতো না, তারপর বিশ্বহিন্দু পরিষদ এবং বজরঙ্গ দলকে দিয়ে বিজেপিরই প্রার্থী ভাগেলা এবং তার অনুগামীদের ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে হারিয়ে দিতো না এবং ভাগেলা অনুগামী মন্ত্রী, সতের বছরের আত্মারাম প্যাটেলকে ১৫ দিনের প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীর আহমেদাবাদের জনসভায় নগ্ন করে প্রহারের পর শৃঙ্খলামত ব্যবস্থা না নিয়ে বসে থাকত না। এখন রাজ্যে রাজ্যে বিজেপির মধ্যে শৃঙ্খলাগত সমস্যা - দিল্লিতে, রাজস্থানে, মধ্যপ্রদেশে, মহারাষ্ট্রে, কোথায় নয়। সাহেব সিং ও খুরানার মধ্যে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রিত্ব নিয়ে লড়াই চলছে। ক্ষমতার লোভ বিজেপিকে কংগ্রেসের কাছাকাছি এনে ফেলেছে।

বামপন্থীরা ছাড়া শৃঙ্খলা এবং দলগত আনুগত্যের সমস্যা প্রতিটি পার্টির মধ্যে রয়েছে। যে কেউ যে কোনো দল থেকে যে কোনো দলে চলে যেতে পারেন, কোনো মানসিক বাধা নেই, টাকা এবং পদ পেলেই হল। এম পি, এম এল এরা এখন পণ্য, বাজার অর্থনীতির অংশ। উন্নত পার্লামেন্টারি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এটা হয় না। ইংল্যান্ডে পুরো বিংশ শতাব্দী ধরলেও দশটার বেশি দলছুট পাওয়া যাবে না। দলছুটরা নির্বাচনে জেতে না, মানুষ তাদের ক্ষমা করে না। যাদের সম্মানবোধ আছে তারা দল পালটালে পদত্যাগ করে আবার নির্বাচনে দাঁড়ান। সত্তরের দশকের খলনায়ক সিদ্ধার্থ রায় জীবনে অন্তত একবার একটা ভালো কাজ করেছিলেন। ১৯৫৮ সালে তিনি কংগ্রেস ছেড়ে বিরোধী দলে যোগ দেন। তখন কিন্তু পদত্যাগ করেছিলেন এবং বামপন্থীদের সমর্থনে নির্বাচনে জিতেছিলেন। ভারতে এই ধরনের দৃষ্টান্ত বিশেষ পাবেন না। আত্মমর্যাদাবোধ যখন নেই, পার্টিরা যখন আয়ারাম-গয়ারামদের ফিরিয়ে দেয় না, তখন একটাই উপায় — আইন করা যে দল পালটালেই পদ ছেড়ে নির্বাচনে আবার দাঁড়াতে হবে -- যা আগেই লিখেছি।

দলগত আনুগত্যবোধ ছাড়া পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র দাঁড়াতে পারে না। ধরুন এই যে ১৯৯৮ সালের নির্বাচন হচ্ছে, এবং ভোটাররা পার্টি দেখে ভোট দিচ্ছেন, তার কি কোনো মানে থাকবে যদি নির্বাচনের পরেই জয়ী প্রার্থীরা তাদের দল পালটে অন্য দলে চলে যান। নির্বাচনের আগে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা দলগুলোর কথা ভাবুন। মমতা ব্যানার্জির তো সীতারাম কেশরীর সঙ্গে এক বছর ধরে ঝগড়া — তবে আগে পদত্যাগ করে নতুন দল করলেন না কেন? কারণ, তাহলে এম পি পদ দলত্যাগবিরোধী আইনের সুবাদে চলে যেতো। তাই এবার ভোট দেবার আগে ভোটারদের নিশ্চিত হতে হবে যে কোন প্রার্থী নির্বাচনের পরে দল পালটাবে না অথবা কোন দল তাদের জোট পালটাবে না। এবং এই ব্যাপারে ভোটারকে ঠকানো চলবে না। তৃণমূল যদি বিজেপির সঙ্গে আপস করে থাকে প্রকাশ্যে বলুক — মানুষ সেটা জেনে ভোট দিক, পক্ষে বা বিপক্ষে, সেটাই গণতন্ত্র।

চার, পার্টিগুলোকে বলতে হবে তাদের নির্বাচনী তহবিলে টাকা আসে কোত্থেকে। এখন একটা নিয়ম আছে যে রাজনৈতিক দলগুলোকে আয়কর বিভাগের কাছে আয়কর রিটার্ন দিতে হবে — কিন্তু শুধু বামপন্থী দলগুলো সেই রিটার্ন জমা দেয়। বামপন্থী দলগুলোর আয়ের এক বড় সূত্র তাদের সভ্য এবং সমর্থকদের আয়ের এক অংশ এবং কিছু ঘোষিত গণচাঁদা সংগ্রহ। কিন্তু, কংগ্রেস, বিজেপি বা তৃণমূলের আয়ের উৎস কি? কার টাকায় এরা বড় বড় সভা করে, হোর্ডিং দেয়, লোক আনে গাড়িতে?

স্বভাবতই এদের আয়ের এক বড় অংশ আসে শিল্পপতিদের কাছ থেকে। এক সময় আইন ছিল যে কোম্পানিরা কোনো পার্টিকে চাঁদা দিতে পারবে না — পরে অবশ্য ইন্দিরার দ্বিতীয় জমানায় সেই আইন পালটানো হয়েছে। সেই আইন থাকলেও তার কোনো মানে হত না — কেননা দেয়া হয় কালো টাকা যার কোনো রেকর্ড থাকে না। একমাত্র বিদেশ

থেকে ব্যাঙ্ক মারফত টাকা এলে সেটা লুকোবার উপায় থাকে না, যে কারণে জার্মানি থেকে কয়েক কোটি টাকার চাঁদা পেয়ে কংগ্রেস এখন বিপদে পড়েছে।

একটাই সমাধান সরকার নির্বাচনের খরচ দেবে। গাড়ি দেবে, তেল দেবে, জনসভায় মাইকের খরচ দেবে। ঠিক আছে, কিন্তু কাকে কতো দেবে এবং কী ভিত্তিতে? সবাইকে সমানভাবে দেওয়া হলে কয়েক হাজার নির্দলীয় প্রার্থী প্রতি কেন্দ্রে দাঁড়াবে। শুধু স্বীকৃত দলের প্রার্থীদের দিলে অন্যদের প্রতি বৈষম্য করা হবে।

মোট কথা নির্বাচনী সংস্কার নিয়ে অনেক কিছু ভাববার আছে। 'বুথ দখল' গণতন্ত্রের ইতিহাসে ভারতের এক অনবদ্য অবদান। এই দখল মুক্ত করবে কে যদি জমিদার-পুলিশ-পার্টি একদিকে থাকে? ভূমিসংস্কার, শিক্ষার প্রসার, গণতান্ত্রিক চেতনা বাড়ানোর জন্য নানা মাধ্যমের ব্যবহার — হয়তো এগুলোই আসল সমাধান। শুধু আইন করে এই সমস্ত অন্যায় বা ফাঁকি এড়ানো যাবে না। কিন্তু মানুষ যদি সচেতন হয় তারাই পারে ঠেকাতে।

মানুষ পারে। ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৭ মুখ বুজে ছিল, ওদের মনের ভাব জানতে দেয়নি। ১৯৭৭ সালে ভোটের সুযোগ পেয়েই স্বৈরতন্ত্রীদের ক্ষমতার আসন থেকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। মধ্যপ্রদেশে কমলনাথ-এর অসুবিধা ছিল বলে নিজে না দাঁড়িয়ে ওর বৌকে দাঁড় করিয়েছিল। পরে ওর ইচ্ছে হল নিজেই আবার এম পি হবে। তাই বউকে পদত্যাগ করিয়ে নিজে দাঁড়াল। কিন্তু ভোটাররা এই ছেলেখেলা পছন্দ করল না, ওকে হারিয়ে দিল। আবার উল্টো দৃষ্টান্তও আছে, — যেমন সুখরাম, সঞ্জয় সিং, জয়ললিতা বা কল্পনাথ রাইর সাফল্য।

পাঁচ, পার্লামেন্ট, সরকার, বিচার ব্যবস্থার মধ্যে সুষ্ঠু ক্ষমতা বিভাজনের প্রশ্ন। গত কয়েক বছরে ক্ষমতার পাল্লা অনেকখানি বিচার ব্যবস্থার দিকে ঝুঁকেছে এবং তার জন্য দায়ী সরকার ও পার্লামেন্ট। শিখবিরোধী দাঙ্গা, সেইন্ট কীটস, চন্দ্রস্বামী, নরসীমা রাও — এই সমস্ত মামলাই দশ বছরের বেশি ঝুলে ছিল, যেহেতু সরকার উদ্যোগী হয়নি। পরে জনস্বার্থে মামলার প্রশ্নগুলো উঠেছে এবং আদালতের হস্তক্ষেপে বেশ কিছু পুরনো অন্যায় ও অপরাধের সংশোধন ও ক্ষতিপূরণ এখন হচ্ছে। যার জন্য মানুষ আদালতের কাছে কৃতজ্ঞ। হাওয়ালা মামলাও পাঁচ বছর ঝুলে থাকবার পর ১৯৯৬ সালে কোর্টে এসেছে, যেমন বিহারের পশুপালন দপ্তর নিয়ে মামলা।

অন্যদিকে বিচার ব্যবস্থার অতি সক্রিয়তার ফলে আদালত অনেক সময় এমন অনেক রায় দিচ্ছেন যা সংবিধানিক ক্ষমতা বিভাজনের মূল নীতি বা উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। যেমন, লালুকে গ্রেপ্তারের জন্য সামরিক বাহিনীর সাহায্য চেয়ে সি বি আই-র আবেদন পাটনা হাইকোর্টের এক বিচারপতির মঞ্জুর করবার ঘটনা। কোনো বিচারকের সেনাবাহিনীকে কোনো নির্দেশ দেবার অধিকার নেই। কোর্ট প্রশাসনকে বলতে পারতেন লালুকে গ্রেপ্তার করবার কথা, এবং প্রশাসন ঠিক করতো তারা কিভাবে সেটা করবে। যে কোনো দেশের সৈন্যবাহিনীর অন্য ভূমিকা থাকে। বন্যা, ভূমিকম্পে তাদের কাজের জন্য বা দাঙ্গা কমানোর জন্য সৈন্য নামানো যেতে পারে, কিন্তু খুচরো কাজের জন্য নয়। তাতে সৈন্যবাহিনীর ভাবমূর্তি নষ্ট হয় এবং মানুষের সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক চলে যায়।

১৯৯১ সাল থেকে একটার পর একটা ঘটনার জন্য বিচার ব্যবস্থাকে একটা বিশেষ ভূমিকা পালন করতে হয়েছে। কিন্তু এটা বিচারকদেরই দেখতে হবে, যাতে ভারসাম্য ফিরে আসে।

সবশেষ, ধর্ম-জাত-নিরপেক্ষতা ছাড়া গণতন্ত্র গড়ে উঠতে পারে না। পৃথিবীর সমস্ত পার্লামেন্টারি গণতান্ত্রিক দেশেই এই 'রুল অফ ল' বা আইনের শাসন কার্যকরী। আইন দেখবে না কার কি জাত, ধর্ম বা বর্ণ। ইউরোপের দেশগুলোর মানুষ কোন অংশে কম

ধর্মীয় নয়। খ্রিস্টমাস বা অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান ওরা কম জাঁকজমকে করে না। কিন্তু ধর্ম এবং রাষ্ট্রকে ওরা গুলিয়ে ফেলে না। ধর্ম চলে ধর্মের পথে, রাষ্ট্র চলে রাষ্ট্রের পথে, দুটো স্বতন্ত্র রাস্তায়। ধর্ম করবার জায়গা চার্চ, মসজিদ, মন্দির বা গির্জা, তার বাইরে রাষ্ট্র। রাষ্ট্র ও ধর্মকে আলাদা ধারায় রাখতে পেরেছে বলেই ওরা অর্থনৈতিকভাবে এত উন্নতি করতে পেরেছে, একটা স্থায়ী রাজনৈতিক কাঠামো চালাতে পেরেছে। যেখানে ধর্ম বড় হয়ে উঠেছে, যেমন উত্তর আয়ার্ল্যান্ডে — সেখানে উন্নতি হয়েছে সবচেয়ে কম।

ধর্মনিরপেক্ষতা মানে সমস্ত ধর্মের রাষ্ট্রের ব্যাপারে নাক গলাবার সমান অধিকার নয়—ধর্ম ও রাষ্ট্রকে আলাদা রাখা। তাছাড়া সমস্ত সভ্য এবং উন্নত দেশেই অনুন্নত সংখ্যালঘুদের জন্য কিছু বিশেষ ব্যবস্থা থাকে, যাতে তারা উন্নত হয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের সঙ্গে মিশে যেতে পারে। সংখ্যালঘুদের সাংস্কৃতিক বিভিন্নতার স্বীকৃতিও দেয় সরকার। ইংল্যান্ডে শিখ শ্রমিক তার পাগড়ি পরেই বাস চালাতে পারবে সংখ্যালঘু বলে, যে অধিকার সংখ্যাগরিষ্ঠরা পায় না। সংখ্যাগরিষ্ঠের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার দরকার হয় না। ভারতে তাই তফসিলি জাতিদের জন্য নির্বাচনী আসন বা কাজের ব্যবস্থা আছে এবং আদিবাসীদের অঞ্চলে কতকগুলো ব্যাপারে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার স্বীকৃত আছে।

এই প্রবন্ধ শেষ করবার আগে শুধু বলব, খালি পেটে গণতন্ত্র হয় না। অর্থনীতির দিকটাও ভাবতে হবে, যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য মানব সম্পদের প্রয়োজন।

বা স ব স র কা র

মতাদর্শের সংঘাত

এক

মতাদর্শের সংঘাত ভারতে স্বাধীনতা-উত্তরকালীন সমস্যা। প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে কার্যত এই সংঘাত তেমন বড় আকারে কোনদিনই ছিল না। জাতীয় আন্দোলনের নরমপন্থী ও চরমপন্থী সংঘাত রাষ্ট্রতত্ত্বের দিক থেকে মতাদর্শের সংঘাত বলা যায় না। সেটা ছিল মোটামুটি একটা লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যে পথ পদ্ধতির দ্বন্দ্ব। আজ একথা প্রমাণিত নরমপন্থীরা দেশের যে বিকাশের কথা ভেবেছিলেন সেখানে উন্নত পুঁজিবাদের সঙ্গে সহযোগিতায় শিল্পায়নের কথা বলা হয়েছিল। বলা হয়েছিল রাজনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নয়নের কথা। শতাব্দীর শেষ দশকে বিশ্বায়নের নামে তারই একটা ব্যাপক বিস্তৃত রূপকে দেশ যেন নির্দ্বিধায় বরণ করতে পারলে বাঁচে, এমনতরো ধারণা সবার মনে দানা বেঁধেছে। নরমপন্থীরা ধীরে চলার নীতি, এক ধরনের gradualism গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যের কাঠামোর মধ্যে self-rule দিয়ে শুরু করে ডোমিনিয়ন পর্যন্ত হতে পারাটাই যথেষ্ট ছিল। তাই ইংরাজ শাসনকে বিধাতার আশীর্বাদ বলে মনে করতে তাদের বাধেনি।

চরমপন্থীরা স্বরাজ চেয়েছিলেন, শুধু স্বাধীনতা নয়। যদিও স্বরাজ আর স্বাধীনতার মধ্যে যে পার্থক্য আছে, সেটা তখন ততটাই স্পষ্ট ছিল কিনা, তা নিয়ে বিতর্ক আছে। চরমপন্থীরা চেয়েছিলেন পুনরুজ্জীবন, regeneration কিন্তু সেটা renaissance নয়, তাকে resurgence বলা যেতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র, অরবিন্দ, তিলক সবাই তার কথা বলেছেন। তারা সবাই, নরমপন্থী ও চরমপন্থী নির্বিশেষে, ছিলেন জাতীয়তাবাদী। সাম্রাজবাদ ও উপনিবেশবাদের স্বরূপ বুঝতে তারা সবাই সমানভাবে পারেননি। কিন্তু বৃটিশ শাসনের সঙ্গে ভারতের জাতীয় লক্ষ্যের যে দ্বন্দ্ব আছে সেই ধারণা তাদের সবারই ছিল। তাই ভারতে শাসক ইংরাজরা খারাপ কিন্তু বিলেতে ইংরাজরা ভাল, তারা ভারতের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন উদার মনের মানুষ বলে দাদাভাই নৌরজির মনে হয়েছিল। তিনি এদেশের শাসক ইংরাজদের drain theory'র কথা বলেছেন, তাদের সৃষ্ট দারিদ্র্যের কথা বলেছেন, শোষণের পরিসংখ্যান দিয়েছেন, আবার ইংরাজ শাসনকে বলেছেন un-british, অ-বৃটিশসুলভ। নৌরজির drain তত্ত্ব নরমপন্থী ও চরমপন্থীরা উভয়েই ব্যবহার করেছিলেন, নিজেদের বিশ্বাসের নিরিখে। তাই নরম ও চরমপন্থী দ্বন্দ্ব যত তীব্রই হয়ে উঠুক না কেন, তাকে মতাদর্শগত সংঘাত বলা যাবে না।

বিশ ও তিরিশের দশকে গান্ধীর সঙ্গে কংগ্রেসে বামপন্থী নামে পরিচিত সুভাষচন্দ্র ও জহরলালের বিতর্ক, বিরোধ ঘটেছিল। জহরলাল-সুভাষচন্দ্র তখন তরুণ নেতা। সেই বিতর্ক-বিরোধ ছিল ডোমিনিয়ন মর্যাদা অর্জনের জন্যে কংগ্রেসের ধীরে চলার নীতির প্রতি গান্ধীর স্পষ্ট সমর্থন আর এই সব তরুণদের পূর্ণ স্বাধীনতার ঘোষণা ও তার জন্যে জঙ্গি আন্দোলন

গড়ে তোলার দাবিতে। সেটাও পথ ও পদ্ধতির বিরোধ, যাকে মতাদর্শের বিরোধ বলা যাবে না। তখন দেশে যারা সত্যই মতাদর্শের প্রশ্ন তুলতে পারতো সেই কয়েক বছর আগে গড়ে ওঠা কমিউনিস্ট পার্টিও পূর্ণ স্বরাজের দাবি ছাড়া কার্যকরভাবে কংগ্রেসের মতাদর্শগত বিকল্পের কোন কর্মসূচী তুলে ধরতে পারেনি। করাচি কংগ্রেস অধিবেশনে গৃহীত অর্থনৈতিক প্রস্তাব, কংগ্রেসের রাজনৈতিক জীবনে সারা দেশের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ প্রথম মতাদর্শগত প্রস্তাব। তখন নেতারাও জানতেন এই প্রস্তাব স্বাধীনতার আগে কার্যকর করা যাবে না। জনগণের যে অংশে তার গুরুত্ব বোঝার মতো চেতনা ছিল, তারাও মানতেন করাচি প্রস্তাব একটা পথের দিশা দিয়েছে, তাকে প্রয়োগ করতে গেলে স্বাধীনতা চাই।

তবে অসহযোগের সময় না হলেও তার পরবর্তীকাল থেকে কংগ্রেসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে স্বাধীনতার জন্যে আন্দোলন ও সংগ্রামে উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সমস্ত জাতীয়তাবাদী শক্তির সার্বিক ঐক্য, গান্ধীর মতে all class unity, অথবা শোষিত মানুষদের সংগ্রামী ঐক্য বা class based unity এই প্রশ্ন মাঝে মাঝেই ওঠে। কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ ও ফৈয়জপুর অধিবেশনে সভাপতি জহরলালের সমাজতন্ত্রী বক্তৃতা পুঁজিপতি ও জমিদারদের বিচলিত করেছিল। তাদের প্রতিনিধি হয়ে ঘনশ্যামদাস বিড়লা ও বিশিষ্ট শিল্পপতিরা বল্লভভাই প্যাটেল, রাজাজী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। গান্ধীর সঙ্গেও দেখা করে আশংকা প্রকাশ করা হয়। শেষপর্যন্ত গান্ধী আশ্বাস দিয়েছিলেন জহরলাল বক্তৃতায় সমাজতন্ত্র, শোষণের অবসান ইত্যাদি বিপ্লবী মতাদর্শের যত কথাই বলুক না কেন, কাজের সময় কর্মসূচী থেকে সরে আসতে পারবেন না। আর সুভাষচন্দ্র প্রবাসে এবং কংগ্রেসের হরিপুরা অধিবেশনের আগে দেশে ফিরে যখন গান্ধীর সঙ্গে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন তখন তার মূলকথা ছিল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি অনুযায়ী অবিলম্বে স্বাধীনতার জন্যে জঙ্গি আন্দোলন শুরু করা। অর্থাৎ মূলকথা হল রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন, আর্থ-সামাজিক সমস্যা তখন মুলতুবী রাখতে মোটামুটি সব প্রথম সারির নেতারা একমত ছিলেন। একথা ঠিক নেহরু ও সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের গণভিত্তিকে স্বতঃস্ফূর্ততার উপর ছেড়ে না দিয়ে শ্রমিক ও কৃষকদের গণসংগঠনগুলিকে তার মধ্যে টেনে আনতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ নিপীড়িত ও শোষিত মানুষদের দাবিদাওয়াগুলি জাতীয় রাজনীতির মঞ্চে উচ্চারিত হোক, কংগ্রেসের প্রস্তাবে তার প্রতিফলন ঘটুক, নেহরু ও সুভাষ তা চেয়েছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের মুখিয়া নেতারা ছিলেন ভিন্নমত, তাই দেখা যায় ১৯৩৭ সালে নানা প্রদেশে কংগ্রেসি মন্ত্রিসভা গঠিত হলেও, আর্থ-সামাজিক প্রশ্নে ইংরাজদের আমলাতান্ত্রিক শাসননীতির মূল কাঠামো তারা সযত্নে বজায় রেখেছেন। গণআন্দোলনের উপর দমনপীড়ন চালাতে অকুণ্ঠভাবেই অগ্রসর হয়েছেন। দেশীয় রাজ্যগুলিতে রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলায় সেই একই স্থিতাবস্থার মনোভাব দেখা গেছে, পাছে রাজন্যবর্গ চটে যায়, তাহলে স্বাধীনতার জন্যে all class unity ব্যাহত হবে।

তখনকার কমিউনিস্ট পার্টি এবং ১৯৩৪ সালে কংগ্রেসের মধ্যে গড়ে ওঠা কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি, বোম্বাইয়ে কয়েক বছর আগে প্রতিষ্ঠিত পেজেন্টস এ্যান্ড ওয়ার্কার্স পার্টি এবং খুচরো কিছু বামপন্থী দলের প্রভাব ও গণভিত্তি এতই সীমিত ছিল যে, কংগ্রেসের বিকল্প কোন মতাদর্শ কায়েম করার শক্তি তারা অর্জন করতে পারেনি। এককথায় কংগ্রেস নেতৃত্ব জাতীয় রাজনীতিতে যে কর্মসূচী নির্ধারিত করে দিতেন, তার বাইরে সামগ্রিক বিকল্প কিছু হাজির করা বামপন্থীদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই মতাদর্শের পার্থক্য কেবল স্বাধীনতা অর্জনের পথ ও পদ্ধতির মধ্যে আবদ্ধ থেকেছে, মতাদর্শের যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারেনি। কংগ্রেস এবং অকংগ্রেস কোন রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে মতাদর্শের প্রশ্নে আর্থ-সামাজিক প্রশ্ন সেই প্রাধান্য পায়নি, যা মতাদর্শের সংঘাত দাবি করে। রাজনৈতিক স্বাধীনতাই ছিল মূল লক্ষ্য, তারপর সব কিছু। শিক্ষার প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ — গান্ধী বিতর্ক সেটাই প্রমাণ করে।

দুই

দেশ আগে স্বাধীন হোক্ তারপর সব কিছু। উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের মোটামুটি এই ছক কার্যত বহাল থাকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত। এদেশে বামপন্থীরা সেই ছক বদলাতে পারেনি, তাদের মূলত সীমিত আঞ্চলিক প্রভাবের জন্যে। কংগ্রেসে নিরপেক্ষভাবে তারা সেই প্রভাব বাড়াতে পারেনি। ফলে কংগ্রেসের কার্যকর নেতৃত্ব অর্থাৎ গান্ধীর কর্মসূচী তাদের মেনে চলতে হয়েছে। কমিউনিস্টরাও এই প্রভাবের বাইরে ছিল না। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের নির্দেশও ছিল তাই, তিরিশের দশকের মাঝামাঝি থেকে। ফ্যাসিবিরোধী সার্বিক ঐক্য গঠনের নীতি গৃহীত হওয়ায় স্বতন্ত্রমতাদর্শভিত্তিক কর্মসূচী গ্রহণ করা কমিউনিস্টদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। অন্য সর্বভারতীয় কোন বাম সংগঠন এ নিয়ে বিশেষ ভাবিত ছিলেন জানা যায় না। তাদের নেতৃত্বে এমন অনেকে ছিলেন যারা গান্ধী ও নেহরুর ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ। তাই বামপন্থীরা দেশজোড়া কোন বিকল্প নেতৃত্ব গঠন করতে তখন পারেনি, একালে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরেও পারেনি।

মতাদর্শের সংঘাত কার্যত ভারতীয় রাজনীতির আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য হয়ে রয়েছে, সর্বভারতীয় বিস্তৃতি লাভ করেনি। অন্যদিকে কংগ্রেসের সেই প্রাধান্য তার অসংখ্য অনাচার, দুর্নীতি কায়েমী স্বার্থবাদী অবস্থানের জন্যে যতই ভাঙতে শুরু করেছে, ততই রাজনৈতিক মতাদর্শের এলাকায় শূন্যতা দেখা দিয়েছে। সেই শূন্যস্থান পূরণে এগিয়ে এসেছে মৌলবাদী ভারতীয় জনতা পার্টি ও নানা ধরনের স্থানীয় ও আঞ্চলিক দল, যাদের মতাদর্শগত অবস্থান খুবই গোলমেলে। বর্তমানে বামপন্থীদের পক্ষে তাদের সঙ্গে রাখায় ঝুঁকি আছে, আর না রাখলে বিপদ আছে। সে প্রসঙ্গ পরে বিবেচ্য। প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে সেই প্রশ্ন ছিল না। তখন নানা মতের নানা দল, নিজেদের সাংগঠনিক অস্তিত্ব বজায় রেখেও ছিল কংগ্রেসের মধ্যে। কমিউনিস্ট পার্টি, সোসালিস্ট পার্টি সবাই কংগ্রেস সংগঠনে যুক্ত ছিল। ১৯৪৫ সালে কংগ্রেস নেতৃত্ব কমিউনিস্ট পার্টিকে বহিষ্কার করে। ১৯৪৮ সালে সোসালিস্টরা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হয়, না হলে তাদের বহিষ্কৃত হতে হত। কমিউনিস্টদের বিতাড়ন করা হয় আগস্ট আন্দোলনে 'ইংরাজ ভারত ছাড়ো' এবং 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' প্রস্তাব কার্যকর না করে জনযুদ্ধ নীতি অনুসরণের জন্যে। অথচ কংগ্রেস নেতৃত্বের নাম করার মত সকলেই কেবল প্রস্তাব গ্রহণ করার কষ্টটুকু স্বীকার করে ছিলেন মাত্র, করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গের 'ক' থেকে 'ম' পর্যন্ত কিছুই করেননি। যারা করেছিল আন্দোলন তারা কংগ্রেস নীতিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে জঙ্গি পথ নিয়েছিল। তবু কমিউনিস্ট বিতাড়ন ঘটে যেহেতু তার কারণ ছিল আলাদা। আর কংগ্রেস সোসালিস্টদের ক্ষেত্রে এই অভিযোগ ধোপে টিকতো না। কারণ তারাই ছিল আগস্ট আন্দোলনের প্রকৃত সংগঠক ও নেতৃত্বে। মেদিনীপুর জেলা বাদে বিহার, পূর্ব উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্রে তারাই আন্দোলন চালায়।

আসলে কংগ্রেস নেতৃত্ব বোঝেন যে দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতি রাজনৈতিক আন্দোলনেও বিকল্প পথ দাবি করতে পারে। যে কোন মূল্যে স্বাধীনতা পেতে মানুষ চাইছে। কমিউনিস্টরা সেই পরিস্থিতি কাজে লাগাতে পারে। তখন সেই জঙ্গি আন্দোলনের কোন না কোন পর্যায়ে শ্রেণীগত দাবি-দাওয়া অপ্রতিরোধ্য হতে পারে। একদিকে আগস্ট আন্দোলনের জঙ্গিরূপ অন্যদিকে সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর কাহিনী মানুষকে জাতীয় মুক্তির জন্যে বিকল্প পথ ও নেতৃত্বের দিকে আকৃষ্ট করতে পারে। তাই কংগ্রেস নেতারা আগস্ট আন্দোলন ও আজাদ হিন্দ ফৌজের সব কৃতিত্ব আত্মসাৎ করতে ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন। তারই প্রথম বলি কমিউনিস্টরা। সোসালিস্ট পার্টির সঙ্গে আগস্ট আন্দোলন নিয়ে কমিউনিস্টদের বিরোধ তখন যথেষ্ট। সোসালিস্ট অনেক নেতা তখনও জেলে আটক। তাই তখনকার মত কংগ্রেস নেতৃত্বের

কোপ তাদের উপরে পড়েনি। কিন্তু নৌবিদ্রোহের সময় থেকে পরপর নানা ঘটনায় এটাও বোঝা যায় যে তারাও জাতীয় মুক্তির জন্যে এবং আর্থ-সামাজিক প্রশ্নের শ্রেণী আন্দোলনের দিকে ঝুঁকতে পারে। তার সঙ্গে ছিল ব্যক্তিত্বের সংঘাত।

আসলে স্বাধীনতার জন্মলগ্ন থেকেই কংগ্রেস নেতৃত্ব এই দলের এযাবৎ গড়ে ওঠা রাজনৈতিক মঞ্চরূপী চরিত্র বদলে তাকে শাসক দলের চরিত্র দিতে সচেষ্ট হন। তাই একটা political monolith হিসেবে তাকে গড়ে তোলার চেষ্টা হয়। অবশ্যই তার সমস্ত সুযোগ ও সম্ভাবনা ছিল। তাই গান্ধীকে জাতির জনকরূপে মেনেও তাঁর শেষ রাজনৈতিক ইচ্ছাপত্র, কংগ্রেস আর দল না থেকে একটা সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হোক, সেই ইচ্ছা স্পষ্টত অমান্য করা হয়। জীবনের শেষ বছরেই গান্ধীর রাজনৈতিক প্রান্তিকীকরণ ঘটেছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের হাতে। আর এখন তিনি কেবল জন্মতিথিতে স্মরণীয়, চরকা কাটা আর রামধুনের আনুষ্ঠানিকতায়, বিদেশী অতিথিদের দিল্লি সফরে প্রথাগতভাবে ফুলমালা পাওয়া আর সরকারি সব আপিসে দামী ফ্রেমে বাঁধাই ছবিতে আবদ্ধ।

তবু বলা দরকার কংগ্রেস নেতাদের দল গড়ে দেশ শাসনের অধিকার কায়েম করার মধ্যে আপত্তি কিংবা অসঙ্গতি কিছু নেই। সেটা রাজনীতিকদের দুনিয়া জোড়া সাধারণ ইচ্ছা, আবশ্যিক কর্মসূচী, বরং না হওয়াটাই অস্বাভাবিক। নেহরু-প্যাটেল তাই করেছেন। বার্ধক্যে ক্ষমতা ভোগ করার জন্যে তাঁরা গান্ধীসহ অনেক কিছু ত্যাগ করেছেন। জনগণের প্রতি শাসক দলের আদৌ যে প্রতিশ্রুতি তাঁদের ছিল সেটাও সেই ত্যাগের তালিকায় যুক্ত। এই বিরাট দেশে বিপুল জনসমষ্টির উপর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব হাতে পাওয়ার পর করাচি কংগ্রেসে দেওয়া আর্থ-সামাজিক কর্মসূচী কেবল নিয়ম রক্ষার জন্যে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হয় কিন্তু তার মূল বিষয়গুলি যা রূপায়ণের চেষ্টা হলে মানুষের জীবনমান কিছুটা বদলাতে পারতো, শিশুরাষ্ট্রের অক্ষমতার দোহাই দিয়ে তা ভবিষ্যতের জন্যে মুলতুবী রাখা হয়। সেগুলিকে কেন্দ্র করেই মতাদর্শের সংঘাত দানা বাঁধে স্বাধীনতার পরে পরেই। সেখানে মুখ্য হয়ে ওঠে কমিউনিস্টদের সঙ্গে বিরোধ। লক্ষ্য করার বিষয় হল বামশক্তির সাংগঠনিক দুর্বলতা, সেই সংঘাত, কেবল কয়েকটি প্রদেশ বা রাজ্যে সীমিত করে দেয়। তাকে সর্বভারতীয় পরিসরে ছড়িয়ে পড়তে দেয়নি।

সোসালিস্টরা কোনদিনই কংগ্রেসের সঙ্গে তাদের নাড়ীর টান কাটাতে পারেনি। ফলে গান্ধী ও নেহরু, এই দুই জাতীয় নেতার প্রভাবের আর্বর্তে তাদের কেবলই ঘুরপাক খেতে হয়েছে। আচার্য নরেন্দ্রদেব থেকে জয়প্রকাশ নারায়ণ পর্যন্ত সকলেই তার শিকার, কেবল ব্যতিক্রম ছিলেন রামমনোহর লোহিয়া। কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে সোসালিস্টদের একাংশ রাজনীতি থেকে স্বেচ্ছা নির্বাসনে যান, একাংশ কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসা গান্ধীবাদীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে কৃষক মজদুর প্রজা পার্টি গঠন করেন, কয়েকজন চলে যান ধীরে ধীরে কমিউনিস্ট পার্টির দিকে। কেবল থেকে যান রামমনোহর লোহিয়া। সোসালিস্ট হিসেবে যদিও কংগ্রেসের মতবাদের বিরুদ্ধে তাঁর সমালোচনা শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি নেহরুর বিরুদ্ধে সমালোচনায় পরিণত হয়। এই সব পুরনো কথা বলার উদ্দেশ্য হল স্বাধীনতা উত্তরকালে কংগ্রেসের মতাদর্শের বিকল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় কমিউনিস্ট পার্টির নীতি ও আদর্শ। সর্বভারতীয় রাজনীতির বাস্তবতায় এটাই ছিল ঘটনা, যদিও রাজ্য রাজনীতির বিচারে কিছু পার্থক্য ছিল। যেমন পশ্চিমবাংলায় যেখানে বামপন্থী আরো দল ছিল, যাদের প্রায় সকলেই মার্কসবাদী কিন্তু কমিউনিস্ট আন্দোলনের শরিক নয়।

তিন

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৪৬ সালের গোড়া পর্যন্ত মনে করেছিল স্বাধীনতার জন্যে ইংরাজদের বিরুদ্ধে ব্যাপক জঙ্গি অন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বন্দিবীরদের মুক্তির দাবিতে দেশব্যাপী গণঅন্দোলন, নৌ-বিদ্রোহে বোম্বাইয়ে শ্রমিক শ্রেণীর অভ্যুথান, বিদেশী শাসনের মূল ভিত্তি পুলিশ ও রাজকীয় সৈন্যবাহিনীর ভারতীয়দের ব্যাপক অসন্তোষ কাজে লাগিয়ে, কংগ্রেস লিগ ও কমিউনিস্ট-সহ অন্যান্য বামপন্থীদের মিলিত সংগ্রাম রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে পারবে। বৈঠকি আলোচনায় কংগ্রেস-লিগের মধ্যে আপোষসূত্র বের করতে ইংরাজদের সাহায্য, পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন নেই। তখন কমিউনিস্ট পার্টি মতাদর্শের লড়াইয়ে রাজনৈতিক মুক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে চলেছে। কিন্তু অচিরে প্রমাণিত হয়ে যায় এই দুই দলের জাতীয় নেতারা বিদেশী শাসনের চেয়ে জনগণের জঙ্গি আন্দোলনকে বেশি ভয় করেন। কারণ তাদের আশঙ্কা ছিল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জঙ্গি মুক্তি আন্দোলন সফল হলেই তার পক্ষে শোষণমুক্তির জন্যে শ্রেণী সংগ্রামে পরিণত হতে দেরি হবে না। কোনও জঙ্গি আন্দোলন নেতৃত্বের রিমোট কন্ট্রোল মেনে চলে না। আর যেকোনো গণআন্দোলন, অচিরে তার নিজস্ব নেতৃত্ব গড়ে তোলে, এক্ষেত্রেও তার ব্যাতিক্রম হবে না।

নেতৃত্বের মনোভাব কমিউনিস্টরা বুঝতে পারার পর থেকেই ১৯৪৬-এ বিকাশমান পরিস্থিতিতে তারা গড়ে তোলে জঙ্গি ও শ্রমিক আন্দোলন। বঙ্গদেশে তেভাগা, কেরলে কৃষক আন্দোলন, তেলেঙ্গানায় কৃষক বিদ্রোহ, সারাভারত ডাক ও তার ধর্মঘট, কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় শিল্পধর্মঘট, যুব ও ছাত্রসমাজের বিস্ফোরণমুখী অভিব্যক্তি তখন কমিউনিস্টদের নেতৃত্ব গড়ে উঠতে ও প্রকাশ পেতে থাকে। সন্দেহ নেই গান্ধীর অসহযোগ ও আইনঅমান্য আন্দোলনের মত তাদের দেশব্যাপী ব্যাপকতা ছিল না। কিন্তু যা ছিল শ্রেণী চেতনার গভীরে যাওয়ার মত, তাদের আলোড়িত করার মত তীব্রতা ও আন্তরিকতা। দেশ একটা। ভূগোলের প্রতিমার বদলে রক্তমাংসের মানুষদের জীবনযাপনের গ্লানি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। ফলে তেভাগা ও কৃষক আন্দোলনের নানা দাবি, শ্রমিক-কর্মচারীদের দাবি-দাওয়া আদায়ের দাবি ক্রমেই সচেতন শ্রেণীর আন্দোলনে পরিণত হতে থাকে। কমিউনিস্টরাই ছিল এইসব আন্দোলনের মূল সংগঠক ও নেতা। এক কথায় এদেশে মতাদর্শের সংঘাত শুরু হয়ে যায় কার্যত এইসময় থেকে, তার আগে যেসব মতবিরোধ ছিল তাদের পথের দ্বন্দ্ব বলাই সঠিক সেগুলি রাষ্ট্রতাত্ত্বিক আলোচনায় মতাদর্শের সংঘাত হিসেবে চিহ্নিত হয় না। তার অর্থ বস্তুত সম্পূর্ণ আলাদা।

সন্দেহ নেই বামপন্থী আন্দোলন তার আগেও শ্রেণী সংগ্রাম, সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামের কথা বলেছে। কিন্তু ঔপনিবেশিক ভারতে জাতীয় মুক্তি লড়াই মুখ্য ঐতিহাসিক সংগ্রাম হওয়ায় সমাজ পরিবর্তনের কথা জোরদারভাবে বলা যায়নি। কিন্তু স্বাধীনতার প্রাক্কালে যখন বোঝা যেতে থাকে যে দেশ বিদেশি শাসনমুক্তি আর শোষণমুক্তির জন্যে সংগ্রামের ডাকে সাড়া দিতে প্রস্তুত, তখন শ্রেণী আন্দোলন আর বিলম্বিত করার কোনো সুযোগ ছিল না। তাছাড়া জনযুদ্ধের রাজনীতির প্রকৃত ব্যাখ্যা করে জাতীয় সংগ্রামের মূলস্রোতের বাইরে থাকা কমিউনিস্টদের পক্ষে সঠিক হয়নি, এই আত্মসমালোচনা প্রকাশ্যে করার মত অবস্থা ও মানসিক প্রস্তুতি, দুটোর কোনোটাই কমিউনিস্টদের ছিল না। তাই ১৯৪৬ সালের বিস্ফোরণমুখী গণচেতনাকে কমিউনিস্টরা একই সঙ্গে পরশাসন বিরোধী ও দেশীয় শোষণ বিরোধী সংগ্রামে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিল। তখনকার কমিউনিস্ট পার্টি ও তার নেতৃত্বের সাংগঠনিক শক্তি ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার পুঁজিতে এইসব সংগ্রাম যতটা বিস্তৃত করা সম্ভব ছিল, সেখানে কোনো সংশয় দুর্বলতা দেখা যায়নি। মেহনতি মানুষ যে তার ডাক বুঝতে ভুল করেনি, তার

প্রমাণ পাওয়া গেছে স্বাধীনতার পর সংসদীয় পথে কমিউনিস্টদের অংশগ্রহণের সময়।

দেশের মূল রাজনৈতিক নেতৃত্ব যে আপোষের পথে ক্ষমতা হস্তান্তরে রাজি, তার জন্যে দেশভাগের কথাও মেনে নিয়েছে, কমিউনিস্টদের পক্ষ থেকে তার সমালোচনা প্রথম থেকে করা হলেও স্বাধীনতার স্বরূপ নিয়ে সংশয় অন্তত ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ ছিল না। কিন্তু দুনিয়ার কোথাও সেইসময় পর্যন্ত ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান আর একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব, এহেন নজিরবিহীন ঘটনা ঘটতে পারে তার কোনো অভিজ্ঞতাও ছিল না। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনেরও নয়। এহেন অভিজ্ঞতার তৎকালীন মূল্যায়ন করে বিকাশমান ব্যবস্থার শ্রেণীচরিত্র নির্ণয় করা এবং কর্মসূচী সেই অনুসারে গ্রহণ ও রূপায়িত করা সত্যিই কমিউনিস্টদের পক্ষে কঠিন কাজ ছিল। দেশের অন্যান্য বামপন্থী দলের সামনে এই সমস্যা দেখা দেয়নি। কারণ তারা জাতীয় আন্দোলনে স্বাধীনতা লাভ করাটাই মুখ্য সংগ্রাম, অন্যগুলি গৌণ, একথা মানতেন। তাই ১৫ আগস্টের পর দেশে সদ্য কায়েম হওয়া সরকারকে কোনো দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা উচিত, সেখানে প্রথম থেকেই শ্রেণী মাপকাঠি প্রয়োগ করেই কংগ্রেস ও তার সরকার সম্পর্কে শেষ কথা বলার প্রশ্ন ওঠেনি। কমিউনিস্টরা এই রাজনৈতিক পরিবর্তনকে সমগ্র জনগণের অভিব্যক্তি অনুযায়ী স্বাগত জানিয়েছে, কিন্তু হুঁশিয়ারি দেওয়ার মত বলতে চেয়েছে জনগণের আসল সংগ্রাম বাকি রয়ে গেল। দেশভাগ যে এড়ানো যেত উপমহাদেশের জনগণের মিলিত সংগ্রামে, সেকথাও বলা হয়েছিল, যদিও রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাকে অভিনন্দিত করা হয়।

চার

মতাদর্শের সংঘাত প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতা-উত্তরকালীন ঘটনা। রাষ্ট্রতত্ত্বে মতাদর্শের ভূমিকা ও কার্যাবলী নিয়ে একালে তাত্ত্বিক আলোচনার কোনো ঘাটতি নেই। আর তার জন্যেই উন্নত পুঁজিবাদে মতাদর্শের ভূমিকা শেষ — end of ideology থেকে শুরু করে কিছুকাল আগে end of history পর্যন্ত সব তত্ত্বই বহুল প্রচলিত, আলোচিত ও বিতর্কিত হয়ে উঠেছে। মার্কিন তত্ত্ববিদ ড্যানিয়েল বেল দুই দশকেরও বেশি আগে মতাদর্শের কাল শেষ বলে মত প্রকাশ করেন। তারই কিছু পরে আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে আরেক মার্কিন তত্ত্ববিদ ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা বলেন ইতিহাসের ও পর্ব শেষ। কারণ পুঁজিবাদ দুনিয়ার চরম ও পরম সত্য, তার শুরু আছে শেষ নেই। কোনো সমাজেই দুনিয়ায় কোথাও আর সেই ধরনের সমূহ কোনো পরিবর্তন ঘটবে না। যাতে নতুন ইতিহাস রচনার প্রশ্ন উঠতে পারে। পরিবর্তন অবশ্যই হবে তবে সেটা পুঁজিবাদেরই নির্ধারিত পথে, তাকে ধ্বংস করার জন্যে নয়। তাই সমাজ যখন মৌলিক বিকাশের শেষ স্তরে এসেছে, তার আর পর কিছু নেই। একালে অর্থনীতিতে বিশ্বায়ন যখন শুরু হয়েছে তখন রাজনীতিতে একটা বিশ্বজনীন মডেল গড়ে উঠবেই, আজ অথবা কাল।

পঞ্চাশ বছর আগে পশ্চিমী ব্যবস্থার অতি বড় কোন তাত্ত্বিক একথা বলার সাহস করতেও পারতেন না। তাহলে দুই শিবিরের তত্ত্ব, মতাদর্শের সংঘাত নিয়ে যুদ্ধোত্তর পশ্চিম দুনিয়া এত মাথা ঘামাতো না। সেসব আজ ইতিহাস। তখন থেকেই পশ্চিমী তাত্ত্বিকরা বলতে থাকেন, সমাজ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় মতাদর্শের বিশিষ্ট ভূমিকা আছে, তার মূল দুটি রূপ আছে, যার একটি হল চলতি ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার মত সর্বতোমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা, আর অন্যটি ব্যবস্থাগত পরিবর্তন ঘটানো। মোটামুটি কোন সমাজে যারা পাওয়ার দলে পড়ে, যারা সম্পদ, শ্রী, স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য থেকে স্থূল বস্তুগত সব উপাদান নিজেদের পাওনা বলে মনে করে, তারা ব্যবস্থাটা টিকিয়ে রাখার, তাকে আরো জোরদার করার পক্ষে। আর যারা না পাওয়া বা বঞ্চিতের দলে, যাদের বঞ্চনার কোন অবসান চলতি অবস্থার মধ্যে কার্যত হওয়ার কোন

সম্ভাবনা নেই, তারা ব্যবস্থাটা বদলানোর দলে, সম্ভব হলে শান্তিপূর্ণভাবে, নয়তো যথাসম্ভব কম শক্তি ও হিংসা প্রয়োগ করে, নয়তো সম্পূর্ণ ভেঙে নতুন একটা ব্যবস্থা কায়েম করতে চায়। দুই পক্ষই চায়, তাদের এই লক্ষ্যপূরণের জন্য এমন একটা হাতিয়ার, একটা মাধ্যম, যার স্বাভাবিক কাজকর্মের মধ্য দিয়েই এই স্থিতাবস্থা কিংবা পরিবর্তনের তত্ত্ব মানুষের মনে বদ্ধমূল হবে। তারই নাম ideology বা মতাদর্শ।

মতাদর্শের কর্মক্ষেত্র মানুষের মন। তার চেতনা চিন্তনে বিশ্বাসের একটা শক্তপোক্ত বুনিয়াদ গড়ে তুলতে পারলে মতাদর্শের কাজ সহজ হয়, প্রচার ও প্রসার দ্রুত ঘটতে পারে। তখন তার সমস্ত কাজের পিছনে যুক্তি হিসেবে থাকে মতাদর্শের ক্রিয়াশীল ভূমিকা। সব কিছু তার নিরিখেই বিচার্য হয়। যেমন আমাদের দেশে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন বঙ্গদেশ ভেঙে দুই বাংলা রুখতে না পারলে, তরুণ বাঙালি প্রজন্ম জঙ্গী আন্দোলনকে সন্ত্রাসবাদের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল, যেখানে ন্যায়-অন্যায় নৈতিকতা-অনৈতিকতা বিচারে একটাই মাপকাঠি ছিল বঙ্গ ভঙ্গ রদ করা যাবে কিনা। সেদিকে একটা সার্থক পদক্ষেপ নিতে পারার জন্যে অন্য সব বিচার উপেক্ষা করা হয়। জাতীয়তাবাদীদের চোখে তাদের সব কাজের তুলনাহীন বৈধতা স্বীকৃত, অন্য বিচারে তার মূল্যায়ন যাইহোক না কেন। তাই মতাদর্শ সব কাজের, সমস্ত আচরণের বৈধতার এমন একটা মান তুলে ধরে, তার মূল্য স্বতন্ত্র। সব মতাদর্শের ভূমিকা এই ক্ষেত্রে এক।

স্বাধীনতার জন্যে আন্দোলনে জাতীয়তাবাদ ছিল এই ধরনের একটা মতাদর্শ, যার সমস্ত কর্মসূচীর গ্রহণযোগ্যতা, বৈধতা নির্ণীত হয়েছিল এই একটি যুক্তিতে। পরিস্থিতি পরে এমন একটা স্তরে পৌঁছায় যখন যে কোন মূল্যে স্বাধীনতা, সেটাই লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। এদেশের মানুষ দেশভাগ মেনে নিয়ে সেই মূল্য দিয়েছে। সেই স্বাধীনতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আর সব প্রশ্ন গৌণ হয়ে ছিল। সমাজ বদলের জন্যে শ্রেণী আন্দোলনকে সংগ্রামের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া তাদের অন্যতম বক্তব্য। শোষণের, বঞ্চনার বহু শত বছরে গড়ে ওঠা পাহাড়, ক্ষমতা হস্তান্তরের পরেই যখন সরাসরি নতুন শাসকদের সামনে এসে দাঁড়ায়, তখন তাঁরা তাদের মোকাবিলার জন্যে রাজি ছিলেন না, হয়তো বা আদৌ কোন সমাধানের কথা ভাবতেও প্রস্তুত ছিল না। অথচ সমস্যা মোকাবিলা না করে উপায়ও ছিল না। বরং দেশভাগ সমস্যাকে আরো তীব্র, জরুরি করে তোলে। নতুন শাসকরা ভেবেছিলেন ক্ষমতা হস্তান্তরের পর যে কোন প্রশ্নের মোকাবিলায় জাতীয়তাবাদকেই কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যাবে। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় মুলতুবী হয়ে থাকা সমস্যা যে জাতীয়তাবাদের কাঠামোর মধ্যে মোকাবিলা করা যায় না, তার চেষ্টা করতে গেলে সমাজে স্থিতাবস্থার শক্তি সবচেয়ে প্রাধান্য পায়, স্বাধীনতার অল্পকাল পরেই সেই উপলব্ধি মাথা চাড়া দেয়। শাসক ও শাসিত, জনজীবনের উভয় অংশেই এই ধারণা ব্যাপক ছড়িয়ে পড়ে। তার থেকেই শুরু হয় মতাদর্শের সংঘাত, যা প্রথম থেকেই স্থিতাবস্থা বনাম পরিবর্তনের দ্বন্দ্ব হিসেবে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

প্রসঙ্গত বলা দরকার এই দ্বন্দ্বের ভৌগোলিক বিস্তৃতি গোটা দেশজোড়া তখনও ছিল না, পরেও ঘটেনি। বরাবরই তার সীমানা আঞ্চলিক হয়ে রয়েছে। দেশের অসম বিকাশ মানুষের রাজনৈতিক চেতনায় যত বিরাট মাপে প্রতিফলিত হয়েছে, বোধহয় তার চেয়ে বেশি অন্য কোথাও সম্ভব ছিল না। চেতনার এই অসমতা মতাদর্শের সংঘাতের পরিধি প্রভাবিত করেছে সবচেয়ে বেশি। সমাজ পরিবর্তনের দৃষ্টিকোণ থেকে বামপন্থী মতাদর্শ, বিশেষত মার্কসীয় মতবাদ কমিউনিস্ট আন্দোলনের এদেশের ইতিহাসে সাত দশকের বেশি সময় কেটে গেলেও কেন যে তার আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে পারেনি, সেই অতি বাস্তব ঘটনা তার প্রমাণ। এই অনুষঙ্গে এটাও উল্লেখ্য, মতাদর্শের সংঘাত এখানে সমাজের অগ্রগতিমূলক পরিবর্তনের সূত্রেই বোঝানো হচ্ছে, পশ্চাদগতি অর্থে নয়। ধর্মীয় মৌলবাদের মতাদর্শও

সংঘাত বাধাতে চায়, যা গত এক দশকে নানা আকারে প্রকাশ পেয়েছে, সেই সংঘাত এই আলোচনার পরিধির বাইরে।

তবুও প্রাসঙ্গিক বিষয় বলেই শুধু এইটুকু উল্লেখ করা যেতে পারে, (১) দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগের মধ্য দিয়ে মৌলবাদের যে জয় সূচিত হয়েছিল, এদেশের মানুষের সুস্থ গণতান্ত্রিক চেতনা ক্ষমতা হস্তান্তরের পর তাকে মোটেই প্রাধান্য দিতে চায়নি। (২) মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকাণ্ড ভারতীয় মৌলবাদকে, অর্থাৎ হিন্দুত্ববাদী ধারণাকে অন্তত তখন দুই দশকের জন্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার শক্তিকে নিদারুণ আঘাত করেছিল। (৩) আর কম সংখ্যায় এবং পরিমাণে হলেও মানুষ এটাও বুঝেছিল এই ভাঙা দেশকে চাঙ্গা করে তুলতে তাদের আরো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকতে হবে। এই তিনটি বক্তব্যের নির্যাস হল ভারতীয় জাতীয়তাবাদ আপাতত বিকল্পবিহীন। সুতরাং স্বাধীন দেশের সরকার, ঔপনিবেশিক শাসনমুক্ত যে সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠছে, তাকে নির্বিবাদে টিকে থাকতে দিতে হবে। জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত এটাই সার কথা।

জাতীয়তাবাদের এই স্থিতাবস্থাপন্থী অবস্থানের বিপরীতে, তাকে বদলানোর তাগিদ থেকেই শুরু হয়েছিল মতাদর্শের সংঘাত। এটার একমাত্র লক্ষ্য ছিল সমাজের কাঠামোগত পরিবর্তন। তার জন্যে লড়তে হবে, সে লড়াই স্বল্প অথবা দীর্ঘস্থায়ী কি হতে পারে, তার কোনো ধারণা সমাজের শাসক এবং শাসিত, কোনো স্তরেই ছিল না। ব্যতিক্রম অবশ্যই ছিল কমিউনিস্ট ও মার্কস কিংবা অ-মার্কসবাদী বামপন্থীদের মধ্যে। কারণ সংগ্রামের আসল লক্ষ্য কি, সে বিষয়ে অন্তত তাদের ধারণা ও বক্তব্যে কোনো অস্বচ্ছতা, কোনো পর্বেই ছিল না, এমনকি থাকার কথাও ছিল না। কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনের যে কাজ তারা করতে পারেনি।' ক্ষমতা হস্তান্তরের পর তা আর পিছিয়ে দেওয়া কিংবা ভুলে থাকা সম্ভব ছিল না। কিন্তু এখানেও কমিউনিস্ট এবং অ-কমিউনিস্ট ও বামপন্থীদের অন্য দলগুলির মধ্যে পরিস্থিতির মূল্যায়নে গুরুতর পার্থক্য দেখা দেয়।

পাঁচ

কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৪৮ সালে তার দ্বিতীয় কংগ্রেস থেকেই নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গীতে ক্ষমতা হস্তান্তর, কেন্দ্রীয় সরকার এবং শাসক কংগ্রেস সম্পর্কে একটা মৌলিক অবস্থান্তরের পরিচয় দেয়। তারাই প্রথম বলে 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়', এই স্বাধীনতা কোনো স্বাধীনতা নয়, এটা সাম্রাজ্যবাদের ভারতীয় জনগণের মুক্তি সংগ্রাম বানচাল করে দেওয়ার কৌশল। আসলে দেশে ইংরাজরা বেনামী শাসন চালাচ্ছে, তাই জনগণকে সাম্রাজ্যবাদ ও তার বেনামদার শাসক কংগ্রেস দল, দুয়ের বিরুদ্ধেই লড়তে হবে। অন্যসব মার্কসবাদী অ-কমিউনিস্ট দল, ও বামপন্থীরা এই মতের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। ফলে স্বাধীনতা-উত্তরকালীন মতাদর্শের সংঘাত কার্যত অচিরে দাঁড়িয়ে যায় কংগ্রেস ও কমিউনিস্টদের মধ্যে মুখোমুখি মরিয়া সংঘাতে। মতাদর্শে এই দুয়ের মধ্যে মেরুগত ব্যবধান ক্ষমতা হস্তান্তরের ঠিক পরবর্তী অধ্যায়। অন্যসব বামপন্থীদের সঙ্গে তখন কমিউনিস্ট পার্টির ব্যবধান বেড়েই যেতে থাকে।

স্বাধীনতার প্রকৃতি নিয়ে অ-কমিউনিস্ট দলগুলির সঙ্গে কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের মূল্যায়নে কোনো পার্থক্য ছিল না। কংগ্রেসের সঙ্গে তাদের মতবিরোধের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায় সরকারের শ্রেণীচরিত্রের বিচার, দেশে সমাজ পরিবর্তনের রণনীতি ও রণকৌশলের স্তর নির্ণয়ে। তাদের সেই মূল্যায়নের সঙ্গে কমিউনিস্টদেরও মতভেদ ছিল। মোট কথা হল মতাদর্শের সংঘাত এই পর্বে দাঁড়ায় কমিউনিস্টদের দৃষ্টিকোণ থেকে সাম্রাজ্যবাদ ও তার বেনামদারদের বিরুদ্ধে দালাল ও সহযোগী অংশ বাদ দিয়ে সমগ্র জনগণের সংগ্রাম আর অ-কমিউনিস্ট সমস্ত বামপন্থীদের দৃষ্টিকোণ থেকে শোষক ও শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে

সমস্ত শোষিত মানুষদের সংগ্রাম। সংঘাতের এই ভিন্ন দুটি দৃষ্টিকোণ থেকেই বোঝা যায় শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কমিউনিস্টরা কত নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিল, যার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে সরকার কমিউনিস্টদের উপর দমনপীড়ন চালাতো। শ্রেণীস্বার্থের বিচারে সরকারের সেইসব কাজ অস্বাভাবিক ছিল না। স্বাধীনতার বৈধতা অস্বীকার করা হলে যে কোনো সরকারের পক্ষে দমন-পীড়ন নীতি প্রয়োগের একটা সুযোগ সৃষ্টি হয়, সরকার যার চূড়ান্ত সদব্যবহার করে। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

কমিউনিস্টদের মূল্যায়নে যে ভুলই থাক তারা একনিষ্ঠভাবে গৃহীত কর্মসূচী রূপায়িত করতে থাকে, তার জন্য চরম ত্যাগ স্বীকার করে এবং কৃষক ও শ্রমিকসহ মেহনতী মানুষদের সঙ্গে থেকে তাদের দাবি-দাওয়া আদায় ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই চালিয়ে যায়। তাদের নীতি ও অবস্থান যে মতাদর্শগত, কোনো সংকীর্ণগোষ্ঠী বা আঞ্চলিক স্বার্থ, কিংবা সুবিধাবাদী মনোভাব থেকে তারা কাজ করছে না, ১৯৪৮ - ৫০ সালের অসংখ্য ঘটনায় তার প্রমাণ পাওয়া যেতে থাকে। এই নিষ্ঠা আন্তরিকতা জনগণের সঙ্গে মিশে থাকার উদ্যোগ দেশের যেসব অঞ্চলে তাদের সদস্য ও সংগঠনের কিছুটা প্রভাব ছিল সেখানেই তাদের প্রতিষ্ঠা দেয়। তাই স্বাধীনতার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করার মত হঠকারিতা সত্ত্বেও কমিউনিস্টরা তাদের আদর্শ নিষ্ঠার জন্যে কৃষক, শ্রমিক সংগ্রাম ও মধ্যবিত্ত কেরানি কর্মচারী অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে আন্দোলন সংগঠিত করার সুবাদে নিজের গণভিত্তি প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়। শুধু এলাকা নয়, রাজ্যভিত্তিতেও সেটাই ঘটে। অন্তত তখন এটা প্রমাণিত হয় /ঝুটা আজাদি*র বিরুদ্ধে কমিউনিস্টদের বামপন্থী সংকীর্ণতাবাদী তত্ত্ব সাধারণ মানুষদের থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করে দেয়নি। তারা আজাদি অলীক একথা মেনে না নিলেও এটাও মানেননি যে কমিউনিস্টরা বিশেষ কোনো স্বার্থ চরিতার্থ করতে স্বাধীনতার বিরোধিতা করছে।

সরকারের অনুসৃত কমিউনিস্ট বিরোধিতার নীতিও এই পার্টিকে তাদের প্রভাবাধীন অঞ্চলে জনগণের কাছে কংগ্রেসের প্রধান বিরোধী হিসেবে তুলে ধরতে সাহায্য করে। যেসব রাজ্যের রাজনীতিতে বরাবরই একটা র‍্যাডিকাল ধারা ছিল, কিংবা যেখানে দীর্ঘদিনের নানা সংগ্রামে সাথী হিসেবে কাজ করার জন্যে মেহনতী মানুষের মনে কমিউনিস্টদের প্রতি যথেষ্ট সমর্থন ছিল, সেখানে শাসক কংগ্রেস ও কমিউনিস্টদের মধ্যে মতাদর্শের সংঘাত শুধু রাজনীতি নয়, চলমান জীবনের নানা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে প্রকাশ পেতে থাকে। যেমন চল্লিশের দশকেও বাংলায়, দেশভাগের আগে ও পরে, সুবিশাল মাদ্রাজ প্রদেশের তেলেগু ভাষী তেলেঙ্গানা এলাকায় যা নিজামের শাসনকাল থেকেই কমিউনিস্টদের কৃষান অন্দোলনের বিশিষ্ট অঞ্চল বলে চিহ্নিত হয়েছিল, সুদূর দক্ষিণে তামিল ভাষী কোয়েম্বাটুর, মাদুরাই এলাকায়, প্রাক্তন ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন রাজ্য এবং বোম্বাইয়ে শিল্প শ্রমিকদের মধ্যে বামসংকীর্ণতাবাদী রাজনীতি সত্ত্বেও কমিউনিস্টদের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়া ছাড়া, কমে যায়নি। এই ধরনের জনসমর্থন বামসংকীর্ণতাবাদকে অনেকদিন টিকে থেকে পাল্টা লড়াই চালাতে সাহায্য করে। দেশের রাজনৈতিক তথা জনজীবনের মূল ধারা থেকে কমিউনিস্টদের বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার কোনো নীতি, সরকারের প্রবল আগ্রহ ও আনুকূল্য সত্ত্বেও কিছুই তেমন কাজ করেনি। এই পটভূমিতে মতাদর্শগত সংঘাত প্রসঙ্গে দু-একটি বিষয়ের দিকে নজর রাখতে হয়।

ছয়

প্রথমত ভারতে জাতি চেতনা এবং তার বৈশিষ্ট্য হিসেবে জাতীয়তাবাদের মতাদর্শ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের আগে ছিল না। বিরাট মাপের আঞ্চলিক বিকাশের তারতম্য সেই চেতনাকে বহুলাংশে খণ্ডিত করেছিল। গান্ধী আন্দোলনের সূত্রে একটা ভাসা ভাসা জাতীয়তাবাদ সমস্ত আঞ্চলিক তারতম্যকে সাময়িকভাবে চেপে রেখে প্রাধান্য পায়, ক্ষমতা

হস্তান্তরের পরেই যার স্বরূপ প্রকাশ পেতে থাকে। জাতীয় নেতৃত্ব ভেবেছিলেন জাতীয়তাবাদ বিশল্যকরণীর কাজ করবে, দেশের সব সমস্যার সমাধানের পথ করে দেবে। এহেন অবস্থায় সমাজ পরিবর্তনের মতাদর্শ সাধারণ মানুষের মনে গভীর প্রভাব বিস্তারের সুযোগ কম পেতে বাধ্য। মানুষ সবার আগে তাদের স্থগিত হয়ে থাকা দাবি-দাওয়া আদায়ের পথ নেয়। ফলে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে নানা অঞ্চলের মানুষদের যে সব বিষয় নিয়ে সংঘাত বাধে তার মূল বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায় বিক্ষোভের রাজনীতি। তাদের যোগ ছিল প্রত্যক্ষ কতগুলি সমস্যা সমাধানের সঙ্গে, যেখানে সমাজ পরিবর্তনের মত মৌল কোন চেতনা গড়ে ওঠার সুযোগ পায়নি। তার উপর কংগ্রেস দলের অনুসৃত নীতি, যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাশার বিস্ফোরণ ক্রমেই সাধারণ মানুষকে দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা সমাধানের জন্যে আন্দোলনমুখী করে তোলে। সমাজ পরিবর্তনের জন্যে মতাদর্শের সংঘাত বলতে যে গভীর ও ব্যাপক সচেতনা বোঝায় অর্থনৈতিক দাবি আদায়ের আন্দোলনে সেটা গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল না তখনই।

তত্ত্বগতভাবে স্বীকার্য যে অর্থনৈতিক অন্দোলনের তীব্রতা অমীমাংসিত সমস্যার জন্যে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকলে তা রাজনৈতিক পরিবর্তনের সংগ্রামে পরিণত হয়। কিন্তু সেটি প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় সমাজে জাতীয়তাবাদের আবেগগত অভিঘাত খুবই সীমিত থাকার জন্যে যে ভাবে সম্ভব হতে পারে, ভারতের মত সদ্যস্বাধীন রাষ্ট্রে যেখানে শাসকরা জাতীয়তাবাদের আবেদনকে আরো ব্যাপক করতে তৎপর ছিলেন, সেখানে তেমনই কঠিন কাজ ছিল। সাধারণ মানুষ ঠিক তখন এটা ভাবতে প্রস্তুত ছিল না যে, জাতীয়তাবাদের সব সম্ভাবনা নিঃশেষিত হয়ে গেছে। তার উপর ঠাণ্ডা যুদ্ধের পরিমণ্ডল, সদ্যস্বাধীন দেশগুলিকে পরনির্ভর করে তোলার জন্যে সাম্রাজ্যবাদের নানা চাপ, নানা কৌশল, জাতীয়তাবাদের আবেদন দুর্বল করার বদলে, তাকে বিশেষ মাত্রায় বজায় রাখতে সাহায্য করে। কমিউনিস্ট ও অন্যান্য বামপন্থীদের সমাজ পরিবর্তনের তত্ত্ব তাই দলীয় নেতা ও কর্মিবৃন্দ, বুদ্ধিজীবী সমাজের একাংশের বাইরে গণসমর্থন লাভ করতে পারেনি। আর শুধু তখনই নয়, স্বাধীনতার পাঁচ দশক পরেও সমাজ পরিবর্তনের বৈপ্লবিক মতাদর্শভিত্তিক আবেদন কয়েকটি অঞ্চলে কিছু সংখ্যক মানুষের মধ্যেই সীমিত হয়ে আছে। সব মতের কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কে তাদের নিষ্ঠা আন্তরিকতা কর্মসূচীর বিশুদ্ধতা নির্বিশেষে একথা প্রযোজ্য।

দ্বিতীয়ত, জীবন সংগ্রামের প্রাত্যহিক আন্দোলনের তাগিদ কমিউনিস্টসহ সব বামপন্থীদের সরকারের নানা নীতির বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক সংগ্রামে সামিল করতে থাকে। ফলে সমাজ পরিবর্তনের মতাদর্শ সরকার বিরোধী দাবি আদায়ের নানা আন্দোলনের পরিসীমায় আটকে পড়ে। এদের কোনটাই গৌণ, অকিঞ্চিৎকর ছিল না। কিন্তু এইসব আন্দোলনে শাসক ও শাসিতদের শ্রেণী-বিরোধের তত্ত্ব অর্থনীতিবাদের গণ্ডির মধ্যে ঢুকে পড়ে। পঞ্চাশের দশকে পশ্চিমবাংলায় বামপন্থী কর্মীদের এই অভিজ্ঞতা ব্যাপক শ্রমিক, কৃষক থেকে মেহনতী মানুষদের বড় একটা অংশ তাদের আর্থিক ও অর্থনৈতিক দাবি আদায়ের জন্যে যেখানে বামপন্থীদের নেতৃত্ব অকুণ্ঠভাবে মেনেছে, তারাই রাজনৈতিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী অবস্থান নিয়ে কমিউনিস্ট ও অন্যান্য বামপন্থীদের বিরোধিতা করেছে। শাসক ও শাসিতের শ্রেণীদ্বন্দ্বের ধারণা তাদের মনের, চেতনার গভীরে প্রবেশ করে থাকলে কখনোই এই ব্যাপার ঘটতে পারতো না। অর্থাৎ নিছক জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে, তাদের অনুগত্যের কোন পরিবর্তন ঘটেনি।

কমিউনিস্টসহ সব বামপন্থীরা তখন আন্দোলনের আশু লক্ষ্য হিসেবে সরকারের সমালোচনা ও নীতি পরিবর্তনের অনুকূলে মত প্রকাশ করতে থাকেন। দেশজোড়া পরিস্থিতি এর চেয়ে সেই সময়ে কোন উন্নত মানে ওঠেনি। একথা এড়িয়ে যাওয়া যায় না যে

কমিউনিস্টরা ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায় বলে যেসব আন্দোলন গড়তে চেয়েছিল, তাদের রাজনৈতিক আবেদনে মানুষ সাড়া দেয়নি, কিন্তু অর্থনৈতিক দাবি আদায়ে তাদের নেতৃত্ব মেনেছে। এই নেতিবাচক তাৎপর্যের অবশ্য একটা সদর্থক অবদান ছিল। সরকারের পক্ষ থেকে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদ বিরোধিতার নানা ফিরিস্তি সংগ্রামী মানুষ মেনে নেয়নি। কারণ তাদের অভিজ্ঞতায় এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, শাসক গোষ্ঠী রাজনীতির যে ব্যাখ্যা দেয় তাতে বিরোধীপক্ষের শক্তিকে খাটো করার একটা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকে। তাই কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার চালিয়ে জনগণ থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করা যায়নি। এখানে আরো একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে আত্মরক্ষার তাগিদে সরকার অ-কমিউনিস্ট বামপন্থীদের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে একই ধরনের অভিযোগ করতে থাকে যা এতদিন কেবল কমিউনিস্টদের জন্যেই বরাদ্দ করা ছিল। অর্থাৎ একটা সামগ্রিক জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে কমিউনিস্ট-সহ সমস্ত বামপন্থীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হতে থাকলে, বামপন্থীদের মধ্যে জোট বাঁধার তাগিদ সৃষ্টি হয়। সেই তাগিদ জোরালো হয়ে ওঠে যখন সমাজ পরিবর্তনের বৈপ্লবিক মতাদর্শ কমিউনিস্ট-সহ সব বামপন্থীদের নানা ভুলভ্রান্তি ও সীমাবদ্ধতার জন্যে, শাসকশ্রেণী ও সরকারের বিপুল শক্তি নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ায় নিছক আত্মরক্ষার তাগিদে তাদের সরকারের নীতির বিরোধিতায় জোট বাঁধতে হয়। দেশে পার্লামেন্টারী রাজনীতির সূচনাপর্ব এই তাগিদকে প্রায় বাধ্যবাধকতায় পরিণত করেছিল।

সাত

প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান প্রবর্তন, রাজনৈতিক অধিকার ও সর্বজনীন ভোটাধিকার ভারতের মত বিরাট দেশে ১৯৫০-৫২ সালে কত বড় মাপের ঘটনা ছিল, চার দশকে অভ্যস্ত পার্লামেন্টারী রাজনীতির পরে তা হয়তো তেমন করে বোঝা সম্ভব নয়। জহরলাল প্রমুখ জাতীয় নেতারা প্রথম থেকেই পার্লামেন্টারি ব্যবস্থার পক্ষে ছিলেন। কোনভাবেই তারা মার্কিন আদলে রাষ্ট্রপতি প্রধান ব্যবস্থা চালু করতে চাননি। আইনসভার কাছে সরকারের দায়িত্বশীলতা, পার্লামেন্টারী ব্যবস্থার এই মর্মবস্তু ভারতে একটা স্বতন্ত্র তাৎপর্য পায়। ইংল্যান্ডে এই দায়িত্বশীলতার অর্থ হল চলতি সরকারের বিকল্প ব্যবস্থাকে ক্ষমতায় যাওয়ার পথ করে দেওয়া। পার্লামেন্টারী বিরোধীপক্ষ বলতে কার্যত সেটাই বোঝায়। স্বাধীনতা পরবর্তী কয়েক দশকে কেন্দ্রীয় শাসনে কংগ্রেসের কোন বিকল্প সরকার প্রতিষ্ঠার কোন সুযোগই ছিল না। কারণ দেশজোড়া তেমন কোন কমিউনিস্ট, অ-কমিউনিস্ট বামপন্থী অথবা অ-বামপন্থী কংগ্রেস বিকল্প গড়ে ওঠার পরিস্থিতি ছিল না। অথচ সরকারের নানা অন্যায় অনাচারের বিরুদ্ধে জনগণের দাবি অনুযায়ী বিরোধিতা সংগঠিত করার তাগিদ ছিল।

প্রথম সাধারণ নির্বাচনে কমিউনিস্ট ও অন্যান্য বামপন্থীরা অংশগ্রহণ করবে কিনা, নির্বাচনী রাজনীতি তাদের মতাদর্শভিত্তিক সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামকে গৌণ করে দেবে কিনা, তা নিয়ে নানা বিতর্ক ওঠে দলের নানা স্তরে। কিন্তু শেষপর্যন্ত আঞ্চলিক এবং সর্বভারতীয় ভিত্তিতে কমিউনিস্ট ও অন্যান্য বামপন্থীরা অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনী রাজনীতির একটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে। মানুষের ভোট চাইতে গেলে তাদের সামনে বিশ্বাসযোগ্য এবং রূপায়ণযোগ্য একটা কর্মসূচী তুলে ধরতে হয়। তার ভিত্তি হল জনাদেশ তাদের গরিষ্ঠতা দিলে তারা ভিন্ন ধরনের কর্মসূচীভিত্তিক একটা সরকার গঠন করবে। তা না হলে দায়িত্বশীল বিরোধীপক্ষের ভূমিকা পালন করবে। প্রথম দিকের নির্বাচনগুলিতে সব বামপন্থীরা মিলিতভাবেও রাজ্যে এবং কেন্দ্রে সব আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেনি। সুতরাং কংগ্রেসের বিকল্প শাসন কায়েম করার প্রশ্ন ওঠেনি। কিন্তু তারা যে কথা বলেছে তার মর্মবস্তু হল জনগণের দাবি-দাওয়া পূরণের জন্যে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়তে হবে, আর বাইরে সেই গণআন্দোলনের দাবি

আইনসভার মধ্যে তোলার জন্যে বামপন্থীদের বেশি সংখ্যায় নির্বাচন করতে হবে। ভিতর ও বাইরের আন্দোলনের মধ্যে নিবিড় যোগসূত্র গড়ে উঠলে মানুষের দাবি আদায় ও অধিকার রক্ষা করা যাবে।

কমিউনিস্ট ও সব বামপন্থীরা একথা অবশ্যই বলেছিল যে মানুষের সার্বিক অগ্রগতি ও শোষণমুক্তির জন্যে সমাজতন্ত্রের কোন বিকল্প নেই। এক কথায় মতাদর্শভিত্তিক আন্দোলন ও সংগ্রামের চূড়ান্ত লক্ষ্য আর জনগণের বহু সমস্যার তৎকালিক সমাধান, এই দুটি পর্বকে মেলানোর চেষ্টার মধ্যে দিয়েই পঞ্চাশের দশক থেকে কমিউনিস্ট ও বামপন্থীদের নির্বাচনী ও বিপ্লবী রাজনীতির পর্ব ও পর্বান্তর শুরু হয়। প্রথম নির্বাচনের আগে ও পরে দেশের রাজনীতিতে মতাদর্শের যে প্রভাব পড়তে শুরু করেছিল, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নেহরুর উদ্যোগে ১৯৫৫ সালে কংগ্রেসের আবাদি অধিবেশনে জাতীয় বিকাশের লক্ষ্য হিসেবে একটা সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গড়ার প্রস্তাব গ্রহণ। এই প্রস্তাব আদৌ আন্তরিক ছিল কিনা সেই বিতর্ক এই আলোচনায় অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু যার প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য তা হল, চলতি ব্যবস্থার একটা সমাজতান্ত্রিক বিকল্প গড়ে তোলার কথা সরকার ও শাসক দল হিসেবে কংগ্রেস যখন বলে কিংবা বলা দরকার বলে মনে করে তখন দেশে যে বিশেষ ধরনের পরিবর্তনের একটা চাপ অনুভূত হচ্ছিল, সেটা মানতেই হবে। তা না হলে সংবিধান রচনা কালেই প্রস্তাবনায় সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের বা অনুরূপ কিছু বলা হত। তার আরো একটা প্রমাণ সত্তরের দশকে অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থায় মানুষ যখন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে চরমভাবে, তখন সেই ১৯৭৬ সালের নভেম্বরে সংবিধান সংশোধন করে যেমন মৌলবাদী শক্তির মোকাবিলায় সেকুলার শব্দটি, তেমনি সমাজতান্ত্রিক শব্দটিও প্রস্তাবনায় সংযোজন করা হয় বিক্ষোভ তখনকার মত প্রশমিত করতে।

এককথায় দেশের স্থিতাবস্থা যে বদলাতে হবে সেকথা কমিউনিস্ট ও বামপন্থীরা বলতে শুরু করার অল্পকালের মধ্যে শাসক শ্রেণীর দল কংগ্রেসও যখন সমাজতন্ত্রের কথা বলতে থাকে তখন মতাদর্শের সংঘাত একটু নতুন মাত্রা পায়। শাসক দল কংগ্রেস সমাজতন্ত্রের কথা বলে to appropriate the ideology of the Left, যার উদ্দেশ্য ছিল জনমানসে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা। শাসকদল ক্ষমতা, প্রভাব, সুযোগ, নেতৃত্বের ক্যারিসমা এবং দেশব্যাপী বিকল্প নেতৃত্বের অভাব সব কিছু কাজে লাগিয়ে নিজের নীতি ও পথে অবিচল থাকতে চেয়েছিল। সত্তরের দশকে নকশালপন্থীদের সংগ্রাম মতাদর্শের সংঘাতকে জঙ্গি কায়দায় যখন ছড়িয়ে দিতে চায় দেশের দরিদ্রতম মানুষদের মধ্যে, তার হঠকারিতা সত্ত্বেও একটা নতুন পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল তাদের আত্মত্যাগের জন্যে তখন শাসক শ্রেণী স্বৈরাচারী পথে তার এবং জয়প্রকাশ নারায়ণের সর্বাত্মক বিপ্লবের আন্দোলন মোকাবিলা করতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাকেই লক্ষ্যমাত্রা বলে ঘোষণা করে। তারই জমি তৈরি করতে committed judiciary, committed bureaucracy প্রভৃতি তত্ত্ব হাজির করা হয়েছিল। এসবই ছিল ভারতের বিশেষ পরিস্থিতিতে মতাদর্শগত সংঘাতের বিশিষ্ট রূপ।

আট

পঞ্চাশের দশকের শেষ থেকেই কমিউনিস্ট ও অন্যান্য অ-কমিউনিস্ট মার্কসবাদীরা নিজেদের বিশ্বাস ও বিশ্লেষণের নিরিখে ভারতীয় বিপ্লবের স্তর নিয়ে নানা মতভেদ থাকলেও সর্বজনীন ভোটাধিকারভিত্তিক সংসদীয় রাজনীতিতে ক্রমেই বেশিমাত্রায় জড়িয়ে পড়তে থাকেন। কেরলে নাম্বুদিরিপাদের নেতৃত্বে প্রথম কমিউনিস্ট প্রধান মন্ত্রিসভা গঠন ঘটনা হিসেবে কেবল অনন্য ছিল না, মতাদর্শের সংগ্রামে একটা নতুন মাত্রা যোগ করার দিক থেকেও বিশিষ্ট ছিল। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশ ইতালি ও ফ্রান্সে কমিউনিস্টরা প্রতিরোধ সংগ্রাম

সংগঠিত করার সুবাদে যুদ্ধোত্তরকালে এই দুটি দেশে সরকারে যোগ দিয়েছিল। ঠাণ্ডাযুদ্ধের চাপে কিছুকালের মধ্যেই সরকার থেকে তারা সরে যেতে বাধ্য হয়। সরাসরি নির্বাচনে জিতে সরকার গঠন সারা দুনিয়ার মধ্যে ভারতেই প্রথম সম্ভব হয়েছিল কেরলে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে। তার রাজনৈতিক অভিঘাত স্বাভাবিক কারণেই ব্যাপক হয়েছিল।

তখনকার ঠাণ্ডাযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে যখন বৈপ্লবিক সংগ্রাম ব্যর্থ করতে মার্কিন প্রশাসন প্রায় মরিয়া হয়ে উঠেছে এবং পারমাণবিক যুদ্ধের সার্বিক প্রস্তুতির মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান অথবা পারমাণবিক ধ্বংস, এই দুটি বিকল্প মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে তখন আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনও শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভব বলে মত প্রকাশ করে। ফলে ভারতের কমিউনিস্ট ও বামপন্থী আন্দোলনও আর নির্বাচনকে শাসকশ্রেণীর রাজনৈতিক বিরোধিতার স্তরে আবদ্ধ না রেখে নির্বাচনকেও সংগ্রাম বলে মনে করতে শুরু করে। রাজনীতি সচেতন মানুষের মধ্যেও সেই চেতনা জোরালো হয়ে ওঠে। তারাও দাবি করে সরকারের পরিবর্তনের জন্যে, মৌলিক কোন পরিবর্তন করা সম্ভব না হলেও, শাসক শ্রেণীর অপশাসনের অবসান ঘটাতে বাম বিকল্পের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা দরকার। আর যেহেতু সারা ভারতের ভিত্তিতে ভৌগোলিক দিক থেকে বাম বিকল্প কেবল কিছু রাজ্যেই সম্ভব, তাই পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের সুযোগ কাজে লাগিয়ে সেখানেই উদ্যোগ নিতে হবে। সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলন তার পাশাপাশি চলতে পারে, একটা অন্যটার পরিপূরক সংগ্রাম, একটা বাদ দিয়ে কেবল অন্যটার কথা ভাবা পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী অনুচিত হবে।

সমগ্রভাবে মার্কসবাদী বামপন্থীদের মধ্যে ভারতীয় বিপ্লবের স্তর নিয়ে মতভেদ তখনও ছিল, এখনও আছে। বিপ্লবের স্তরের উপরেই সমাজপরিবর্তনে রণনীতি ও রণকৌশল স্থির করা হয়। ভারতে কোন শ্রেণী শাসনক্ষমতায় আছে, তার সহযোগী কারা, বিদেশে তার মিত্রশক্তি কে এবং কারা, তা নিয়ে চুলচেরা বিতর্ক মার্কসবাদী তাত্ত্বিক মহলে এখন পুরনো কাসুন্দির মত। তারা সবাই বিশুদ্ধতাবাদী। সকলেই তত্ত্ব ও তথ্যের বিপুল সমাবেশ ঘটিয়ে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম। মার্কসবাদী মহলের বাইরে কোটি কোটি মানুষের জীবন সংগ্রামের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ সংযোগ কোথায়, সেটা আজও দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষকে বোঝানো সম্ভব হয়নি। অথচ শাসক শ্রেণীর অনাচার, শোষণ ও পীড়ন চলছে একটানা। তারই প্রত্যক্ষ অভিঘাতে যখন মানুষ পথে নেমেছে আন্দোলন করতে প্রতিকারের জন্যে, সম্ভব হলে প্রতিরোধ, তখন সব মতের বামপন্থীরা মার্কসবাদী-অমার্কসবাদী নির্বিশেষে তাতে সামিল না হয়ে পারেনি। বলা বাহুল্য এইসব গণ আন্দোলন সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রাম ছিল না। তাদের মধ্যে সেই সংগ্রামের বীজ থাকলেও তাকে বাস্তবায়িত করা যায়নি। কিন্তু গণ আন্দোলনের যে ঢল নেমেছিল পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকে ষাটের দশকের প্রায় শেষ পর্যন্ত, তাতে ক্রমে এটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে সমাজ পরিবর্তন এখনই সম্ভব না হলেও কংগ্রেসের শাসনক্ষমতার পরিবর্তন আনা যায়। তারই পরিণত রূপ হল সার্বিক কংগ্রেস বিরোধিতা ও বাম বিকল্পের রাজনীতি। এই রাজনীতির প্রয়োগ ক্ষেত্র নির্বাচন। সন্দেহ নেই এর পিছনেও মতাদর্শ ছিল, সকলের না থাক অনেকের ছিল। কিন্তু পার্লামেন্টারী রাজনীতির স্বকীয়তার জন্যে যখন সেটা কংগ্রেস ও অকংগ্রেসি সরকার প্রতিষ্ঠার সংঘাতে পরিণত হয়, তখন রাজ্য রাজনীতির চেতনার তারতম্যের জন্যে পশ্চিমবাংলা ও কেরলের মত কোথাও তা হয়ে পড়ে বাম-গণতান্ত্রিক শক্তির কংগ্রেস বিরোধী জোট, আবার বিহার থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত তা হয়ে দাঁড়ায় সংযুক্ত বিধায়ক দলের শাসন অর্থাৎ সার্বিক কংগ্রেস বিরোধী জোট।

১৯৫৭ সালে দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন থেকে দেশের বিকাশমান রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় প্রজাতান্ত্রিকতার স্বীকৃতি হিসেবে পার্লামেন্টারি রাজনীতি এমনই প্রভাব বিস্তার করতে থাকে যে কমিউনিস্ট ও অকমিউনিস্ট মার্কসবাদী এবং অন্য সব বামপন্থীদল সেই রাজনৈতিক বৃত্তের

শরিক হয়ে পড়ে। তার বাইরে থাকা কার্যত আর কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। শুধু তাই নয়, কোন দলের গণভিত্তি, জনপ্রিয়তা, রাজনৈতিক কোন বক্তব্য, সমালোচনার কার্যকারিতা বুঝতে এবং অন্যদের বোঝাতে নির্বাচনী সাফল্য সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি হয়ে ওঠে। সমাজ পরিবর্তনের মতাদর্শের প্রচার অবশ্য তখনই শেষ হয়নি। কারণ শাসক কংগ্রেস তখন জাতীয়তাবাদ আঁকড়ে থেকেছে, এবং কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে সব সময় জাতীয়তাবাদ বিরোধিতার অভিযোগ এনেছে। ফলে বিকল্প মতাদর্শের প্রচারগত গুরুত্ব তখন কমে যায়নি। তাছাড়া সরকারের অনাচার, দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনগণকে সংঘবদ্ধ করতে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের ব্যবহারিক গুরুত্ব অপরিবর্তিত থেকেছে। কিন্তু নির্বাচনী সংগ্রামের বাইরে তাকে প্রয়োগ করা যায়নি। বামপন্থীদের নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলন ও গণসংগ্রামগুলিও চূড়ান্ত সাফল্যের মুহূর্তে সরকারের নীতি কিংবা আরো এগিয়ে সরকারের পরিবর্তন দাবি করেছে, সেই সাফল্যকে সমাজ পরিবর্তনের বৈপ্লবিক কর্মসূচীতে পরিণত করতে পারেনি, হয়তো চায়ওনি। নির্মোহভাবে আলোচনা করলে একথা মানতেই হবে পার্লামেন্টারি রাজনীতির জয়-পরাজয়ের নিরিখে ক্রমেই এই ধারণা গড়ে ওঠে যে, সমাজের মৌল পরিবর্তন এই পথে সম্ভব। তবে তার জন্যে দরকার রাজ্যে নয়, কেন্দ্রে শাসনক্ষমতা অর্থাৎ রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা।

এই নীতির অনুষঙ্গে প্রথম ধাপ ছিল যেখানে সম্ভব রাজ্যে কংগ্রেস শাসনের অবসান করা। কেরল অকংগ্রেসি শাসনের একটা ছোটখাটো মডেল তুলে ধরেছিল। রাজ্য পরিস্থিতির তারতম্য অনুসারে সেই মডেল কিছুটা রদবদল করে ব্যবহার করা যায়, এই ধারণা দেশে বহু রাজ্যেই চেতনার তারতম্য অনুসারে গড়ে উঠেছিল। যেখানে বামপন্থীরা শক্তিশালী, গণ আন্দোলনের ঐতিহ্য যথেষ্ট পুরনো সেখানে সরাসরি বাম বিকল্প আর অন্যত্র অকংগ্রেসী বিকল্পের কথা বলা হয়। তারই আরেক নাম সার্বিক কংগ্রেস বিরোধিতা। কংগ্রেসের একচেটিয়া প্রাধান্যের যুগে বিরোধী কোন শক্তিকে নির্বাচনী রাজনীতিতে আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে গেলে সার্বিক কংগ্রেস বিরোধিতার পথ গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। পরবর্তী ধাপ অর্থাৎ কেন্দ্রে ক্ষমতা দখল, রাষ্ট্রক্ষমতা ব্যবহারের স্তরে পৌঁছানো ছিল দূরবর্তী একটা সম্ভাবনা, কবে বাস্তবায়িত হবে কারো জানা ছিল না।

প্রসঙ্গত বলা দরকার সমকালে দেশে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়া, মৌলবাদী শক্তির এমন কোন চরম বাড়বাড়ন্ত দেখা যায়নি, যার থেকে সার্বিক কংগ্রেস বিরোধিতার নীতি নিয়ে সংশয় দেখা দিতে পারে এবং সঙ্গত কারণে মনে হতে পারে মৌলবাদের মোকাবিলার জন্যে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের সার্বিক ঐক্য দরকার। সেইরকম একটা নীতির যুগ চলেছে শতাব্দীর শেষ দশকে, বিশেষত বর্তমান সময়ে। বিরোধী সব পক্ষের তখন এই ধারণা হয় যে, আগে কংগ্রেসের অপশাসন শেষ করার জন্যে লড়াই চলুক, যেটা ছিল ক্ষেত্রবিশেষে অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রাম, তারপর অন্যান্য কথা ভাবা যাবে। ১৯৬২ সালের চীন-ভারত সীমান্ত যুদ্ধ, ১৯৬৫ সালে পরপর দুবার ভারত-পাক যুদ্ধ শাসকদলের ঝুলে পড়া জাতীয়তাবাদী আদর্শকে প্রাণপণে চাঙ্গা করে তোলার মরিয়া প্রচেষ্টার বিপরীতে এই নীতির অসার্থকতা প্রমাণ করতে এবং দেশ শাসনে অন্যরাও কংগ্রেসের চেয়ে কোন অংশে কমজোরি নয় বোঝাতে পার্লামেন্টারী রাজনীতির প্রতি আকর্ষণ বিপুল হয়ে ওঠে। ফলে মতাদর্শের সংঘাত সমাজ পরিবর্তনের বদলে সরকার পরিবর্তনে, একদলীয় শাসনের স্থিতাবস্থার বদলে জোটবদ্ধতার বিকল্পের দিকে অগ্রসর হয়।

নয়

মার্কসবাদী বামপন্থীদের মধ্যে মতাদর্শগত সংঘাত বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্ক নিরপেক্ষভাবে স্বাধীনতা উত্তরকালে কেবল বজায় থাকেনি, নানা সময়ে তার তীব্রতা তিক্ততা

বেড়েছে, এবং কখনো বা একে অন্যকে শ্রেণীশত্রুর চেয়েও বিপজ্জনক বলে অভিহিত করেছে। ভারতীয় বিপ্লবের স্তর নিয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে বিরোধ ছিল। তাকে জাতীয় গণতান্ত্রিক অথবা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব বলা সঙ্গত কিনা, সেটাই ছিল তাত্ত্বিক বিতর্ক। আর অকমিউনিস্ট মার্কসবাদীদের সঙ্গে কমিউনিস্টদের বিতর্ক ছিল তাকে এখনই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর বলা যাবে কিনা, তা-ই নিয়ে। শ্রেণী সম্পর্কের মূল্যায়নে কাদের সঙ্গে চূড়ান্ত বিরোধ আর কাদের সঙ্গেই বা সহযোগিতা করা দরকার, এটাই নির্ণেয় ছিল। কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৬৪ সালে ভেঙে গেলে এই বিরোধ প্রকাশ্যে এসে পড়ে এবং একপক্ষ অন্যপক্ষকে শত্রু বলেই মনে করতে থাকে। অথচ ঘটনাচক্রে দেখা যায় এই বিরোধ সত্ত্বেও জনাদেশ ১৯৬৭ থেকে ১৯৭০, দ্বিধাবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টিকে একজোটে কাজ করতে বাধ্য করেছে। অ-কমিউনিস্ট মার্কসবাদীদের সম্পর্কেও একই কথা খাটে। দলের মঞ্চে কিংবা সম্মেলনে পরস্পরের বিরুদ্ধে তারা যে জিগির তুলুক না কেন, এমনকি গণসংহতির নানা ফ্রন্ট এই মতাদর্শগত বিরোধের জেরে যেভাবেই ভেঙে থাক না কেন, যে কোন আন্দোলনে, কোন সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে তারা সবাই বাধ্য হয়েছে অন্তত তখনকার মত একজোটে কাজ করতে। এই সব তাত্ত্বিক বিরোধ যে জনজীবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও পড়ার মত কোন দাগ কাটতে পারেনি এটাই ছিল বাস্তব রাজনীতির শিক্ষা। সাধারণ মেহনতী মানুষ এই ধরনের বিতর্ক বিরোধকে আমল দেয়নি, যদিও তার প্রত্যক্ষ অভিঘাতে সব সময়ে মেহনতী মানুষের ঐক্যকে সবক্ষেত্রে বজায় রাখতেও পারেনি।

ষাটের দশকের শেষ থেকেই নকশালপন্থী আন্দোলন মতাদর্শের সংগ্রামে সত্যই একটা স্বাতন্ত্র নিয়ে এসেছিল। সমস্ত বিরোধ সত্ত্বেও সব বামপন্থীরা যেখানে পার্লামেন্টারী পথ আঁকড়ে ধরেই চলছিল, সেখানে নকশালরা বহুকাল ধরে তাকে বাতিল করে জঙ্গি আন্দোলনের পথে নেয়। প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির প্রতি তাদের অনীহা ছিল প্রকৃতই মতাদর্শগত বিরোধের বলিষ্ঠ প্রকাশ। সমাজ পরিবর্তনে কৃষক সংগ্রাম থেকে কৃষি বিপ্লবের তত্ত্ব কায়েম করে তাদের নীতি ও কর্মসূচী অন্তত চেনা রাজনীতির ছকের বাইরে যাওয়ার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ছিল। কিন্তু চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব থেকে শুরু করে সব কিছু চৈনিক ধাঁচে গড়ে তোলার চেষ্টায় যে আতিশয্য ও জবরদস্তি প্রকাশ পায়, সত্তরের দশককে গণমুক্তির দশক বলে ঘোষণা করেও গণচেতনায় তারা কাঙ্ক্ষিত সাড়া জাগাত পারে না। ফলে মতাদর্শ একেবারে ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ থেকে ক্ষুদ্র স্বার্থের চোরাবালিতে আটকে অর্থহীন হানাহানি ও আত্মঘাতী পরিণতিতে বহুধা বিভক্ত হয়ে পড়ে। শাসক শ্রেণী নকশাল আন্দোলনের ঝলসে ওঠা প্রভাবে বিপর্যস্ত কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে তাদের সমস্ত প্রশাসনিক কায়দা কানুন কাজে লাগিয়ে মতাদর্শের এই চ্যালেঞ্জকে ব্যর্থ করতে দিতে সক্ষম হয়।

ভারতীয় প্রেক্ষাপটে নকশাল আন্দোলন ছিল সমাজ পরিবর্তনে সংগঠিত মতাদর্শের আপাতত শেষ চ্যালেঞ্জ। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি থেকে স্বাধীনতার এই সুবর্ণ জয়ন্তী বছর পর্যন্ত, রাজনীতি, প্রশাসন, সমাজ ও যে কোন ধরনের সামাজিক প্রতিষ্ঠান তার অস্তিত্বের সংকট আর অনুভব করেনি, যেমনটি করেছিল নকশাল রাজনীতির পর্বে। ব্যক্তি, দলগত মতামত ও মূল্যায়ন নির্বিশেষে একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। অবিভক্ত কিংবা বিভক্ত কমিউনিস্ট আন্দোলন স্বাধীনতা-উত্তরকালে গত পাঁচ দশকে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার সামনে এতবড় অস্তিত্বের সংকট আর সৃষ্টি করতে পারেনি, যা করেছিল নকশাল আন্দোলন।

দশ

১৯৭৭-৯৭, জাতীয় রাজনীতিতে অকংগ্রেসি কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠার দুটি প্রান্ত বলে আপাতত এই আলোচনা সূত্রে ধরে নেওয়া যায়, সূচনা পর্বে রয়েছে সার্বিক কংগ্রেস বিরোধিতার রাজনীতি আর সমকালে মৌলবাদ বিরোধিতার সার্বিক ঐক্যের রাজনীতি। ব্যাপকার্থে দেখতে গেলে এই বিশ বছরের কালপর্বেও মতাদর্শের ভূমিকা আছে, যেখানে পশ্চিম বাংলা, কেরল কিংবা ত্রিপুরায় গণমুখী কর্মসূচী প্রশাসনিক ভিত্তিতে চালু করা থেকে জনগণের জন্যে কিছু সুযোগ-সুবিধা দেওয়া, সমাজকল্যাণের ব্যবস্থা দাবির কথা বলা হয়েছে। তথাকথিত জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের দেউলিয়াপনার পাশাপাশি মৌলবাদের সঙ্গে তাকে যুক্ত করে একটা হিন্দু জাতীয়তাবাদ কায়েম করার চেষ্টাও হয়েছে ব্যাপকভাবে। তারই বিপরীতে রয়েছে গণতান্ত্রিকতা, সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও সেকুলারত্ব প্রতিষ্ঠার মতাদর্শ। এই দুই দশক ভারতীয় রাজনীতিতে মতাদর্শহীনতার যুগ নয়। কিন্তু যে মতাদর্শের ভূমিকা ও সংঘাত নিয়ে এই আলোচনা, অর্থাৎ সামাজিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখা কিংবা ভেঙে ফেলা, বলা বাহুল্য এটা সেই মতাদর্শ নয়। এই মতাদর্শের কাজ কারবার শাসন রীতিনীতির সঙ্গে, রাজনৈতিক ব্যবস্থার ব্যবহারিক দিকের সঙ্গে তার যোগ আছে মাত্র।

অনেকেরই মনে হওয়া সম্ভব সোভিয়েত সমাজতন্ত্র ভেঙে পড়ার পর, চীন, ভিয়েতনাম ও কিউবায় ব্যাপক উদারীকরণ নীতি সোৎসাহে গ্রহণ করার পর, মতাদর্শেব ভূমিকার কেতাবি আলোচনার কোন প্রাসঙ্গিকতা নেই। সুতরাং মতাদর্শ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়লে আর সংঘাতের কথা ওঠে না। সেখানেই নিবন্ধকারের দু একটি নিবেদন আছে ঃ

প্রথমত, মহাদেশোপম ভারতে আঞ্চলিক বাস্তবতার তারতম্য বৈচিত্রে ও গভীরতায় এতই বেশি যে দেশের এক অঞ্চলের জোরালো কোন রাজনৈতিক অভিঘাত অন্য অঞ্চলের নিস্তরঙ্গ জীবনে কোন আলোড়নই তোলে না। সর্বাধুনিক ভোগবাদী ব্যক্তিতান্ত্রিক মানসিকতা আর মধ্যযুগীয় জীবনযন্ত্রণা থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে মানুষের দৃঢ়পণ প্রচেষ্টার মধ্যে বাস্তবের যে চিত্র ফুটে ওঠে, সেখানে মতাদর্শের ভূমিকা শেষ কিংবা শুরু, কোনটা সঠিক বলা মানুষের চিন্তা, ভাবনার উপর নির্ভর করে। সমাজ পরিবর্তনের প্রাসঙ্গিকতা তাই কেবল বিশ্বাসের প্রশ্ন নয়, সেটা জরুরী বাস্তব প্রশ্ন।

দ্বিতীয়ত, একমাত্র মার্কিন সমাজ বাদ দিলে দুনিয়ার অন্যত্র মতাদর্শের ভূমিকা নতুনভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যেখানে পরিবর্তনের দাবি উঠেছে নানা স্তরে। সন্দেহ নেই সেই দাবি এখনো কেবল প্রশাসনিক স্তরেই আবদ্ধ, যেমন ফ্রান্সে কিংবা ইংল্যান্ড অথবা ইতালিতে। কিন্তু পূর্ব ইউরোপের বিপর্যস্ত, সমাজতান্ত্রিক মডেল দেখেও যখন মানুষ এতো অল্প সময়ের মধ্যে পরিবর্তনের কথা বলে, তখন সেটা কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র ধারণা অতিক্রম করে আরো দূরে প্রসারিত হবে না, সেকথাও বলা যাবে না।

তৃতীয়ত, মার্কসবাদ সমাজ পরিবর্তনের কথা বলেছে শুধু শোষণ ব্যবস্থার অবসানের জন্য নয়, মানবমুক্তি তার চূড়ান্ত লক্ষ্য। মার্কস উন্নত পুঁজিবাদের স্তর থেকে সেই মানবমুক্তির স্তরে পৌঁছানোর কথা যদি বলে থাকেন, তাহলে সেই মতাদর্শের সংঘাত এখনও শুরু হয়নি। এইবার এই চলতি কাঠামোর মধ্য থেকেই তাকে অতিক্রম করার উদ্যোগ শুরু হবে।

মতাদর্শের সংঘাত মানুষ সৃষ্টি করে নিজেকে অতিক্রম করে যাওয়ার জন্যে। চলিষ্ণুতা তার মূল বৈশিষ্ট্য। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে সেই চলিষ্ণুতা ভারতীয় সমাজে থেকে যাবে, চোরাবালিতে আটকে পড়বে এমন মনে করার কোন বাস্তব কারণ নেই।

অ মি তা ভ চন্দ্র

স্বাধীনতা পরবর্তী কমিউনিস্ট আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট অর্জিত হল ভারতের স্বাধীনতা। ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীর পক্ষ থেকে ভারতীয় শাসকশ্রেণীকে ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে এসেছিল এই স্বাধীনতা। তারপর কেটে গেছে পঞ্চাশ বছর। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বহুবিধ ঘটনা ঘটে গেছে এই পঞ্চাশ বছরে। আর এই ঘটনাবলী নানা সময়ে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের সামনে উপস্থাপিত করেছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে একদা ঐক্যবদ্ধ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রথমে দ্বিধাবিভক্ত, তার পরে ত্রিধাবিভক্ত হয়ে বর্তমানে বহুধা বিভক্ত। ফলে যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি বিভিন্ন সময়ে হতে হয়েছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও কমিউনিস্ট আন্দোলনকে, সেই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় একদা ঐক্যবদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টি থেকে শুরু করে বর্তমানে বহুধাবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির ধারাকে বার বার বদলাতে হয়েছে লাইন, কমিউনিস্ট আন্দোলনকে বার বার হাতড়ে বেড়াতে হয়েছে সঠিক পথ। এই অনুসন্ধানের ফলে সর্বদাই যে সঠিক পথ বেরিয়ে এসেছে, তা নয়, অনেক সময়ই এক ভুল সংশোধন করতে গিয়ে দেখা দিয়েছে আর এক ভুল, কিন্তু সঠিক পথের অনুসন্ধান চলেছেই। বর্তমানে প্রবন্ধের বিষয়বস্তু — বিচার-বিশ্লেষণের আলোকে স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর। বিগত পঞ্চাশ বছরের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঘটনাবলীর বিবরণের বিস্তারে না গিয়ে সেই অংশকে সংক্ষিপ্ত রেখে বিচার বিশ্লেষণভিত্তিক মূল্যায়নের এক প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে বর্তমান নিবন্ধে। আর এই নিবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে কমিউনিস্ট আন্দোলন নিয়ে, প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে তারই এক বিচার-বিশ্লেষণভিত্তিক মূল্যায়নের, কমিউনিস্টদের সংসদীয় কাজকর্ম বা সরকারে তাদের ভূমিকা বর্তমান সন্দর্ভের পরিধিভুক্ত নয়।

দীর্ঘ ছ' বছর চলার পর ফ্যাসিবাদের সার্বিক পরাজয়ের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটল ১৯৪৫ সালে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে আবার এক গুণগত পরিবর্তন ঘটাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন শত্রু ফ্যাসিবাদ পরাস্ত ও পর্যুদস্ত হওয়ার ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন আবার ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের চোখে প্রধানতম শত্রু হিসাবে পরিগণিত হল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে আবার তার লাইন পরিবর্তনের পথে নিয়ে গেল। ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে

অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিং এ সি পি আই তার 'জনযুদ্ধ' এর যুগের সাধারণভাবে 'জনযুদ্ধ' এর লাইন বলে পরিচিত 'ধর্মঘটবিমুখতার' ও 'সংগ্রামবিমুখতার' লাইন পরিবর্তন করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শেষ ও চূড়ান্ত সংগ্রামের লাইন গ্রহণ করল। সি পি আই সোৎসাহে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামগুলিতে অংশগ্রহণ করা শুরু করল। প্রাথমিক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-জড়তা কাটিয়ে উঠে সি পি আই আবার নেমে এলে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের ময়দানে। ক্রমশ সি পি আই-এর মধ্যে দেখা দিল সংগ্রামী উদ্দীপনা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে সি পি আই সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। এই যুগেব বিভিন্ন শ্রমিক-কৃষক সংগ্রাম মুখ্যত সংগঠিত করার ও এই শ্রমিক-কৃষক সংগ্রামগুলিতে নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল সি পি আই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ব্যাপক গণ আন্দোলনগুলিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েই কমিউনিস্টরা ক্রমশ চলে এসেছিলেন যুদ্ধ পরবর্তী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণ সংগ্রামের পিছনের সারি থেকে সামনের সারিতে।

মর্মান্তিক দেশবিভাগকে সঙ্গী করে, ক্ষমতা হস্তান্তরের রূপ ধরে এল জাতীয় স্বাধীনতা ১৫ আগস্ট ১৯৪৭। 'জাতীয় অগ্রগতির সরকার নেহরু সরকারকে অকুণ্ঠ সমর্থন' জানিয়ে স্বাধীন ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির যাত্রারম্ভ হল। ১৯৪৮ সালে ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ৬ মার্চ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হল কলকাতার মহম্মদ আলি পার্কে। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব ও লাইন দুটোই পাল্টাল এই কংগ্রেসে। লাইন পরিবর্তনের ব্যাপারটি আদৌ আকস্মিক ছিল না। ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক প্রস্তাব For the Final Assault ! Tasks of the Indian People in the Present Phase of Indian Revolution[১]-এ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখলের জন্য শেষ সংগ্রামের আহ্বানের মধ্যেই লাইন পরিবর্তনের ইঙ্গিত ছিল। তবে তা ছিল ইঙ্গিতমাত্র। কেন্দ্রীয় কমিটির জুন ১৯৪৭ -এর রাজনৈতিক প্রস্তাব Mountbatten Award and After[২]-এ 'মাউন্টব্যাটেন অ্যাওয়ার্ড' সম্পর্কে এক মিশ্র দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা হয়। প্রস্তাবে বলা হয় — এই ক্ষমতা হস্তান্তর দেশের অগ্রগতির সূচনা করেছে, জনগণ একে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে পারে, কিন্তু এটা প্রকৃত স্বাধীনতা নয়। পরবর্তীকালের 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়'-এর বীজও এখানেই নিহিত ছিল। ১৯৪৭ সালের ৭ থেকে ১৬ ডিসেম্বর বোম্বাইতে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ঐ বৈঠকে কেন্দ্রীয় কমিটি For the Struggle for Full Independence and People's Democracy[৩] এবং On the Present Policy and Tasks of the Communist Party of India[৪] নামে দুটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই দুই দলিলেই রাজনৈতিক লাইন পরিবর্তনের ছবিটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর পরেই আসছে দ্বিতীয় কংগ্রেসে পরিবর্তিত রাজনৈতিক লাইন।

রাজনৈতিক লাইন পরিবর্তনের সঙ্গে নেতৃত্ব পরিবর্তনের বিষয়টি অঙ্গাঙ্গীভাবেই জড়িত ছিল। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বও পরিবর্তিত হল এই দ্বিতীয় কংগ্রেসেই। দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের প্রাক্কালে অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনের সময় কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক পি সি যোশীর আনুষ্ঠানিক নেতৃত্ব বজায় থাকলেও, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক উদ্যোগ তখনই যোশীর হাতছাড়া হয়ে গেছে। পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে অপসারিত হলেন এক দশকেরও অধিক সময় এই পদে অবস্থানকারী, সেই সময় 'সংস্কারপন্থী' হিসাবে চিহ্নিত ও সমালোচিত

পি সি যোশী। তার জায়গায় কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হলেন 'সংগ্রামী' বি টি রণদিভে। রণদিভের নেতৃত্বে দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে নির্বাচিত হল নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি। নেতৃত্বের সঙ্গে সঙ্গেই রাজনৈতিক লাইনও পরিবর্তিত হল দ্বিতীয় কংগ্রেসেই। 'জাতীয় অগ্রগতির সরকার নেহরু সরকারকে অকুণ্ঠ সমর্থন' জ্ঞাপনের 'সংস্কারবাদী' অবস্থান সম্পূর্ণ বর্জিত হল কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে। পরিবর্তে দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত Political'-এ 'জাতীয় আত্মসমর্পণের সরকার, সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী ও তার সঙ্গে আপসকামীদের সরকার নেহরু সরকারের' সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘাতের আহ্বান জানানো হল। দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত সবকটি রিপোর্ট ও প্রস্তাবেই প্রত্যক্ষ সংঘাতের এই মেজাজটি অক্ষুণ্ণ রাখা হল। পার্টি কংগ্রেসের শেষে ময়দানের প্রকাশ্য সভায় ঘোষণা করা হল — 'তেলেঙ্গানার পথ আমাদের পথ।'

দ্বিতীয় কংগ্রেস শেষ হওয়ার ঠিক কুড়ি দিনের মাথায় ২৫ মার্চ ১৯৪৮ বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন কংগ্রেস সরকার এই রাজ্যে কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনি ঘোষণা করল। পরাধীন ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি দীর্ঘ আট বছর সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। এবার কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হল স্বাধীন ভারতের একটি রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে। সেদিনই ভোর থেকে শুরু হয়ে গেল ব্যাপক ধরপাকড়, পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র সীল হয়ে গেল কমিউনিস্ট পার্টির অফিস, সীল হয়ে গেল কমিউনিস্ট পার্টির দৈনিক মুখপত্র 'স্বাধীনতা'র অফিস। পশ্চিমবাংলার সর্বত্র গ্রেপ্তার হলেন ও হতে থাকলেন বহু কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মী।

দ্বিতীয় কংগ্রেস থেকেই কমিউনিস্ট পার্টির লাইন হল দেশজোড়া বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের লাইন, সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের লাইন। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে চলল অকুতোভয় জঙ্গি কৃষক সংগ্রাম-তেভাগা-তেলেঙ্গানা-কাকদ্বীপ-বড়া কমলাপুর-ডুবিরভেড়ি-অগ্রদ্বীপ, পাশে এসে দাঁড়াল চন্দনপিঁড়ি-ভাঙড়-নন্দীগ্রাম-বিষ্ণুপুর-টাঁটাল-মাসিলা। কৃষক সংগ্রাম পেল এক নতুন মাত্রা, খুলে গেল কৃষক আন্দোলনের এক নতুন দিগন্ত, কমিউনিস্ট আন্দোলনে সৃষ্টি হল এক সংগ্রামী মেজাজ। অপরদিকে সরকারের তরফ থেকে নেমে এল চরম দমন-নিপীড়ন। কলকাতার রাজপথে চলল গুলি - ২৭ এপ্রিল ১৯৪৯। শহিদ হলেন লতিকা-প্রতিভা-অমিয়া-গীতা। আলিপুর জেলে চলল লাঠি, প্রেসিডেন্সি ও দমদম জেলে চলল গুলি —নিহত ও আহত হলেন কমিউনিস্ট রাজবন্দিরা। কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস থেকে পরবর্তী দুই বছরের ইতিহাস একদিকে নেহরু-বিধান রায়ের কংগ্রেস সরকারের কমিউনিস্ট দলন-দমনের ইতিহাস, আর অপর দিকে পার্টি নেতৃত্বের চরম 'আমলাতান্ত্রিকতা'র ও পার্টি লাইনের 'বাম-সংকীর্ণতা'র ইতিহাস। যোশী নেতৃত্বের চরম 'সংস্কারবাদ' উল্টো ধাক্কায় পরিণত হল রণদিভে নেতৃত্বের গোঁড়া 'সংকীর্ণতাবাদে'। কংগ্রেস নেতৃত্বের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতার ও নেহরু স্তুতির উল্টোরথের যাত্রায় এল প্রস্তুতিবিহীন দেশজোড়া বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের আহ্বান। এর মধ্যেই শুরু হল পার্টি পলিটব্যুরোর সঙ্গে অন্ধ্র পার্টি নেতৃত্বের ভারতের বিপ্লবের বর্তমান স্তর ও তার আনুষঙ্গিক রণনীতি-রণকৌশল সংক্রান্ত মতবিরোধ। সেটা চল্লিশের শেষ বছর।

১৯৫০ সালের ২৭ জানুয়ারি 'Cominform' ('কমিন্‌ফর্ম')-এর মুখপত্র For Lasting Peace, For a People's Democracy!-তে প্রকাশিত সম্পাদকীয় নিবন্ধ* পুরো চিত্রটাই আবার বদলে দিল। মাও সে-তুং-এর নেতৃত্বাধীন সফল চীন বিপ্লবও এই পট পরিবর্তনে সাহায্য করেছিল। এই দুই-এর প্রতিক্রিয়ায় শুরু হল তীব্র আন্ত-পার্টি সংগ্রাম। নেতৃত্বের বিরূপ সমালোচনার পাশাপাশি এল আত্মসমালোচনা। আর এই তীব্র আন্তঃ--পার্টি সংগ্রামের

মধ্য দিয়েই পঞ্চাশের দশকের সূত্রপাত। পঞ্চাশের দশকের প্রথম বছরের মাঝামাঝি পার্টি নেতৃত্বে ও লাইনে আবার পরিবর্তন ঘটল। বি টি রণদিভের জায়গায় সি রাজেশ্বর রাও পার্টির সাধারণ সম্পাদক হলেন। অন্ধ্র লাইন প্রযুক্ত হল। রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে বলা হল — চীনের পথ ধরেই ভারতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম এগিয়ে যাবে।

কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার দিয়ে ১৯৫১ সালের শুরু। নেহরু সরকার ঘোষিত প্রথম সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয় কমিউনিস্ট পার্টি। ১৯৫১ সালের মে মাসে আবার পার্টি নেতৃত্বে ও লাইনে পরিবর্তন ঘটল। সি রাজেশ্বর রাও-এর জায়গায় কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক পদে এলেন অজয়কুমার ঘোষ। সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে কমিউনিস্ট পার্টি আবার সাংবিধানিক পথে ফিরে এল। আবার শুরু হল 'সাংবিধানিক কমিউনিজমের'।[৭]

পঞ্চাশের দশকে একদিকে নতুন করে এবং শিকড় বিস্তার করে প্রায় স্থায়ীভাবে সাংবিধানিক কমিউনিজমের সূত্রপাত ঘটল। আর অপরদিকে পঞ্চাশের দশকে দেখা গেল দুর্বার গণ-আন্দোলনের জোয়ার, যার প্রতিটিতেই অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব ছিল কমিউনিস্ট পার্টির। ১৯৫১ সালে কোচবিহার শহরে ভুখা মিছিলের উপর পুলিসের বেপরোয়া লাঠি চার্জ ও গুলিচালনার বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত জাগ্রত করার প্রয়াস গ্রহণ করা হল, দাবি করা হল বেসরকারি ও বিচারবিভাগীয় তদন্ত এবং দুর্ভিক্ষ-সৃষ্টিকারী ও হত্যাকারীদের ব্যাপক বিচার।

১৯৫৩ সালে কংগ্রেস সরকারের অনুমোদনসহ কলকাতার তৎকালীন ব্রিটিশ ট্রাম কোম্পানি কর্তৃক ট্রাম ভাড়া এক পয়সা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টিসহ সব বামপন্থী দলগুলির যৌথ নেতৃত্বে চলল তীব্র, ব্যাপক, ধারাবাহিক ও দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন। ১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত হল স্মরণীয় শিক্ষক আন্দোলন, যা ছিল স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষকদের দাবি আদায়ের জন্য প্রথম ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন। ১৯৫৫ সালে শুরু হল গোয়ায় পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসান ঘটানোর উদ্দেশ্যে গোয়া মুক্তি আন্দোলন। পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এই গোয়া মুক্তি আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছিলেন সব রাজনৈতিক শক্তিই। উৎসাহী ও সক্রিয় সমর্থন এসেছিল কমিউনিস্ট পার্টিসহ বামপন্থী শক্তিসমূহের কাছ থেকে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এই মুক্তি আন্দোলনে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাসেবক প্রেরণ করা হয়েছিল। ১৯৫৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার এই দুইটি রাজ্যকে যুক্ত করে পূর্বপ্রদেশ নামে একটিমাত্র রাজ্য গঠন করার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভ সামিল হয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের জনসমষ্টির বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন বহু বিশিষ্ট ও বিদগ্ধ দেশপ্রেমিক ব্যক্তিত্ব-সহ পশ্চিমবঙ্গের সর্বস্তরের মানুষ। কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য অ-কমিউনিস্ট বামপন্থী শক্তি যৌথভাবে এই সংযুক্তিকরণ-বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব প্রদান করেছিল। ব্যাপক রূপ গ্রহণ করেছিল এই সংযুক্তি-বিরোধী আন্দোলন। বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল সারা পশ্চিমবঙ্গ। শেষপর্যন্ত গণ আন্দোলনের চাপে সংযুক্তির প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হয়েছিল।

কমিউনিস্ট পার্টির এবং অন্যান্য অকমিউনিস্ট বামপন্থী শক্তিসমূহের যৌথ অংশগ্রহণের মাধ্যমে ও যৌথ নেতৃত্বে পরিচালিত হত এইসব গণ আন্দোলন এবং এর প্রতিটিতেই এক মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করত কমিউনিস্ট পার্টি। আর এই গণ-আন্দোলনগুলি থেকেই কমিউনিস্ট আন্দোলন সংগ্রহ করে নিত তার বিকাশের প্রয়োজনীয় রসদ। গতি সঞ্চারিত হত কমিউনিস্ট আন্দোলনে, শক্তি বৃদ্ধি ঘটত কমিউনিস্ট পার্টির। এই গণ আন্দোলনগুলি থেকে শুধু যে কমিউনিস্ট পার্টি শক্তি সঞ্চয় করত, তা নয়, অংশগ্রহণ ও যৌথ নেতৃত্ব প্রদানের মাধ্যমে অন্যান্য অকমিউনিস্ট বামপন্থী শক্তিসমূহও এই গণ আন্দোলনগুলি থেকে তাদের প্রয়োজনীয়

শক্তি সঞ্চয় করে। ফলে সংসদীয় পথ এবং সংসদের বাইরে গণ আন্দোলনে অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বপ্রদান — উভয়ের সংমিশ্রণে ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছিল কমিউনিস্ট পার্টি।

স্বাধীন ভারতের সংবিধান অনুযায়ী সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সারা দেশে ১৯৫২ সালের জানুয়ারি মাসে লোকসভা ও বিধানসভাগুলির প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। এই লোকসভা নির্বাচনে সি পি আই লোকসভায় বিরোধী পক্ষের বৃহত্তম গ্রুপ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং সর্বভারতীয় পার্টি হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় কমিউনিস্ট পার্টি বিরোধী শক্তিসমূহের মধ্যে এককভাবে সর্ববৃহৎ শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। কমিউনিস্ট পার্টি বিরোধী পক্ষ হিসাবে স্বীকৃতি পায়নি। তবে কমিউনিস্ট পার্টিকে প্রধান বিরোধী পার্টি এবং কমিউনিস্ট পার্টির পরিষদীয় দলের নেতা জ্যোতি বসুকে প্রধান বিরোধী পার্টির নেতা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল।

১৯৫৭ সালের মার্চ মাসের গোড়ায় কয়েক দফায় সারা ভারতে দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। নির্বাচন হয়েছিল লোকসভার এবং পশ্চিমবঙ্গ-সহ বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভায়। এই দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টি অন্যান্য অকমিউনিস্ট বামপন্থী শক্তিসমূহের সঙ্গে যৌথভাবে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা ও লোকসভার আসনগুলিতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। 'বিকল্প সরকার' গঠনের ডাক দিয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল কমিউনিস্ট পার্টি ও বিভিন্ন অকমিউনিস্ট বামপন্থী শক্তিসমূহের সমন্বয়ে গঠিত নির্বাচনী ফ্রন্ট। 'বিকল্প সরকার' গঠন করা সম্ভব হয়নি, তবে বিধানসভায় ও লোকসভায় আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টির। আসন বেড়েছিল সহযোগী বামপন্থী শক্তিসমূহেরও।

পশ্চিমবঙ্গে সম্ভব না হলেও কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হল কেরলে। ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে জিতে কেরলে ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হল কমিউনিস্ট সরকার। এই প্রথম ভারতের একটি রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হল কমিউনিস্ট সরকার, যার মুখ্যমন্ত্রী হলেন নাম্বুদ্রিপাদ। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেই ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ ভূমিসংস্কার, ভূমিতে কৃষকদের স্থায়ী স্বত্বদান, কৃষিশিল্পের উন্নয়ন হওয়া প্রভৃতি ১৬ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করলেন। আরও ঘোষণা করা হল, কোনও গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ভাঙতে পুলিশকে ব্যবহার করা হবে না।

১৯৫৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে নতুন বিধানসভা গঠিত হওয়ার পর স্পিকারের রুলিং-এ বিরোধী দলের স্বীকৃতি পেল কমিউনিস্ট পার্টি এবং বিরোধী পক্ষের নেতা হিসাবে স্বীকৃতি পেলেন বিধানসভায় কমিউনিস্ট পার্টির পরিষদীয় দলের নেতা হিসাবে নির্বাচিত জ্যোতি বসু।

নানা গণ-আন্দোলনের ঢেউয়ের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হল ১৯৫৭ থেকে পরবর্তী দুই বছর। এই গণ আন্দোলনগুলিতে যৌথ অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব ছিল কমিউনিস্ট পার্টির এবং অকমিউনিস্ট বামপন্থী শক্তিসমূহের।

এল ঘটনাবহুল ১৯৫৯ সাল। ১৯৫৯ সালের ৩১ জুলাই সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক উপায়ে ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদের নেতৃত্বাধীন কেরলের প্রথম কমিউনিস্ট সরকারকে অপসারিত করা হল। সংবিধানের ৩৫৬ নং ধারা প্রয়োগ করে নাম্বুদ্রিপাদ সরকারকে বরখাস্ত করে কেরলে জারি করা হল রাষ্ট্রপতির শাসন, ভেঙে দেওয়া হল রাজ্য বিধানসভা। কেরল সরকারকে অপসারিত করার জন্য যে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্ত করা হয়েছিল, তার প্রধান হোতা ছিলেন তৎকালীন কংগ্রেস সভানেত্রী ইন্দিরা গান্ধী। কেরলে নাম্বুদ্রিপাদের নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট সরকারকে অপসারিত করার জন্য সমস্ত ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল

শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে ইন্দিরা গান্ধী শুরু করেছিলেন বিমোচন আন্দোলন, যার পরিণতিতে বরখাস্ত হয়েছিল এই সরকার।

সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক উপায়ে কেরল সরকারকে বরখাস্ত করার প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে। প্রতিবাদে মুখর হয়েছিল সারা পশ্চিমবঙ্গ। কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গেই প্রতিবাদে গলা মিলিয়েছিল অন্যান্য বামপন্থী শক্তিসমূহ, প্রতিবাদে শামিল হয়েছিলেন বহু বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, বামপন্থী অবামপন্থী নির্বিশেষে গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষজন।

১৯৫৯ সালের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলন। এই খাদ্য আন্দোলন যৌথভাবে পরিচলনা করেছিল কমিউনিস্ট পার্টি এবং অন্যান্য অকমিউনিস্ট বামপন্থী শক্তিসমূহ।

১৯৫৯ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর কলকাতার তৎকালীন ওয়েলিংলটন স্কোয়ারে (বর্তমানে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার) কমিউনিস্ট পার্টি-সহ বিভিন্ন বামপন্থী দলের যৌথ উদ্যোগে পুলিশী দমন-পীড়ন-সন্ত্রাসের শিকার খাদ্য আন্দোলনের শহিদদের স্মরণস্তম্ভের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হল। কমিউনিস্ট পার্টি-সহ সব বামপন্থী দল যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল, প্রতি বছর ৩১ আগস্ট শহিদ দিবস হিসাবে পালিত হবে। সেই থেকে প্রতি বছরই ৩১ আগস্ট শহিদ দিবস হিসাবে পালিত হয়।

এল ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ ১৯৬২ সাল। নানা কারণে এই বছরটি ভারতীয় রাজনীতি তথা বিশ্ব রাজনীতিতে স্মরণীয় হয়ে আছে। একইসঙ্গে এই ১৯৬২ সালটি ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রেও ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নানা জাতীয় তথা আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতের কারণে সঙ্কটের ঘূর্ণাবর্তে পড়েছিল ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন।

১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সারা দেশে তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল—লোকসভায় এবং পশ্চিমবঙ্গ-সহ বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভায়। এই নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টি সহযোগী অন্যান্য বামপন্থী শক্তিসমূহের সঙ্গে যৌথভাবে সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট গঠন করে 'বিকল্প সরকার' গঠনের আহ্বান জানিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। কিন্তু এই আহ্বান ব্যর্থ হয়েছিল, 'বিকল্প সরকার' গঠন করা সম্ভবপর হয়নি। কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে নির্বাচনী ফলাফল আশানুরূপ সাফল্য নিয়ে আসেনি। যত সংখ্যক আসন কমিউনিস্ট পার্টি লাভ করবে ভেবেছিল, তত সংখ্যক আসন পার্টি পায়নি। তবে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় কমিউনিস্ট পার্টির আসন সামান্য হলেও বেড়েছিল, লোকসভার ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টির আসন সংখ্যায় কোনও পরিবর্তন হয়নি। পশ্চিমবঙ্গে এই নির্বাচনে সি পি আই শহরাঞ্চলে আগের তুলনায় কিছুটা খারাপ ফল অর্জন করেছিল। তুলনামূলকভাবে পার্টির ভালো ফল লাভ হয়েছিল গ্রামে। সব মিলিয়ে আসন সংখ্যায় তেমন হেরফের না হলেও কমিউনিস্ট পার্টির তথা সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্টের ভোট আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টির পরিষদীয় দলের নেতা হিসাবে নির্বাচিত জ্যোতি বসুই পুনর্বার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বিরোধী দলের নেতা হিসাবে ঘোষিত হলেন।

১৯৬৪ সালে সংঘটিত হয়েছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম বড় বিভাজন। দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। প্রসঙ্গটিতে আসতে গেলে আমাদের শুরু করতে হবে বেশ কিছুটা পিছন থেকে। ১৯৬৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টি বিভক্ত হলেও পার্টি ভাঙনের বীজ কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে নিহিত ছিল পঞ্চাশের দশকেই। তাই আমাদের এই প্রসঙ্গটি শুরু করতে হবে পঞ্চাশের দশক থেকেই।

পঞ্চাশের দশকে ভারতে ঐক্যবদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টি অবস্থিত থাকলেও তা ছিল নেহাতই আনুষ্ঠানিক ঐক্যবদ্ধতা। পার্টির মধ্যে ছিল তীব্র মতবিরোধ ও মতপার্থক্য, শুরু হয়েছিল পার্টির মধ্যে তীব্র মতাদর্শগত সংগ্রাম। নানা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রশ্ন ও বিষয়কে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছিল এই মতপার্থক্য ও মতবিরোধসমূহ, সেগুলির উপর ভিত্তি করেই চলছিল আন্তঃপার্টি মতাদর্শগত সংগ্রাম।

১৯৫৩ সালের ৫ মার্চ প্রয়াত হলেন জোসেফ স্তালিন। ১৯৫৬ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেসে স্তালিন-পরবর্তী সোভিয়েত ইউনিয়নের তৎকালীন নিকিতা ক্রুশ্চেভ নেতৃত্ব শুরু করলেন নিঃ-স্তালিনীকরণ (De-Stalinization) প্রক্রিয়া। একই সঙ্গে ১৯৫৬ সালে অনুষ্ঠিত এই বিংশতিতম কংগ্রেসে নিকিতা ক্রুশ্চেভ নেতৃত্ব আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে আমদানি করলেন এক নতুন তত্ত্ব, যা 'তিন পি-র তত্ত্ব' বা 'Three P's Thesis' হিসাবে পরিচিত হয়ে আছে। এই 'তিন পি-র তত্ত্ব' বা 'Three P's Thesis' হল — (১) শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ (Peaceful Transition to Socialism), (২) ধনতান্ত্রিক-সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান (Peaceful co-exixtence with the Capitalist-Imperialist States) এবং (৩) ধনতান্ত্রিক-সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতা (Peaceful Competition with the Capitalist-Imperialsit States)। এই নিঃস্তালিনীকরণ প্রক্রিয়া এবং 'তিন পি-র তত্ত্ব' বা 'Three P's Thesis' আলোড়ন ফেলে দিল আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট মহলে। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিপ্লবী অংশ সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন এই নিঃ-স্তালিনীকরণ প্রক্রিয়া এবং 'তিন পি-র তত্ত্ব। মাও সে-তুং-এর নেতৃত্বাধীন চীনের কমিউনিস্ট পার্টি 'তিন পি-র তত্ত্ব' এবং নিঃস্তালিনীকরণ প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করে সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্রুশ্চেভ নেতৃত্বকে 'সংশোধনবাদী', 'সংস্কারপন্থী', 'ধনতন্ত্রের কাছে আত্মসমর্পণকারী' ইত্যাদি নিন্দাসূচক আখ্যায় আখ্যায়িত করল। চীনের মাও নেতৃত্বের বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ হানলেন তৎকালীন সোভিয়েত নেতৃত্ব। শুরু হয়ে গেল ষাটের দশকের গোড়া থেকেই চীন-সোভিয়েত মতাদর্শগত সংগ্রাম, যা আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে সুপরিচিত হয়ে আছে 'Great Theoretical Debate' বা 'মহান মতাদর্শগত সংগ্রাম' নামে।

এই চীন-সোভিয়েত দ্বন্দ্বের প্রতিফলন পড়ল ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে। ১৯৫৬ সালে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেসে নিকিতা ক্রুশ্চেভ নেতৃত্ব কর্তৃক নিঃ-স্তালিনীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর এবং 'তিন পি-র তত্ত্ব' উপস্থাপিত হওয়ার পর থেকেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে এই নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়ে গিয়েছিল। চীনের মাও নেতৃত্ব এই প্রক্রিয়া এবং এই তত্ত্ব প্রত্যাখ্যান করে তার বিরোধিতায় অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরস্থ এই দ্বন্দ্ব নতুন এক মাত্রা পেল এবং আরও তীব্র হয়ে উঠল। কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে এক অংশ ছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের মতের সম্পূর্ণ অনুগামী, আর অপর অংশটি চীনের মতের সম্পূর্ণ অনুগামী না হলেও তাদের অবস্থান ছিল চীনের অবস্থানের কাছাকাছি। সাধারণভাবে কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে আন্তর্জাতিক প্রশ্নে এক পক্ষ 'সোভিয়েতপন্থী' বা 'রুশপন্থী' এবং অপরপক্ষ 'চীনপন্থী' হিসাবেই পরিচিত ছিলেন। বাম-দক্ষিণ বিচারে কমিউনিস্ট পার্টির 'সোভিয়েতপন্থী' বা 'রুশপন্থী' অংশ 'দক্ষিণপন্থী' এবং সাধারণভাবে 'চীনপন্থী' বলে পরিচিত অপর অংশ 'বামপন্থী' বলেই পরিচিত ছিলেন।

১৯৬২ সালের ২০ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ এই

'দক্ষিণপন্থী' ও 'বামপন্থী' অবস্থানদ্বয়কে আরও জোরদার করে মেরুকরণ প্রক্রিয়াকে প্রায় সম্পূর্ণ করে তুলে পার্টির ভাঙনকে অনিবার্য করে তুলল।

এই আন্তর্জাতিক প্রশ্নাবলীর সঙ্গে যুক্ত ছিল জাতীয় প্রশ্নাবলী এবং বিষয়সমূহ। প্রকৃতপক্ষে জাতীয় প্রশ্নাবলী এবং বিষয়সমূহ নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে মতপার্থক্য ও মতবিরোধ এবং মতাদর্শগত সংগ্রাম আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। এগুলির সঙ্গেই যুক্ত হয়েছিল আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী এবং তাই নিয়ে বিতর্ক।

কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে যে জাতীয় প্রশ্ন ও বিষয়গুলি নিয়ে অন্তর্বিরোধ ও মতপার্থক্য ছিল, সেগুলি ছিল সাধারণভাবে ভারতীয় রাষ্ট্র ও ভারতের শাসকশ্রেণী সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি। ক্ষমতাসীন নেহরু সরকার ও কংগ্রেস সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য প্রয়োজনীয় যে গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠন করা দরকার, তার চরিত্র কি হবে এবং তাতে কোন্ কোন্ শক্তি যোগ দেবে, কোন্ কোন্ শ্রেণীর সমন্বয়ে তৈরি হবে এই গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট, নেতৃত্ব থাকবে কোন্ শ্রেণীর হাতে ইত্যাদি বিষয় সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি। এই সমস্ত বিষয়গুলি নিয়ে মতপার্থক্যকে কেন্দ্র করে পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে দুটি শিবির তৈরি হয়ে গিয়েছিল। একটি শিবিরের নাম ছিল জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট বা এন ডি এফ (National Democratic Front or NDF) শিবির, এবং অপর শিবিরটির নাম ছিল জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট বা পি ডি এফ (People's Democratic Front or PDF) শিবির।

কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে ১৯৫৪-৫৫ সাল থেকেই এই জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট বা এন ডি এফ বনাম জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট বা পি ডি এফ বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। ১৯৫৬ সালের ১৯ এপ্রিল কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্থ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হল কেরলের পালঘাটে। এই পালঘাট কংগ্রেসেই এই বিতর্ক সামনে চলে এসেছিল। জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট বা এন ডি এফ গঠনের কথা পার্টির যে সদস্যরা বলতেন, তাদের বক্তব্য ছিল এই জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠন করতে হবে শ্রমিক শ্রেণী, কৃষক শ্রেণী, পাতি বুর্জোয়া এবং জাতীয় বুর্জোয়া- এই চার শ্রেণীকে নিয়ে। এই ফ্রন্টের ভিত্তি হবে দৃঢ়বদ্ধ শ্রমিক-কৃষক ঐক্য, এবং এই ফ্রন্ট পরিচালিত হবে চার শ্রেণীরই যৌথ নেতৃত্বে, বিশেষত শ্রমিক শ্রেণী ও জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর যৌথ নেতৃত্বে। অর্থাৎ জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রবক্তারা জোর দিয়েছিলেন যৌথ নেতৃত্বের উপর। অপরদিকে জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট বা পি ডি এফ গঠনের কথা পার্টির যে সদস্যরা বলতেন, তারাও শ্রমিক শ্রেণী, কৃষক শ্রেণী, পাতি বুর্জোয়া এবং বুর্জোয়া-এই চার শ্রেণীকে নিয়েই জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের কথা বলতেন, তারাও জোর দিতেন দৃঢ়বদ্ধ শ্রমিক-কৃষক ঐক্যের উপর, যা হবে এই ফ্রন্টের ভিত্তি, কিন্তু তাদের স্পষ্ট বক্তব্য ছিল এই জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্টের নেতৃত্বে থাকবেন একমাত্র শ্রমিক শ্রেণী, অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণীর একক নেতৃত্বের ভিত্তিতেই গঠন করতে হবে চার শ্রেণীর এই যৌথ জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট। যৌথ নেতৃত্বের কোনও তত্ত্ব গ্রহণ করতে এই জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রবক্তারা প্রস্তুত ছিলেন না।

জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রবক্তাদের বক্তব্য ছিল কংগ্রেসের একাংশকে অর্থাৎ কংগ্রেসের অভ্যন্তরস্থ প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক অংশকে এই জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের মধ্যে টেনে আনতে হবে, সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে কংগ্রেসের প্রভাবাধীন জনগণের সঙ্গে, তাদেরও টেনে আনতে হবে এই ফ্রন্টের ভেতর। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং দক্ষিণপন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে কংগ্রেসের গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল অংশকে সঙ্গে রাখতে হবে। জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকারের সঙ্গে এবং কংগ্রেসের সঙ্গে সরাসরি কোনও সহযোগিতার কথা না বললেও এই মতের প্রবক্তারা কংগ্রেস সম্পর্কে, বিশেষত কংগ্রেসের নেহরু নেতৃত্ব সম্পর্কে, সহনশীল দৃষ্টিভঙ্গি

গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন এবং কংগ্রেসের মধ্যে ও কংগ্রেসের বাইরে ক্রমবর্ধমান দক্ষিণপন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জওহরলাল নেহরু ও তাঁর অনুগামী প্রগতিশীলদের প্রয়োজনীয় সমর্থনের কথা বলতেন। অপরদিকে জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রবক্তারা শ্রমিক শ্রেণীর একক নেতৃত্বের উপরই জোর দিতেন, জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীকে এই ফ্রন্টে স্থান দিলেও তাদের সঙ্গে নেতৃত্ব ভাগ করে নেওয়ার মত কোনও দুর্বলতা দেখাতে তারা প্রস্তুত ছিলেন না, এবং সেই কারণেই কংগ্রেস বিরোধী অবস্থানে তারা দৃঢ় ছিলেন, কংগ্রেসের নেহরু নেতৃত্ব সম্পর্কে তাদের কোনও অহেতুক মোহ ছিল না এবং কংগ্রেসের নেহরু নেতৃত্বের প্রতি অপর মতের প্রবক্তাদের মত কোনও দুর্বলতা তারা পোষণ করতেন না।

কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রবক্তারা সাধারণভাবে 'দক্ষিণপন্থী' হিসাবে এবং জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রবক্তারা সাধারণভাবে 'বামপন্থী' হিসাবে পরিচিত ছিলেন। আন্তর্জাতিক প্রশ্নে 'রুশপন্থী'রাই সাধারণভাবে জাতীয় প্রশ্নে ছিলেন জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রবক্তা, আর অপরদিকে আন্তর্জাতিক প্রশ্নে সাধারণভাবে 'চীনপন্থী' বলে পরিচিতরাই জাতীয় প্রশ্নে ছিলেন জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রবক্তা। পার্টির মধ্যে যারা 'রুশপন্থী' ও জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রবক্তা ছিলেন অর্থাৎ সাধারণভাবে যারা 'দক্ষিণপন্থী' বলে পরিচিত ছিলেন, ১৯৬৪ সালে পার্টি বিভক্ত হওয়ার পর তারা প্রায় সকলেই থেকে গেলেন সি পি আইতেই। আর অপরদিকে পার্টির মধ্যে যারা সাধারণভাবে 'চীনপন্থী' বলে পরিচিত ছিলেন ও জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রবক্তা ছিলেন, অর্থাৎ সাধারণভাবে যারা 'বামপন্থী' বলে পরিচিত ছিলেন, পার্টি ভাগের পর কয়েকজন ব্যতীত তাদের প্রায় সকলেই যোগ দিলেন নবগঠিত সি পি আই (এম)-এ। অবশ্যই উভয়পক্ষেই কয়েকজন ব্যতিক্রমী ছিলেন। যেমন পার্টির মধ্যে উভয় পক্ষের শক্তিবিন্যাস অনুযায়ী পঞ্চাশের দশকের শেষাশেষি ও ষাটের দশকের প্রথম দিকে 'বামপন্থী' বলে পরিচিত শিবিরে অবস্থানকারী ও বিবিধ প্রশ্নে 'বামপন্থী'-দের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত এবং সাধারণভাবে 'বামপন্থী' হিসাবেই চিহ্নিত ভূপেশ গুপ্ত ও রণেন সেন পার্টি ভাগের পর সি পি আই (এম)-এ যোগ না দিয়ে থেকে গেলেন সি পি আই-তেই। একই কথা প্রযোজ্য সোহন সিং যোশ সম্পর্কেও।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা তাত্ত্বিক প্রশ্নে যখন কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে বামদক্ষিণ মেরুকরণ প্রক্রিয়া পূর্ণমাত্রায় শুরু হয়ে গেছে, তখন পার্টি ভাগের ঘোরতর বিরোধী জ্যোতি বসু এবং ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ সাধারণভাবে এক 'মধ্যপন্থী' অবস্থান গ্রহণ করলেও শেষ বিচারে তাঁদের অবস্থান ছিল 'বামপন্থী' শিবিরেই এবং তাঁদের পরিচিতি ছিল 'বামপন্থী' হিসাবেই। পার্টির মধ্যে বামদক্ষিণ মেরুকরণ প্রক্রিয়া শুরু হওয়া থেকেই পার্টি ভাগ হয়ে সি পি আই (এম) সৃষ্টি হওয়া পর্যন্ত ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ, জ্যোতি বসু ও ভূপেশ গুপ্ত প্রায় একই মতের প্রবক্তা ও একই পথ অনুসরণকারী ছিলেন। পার্টি ভাগের পর জ্যোতি বসু ও নাম্বুদ্রিপাদ যোগ দিলেন সি পি আই (এম)-এ, কিন্তু ভূপেশ গুপ্ত থেকে গেলেন সি পি আইতেই।

১৯৬২ সালের ১৩ জানুয়ারি, তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনের ঠিক মাসখানেক আগে, প্রয়াত হলেন কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক অজয়কুমার ঘোষ। কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে ১৯৫৪-৫৫ সাল থেকেই বিভিন্ন প্রশ্নে যে অন্তর্বিরোধ ও মতপার্থক্য দেখা দিতে শুরু করেছিল, তাকে যতটা সম্ভব প্রশমিত রেখে এর 'মধ্যপন্থী' অবস্থান গ্রহণ করে কমিউনিস্ট পার্টিকে সাংগঠনিকভাবে ঐক্যবদ্ধ রাখার ক্ষেত্রে অজয় ঘোষের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। অজয় ঘোষের মৃত্যুর পর পার্টি বিভাজন প্রায়

চরিত্র হয়ে উঠল। আসলে পার্টি বিভাজনকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য 'দক্ষিণপন্থী' ও 'বামপন্থী' উভয় শিবিরের মধ্যে আপস হিসাবে কমিউনিস্ট পার্টিতে এক নতুন চেয়ারম্যানের পদ সৃষ্টি করে 'দক্ষিণপন্থী' অংশের নেতা শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গেকে করা হল পার্টির চেয়ারম্যান এবং 'বামপন্থী' শিবিরের অন্যতম উল্লেখযোগ্য নেতা ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদকে করা হল পার্টির সাধারণ সম্পাদক। এই ভাবে পার্টি বিভাজন আপাতত দুই বছর ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হল।

১৯৬২ সালের ২০ অক্টোবর শুরু হল চীন ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ। এই চীন ভারত সীমান্ত সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে চীনকে আক্রমণকারী হিসাবে চিহ্নিত করে সারা ভারতে সৃষ্টি হল উগ্র চীন বিদ্বেষ। উগ্র দেশপ্রেম ও উগ্র জাতীয়তাবাদ আচ্ছন্ন করে রাখল সারা দেশকে। আর তার সঙ্গেই যোগ হল উগ্র ও উৎকট কমিউনিস্ট বিদ্বেষ। চীনের সঙ্গে কমিউনিস্টদের এক করে দেখে উগ্র চীন বিরোধিতা রূপ নিল উগ্র কমিউনিস্ট বিরোধিতায়। এই ব্যাপারে সবচেয়ে প্রবল ভূমিকা ছিল কংগ্রেসের ভিতরের ও বাইরের যাবতীয় দক্ষিণপন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির। প্রকৃতপক্ষে এই সীমান্ত সংঘর্ষের জন্য চীন ও ভারত উভয়ের মধ্যে কার কতটা দায়িত্ব, কে কতটা দোষী, সে সমস্ত বিবেচনাবোধ শিকেয় তুলে রেখে, সমস্ত যুক্তি বিসর্জন দিয়ে, একতরফা ভাবে চীন বিরোধিতার ও কমিউনিস্ট বিরোধিতার রাস্তা গ্রহণ করা হল। কমিউনিস্ট পার্টি তখনও আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বিখণ্ডিত না হলেও পার্টির মধ্যে 'দক্ষিণপন্থী' ও 'বামপন্থী' মেরুকরণ চূড়ান্ত হয়ে গেছে এবং একে অপরের প্রতিপক্ষের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে গেছে। কমিউনিস্ট পার্টির 'দক্ষিণপন্থী' অংশ চীনকে আক্রমণকারী হিসাবে চিহ্নিত করে জাতীয় প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে নেহরুর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকারকে এবং বিশেষ করে নেহরু ও তাঁর অনুগামীদের পূর্ণ সমর্থনের কথা ঘোষণা করলেন। কমিউনিস্ট পার্টির 'বামপন্থী' অংশ চিহ্নিত হলেন 'দেশদ্রোহী' হিসাবে। সর্বত্র আক্রমণের শিকার হলেন 'বামপন্থী' কমিউনিস্টরা। 'বামপন্থী' কমিউনিস্টদের প্রধান অপরাধ ছিল, তাঁরা দেশব্যাপী উগ্র দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদ ও চীন বিদ্বেষের স্রোতে গা না ভাসিয়ে এবং চীনকে আক্রমণকারী হিসাবে চিহ্নিত না করে নিরপেক্ষ অবস্থান অবলম্বন করেছিলেন এবং আলাপ আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ মিটিয়ে ফেলার কথা বলেছিলেন। পরিণতিতে দেশজুড়ে সব 'বামপন্থী' কমিউনিস্টরাই আক্রমণের ও লাঞ্ছনার শিকার হয়েছিলেন। সারা দেশ জুড়ে ব্যাপক হারে কমিউনিস্টদের গ্রেপ্তার করা শুরু হয়েছিল। প্রধানত 'বামপন্থী' বা 'চীনপন্থী' বলে পরিচিত কমিউনিস্টরাই গ্রেপ্তার হলেও যেহেতু ব্যাপক হারে ও প্রায় নির্বিচারে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, সেহেতু অনেক 'দক্ষিণপন্থী' বা 'রুশপন্থী' বলে পরিচিত কমিউনিস্ট নেতাও গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, যাঁরা পরবর্তীকালে পার্টি ভাগের পর যোগ দিয়েছিলেন সি পি আই তে। চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ এক মাসও চলেনি, কিন্তু 'বামপন্থী' ও অন্যান্য কমিউনিস্ট নেতাদের গ্রেপ্তার হয়ে থাকতে হল এক বছরেরও বেশি। তাঁরা মুক্তি পেলেন ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বর মাসে।

১৯৬৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিখণ্ডিত হল। সৃষ্টি হল নতুন দল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) বা সি পি আই (এম)।

১৯৬৪ সালের ৯ এপ্রিল দিল্লিতে সি পি আই-এর জাতীয় পরিষদের বৈঠক বসল। এই জাতীয় পরিষদের বৈঠকে 'বামপন্থী' কমিউনিস্ট নেতাদের সঙ্গে 'দক্ষিণপন্থী' কমিউনিস্ট নেতাদের তীব্র মতপার্থক্য দেখা দিল। বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে মতপার্থক্য ছিল। সেই বিষয়গুলির মধ্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছিল 'ডাঙ্গে পত্রাবলী' নিয়ে উভয় পক্ষের বিতর্ক। 'বামপন্থী' কমিউনিস্টরা দাবি করেছিলেন, জাতীয়

পরিষদের সভায় তাদের সভাপতিত্ব করা চলবে না, যেহেতু 'ডাঙ্গে পত্রাবলী' নিয়ে বিতর্ক চলছে। শেষ পর্যন্ত কোনও আলোচনাই ফলপ্রসূ হল না। ১১ এপ্রিল ১৯৬৪ জাতীয় পরিষদের ৩২ জন সদস্য সভা ছেড়ে বেরিয়ে আসেন এবং পৃথক বিবৃতি দেন। এই সভাত্যাগী সদস্যদের মধ্যে নাম্বুদ্রিপাদ, জ্যোতি বসু ও ভূপেশ গুপ্ত তিনজনই ছিলেন। পার্টির ভাঙন প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গেল।

১৯৬৪ সালের ৭ থেকে ১১ জুলাই জাতীয় পরিষদের সভা ত্যাগী ৩২ জন 'বামপন্থী' কমিউনিস্টদের ডাকে অন্ধ্রপ্রদেশের তেনালিতে একটি কনভেনশন অনুষ্ঠিত হল। যোগ দিয়েছিলেন সারা দেশ থেকে ১৪৬ জন প্রতিনিধি, যাঁরা 'বামপন্থী' কমিউনিস্ট বলে পরিচিত ছিলেন। জ্যোতি বসু ও নাম্বুদ্রিপাদ এই তেনালি কনভেনশনে যোগ দিয়েছিলেন এবং উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু ভূপেশ গুপ্ত এই কনভেনশনে যোগ দেননি। জাতীয় পরিষদের সভা থেকে অন্য ৩১ জনের সঙ্গে তিনি বেরিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু তারপরই 'বামপন্থী' কমিউনিস্টদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে তিনি আবার ফিরে গিয়েছিলেন সি পি আই-তেই।

এই সময় কমিউনিস্ট পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ রাখার প্রয়াসে পার্টি ভাঙন-বিরোধী এবং 'মধ্যপন্থী' কমিউনিস্টদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল একটি সংগঠন। তার নাম ছিল কমিউনিস্ট ইউনিটি সেন্টার (Communist Unity Centre--CUC) বা কমিউনিস্ট ঐক্য কেন্দ্র বা সি ইউ সি। জ্যোতি বসু এই সময় যুক্ত হয়েছিলেন এই সি ইউ সি-র সঙ্গে। তাঁর সঙ্গেই ছিলেন নিরঞ্জন সেন, সরোজ মুখোপাধ্যায়, মহম্মদ ইসমাইল, মনোরঞ্জন রায়, রবীন মুখোপাধ্যায়, হেমন্তর ঘোষাল প্রমুখ। জ্যোতি বসু-সহ এঁরা সকলেই শেষ পর্যন্ত যোগ দিয়েছিলেন সি পি আই (এম)-এ, সি ইউ সি-র কয়েকজন সদস্য শেষপর্যন্ত চলে গিয়েছিলেন সি পি আই-তে, আর কেউ কেউ দুই দলের কোনটিতেই যোগ না দিয়ে নিজেদের 'মধ্যপন্থী' ও ভাঙনবিরোধী অবস্থান বজায় রেখেছিলেন। তেনালি কনভেনশনের আগেই কলকাতায় 'জ্যোতি বসু প্রমুখের দলিল' নামে একটি রাজনৈতিক দলিল প্রকাশিত হয়েছিল। এটি ছিল 'বামপন্থী' কমিউনিস্টদের দলিলের থেকে পৃথক। এই দলিলটি ছিল সি ইউ সি-র তৎকালীন রাজনৈতিক মতবাদের পরিচায়ক।

শেষপর্যন্ত জ্যোতি বসু যোগ দিয়েছিলেন তেনালি কনভেনশনে এবং এই কনভেনশনের কার্য পরিচালনার জন্য সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য হয়েছিলেন, অর্থাৎ তিনি শেষপর্যন্ত তাঁর 'মধ্যপন্থী' অবস্থান ত্যাগ করে সম্পূর্ণভাবে যোগ দিলেন 'বামপন্থী' কমিউনিস্টদের সঙ্গে। একই অবস্থান গ্রহণ করলেন নাম্বুদ্রিপাদ।

তেনালি কনভেনশনেই স্থির হল, পার্টির সপ্তম কংগ্রেস আহ্বান করে নতুন রাজনৈতিক লাইন 'জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব'-এর শ্লোগানের ভিত্তিতে স্থির করা হবে। গ্রহণ করা হবে নতুন পার্টি কর্মসূচি। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের মতভেদের প্রশ্নে এখনই কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে না। তেনালি কনভেনশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পার্টির সপ্তম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হল কলকাতার ত্যাগরাজ হলে ১৯৬৪ সালের ৩১ অক্টোবর থেকে ৭ নভেম্বর। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল নবগঠিত দল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) বা সি পি আই (এম)-এর প্রথম কংগ্রেস। কিন্তু ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পূর্বতন কংগ্রেসগুলির ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে এই কংগ্রেস সি পি আই (এম)-এর বিচারে পরিচিত হয়ে আছে এই দলের সপ্তম কংগ্রেস হিসাবে। সপ্তম কংগ্রেসে পি সুন্দরাইয়া সর্বসম্মতিক্রমে সি পি আই (এম)-র সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও পলিটব্যুরো উভয় সংস্থাতেই সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন জ্যোতি বসু ও নাম্বুদ্রিপাদ। এখন

থেকেই অদ্যাবধি জ্যোতি বসু সি পি আই (এম) এর কেন্দ্রীয় কমিটি ও পলিটব্যুরো উভয়েরই সদস্য। সাতের দশকে ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ সি পি আই (এম) এর সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং তারপর থেকে সুদীর্ঘ সময় তিনি সাধারণ সম্পাদক হিসাবে এই দলকে পরিচালিত করেছিলেন। ১৯৬৪ সালের ৭ নভেম্বর মনুমেন্ট ময়দানে নবগঠিত সি পি আই (এম)-এর প্রথম প্রকাশ্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

নবগঠিত সি পি আই (এম) জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের আদর্শ সামনে রেখে তার কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। একই সঙ্গে শান্তিপূর্ণ ও সংসদীয় পথে তার আস্থার কথাও ঘোষণা করেছিল। ঘোষণা করেছিল আন্তর্জাতিক প্রশ্নে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি ও চীনা কমিউনিস্ট পার্টি থেকে সমদূরত্ব বজায় রেখে নিজস্ব অবস্থান গ্রহণের কথা।

সি পি আই (এম) দলের জঙ্গী বিপ্লবী অংশ প্রথম থেকেই সি পি আই (এম)-এর প্রোগ্রাম তথা কর্মসূচি নিয়ে খুশি ছিলেন না। নির্বাচনে জিতে ক্ষমতা দখলের কর্মসূচি তাদের আকৃষ্ট করেনি, তারা চাইছিলেন সশস্ত্র বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের প্রোগ্রাম। এই বিপ্লবী অংশের নেতৃত্বে ছিলেন উত্তরবঙ্গের সি পি আই (এম) নেতা চারু মজুমদার। প্রোগ্রাম তথা কর্মসূচি নিয়ে আপত্তি থাকলেও অখুশি হলেও তারা তখনই সি পি আই (এম) ছেড়ে বেরিয়ে যাননি। পরবর্তীকালে নকশালবাড়ির সশস্ত্র কৃষক অভ্যুত্থানের সমর্থনকে কেন্দ্র করে সি পি আই (এম) দলের এই জঙ্গী বিপ্লবী অংশ বহিষ্কৃত হয়েছিল পার্টি থেকে এবং গড়ে তুলেছিল ভারতের তৃতীয় কমিউনিস্ট পার্টি, যার নাম ছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) অথবা সি পি আই (এম এল)।

কংগ্রেসী অপশাসনের বিরুদ্ধে ক্রমশ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছিল গণ-অসন্তোষ, যা ক্রমেই রূপ নিচ্ছিল গণবিক্ষোভের। সাধারণ মানুষ ক্রমেই উপলব্ধি করতে শুরু করেছিলেন কংগ্রেসী শাসন থেকে তাদের আর পাওয়ার কিছুই নেই, এবার একটা পরিবর্তন দরকার। সেই পরিবর্তন শেষপর্যন্ত এল ১৯৬৭তে, কিন্তু তার আগে ১৯৬৬ সালটি ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পশ্চিমবাংলায় শুরু হল ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলন। পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী তখন প্রফুল্লচন্দ্র সেন। প্রফুল্লচন্দ্র সেনের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে নানা আন্দোলন চলেছিল সারা ১৯৬৫ সাল জুড়ে। চলেছিল বন্দিমুক্তি আন্দোলন। ১৯৬৫ সালের আগস্ট সেপ্টেম্বর মাসে চলল ট্রামভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলন। বন্দিমুক্তির দাবির সঙ্গে যুক্ত হল এই দাবিও। পশ্চিমবঙ্গের সি পি আই (এম) দলের শীর্ষস্থানীয় নেতারা প্রায় সকলেই তখন কংগ্রেস সরকারের জেলে আবদ্ধ, কারারুদ্ধ ছিলেন অন্যান্য বামপন্থী নেতারাও।

এইরকম এক পরিস্থিতিতে পশ্চিমবাংলায় ১৯৬৬ সালের ফ্রেবুয়ারি মাসে শুরু হল ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলন, যার কথা গণ-আন্দোলনের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ ছিল সি পি আই (এম), সি পি আই এবং অন্যান্য সব বামপন্থী দলের। যৌথ নেতৃত্বও এসেছিল এইসব দলের কাছ থেকেই।

ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলন শুরু হয়েছিল স্বতঃস্ফূর্তভাবে — প্রথমে কয়েকটি ছোটোখাটো ঘটনা দিয়ে। তারপর যত দিন গেল, আন্দোলন ক্রমশ আরও ব্যাপক রূপ নিতে শুরু করল। খাদ্য আন্দোলনের আগুন ছড়িয়ে পড়ল সারা পশ্চিমবাংলায়। খাদ্য আন্দোলন দমন করার জন্য কংগ্রেস সরকারের পুলিশ নির্বিচারে ব্যবহার করেছিল লাঠি, কাঁদানে গ্যাস, গুলি। এই আন্দোলন দমনের জন্য পুলিশের গুলিবর্ষণ মাত্রাছাড়া হয়ে উঠতে শুরু করেছিল, পুলিশী সন্ত্রাস হয়ে উঠেছিল লক্ষ্যহীন।

১৯৬৬ সালের মার্চের শেষে রাজবন্দিরা ক্রমশ মুক্তি পেতে শুরু করলেন। তখনও আন্দোলন প্রত্যাহৃত হয়নি। তখনও আন্দোলনের উপর চলছে পুলিশী গুলিবর্ষণ-দমন-পীড়ন-সন্ত্রাস।

আন্দোলনের চাপে সরকারি খাদ্যনীতির কিছু কিছু পরিবর্তন ঘোষিত হল। শেষপর্যন্ত আন্দোলনের অনেক দাবি পশ্চিমবঙ্গ সরকার মেনে নেওয়ায় আংশিক বিজয় লাভের মধ্য দিয়ে এই ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটল। শেষ হল খাদ্য আন্দোলন, কিন্তু থেকে গেল এর রেশ।

ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক চিত্রটিও অনেকটাই পরিবর্তিত হয়ে গেছে। পারস্পরিক বিদ্বেষ এবং শত্রুতা সত্ত্বেও দুই কমিউনিস্ট দল সি পি আই (এম) এবং সি পি আই আন্দোলনের যুক্ত মঞ্চে পরস্পরের কাছাকাছি চলে এসেছে। যুক্ত আন্দোলন অন্যান্য বামপন্থী দলগুলিকেও নিয়ে এসেছে দুই কমিউনিস্ট দলের কাছে। ঐক্যবদ্ধ কংগ্রেস বিরোধী মঞ্চ গঠনের পরিস্থিতি অনেকটাই প্রস্তুত হয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মনের মধ্যেও ক্রমশই প্রবল হয়ে উঠছে কংগ্রেস বিরোধিতা।

এর মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় কংগ্রেস নেতা অজয় মুখোপাধ্যায় মতপার্থক্যের কারণে তাঁর অনুগামীদের নিয়ে কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে এসে গঠন করেছেন বাংলা কংগ্রেস। বাংলা কংগ্রেস হাত মিলিয়েছে কংগ্রেসের বামপন্থী বিরোধী পক্ষের সঙ্গে।

এসে গেল চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল লোকসভায় এবং পশ্চিমবঙ্গ সহ বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভায়। পশ্চিমবঙ্গে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল ১৯৬৭ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি। বিভিন্ন মতপার্থক্য ও অনৈক্যের কারণে ঐক্যবদ্ধ কংগ্রেসবিরোধী ফ্রন্ট করে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সম্ভবপর হল না। কংগ্রেসবিরোধী দুটি বামপন্থী ফ্রন্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতা করল এই নির্বাচনে। একটি ছিল সি পি আই (এম)-এর নেতৃত্বাধীন সংযুক্ত বাম ফ্রন্ট বা ইউ এল এফ (United Left Front or U L F)। তাতে সি পি আই (এম) ছাড়াও ছিল আর এস পি, এস ইউ সি প্রভৃতি বামপন্থী দল। অপর ফ্রন্টটির নাম ছিল প্রগতিশীল সংযুক্ত বাম ফ্রন্ট বা পি ইউ এল এফ (Progressive Left Front or P U L F)। তাতে ছিল সি পি আই, বাংলা কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি দল।

কেন্দ্রে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে পুনর্বার সরকার গড়তে সমর্থ হলেও আসন সংখ্যা অনেক হ্রাস পেল। পশ্চিমবঙ্গে স্বাধীনতার পর এই প্রথম একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাল কংগ্রেস, যদিও বিধানসভায় একক সর্ববৃহৎ দল ছিল তারা।

এবার সম্মিলিত কংগ্রেস বিরোধী সরকার গঠনের প্রস্তুতি শুরু হল। আলোচনায় বসল ইউ এল এফ এবং পি ইউ এল এফ। শেষপর্যন্ত ইউ এল এফ এবং পি ইউ এল এফ যৌথভাবে একটি ফ্রন্ট গঠনের কথা ঘোষণা করে। গঠিত হল ১৪ দলের যুক্তফ্রন্ট। সি পি আই (এম) এই ফ্রন্টের মধ্যে সর্ববৃহৎ দল হওয়া সত্ত্বেও পরিস্থিতির প্রয়োজনে অজয় মুখোপাধ্যায়কে নেতা হিসাবে স্বীকার করে নিল। জ্যোতি বসু হলেন সহ-নেতা।

১৯৬৭ সালের ২ মার্চ বিপুল উত্তেজনা-উন্মাদনার মধ্যে পশ্চিমবাংলায় সুদীর্ঘ কুড়ি বছর ব্যাপী কংগ্রেসী অপশাসনের অবসান ঘটিয়ে প্রতিষ্ঠিত হল প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার। অজয় মুখোপাধ্যায় হলেন প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী। উপ-মুখ্যমন্ত্রী হলেন জ্যোতি বসু। জ্যোতি বসুর দায়িত্বে রইল অর্থ এবং পরিবহন দপ্তর। কাজ শুরু করল মন্ত্রিসভা।

এর পরবর্তী ইতিহাস প্রায় সকলেরই জানা। ফলে সেই পর্যায়ের বিস্তারিত বিবরণে এবং আলোচনায় যাওয়া নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়। এই পর্যায়ের ইতিহাস নেহাতই সংক্ষেপে এখানে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে।

১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে প্রথম ক্ষমতায় এসেই বেশ কয়েকটি গণমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার। সমস্ত ছাঁটাই সরকারি কর্মচারীকে কাজে ফিরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। ট্রাম ও স্টেট বাসের ছাঁটাই শ্রমিকরাও চাকরি ফিরে পেয়েছিলেন। ১৯৬৭ সালের জুলাই মাসে ব্রিটিশ পুঁজি পরিচালিত কলকাতা ট্রাম কোম্পানি পরিচালনার দায়িত্বভার নিজের হাতে তুলে নিল প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার। এর জন্য কোনও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হল না।

এর মধ্যেই ১৯৬৭ সালের মে মাসে মাওপন্থী কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের নেতৃত্বে উত্তর বাংলার নকশালবাড়িতে সংঘটিত হল এক সশস্ত্র কৃষক অভ্যুত্থান। এই কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা তখনও অবধি ছিলেন ক্ষমতাসীন সি পি আই (এম) দলের সক্রিয় সদস্য। এই নকশালবাড়ি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সঙ্কটে পড়েছিল সি পি আই (এম)। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই ভাঙল সি পি আই (এম); গঠিত হল সি পি আই (এম-এল), শুরু হল নকশালপন্থী আন্দোলন। এই প্রসঙ্গে নিতান্তই সংক্ষেপে হলেও পরে কিছুটা আলোচনা করা হবে।

এর মধ্যেই শুরু হয়ে গেল প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের চক্রান্ত। এই চক্রান্তে মুখ্য ভূমিকা ছিল পশ্চিমবঙ্গের নবনিযুক্ত রাজ্যপাল ধরমবীর এবং রাজ্য কংগ্রেসের ক্ষমতালোভী এক অংশের। এই চক্রান্তের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায় প্রথমে কিছুটা যুক্ত হলেও পরে তিনি সরে আসেন। কিন্তু এই চক্রান্তে পুরোদস্তুর যুক্ত ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, হুমায়ুন কবির প্রমুখ যুক্তফ্রন্টেরই কয়েকজন প্রভাবশালী নেতা। প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ছিলেন এই সরকারের খাদ্যমন্ত্রী।

১৯৬৭ সালের ৪ নভেম্বর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করলেন এবং ১৭ জন বিধানসভা সদস্যসহ যুক্তফ্রন্ট ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। ১৯৬৭ সালের ২১ নভেম্বর রাজ্যপাল ধরমবীর প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে দিলেন। ক্ষমতায় আসীন হলেন প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বাধীন পি ডি এফ এবং কংগ্রেসের কোয়ালিশন সরকার। মুখ্যমন্ত্রী হলেন পি ডি এফ এর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এবং উপমুখ্যমন্ত্রী হলেন কংগ্রেসের প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র।

পশ্চিমবাংলায় শুরু হল এই পিছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় আসা মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভ। এই বিক্ষোভে নেতৃত্ব দিল সি পি আই (এম)সহ সব বামপন্থী দল। ২২ নভেম্বর থেকে শুরু হল বিক্ষোভ-ধর্মঘট-হরতাল। সেইসঙ্গে চলল সরকারি দমন-পীড়ন এবং পুলিশের লাঠিচার্জ-গুলি ও গ্রেপ্তার।

বিক্ষোভ চলতেই থাকল। ১৯৬৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করল। পশ্চিমবঙ্গে জারি হল রাষ্ট্রপতির শাসন — এই প্রথমবার।

১৯৬৯ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গে অনুষ্ঠিত হল মধ্যবর্তী নির্বাচন। এটাই ছিল এই রাজ্যে প্রথম মধ্যবর্তী নির্বাচন। ১৪ দলের যুক্তফ্রন্ট এবার সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। এই নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট পেল ২১৪টি আসন, কংগ্রেস পেল ৫৫টি।

যুক্তফ্রন্টের মধ্যে সি পি আই (এম) সর্ববৃহৎ দল হওয়া সত্ত্বেও এবারও পরিস্থিতির প্রয়োজনে এবং ঐক্যের স্বার্থে অজয় মুখোপাধ্যায়কেই নেতা হিসাবে নির্বাচিত করা হল, সহ-নেতা হলেন জ্যোতি বসু। ১৯৬৯ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হল। অজয় মুখোপাধ্যায় হলেন দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী। উপ মুখ্যমন্ত্রী হলেন জ্যোতি বসু। এবারে তাঁর হাতে রইল সাধারণ প্রশাসন এবং পুলিশ-সহ স্বরাষ্ট্র দপ্তরের দায়িত্ব।

যুক্তফ্রন্ট সরকার দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসে প্রথমবারের মতই ভূমিসংস্কার কর্মসূচিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছিল। বিধানসভায় 'পশ্চিমবঙ্গ ভূমিসংস্কার (দ্বিতীয় সংশোধনী) বিল,

১৯৬৯' উত্থাপন করা হয়েছিল সরকারের তরফ থেকে। সারা ভারতে প্রথম পশ্চিমবঙ্গেই এ ধরনের একটি বিল আনা হয়েছিল। এই বিলে পরিবার পিছু তিন একর পর্যন্ত কৃষিজমিকে খাজনা থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে ৬০ লক্ষ কৃষিজীবী পরিবার খাজনার কবল থেকে স্থায়ীভাবে রেহাই পেয়েছিলেন।

দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার এইরকমই আরও কিছু গণমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারকেও প্রথমটির মতোই ভেঙে দেওয়ার চক্রান্ত প্রথম থেকেই শুরু হয়েছিল। কেন্দ্রের উস্কানি ও চক্রান্ত তো ছিলই, কিন্তু যুক্তফ্রন্ট সরকারকে প্রথম থেকেই দুর্বল এবং প্রায় পঙ্গু করে তুলেছিল শরিকী বিবাদ এবং শরিকী সংঘর্ষ। এই শরিকী বিবাদে ও সংঘর্ষে যুক্তফ্রন্টের ১৪টি শরিক দলের প্রায় সকলেই কোনও না কোনওভাবে জড়িয়ে পড়েছিল, সকলেরই ছিল কম-বেশি দায়িত্ব। বাইরের চক্রান্ত ও উস্কানি যতই থাকুক না কেন, যুক্তফ্রন্টের যা সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল, শরিক দলগুলি যদি ঐক্যবদ্ধ থাকত এবং পারস্পরিক বিবাদে ও সংঘর্ষে লিপ্ত না হত, সেক্ষেত্রে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে কাবু করা বা ফেলে দেওয়া কিছুতেই সম্ভবপর হত না। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পিছনে কেন্দ্রের ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকারের এবং রাজ্যের কংগ্রেস দলের নিঃসন্দেহে ভূমিকা ছিল। কিন্তু সবেচেয়ে বেশি ভূমিকা ছিল যুক্তফ্রন্টভুক্ত সব কটি শরিক দলেরই। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট ভাঙার দায়িত্ব যুক্তফ্রন্টের কোনও নেতাই এড়িয়ে যেতে পারেন না।

শরিকী বিবাদ ও সংঘর্ষ ক্রমশ বাড়তেই থাকে। প্রায় অচল হয়ে পড়ে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার। ১৯৭০ সালের জানুয়ারি মাসেই পরিষ্কার হয়ে যায় যুক্তফ্রন্ট সরকার ভাঙছে, ভাঙাটা শুধু সময়ের অপেক্ষামাত্র।

১৯৭০ সালের ১৬ মার্চ মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায় পদত্যাগ করলেন। পতন ঘটল দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার। পরের দিন ১৭ মার্চ সি পি আই (এম) সারা পশ্চিমবঙ্গে হরতাল ডাকল! নানা স্থানে সংঘর্ষে নিহত হলেন ২৪ জন। সেইদিনই ঘটল সাঁইবাড়ির হত্যাকাণ্ড।

জ্যোতি বসু তৎকালীন রাজ্যপাল ধাওয়ানের সঙ্গে দেখা করে বললেন, একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে সি পি আই (এম)-কে সরকার গঠন করার সুযোগ দেওয়া হোক। তাঁরা বিধানসভায় শক্তির পরীক্ষা দেবেন। কিন্তু রাজ্যপাল সেই অনুরোধ অগ্রাহ্য করলেন। ১৯৭০ সালের ১৯ মার্চ পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতির শাসন জারি হল।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে পঞ্চম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। ১৯৭১ সালের ৯ মার্চ পশ্চিমবঙ্গে লোকসভা এবং বিধানসভা উভয় নির্বাচনই অনুষ্ঠিত হল। এই নির্বাচনে বহুমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল। এর মধ্যে ১৯৬৯ সালে কংগ্রেস দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে এবং ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসই শাসক কংগ্রেস হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। শাসক কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল সি পি আই (এম)-এর নেতৃত্বাধীন ছয় বাম দলের জোট। এছাড়াও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল সি পি আই-এর নেতৃত্বাধীন আট বাম দলের জোট। বাংলা কংগ্রেস, আর এস পি প্রভৃতি দল এককভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল।

এই নির্বাচনে বিধানসভায় সমর্থিত চার জন নির্দল-সহ সি পি আই (এম) এককভাবে পেয়েছিল ১১৫টি আসন এবং সি পি আই (এম)-এর নেতৃত্বাধীন ছয় বাম দলের জোট পেয়েছিল মোট ১২৩টি আসন। অপরদিকে শাসক কংগ্রেস পেয়েছিল ১০৫টি আসন।

সি পি আই (এম) একক সর্ববৃহৎ দল হওয়া সত্ত্বেও এবং এই দলের নেতৃত্বাধীন ছয় বাম দলের জোট একক সর্ববৃহৎ জোট হওয়া সত্ত্বেও রাজ্যপাল ধাওয়ান সি পি আই (এম)-এর নেতা জ্যোতি বসুকে সরকার গঠনের জন্য আহ্বান জানাননি। রাজ্যপালের যুক্তি

ছিল জ্যোতি বসুর নেতৃত্বাধীন সি পি আই (এম) তথা ছয় বাম দলের জোটের বিধানসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই। শেষপর্যন্ত সি পি আই-এর সমর্থনে শাসক কংগ্রেস, বাংলা কংগ্রেস এবং সংগঠন কংগ্রেস, মুসলিম লিগ প্রভৃতি নানারকম দলকে নিয়ে গঠিত হল এক নীতিহীন সুবিধাবাদী পাঁচমিশালি সরকার। এই সরকারের নাম ছিল ডেমোক্র্যাটিক কোয়ালিশন সরকার। মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন বাংলা কংগ্রেসের নেতা অজয় মুখোপাধ্যায়। উপ-মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন কংগ্রেস নেতা বিজয় সিংহ নাহার। এই মন্ত্রিসভা শপথ নিয়েছিল ১৯৭১ সালের ২ এপ্রিল এবং পদত্যাগ করেছিল ২৫ জুন। অজয় মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশে রাজ্যপাল ধাওয়ান বিধানসভা ভেঙ্গে দিলেন। আবার জারি হল রাষ্ট্রপতির শাসন।

পুরো ১৯৭০-৭১ ধরেই চলেছিল, সংঘর্ষ, হত্যাকাণ্ড এবং খুনোখুনির রাজত্ব। কংগ্রেস-সি পি আই (এম) সংঘর্ষ, কংগ্রেস-নকশালপন্থী সংঘর্ষ, পুলিশ-নকশালপন্থী সংঘর্ষ, সি পি আই (এম)-নকশালপন্থী সংঘর্ষ, সি পি আই (এম)-এর সঙ্গে অন্যান্য বামপন্থী দলের সংঘর্ষ — শুধু সংঘর্ষ এবং পারস্পরিক হত্যাকাণ্ড ও খুনোখুনি। সি পি আই (এম)-নকশালপন্থী সংঘর্ষ এবং সি পি আই (এম)-এর সঙ্গে অন্যান্য বামপন্থীদের সংঘর্ষ থেকে পুরো লাভ তুলে নিচ্ছিল কংগ্রেস, প্রতিষ্ঠা হচ্ছিল প্রায় ফ্যাসিবাদী কংগ্রেসী শাসন প্রতিষ্ঠার পটভূমি।

১৯৭২ সালের ১১ মার্চ পশ্চিমবাংলায় আবার অনুষ্ঠিত হল মধ্যবর্তী নির্বাচন। পশ্চিমবাংলায় তথা সারা ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে এই দিনটি হল সবচেয়ে কালো দিন। এই নির্বাচনে সি পি আই ছিল কংগ্রেসের সহযোগী। আর কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল সি পি আই (এম)-এর নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট, তাতে ছিল আর এস পি, ফরওয়ার্ড ব্লক, এস ইউ সি প্রভৃতি বামপন্থী দল। ব্যাপক রিগিং ও সন্ত্রাস চালিয়ে ১৯৭২ সালের ১১ মার্চ ঐ নির্বাচনে সি পি আই (এম)-এর নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্টকে পরাজিত করা হল। ঐ নির্বাচনে কংগ্রেসকে জেতানোর জন্য হেন গুণ্ডামি নেই, যা করা হয়নি। ব্যাপক হারে ব্যবহার করা হয়েছিল সমাজবিরোধী ও গুণ্ডাদের। প্রশাসন ছিল পরোক্ষ সমর্থক। ঐ নির্বাচনে সি পি আই (এম)-এর আসন সংখ্যা কমে দাঁড়াল ১৪। অবিশ্বাস্য ফলাফল! ঠিক এক বছর আগের নির্বাচনে সি পি আই (এম)-এর আসনসংখ্যা ছিল ১১৫, আর এবারে কমে এসে দাঁড়াল মাত্র ১৪। প্রকৃতপক্ষে ঐ জাল ও রিগড্ বিধানসভা নির্বাচনে ব্যাপক সন্ত্রাস চালিয়ে সি পি আই (এম)-কে ১৪টির বেশি আসন পেতে দেওয়া হয়নি। সমস্ত রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করে ঐ রিগড্ নির্বাচনে জ্যোতি বসুকে তাঁর নিজের বিধানসভা কেন্দ্র বরাহনগরে হারানো হয়েছিল। ছেদ পড়েছিল তাঁর ২৫ বছরেরও অধিক পরিষদীয় রাজনৈতিক জীবনে।

১৯৭২ সালের ২১ মার্চ পশ্চিমবঙ্গে আবার প্রতিষ্ঠিত হল কংগ্রেস সরকার। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন সিদ্ধার্থশংকর রায়। এই সরকারকে সমর্থন করেছিল সি পি আই। সিদ্ধার্থশংকর রায়ের নেতৃত্বাধীন এই কংগ্রেস সরকারের আমলে পরবর্তী পাঁচ বছর ধরে সারা পশ্চিমবাংলায় চলেছিল ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাস।

১৯৭২ সালের ১৮ মার্চ সি পি আই (এম) সহ নয়টি বামপন্থী দল, যারা জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচনে লড়েছিল, সিদ্ধান্ত নিল, জাল ও রিগড্ নির্বাচনভিত্তিক এই সাজানো বিধানসভা বয়কট করা হবে। যুক্ত বিবৃতিতে সি পি আই (এম) দলের পক্ষে স্বাক্ষর করেছিলেন জ্যোতি বসু। পরে অবশ্য আর এস পি মত পরিবর্তন করে বিধানসভায় যোগ দিয়েছিল — বিধানসভার ভিতর থেকে লড়াই করার উদ্দেশ্যে।

১৯৬৭ সালের মে মাসে মাওপন্থী কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের নেতৃত্বে পশ্চিমবাংলার উত্তর

ভাগের এক অঞ্চল নকশালবাড়িতে সংঘটিত সশস্ত্র কৃষক অভ্যুত্থানের প্রভাব পড়েছিল ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে। নকশালবাড়ি আন্দোলন নামে সুপরিচিত এই অভ্যুত্থানের অনুপ্রেরণায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলেও সংঘটিত হয়েছিল সশস্ত্র কৃষক আন্দোলন -- কৃষক অভ্যুত্থান। আর এই সঙ্গেই নকশালবাড়ি কৃষক অভ্যুত্থানের প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে শুরু হয়েছিল সশস্ত্র জঙ্গি বিপ্লবী আন্দোলন, যা সাধারণভাবে পরিচিত হয়ে আছে নকশাল আন্দোলন নামে। এই নকশাল আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল ১৯৬৯ সালের ২২ এপ্রিল গঠিত ভারতের তৃতীয় কমিউনিস্ট পার্টি, যার নাম ছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) অথবা সি পি আই (এম-এল)। এই ঘটনাবলীর আর একটু বিস্তারিত বিবরণ-বিশ্লেষণ প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় আবশ্যক।

১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে সি পি আই (এম)-এর বিপ্লবী অংশও দলীয় কর্মী হিসাবে সাংগঠনিক আনুগত্যের কারণে অংশগ্রহণ করেছিলেন, কেউ কেউ দলীয় নির্দেশে এই নির্বাচনে সি পি আই (এম) দলের প্রার্থীও হয়েছিলেন। ১৯৬৭ সালের ২ মার্চ বিপুল উত্তেজনা-উন্মাদনার মধ্যে পশ্চিমবাংলার সুদীর্ঘ কালের কংগ্রেসী অপশাসনের অবসান ঘটিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার। ক্ষমতায় এসেই প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী বর্ষীয়ান সি পি আই (এম) কৃষকনেতা হরেকৃষ্ণ কোঙার 'জমি থেকে ভাগচাষীদের উৎখাত বন্ধে'র কথা এবং 'ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি দ্রুত বণ্টন' করার কথা ঘোষণা করেছিলেন। সেই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই ১৯৬৭ সালের ১৮ মার্চ দার্জিলিং জেলায় সি পি আই (এম) দলের শিলিগুড়ি মহকুমা কমিটি এক কৃষক সম্মেলনের অনুষ্ঠান করেছিল এবং সেই কৃষক সম্মেলন 'জমির উপর জোতদারদের একচেটিয়া মালিকানার অবসান ঘটিয়ে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে কেড়ে নেওয়া জমি বণ্টনের এবং জোতদার ও গ্রামীণ প্রতিক্রিয়াশীলদের আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্য সশস্ত্র কৃষক সংগঠন গঠন করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। সেই মত কাজও শুরু হয়েছিল। কানু স্যান্যাল, জঙ্গল সাঁওতাল প্রমুখ সি পি আই (এম)-এর বিপ্লবী অংশ এই কাজে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

১৯৬৭ সালের মে মাসে দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ি এবং ফাঁসিদেওয়া অঞ্চলে বিদ্রোহী কৃষকেরা তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ১৯৬৭ সালের ২৩ মে পুলিশের সঙ্গে বিদ্রোহী কৃষক জনতার সংঘর্ষে সোনমওয়াংদি নামে এক পুলিশ ইন্সপেক্টর মারা যায়। প্রতিশোধস্পৃহায় উন্মত্ত পুলিশ ২৫ মে নকশালবাড়ি অঞ্চলের প্রসাদজোত গ্রামে গ্রামবাসীদের উপর গুলি চালিয়ে দশ জনকে হত্যা করে। নিহতদের মধ্যে ছিলেন সাত জন নারী এবং দুজন শিশু। গ্রামবাসী কৃষকদের উপর পুলিশী অত্যাচার-আক্রমণ-সন্ত্রাস চলতেই থাকে, একই সঙ্গে চলতে থাকে কৃষক প্রতিরোধ। শেষপর্যন্ত ১৯৬৭ সালের ২২ জুলাই পুলিশ সাময়িককালের জন্য নকশালবাড়ির কৃষক অভ্যুত্থান দমন ও স্তব্ধ করতে সক্ষম হয়। কিন্তু সে শুধুই সাময়িককালের জন্য।

নকশালবাড়ি কৃষক অভ্যুত্থানের ঘটনাগুলোতে সবচেয়ে ফাঁপরে পড়েছিল সি পি আই (এম) দল। এই দলের হয়েছিল 'সাপের ছুঁচো গেলার' অবস্থা। সরকারে থাকার মাসুল দিতে হচ্ছিল এই দলকে। সি পি আই (এম) না পারছিল তাদেরই দলের কমরেডদের নেতৃত্বে সংঘটিত এই নকশালবাড়ি কৃষক অভ্যুত্থানকে অনুমোদন করতে, না পারছিল পুলিশী অত্যাচার-সন্ত্রাসকে অনুমোদন করতে। কেন্দ্রের প্রতিক্রিয়াশীল কংগ্রেস সরকারের কাছ থেকে কঠোর হাতে আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতি রক্ষা করার জন্য চাপ আসছিল। কেন্দ্র এই অজুহাতে রাজ্যের প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে দিতে পারে এই ভয়ও ছিল।

শেষপর্যন্ত সি পি আই (এম) দল এবং মন্ত্রীরা পুলিশী আক্রমণ অত্যাচার-সন্ত্রাসের নিন্দা করে পুলিশী কার্যকলাপ বন্ধের দাবি জানালেও সি পি আই (এম) দল নকশালবাড়ি কৃষক অভ্যুত্থান এবং নকশালবাড়ি প্রদর্শিত সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহের লাইনকে অনুমোদন করল না।

নকশালবাড়ি কৃষক অভ্যুত্থান সম্পূর্ণ সমর্থিত ও অনুমোদিত হল চীন থেকে। নকশালবাড়ি লাইনও চীনের সম্পূর্ণ স্বীকৃতি লাভ করল। চীনের কমিউনিস্ট নেতৃত্বের চোখে নকশালবাড়ির সশস্ত্র কৃষক অভ্যুত্থান ছিল 'ভারতের বুকে বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ।'

তার পরের ঘটনাবলী খুব দ্রুত ঘটতে শুরু করল। ১৯৬৭ সালের জুন মাসে সি পি আই (এম) থেকে বহিষ্কৃত হলেন সুশীতল রায়চৌধুরী, ১৯৬৫ সালের জানুয়ারি থেকে ১৯৬৭ সালের এপ্রিল অবধি প্রকাশিত 'ঐতিহাসিক আটটি দলিল'-এর লেখক চারু মজুমদার, সরোজ দত্ত, কানু সান্যাল, সৌরেন বসু, অসিত সেন, পরিমল দাশগুপ্ত প্রমুখ ১৯ জন বিপ্লবী নেতা। প্রায় ৪০০ পার্টি সদস্য দলবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে সি পি আই (এম) থেকে বহিষ্কৃত হলেন।

সি পি আই (এম) থেকে বহিষ্কৃত বিপ্লবী নেতা ও সদস্যরা এবং অন্যান্য বিপ্লবী কমিউনিস্টরা ১৯৬৭ সালের ১৩ নভেম্বর গড়ে তুললেন 'অল-ইন্ডিয়া কো-অর্ডিনেশন কমিটি অব্ রেভলিউশানারীজ্' (এ আই সি সি আর)। ১৯৬৮ সালের ১৪ মে এই সংগঠন নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম গ্রহণ করল 'অল-ইন্ডিয়া কোঅর্ডিনেশন কমিটি অভ্ কমিউনিস্ট রেভলিউশানারীজ্' (এ আই সি সি সি আর)।

ভারতে নতুন কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের পূর্ণ প্রস্তুতি শুরু হল। আর তার সঙ্গেই শুরু হল এ আই সি সি সি আর-এর মধ্যে মতবিরোধ। নাগি রেড্ডির নেতৃত্বে অন্ধ্রপ্রদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্টদের একটা বড় অংশ ১৯৬৯ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি এ আই সি সি সি আর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। চারু মজুমদার চাইছিলেন এখনই ভারতে নতুন কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করতে। নাগি রেড্ডি চাইছিলেন আরও সময় ও আরও প্রস্তুতি।

অপরদিকে নকশালবাড়ির অনুপ্রেরণায় সংগ্রাম চলছিল অন্ধ্রপ্রদেশের তেলেঙ্গনা ও শ্রীকাকুলামে, বিহারের মুশাহরিতে, উত্তরপ্রদেশের লখিমপুরে। চারু মজুমদার মনে করলেন পার্টি গঠনের সময় উপস্থিত।

১৯৬৯ সালের ১৯ থেকে ২২ এপ্রিল এ আই সি সি সি আর-এর প্লেনারি সেশন অনুষ্ঠিত হল কলকাতায়। সেই সেশনে এ আই সি সি সি আর বিলুপ্ত হওয়ার কথা এবং নতুন পার্টি গঠিত হওয়ার কথা ঘোষিত হল। ১৯৬৯ সালের ২২ এপ্রিল গঠিত হল এক নতুন কমিউনিস্ট পার্টি— ভারতের তৃতীয় কমিউনিস্ট পার্টি — ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) অথবা সি পি আই (এম-এল)। অনেকটা আচমকাই এই নতুন কমিউনিস্ট পার্টি জন্ম নিল। অনেক বিপ্লবী কমিউনিস্টই এই সিদ্ধান্ত তখনই জানতে পারলেন না, অনেক বিপ্লবী কমিউনিস্ট এই সিদ্ধান্তের শরিক হলেন না।

১৯৬৯ সালের ১ মে কলকাতার শহিদ মিনারের পাদদেশে ময়দানে অনুষ্ঠিত মে দিবসের জনসভায় প্রখ্যাত কমিউনিস্ট বিপ্লবী নেতা কানু সান্যাল আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করলেন এই নতুন কমিউনিস্ট পার্টি—ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)-গঠনের কথা। ১৯৬৯ সালের ২ জুলাই পিকিং রেডিও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) গঠনের কথা ঘোষণা করে তাকে শুভেচ্ছা জানালো। অর্থাৎ নতুন কমিউনিস্ট পার্টি সি পি আই (এম এল)-এর মিলল চীনের স্বীকৃতি।

কিন্তু প্রথম থেকেই সি পি আই (এম-এল)-এর মধ্যে দেখা দিল বিরোধ। অনেক কমিউনিস্ট বিপ্লবীই সি পি আই (এম এল) দলে যোগ দেননি। অনেকেই আবার যোগ

দিয়ে কিছুদিনের মধ্যেই মতবিরোধের কারণে পার্টি ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। অভিযোগ ছিল উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নতুন দল সৃষ্টির, অভিযোগ ছিল আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দল চালানোর, অভিযোগ ছিল সব মতের কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের স্বাধীন মতপ্রকাশের সুযোগ না দেওয়ার।

১৯৭০ সালের ১৫ ও ১৬ মে কলকাতায় গোপনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল সি পি আই (এম এল) দলের প্রথম কংগ্রেস। দলের মধ্যে মতবিরোধ ততদিনে প্রকট রূপ ধারণ করতে শুরু করেছে। সি পি আই (এম এল) দল ভারতকে বর্ণনা করেছিল 'আধা-ঔপনিবেশিক, আধা-সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র' বলে, ঘোষণা করেছিল 'ভারতে প্রকৃত রাষ্ট্রক্ষমতা নিহিত আছে বৃহৎ জমিদার এবং মুৎসুদ্দি-আমলাতান্ত্রিক পুঁজিপতি শ্রেণীর হাতে।' এই দলের চোখে ভারত সরকার ছিল 'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের দালাল।' এই দলের বিচারে 'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র এবং মুৎসুদ্দি-আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ ছিল ভারতীয় জনগণের 'চার প্রধান শত্রু,' 'ভারতীয় জনগণের বুকের উপর চেপে বসা চার জগদ্দল পাহাড়ের ভার।'

সি পি আই (এম-এল) ডাক দিয়েছিল 'সশস্ত্র গণবিপ্লবের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলে'র, 'বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল'-ই ছিল শেষ কথা, 'কৃষি বিপ্লব' ছিল তার সূত্রপাত, তার সোপান। 'কৃষি বিপ্লবে'র পথ অনুসরণ করেই 'রাষ্ট্রক্ষমতা দখল' করতে হবে, 'গ্রামকে দিয়ে শহর ঘিরতে' হবে, আর তাই ডাক ছিল 'গ্রামে চলো'র। বহু মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী এই ডাকে সাড়া দিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছেড়ে বেরিয়ে এসে, কেরিয়ার গঠনের তোয়াক্কা না করে কৃষিবিপ্লবে অংশগ্রহণ করতে গ্রামে চলে গিয়েছিলেন, রাষ্ট্রশক্তি ও শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, নতুন ভবিষ্যতের স্বপ্নে রাঙিয়ে নিয়েছিলেন নিজেদের, দেশের মানুষকেও দেখাতে শুরু করেছিলেন এই স্বপ্ন।

তার পরের ইতিহাস বড়ই করুণ, বড়ই ট্র্যাজিক। রাষ্ট্রশক্তি সম্পূর্ণ ফ্যাসিস্ট কায়দায় দমন করা শুরু করল নকশালপন্থী আন্দোলন। পুলিশ-সি আর পি-মিলিটারি নকশালপন্থী বিপ্লবীদের উপর শুরু করল নির্মম অত্যাচার। জেল ভরে গেল নকশালপন্থী বিপ্লবীতে, শুরু হল দিকে দিকে নকশাল হত্যা, এনকাউন্টারের নামে ঠাণ্ডা মাথায় গুলি করে নকশাল নিধন। 'শ্বেত সন্ত্রাসের' চূড়ান্ত নমুনা দেখাল ভারতের রাষ্ট্রশক্তি, সারা ভারত প্রত্যক্ষ করল রাষ্ট্রীয় ফ্যাসিবাদের নির্মম রূপ।

অপরদিকে বিপ্লবী নকশালপন্থী আন্দোলনও আটকে পড়ল সন্ত্রাসবাদের কানাগলিতে। 'গেরিলা যুদ্ধে'র স্থান নিল 'খতম' অভিযান, শ্রেণীসংগ্রামের নামে শুরু হল নিছক ব্যক্তি হত্যা, বিপ্লবী সংগ্রাম রূপ নিল নিছক সন্ত্রাসবাদের। শুরু হল ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষ, উপদলীয় সংঘর্ষ। শহরে শ্রেণীসংগ্রাম আবদ্ধ রইল ব্যক্তিহত্যা, মূর্তি ভাঙা, স্কুল-কলেজের উপর আক্রমণ, ল্যাবরেটরি পোড়ানো ইত্যাদির মধ্যে। বলিষ্ঠ প্রতিবাদ করলেন বর্ষীয়ান কমিউনিস্ট বিপ্লবী, নকশালপন্থী নেতা সুশীতল রায়চৌধুরী, কিন্তু এই সমস্ত কাজকর্মকে বিপ্লবী অনুমোদন জানালেন চারু মজুমদার ও সরোজ দত্ত। 'খতম' লাইনের তীব্র বিরোধিতা এল একদা চারু মজুমদারের একনিষ্ঠ অনুগামী, একদা কিংবদন্তীপ্রায় ছাত্র নেতা, প্রখ্যাত নকশাল নেতা অসীম চ্যাটার্জির (কাকা) কাছ থেকেও। কিন্তু চারু মজুমদার, সরোজ দত্ত ছিলেন তাঁদের লাইনে অবিচল।

ব্যাপক রাষ্ট্রীয় ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসের সম্মুখীন হয়ে বিপর্যস্ত হয়ে গেল নকশালপন্থী আন্দোলন। 'শ্বেত সন্ত্রাসে'র পালটা 'লাল সন্ত্রাস', আবার 'লাল সন্ত্রাসের পালটা 'শ্বেত সন্ত্রাস'। নকশালপন্থী আন্দোলন স্তিমিত হয়ে গেল, পরাজিত হল, কিন্তু থেকে গেল

নকশালবাড়ির শিক্ষা। সশস্ত্র বৈপ্লবিক গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলই একমাত্র পথ, নিপীড়িত জনগণের মুক্তির একমাত্র উপায় -- এই ছিল নকশালবাড়ির শিক্ষা। সি পি আই (এম-এল) নকশালবাড়ির শিক্ষা বিস্মৃত হয়ে বৈপ্লবিক গণ আন্দোলন ও গণ সংগঠনের পথ ছেড়ে ধরেছিল 'ব্যক্তি হত্যা'র পথ, তাই সেই পথ দুর্ভাগ্যবশত শেষ হয়েছিল সন্ত্রাসবাদের কানাগলিতে। কিন্তু কখনই বিস্মৃত হওয়ার নয় নকশালপন্থী তরুণ তরুণীদের চরম আত্মত্যাগ, ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে তাদের মরণপণ সংগ্রাম, 'জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য' করে যে লড়াই তারা লড়েছিলেন, তারা জিতেছিলেন, কি হেরেছিলেন, সেটা সেখানে বড় কথা ছিল না। নকশালবাড়ি আন্দোলন ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং ভারতে বিপ্লবের চরিত্র বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে দিয়েছিল এক বিকল্প পথের সন্ধান, ভারতে বিপ্লব কোন্ পথ ধরে হবে এবং কি কি স্তরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হবে, সেক্ষেত্রেও নকশালবাড়ি আন্দোলন করেছিল এক বিকল্প পথনির্দেশ। নকশালবাড়ি আন্দোলন সশস্ত্র গণসংগ্রামের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পথনির্দেশ উপস্থাপিত করেছিল জনগণের কাছে, লক্ষ লক্ষ কৃষকের কাছে গিয়ে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে বিপ্লবী রাজনীতি ছড়িয়ে দিয়েছিল প্রত্যন্ত গ্রামে-গ্রামান্তরে। সমগ্র ভারতীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার দিকেই নকশালবাড়ি আন্দোলন ছুঁড়ে দিয়েছিল এক সিরিয়াস চ্যালেঞ্জ। সমস্ত ব্যর্থতা-ত্রুটি-বিচ্যুতি-সীমাবদ্ধতা-সন্ত্রাসবাদী বিপথগমন সত্ত্বেও এখানেই নিহিত আছে নকশালবাড়ি আন্দোলনের সার্থকতা, সাফল্য ও অবদান।[৯]

কিন্তু এই বছরগুলিতেই দেখা গিয়েছিল সি পি আই (এম) এবং নকশালপন্থীদের মধ্যে ব্যাপক সংঘাত। রক্তাক্ত ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষ একের পর এক ঘটে গিয়েছিল সি পি আই (এম) এবং নকশালপন্থীদের মধ্যে। এই ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষে ক্ষতি হয়েছিল দু পক্ষেরই, ক্ষতি হয়েছিল সার্বিকভাবে কমিউনিস্ট আন্দোলনের, আর লাভবান হয়েছিল কংগ্রেস। এই সি পি আই (এম)-নকশালপন্থী ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষ পরবর্তীকালে কংগ্রেসের প্রায় ফ্যাসিবাদী শাসন প্রতিষ্ঠার পথ অনেকটাই সুগম করে দিয়েছিল। ক্ষমতায় আসার আগে থেকেই অর্থাৎ ১৯৭১ সালে রাষ্ট্রপতির শাসন চলার সময়েই পুলিশ এবং গুণ্ডা-সমাজবিরোধীদের সহায়তায় কংগ্রেস সি পি আই (এম) এবং নকশালপন্থী উভয় পক্ষের উপরই তীব্র আক্রমণ নামিয়ে এনেছিল। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের শিকার হওয়া শুরু করেছিলেন সি পি আই (এম) এবং নকশালপন্থী উভয় পক্ষই। আর ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে সিদ্ধার্থশংকর রায়ের নেতৃত্বে পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সম্পূর্ণ ফ্যাসিবাদী কায়দায় দমন করা হয়েছিল সি পি আই (এম) এবং নকশালপন্থী উভয় পক্ষকেই। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস সি পি আই (এম) এবং নকশালপন্থী কাউকেই ছেড়ে দেয়নি।

সিদ্ধার্থশংকর রায়ের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমবাংলার কংগ্রেস সরকার স্তব্ধ করে দিয়েছিল সব গণ-আন্দোলন, কেড়ে নিয়েছিল মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার। গণতন্ত্র হত্যার ব্যাপক আয়োজন করা হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে। ১৯৭৩-৭৪ সালে এসব সত্ত্বেও ছোটখাটো গণ-আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গে হয়েছে। সেগুলিতে সি পি আই ব্যতীত অন্যান্য সব বামপন্থী শক্তিরই অংশগ্রহণ ছিল।

১৯৭৪ সালের ৮ মে থেকে সারা ভারতে শুরু হয়েছিল ঐতিহাসিক রেল ধর্মঘট। ব্যাপক দমন-পীড়ন ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালানো হয়েছিল ধর্মঘটী রেল কর্মচারীদের উপর। শেষপর্যন্ত দাবি না মিটলেও ২০ দিন পরে রেল ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হয়েছিল ধর্মঘটী নেতৃত্বের এক অংশের আপসকামী মনোভাব ও বিশ্বাসভঙ্গের ফলে, যদিও ধর্মঘটী রেল কর্মচারীরা ধর্মঘট চালিয়ে যেতে প্রস্তুত ছিলেন।

সারা ভারতেই এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। ইন্দিরার স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী গণ আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ, ডাক দিয়েছিলেন 'সর্বাত্মক বিপ্লব' এর। সমস্ত প্রতিবাদী কণ্ঠ রুদ্ধ ও সমস্ত বিরোধী মত স্তব্ধ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ১৯৭৫ সালের ২৬ জুন সারা ভারতে ঘোষিত হল আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা। সারা দেশ জুড়ে ব্যাপক হারে গ্রেপ্তারী শুরু হল। জয়প্রকাশ নারায়ণ-সহ স্বৈরতন্ত্রের বিরোধী সমস্ত নেতাকে গ্রেপ্তার করা হলেও এবারে সি পি আই (এম) দলের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়নি। উল্লেখযোগ্য সি পি আই (এম) নেতা হিসাবে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন জ্যোতির্ময় বসু ও জয়পাল সিং। অবশ্য সি পি আই (এম) এর মাঝারি ও তলার স্তরের কয়েকজন নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। আর গ্রেপ্তার হয়েছিলেন বহু সি পি আই (এম) কর্মী। গ্রেপ্তার হয়েছিলেন বহু নকশালপন্থী এবং অন্যান্য বামপন্থী কর্মীরাও। অবশ্য ১৯৭০ সালে থেকেই নকশালপন্থীদের হয় হত্যা করা হচ্ছিল, অথবা জেলে পোরা হচ্ছিল। জরুরী অবস্থার সময় আর গ্রেপ্তার হয়েছিলেন ইন্দিরা স্বৈরতন্ত্র বিরোধী বেশ কয়েকজন সাংবাদিক। এই সময় ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার দাবিতে জনসভার মধ্যেই আন্দোলন আবদ্ধ হয়েছিল।

১৯৭৭ সালের মার্চ মাসে ঘোষিত হল লোকসভা নির্বাচন। নির্বাচনে পরাজিত হল কংগ্রেস। পরাজিত হলেন স্বয়ং ইন্দিরা গান্ধী। কেন্দ্রে নির্বাচিত হল জনতা সরকার। জনতার সহযোগী ছিল বামফ্রন্ট। বামফ্রন্ট কেন্দ্রে জনতা সরকারকে সমর্থন জানাল। বামফ্রন্টের নেতৃত্বে ছিল সি পি আই (এম), সঙ্গে ছিল আর এস পি, ফরওয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি বামপন্থী শক্তি।

১৯৭৭ সালের ১২ জুন ও ১৪ জুন দু'দিন পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। এই নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে বিজয়ী হল সি পি আই (এম)-এর নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট। ২৯৪টি আসনের মধ্যে ২৩১টি লাভ করল বামফ্রন্ট। সি পি আই (এম) এককভাবে লাভ করল ১৭৮টি আসন। বরাহনগরের পরিবর্তে সাতগাছিয়া কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিপুল ভোটে জিতে বিধানসভায় নির্বাচিত হলেন জ্যোতি বসু, পাঁচ বছর বিধানসভার বাইরে থাকার পর।

অবসান ঘটল ইন্দিরা-সিদ্ধার্থ স্বৈরতন্ত্রের। পশ্চিমবাংলায় প্রতিষ্ঠিত হল বামফ্রন্ট সরকার। ১৯৭৭ সালের ২১ জুন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করলেন জ্যোতি বসু। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম কমিউনিস্ট মুখ্যমন্ত্রী হলেন জ্যোতি বসু। তারপর ১৯৮২, ১৯৮৭, ১৯৯১, ১৯৯৬—চারবারের প্রতিবারই বামফ্রন্টের বিজয়। প্রতিবারই মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। ১৯৭৭ সালের ২১ জুন থেকে ১৯৯৭-এর সেপ্টেম্বর — টানা ২০ বছরেরও অধিক সময় ধরে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী আছেন কমিউনিস্ট নেতা জ্যোতি বসু।

দীর্ঘ সময়ের কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিকাশের পথ ধরে এবং তার ধারাবাহিকতা অবলম্বন করে ক্ষমতায় এসেছে এবং অধিষ্ঠিত আছে জ্যোতি বসুর নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকার। ফলে এক অর্থে বামফ্রন্ট সরকার কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিজয়, তার বিকাশলাভের পরিণতি, অবশ্যই কখনওই চূড়ান্ত অর্থে নয়। শুধু কমিউনিস্ট আন্দোলন নয়, ব্যাপক অর্থে সমগ্র বামপন্থী আন্দোলনেরই সাফল্যের পথ ধরে এসেছে এই বামফ্রন্ট সরকার। আবার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিকাশলাভের এবং বিজয়ের পথ ধরেও বামফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতায় আসা। এক অর্থে কমিউনিস্ট আন্দোলনের চেয়েও ব্যাপক অর্থে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিকাশের এবং সাফল্যের পরিণতি বামফ্রন্ট সরকার। কারণ

কংগ্রেসী স্বৈরতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সার্বিক আগ্রহই পরিণতি পেয়েছে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

এবারই আমাদের মুখোমুখি হতে হয় এক অনিবার্য ও অমোঘ প্রশ্নের - বামফ্রন্ট সরকারের ২০ বছরেরও অধিক সময় ধরে ক্ষমতায় অধিষ্ঠান কি কমিউনিস্ট আন্দোলনের অগ্রগতি ও বিকাশলাভের পক্ষে সহায়ক হয়েছে, না কি রুদ্ধ হয়ে গেছে কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রবহমানতা, আবদ্ধ হয়ে আছে কমিউনিস্ট আন্দোলন 'সরকারসর্বস্বতা'র ও 'সংসদসর্বস্বতা'র চৌহদ্দির ভিতর? কমিউনিস্ট আন্দোলনের অগ্রগতির ও বিকাশের পথ ধরেই ২০ বছর আগে ক্ষমতায় এসেছিল বামফ্রন্ট সরকার, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও কেরল — এই তিনটি রাজ্যে ক্ষমতায় আসীন আছে বামফ্রন্ট সরকার, লোকসভায় আসন ও শক্তি উভয়ই বেড়েছে কমিউনিস্টদের, কেন্দ্রীয় সরকারকে বিভিন্ন কাজকর্মে প্রভাবিত করতে পারার ক্ষেত্রেও কমিউনিস্টদের আছে একটা বড় ভূমিকা, সি পি আই তো বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারে অন্যতম অংশগ্রহকারী, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মত এক অতি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরও আছে এই দলের হাতে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন নীতি নির্ধারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকেন সি পি আই (এম) নেতা জ্যোতি বসু ও এই দলের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক হরকিষেণ সিং সুরজিৎ, প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য বিশেষ গুরুত্ব সহকারেই বিবেচিত হয়েছিল জ্যোতি বসুর নাম, এসবই নিঃসন্দেহে সত্য। কিন্তু এর ফলে কতটা এগোতে পেরেছে সামগ্রিক বিচারে কমিউনিস্ট আন্দোলন, যে সমাজবিপ্লবের উদ্দেশ্য নিয়ে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূত্রপাত সেই উদ্দেশ্যসাধনের পথে অগ্রগতি আদৌ কতটা সম্ভবপর হয়েছে? সমাজবিপ্লবের কোনও সম্ভাবনা কি আদৌ সৃষ্টি করা সম্ভবপর হয়েছে? প্রশ্নগুলির উত্তর নেতিবাচক হতে বাধ্য। কেন্দ্রীয় কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের আপত্তির কারণে জ্যোতি বসুর প্রধানমন্ত্রী হওয়া সম্ভব হল না। এটা সম্ভব হলে দেশ একজন কমিউনিস্ট প্রধানমন্ত্রী পেত। জ্যোতি বসু নিজে পার্টির এই সিদ্ধান্তকে 'এক বিরাট রাজনৈতিক ভ্রান্তি', 'এক ঐতিহাসিক ভ্রান্তি', 'সঠিক রাজনৈতিক চেতনার অভাব' ইত্যাদি তীব্র সমালোচনামূলক ভাষায় আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু জ্যোতি বসু প্রধানমন্ত্রী হলেও কি কমিউনিস্ট আন্দোলনের কোনও অগ্রগতি ঘটত, এই আন্দোলন এগোতে পারত সমাজবিপ্লবের অভীষ্ট লক্ষ্যের পথে?

কমিউনিস্টদের অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে পড়ে দু ধরনের সংগ্রামের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটানো। একটি হচ্ছে 'সংসদীয় পথে সংগ্রাম' বা 'Parliamentary Struggle', কিন্তু অপরটি অবশ্যই হচ্ছে 'সংসদ বহির্ভূত পথে সংগ্রাম' বা 'Extra-Parliamentary Struggle'। আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত কমিউনিস্ট পার্টিদ্বয় শুধু প্রথমটিকেই আঁকড়ে ধরে বসে আছে, দ্বিতীয়টির কথা লেখা আছে বইয়ের পৃষ্ঠায়, আছে প্রোগ্রামের ধারায়, উচ্চারিত হয় ভাষণে-আলোচনায়, কিন্তু বাস্তব অবস্থানের সঙ্গে দ্বিতীয় পথটির ব্যবধান ক্রমশ বেড়েই চলেছে। লেনিন যাকে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছিলেন 'Parliamentary Cretinism' ('পারলিয়ামেন্টারী ক্রেটিনিজম্') বলে, সেই 'Parliamentary Cretinism' আজ গ্রাস করতে চলেছে আমাদের দেশের প্রতিষ্ঠিত কমিউনিস্ট পার্টি দুটিকে এবং সেই সঙ্গে কমিউনিস্ট আন্দোলনকেও। 'বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলে'র কোনও আশু সম্ভাবনা নেই, সেই সম্ভাবনা সৃষ্টির কোনও প্রয়াসও নেই। নকশালপন্থী আন্দোলন পরাস্ত, বিপর্যস্ত, ছিন্নভিন্ন। আছে বিচ্ছিন্ন নকশালপন্থী প্রয়াস, যা ভারতের রাজনীতির উপর সার্বিকভাবে কোনও প্রভাব ফেলে না, চরিত্রগতভাবে তা নেহাতই আঞ্চলিক। অনেক সময়ই এই প্রয়াস আবার হঠকারিতা ও সন্ত্রাসবাদী বিপথগমনের শিকার।

নানারকম সঙ্কটের সম্মুখীন হয়ে চলেছে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন। তার সামনে নিয়তই আসছে নতুন বিপদ, নতুন বাধা, নতুন চ্যালেঞ্জ। দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার হাত ক্রমশই শক্ত হয়ে চলেছে। ভোগবাদী মানসিকতা ক্রমশ গ্রাস করতে চলেছে আমাদের সমগ্র সমাজকে। নব রূপে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের পথ প্রশস্ত হচ্ছে। উদারনীতিকরণ, বেসরকারিকরণ ও বিশ্বায়নের গালভরা ও বাহারী বক্তব্যের আড়ালে বহুজাতিক সংস্থাসমূহের অবাধ লুণ্ঠনের রাস্তা তৈরি হয়ে চলেছে -- তাদের শোষণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছে আমাদের দেশ। ভোগবাদ ও অবক্ষয়ের হাতছানি সর্বত্র। অপরদিকে শোনা যাচ্ছে গৈরিক ফ্যাসিবাদের পদধ্বনি, প্রায়শই তা জোরালো হয়ে ওঠে। প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় আগমন কোনও অসম্ভব ঘটনা নয়, অদূর ভবিষ্যতে তা ঘটতেই পারে। আর তাহলেই গৈরিক ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়ে যাবে। এই সমস্ত বাধা-বিপদ-চ্যালেঞ্জের সঠিক মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত কি আমাদের দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন, অস্ত্রাগারে যে সমস্ত অস্ত্র আছে, তা এই মোকাবিলার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী ও উপযুক্ত তো? উত্তরটা খুব আশাব্যঞ্জক নাও হতে পারে।

কি করা উচিত আমাদের দেশের কমিউনিস্টদের? কোন্ পথে সম্ভব কমিউনিস্ট আন্দোলনের অগ্রগতি? 'বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল' তো অনেক দূরের ব্যাপার, কোনও আশু সম্ভাবনা নেই। সংসদীয় নির্বাচনে ও সরকারে অংশগ্রহণ আপত্তিকর নয়, বরং কৌশল হিসাবে তা অবলম্বন করা অবশ্যই প্রয়োজন, আপত্তিজনক হল 'সংসদসর্বস্বতা' ও 'সরকারসর্বস্বতা', যা আমাদের দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক বড় ব্যাধি হিসাবে দেখা দিয়েছে। প্রখ্যাত ইতালিয় মার্কসবাদী তাত্ত্বিক ও কমিউনিস্ট নেতা আন্তোনিও গ্রামশি (Antonio Gramsci) এবং বিখ্যাত ফরাসী মার্কসবাদী তাত্ত্বিক লুই আলথুসারের (Louis Althusser) দৃষ্টিভঙ্গি ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অনুসরণ ও অবলম্বন করে আমাদের দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের কর্তব্য নিরূপণের বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে।[১০]

লুই আলথুসার মার্কসবাদী বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে রাষ্ট্রক্ষমতা (State Power) এবং রাষ্ট্র যন্ত্র (State Apparatus)-এর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেছেন। রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করা অপেক্ষাকৃত সহজ কাজ, অনেক কঠিন কাজ হল রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করা, এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর স্বীয় কর্তৃত্ব স্থাপন ও বিস্তার করা। রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা হলেই রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করা হয় না। এর স্বীকৃতি মেলে লেনিনের লেখাতেও। ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে বলশেভিক বিপ্লবের পর লেনিনকেও এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ফলে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পরই কমিউনিস্টদের সচেতন প্রয়াস চালাতে হবে রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করার জন্য, রাষ্ট্রযন্ত্রের কর্তৃত্ব থেকে বুর্জোয়াদের সম্পূর্ণ অপসারিত করার জন্য। আলথুসার আবার দু ধরনের রাষ্ট্রযন্ত্রের কথা লিখেছেন — (১) নিপীড়নমূলক রাষ্ট্র যন্ত্র (Repressive State Appartus) এবং (২) মতাদর্শমূলক রাষ্ট্র যন্ত্র (Ideological State Apparatus)। অর্থাৎ শুধুমাত্র নিপীড়নমূলক রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করাই যথেষ্ট নয়, সঙ্গে সঙ্গেই দখল করতে হবে মতাদর্শমূলক রাষ্ট্রযন্ত্রও। আর এই দ্বিতীয় কাজটিই অধিকতর কঠিন। মতাদর্শমূলক রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করার জন্য প্রয়োজন সমাজদেহে মতাদর্শের (Ideology) বিস্তার, প্রয়োজন আধিপত্যের (Hegemony) বিস্তার। আর এইখানেই আছে আন্তোনিও গ্রামশির তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা।

জার নিয়ন্ত্রণাধীন রাশিয়ার সঙ্গে তাঁর নিজের দেশ ইতালির ও ইতালির মত অন্যান্য

দেশের পার্থক্য নিরূপণ করে গ্রামশি লিখেছিলেন, এই দ্বিতীয় ধরনের দেশগুলিতে রাষ্ট্রই সব নয়, আছে এক শক্তিশালী পুর সমাজ (Civil Society), কারণ এই দেশগুলিতেই গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের ফলে এই শক্তিশালী পুর সমাজ গড়ে উঠেছে। গ্রামশির মতে ইতালির মত পশ্চিমী গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে শাসকশ্রেণী শুধুমাত্র বলপ্রয়োগ বা প্রভুত্বের (Force) মাধ্যমেই শাসন করে না, শাসন করে আধিপত্য (Hegemony) বিস্তারের মাধ্যমেও। ফলে শুধুমাত্র শাসকশ্রেণীর প্রভুত্বের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করলে চলবে না। ভাঙতে হবে সমাজদেহে তার আধিপত্যকেও। ফলে প্রয়োজন পাল্টা আধিপত্য বিস্তারের। এই কারণেই গ্রামশির তত্ত্ব অনুযায়ী ইতালির মত পশ্চিমী গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে বিপ্লবের চরিত্র রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের চরিত্রের থেকে পৃথক হবে। এই দেশগুলিতে বিপ্লব হবে পাল্টা আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে, চরিত্রগতভাবে এ হবে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম, গ্রামশির ভাষায় যা হল 'অবস্থায়ী যুদ্ধ' ('War of Position')। অপরদিকে বলশেভিক বিপ্লব তাঁর চোখে ছিল 'চলিষ্ণু সংগ্রাম' ('War of Manoeuvre'), যা রাশিয়ার মত দেশ, যেখানেই রাষ্ট্রই সর্বগ্রাসী, পুর সমাজের পৃথক কোনও অস্তিত্ব নেই, সেখানে প্রযোজ্য।

গ্রামশির তত্ত্ব অনুসরণ করেই ভারতের কমিউনিস্টদের এগোতে হবে। ভারতে নানাবিধ বিকৃতি সত্ত্বেও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অস্তিত্ব ও বিকাশের ফলে রাষ্ট্র সর্বগ্রাসী নয়, আছে এক শক্তিশালী পুর সমাজ (Civil Society)। শাসকশ্রেণী এখানে শুধুমাত্র বলপ্রয়োগ বা পশুশক্তি বা প্রভুত্বের (Force) মাধ্যমেই শাসন করে না, সমাজদেহে তার আধিপত্য (Hegemony) বিস্তারের মাধ্যমেও শাসন করে। ভারতে কমিউনিস্টদের লড়তে হবে শাসক শ্রেণীর প্রভুত্ব ও আধিপত্য উভয়ের বিরুদ্ধেই। এখানে তাঁদের চালাতে হবে 'অবস্থায়ী যুদ্ধ' ('War of Position'), এবং তার জন্যই সমাজদেহে কমিউনিস্টদের বিস্তার করতে হবে পাল্টা আধিপত্য (Hegemony)। গ্রামশি কর্তৃক ব্যবহৃত অর্থে কমিউনিস্ট পার্টিই হচ্ছে সমাজের 'জাতীয় জনপ্রিয় সমষ্টিগত ইচ্ছা' ('national popular collective will')-এর প্রতীক এবং প্রাতিষ্ঠানিক রূপ। সুতরাং কমিউনিস্টদের তার যোগ্য হয়ে উঠতে হবে। পাল্টা আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে কমিউনিস্টদের ভাঙতে হবে সমাজদেহে শাসক শ্রেণীর আধিপত্য। সুতরাং তাঁদের দৃঢ়ভাবে বৈপ্লবিক 'অবস্থায়ী যুদ্ধ' বা 'অবস্থায়ী সংগ্রাম' ('War of Position') চালিয়ে যেতে হবে। গ্রামশির মতানুযায়ী এই 'War of Position'-এর অর্থ হল দীর্ঘদিনব্যাপী 'unprecedented concentration of hegemony'[১১]। একমাত্র এই পথেই ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের অগ্রগতি ও সাফল্য সম্ভব।

সূত্র নির্দেশ :

(১) For the Final Assault ! Tasks of the Indian People in the Present Phase of Indian Revolution. Political Resolution of the Central Committee of the Communist Party of India, August 1946, People's Publishing House, Bombay, pp 1-20

(২) Mountbatten Award and After. Political Resolution of the Central Committee of the Communist Party of India, June 1947, People's Publishing House Ltd, Bombay, pp 1-15

(৩) Communist Statement of Policy. For the Struggle for Full Independence and People's Democracy. Resolution on the present political situation passed by the Central Committee of the Communist Party of India at its meeting held in Bombay from 7th to 16th December 1947, People's Publishing House Ltd, Bombay, December 1947, pp 1-14

(৪) On the Present Policy and Tasks of the Communist Party of India. Adopted by the Central Committee of The CPI at its meeting held in Bombay from December 7 to 16, 1947

(৫) Political Thesis of the Communist Party of India Adopted at the Second Congress February 28 March 6 1948 Calcutta Published by the Communist Party of India Bombay July pp i v+1 118 Political Thesis of the Communist Party of India Adopted at the Second Congress February 28 to March 6 1948 Calcutta in M B Rao (ed) Documents of the History of the Communist Party of India (hereafter Documents) Volume VII (1948 1950) Peoples Publishing House New Delhi January 1976 pp 1 118

(৬) Mighty Advance of National Liberation Movement in the Colonial and Dependent Countries (Editorial) For a Lasting Peace For a Peoples Democracy Bucharest Organ of the Information Bureau of the Communist and Workers Parties (Cominform) No 4 (64) 27th January 1950 p 1

(৭) Gene D Overstreet and Marshall Windmiller Communism in India The Perennial Press Bombay 1960 p 309 Overstreet and Windmiller এই অধ্যায়ের শিরোনাম 'The Return to Constitutional Communism'

(৮) Programme of the Communist Party of India (marxist) Adopted at the Seventh Congress of the Communist Party of India (Marxist) held in Calcutta from October 31 to November 7 1964 With the Amendment by the Ninth Congress in Madurai June 27 July 2 1972 and Statement of Policy Adopted at the All India Conference of the Communist Party of India October 1951 Published by the West Bengal State Committee of the C P I (M) Calcutta Fifteenth Reprint March 1979

(৯) নকশালবাড়ি আন্দোলন সি পি আই (এম এল) এবং নকশালপন্থী' আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এবং বিবরণ বিশ্লেষণের জন্য দ্রষ্টব্য Amitabha Chandra 'The Naxalism Movement The Indian Journal of Political Science Published by the Indian Political Science Association Volume L I (Volume 51) No 1 January March 1990 Madras pp 22 45

এই বিষয়ে বিস্তারিত 'সূত্রনির্দেশ' এর জন্য অর্থাৎ এই বিষয় সম্পর্কিত গ্রন্থাবলী ও প্রবন্ধাবলীর বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য উক্ত প্রবন্ধের Notes and References Amitabha Chandra op cit pp 42 45

(১০) এই বিষয়ে, তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও তাত্ত্বিক কাঠামো নির্ধারণের জন্য সহায়ক গ্রন্থাবলী

(১) Marx Engels Lenin On the Dictatorship of the Proletariat A Collection Progress Publishers Moscow 1984

(২) Louis Althusser Ideology and Ideological State Apparatuses (Notes towards and Invstigation)' in Louis Althusser Essays on Ideology Verso London 1984 pp 1 60

(৩) Selections from the Prison Notebooks' of Antonio Gramsci , Edited and Translated by Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith International Publishers New York 1971 pp i xcvi+1 483

(৪) Antonio Gramsci The Modern Prince and other Writings International Publishers New York 1967 pp 1 192

(৫) John Molyneux Marxism and the Party Pluto Press London, 1978 pp 1 192 and Book Marks London Chicago and Melbourne July 1986 pp 1 192

(৬) আন্তোনিও গ্রামশি, 'নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ', (প্রথম খণ্ড) সম্পাদনা ও অনুবাদ, সৌরীন ভট্টাচার্য ও শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় ভূমিকা' গ্রামশি পরিচয় আমাদের গ্রামশিচর্চা' সৌরীন ভট্টাচার্য ও ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তত্ত্বের অভিমুখে' শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্ল পাবলিশার্স, কলকাতা, জুলাই, ১৯৯৩, পৃ ক জ এবং একশ চুয়াল্লিশ ১২২।

(৭) সৌরীন ভট্টাচার্য ও শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রামশি পরিচয়,' পার্ল পাবলিশার্স, কলকাতা অক্টোবর, ১৯৯৩, পৃ ন ঘ এক-একশ চুয়াল্লিশ।

(৮) শোভনলাল দত্তগুপ্ত (সম্পাদিত) 'আন্তোনিও গ্রামশি বিচার-বিশ্লেষণ,' (প্রথম খণ্ড) ভূমিকা 'গ্রামশি চর্চা প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ ও প্রাসঙ্গিকতা শোভনলাল দত্তগুপ্ত, পার্ল পাবলিশার্স, কলকাতা, জুলাই, ১৯৯৩, পৃ ন ৯-১ ২৩২।

(৯) শোভনলাল দত্তগুপ্ত গ্রামশি চর্চা প্রেক্ষাপট, বিশ্লেষণ ও প্রাসঙ্গিকতা' পার্ল পাবলিশার্স, কলকাতা, অক্টোবর, ১৯৯২ পৃ ন ৮-১ ৯৫

(১০) আন্তোনিও গ্রামশি 'বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষা', সম্পাদনা ও অনুবাদ সৌরীন ভট্টাচার্য ও শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্ল পাবলিশার্স, কলকাতা জানুয়ারি ১৯৯৪, পৃ ন-ঘ-১-৭২।

(১১) Antonio Gramsci State and Civil Society' in Selections from the 'Prison Notebooks' of Antonio Gramsci op cit pp 238-39

র ণ জি ৎ দা শ গু প্ত

স্বাধীনতার পাঁচ দশকে অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি

১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগস্টের সন্ধিক্ষণে জওহরলাল নেহরু জাতির উদ্দেশে ঘোষণা করেছিলেন — বহু বছর আগে আমরা ভাগ্যের সঙ্গে মোকাবিলা করার যে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিলাম তা সার্থক হওয়ার সময় এসেছে। নিঃসন্দেহে দেশের ইতিহাসে একটা পালাবদল ঘটল। আমরা ব্রিটিশ রাজের প্রজা ছিলাম, ডোমিনিয়ানের সংক্ষিপ্ত পর্বের পর হলাম স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রের সর্বজনীন ভোটাধিকারসম্পন্ন নাগরিক, কিন্তু এই পালাবদল যে প্রতিশ্রুতি ও সম্ভাবনা নিয়ে এসেছিল তার কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে? নানা ক্ষেত্রে পরিবর্তন হয়েছে অনেক। কিন্তু, কোন পথে? সেসব পরিবর্তনের গতি কোন দিকে?

গোড়াতে বলে নেওয়া উচিত যে, এই লেখার মুখ্য বিষয় — স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি। তবে সে অর্থনীতিতে রাষ্ট্র ও সরকারের ভূমিকা থেকেছে গুরুত্বপূর্ণ। তাই রাজনীতির কথাও মাঝে মাঝে এসে পড়বে।

ঔপনিবেশিকতার দায়ভাগ

আলোচনার সুবিধার জন্য সংক্ষেপে দেখে নেওয়া ভালো যে, ঔপনিবেশিক আমলে ভারতের অর্থনীতিতে কি জাতীয় পরিবর্তন ঘটেছিল। স্বাধীনতা পাওয়ার সময়ে অর্থনীতির অবস্থা কেমন ছিল — এ সব প্রশ্নে ঐতিহাসিকদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক অনেক। সরলীকরণের ঝুঁকি নিয়েও এখানে বলা হচ্ছে — নানা জটিল পরিবর্তনের মধ্যে অন্যতম প্রধান, এক অর্থে সব থেকে লক্ষণীয়, বৈশিষ্ট্য ছিল ভারতের অর্থনীতিতে সীমিতভাবে হলেও ধনতান্ত্রিক সম্পর্কের অনুপ্রবেশ। আর নানা পদ্ধতিতে ঔপনিবেশিক শোষণের পরিণামে দেশ ছিল চরম দারিদ্র্য-দুর্দশাগ্রস্ত। আরও উল্লেখযোগ্য যে, ঔপনিবেশিক শাসনের শেষ দশকগুলিতে অর্থনীতিতে দেখা দিয়েছিল প্রায় সম্পূর্ণ বদ্ধদশা। ১৯০০ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত সময়ে বছরে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার ছিল ১ শতাংশেরও কম — মাত্র ০.৩৫ শতাংশ! বস্তুতপক্ষে অর্থনৈতিক গতির ধারা ঘুরেছিল বিপরীত দিকে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল মাত্র ১ শতাংশ হারে, এই অবস্থাতেও মাথাপিছু খাদ্যশস্যের যোগান হ্রাস পাচ্ছিল। আর স্বাধীনতার সময়ে নবজাত শিশুর প্রত্যাশিত আয়ু ছিল মাত্র ৩৩ বছর।

ঔপনিবেশিক আমলের প্রায় শুরু বাংলায় ছিয়াত্তরের মন্বন্তর দিয়ে, আর তার প্রায় শেষেও ঘটেছে তেতাল্লিশের মন্বন্তর। এই সময়কালে বারে বারেই দেখা দিয়েছে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ। দুর্ভিক্ষ অবশ্য একটা অস্বাভাবিক ঘটনা, কিন্তু তার শিকড় থেকেছে ঐ আমলের স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যেই।

স্বাধীনতা পাওয়ার সময়ে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো আর কৃষি ও শিল্পের অবস্থা কি ছিল? এখানে সে সবের শুধু একটা আভাসই দেওয়া যেতে পারে। বলাই বাহুল্য, ভারত তখন ছিল একান্তভাবে কৃষিনির্ভর। ১৯৫১ সালে বৃত্তি হিসাবে পুরুষ কর্মীদের ৭৩.২ শতাংশ নিয়োজিত ছিল কৃষিসংশ্লিষ্ট প্রাথমিক বর্গে, মাত্র ১০.৯ শতাংশ নিয়োজিত ছিল শিল্পসংশ্লিষ্ট দ্বিতীয় বর্গে, আর পরিবহন, ব্যবসা, প্রশাসন ইত্যাদি তৃতীয় বর্গের ক্ষেত্রে এই অনুপাত ছিল ১৫.৮ শতাংশ। ঔপনিবেশিক আমলের শেষ সাত দশকে বৃত্তি হিসাবে বিভাগের ক্ষেত্রে কোনো বড় রকমের পরিবর্তন চোখে পড়ে না, মোটের ওপর যে ছবিটা বেরিয়ে আসে তা হল ঔপনিবেশিক অর্থনীতির স্থবিরতা।

কৃষিতে পুঁজিবাদের ক্রমশ প্রসার ঘটতে থাকলেও কৃষি ছিল মূলত সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক। অবশ্য ঐ কৃষি অর্থনীতিকে সামন্ততান্ত্রিক বলে অভিহিত করা যথাযথ কি না তা নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে। জমির ও শ্রমের একক পিছু কৃষির উৎপাদন ছিল অত্যন্ত কম, রীতিমত অনগ্রসর। শিল্পের ক্ষেত্রে অবস্থাটা কি ছিল? উনিশ শতকের প্রথম ছয় দশক বা ঐ রকম সময়ে ঘটেছিল শিল্পের অধোগতি, বিশিল্পায়ন (*Deindustrialisation*)। এর শিকার হয়েছিল চিরাচরিত কুটির ও হস্তশিল্প। ১৮৬০ সাল নাগাদ শুরু হয় আধুনিক যন্ত্রচালিত শিল্পের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু সমগ্র অর্থনীতিতে তার স্থান ছিল সামান্য, ১৯০০—০৪ সালে যখন জাতীয় আয়ের ১৩ শতাংশের কম, আর ১৯৪০-৪৪ সালেও ১৭ শতাংশের নিচে। স্বাধীনতার সময়েও শিল্প কাঠামো ছিল দুর্বল, একপেশে — সুতিবস্ত্র বা পাটশিল্পের মত হালকা শিল্পপ্রধান। মূল ও যন্ত্রপাতি তৈরি করার মত উল্লেখযোগ্য কোনো শিল্প গড়ে ওঠেনি। বিদেশি পুঁজি এসেছে, তবে পরিমাণগত দিকের থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল ঐ পুঁজির অর্থনৈতিক চরিত্র। ঐ পুঁজি ছিল মূলত ঔপনিবেশিক ধাঁচের — বিনিয়োগ হয়েছে কাঁচামাল ইত্যাদি রপ্তানি ও বিদেশ থেকে শিল্পসামগ্রীর আমদানির সহায়ক হয় — এমন সব ক্ষেত্রে যেমন, রেলপথ, বন্দর ইত্যাদি। বস্তুতপক্ষে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির বিশেষ বৈশিষ্ট্যই ছিল তার বহির্মুখীনতা।

ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ও সরকারের ভূমিকা কি ছিল? অবাধ বাণিজ্য (Free Trade) ও অর্থনীতিতে সরকারি হস্তক্ষেপের বিরোধিতা (laissez faire) ছিল ব্রিটেনের রাজনৈতিক মহলে অবিসংবাদিত নীতি। এর দরুন ভারতের অর্থনীতিতে, বিশেষত শিল্পের ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগ ছিল সামান্য। তবে ঔপনিবেশিকতার স্বার্থেই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করেছে সরাসরি, কোনো কোনো জায়গায় পরোক্ষভাবে।

আর একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তনের কথা বলা দরকার। সেটি হল ঔপনিবেশিক পটভূমিতে ভারতীয় পুঁজিপতিদের উত্থান। অনেক সময়ে বিদেশি বণিক ও পুঁজিপতি এবং সরকারের প্রতিকূলতা অগ্রাহ্য করে, আবার বহু ক্ষেত্রে বিদেশি পুঁজির সঙ্গে সমঝোতা করে এবং নানা বিবেচনার থেকে সরকারের পক্ষ থেকে আনুকূল্য প্রদর্শনের সুযোগ নিয়ে সাবেকি ব্যবসা ও মহাজনি থেকে শিল্পপতির ভূমিকা গ্রহণ করে দেশি পুঁজি। তবে উৎপাদনের জগতের থেকে বিচ্ছিন্ন তার জন্ম চিহ্নের ছাপ অর্থাৎ বণিকি - মহাজনি বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে ভারতীয় পুঁজির পরবর্তী বিকাশের ধারায়।

এইসব পরিবর্তনের অঙ্গ হিসাবে জন্ম হল কারখানা, বাগিচা, খনি, রেল ইত্যাদিতে নিযুক্ত মজুরি শ্রমিকের। তারা ছিল পুঁজিবাদী এবং সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতির সংমিশ্রণে সীমাহীন ও বীভৎস শোষণ ও অত্যাচারের শিকার। বহু ক্ষেত্রে শ্রমিকের অবস্থা ছিল আধা-দাসের সামিল।

এই অংশটি শেষ করার আগে ঔপনিবেশিক ধারার আর একটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। ঐ আমলের অর্থনীতির বিভিন্ন অংশ, শাখা-প্রশাখা ছিল নানাভাবে বিচ্ছিন্ন, খণ্ডিত

(fragmented)। আধুনিকীকরণ-এর লক্ষণ হিসেবে কলকাতা বোম্বাই মাদ্রাজের মত যে তিনটি মহানগরী ও পরবর্তীকালে আহ্‌মেদাবাদ কানপুর জামশেদপুরের মত শিল্পনগর এবং ছোট ছোট শহর গড়ে উঠেছিল সে সবই ছিল পশ্চাৎপদ বিশাল কৃষি অর্থনীতি দিয়ে পরিবেষ্টিত বিক্ষিপ্ত কিছু দ্বীপের মত। যে উন্নয়ন ঘটল তা ছিল মূলত enclaved growth।

ভারতীয় রাষ্ট্রের চরিত্র ও ভূমিকা

দেশবিভাগ ও রক্তাক্ত হানাহানির মধ্য দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা এলেও সে মুহূর্তে আশা ছিল দারিদ্র্য দূর হবে, কৃষি ও শিল্পের ব্যাপকভিত্তিক দ্রুত উন্নয়ন ঘটবে, সকলের জন্য অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, কাজের সংস্থান হবে, দেশের সমৃদ্ধি আসবে। ঔপনিবেশিক যুগ থেকে স্বাধীন, উন্নত, আধুনিক যুগে উত্তরণ ঘটবে। বিশ্বাস ছিল, এসব পরিবর্তন নিয়ে আসার ব্যাপারে ভারতীয় রাষ্ট্র ও সরকার সক্রিয় উদ্যোগ নেবে।

এই প্রত্যাশিত উদ্যোগ গ্রহণে সাফল্য ও ব্যর্থতা বোঝার জন্য দেখে নেওয়া দরকার রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব এবং ভারতীয় রাষ্ট্রের চরিত্র ও ভূমিকা। স্বাধীনতার পর সরকারি ক্ষমতায় এলেন এক জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব। রাষ্ট্রের ভূমিকা নির্ধারিত হয়েছে সমাজের শ্রেণীবিন্যাস দিয়ে। প্রভুত্বশালী বিত্তবান বা সম্পত্তির মালিক শ্রেণীগুলির — শিল্প ও বাণিজ্য জগতের ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণী (যার কোনো কোনো অংশের সঙ্গে থেকেছে বিদেশি পুঁজির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক), কৃষিক্ষেত্রে সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-সমান্ততান্ত্রিক ভূস্বামী-জমিদার-জোতদার এবং পুঁজিবাদী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ধনী চাষী, এবং সামরিক ও অসামরিক পেশাদার কর্মচারী গোষ্ঠীর — রাষ্ট্রের সামাজিক-অর্থনৈতিক নীতি নিরূপণের ক্ষেত্রে থেকেছে বিপুল প্রভাব।

অবশ্য এখানে উল্লেখ করা উচিত যে ভারতীয রাষ্ট্র যে, সব সময়ে বিত্তবান শ্রেণী ও গোষ্ঠীগুলির সরাসরি হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে তা নয়। এই শ্রেণী ও গোষ্ঠীগুলির সামগ্রিক ও দীর্ঘকালীন স্বার্থ ক্ষুন্ন না করে রাষ্ট্র অনেক সময়ে আপেক্ষিক অর্থে স্বাধীন (relative autonomous) অবস্থান নিয়েছে। সেটা সম্ভব হয়েছে অংশত বিভিন্ন বিত্তবান শ্রেণী এবং অভ্যন্তরে বিভিন্ন গোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে জটিল টানাপোড়েন ও দ্বন্দ্বের ফলে। তাছাড়া, আমাদের দেশের জটিল স্তর-বিন্যস্ত সমাজে শ্রেণীস্বার্থের সঙ্গে অনেক সময় জাতি সত্তা (nationality) ও অধিজাতিসত্তা, আঞ্চলিক স্বার্থ, ভাষাগোষ্ঠী, জাতি ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আস্তরণ বা প্রলেপ থেকেছে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হল যে, স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে যে রাজনৈতিক নেতৃত্ব ক্ষমতায় এসেছিলেন, বহু বছর ধরে স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়ার ফলে যে মর্যাদা সে নেতৃত্ব অর্জন করেছিলেন এবং জাতীয় অর্থনৈতিক বিকাশে রাষ্ট্রের ভূমিকা সম্পর্কে সে নেতৃত্বের যে মোটামুটি সহমত ছিল, সে সবের ফলে রাষ্ট্র বিত্তবান বা সম্পত্তির মালিক শ্রেণীগুলির সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বেশ কিছুটা স্বাতন্ত্র্য অর্জনে সমর্থ হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যে, বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র দেশে, বহুধাবিভক্ত সমাজ ও বৃহত্তম গণতন্ত্রে নির্বাচনী রাজনীতির বাধ্যবাধকতাও রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক নেতৃত্বকে আপেক্ষিক স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্য দিয়েছিল। অর্থনৈতিক নীতির অগ্রাধিকার এবং পরিবর্তনের গতিমুখ ও পন্থাপদ্ধতি স্থির করার ব্যাপারে রাষ্ট্র ও নেতৃত্বের এই আপেক্ষিক স্বাধীনতার প্রতিফলন ঘটেছে অনেক সময়ে, বিশেষত স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রথম দুই দশকে বা তারও কিছু পরে পর্যন্ত। বস্তুতপক্ষে বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাতের ক্ষেত্রে অনেকদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রের একটা মধ্যস্থের ভূমিকা ছিল। কিন্তু পরিবর্তনের জটিল গতিধারায় সম্পত্তির মালিক শ্রেণী ও গোষ্ঠীগুলির

আর্থ-সামাজিক শক্তিবৃদ্ধি এবং জাতীয় আন্দোলনের ঐতিহ্যবাহী নেতাদের একে একে বিদায় নেওয়ার পর নীতি নিরূপণ ও রূপায়ণে বিত্তবান শ্রেণীগুলির প্রভাব প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে ওঠে। আবার, তাদের সঙ্গে যুক্ত ছিল বিদেশি পুঁজি ও বিদেশি পরামর্শদাতাদের গুরুত্ব।

স্বাধীনতাপ্রাপ্তির সময়ে দেশের অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে ছিল দুটি প্রধান পরিপ্রেক্ষিত — একটি মহাত্মা গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গী, অপরটি জওহরলাল নেহরুর নামের সঙ্গে যুক্ত। গান্ধীর চিন্তায় জোর ছিল কৃষি ও গ্রাম উন্নয়নের উপর, আর নেহরুর দৃষ্টিভঙ্গিতে যন্ত্রশিল্প, আধুনিক প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের ওপর। নেহরু-পন্থাই গৃহীত হল।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক শক্তির মধ্যে যে ভারসাম্য সে সময়ে ছিল তাকে ক্ষুণ্ণ না করাটাই হবে বিজ্ঞানোচিত কাজ — সরকারি নেতৃত্ব এরকম একটা অবস্থান নিয়েছিলেন। সংবিধানেও সম্পত্তির অধিকার ও ব্যবসা ইত্যাদি করার স্বাধীনতার গ্যারান্টি দেওয়া হল। নেতৃত্বের চিন্তা ছিল প্রচলিত বা বিদ্যমান অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে অগ্রাধিকার দিতে হবে উৎপাদনের বৃদ্ধিকে। এর পরিণাম হল, যে অর্থনৈতিক বন্দোবস্ত ছিল তাকে বজায় রাখা, তাকে আরও মজবুত করা। রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও সম্পদকে ব্যবহার করা হল ঐ বন্দোবস্তের মধ্যে উৎপাদন কাজে। এর নাম দেওয়া হল মিশ্র অর্থনীতি। স্বাধীনতা লাভের নয় মাসের মধ্যেই ১৯৪৮ সালে ঘোষিত হল সরকারি শিল্পনীতি। তাতে সমস্ত শিল্পকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। বলা হল প্রথম ভাগের সব শিল্পে থাকবে একমাত্র সরকারি মালিকানা, দ্বিতীয়ভাগে তালিকাভুক্ত শিল্পগুলিতে সব নতুন সংস্থা হবে সরকারি উদ্যোগে, তৃতীয় ভাগে তালিকাভুক্ত শিল্পগুলিতে বেসরকারি উদ্যোগে নতুন প্রতিষ্ঠানও স্থাপিত হতে পারবে, তবে এদের পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের অধিকার থাকবে সরকারের, আর চতুর্থ ভাগে পড়ল বাকি সব শিল্প যেগুলির ক্ষেত্রে দরজা খোলা থাকবে পুরোপুরি বেসরকারি মালিকানার জন্য। বিদেশি পুঁজির প্রয়োজনকে স্বীকার করা হয়েছিল, তবে এই পুঁজির প্রকাশ নিয়ন্ত্রিত থাকবে। নতুন শিল্পনীতি কার্যকর করার জন্য ১৯৫১ সালে পাশ করা হয় শিল্প (উন্নতি ও নিয়ন্ত্রণ) আইন। এই আইনে শিল্পের জন্য লাইসেন্স ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়।

১৯৪৮-এর ঘোষণা ও ১৯৫১ সালের আইন হল সরকারি শিল্পনীতি তথা ভারতের মিশ্র অর্থনীতি-মূল ভিত্তি। ১৯৫৬ সালে শাসক দলের আবাদি সম্মেলনের পর ঘোষিত শিল্পনীতি ছিল সামান্য পরিবর্তনের পর ১৯৪৮-এর নীতির পুনরাবৃত্তি। আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে দফায় দফায় শিথিল করলেও ১৯৯১-এর জুলাই-এ মনমোহন সিং-এর অর্থনৈতিক প্যাকেজের অঙ্গ হিসেবে বাতিল করা পর্যন্ত এটিই ছিল শিল্পনীতি। এই মিশ্র অর্থনীতিকেই অভিহিত করা হল সমাজতন্ত্রের দিকে ভারতীয় পথ হিসেবে। কিছু লোক — তাঁদের কেউ কেউ ছিলেন শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী, আবার কেউ কেউ ছিলেন ঝান রাজনীতিবিদ — জনমানসে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্যই হোক বা সমাজতন্ত্র কথাটি সম্পর্কে স্রেফ অ্যালার্জির জন্যই হোক — এই নীতির বিরোধিতায় সোচ্চার হয়েছিলেন। অবশ্য এমন কয়েকজন ছিলেন যাঁদের কাছে অর্থনীতিতে যে কোন রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপই ছিল সমাজতন্ত্রের সমার্থক। কিন্তু গোড়ার থেকেই অনেকের কাছে, বিশেষত বামপন্থীদের কাছে এটা মনে হয়েছিল যে, সমাজতন্ত্রের ভারতীয় পথ আসলে ভারতের অর্থনীতির ধনতান্ত্রিক ধারাতে উন্নয়নের পথ।

পরিকল্পিত উন্নয়নের প্রথম পনেরো বছর

এই পটভূমি এবং সম্পত্তির প্রচলিত বন্দোবস্তের কাঠামোতে শুরু হয় পরিকল্পিত উন্নয়নের যুগ। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আরম্ভ ১৯৫১ সালে। তবে এই পরিকল্পনা ছিল মূলত

ঔপনিবেশিক আমলের শেষ দিকে ও স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পরে তৈরি কতকগুলি ছোট-বড় বিভাগীয় প্রকল্পের সমষ্টি-মাত্র। সেসব প্রকল্পের পরস্পরের সঙ্গে সঙ্গতি বা সম্পর্ক কমই ছিল। নতুন পরিপ্রেক্ষিতের, ঔপনিবেশিক অর্থনীতির কাঠামোতে রূপান্তর আনার পরিপ্রেক্ষিতের তেমন কোনো পরিচয়ও এই পরিকল্পনাতে ছিল না। বস্তুপক্ষে, এটি রচিত হয়েছিল এই দেশে যাওয়ার আগে ব্রিটিশ শাসকদেরই পরিপ্রেক্ষিতের ভিত্তিতে।

নেহরু - মহলানবীশ ছক

এই পরিকল্পনার থেকে মূলগতভাবেই ভিন্ন চরিত্রের পরিকল্পনা এল দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময় (১৯৫৬ - ৬০) থেকে। সুখময় চক্রবর্তীর ভাষায়, ভারতের অর্থনৈতিক চিন্তায় একটি প্রধান জলবিভাজিকা প্রতিফলিত হল, এই পরিকল্পনাতে। উন্নয়নের নেহরু-মহলানবীশ স্ট্র্যাটেজি বা ছক বলে যা পরিচিত তা নির্দিষ্ট রূপ পায় দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে। ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গীর ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়েছিল তৃতীয় পরিকল্পনায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার তাত্ত্বিক মডেল বা রূপাদর্শ বিবৃত ছিল অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ কর্তৃক রচিত পরিকল্পনা কাঠামাতে। পরবর্তী কয়েক দশকে উন্নয়ন সংক্রান্ত চিন্তাভাবনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে এই মডেল বা রূপাদর্শ।

নেহরু-মহলানবীশ ছকের অন্যতম প্রধান দিক ছিল ভারি ও বুনিয়াদি শিল্পভিত্তিক দ্রুত উন্নয়ন। লক্ষ্য ছিল ইস্পাত, রসায়ন, যন্ত্রপাতি নির্মাণ, ডিজেল ইঞ্জিন, তেল শোধন, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ইত্যাদি শিল্প গড়ে তুলে ভারতীয় অর্থনীতির, বিশেষত শিল্পের, ভিত্তিকে মজবুত করে উৎপাদন ক্ষমতার প্রসার ঘটানো। জাপান হচ্ছে বিলম্বিত কিন্তু সফল শিল্পায়নের বহু আলোচিত দৃষ্টান্ত। সে দেশে অনুকরণ করা হয়েছিল textile first অর্থাৎ প্রথমে বস্ত্র শিল্প ও পরে মূল ও বুনিয়াদি শিল্প নির্মাণের নীতি। ভারতে নেওয়া হল তার থেকে ভিন্ন নীতি — মুখ্যত প্রথমে মূলধনী-সামগ্রী শিল্প নির্মাণের নীতি। ঔপনিবেশিক আমলে এসব শিল্প হয়নি। অনেক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ভারতের অর্থনীতি ছিল বিদেশ থেকে আমদানি অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির ওপর নির্ভরশীল। নেহরু - মহলানবীশ ছকের অন্তর্নিহিত লক্ষ্য ছিল এই নির্ভরশীলতা কাটিয়ে ওঠা। অবশ্য এই নীতির অনুসরণ সম্ভবপর হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সাহায্যদানের ফলে। অবশ্য দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময়ে এই সাহায্যের সবে শুরু। তবে মাঝে মাঝে প্রশ্নই উঠেছে শিল্পায়নের পারস্পরিক সংযোগ অর্থাৎ backward ও forward linkages বা পশ্চাৎমুখী ও সম্মুখমুখী সংযোগের বিষয়টিকে কি উপযুক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল?

নেহেরু - মহলানবীশ ছকের আর একটি প্রধান দিক ছিল অন্তর্মুখীনতা অর্থাৎ বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর কম নির্ভরশীলতা। এই নিয়ে সমালোচনা হয়েছে অনেক। কিন্তু গত দুই দশক আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বহুবিধ পরিবর্তনের ফলে এখন অন্তর্মুখী শিল্পনীতিকে ভারতের পক্ষে যতই ভ্রান্ত মনে করা হোক না কেন, পঞ্চাশের দশকে বাস্তব অবস্থা অন্যরকম ছিল এবং সেই প্রেক্ষিতে এই নীতিও যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত ছিল।

আপেক্ষিক অর্থে স্বাধীন, স্বনির্ভর অর্থনৈতিক উন্নয়নের এই নীতিতে মূল ও ভারী শিল্পের জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতি ছিল। পশ্চিম ইউরোপেরও শিল্পায়নে রাষ্ট্রে সক্রিয় ও বৃহৎ ভূমিকা ছিল। ভারতে অবশ্য রাষ্ট্র তার থেকেও বেশি সক্রিয় ও বৃহৎ ভূমিকা নেয়। এই জাতীয় শিল্পের নির্মাণ সময়সাপেক্ষ, বিপুল বিনিয়োগনির্ভর। এসব শিল্পে লাভও কম। ফলে সাধারণভাবে ভারতীয় পুঁজিপতিরা মৌল ক্ষেত্রে বিনিয়োগে উৎসাহী ছিল না, তাদের সামর্থ্যও ছিল না। এই অবস্থায় দ্রুত শিল্পায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিখর দেশগুলিকে

রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নিয়ে আসার নীতি গ্রহণ করা হয়। তৎকালীন বৃহত্তম বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ও জীবনবীমার জাতীয়করণের পিছনেও অনুরূপ বিবেচনা কাজ করেছে। ১৯৪৮-এর শিল্পনীতিতেই মৌল ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগের কথা ছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময়ে তাতে আরও জোর দেওয়া হল।

রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র প্রসারের কোনো কোনো দিক নিয়ে ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণীর কিছু কিছু অংশের মধ্যে গুঞ্জন ও অসন্তোষ স্বতন্ত্র পার্টির রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে সরাসরি বিরোধিতা থাকলেও মোটের ওপর ঐ শ্রেণীর তাতে সমর্থনই ছিল। বস্তুতপক্ষে যুদ্ধের সময়ে বৃহৎ ভারতীয় পুঁজিপতিরা এক সঙ্গে মিলে যে বোম্বে প্ল্যান বা টাটা-বিড়লা প্ল্যান তৈরি করেছিল, তাতেও অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে রাষ্ট্রের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছিল বিশেষ স্থান। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ও পরিকল্পিত উন্নয়নের প্রথম দশকগুলিতে রাষ্ট্রের জন্য যে বৃহৎ ও সক্রিয় ভূমিকা স্থির করা হয়েছিল, তার সঙ্গে ভারতীয় ধনিক শ্রেণীর সাধারণভাবে কোনো বিরোধ ছিল না। বরং সরকারি নীতি নানাভাবে পুঁজিবাদের বিকাশের পক্ষে সহায়ক ছিল।

বৃহদায়তন ভোগ্যপণ্যের শিল্পগুলিকে পুরোপুরি রেখে দেওয়া হয়েছিল বেসরকারি মালিকানায়। আন্তর্জাতিক পুঁজির সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না কারও। অতিমাত্রায় বিদেশি প্রতিযোগিতার ঝাপটার থেকে ভারতীয় শিল্পকে আড়ালে রাখার উদ্দেশ্যে উচ্চহারে শুল্ক বসিয়ে এবং আমদানির ওপর পরিমাণগত বিধি-নিষেধ অরোপ করে দেশের ভেতরে ভোগ্যপণ্যের শিল্পগুলিকে উৎসাহ দেওয়ার নীতি অনুসরণ করা হল।

আমদানি-পরিবর্ততার নীতি

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা দরকার। আমাদের শিল্প ও বহির্বাণিজ্যের নীতিতে বিদেশি মূলধনী সামগ্রী ও ভোগ্যপণ্যের আমদানির বদলে দেশীয় শিল্পবিকাশের জন্য যে নীতি গ্রহণ করা হল তা হল আমদানি-পরিবর্তনের নীতি। ঐ সময়েই ঐ নীতি বনাম রপ্তানি-প্রসূত নীতির প্রশ্নটি উঠেছিল। পরবর্তীকালে এটি একটি বৃহৎ ইস্যু হয়ে দাঁড়ায়। রাষ্ট্রায়ত্ত মৌলিক শিল্পগুলিতে আমদানি-পরিবর্ততা কোনো কোনো ক্ষেত্রে অদক্ষতার কারণ হয়ে ওঠে। বেসরকারি পুঁজি ঐ নীতিকে ব্যবহার করে আমদানির বিকল্প হিসেবে বিলাস সামগ্রীর উৎপাদনে। তবে সে সময়ে তো বটেই, পরবর্তীকালেও ভারতের মত দেশে যেখানে জাতীয় আয়ে রপ্তানির অনুপাত খুবই কম — সাধারণত ৭ বা ৮ শতাংশ ছিল, সেখানে আমদানি পরিবর্ততার নীতি যুক্তিযুক্তি ছিল বলেই মনে হয়।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে পরিকল্পনার প্রসঙ্গেও অনেক সমালোচনা উঠেছে। রাষ্ট্রর বৃহৎ ভূমিকা, নেহরুর আমলে 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচ'-এর সমাজ অর্থনীতি এবং সংবিধানের মুখবন্ধে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রকে সমাজতান্ত্রিক হিসেবে অভিহিত করা, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ইত্যাদির কথা তুলে ভারত সরকারের অর্থনৈতিক নীতিকে সমাজতান্ত্রিক বলে আক্রমণ করা হয়েছে বারেবারে। একথাও অস্বীকার করা যায় না যে, স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রথম তিন বা সাড়ে-তিন দশকে সরাসরি বা পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্র যে পরিমাণ অর্থনৈতিক ক্ষমতা জমা করেছিল, তার নজির ভারতের ইতিহাসে ছিল না। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে, ভারত সরকারের অর্থনৈতিক নীতি ছিল মূলত রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায়, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে ধনতান্ত্রিক বিকাশের নীতি। ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সঙ্গে সোভিয়েত পরিকল্পনার কিছু সাদৃশ্য থাকলেও তা কখনোই হুকুমভিত্তিক পরিকল্পনা ছিল না কিন্তু কোনো সময়েই তাকে বাজারের বিকল্প হিসাবে ভাবা হয়নি। এমনকি নেহরু - মহলানবীশ ছকেও নয়। বাজার প্রক্রিয়ার ওপর বিভিন্ন সময়ে নানারকমের নিয়ন্ত্রণ আরোপ করলেও সব পর্যায়েই বাজারের থেকেছে গুরুত্বপূর্ণ স্থান।

কৃষি ও ভূমিসংস্কার

দ্বিতীয় পরিকল্পনা সম্পর্কে আরো একটি কথা। হামেশাই বলা হয়, ঐ পরিকল্পনার গুরুতর দুর্বলতা ছিল কোনো কৃষিনীতির অভাব। একথা ঠিক যে, সেই ১৯৪৮ সালেই একটি শিল্পনীতি বিবৃত করা হলেও কৃষিনীতি হিসাবে কোনো নীতিই দ্বিতীয় বা তৃতীয় পরিকল্পনার সময়ে ঘোষণা করা হয়নি। তার মানে এই নয় যে, কৃষি সম্পর্কে সরকারের কোনো নীতি ছিল না। কৃষিক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধনের জন্যও রাষ্ট্রের একটি সক্রিয় ভূমিকা ছিল। সে ভূমিকার নেতিবাচক ও ইতিবাচক — এই দুই দিকই ছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ভূমি সংস্কারের একটি বেশ বিস্তারিত কর্মসূচী ছিল। তার একটি অংশে ছিল মধ্যস্বত্ব ব্যবস্থার অবসান, প্রজাদের নানা স্তরের মধ্যে ওপরের স্তরের প্রজাদের জমিতে স্বত্বের নিরাপত্তাদান ও খাজনাহ্রাস। অন্য অংশে ছিল পরিবার পিছু জমির মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ, সীমার অতিরিক্ত জমি অধিগ্রহণ এবং গরিব ও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে ঐ জমি বণ্টন। সমবায়ের একটি প্রেক্ষিতও ঐ কর্মসূচীতে ছিল। ঐ কর্মসূচীর রূপায়ণে অগ্রগতি বিচার করে তৃতীয় পরিকল্পনাতে ভূমি সংস্কারের কাজ চালিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়। মোটের উপর যা দাঁড়ায় তা হল ঐ কর্মসূচীর প্রথম অংশটি রূপায়িত করে সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক শোষণের উৎকট দিকগুলিকে খর্ব করে কৃষিতে ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথকে সুগম করা। পুরনো ধাঁচের উচ্চবর্ণের শহরবাসী সামন্ততান্ত্রিক খাজনাভোগী ভূস্বামীদের কৃষিতে পুঁজিতে বিনিয়োগকারী নিজস্ব তদারকিতে ক্ষেতমজুর লাগিয়ে কৃষিকাজে আগ্রহী পুঁজিবাদী ভূস্বামীতে এবং কৃষকদের একটি ক্ষুদ্র, উদ্যমশীল, প্রায়শই মধ্যবর্ণ, বিত্তবান অংশকে ধনী চাষীতে রূপান্তরিত করার নীতি অনুসরণ করা হয়। তাতে শিল্পজাত সামগ্রীর অভ্যন্তরীণ বাজারের কিছুটা প্রসার ঘটে। কিন্তু ঘোষিত কর্মসূচীর অন্য অংশটি বাস্তবায়িত করে জমিতে মালিকানা বন্দোবস্তের কোনো মূলগত রূপান্তর হয়নি। শিল্পায়নকে ত্বরান্বিত ও উদ্দীপ্ত করতে পারে — অভ্যন্তরীণ বাজারের সে রকম প্রসারই ঘটেনি। তবে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করে প্রথম পরিকল্পনার সময় থেকেই বহুমুখী নদী প্রকল্প নির্মাণে সরকারের ছিল একটি সক্রিয় ভূমিকা।

ঘোষণা অনুসারে ভূমি সংস্কার না হওয়ার কারণ হিসাবে অনেক সময়েই সরকারি নেতৃত্বের রাজনৈতিক ইচ্ছার অভাব ও প্রশাসনিক দুর্বলতার কথা বলা হয়। তবে এই ব্যাখ্যার মধ্যে কিছুটা যথার্থতা থাকলেও তা নেহাতই সরল। কারণ প্রচলিত সামাজিক-অর্থনৈতিক বন্দোবস্ত এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের কাঠামোতে রাজনৈতিক নেতৃত্ব যা চাইতেন তাই-ই করতে পারতেন — এমন ধরে নেওয়ার কোনো যুক্তি আছে বলে মনে হয় না। আমূল ভূমি সংস্কার সাধনে ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে কাজ করেছে ভূমি সংস্কারে দায়বদ্ধ সামাজিক — রাজনৈতিক হাতিয়ার, বিশেষত দরিদ্র কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের সংগঠন এবং সচেতন লাগাতার সঙ্ঘবদ্ধ হস্তক্ষেপের অভাব। বামপন্থী দলগুলিও কি এই শেষোক্ত কাজে তেমন তৎপরতা দেখাতে পেরেছিল?

তবে নানা সীমাবদ্ধতা ও পরিকল্পনার রূপায়ণে বহু ক্ষেত্রে অসাফল্য সত্ত্বেও মোটের ওপর পরিকল্পিত উন্নয়ন প্রয়াসের প্রথম পনেরো বছরে, বিশেষত দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনার সময়ে অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটে। ঔপনিবেশিক আমলে যে প্রায়-নিশ্চলতা ছিল তা কেটে গিয়ে গতি সঞ্চারিত হয়। ১৯৫১-৬৬-র পুরো পনেরো বছরে জাতীয় আয় বেড়ে ছিল ৬২.১ শতাংশ অর্থাৎ বছরে ৩.৩ শতাংশ। পরে অনেক বছর পর্যন্ত সাড়ে তিন শতাংশই — অধ্যাপক রাজকৃষ্ণর তথাকথিত হিন্দু বৃদ্ধির হার ছিল বার্ষিক বৃদ্ধির

প্রবণতা। জনসংখ্যা বৃদ্ধির উঁচু হারের জন্য মাথা পিছু আয় বেড়েছিল অবশ্য অনেক কম হারে — মাত্র ১৯ শতাংশ।

অর্থনীতির কাঠামোতেও লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন আসে। চলতি দামের হিসাবে গ্রস অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে (জি.ডি.পি) কৃষির অংশ পরিকল্পনা শুরুর প্রথম বছরে (১৯৫১-৫২) ছিল অর্ধেকের বেশি বা ৫১.২ শতাংশ, তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে (১৯৬৫-৬৬) এটা কমে গিয়ে হয় ৪১.৩ শতাংশ। জি.ডি.পি-তে রেজিস্ট্রি করা ও রেজিস্ট্রি করা নয় — এই দুই মিলে শিল্পের অংশ প্রথমোক্ত বছরে ছিল ১২.১ শতাংশ, আরে শেষোক্ত বছরে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১৫.৫ শতাংশ। পরিকল্পনার প্রথম বছরে পরিষেবা ক্ষেত্রের (অর্থাৎ ব্যবসা-বাণিজ্য, হোটেল, পরিবহন, যোগাযোগ, ব্যাঙ্কিং ও বীমা) অংশ ছিল ২৯.৩ শতাংশ, আর তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ৩৪ শতাংশ।

বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, ঐ পনেরো বছরে শিল্প কাঠামোতে আসে বৈচিত্র্য, নতুনত্ব ও জটিলতা। আর একটি নতুন মাত্রা আসে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের প্রসার ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে। ওঠাপড়া সত্ত্বেও অর্থনীতির বৃহত্তম ক্ষেত্র কৃষির উপার্জনও বৃদ্ধি পায়।

কিন্তু পরিবর্তনের এই ধারার মধ্যেই ছিল গুরুতর সব দুর্বলতা ও অসঙ্গতি। সে সবের মূলে ছিল শ্রেণী ও গোষ্ঠীগত বিন্যাস, সে বিন্যাসে সম্পত্তি ও বিত্তের মালিকদের প্রভাব।

এইসব অসঙ্গতির একটি দিক ছিল সরকারের শ্রমনীতি ও শ্রম আইন। ঔপনিবেশিক আমলে শ্রমিকের যে প্রায় কোনো অধিকারই ছিল না — সেকথা ওপরে বলা হয়েছে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রথম কয়েক বছরেই সরকারি শ্রম নীতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। সংক্ষেপে, অন্তত কিছু ক্ষেত্রে শ্রমিকের জন্য নানাবিধ আইনি অধিকার ও সুযোগসুবিধার স্বীকৃতি ও প্রসার ঘটে।

সে সবের পিছনে নিঃসন্দেহে একটি প্রধান কারণ ছিল বহু বছরব্যাপী শ্রমিক সংগ্রামের চাপ। তবে এটিকে অতিরঞ্জিত করে দেখাটা বোধহয় ঠিক হবে না। পুঁজিবাদী শোষণ ও জুলুম যেন মাত্রাতিরিক্ত না হয়ে ওঠে — সেটাও সরকারের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার বিষয় ছিল। সরকারি শ্রমনীতির মূল উদ্দেশ্যই ছিল পুঁজির স্বার্থে শ্রমিককে রাখা।

এই উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আইনি বন্দোবস্তের অন্যতম প্রধান ঝোঁক ছিল দ্বি-পাক্ষিক যৌথ দরকষাকষির পরিবর্তে বাধ্যতামূলক সালিশী সরকারি হস্তক্ষেপের ওপর। শুধু তাই নয়। শ্রমিক ও শ্রমজীবী বাহিনীর একটি অতি বৃহৎ অংশই (যেমন অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক, খতবন্দি, কৃষি ও অন্যান্য শ্রমিক, শিশু শ্রমিক ইত্যাদি) রয়ে গেল আইন ব্যবস্থার সীমিত অধিকার ও সুয়োগসুবিধার গণ্ডির সম্পূর্ণ বাইরে।

এইসব নানারকমের অসঙ্গতিই নেহরু সরকারের আমলেই আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে নিয়ে আসছিল বহুমাত্রিক সমস্যা ও সংকট।

সেসবের সঙ্গে আবার যুক্ত হয়েছিল অর্থনীতি-বহির্ভূত এবং দেশের বাইরে থেকে আসা অপ্রত্যাশিত দুটি বড় ধাক্কা - ১৯৬২-র চীন - ভারত ও ১৯৬৫-র পাকিস্তানের সঙ্গে সামরিক সংঘর্ষ। এই দুটির ফল শুধু রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেই বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

হিসেবের খুঁটিনাটির মধ্যে প্রবেশ না করেও বলা যায়, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনার জাতীয় আয় বৃদ্ধি থেকে শুরু করে শিল্প ও কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, অসাম্য হ্রাস ইত্যাদি সংক্রান্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যই অপূর্ণ থেকে গেল। সেচ ও সার প্রকল্পে বিরাট বিনিয়োগ হল, কিন্তু কৃষি উৎপাদন প্রকৃতি দেবীর মর্জির ওপর নির্ভরশীল রয়ে গেল।

রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে মূল ও বুনিয়াদি শিল্প গড়ে ওঠার পাশাপাশি বেসরকারি মালিকানায় বিলাস ও আধা-বিলাস সামগ্রীর নতুন নতুন শিল্প স্থাপিত হল বা প্রতিষ্ঠিত বিলাস শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি পেল। যেসব মূল ও বুনিয়াদি শিল্প গড়ে উঠল, সংযোগের linkages উপযুক্ত পরিকল্পনার অভাব, ব্যবস্থাপনাগত ত্রুটি, অদক্ষতা ও আমলাতান্ত্রিকতা এবং অন্যান্য কারণ মিলিয়ে সেসবের বেশ কয়েকটিতেই অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতা দেখা দিতে শুরু করল। পরবর্তীকালে এটা একটা স্থায়ী ও গুরুতর সমস্যার রূপ নিল।

মৌলিক ভূমি সংস্কার না হওয়ার ফলে অভ্যন্তরীণ বাজার সীমাবদ্ধ থেকে গেল। ঐ সংস্কার না হওয়ার আর একটি ফল হল কৃষিতে ভূস্বামী ও বড় কৃষকের আধিপত্যের প্রতিষ্ঠা।

বিত্তবান শ্রেণী ও গোষ্ঠীগুলির শিল্পপতি, অর্থের কারবারি, ব্যবসায়ী, ঠিকাদার, জমির বড় মালিক ও ধনী কৃষক, সরকারি আমলা দেশি ও বিদেশি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা প্রমুখের বৈভবের ঘটল বিপুল বৃদ্ধি।

অর্থনীতির নানা ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সক্রিয় হস্তক্ষেপ এবং পরিকল্পিত উন্নয়নের নীতি অনুসরণ করা হলেও অর্থনৈতিক নীতি কোনো সময়েই বাজার শক্তির market forces ক্রিয়াকলাপের প্রতি প্রতিকূল ছিল না। ফলে বিত্তবানদের চাহিদা পূরণের তাগিদে জাঁক দেখানো ভোগ conspicuous consumption বেড়ে উঠল, উৎপাদন বাড়তে লাগল রেফ্রিজারেটর, এয়ারকন্ডিশনার, গাড়ি ইত্যাদির, গড়ে উঠতে লাগল বিলাস প্রাসাদ বা পাঁচতারা হোটেল, চালু হল শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত রেল ভ্রমণ। কিন্তু দারিদ্র্য, খাদ্যাভাব ও অপুষ্টি, আশ্রয়, কর্মসংস্থান, পানীয় জলের সরবরাহ, প্রাথমিক শিক্ষা, চিকিৎসার সুযোগ ইত্যাদির মত জনজীবনের জরুরি সমস্যাগুলির উপশমে কোনো অগ্রগতি তো ঘটলই না, বরং বহু ক্ষেত্রে সমস্যা তীব্র থেকে তীব্রতর হল। আর সমাজ-অর্থনীতিতে যে বিভাজন fragmentation ও enclaved growth ছিল ঔপনিবেশিক অর্থনীতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তা কিন্তু রয়ে গেল — তবে নিঃসন্দেহেই ভিন্নভাবে।

অর্থনৈতিক দুর্যোগ ও পরিকল্পনার সংকট

বস্তুতপক্ষে তৃতীয় পরিকল্পনার থেকেই শুরু হয় উন্নয়ন-নীতির রূপায়ণে শ্লথগতি। ১৯৬৫-৬৬ ও ১৯৬৬-৬৭ পর পর দু'বছরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন অনেক নেমে যাওয়ার ফলে মুদ্রাস্ফীতির হার বাড়ল এবং বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য ও শিল্পের জন্য কৃষিজ কাঁচামালের বিপুল আমদানির ফলে আন্তর্জাতিক লেনদেনেও চাপ বাড়ল। দেশের কোনো কোনো অঞ্চলে আধা - দুর্ভিক্ষ বা এমনকি পুরো দুর্ভিক্ষের মত অবস্থা দেখা দিল এবং এই অবস্থা সামাল দেওয়ার জন্য আমেরিকান পাবলিক ল ৪৮০ অনুসারে খাদ্যশস্যর আমদানি শুরু হল। ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রিত্বের প্রথম বছরেই ১৯৬৬ সালের জুনে টাকার অবমূল্যায়ন করা হল। এর পিছনে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (আই. এম. এফ.) ও বিশ্ব ব্যাঙ্কের চাপও ছিল। ঐ চাপেই সরকারের পরিকল্পনামন্ত্রী প্রাক্তন প্রজাসমাজতন্ত্রী নেতা অশোক মেহতা ঘোষণা করলেন ভারতের 'গর্ভ'কে উন্মুক্ত করে দেওয়ার নীতি। আবার, ভেতর থেকে নানা স্থিতস্বার্থের চাপও এসব পরিবর্তনের পিছনে কাজ করছিল। কিন্তু এসবে কাজ হল না। উৎপাদন, বহির্বাণিজ্য, দ্রব্যমূল্য ইত্যাদি সমস্যার জটিলতা গুরুতর হয়ে উঠল।

অর্থনৈতিক দুর্যোগ ও অর্থসংস্থানের সমস্যা এতই নৈরাশ্যজনক মনে হল যে, ১৯৬৬ সাল থেকে পরিকল্পনাকে পর পর তিন বছরের জন্য 'ছুটি' দিয়ে বার্ষিক পরিকল্পনা করা হল। অর্থনীতির ওপর এর যেসব বিরূপ প্রভাব পড়ল সেসবের অন্তত তিনটির এখানে উল্লেখ করা দরকার। প্রথমত, পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান যে কাজ একটি দীর্ঘকালীন পরিপ্রেক্ষিতে

রচনা করা — সেটাই বন্ধ হয়ে গেল। দ্বিতীয়ত, পরিকল্পনা-ব্যয় এত বেশি মাত্রায় হ্রাস করা হল যে তার প্রতিক্রিয়া বহু বছর ধরে অনুভূত হয়েছিল। তৃতীয়ত, সরকারি খাতে বিনিয়োগ কমানো হল। কিন্তু তার ফলে বেসরকারি বিনিয়োগও কমে গেল। বেসরকারি ক্ষেত্রে উৎপন্ন সামগ্রীর বড় ক্রেতা সরকার। সেই সরকারের চাহিদা কমে যাওয়ায় বেসরকারি বিনিয়োগ ও উৎপাদন হ্রাস পেল।

আর একটি দিকের কথা এখানে বলা যায়। আমদানি-পরিবর্ততার যে নীতি অনুসরণ করা হচ্ছিল তার দরুন উৎপাদনের সম্ভাবনা পুরোপুরি শেষ না হয়ে গেলেও ষাটের দশকের মাঝামাঝি নাগাদ তার বেশ কয়েকটিতেই (যেমন, যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক বস্তু, কাগজ ইত্যাদি) সুযোগ খুবই কমে আসে এবং অনেক শিল্পের ক্ষেত্রেই অভ্যন্তরীণ বাজারের আয়তন উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে দেখা দিতে শুরু করে।

ওপরে উল্লিখিত বিভিন্ন কারণের সমাবেশে ঐ দশকের মাঝামাঝিতে অর্থনীতিতে, বিশেষত শিল্পের ক্ষেত্রে নেমে আসে 'রিসেশন' বা মন্দা।

তথাকথিত সবুজ বিপ্লব

ষাটের দশকের কৃষিক্ষেত্রে একটা বড় রকমের পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। ঐ দশকের গোড়ার দিকেই খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য নিয়ে চালু করা হয় যেসব কৃষকের জমি ও জল রয়েছে সেসব কৃষক অর্থাৎ সম্পদশালী কৃষকের ওপর নির্ভর করে ইনটেনসিভ অ্যাগ্রিকালচারাল এরিয়া ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম (আই.এ.এ.ডি.পি.)। এই প্রোগ্রামের মূল কথা ছিল বাছাই করা এলাকাতে কৃষির মূলধন নিবিড় বিকাশ। ভূমি সংস্কার এবং কৃষিতে সরকারি বিনিয়োগ — এই দুই এরই বিকল্প হিসাবে এই নীতি গ্রহণের পিছনে ছিল দেশের ভেতরে পুঁজিবাদী ভূস্বামী ও কৃষকদের চাপ আর দেশের বাইরে মার্কিন প্রশাসন ও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ।

এটাই ছিল তথাকথিত সবুজ বিপ্লবের পটভূমি। তথাকথিত বলা হচ্ছে এই কারণে যে, নতুন কর্মসূচী চালু করার আগে ১৯৫০-৫১ সাল থেকে ১৯৬৪-৬৫ পর্যন্ত সময়ে কৃষিতে আয় বেড়েছে বছরে গড়ে ২.৪ শতাংশ। আর ১৯৬৭-৬৮ থেকে ১৯৮১-৮২ সময়ে অর্থাৎ যেসময়ে সবুজ বিপ্লব ঘটে থাকার কথা সেসময়ে কৃষিতে আয় বেড়েছে বছরে গড়ে ২.২ শতাংশ হারে। স্পষ্টতই কোনো কোনো অঞ্চলে (যেমন, উত্তর-পশ্চিমে) এবং কোনো কোনো শস্যে (যেমন, গমে) ফলন নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেলেও সমগ্র দেশে শেষোক্ত কালপর্বে কৃষির মোট বৃদ্ধির হার বিশেষ কোনো পরিবর্তন আনতে পারেনি। তবে পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ — এই আড়াইটি রাজ্যে গম ও এমনকি ধানেরও মোট উৎপাদনের যে বৃদ্ধি ঘটল তাতে সকলের জন্য খাদ্যের সংস্থান না হলেও সত্তরের দশকের মাঝামাঝি থেকে খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে আমদানি-নির্ভরতার অবসান ঘটল।

তাছাড়া, সবুজ বিপ্লব কৃষিতে কয়েকটি নতুন বৈশিষ্ট্য নিয়ে এল। সাবেকি কৃষির দুটি প্রধান 'ইনপুট' বা উপাদান — বীজ ও গোবর সার — কৃষকের নিজস্ব খামার থেকেই পাওয়া যেত। কিন্তু সবুজ বিপ্লবের প্রযুক্তিতে যেসব 'ইনপুট'-এর ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে পড়ল (যেমন, উচ্চফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার, নিয়ন্ত্রিত জল সরবরাহের জন্য টিউবওয়েল-নির্ভর সেচ ও কীটনাশক ওষুধ) সেসব পাওয়ার একমাত্র উপায় হল বাজার থেকে কেনা। ফলে বাজারের ক্রিয়াকলাপের ঘটল লক্ষণীয় বৃদ্ধি। তাছাড়া ঋণের গুরুত্বও বেড়ে গেল। অন্যভাবে বলা যায়, কৃষিতে ঘটতে থাকল ব্যাপক commercialisation বা বাণিজ্যায়ন।

উল্লেখ্য যে, তাত্ত্বিক দিক থেকে সবুজ বিপ্লবের প্রযুক্তি-জোত বড় না ছোট সে বিষয়ে

নিরপেক্ষ। সামাজিক ও শ্রেণীগত বিচারে তা কিন্তু মোটেই নিরপেক্ষ নয়। এই প্রযুক্তি প্রয়োগ করা সম্ভবপর ছিল একমাত্র তাদের পক্ষেই যাদের ছিল বা রয়েছে প্রয়োজনীয় সম্পদ ও ঋণ পাওয়ার যোগ্যতা। ভূমি সংস্কারে ব্যর্থতা পুঁজিবাদী ভূস্বামী ও বড় কৃষকের যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছিল, সবুজ বিপ্লব সেই আধিপত্যকে আরও শক্তিশালী করে তুলল। কৃষিতে ধনতন্ত্রের প্রসার আগের থেকেই ঘটেছিল — সবুজ বিপ্লব সেই প্রসারকে দ্রুততর করে তলল।

কৃষি পণ্যের বাজারের বিস্তার ঘটল, আর তাতে বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেল ফসলের কারবারিদের ক্ষমতা। তার পরিচয় পাওয়া গেল ১৯৭৪-এ যখন কেন্দ্রীয় সরকার খাদ্যশস্যের পাইকারি বাণিজ্য জাতীয়করণের প্রয়াস নেয়। সে প্রয়াস ব্যর্থ হয় পাইকারি কারবারিদের প্রতিরোধের ফলে। আবার, সবুজ বিপ্লব যে বড়, ধনী কৃষকের আধিপত্যকে মজবুত করেছিল সেই ধনী কৃষকের চাপের ফলেই সরকারকে উত্তরোত্তর বাড়াতে হয়েছে ফসলের সংগ্রহ মূল্য কিংবা সার, সেচ, বিদ্যুৎ ইত্যাদির বাবদে ভর্তুকির পরিমাণ। সে সবই ফের নিয়ে আসছে গুরুতর সব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা।

সংক্ষেপে, পুঁজিবাদী উন্নয়নের গতিধারায় যে বিত্তবান শ্রেণী ও গোষ্ঠীগুলি গ্রামাঞ্চলের অবস্থাপন্ন কৃষক কিংবা অ-কৃষি শিল্প-বাণিজ্য-অর্থের জগতে শিল্পসমৃদ্ধ অন্যান্য বিত্তবান শ্রেণী ও গোষ্ঠী-স্ফীত ও সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনে বেশি বেশি করে প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠছিল, সেই শ্রেণী ও গোষ্ঠীগুলি ব্যাপকভিত্তিক, সবল পঁজিবাদী বিকাশের পক্ষে অন্তরায় হয়ে উঠছিল।

জনমনোরঞ্জক রাজনীতির পর্ব

১৯৬৬-৬৭ সালে যে অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক সংকটের কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে এবং যার সঙ্গে আবার যুক্ত হয়েছিল গুরুতর রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকট, বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাত, বিশেষত জনসাধারণের ব্যাপক অংশের মধ্যে অসন্তোষ ও প্রতিবাদ — সে সবের প্রতিফলন ঘটল চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে। একাধিক রাজ্যে কংগ্রেসের বিপর্যয় ঘটল, পশ্চিমবঙ্গসহ কয়েকটি রাজ্যে বামপন্থীসহ অ-কংগ্রেসি সরকার গঠিত হল এবং লোকসভাতেও কংগ্রেসের সদস্যসংখ্যা বিপুলভাবে হ্রাস পেল। সব মিলিয়ে দেশের রাজনীতিতে কংগ্রেসের একাধিপত্যের অবসান সূচিত হল।

এই পটভূমিতেই প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী নিলেন বেশ কিছু জনমনোরঞ্জক নজরকাড়া পদক্ষেপ — ১৪টি বৃহৎ বেসরকারি ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ, রাজন্যভাতার বিলোপসাধন, সাধারণ বীমার জাতীয়করণ, কয়লা শিল্পের জাতীয়করণের মত ব্যবস্থা। গরিব কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের তীব্র অসন্তোষ ও প্রবল প্রতিবাদের — যার একটা প্রকাশ ছিল দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে 'নক্সালপন্থী' বিদ্রোহ — পৃষ্ঠপটে ভূমিসংস্কার, বিশেষত সিলিং আইনের সংশোধন ও সুষ্ঠু প্রয়োগ ও ভূমি বণ্টনের ওপর নতুন করে বিশেষ জোর দেওয়া হল। গরিবি হঠাও -এর কর্মসূচী ঘোষণা করা হল। ১৯৭০-এ পাশ করা হয় মনোপলি অ্যান্ড রেসট্রিকটিভ প্র্যাকটিসেস অ্যাক্ট (সংক্ষেপে 'মরটন'), যার উদ্দেশ্য ছিল একচেটিয়া ব্যবসা ও প্রতিযোগিতার সংকোচনকে শাসনে আনা। ১৯৭৩-এ এল ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন অ্যাক্ট (সংক্ষেপে 'ফেরা'), যার একটা উদ্দেশ্য ছিল বিদেশি মালিকানার গুরুত্ব কমানো।

এইসব ব্যবস্থা নেওয়ার পিছনে একটা বড় কারণ ছিল রাজনৈতিক সংকটের পৃষ্ঠপটে শাসক দলের নেতৃত্বের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন অংশের পক্ষ থেকে দলের হারানো রাজনৈতিক - সামাজিক সমর্থন ফিরে পাওয়ার তাগিদ। আর একটি কারণ ছিল অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকট থেকে বেরিয়ে আসার চাপ।

একটা ধারণা চাল আছে যে, নেহরুপন্থার অনুসরণে ইন্দিরা গান্ধী সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গির থেকে এইসব ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। কিন্তু কোনো বিশেষ মতাদর্শগত ঝোঁক নয়। রাজনৈতিক-সামাজিক বিবেচনার পাশাপাশি ধনতান্ত্রিক বিকাশের 'লজিক' বা যুক্তিই এইসব অনেক ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি করে তুলেছিল। এর অন্যতম প্রধান দৃষ্টান্ত হল বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির জাতীয়করণ। সবুজ বিপ্লবের লজিকেই প্রয়োজন ছিল গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার প্রসার। বস্তুতপক্ষে ব্যাঙ্কের থেকে বিত্তবান চাষী সহজে নিচু সুদে বিপুল ঋণ না পেলে ঐ বিপ্লব আদৌ ঘটতে পারত কি না তা সংশয়ের বিষয়। কয়লা শিল্পের জাতীয়করণ এরকম আর একটি দৃষ্টান্ত। বেসরকারি মালিকানায় এই শিল্পে চলছিল যথেচ্ছ লুঠ, দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থ হচ্ছিল সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। ধনতান্ত্রিক শিল্পায়নকে শক্ত ভিত্তি দেওয়ার জন্যই কয়লা শিল্পকে নিয়ে আসা হল রাষ্ট্রীয় মালিকানায়।

ভূমিসংস্কারের ওপর গুরুত্ব আরোপ কিংবা খাদ্যশস্যের পাইকারি বাণিজ্যের জাতীয়করণের মত সিদ্ধান্তগুলির কোনোটিই ধনিক শ্রেণীর সামগ্রিক ও দীর্ঘকালীন স্বার্থের পরিপন্থী ছিল না। কিন্তু পূর্ববর্তী দু-আড়াই দশকের উন্নয়নের ধারা শ্রেণী ও গোষ্ঠীগুলির বিন্যাসে যে সব পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল তাতে এসব সিদ্ধান্ত কার্যকর করা সম্ভবপর ছিল না। 'মরটন' ও 'ফেরা'-তে অনেক ফাঁকফোকর ছিল। সে সবের সুযোগে একচেটিয়া পুঁজির প্রতিপত্তি বেড়ে চলল, বিদেশি মূলধনের গুরুত্ব অনেক ক্ষেত্রে রয়ে গেল। বস্তুতপক্ষে পাল্লাটা ইতিমধ্যেই ভীষণভাবে ঘুরে গিয়েছিল বিত্তবান শ্রেণী ও গোষ্ঠীগুলির সংকীর্ণ স্বার্থের অনুকূলে। ইন্দিরা গান্ধীর ঘনিষ্ঠ পরামর্শদাতার মধ্যে সদিচ্ছাসম্পন্ন, এমনকী বামপন্থী মনোভাবাপন্ন ব্যক্তির অভাব ছিল না। কিন্তু ঐসব সিদ্ধান্তকে রূপায়িত করার মত কোনো সামাজিক 'এজেন্সি' অর্থাৎ সামাজিক-রাজনৈতিক সংগঠন ও গণ-সমাবেশ ছিল না।

১৯৬৯-এর শেষ দিক থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত সময়ে ঘোষিত ও গৃহীত কিছু কিছু ব্যবস্থা এবং প্রধানমন্ত্রীর সমাজতান্ত্রিক বুলি দেশের মানুষের মনে নতুন আশার সঞ্চার করেছিল। কিন্তু সেই আশা বাস্তবায়িত না হওয়ার ফলে দেখা দিল ব্যাপক অসন্তোষ, বিক্ষোভ ও ধর্মঘট। এদিকে, আবার শাসক এবং বিত্তবান শ্রেণী ও গোষ্ঠীগুলির নিজেদের মধ্যে সংকীর্ণ স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও সংঘাত তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠল। এই সবেরই পরিণামে এল জরুরি অবস্থা। জরুরি অবস্থা জারি করার পিছনে একটা কারণ ছিল নেত্রীর ব্যক্তিগত ক্ষমতা রক্ষা করা। আর একটা কারণ ছিল গণপ্রতিবাদ ও অসন্তোষকে স্বৈরাচারী পদ্ধতিতে দমন করার তাগিদ — এটা ছিল দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার স্বৈরাচার। আবার, বিত্তবানদের বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্বকে কঠিন হাতে মোকাবিলা করার প্রয়োজনও ছিল। ১৯৭৭-এ কংগ্রেসে ঘটল নির্বাচনী বিপর্যয়। কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রথম অকংগ্রেসি সরকার।

সত্তরের দশকের শেষ হয় রাজনীতি ও অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গুরুতর অনিশ্চয়তা নিয়ে। জনতা সরকার এসে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিল। কিন্তু সে সরকারের অকালমৃত্যু ঘটল। তবে সে সরকার টিকে থাকলেও অবস্থার কোনো উন্নতি হত না। বস্তুতপক্ষে ঐ দশকের শেষে পরিকল্পনা ও উন্নয়নের সংকট যে আকার নিয়েছিল তেমন আর কখনো দেখা যায়নি। সাধারণ মানুষের যা কাম্য — খাদ্যশস্যের সহজ প্রাপ্তি, দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা, বেকার ও আধা-বেকারদের জন্য কাজ — এসব কিছুই আরও অনিশ্চিত হয়ে পড়ল। অন্যদিকে দুর্নীতি ও কালো টাকার প্রসার ঘটছিল অব্যাহতভাবে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের উৎপাদনে এল শ্লথ-গতি, কিন্তু বিত্তবানদের ব্যবহার্য বিলাস ও আধা-বিলাস সামগ্রীর উৎপাদন বাড়ল অনেক বেশি হারে, প্রাসাদোপম অট্টালিকা বা পাঁচতারা হোটেল নির্মিত হতে থাকল দ্রুত।

আশির দশকের উদারীকরণ

স্বল্পকালীন জনতা সরকারের পর ১৯৮০-র গোড়ায় ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় ফিরে এলেন এই বিশ্বাস নিয়ে যে অর্থনৈতিক নীতিতে বড় রকমের পরিবর্তন নিয়ে আসা প্রয়োজন। সময়টা ছিল এমন যখন একটি নতুন বিশ্ব অর্থনৈতিক বিন্যাস গড়ে উঠছে, আর ঐ বিন্যাসে আন্তর্জাতিক পুঁজি ও তার প্রধান বাহন মাল্টিন্যাশনাল বা ট্রান্সন্যাশনাল সংস্থার গুরুত্ব বাড়ছিল। ঐ পটভূমিতেই একটা দক্ষিণপন্থী চাপ ক্রমশ বাড়তে লাগল। অতীতে অনুসৃত সরকারি নীতিতে স্ফীত হয়েছিল শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী মহল, যে মহলের সঙ্গে আবার অনেক ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল আন্তর্জাতিক পুঁজির। ঐ মহল, তারই মুখপাত্র বেশ কিছু রাজনৈতিক নেতা এবং কয়েকজন অর্থনীতিবিদ সরকারের এক্তিয়ার ও অর্থনৈতিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ কমানোর জন্য চাপ দিতে শুরু করলেন। তারা আরও বললেন যে, উৎপাদন ও অর্থনৈতিক কাজকর্ম চলক বাজারের 'লজিক'-এ, চাহিদা ও সরবরাহের টানাপোড়েনের জোরে। এর মানে হল যে, কি উৎপাদন হবে বা হবে না, কতটা উৎপাদন হবে, কি প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে — এ সবই স্থির হবে যাদের হাতে বাজার ব্যবস্থার সম্পদের ওপর মালিকানা রয়েছে তাদের ক্রয়ক্ষমতা অথবা অমর্ত্য সেনের ভাষায় কেনার স্বত্বাধিকার অনুসারে। আই.এম.এফ. ও বিশ্ব ব্যাঙ্কের বক্তব্যও ছিল অনুরূপ।

বাইরের থেকে তাদের চাপ এবং ভেতর থেকে বিত্তবান শ্রেণী ও গোষ্ঠীগুলির, বিশেষত শিল্প-অর্থ-বাণিজ্য জগতের শিরোমণিদের চাপের একটা convergence বা মিল ঘটে গেল। শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের অনেকেরই আবার ছিল আন্তর্জাতিক পুঁজির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। মূল কথা ছিল দুটি। এক, আমদানিকে সঙ্কুচিত করে রাখার জন্য যে সব নিয়ন্ত্রণ চালু ছিল সে সবের বিলোপ ঘটাতে হবে। দুই, অর্থনৈতিক কাজকর্ম ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার স্থির করার ব্যাপারে রাষ্ট্রের যে সক্রিয় ভূমিকা ছিল তাকে গুটিয়ে ফেলতে হবে। প্রধান বক্তব্য ছিল যে, প্রশাসনিক বিধিনিষেধ থেকে সরে আসতে হবে উদারীকরণের দিকে অর্থাৎ বাজার শক্তির ক্রিয়াকলাপ বাড়ানোর দিকে।

এইসব চাপের ধাক্কায় অর্থনৈতিক পরিবর্তনের গতিমুখ ও অগ্রাধিকার সম্পর্কে ইতিপূর্বে ঘোষিত নীতি ও কর্মসূচী দ্রুত বদলে যেতে লাগল। ষষ্ঠ পরিকল্পনা (১৯৮০-৮১ — ১৯৮৪-৮৫) গ্রহণ করা হল ও পরিকল্পনার গুরুত্বকে কমানো হল, আমদানিকে সহজ থেকে সহজতর করা হল, একচেটিয়া ব্যবসার ওপর নিয়ন্ত্রণকে শিথিল থেকে শিথিলতর করা হল, বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রবেশকে সুগম করে দেওয়া হল। আশির দশকের গোড়ায় একটি নতুন শিল্পনীতি ঘোষণা করে বেসরকারি উৎপাদক ও বিনিয়োগকারীদের ভূমিকাকে অনেকখানি বাড়িয়ে দেওয়া হল। সত্তরের দশকের শেষ দিকেই দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর বা হংকং-এর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে ঐসব দেশের আয়তন, জনসংখ্যা, জাতীয় আয়ের মধ্যে রপ্তানির অনুপাত, অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ব্যাপক ভূমিকা ইত্যাদি বিবেচনার মধ্যে না এনেই ভারতে আমদানি-পরিবর্তনের নীতির বদলে রপ্তানি-প্রসূত বা রপ্তানি-উদ্ভূত (export-led) বৃদ্ধি নীতি চালু করার কথা শুরু হয়েছিল। এবারে সেটা প্রায় মন্ত্র হয়ে উঠল। সব মিলিয়ে, পরিপ্রেক্ষিতটাই পাল্টে গেল। সি. টি. কুরিয়েন দেখিয়েছেন, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার পরিবর্তে জোরটা সরে এল অর্থনীতির ম্যানেজমেন্ট বা ব্যবস্থাপনার ওপর।

পূর্ববর্তী তিন দশক ধরে যে সব আচরণ গড়ে উঠেছিল — যেমন, অর্থনীতির নানা ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অহেতুক নাক গলানো, পরিকল্পনার নামে বিভিন্ন কাজকর্মে রাষ্ট্র, সরকার নেতা ও তাদের অনুগামীদের হস্তক্ষেপ, পাঁচতারা হোটেল ব্যবসা ইত্যাদির মত ক্ষেত্রে সরকারি

মালিকানা, নানারকম অপ্রয়োজনীয় বিধিনিষেধের জটিল জাল, আমলাতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারিতা (এ-সবই জন্ম দিয়েছিল যুক্তিসঙ্গতভাবেই বহু নিন্দিত লাইসেন্স-পারমিট রাজের) ইত্যাদি সংশোধন ও এমনকী বর্জন নিঃসন্দেহেই জরুরি হয়ে উঠেছিল। কিন্তু জওহরলাল নেহরুর প্রধানমন্ত্রিত্বে প্রবর্তিত পরিকল্পিত উন্নয়ন, উন্নয়নে রাষ্ট্রের সক্রিয় ভূমিকা এবং অর্থনৈতিক বিকাশে অন্তত ঘোষণাতে একইসঙ্গে বৃদ্ধি ও সমতার (growth and equity) নীতি আশির দশকের শুরুতে নেহরু কন্যার ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের পর দ্রুত পাল্টে যেতে লাগল।

এ-সবের ফলাফল কি দাঁড়াল? ষষ্ঠ পরিকল্পনা শেষ হয় ১৯৮৫-র ৩১ মার্চ। ঐ পরিকল্পনাতে আগের পরিকল্পনাগুলির মতই অনেক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। তার সবই যে মিথ্যায় পর্যবসিত হয়েছিল এমন নয়। সাড়ে তিন দশকের উন্নয়ন পরিকল্পনাকে যদি একসঙ্গে ধরা হয় তবে দেখা যায় যে, ঐ ইতিহাস একই সঙ্গে সাফল্য ও অসাফল্যের ইতিহাস। ঐ সময়কালে মোট জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি আশানুরূপ হয়নি — প্রস্তাবিত ৫ শতাংশের জায়গায় মাত্র ৩.৫ শতাংশ। কিন্তু শিল্পকাঠামোতে ঘটে গিয়েছিল তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন। মনে রাখা ভাল যে, স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময়ে কারখানা-উৎপন্ন প্রায় সব সামগ্রীই আমদানি করতে হত। বহু সমালোচিত আমদানি-পরিবর্ততার নীতি অনুসরণের সবাদে অনেক শিল্পে হয়েছিল অভূতপূর্ব উন্নতি, প্রায় সম্পূর্ণ স্বনির্ভরতা। ঐ কাঠামোতে ঘটল বৈচিত্র্যায়ন, প্রযুক্তিগত উন্নতি। ছয়টি পরিকল্পনাতে ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম, রাসায়নিক সার, কলকবজা, মোটরগাড়ি, রেল-ইঞ্জিন, খনিজ তেল, কয়লা ইত্যাদি সামগ্রীর উৎপাদন বেড়েছিল ১৫ থেকে ২০ গুণ — কোনো কোনো ক্ষেত্রেও আরও বেশি। কিন্তু বিদ্যুতের ক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়লেও চাহিদা বেড়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি।

কৃষির ক্ষেত্রে সেচব্যবস্থার প্রসার হয়েছিল ব্যাপকভাবে। ষাটের দশকের মাঝামাঝিতে দেশ যেখানে বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানির ওপর নির্ভরশীল ছিল, সেখানে অনাহার ও অপুষ্টি থাকলেও সত্তরের দশকের মাঝামাঝি নাগাদ ঐ নির্ভরশীলতা কেটে গিয়ে সীমিত অর্থে স্বয়ম্ভর হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু এ সব হল একদিকের চিত্র। আবার অন্য চিত্রও ছিল। শিল্পের প্রায় কোনো শাখাতেই উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে পারেনি। ব্যতিক্রম ঘটেছে শুধমাত্র বিত্তশালীর ব্যবহার্য বিলাসসামগ্রীর উৎপাদনে। পরিচালন ব্যবস্থায় 'অটোনমি'র অভাব, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, শ্রমিক-কর্মচারীদের বিভিন্ন স্তরে দায়বদ্ধতার অনপস্থিতি ইত্যাদি নানা কারণে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাতে বেড়ে চলে অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতার বোঝা, জমে ওঠে লোকসানের বহর। অনেক বেসরকারি মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানেও দেখা দেয় প্রতিযোগিতাবিমুখ বৈশিষ্ট্য, অদক্ষতা, রুগ্‌ণতা।

এদিকে 'ট্র্যাডশনাল' বা চিরাচরিত কুটির, কারিগরি ও গৃহভিত্তিক শিল্পগুলির ক্ষেত্রেও ছড়িয়ে পড়েছিল পুঁজিবাদী সম্পর্ক। তার একটি প্রধান রূপ হয় putting out system, বিড়ি, পাঁপর, হস্তচালিত তাঁত, জরি, পোশাক তৈরি ইত্যাদির মত নানা শিল্পে দেখা গেল যন্ত্রের ব্যবহার নেই বা হলেও অতি সামান্য এবং উৎপাদন হয় মুখ্যত পরিবারের সদস্যদের সাহায্যে। কিন্তু উৎপাদনী কাজ পুরোপুরি এসে পড়ল বাজারে যারা কাঁচামাল ইত্যাদির যোগান দেয় এবং বিপণন করে তাদের খপ্পরে। জনসাধারণের ব্যবহার্য বহু সামগ্রী, যেমন জুতো, তালা, বৈদ্যুতিক পাখা, সেলাই মেশিন, প্রেসার কুকার ইত্যাদির উৎপাদন হয়ে পড়ল বিকেন্দ্রীকৃত। সস্তা শ্রমের সুবিধা নেওয়া ও কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য বড় নামকরা কোম্পানি উৎপাদন প্রক্রিয়াকে ভাগ করে আনুষঙ্গিক অংশ উৎপাদনের দায়িত্ব দিয়ে দিল দেশের বিভিন্ন অংশে ছড়ানো উৎপাদন

কেন্দ্রগুলিতে। বাটার জুতো তার অতি পরিচিত দৃষ্টান্ত। ক্ষুদ্র বা অতিক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা বহু ক্ষেত্রে হয়ে দাঁড়াতে থাকে দেশী ও বিদেশী একচেটিয়া ও বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের বেনামদার। এসব পদ্ধতি আগেও ছিল। কিন্তু শিল্পনীতিকে শিথিল করে দেওয়ার সুযোগ নিয়ে এই জাতীয় পদ্ধতি আরও ছড়িয়ে পড়ল।

একদিকে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, অন্যদিকে উৎকট দারিদ্র্য

অতীতে দেখা গিয়েছে, পরিবর্তনের ধারায় অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে দারিদ্র্য এবং কর্মহীনতাও। আশির দশকের মাঝামাঝিতে এই বৈশিষ্ট্য আরও প্রকট হয়ে ওঠে। অর্থনৈতিক উন্নতি যা হয়েছে তার ফল ভোগ করছে অতি ক্ষুদ্র একটা গোষ্ঠী, আর অসংখ্য মানুষ রয়েছে অন্ধকারে। সংখ্যাগত দিকটা দেখা দরকার। দারিদ্র্যসীমার সংজ্ঞা ও হিসেব নিয়ে অনেক তর্ক রয়েছে। তবে একটি নির্ভরযোগ্য বিশ্লেষণ অনুসারে দারিদ্র্যসীমার নিচের সংখ্যার অনুপাত ১৯৭০-৭১-এ ছিল ৫৬.২৫ শতাংশ, ১৯৮৭-৮৮-তে এটা কমে হয় ৪৫.৮৫ শতাংশ। কিন্তু প্রথমোক্ত বছরটিতে মোট দরিদ্রের সংখ্যা ছিল ৩০ কোটি, শেষোক্ত বছরে এটি বেড়ে হয় ৩৬ কোটি (উৎস ঃ বি.এস.মিনহাস ও অন্যান্য, 'ডিক্লাইনিং ইন্সিডেন্স অব পভার্টি ইন দ্য নাইনটিন এইটিজ — এভিডেন্স ভার্সাস আর্টিফ্যাক্টস, 'ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি', ভল্যুম ২৬, সংখ্যা ২৭-২৮, ১৯৯১)।

অবস্থাটা অন্যভাবেও বলা যায়। ৮ কি ১০ শতাংশ মানুষের — ভারতের মতো জনবহুল দেশে তার সংখ্যা ৭/৮ কোটির কম নয় — জন্য চোখ ধাঁধানো বিলাস-বৈভব, আর অগণিত মানুষের ক্ষেত্রে সীমাহীন দুর্দশা ও কর্মহীনতা। পাঁচতারা হোটেল, আর কাছেই নোংরা ঘিঞ্জি দরিদ্রতম বস্তি। রকমারি নজরকাড়া বস্ত্রসম্ভারের পাশাপাশি জনসাধারণের একান্ত বস্ত্রাভাব। ফুড কর্পোরেশনের গুদামে খাদ্যশস্যের বিপুল মজুত ও বিত্তবানদের তরফে খাদ্যের বিপুল অপচয়ের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ মানুষের অনাহার ও অপুষ্টি। এদিকে শ্রমিক ও শ্রমজীবীদের এক বৃহৎ অংশ অর্থাৎ সচরাচর যাদের অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক বলে গণ্য করা হয় তাদের কাজ এবং মজুরির কোনো নিরাপত্তাই ছিল না, তাদের জন্য বোনাস, পি.এফ. ইত্যাদি আইনের কোনো মানেই ছিল না।

রাজীব পর্ব

আশির দশকের প্রথমার্ধে ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রিত্বে অর্থনীতির পালা বদলের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল নেহরু-দৌহিত্র একুশ শতকে প্রবেশের জন্য অধীর তরুণ রাজীব গান্ধী ও তাঁর 'হুইজ-কিড' বন্ধুদের উৎসাহে সে প্রক্রিয়াকেই আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। নীতিটির নামকরণ হল নয়া অর্থনৈতিক নীতি। এই নীতির পিছনে ছিল কয়েকটি পরস্পরসংশ্লিষ্ট বিশ্বাস।

সে সবের একটি হল সত্তরের দশকের শেষাশেষি নাগাদ মার্কিন দেশে বাতিল হয়ে যাওয়া *'সাপ্লাই সাইড ইকনমিকস'* বা *যোগান-দিকের* অর্থনীতির তত্ত্ব। ইতিপূর্বে নেহরু-মহলানবীশ মডেল, সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের মডেল, সরাসরি সমাজতান্ত্রিক মডেল, গান্ধিবাদী সমাজতান্ত্রিক মডেল ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। এবারে সেসবের বদলে নাম না করেও এল রেগন-থ্যাচার মডেল।

এই তত্ত্বের মূল কথা : যদি কর জমানো হয়, তাহলে দেশে সঞ্চয় বাড়বে, বিনিয়োগ বাড়বে, উৎপাদন বাড়বে, কর্মসংস্থান বাড়বে, আর তাতে অর্থনীতির শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে।

আর একটি বিশ্বাস ছিল 'মার্কেট ফোর্সেস' বা বাজার শক্তি সম্পর্কে। সেটি হল রাষ্ট্রের

কাজকর্মের পরিধিকে গুটিয়ে আনতে হবে, বাজার শক্তির বা চাহিদা যোগানের খেলার সুযোগকে অবারিত করে দিতে হবে। তবেই উৎপাদন বাড়বে, প্রতিযোগিতা বাড়বে, উৎপাদনের দক্ষতা ও উৎকর্ষ বাড়বে।

তৃতীয় একটি বিশ্বাসও ছিল। তা হল অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্যমোচনের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। বরং বৃদ্ধি ঘটলে তার সুফল আজ হোক কাল হোক নিচের দিকে চুঁইয়ে পড়বেই।

এইসব বিশ্বাসের ভিত্তিতে যে নয়া অর্থনৈতিক নীতি চালু করা হল তার পিছনে প্রবল চাপ ছিল আই.এম.এফ. ও বিশ্ব ব্যাঙ্কের এবং মাল্টিন্যাশনাল / ট্রান্সন্যাশনাল পুঁজির। এদের মতে স্থান-কাল-ইতিহাস নির্বিশেষে সব দেশেরই সমৃদ্ধির উপায় হচ্ছে বহির্মুখী হওয়া। তাদের পক্ষে এই পরামর্শ দেওয়ায় অবশ্য বিস্ময়ের কিছু ছিল না। কারণ ভারতের মত দেশ এই নীতি গ্রহণ করলে বহুজাতিক পুঁজির জন্য খুলে যাবে পুঁজি লগ্নির লাভজনক ক্ষেত্র এবং আকর্ষণীয় বিশাল বাজার। কয়েকজন অনাবাসী ভারতীয় অর্থনীতিবিদও অনুরূপ পরামর্শ দিচ্ছিলেন। সরকারের ভেতরে, বিশেষত অর্থ মন্ত্রকের তরফ থেকে এই জাতীয় নীতির প্রতি সমর্থন কাজ করছিল। ভারতীয় শিল্প-অর্থ-বাণিজ্য মহলও অনেকদিন থেকেই বেশি বেশি করে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল তথাকথিত নেহরুপন্থী সমাজতন্ত্র থেকে সরে আসার জন্য। ঐ মহলের অনেকেরই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল বহুজাতিক পুঁজির সঙ্গে।

কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে কিছু বড় রকমের সাফল্য — যেমন, আশির দশকে বার্ষিক ৮ শতাংশ হারে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি সত্ত্বেও — দশকের শেষে ভারত হয়ে পড়ে উন্নয়নশীল দেশগুলি মধ্যে সব থেকে ঋণগ্রস্তদের অন্যতম। জাতীয় আয়ের লক্ষণীয় বৃদ্ধি ঘটলেও কর্মসংস্থানের কোনো প্রসার ঘটেনি। যা ঘটল তাকে বলা যায় jobless growth। জনজীবনের জরুরি সমস্যাগুলির কোনো সুরাহাই হয়নি। বস্তুতপক্ষে নানা দিক দিয়ে ভারতের অর্থনীতি নিমজ্জিত হয়ে পড়ে একটা গভীর সংকটে। উঁচু হারে মুদ্রাস্ফীতি, সরকারি কোষাগারে বিপুল ঘাটতি ইত্যাদি মিলিয়ে সংকট একটা অভূতপূর্ব মাত্রা নেয়। সে সবের সঙ্গে আবার যুক্ত হয় দুর্নীতি ও আর্থিক কেলেঙ্কারির অভিযোগ। কালো টাকার সমান্তরাল অর্থনীতির ঘটে বিপুল প্রসার। এরই সঙ্গে দেখা দেয় স্থায়ী ভোগ্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে consumer boom।

এই সংকটের প্রধান কারণ ছিল রাজীব গান্ধীর আমলে অনুসৃত নয়া অর্থনৈতিক নীতি। যেমন, আন্তর্জাতিক লেনদেনের চলতি হিসাবে বিরাট ঘাটতি ঘটেছিল অনেকাংশেই আমদানির ক্ষেত্রে সরকারি উদারনীতির জন্য। ঋণের মেলার মত লোক দেখানো কিছু কিছু পদক্ষেপ সমস্যাকে তীব্রতর করে তোলে।

কিন্তু এসবই ছিল বাইরের লক্ষণ। সংকটের শিকড় ছিল অনেক গভীরে। সেই শিকড় নিহিত ছিল স্বাধীনতা-পরবর্তী দশকগুলিতে, বিশেষত নিকট অতীতে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের গতিধারা এবং পূর্ববর্তী শাসক গোষ্ঠীগুলি কর্তৃক অনুসৃত নীতিগুলির ফলস্বরূপ সমাজ ও অর্থনীতিতে বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠীর যে বিন্যাস গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে। শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, ধনী, কৃষক, উঁচু আয়ের পেশাজীবী, উঁচু পদে আসীন আমলা ইত্যাদি বিভিন্ন বিত্তবান ও প্রতিপত্তিশালী শ্রেণী ও গোষ্ঠীর স্বার্থসংঘাত ও স্বার্থসাযুজ্যের টানাপোড়েনের মধ্যে একটা সংকটের বীজ বরাবরই ছিল। এই বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠীর বিত্ত ও প্রভাব বেড়েছে অনেকটাই সরকারি নীতির দৌলতে। আর তারা তাদের সংকীর্ণ স্বার্থে চেষ্টা করেছে রাষ্ট্রের নীতি ও কর্মসূচীকে প্রভাবিত করতে।

রাষ্ট্রের কাছে প্রত্যেকটি গোষ্ঠীর রকমারি দাবি। শিল্পপতির দাবি সস্তায় মজুর, কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, কম কর, সুরক্ষিত বাজার। বড় কৃষকের দাবি সার, বিদ্যুতে ভর্তুকি, ফসলের ন্যায্য

অর্থাৎ চড়া দর, ব্যাঙ্ক ঋণ মকুব। চাকুরিজীবীর দাবি চাকরির নিরাপত্তা, বেতন ও ভাতার নিয়মিত বৃদ্ধি। স্ফীতকায় ক্ষমতাশালী আমলাতন্ত্রের দাবি — আরও স্ফীতকায় হওয়ার সুযোগ, ক্ষমতার আরও বৃদ্ধি। ওপরমহলের পেশাজীবীর দাবি কর হ্রাস, করের ক্ষেত্রে রকমারি ছাড়। এক এক গোষ্ঠীর মধ্যে নানা উপগোষ্ঠী, তাদেরও চাহিদা নানা। সেইসব চাহিদা মেটাতে গিয়ে, আপসের পর আপস করে সরকারি আয়-ব্যয়ে ঘাটতি, আর্ন্তজাতিক লেনদেনের ব্যালান্স ঘাটতি বাড়তে বাড়তে দেখা দেয় গুরুতর সংকট।

মনমোহিনী-আর্থনীতিক সংস্কার

এই সংকটের পটভূমিতেই নব্বই-এর দশকের গোড়ায় নরসিমহা রাও সরকার ও সে সরকারের অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং প্রবল উদ্যমে ব্যাপৃত হয়ে পড়েন ইন্দিরা-রাজীব গান্ধীর জমানাতে যে সংস্কার নীতির সূত্রপাত হয়েছিল, তাকে অনেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়ে অর্থনীতির ব্যাপক পুনর্গঠনে যে সব ব্যবস্থা নেওয়া হল সে সবের কোনো কোনোটা তাৎক্ষণিক সংকট নিরসের জন্য (যেমন সোনা বিক্রি), কোনো কোনোটা একইসঙ্গে তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘকালীন পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত (যেমন, টাকার অবমূল্যায়ন), এবং কোনো কোনোটা দীর্ঘকালীন পুনর্গঠন কর্মসূচীর অঙ্গ হিসেবে (যেমন, শিল্পনীতি ও বাণিজ্য নীতি)।

এই প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বিন্যাসের পটভূমিটাও মনে রাখা ভাল। সংক্ষেপে, সত্তরের দশক থেকেই আন্তর্জাতিক ধনতন্ত্রের একটা নতুন পর্যায় বিশ্বায়নের প্রক্রিয়া কাজ করছিল। আশির দশকে বেশ কিছু নতুন বৈশিষ্ট্য নিয়ে ধনতন্ত্র একটা globalised বা বিশ্বায়ন চরিত্র নিল। এই নতন বিন্যাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল ট্রান্সন্যাশনাল/মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশনের (টি.এন.সি./এম.এন.সি.) ভূমিকা। বাস্তবে বিদ্যমান সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় বিশ্বায়ত ধনতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করে তুলল, দেশে দেশে টি.এন.সি./এম.এন.সি.র ক্ষমতা ও প্রভাবের ঘটল বিপুল বৃদ্ধি। নরসিমহা রাও সরকার ভারতের অর্থনীতিকে এই বিশ্বায়ত ধনতন্ত্রের সঙ্গে গ্রথিত করার জন্য নিল সোৎসাহ প্রয়াস।

বিশ্বায়ন, উদারীকরণ ও বাজারশক্তির ক্রিয়াকলাপকে অবাধ করে দেওয়াটা হল মনমোহিনী অর্থনীতি বা 'মনমোহনোমিক্স'এর মূল মন্ত্র। টাকার অবমূল্যায়ন, নতুন শিল্পনীতি, 'ওপেন জেনারেল লাইসেন্স' — এর প্রসার ঘটিয়ে আমদানির সুযোগ বৃদ্ধি। এসবই হয়ে উঠল অর্থনৈতিক সংস্কার কার্যক্রম রূপায়ণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এসব পদক্ষেপ নেওয়ার পিছনে শাসন ক্ষমতায় নতুন অধিষ্ঠিত নেতাদের আশু বিবেচনা ছিল — যে গভীর সংকটে দেশের অর্থনীতি পড়েছে তাতে শুধু বৈদেশিক ঋণ নিয়ে বা সরকারি খরচ কমিয়ে উদ্ধার পাওয়া যাবে না। তাঁদের মনে হয়েছিল, প্রয়োজন হচ্ছে রাষ্ট্রের ভূমিকাতেই একটা মৌলিক পরিবর্তন।

আগে দেখানো হয়েছে, স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রথম দশকগুলিতে আর্থ-সামাজিক শ্রেণী ও গোষ্ঠীগত সংঘাতে রাষ্ট্রের একটা মধ্যস্থের ভূমিকা ছিল। অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়াতেও রাষ্ট্রের ছিল বড় ভূমিকা। কিন্তু জনতা সরকারের সময় থেকেই এটা বেশি বেশি করে বোঝা যাচ্ছিল যে, অর্থনীতির হাল তেমন করে আর রাষ্ট্রের হাতে থাকছে না। বস্তুতপক্ষে বেসরকারি পুঁজির প্রভাব-প্রতিপত্তি তো কোনো পর্বেই ঠিক কাটিয়ে ওঠা যায়নি। তবে ক্রমশ ক্ষীয়মান হলেও আশির দশকেও অর্থনীতির নানা ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের একটা তৎপরতা ছিল। নরসিমহা রাও সরকারের আমলে এসবের থেকে রাষ্ট্রের একেবারে খোলাখুলি পশ্চাদাপসরণের নীতি গৃহীত ও চালু হল।

মনমোহিনী সংস্কার কর্মসূচীর দিক থেকে একটা বড় পদক্ষেপ ছিল ১৯৯১-এর জুলাইতে ঘোষিত নতুন শিল্পনীতি। ১৯৪৮ ও ১৯৫৬-এ ঘোষিত শিল্পনীতি, যা ছিল 'মিশ্র অর্থনীতি'র

ভিত্তি, তার আমূল পরিবর্তন করা হল। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। ১৯৫৬-র শিল্পনীতিতে রাষ্ট্রের জন্য সংরক্ষিত শিল্পের সংখ্যা ছিল সতেরো, এবারে সেটা কমিয়ে করা হল আট। মিশ্র অর্থনীতির আড়ালে বেসরকারি পুঁজির প্রশ্রয় অতীতেও ছিল। কিন্তু এবারে তার ক্ষেত্রকে আরো প্রসারিত করা হল। সেই সঙ্গে 'মনোপলি অ্যান্ড রেস্ট্রিকটিভ প্র্যাকটিসেস' (মরটপ) আইনের বহু বাধানিষেধ তুলে দেওয়া হল। তার মানে দাঁড়াল যে, বড়ো, একচেটিয়া বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তো বেড়ে চলছিলই। এবারে বিনা বাধায় তা আরও বড়ো হতে পারবে, অন্য প্রতিষ্ঠানকে 'অধিগ্রহণ' করে গ্রাস করতে পারবে। সঞ্চয়ের স্বল্পতা ও পুঁজির অনটনের যুক্তিতে বিদেশি পুঁজির স্থান ১৯৪৮-এর থেকেই ছিল। শিল্পায়নে গতিবেগ বাড়ানোর যুক্তি দেখিয়ে বিদেশি পুঁজির প্রতি আরও উদার মনোভাব নেওয়া হল। 'ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশান অ্যাক্ট'-এর (ফেরা) সংশোধন করে ভারতীয় কোম্পানিতে বিদেশি পুঁজির মালিকদের ধৃত শেয়ারের পরিমাণ ৫১ শতাংশ করা অর্থাৎ ভোটে গরিষ্ঠতা পাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হল। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এমনকী ১০০ শতাংশ বিদেশি পুঁজির অনুমতি দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হল। এই সঙ্গে প্রযুক্তি আমদানির বিশেষ সুযোগও দেওয়া হল। এসবের সূত্র ধরে কিছু কিছু বাছাই করা অর্থাৎ লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার শেয়ার-মূলধনের একটা অংশকে বেসরকারি সংস্থার কাছে বিক্রি করে দেওয়ার নীতি নেওয়া হল।

পুনর্গঠনের আর একটি পদক্ষেপ হল বাণিজ্যিক নীতির পরিবর্তন। 'ওপেন জেনারেল লাইসেন্স'-এর (ও.জি.এল.) ক্ষেত্র প্রসারিত করে আমদানির জন্য লাইসেন্সিং অনেক কমিয়ে দেওয়া হল। রপ্তানিকারকদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য নতুন একটি স্কীম চালু করা হল। এ দুয়ের উদ্দেশ্য হল বৈদেশিক বাণিজ্যকে উদার করে দিয়ে বিশ্ব অর্থনীতি অর্থাৎ বিশ্বায়িত ধনতন্ত্রের সঙ্গে ভারতের অর্থনীতির সংযোগকে ঘনিষ্ঠতর করা।

অর্থনৈতিক সংস্কার ও পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে নতুন একটি কথা বিশেষ করে উঠল — 'মার্কেট - ফ্রেন্ডলি' বা বাজার-বান্ধব নীতির কথা। অথচ স্বাধীন ভারতে অর্থনৈতিক নীতি কোনো সময়েই, এমনকী নেহরুবাদ সমাজতন্ত্রের সময়েও বাজার-বৈরী ছিল না। নানা ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ থাকলেও পরিকল্পনা, রাষ্ট্রীয় সংস্থা ও রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপকে কখনোই বাজারের এবং বেসরকারি উদ্যোগ বা পুঁজির বিকল্প হিসেবে দেখা হয়নি।

কিন্তু এবারে রাষ্ট্রের ভূমিকা গুটিয়ে ফেলে বাজার শক্তির অবাধ লীলাখেলার নীতি প্রবর্তন করা হল। আশির দশকের গোড়া থেকে ক্রমশ বেসরকারি পুঁজিকে নানা সুবিধা দেওয়া হতে ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণকে শিথিল করা হতে থাকলেও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের মূল কাঠামোটি মোটের ওপর অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু অর্থনৈতিক সংস্কার ও বাজার-বান্ধব নীতির নামে সেই কাঠামোটিকেই আঘাত করা হল। বিদেশি ও স্বদেশি বেসরকারি পুঁজিকে দেওয়া হল শুধু সুবিধা নয়, কার্যত অবাধ স্বাধীনতা।

সরকার এবং উদারীকরণের প্রবক্তারা প্রতিযোগিতার গুণগান করলেও যে নীতি নেওয়া হল তার মানে দাঁড়াল যে সব কিছু চালাবে বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান এবং বৃহৎ ভারতীয় পুঁজিপতিরা। মনোপলি কমানোর নামে মনমোহিনী নীতি মনোপলির দরজা খুলে দিল। সংযুক্তি, অধিগ্রহণ ইত্যাদি নানা পদ্ধতিতে প্রতিযোগিতাকে খর্ব করে বাজারে বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠানের অংশকে বাড়িয়ে তুলল। যেমন, বহুজাতিক সংস্থা হিন্দুস্তান লিভার কর্তৃক টমকোর বা প্রক্টর অ্যান্ড গ্যাম্বল কর্তৃক গোদরেজ-এর অধিগ্রহণ, পার্লে ও কোকা কোলার সংযুক্তি, মালহোত্রাদের সঙ্গে মার্কিন সংস্থা জিলেটের গাঁটছড়া বাঁধা। আইসক্রিম থেকে শুরু করে জ্যাম-জেলি, সাবান থেকে শুরু করে প্রসাধনসামগ্রী ইত্যাদি রকমারি অস্থায়ী ভোগ্যপণ্যের বাজারের সিংহভাগই এখন অ্যাংলো-ডাচ বহুজাতিক সংস্থা ইউনিলিভার ও তার অধীনস্থ

হিন্দুস্তান লিভারের দখলে।

সংস্কার কার্যক্রমের নানা দিক থেকেই সমালোচনা হয়েছে। এখন সংক্ষেপে আর কয়েকটি জিনিষের কথা উল্লেখ করা যায়। একটা শিল্পনীতি ঘোষণা করা হল, কিন্তু তার সঙ্গে সম্পর্কিত কোনো কৃষিনীতি তৈরি হল না। ভূমিসংস্কারের ব্যাপারটিই সরকারি এজেন্ডার থেকে পুরোপুরি উধাও হয়ে গেল। অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কথা বলা হল, কিন্তু কর্মসংস্থানের কোনো নীতি জানানো হল না, তবে ঘোষণা করা হল বিদায় নীতি। শ্রমের বাজারে নমনীয়তা যুক্তিতে hire and fire policy চালু করার প্রয়াস নেওয়া হল। অস্থায়ী শ্রমিক নিয়োগের ব্যাপক প্রথা আগেই ছিল। তা আরও ব্যাপক হল। ক্ষুদ্র শিল্প সম্পর্কে যে নীতি প্রকাশ করা হল তাতে বড় বড় প্রতিষ্ঠানের এমনকী বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানেরও ক্ষুদ্র শিল্প ক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ খুলে দেওয়া হল।

সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন

একটা সমালোচনা বারেবারেই উঠেছে। তা হল, সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণের মধ্যে দিয়ে ভারতের সার্বভৌমত্ব — রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা গুরুতরভাবে বিপন্ন হয়েছে। কোনো সন্দেহ নেই যে, উদারীকরণের কর্মসূচী প্রবর্তন করা হয়েছে যাকে বলা হয় ওয়াশিংটন সহমত (Washington consensus) তার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে। আই.এম.এফ. ও বিশ্বব্যাঙ্ক ঐ নীতি গ্রহণের জন্য পরামর্শ দিয়েছে, উৎসাহ যুগিয়েছে।

কিন্তু নরসিমহা রাও সরকার কি শুধু সে কারণেই বা আই.এম.এফ. — বিশ্ব ব্যাঙ্কের নির্দেশেই ঐ কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল? সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হওয়ার কথাটি অনেক সমালোচক যে ভাবে বলেন তা কি ঠিক? মনে রাখা উচিত যে, সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণের জন্য দেশের ভেতর থেকেও প্রবল চাপ কাজ করেছে। অনেক জনমনোরঞ্জক বুলি, এমনকী সমাজতন্ত্রের বুলির আড়ালে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতাতেই বেসরকারি ভারতীয় পুঁজির দাপট ক্রমশই বেড়েছে। দ্রুত কিন্তু বেশি বেশি মুনাফার সন্ধানে ঐ ভারতীয় পুঁজি বিদেশি বা বহুজাতিক পুঁজির সঙ্গে সহযোগ কামনা করেছে। ভারতের পুঁজিপতি শ্রেণী অবশ্য homogenous বা সমগোত্রীয় নয়, তার ভেতরে রয়েছে নানা অংশ, নানা ভাগ (যেমন সর্বভারতীয় পরিসরে সক্রিয় পুঁজি ও আঞ্চলিক পুঁজি, শিল্প পুঁজি ও মুখ্যত ফাটকা পুঁজি, অকৃষি ও বড় কৃষক-ভিত্তিক কৃষি পুঁজি ইত্যাদি)। তাদের সকলের স্বার্থও অভিন্ন নয় — রয়েছে নানা দ্বন্দ্ব ও সংঘাত।

তবে একথা বললে বোধহয় অতিসরলীকরণ হবে না যে, মোটের ওপর স্বদেশি পুঁজি এবং অন্যান্য বিত্তবান শ্রেণী ও গোষ্ঠীগুলির অনেক অংশই অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ খর্ব করতে চেয়েছে, বাজার শক্তির অবাধ তৎপরতা চেয়েছে, বিদেশি পুঁজির প্রবেশপথকে সুগম করতে চেয়েছে। সবুজ বিপ্লবের দৌলতে ফুলেফেঁপে ওঠা পাঞ্জাব-হরিয়ানার বড় ধনিক কৃষক আবার চেয়েছে ফসলের কারবারের ওপর যাবতীয় বিধি-নিয়োগের অপসারণ, ফসল রপ্তানির অবাধ সুযোগ, খাদ্যশস্যের পরিবর্তে খাদ্যশস্য নয় এমন বাণিজ্যিক ফসলের চাষের সুযোগ। বাইরের চাপ ও ভেতরের চাপে এসেছে উদারীকরণের, সংস্কারের কার্যক্রম।

অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব ক্ষুন্ন হওয়ার প্রশ্নটি নিশ্চয়ই উপেক্ষা করার নয়। তবে আসল প্রশ্ন হল — উদারীকরণের পরিণাম কি হয়েছে? সংস্কার নীতির প্রবক্তারা বলেছিলেন — আমাদের সব অর্থনৈতিক সমস্যার মূলে রয়েছে রাষ্ট্র, রাষ্ট্র তার কালো হাত সরিয়ে নিলেই, বাজারের ওপর সব কিছু ছেড়ে দিলেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হবে, স্বদেশি ও বিদেশি পুঁজি বিপুলভাবে বিনিয়োগ করবে উৎপাদনে ও পরিকাঠামো উন্নতিবিধানে। কিন্তু চিত্রটা কি

দাঁড়িয়েছে?

বিশদ তথ্য ও পরিসংখ্যান দেওয়ার পরিসর এই লেখায় নেই। সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলে নেওয়া যায়। উৎপাদন ও আমদানির ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়ার ফলে ভোগ্যপণ্যের, বিশেষত ধনীজনের ব্যবহার্য স্থায়ী ভোগ্যপণ্য অর্থাৎ বিলাস সামগ্রীর বাজারে ঘটেছিল একটা 'বুম', এসেছিল রমরমা অবস্থা। এই রমরমা অবস্থাটা অবশ্য রাজীব-পর্বেই দেখা দিয়েছিল — সংস্কার নীতির দৌলতে সেটা নরসিমহা রাও সরকারের আমলেও অনেকদিন পর্যন্ত ছিল। ইতিপূর্বে অনুসৃত অর্থনৈতিক নীতির সুবাদে ওপরতলার মানুষের আর্থিক সমৃদ্ধি, আর প্রচার মাধ্যমের কল্যাণে অনেকদিন ধরেই জমেছিল বিশেষ ধরনের ভোগ্যপণ্য — গাড়ি, রঙিন টি.ভি., ভি.সি.আর-ভি.সি.পি., ওয়াশিং মেশিন, রান্নার অত্যাধুনিক সরঞ্জাম, সেলুলার ফোন ও পেজার, দামি স্যুট ইত্যাদির চাহিদা। মুক্ত বাজারে ঘটেছে এই চাহিদার প্রতিফলন।

কিন্তু শিল্প বিপ্লব ঘটেনি। ব্যাপক-ভিত্তিক গতিশীল অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেনি। সংস্কার কার্যক্রম চালু করার অব্যবহিত পরেকার বছরগুলিতে উঁচ হয়ে জাতীয় আয় এবং ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু তা হয়েছে স্বল্পকালস্থায়ী jobless growth, ঘোষিত হয়েছে বিদায় নীতি। শেয়ারবাজার ও অন্যান্য অনুৎপাদক কাজকর্মে দ্রুত মুনাফাসন্ধানী স্বল্পমেয়াদী পুঁজি এলেও শিল্প উৎপাদনে, পরিকাঠামো নির্মাণে দীর্ঘমেয়াদি পুঁজি আসেনি। কৃষিতে সবুজ বিপ্লব একটা মালভূমিতে পৌঁছে গিয়েছে। তার একটা প্রধান কারণ সরকারি ব্যয়হ্রাসের নীতি অনুসারে কৃষিতে সরকারি বিনিয়োগ হয়নি। কিন্তু অনেক নেতিবাচক দিকের সঙ্গে যা ঘটেছে তা হল দুর্নীতি ও আর্থিক কেলেঙ্কারির উদারীকরণ। এই হল একদিকের চিত্র।

অন্যদিকে ব্যাপক দারিদ্র্যের কোনো হ্রাস ঘটেনি। অর্থনৈতিক অসাম্য ও বৈষম্যের হ্রাস ঘটেনি। দেশের মানুষের ক্রয়ক্ষমতার কোনো বৃদ্ধি ঘটেনি। পানীয় জল, শিক্ষা, চিকিৎসা, আশ্রয় ইত্যাদির মত সাধারণ মানুষের জীবনের জরুরী সমস্যাগুলির কোনোটিরই কোনো প্রতিকার হয়নি।

ঔপনিবেশিক আমল থেকেই দেশের সমাজ ও অর্থনীতিতে যে একটা লক্ষণীয় দ্বৈততা ও বিভাজন ছিল সে কথা ওপরে বলা হয়েছে। মনমোহিনী সংস্কার নীতির দৌলতে সেই দ্বৈততা ও বিভাজন নতুন রূপে পাকাপোক্ত হচ্ছে। বস্তুতপক্ষে স্বাধীনতা-উত্তর অর্থনৈতিক নীতির পরিণামে সংস্কার নীতি চালু হওয়ার আগেই দশ-পনেরো বা বড় জোর বিশ শতাংশ বিত্তবান আর বাকি আশি-পঁচাশি শতাংশ মানুষ হয়ে উঠেছিল দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থনীতির, ভিন্ন জগতের বাসিন্দা, গড়ে উঠেছিল দেশের মানুষের মধ্যে মেরুবিভাজন। সংস্কার কার্যক্রম সেই মেরুবিভাজনকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

একাদশ লোকসভা নির্বাচন-পরবর্তী রাজনীতি ও অর্থনীতি

এই পটভূমিতেই অনুষ্ঠিত হয় একাদশ লোকসভার নির্বাচন এবং নির্বাচনের পর রাজনৈতিক শক্তিগুলির পনর্বিন্যাস। নির্বাচন-পরবর্তী বিশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে হিন্দুত্ববাদী শক্তিগুলির কেন্দ্রে সরকারি ক্ষমতা দখলের প্রয়াসকে প্রতিহত করার তাগিদে গঠিত হয় অ-হিন্দুত্ববাদী, অ-কংগ্রেসি ১৩টি মধ্যপন্থী এবং বামপন্থী দল ও গোষ্ঠীর, সি.পি.আই(এম) ও জনতা দলের মত সর্বভারতীয় দল এবং একাধিক আঞ্চলিক দল ও গোষ্ঠীর যুক্তফ্রন্ট ও তার সরকার। সে সরকারকে বাইরে থেকে সমর্থন জানালো, একদিকে সি.পি.আই.(এম), অন্যদিকে কংগ্রেস(ই)। দেশ প্রবেশ করল একদলীয় সরকারের পরিবর্তে

বহুদলীয় সরকারের পর্বে। এটি হল আমাদের দেশের সংসদীয় রাজনীতির ইতিহাসে একটা নজিরবিহীন, কিন্তু দূরপ্রসারী তাৎপর্যপূর্ণ পর্বের সূচনা। অবশ্য এর মধ্যে যে অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা নিহিত ছিল তা প্রকট হয়েছে গত ৩০শে মার্চ দেবগৌড়া সরকারের প্রতি কংগ্রেসের আচমকা সমর্থন প্রত্যাহার — পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহে।

সে প্রবাহের পরিণতি কি হবে তা এই লেখার সময় পর্যন্ত জানা নেই। কিন্তু এখানে যা উল্লেখ্য তা হল — শ্রেণী ও সামাজিক শক্তির বিচারে ফ্রন্টে রয়েছে, একদিকে, সর্বভারতীয় বৃহৎ পুঁজি (যার সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে বিদেশি বহুজাতিক পুঁজির), আঞ্চলিক পুঁজি (যেমন, কর্নাটকের কম্পিউটার ও ইলেকট্রনিক্স টেকনোলজি-ভিত্তিক নব্য পুঁজি), অন্ধ্র-তামিলনাড়ুর শহর-গ্রামাঞ্চলের কৃষি ও কৃষি শিল্প-ভিত্তিক (agro industry) পুঁজি, উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের সেচসেবিত অঞ্চলের প্রসারমান কৃষি পুঁজি ও বিত্তবান কৃষক। আর অন্যদিকে রয়েছে শহর ও গ্রামাঞ্চলের শ্রমজীবী মানুষ — শিল্প, খনি, বাগিচা ইত্যাদির শ্রমিক, তথাকথিত অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক, নানা পদ্ধতিতে শোষণ ও বঞ্চনায় জর্জরিত হস্তশিল্পী ও কারিগর, কৃষি, শ্রমিক, গরিব ও প্রান্তিক চাষী এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত।

যুক্তফ্রন্টের অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচীতে প্রতিফলিত হয়েছে এই বিভিন্ন শ্রেণী, সামাজিক গোষ্ঠী ও আঞ্চলিক শক্তির পারস্পরিক সমঝোতাভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী ও স্বার্থ। কিন্তু তাদের দৃষ্টিকোণ ও স্বার্থের মধ্যে পার্থক্য অনেক, অনেক ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী। স্বভাবতই অর্থনৈতিক নীতি ও ব্যবস্থা নিয়ে বহু সময়েই ফ্রন্টের ভেতর দেখা দিয়েছে নানা টানাপোড়েন, এমনকী সংঘাত। সে সবের প্রকাশ দেখা গিয়েছে যুক্তফ্রন্ট সরকার কর্তৃক অনুসৃত অর্থনৈতিক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে, মার্চে পেশ করা বাজেটে।

অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচীতে স্বচ্ছ, জনমুখী, উন্নয়নমুখী নীতি অনুসরণের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থানকারীদের জন্য রেশনের অর্ধেক দামে খাদ্যশস্য সরবরাহের জন্য পদক্ষেপ, আঞ্চলিক দলগুলির আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিপ্রেক্ষিতে তুলে ধরা এবং সেই সঙ্গে রাজ্যগুলির জন্য কোনো কোনো খাতে অধিক অর্থসংস্থান কিংবা প্রত্যক্ষ করের ভিত্তিকে প্রসারিত করার জন্য বাজেট প্রস্তাব প্রশংসাযোগ্য।

সংস্কার কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা

কিন্তু অর্থমন্ত্রী পি. চিদম্বরমের প্রস্তাবিত বাজেটের মূল জোরটা কিসের ওপর? তার গতিমুখটা কোন্ দিকে? বস্তুতপক্ষে তাঁর প্রথম বাজেট (১৯৯৬-৯৭) ও ঐ বাজেটের আগে পেশ করা 'ইকনমিক সার্ভে ১৯৯৫-৯৬ : অ্যান আপডেট' - এই ১৯৯১-এর মাঝামাঝি থেকে অনুসৃত ফান্ড-ব্যাঙ্ক কর্তৃক অনুমোদিত বাজার-সর্বস্ব মতাদর্শে অনুপ্রাণিত অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচীর প্রতি যুক্তফ্রন্ট সরকারের দায়বদ্ধতার পরিচয় খুব অস্পষ্ট ছিল না।

তবে ১৯৯৭-৯৮ আর্থিক বছরের জন্য পেশ করা বাজেটের খুঁটিনাটির মধ্যে প্রবেশ না করেও বলা যায়, ঐ বাজেটের গতিমুখ বিশ্বায়ন, উদারীকরণ ও বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়াকে আরও বেগবান করার দিকে। মনমোহন সিং-এর সংস্কার প্রক্রিয়ার পিছনের যে বিশ্বাসগুলির কথা আগে বলা হয়েছে সেই বিশ্বাসগুলিই রয়েছে চিদম্বরমের বাজেটের পিছনে। আর তাই এই বাজেট প্রসঙ্গে ব্যতিক্রমহীনভাবেই মার্কিন সরকার থেকে শুরু করে সব কয়টি পুঁজিবাদী সরকার, ফান্ড-ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ, আন্তর্জাতিক পুঁজি, দেশের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী মহল, উচ্চ মধ্যবিত্ত, ধনী কৃষক ইত্যাদি নানা বিত্তবান শ্রেণী ও গোষ্ঠীর উচ্ছ্বাস।

একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে। কর কমালে অর্থনীতির শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে এই বিশ্বাসের থেকে ঢালাওভাবে প্রত্যক্ষ কর — কর্পোরেট কর ও ব্যক্তিগত আয় কর কমানোর প্রস্তাব রয়েছে। তাতে উপকৃত হবেন কারা? শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী, ফাটকা কারবারী ও শেয়ার বাজারের

দালাল, শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের 'এক্সিকিউটিভস', বড় বড় সরকারি আমলা, উচ্চ বেতনভোগী কর্মচারী, উচ্চ আয়ের আইনজীবী ও ডাক্তারদের মত পেশাজীবী ও 'প্রফেশনালস' প্রমুখ। এই বছর পালিত হচ্ছে আমাদের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পঞ্চাশতম বার্ষিকী পালনের উৎসব। দেশি ও বিদেশি বিত্তবানদের নামে সত্যিই উৎসব! প্রস্তাবিত ফিনান্স বিল যদি গৃহীত হয়, তবে প্রত্যক্ষ কর যে হ্রাস ঘটবে তাতে প্রত্যক্ষ করের বোঝা হবে স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে সব থেকে কম।

মনমোহনীয় নীতি আর চিদম্বরমের প্রস্তাবিত বাজেট — এই দুয়ের পিছনেই রয়েছে আর একটি বিশ্বাস — 'কনজাম্পশন-লেড' (consumption-led) গ্রোথ বা ভোগ-প্রসূত বৃদ্ধির ধারণা। তার মানে হল, ভোগ যতই বাড়বে অর্থনৈতিক বৃদ্ধিও ততই ত্বরান্বিত হবে।

কিন্তু কিসের ভোগ? কার ভোগ? কি সামগ্রীর ভোগ? সে কি দেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভোগ, তাদের অত্যাবশ্যক সামগ্রীর ভোগ? না, তা নয়। আশি/পঁচাশি কোটি মানুষের ভোগ, তাদের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাজারের সম্প্রসারণ নিয়ে দেশের নীতি রচয়িতা ও নির্ধারকরা ভাবিত নন। চিদম্বরমের বাজেট প্রস্তাবে যে সব সামগ্রীর ওপর আমদানি ও উৎপাদন শুল্ক কমানো হয়েছে এবং বাজেট প্রস্তাবের পর যে বাণিজ্য নীতি ঘোষিত হয়েছে তাতে বুঝতে অসুবিধা হয় না — তাঁদের চিন্তা-ভাবনাতে রয়েছে বিলাস ও আধা-বিলাস সামগ্রীর ভোগ। তাঁদের বাজেট নীতির ফলে এসবের দাম কমতে পারে, উৎপাদন বাড়তে পারে।

কিন্তু মারুতি বা সিয়েলো গাড়ি, এয়ারকন্ডিশনার, ওয়াশিং মেশিন, ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের মত সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি (অবশ্য সে সব শিল্পেও একটা মন্দার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে), সেলুলার ফোন-পেজার হাতে ঘুরে বেড়ানো, লি বা লেভিস জিনস কিংবা নাইকের জুতোয় সজ্জা, কেলগের ব্রেকফাস্ট সিরিয়েলস খাওয়ার অভ্যাসের প্রসার, নতুন নতুন পাঁচতারা হোটেল নির্মাণ বা পেপসি-কোকাকোলার ফোয়ারার মানেই কি 'গ্রোথ' বা বৃদ্ধি — অর্থনীতির সমৃদ্ধি, শ্রীবৃদ্ধি?

উপসংহার

তবে এই সমৃদ্ধি বা শ্রীবৃদ্ধিতে যে কোটি কোটি মানুষ খাদ্যাভাব ও অপুষ্টির শিকার, যে কোটি কোটি মানুষের পানীয় জল, প্রাথমিক শিক্ষা, সামান্যতম চিকিৎসার সুযোগ নেই, যে সব মানুষের ন্যূনতম জীবিকার সংস্থান নেই, তাঁদের উপকার হবে কিভাবে? "তোমা হইতে হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্তের কি উপকার হইয়াছে... বল দেখি চশমা-নাকে বাবু ইহাদের কি উপকার হইয়াছে" — প্রায় সোয়া শ'বছর আগে তোলা বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রশ্ন স্বাধীনতা প্রাপ্তির পঞ্চাশ বছরের পূর্তিতেও খুব বেশি করেই প্রাসঙ্গিক।

স্বাধীনতার পাঁচ দশকে ভারতের সমাজ ও অর্থনীতিতে যে পরিবর্তন ঘটেছে তা উপেক্ষা করার নয়। দেশবিভাগ ও ভয়াবহ দাঙ্গা, প্রতিবেশী চিন ও পাকিস্তানের সঙ্গে একাধিক সামরিক সংঘর্ষ, সাম্রাজ্যবাদীর পুঁজির বিরোধিতা, অভ্যন্তরীণ স্থিতস্বার্থের প্রবল প্রতাপ ইত্যাদি নানা জটিল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও শিল্প, কৃষি ও অন্যান্য নানা ক্ষেত্রে ঘটেছে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির থেকে প্রস্থান এবং সুদূরপ্রসারী সব পরিবর্তন।

কিন্তু ঔপনিবেশিক অর্থনীতির সঙ্গে পরিবর্তিত রূপে থেকে গিয়েছে এক ধরনের ধারাবাহিকতা। পাঁচ দশক ধরে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের গতিপ্রকৃতিতে ওপরতলার দশ-পনেরো শতাংশ মানুষ আর নীচের তলার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের মধ্যে বিভাজন রয়েছে অটুট, কোনো কোনো দিক দিয়ে এই বিভাজন আরও বেড়েছে। কিছু কিছু অঞ্চলের জন্য সংহত করেছে দারিদ্র্য-দুর্দশা এবং পশ্চাৎপদতা পরিবেষ্টিত 'এনক্লেভড গ্রোথ' (enclaved growth)

এই দীর্ঘ লেখা শেষ করার আগে আর একটি কথা। সেটি হল রাজনীতি ও অর্থনীতির জটিল টানাপোড়েনের বিষয়ে। রাজনীতি অনেক সময়েই গভীরভাবে প্রভাবিত করে অর্থনীতিকে, স্বাধীনতার পাঁচ দশকে তা করেছেও। কিন্তু এই পাঁচ দশকেই রাজনীতি ও অর্থনীতির টানাপোড়েনে শ্রেণী ও সামাজিক বৈষম্যমূলক অর্থনীতির যে কাঠামো গড়ে উঠেছে ও ক্রমশ পাকাপোক্ত হয়েছে তাকে অস্বীকার করে র‍্যাডিকাল বা এমনকী ব্যাপকভিত্তিক পরিবর্তন আনতে সমর্থ, কোনো সামাজিক-রাজনৈতিক শক্তির বিকাশ ও শক্তিবৃদ্ধির সম্ভাবনা অন্তত নিকট ভবিষ্যৎ-এ খুবই অনিশ্চিত। তাই এই মুহূর্তে সব রাজনৈতিক ডামাডোল সত্ত্বেও অর্থনৈতিক সংস্কারের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলেই মনে হয়। তাতে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকট ব্যাপকতর হবে, গভীরভাবে হবে আর ইতিমধ্যে আজাদির বিজ্ঞাপিত অর্থ দাঁড়াচ্ছে পেপসি পানের আজাদি অর্থাৎ জাতীয় জীবনের জরুরি সব সমস্যা সম্পর্কে চোখ বন্ধ রেখে মনভোলানো হরেক রকম ভোগ্যপণ্যের 'স্বপ্ন' দেখার স্বাধীনতা।

প বি ত্র স র কা র

রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি, তিন অকাদেমি

যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল, তখন পশ্চিমের 'মুক্ত-দুনিয়া'তে 'দি আর্ট অ্যান্ড দ কমিসার' বলে একটা বই বেরিয়েছিল। শুধু বইয়ের নাম হিসেবে নয়, ওই কথাগুলো চলত এক ধরনের প্রচার হিসেবে। কথাগুলির ইঙ্গিত এমন ছিল যে, সোভিয়েতে কমিসার অর্থাৎ অফিসের বড়কর্তারা শিল্প-সাহিত্যকে নিজেদের মুঠোর মধ্যে রেখে নিয়ন্ত্রণ করছেন, শিল্পীর স্বাধীনতা বলে সেখানে কিচ্ছু নেই। সে প্রচারের ভিত্তি যাই হোক, তার মূলে একটা জরুরি কথা ছিল। তা হল, দেশে এই যে এত মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে, এত সঙ্গীত নাটক চিত্র ভাস্কর্য প্রতিদিন নির্মিত ও অভিকৃত (পারফর্মড) হচ্ছে, তাতে সরকারের ভূমিকা ও উপস্থিতি কোথায় কতটা থাকবে? সরকার কি এই সব সৃষ্টি ও অভিকরণের বিপুল কর্মক্ষেত্রে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে, কঠোর আড়ালে রাখবে, বলবে যে, 'যে যেমন চালাচ্ছে চালাক, ওখানে আমাদের কিছু করবার নেই?' কিংবা উল্টোপক্ষে, সে কি ঝাঁপিয়ে পড়ে ধমক লাগাবে যে, 'এইয়ো খবরদার! আমাদের কাজকর্মের বিরুদ্ধে কিছু লিখলে গাইলে দেখালে অমনি ধরে নিয়ে, জেলে পুরে দেব — ওসব ছাপাতে শোনাতে দেখাতে দেব না' — জরুরি অবস্থার সময় এদেশে যেমন হয়েছিল? কিংবা সে কি বড়লোক বাবা কিংবা জ্যেঠামশায়ের মতো পদ্য পড়ে গান শুনে ছবি দেখে ভাল লাগলে খুশি হয়ে বাহবা দেবে, বলবে 'চমৎকার হয়েছে, এই নাও পাঁচশো টাকার চেক। চালিয়ে যাও!'?

বলা বাহুল্য, সরকারের চরিত্র ও ইতিহাসের ঘটনাসংস্থানের উপর নির্ভর করে কোন সরকার দেশের এই শিল্প-সাহিত্যসৃষ্টি প্রবাহের পাশে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে নিজের কী সম্পর্ক খুঁজে নেবে। ইতিহাসের তথ্যের খাতিরে এটা স্বীকার করতে হবে যে, বিদেশী রাজাই প্রথম ভেবেছিল তাদের উপনিবেশের বা 'ভারত সাম্রাজ্যে'র শিল্প-সাহিত্যের উন্নয়নের প্রাতিষ্ঠানিক চেষ্টা বিষয়ে। আসলে ১৯৪৪ নাগাদ কলকাতার রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি প্রস্তাব করেছিল যে, তৈরি হোক একটা জাতীয় সংস্কৃতি নিধি — ন্যাশনাল কালচারাল ট্রাস্ট। এই ট্রাস্টের থাকবে তিনটি অংশ — একটা সাহিত্যের, একটা নৃত্য-নাট্য-সঙ্গীতের, আর একটা চিত্র ভাস্কর্য ইত্যাদি দৃশ্যকলার। তখনকার ব্রিটিশ সরকার রাজিও হয়েছিল এই সংস্কৃতি-নিধি নির্মাণের বিষয়ে। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের উদ্‌ব্যস্ততার মধ্যে তৈরি এই প্রস্তাব ও সঙ্কল্প শেষপর্যন্ত বিদেশী সরকারের হাতে স্থায়ী রূপ পায়নি।

১৯৪৭ সালের ১৫ অগস্ট ক্ষমতা হস্তান্তরের পর যখন আমাদের দেশীয় সরকার তৈরি হল, তারাও খুব স্বাভাবিকভাবেই তৈরি হতে সময় নিলেন একটু। প্রথম অবস্থায় অগ্রাধিকারের মধ্যে 'সংস্কৃতি' ছিল না, না-থাকারই কথা। 'সংস্কৃতি' বলতে অনেকেই এখনও

শুধু নাচ গান নাটক পদ্য ইত্যাদিই বোঝেন, তখনও বুঝতেন। তখন আসছে উদ্বাস্তুর বিপুল স্রোত, সাম্প্রদায়িক ক্ষত তখনও শুকোয়নি, তৈরি হবে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য নতুন সংবিধান, তারপরে দেশের সর্বাঙ্গীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরম্পরা তৈরি হবে। ভারতীয় প্রশাসকেরা বুঝি সরল মার্ক্সীয় তত্ত্ব ধরে নিয়েই ভেবেছিলেন, আগে ভিত্তি (বেস) তৈরি হোক, পরে অধিন্যাসে (সুপার স্ট্রাকচার) হাত দেওয়া যাবে। ফলে ১৯৫০-এ সংবিধান গৃহীত হল, ১৯৫২তে একই সঙ্গে প্রথম সাধারণ নির্বাচন ও প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূত্রপাত হল। তবে ১৯৫২তেই ভারত সরকারের 'রেজোলিউশন' তৈরি হয় তার শিক্ষামন্ত্রকে, যে ওই অকাদেমিগুলি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তার দু'বছরের মধ্যে, ১৯৫৪ নাগাদ তৈরি হয়ে গেল তিনটি অকাদেমি --- সাহিত্য অকাদেমি, ললিত কলা অকাদেমি ও সঙ্গীত নাটক অকাদেমি। ঔপনিবেশিকতার আচ্ছাদন থেকে বেরিয়ে আসার পর এশিয়ার এক তরুণ স্বাধীন রাষ্ট্রের সরকার নিজেদের দেশের নিয়তসর্জমান সাহিত্যশিল্পসংস্কৃতির সঙ্গে নিজের একটা সম্পর্ক তৈরি করতে চাইল। এ সম্পর্ক শাসকের নয়, শাস্তার নয়, এমনকী অভিভাবকেরও নয় ; এ কিছুটা পেট্রনের সম্পর্ক, কিন্তু দরবারি ও কর্তাভজা সৃষ্টি ও তোষণ পোষণের লক্ষ্য এর ছিল না।

কী উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরি হয়েছিল এ তিনটি অকাদেমি? সাহিত্য অকাদেমির (সংকল্প ডিসেম্বর ১৯৫২ ; আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন মার্চ, ১৯৫৪) সংবিধান বলছে, ভারতীয় ভাষাগুলির সাহিত্যের উন্নয়নের লক্ষ্যে সাহিত্যিকদের মধ্যে সহযোগিতায় উৎসাহদান, ভারতীয় ভাষাগুলির পরস্পরের শ্রেষ্ঠ রচনার অনুবাদ, বিদেশি ভাষার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ভারতীয় ভাষায় পরিবেশন, গ্রন্থপঞ্জি, অভিধান, কোষগ্রন্থ, মৌলিক শব্দভাণ্ডার ইত্যাদি প্রকাশ ও প্রকাশে সহযোগিতা, সাহিত্য সম্মেলন, আলোচনাচক্র, প্রদর্শনী ইত্যাদির আয়োজন ও আয়োজনে সহায়তা, লেখকদের পুরস্কারদান, ভারতীয় ভাষায় গবেষণায় উৎসাহদান, ভাষা-অঞ্চলের বাইরে সেই ভাষার শিক্ষা, চর্চা ও প্রচারের ব্যবস্থা, সাধারণ মানুষের মধ্যে সাহিত্যের প্রচার ইত্যাদি তার কর্তব্য। সেই সঙ্গে আছে আরও তিনটি গৌণ দায়—বিভিন্ন ভাষার লিপির উন্নয়ন, দেবনাগরিতে অন্যভাষার সাহিত্য পরিবেশন ('গীতাঞ্জলি' এভাবে পরিবেশিত হয়েছে) এবং নানা লিপির উন্নয়ন।

ললিত-কলা অকাদেমি (অগস্ট, ১৯৫৪) চেয়েছে, দেশে সৃষ্টিশীল দৃশ্যকলার জগতে যে কাজ চলেছে, তার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে দেশের 'সাংস্কৃতিক ঐক্যে'র বিবর্ধন ঘটাতে। এই উদ্দেশ্যেই প্রদর্শনী, শিল্পবস্তু প্রকাশনা, সাংস্কৃতিক বিনিময়, স্টুডিয়োর সুবিধা নির্মাণ, পুরস্কারপ্রদান, শিল্প-শিবির, কর্মশালা ইত্যাদির আয়োজন করা ছিল তার লক্ষ্য।

সঙ্গীত নাটক অকাদেমি (১৯৫৩) চেয়েছে সঙ্গীত নৃত্য ও নাট্যের ক্ষেত্রে দেশের নানা অকাদেমিগুলির কাজের সমন্বয়, গ্রন্থাগার ও প্রদর্শশালা স্থাপন করে এ সব বিষয়ে গবেষণায় উৎসাহদান, আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক ধারণা ও সৃষ্টির আদান-প্রদান, নাট্যকেন্দ্র ও নাট্যানুশীলন কেন্দ্র স্থাপন, পুরস্কারদান, গ্রন্থপ্রকাশ, স্বীকৃতি ও সম্মাননা, লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্য ও লোকনাট্য সংরক্ষণ, উৎসবের আয়োজন, প্রশিক্ষণে সহায়তা, ইত্যাদি।

এখানে মনে রাখতে হবে যে, শুধু অকাদেমিগুলি সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেনি। ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রকের অধীনে সংস্কৃতি বিভাগের সঙ্গীত ও নাট্যবিভাগ (সং অ্যান্ড ড্রামা ডিভিশন) সঙ্গীত নাটক অকাদেমির পাশাপাশি কাজ করে গেছে, যার ফলে ইদানীংকালে মালটিমিডিয়া-ধৃত 'রক্তকরবী'-র মতো একটি ভয়ঙ্কর নির্মাণের দ্বারা আমরা আক্রান্ত হয়েছি। এর সঙ্গেই তৈরি হয়েছিল জাতীয় নাট্যবিদ্যালয় (ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা, ১৯৫২), তা সঙ্গীত নাটক অকাদেমি থেকে এক স্বাধীন অস্তিত্ব তৈরি করেছে। তবু এ কথা হয় তো বলা যাবে যে সঙ্গীত নাটক অকাদেমির কয়েকটি উদ্দেশ্যের সহায়ক হয়েছে এই জাতীয় নাট্যবিদ্যালয়। এ

ছাড়া রাজ্য স্তরেও শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নানা পুরস্কার, অনুদান ও সাহায্যের প্রথা অনেক জায়গাতেই গড়ে উঠেছে। ১৯৫৫-তে 'পথের পাঁচালি' চলচ্চিত্রের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আনুকূল্য স্মরণযোগ্য। যদিও জনশ্রুতি এই রকম যে, তখন প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রামীণ গোষ্ঠী-উন্নয়ন বা কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টের প্রচার হবে বলে ওই টাকা সত্যজিৎ রায়কে দেওয়া হয়েছিল, এবং ছবিতে সেই 'উন্নয়নের' কোন সূত্র ছিল না বলে তৎকালীন তথ্য-অধিকর্তা একটু ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, তবু ওই সহায়তা না থাকলে 'পথের পাঁচালি' ছবিটি তৈরি করা কঠিন হত, এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই। অর্থাৎ সরকারের নানা মহলে শিল্প-সাহিত্যকে উৎসাহদানের উদ্দেশ্য নিয়ে নানারকম ধারণা অবশ্যই ছিল, কিন্তু কখনওই শাসন বা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যটি বড় হয়ে ওঠেনি, সত্তরের বছরগুলির মাঝামাঝি জরুরি অবস্থার সময় ছাড়া। সাহিত্য অকাদেমিতে প্রথম সভাপতি হয়েছিলেন জওহরলাল নেহরু, তার পরে সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণন, জাকির হোসেন প্রমুখ। কিন্তু এঁরা শুধু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে গদি পেয়েছিলেন, এমন কথা বলা সঙ্গত হবে না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সুনীতিকুমার, গোকক, কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, শঙ্খ চৌধুরী, অনন্তমূর্তির মতো অরাজনৈতিক ব্যক্তিরাই নানা অকাদেমির সভাপতি হয়েছেন।

প্রায় তেতাল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছরের মতো হবে এই তিনটি অকাদেমি প্রকল্পিত হয়েছে এবং তাদের কাজকর্মের ইতিহাসও প্রায় সমান দীর্ঘ। আমরা বাইরে থেকে এই অকাদেমিগুলির কাজের বিচার করতেই পারি। কিন্তু তার আগে উল্লেখ করতে হবে যে, ভারত সরকার নিজেই ২৪ মার্চ, ১৯৮৮ তারিখে একটি প্রস্তাব নিয়ে অকাদেমিগুলির কাজকর্মের পর্যালোচনা করার জন্য একটি 'হাই-পাওয়ার্ড কমিটি' গঠন করেন। পি এম হাকসার এ কমিটির সভাপতি ছিলেন, ফলে একে পি এন হাকসার কমিটিও বলা হয়। এ কমিটি ভারতের প্রায় প্রত্যেক রাজ্যের রাজধানীতে গিয়েছে, হাজারখানেকের উপর শিল্পী-সাহিত্যিক ও অন্যান্য বুদ্ধিজীবী ও সংগঠকদের সাক্ষাৎকার নিয়েছে, এবং তারই ভিত্তিতে তাদের জুলাই ১৯৯০-এ পেশ করা রিপোর্টে জানিয়েছে যে, অকাদেমিগুলি কাজ ভালই করেছে, কিন্তু আরও ভাল করতে পারত। কোথায় কোথায় অকাদেমিগুলি তেমন কাজ দেখাতে পারেনি তার একটি তালিকাও করেছে হাকসার কমিটি। প্রথমত, দেশের সর্বত্র, বিশেষত উত্তর পূর্বাঞ্চলের কিছু রাজ্যে অকাদেমির কোনও প্রভাব পড়েনি। অর্থাৎ সেখানকার মানুষদের কাছে অকাদেমিগুলি যথেষ্ট বাস্তব হয়ে তাদের সঙ্গে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের উৎস হয়ে ওঠেনি। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন রাজ্যের অকাদেমি বা রাজ্যের শিল্প-সংস্কৃতি সহায়ক সরকারি প্রকল্পগুলির সঙ্গে কেন্দ্রীয় অকাদেমিগুলির সম্পর্ক স্পষ্ট ও সুনির্ধারিত হয়নি। টাকাকড়ির ক্ষেত্রেও, যারা দিল্লি ও তার কাছাকাছি অঞ্চলে থাকে বা গিয়ে ঘন ঘন দরবার করতে পারে তারাই বেশি পেয়েছে, অন্যরা কম। আমাদের মনে হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনও ঠিক এই ব্যাধিতে ভোগে। ১৯৮৫ থেকে ১৯৮৭র মধ্যে ভারত সরকার যে সব অঞ্চলভিত্তিক সংস্কৃতি-কেন্দ্র তৈরি করেছে তাদের লক্ষ্যের সঙ্গে জাতীয় অকাদেমিগুলির কিছু লক্ষ্য যে অভিন্ন তাও কমিটির নজরে এসেছে, এবং এ ব্যাপারে তারা স্পষ্ট সীমানির্দেশ আকাঙ্ক্ষিত বলে মনে করেছেন। কমিটির মতে আঞ্চলিক সংস্কৃতি কেন্দ্রের ধারণাটি সুপরিকল্পিত নয় ('ওয়াজ নট ওয়েল থট আউট', পৃ ৪০) অকাদেমিগুলির আর্থিক ভিত্তি আরও শক্ত করে তাদের সাহায্যদানের ক্ষমতা আরও বাড়াতে হবে, বাড়াতে হবে গবেষণা, প্রকাশনা ইত্যাদির সুযোগ। মুম্বইমার্কা ছবি ও তার দোসর দূরদর্শনের দাপটে জাতীয় অকাদেমিগুলি জাতীয় রুচি-চর্চায় ('কালটিভেশন অফ টেস্ট') তেমন সফল হয়নি, এই করুণ তথ্যও কমিটির অগোচরে থাকেনি।

আমরা প্রথমেই যেভাবে শুরু করেছিলাম সেখানে ফিরে আসি। সরকার ও

শিল্পের/সাহিত্যের সম্বন্ধ কী হবে — এই প্রশ্নের উত্তর স্বাধীনতার পর নির্বাচিত ভারতীয় সরকার, (এবং বেশ কিছু নির্বাচিত প্রাদেশিক সরকার) — এইভাবে দেবার চেষ্টা করেছে যে, এটি হবে বন্ধুত্বের, সহায়কের সম্পর্ক, শাসকের বা নিয়ন্তার নয়, আবার উদাসীন দর্শকেরও নয়। আমাদের মনে হয়, জরুরি অবস্থার বিকারের সময়টা ছাড়া অকাদেমিগুলি এই সম্পর্কটিকে মোটামুটি তুলে ধরবার চেষ্টা করেছে। অকাদেমিগুলির অর্জন কম নয়। সাহিত্য অকাদেমির বেলায় বলতে পারি, বাইশটি ভারতীয় ভাষার মধ্যে বিশাল এক আদানপ্রদানের ক্ষেত্র তৈরি করেছে এই প্রতিষ্ঠান, পরস্পরের শ্রেষ্ঠ রচনা অনুবাদের মধ্য দিয়ে। আমাদের মতে ব্যক্তিগত পুরস্কার বা ফেলোশিপের চেয়ে এ কাজটি জাতীয় ক্ষেত্রে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

ললিতকলা এবং সঙ্গীত নাটক অকাদেমিও তাদের নিজের নিজের ক্ষেত্রে এক দিকে উৎকর্ষের পুরস্কার দিয়ে, অন্যদিকে উৎকর্ষ ও উন্নয়নে সহায়তা ও আনুকূল্য দিয়ে — এই একই ধরনের কাজ করেছে। ললিত কলার বার্ষিক কলা-মেলা, তিন বছর অন্তর 'ত্রিয়েনালে'-তে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী, সঙ্গীত নাটক অকাদেমির নানা সর্বভারতীয় সঙ্গীত ও নাট্যোৎসব ইত্যাদির মধ্য দিয়ে স্রষ্টা ও অভিকরণশিল্পী (পারফরমার)-দের মধ্যে পরস্পরের কাজ দেখা ভাবনার আদান-প্রদান, শিক্ষণ-প্রশিক্ষণের এক ব্যাপক ক্ষেত্র তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

হাকসার কমিটি যেসব সমালোচনা করেছে সেগুলি অসঙ্গত নয়। নিশ্চয়ই ওই সব সুযোগ ভারতের প্রতিটি প্রান্তে পৌঁছানো দরকার। এও ভাবা দরকার যে, জাতীয় সাহিত্য অকাদেমি শুধু লিখিত ও প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যের পৃষ্ঠপোকতা করবে কি না। যেসব ভাষায় সবে লিখিত সাহিত্যের সূত্রপাত দেখা যাচ্ছে, কিন্তু আছে দীর্ঘকালীন মৌখিক সাহিত্য — কেন সে তার পরিচর্যাতেও নিজেকে এগিয়ে আনবে না, এ প্রশ্ন উঠেই পড়ে। এই একই প্রশ্ন উঠে পড়ে ললিত-কলা ও সঙ্গীত-নাটক অকাদেমি সম্বন্ধে। দেশের লোকচিত্রকলা ও সংশ্লিষ্ট লোকশিল্পের যে বিশাল ঐতিহ্য — তা কতটা সহায়তা পেয়েছে ললিত কলা অকাদেমির কাছ থেকে? অন্তত শহরে শিল্পকলার প্রতি সহায়তার তুলনায় তা কতটা? লোকনাট্যের বিপুল বৈচিত্র্য কতটা সমর্থন পেয়েছে সঙ্গীত নাটক অকাদেমি থেকে? এই অকাদেমিগুলি মূলত শহরের লেখকদের শিল্পীদের নাট্যকর্মীদের পৃষ্ঠপোষকতা বেশি করে করছে, এমন অভিযোগের ভিত্তি খুব দুর্বল নয়।

কোথাও কোথাও গোষ্ঠীর কায়েমি স্বার্থের অভিযোগও শোনা গেছে, হাকসার কমিটিও সে কথা বলেছে। সাহিত্য অকাদেমির একটি বাংলা ভাষা সমিতি এইভাবে সুপারিশ করে যদুনাথ সরকারের জীবনী 'আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের স্রষ্টা' ('মেকার্স অব মডার্ন ইন্ডিয়ান লিটারেচার') সিরিজে ঢুকিয়েছে। যদুনাথ ঐতিহাসিক হিসেবে অবশ্যই চিরবরেণ্য, কিন্তু তাঁকে 'আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের স্রষ্টা'দের মধ্যে ফেললে তাঁর সাহিত্যকর্মের নিরপেক্ষ বিচার হয় না।

তবু বলব, এগুলি ব্যতিক্রম এবং এতে এই অকাদেমিগুলি যে মূল্যবান কাজ করেছে সেগুলির গুরুত্ব কমে না। বলা বাহুল্য, এখন অকাদেমিগুলির পাশাপাশি বেসরকারি অনেক প্রতিষ্ঠান কাজ করে চলেছে। তারা অনেকে বেশি টাকা মূল্যের পুরস্কারও দেয়। মধ্যপ্রদেশের সরকারও জাতীয় অকাদেমির চেয়েও অনেক বেশি টাকার পুরস্কার দেয়। কিন্তু খুব কম ক্ষেত্রেই অকাদেমিগুলির মতো সর্বভারতীয় দেখা-সাক্ষাৎ, আদান-প্রদান, ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার জায়গা এই সহকর্মী প্রতিষ্ঠানগুলি তৈরি করতে সমর্থ হয়েছে। ফলে নানা সীমাবদ্ধতা, সমস্যা, ঝুঁকি ইত্যাদি সত্ত্বেও সাহিত্য ললিত কলা ও সঙ্গীত নাটক -- এ তিনটি জাতীয় অকাদেমি যে আমাদের দেশের সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিজেদের ভূমিকা গুরুত্ব ও যোগ্যতা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

নি মা ই সা ধ ন ব সু

জবাবদিহির দায় আমাদেরই

লেখার পূর্ণ স্বাধীনতা এক দুর্লভ কাঙ্ক্ষিত সুযোগ। কিন্তু এই সুযোগ আপাত দৃষ্টিতে যেমন লোভনীয় তেমনি এক বড় সমস্যা, বিশেষ করে যখন লেখার বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ নয়। এই সমস্যা সঙ্কটের রূপ নেয় যদি তার মধ্যে স্মৃতিচারণ, বর্তমান প্রজন্মের সমালোচনা, নিন্দার বা উপদেশদানের সুর থাকে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি আরও পরিপক্ক হয় কি না এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান বৃদ্ধি পেলেও 'সাধারণ জ্ঞান' বা Common sense প্রায়শই কমতে দেখা যায়। আমাদের চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য আছে। সেটি হল, আমরা ভারতীয়রা (বিশেষ করে বাঙালিরা) একটি মানসিক রোগাক্রান্ত। রোগটি হল : 'আমি তোমার থেকে ভাল'। ইংরাজি ভাষায় যাকে বলা হয় 'Holier than thou'-মনোভাব। এই রোগে আমরা দীর্ঘকাল ধরে ভুগছি। অনেক ধাক্কা খেয়ে, অপদস্থ হয়েও রোগটি সারছে না। এই রোগেরই এক লক্ষণ হল বর্তমানের যুব-সমাজের নিন্দা সমালোচনা। সে কাল অর্থাৎ আমাদের কাল, এ কাল অর্থাৎ বর্তমানের তুলনায় কতখানি ভাল ছিল, একালে কতটা অধঃপতন ঘটেছে ও ঘটছে তাই নিয়ে আমাদের উদ্বেগ ও মাথাব্যথার শেষ নেই। এর সবটাই যে অমূলক, ভিত্তিহীন সমালোচনা তা নয়। কিন্তু নিজেদের ভুল-ভ্রান্তি, ব্যর্থতা, অকর্মণ্যতা বেমালুম ভুলে গিয়ে সব কিছুর জন্যে যখন বর্তমান প্রজন্মকে দোষারোপ করি তখন তা অর্থহীন হয়ে পড়ে। এ ছাড়া বয়সের আর এক দোষ আছে। সেটি হল কতটা বলা উচিত, কোথায় থামতে হবে, এই বিষয়ে মাত্রা জ্ঞান থাকে না প্রায়শই। অ্যারিস্টটল বলেছিলেন, "বেশি কথা বলা, তা যত মূল্যবানই হোক নির্বুদ্ধিতার নিদর্শন"। বিশ্ববিশ্রুত গ্রীক দার্শনিকের উপদেশ কম লোকই শোনে। আর একটি কথা প্রচলিত আছে, "আমাদের দুটি কান ও একটি মুখ আছে যাতে আমরা কম কথা বলি এবং বেশি কথা শুনতে পাই"। এই কথাতেও আমরা কান দিই না।

স্বাধীন ভারতবর্ষের পঞ্চাশ বছর বয়স হয়ে গেল। কিন্তু যেমন আশা করা গিয়েছিল তার তুলনায় দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধি খুবই হতাশজনক। ওই বিতর্কের প্রয়োজন নেই। তবে যখনই এই প্রসঙ্গে ও বর্তমান পরিবেশ পরিস্থিতির কারণ বিশ্লেষণ হয় তখন প্রায় অবধারিতভাবে বর্তমানকালের ছেলেমেয়েদের নিন্দা-সমালোচনা করা হয়। এটা বয়স্কদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এর ব্যতিক্রম খুবই কম। বর্তমান যুবমানস সম্পর্কে একটি বক্তৃতায় প্রয়াত অধ্যাপক অমিয়কুমার মজুমদার 'আমেরিকান রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে একটি উদ্ধৃতির উল্লেখ করেছিলেন। উদ্ধৃতির সারমর্ম হল : "আজকাল ছেলেগুলোর হল কি, তারা বাপ-মার কথা শুনছে না, মাস্টারমশাইদের কথা শুনছে না, গুরুজনদের কথা শুনছে না, সামনে যা কিছু

পাচ্ছে তাই ভেঙে চুরমার করছে, কোনও কিছু গড়ার দিকে স্পৃহা নেই, --- তাদের সামনে বিরাট শূন্যতা, এদের কী হবে?" — কথাগুলো পড়লে মনে হবে, এ তো বর্তমানকালের কথা। আসলে কিন্তু তা নয়। প্রায় আড়াই হাজার পূর্বের কথা। বলেছিলেন গ্রীক দার্শনিক প্লেটো। মনে হবে অবিশ্বাস্য! কিন্তু একেবারে নির্ভেজাল সত্যি। প্লেটোর এই ক্ষোভ কিন্তু আক্ষরিক অর্থে ধরে, বর্তমানকালের সঙ্গে আপাত সাদৃশ্য দেখে আত্মসন্তুষ্টি বা নিশ্চিন্ত বোধ করলে ভুল করা হবে। প্লেটো তিনটি মানবধর্মের (Virtue) কথা বলেছেন — প্রজ্ঞা, শৌর্য ও মিতাচার। তিনি চতুর্থ একটি ধর্ম স্বীকার করেছেন, সেটি হল 'ন্যায়' (Justice)। রাষ্ট্র পরিচালনায় এই 'চারটি' মানবধর্ম অবশ্য পালনীয় বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। তাঁর 'আদর্শ রাষ্ট্র' শাসন করবেন দার্শনিকরা। তাঁরাই দেশ শাসনের উপযুক্ত। বিবাহ, দাম্পত্য জীবন ও পারিবারিক ধর্মপালনের অধিকার থাকবে নাগরিকদের। কিন্তু শাসকদের ব্যক্তিগত ধনহীন, পারিবারিক বন্ধনহীন আজীবন শিবির জীবন যাপন করতে হবে। অনাসক্ত দার্শনিকরাই 'আদর্শ রাষ্ট্র' (Ideal State) শাসনের উপযুক্ত।

দর্শন চর্চা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। প্লেটোর প্রসঙ্গ এই কারণেই বর্তমান আলোচনায় প্রাসঙ্গিক, কেন না আমরা বর্তমান প্রজন্মকে নিন্দা-সমালোচনা করলে তাঁরা প্লেটোর উল্লেখ করে বলতে পারে, 'বর্তমান প্রজন্মকে সমালোচনা করা, তাদের কোনও কিছুই ভাল নয়', আমাদের সময় সব কিছুই অনেক ভাল ছিল এটা বলাই বড়দের স্বভাব। এটাই হল Nostalgia। একেই বলে Generation Gap। অন্যদিকে তারাও যুক্তিসঙ্গতভাবেই অভিযোগ করতে পারে বড়দের সম্পর্কে, 'তোমরা উপদেশ দাও, নীতিকথা শোনাও তার কতটুকু নিজেদের জীবনে, আচার আচরণে অনুসরণ করেছ বা কর? কথায় ও কাজে কতটুকু মিল আছে? বড় বড় তত্ত্ব কথা, বেদ-বেদান্ত, রামায়ণ-মহাভারত, নানক-চৈতন্য, বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, গান্ধীজি, নেতাজি আরও কত বড় বড় আদর্শ, মনীষীদের কথা তো দিনরাত শুনছি তোমাদের মুখে ও লেখায়। তার কতটুকু তোমাদের প্রজন্মের জীবনে ছাপ ফেলেছে? সুতরাং ওইসব "জ্ঞানদান" অর্থহীন। যুগ পাল্টে গেছে। ওইসব কথা পড়তে ভাল, শুনতে ভাল। বাস্তব জীবনে অর্থহীন। কোনও কাজে লাগবে না।'

এই কথোপকথন কিন্তু কাল্পনিক নয়। এই ঘটনা ঘটতে দেখেছি। এইরকম প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছি। অবশ্যই ভাষা ও বলার ভঙ্গি অনেক শোভন ও মার্জিত। 'আজকালকার ছেলেমেয়েদের 'যতটা অসভ্য, দুর্বিনীত ও উদ্ধত আমরা মনে করি তা মোটেই সত্যি নয়। তাৎক্ষণিক উত্তেজনা কিছু স্বার্থান্বেষীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্ররোচনায় দলীয় বা গোষ্ঠী স্বার্থে এরকম ঘটনা প্রায়ই ঘটলেও এই আচরণ আজকালকার ছেলেমেয়েদের সহজাত প্রবৃত্তি নয়। বড়দের সঙ্গে, শিক্ষকদের সঙ্গে, অগ্রজদের সঙ্গে এইরকম 'অসভ্য, অসংযত, অশালীন' ব্যবহারের আমরা নিন্দা করি, কিন্তু ভেবে দেখি না, এর কারণ কী। যে প্রশ্ন তারা করে তার উত্তর আমরা জানি না। দিতে পারি না। তার ফলে নিজেদের অজ্ঞতা, অক্ষমতা আমাদের ক্রোধ ও অসহিষ্ণু ব্যবহারে প্রকাশ পায়। এই প্রসঙ্গে দুটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ে।

হায়দরাবাদে 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারা ও তার মূল্যায়ণ' সম্পর্কে একটি বড় সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়েছিলাম। সম্মেলনটি হচ্ছিল হায়দরাবাদের রামকৃষ্ণ মিশনের সভাগৃহে। কলকাতা থেকে শঙ্করীপ্রসাদ বসু, সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক অমিতাভ মুখোপাধ্যায়ও গিয়েছিলেন, দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের বহু খ্যাতনামা অধ্যাপক বুদ্ধিজীবী এবং সন্ন্যাসীরা এসেছিলেন। সভাগৃহে আসন সংখ্যা ছিল আনুমানিক ১৪০০। তিল ধারণের স্থান ছিল না। বহু শ্রোতা দাঁড়িয়ে ও মেঝেতে বসে গভীর আগ্রহে বক্তৃতা শুনছিলেন। দু'দিন ব্যাপী সম্মেলনের পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন স্বামী রঙ্গনাথানন্দ। সহায়তায় ছিলেন স্বামী

ভিতাত্মানন্দ ও হায়দরাবাদ মঠের অন্য সন্ন্যাসীরা। তাঁরা কিন্তু সম্মেলনে বক্তৃতা আলোচনায় কোনও অংশগ্রহণ করেননি। রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের তৎকালীন অধ্যক্ষ প্রয়াত স্বামী বীরেশ্বরানন্দর সেইরকম নির্দেশ ছিল। ওই সময় একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল সারা ভারতবর্ষ এবং ভারতের বাইরে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারার প্রভাব ও তার প্রয়োজন সম্পর্কে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে মঠ-মিশনের সাধু নন এমন শিক্ষাবিদ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় এই উদ্দেশ্যে সম্মেলন ও আলোচনায় যোগদান করে তাঁদের বক্তব্য রাখবেন। প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ প্রয়াত অধ্যাপক এ এল ব্যাশাম এই উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত এক আন্তর্জাতিক কমিটির সভাপতি হয়েছিলেন। তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়া ও কমিউনিস্ট চীনের বিশিষ্ট অধ্যাপকরাও কমিটির উপদেষ্টা ও সহ-সভাপতি রূপে যোগ দিতে সম্মত হয়েছিলেন। এছাড়া আমেরিকা, বৃটেন প্রভৃতি দেশের খ্যাতনামা ব্যক্তিরাও কমিটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। উদ্যোগের পিছনে সক্রিয় সহযোগিতা ও উৎসাহ দিয়েছিলেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ও রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অফ কালচারের তরুণ উদ্যাগী সন্ন্যাসী শঙ্কর মহারাজ (বর্তমানে স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ)।

প্রথম দিনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানের পর প্রায় কুড়ি পঁচিশ জন যুবক আমাদের ঘিরে ধরে কয়েকটি প্রশ্ন করেছিল। তারা প্রায় সবাই কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। চোখে-মুখে গভীর আগ্রহ ও ঔৎসুক্যের ছাপ। তাদের প্রশ্ন ছিল, "আপনাদের সব বক্তৃতা-আলোচনা শুনে আমাদের খুব ভালো লেগেছে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনলাম, জানলাম, আরও জানতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু একটি প্রশ্নের উত্তর জানতে আপনাদের কাছে এসেছি। আপনারা যেখানে এই সম্মেলন করছেন সেই শহরেরই আর একদিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হচ্ছে। এক সম্প্রদায়ের মানুষ আর এক সম্প্রদায়ের মানুষকে হত্যা করছে। সব বাড়ি পুড়িয়ে দিচ্ছে। প্রতি বছরই এইরকম হয়। এর কী প্রতিকার? যাঁরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রেম-ভালবাসা-ভ্রাতৃত্বের বন্ধন, সর্বধর্মের সমন্বয়ের কথা বলেন তাঁরা এ বিষয়ে কার্যকর কিছু করতে পারেন কি? কেন মানুষের মনে তাঁদের প্রভাব তেমনভাবে পড়ছে না? আজকের সভায় যে এত মানুষ এলেন তাঁদের করণীয় কিছু নেই? রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের শিক্ষার সার্থক প্রয়োগ তেমন দেখি না কেন? এই বিষয়ে আপনারা কী ভাবছেন?" ওই যুবকদের অত আগ্রহ ও গভীরভাবে চিন্তা করতে দেখে আমরা অভিভূত হয়েছিলাম। কিন্তু একই সঙ্গে মনে মনে বিব্রত বোধ করেছিলাম তাদের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর না দিতে পেরে।

অন্যটি পুরুলিয়ার রামকৃষ্ণ মিশনে একটি সভার পরের ঘটনা। পুরুলিয়ার রামকৃষ্ণ মিশনে স্কুলের ছাত্ররা সকলেই মেধাবী। উজ্জ্বল তাদের চোখ-মুখ। ছাত্রদের সামনে ভাষণ দেওয়ার পর আমরা কজন মিশনের অধ্যক্ষ উমানন্দজি মহারাজ, কয়েকজন সন্ন্যাসী ও শিক্ষকের সঙ্গে চা পান করছিলাম। এমন সময় কয়েকজন ছাত্র, ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল আমাদের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বলবে বলে। আমরা সানন্দে তাদের ডাকলাম। ঘরে ঢুকে উমানন্দজি ও অন্য সন্ন্যাসীদের সামনে কথা বলতে তারা দ্বিধা বোধ করছিল। উমানন্দজি তাদের অভয় দিয়ে বললেন, 'সঙ্কোচ করছ কেন? যা জিজ্ঞাসা করতে চাও কর।'

এ কথা সে কথার পর একটি ছাত্র ভয়ে ভয়ে বলল, "স্যার একটা প্রশ্ন করব? আমি খুব সমস্যার মধ্যে আছি। কী করব বুঝতে পারছি না। তাই আপনাদের জিজ্ঞাসা করতে চাইছি।"

জিজ্ঞাসা করতে ছেলেটি বলল, "আমি এক সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। বাবা সামান্য চাকরি করতেন। আমরা দু'ভাই। বাবা অনেক কষ্ট করে দাদাকে পড়িয়েছেন। আমাকে পড়াচ্ছেন। বাবা চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন কিছুদিন আগে। দাদা ইঞ্জিনিয়ার হয়ে একটি ভাল চাকরি পায়। বাবা-মা খুব খুশি হয়েছিলেন। ভেবেছিলেন ভাল কাজ পেয়েছে, কোনও সমস্যা হবে না। কিন্তু কিছুদিন পর দাদা কাজ ছেড়ে দেয়। অফিসে এত দুর্নীতি ও অসৎ

সহকর্মী যে তা মেনে নিয়ে তার পক্ষে কাজ করা সম্ভব হয়নি। বাবা ও মা বকাবকি করে, অনেক বুঝিয়েও দাদার মত পরিবর্তন করাতে পারেননি। সংসারে যত দুঃখ কষ্ট হোক না কেন দাদা কিছুতেই অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করতে রাজি হয়নি। এখন খুব অল্প মাইনের একটি কাজ করে। সংসার খুবই অসুবিধার মধ্যে পড়েছে। এখন বাবা ও মা চেয়ে আছেন ছোট ছেলের দিকে। পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলে পড়ছে। ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলে তাঁরা আশা করছেন।"

ছেলেটি উদ্বেগ-আশঙ্কায় মানসিকভাবে জর্জরিত। সে কী করবে? দাদার মত ও পথ বেছে নেবে, না, বাবা ও মার কথা ভেবে ভবিষ্যতে আপোশ করে চলবে। আমাদের কাছ তার জিজ্ঞাসা, কোন সিদ্ধান্ত তার নেওয়া সঠিক হবে।

আমরা, অন্য পাঁচজনে যা বলে থাকেন, লেখা ও ভাষণে বলেন, তাই বলেছিলাম ছেলেটিকে। বলেছিলাম স্বামীজির কথা — সত্যের জন্যে সব কিছু ত্যাগ করা যায়, কোনও কিছুর মধ্যেই সত্যকে ত্যাগ করা যায় না। জীবনে লড়াই করতে হবে। যে কোনও দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হবে। আদর্শকে ধরে রাখতে হবে। শুধু স্বামীজিই নন, অন্য মনীষীরাও এই সব কথা বলেছেন। এ তো চিরন্তন সত্য, জীবনের মূল লক্ষ্য। কিন্তু তাতে ছেলেটির মানসিক দ্বন্দ্বের কী অবসান হয়েছিল?

মনে মনে প্রশ্ন করেছিলাম, আমরা নিজেরা কী জীবনে ওইসব কথা মেনে চলেছি, বা চলি? আমাদের কথা ওর বিশ্বাস করার কোনও কারণ আছে? বাড়িতে বাবা, মা, অভিভাবকেরা, স্কুল-কলেজে, শিক্ষক-শিক্ষিকারা, রাজনৈতিক নেতারা, সমাজের মাথারা, খ্যাতিমান কীর্তিমান বুদ্ধিজীবীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে পদস্থ ব্যক্তিরা মন ও মুখের মধ্যে মিলের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন না। কেউই করেন না তা বলব না, কেননা তাহলে ব্যক্তি এবং সমাজজীবন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হত। অল্প সংখ্যক মানুষের আচার-আচরণ, প্রাত্যহিক জীবন ও কর্মের দৃষ্টান্তই কিছু মূল্যবোধ, ন্যায়-অন্যায় বোধকে ধরে রেখেছে। কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য যে, 'দেখে শেখা ও ঠেকে শেখা' এই দুয়ের মধ্যে 'দেখে শেখার সুযোগ-সৌভাগ্য' বর্তমান কালের ছেলেমেয়েদের আর তেমন হয় না। যা তারা দেখছে তার কুফল সর্বক্ষেত্রেই ক্রমে ফুটে উঠছে। তারা 'ঠেকে শিখছে' তো প্রতিটি ক্ষেত্রে, পদে পদে। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল সকলের সম্বন্ধে অবিশ্বাস এবং অনাস্থার ভাব। শ্রদ্ধাহীনতার মনোভাব। তারই আর এক প্রতিফলন হল যে সব আদর্শ, মূল্যবোধ, নৈতিকতার কথা আমরা বলি সেই সব কিছু শুধুমাত্র শূন্যগর্ভ বাগাড়ম্বর মনে হয়। যাঁদের জীবন, আদর্শ ও উদ্ধৃতি দিয়ে আমরা বর্তমান প্রজন্মকে ওইসব কথা বলি, অনুসরণ করতে উপদেশ দিই যেমন, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, নেতাজি সুভাষ ও আরও অনেক মহান নেতা ও মনীষীরা। তাঁদের প্রতিও ছেলেমেয়েদের তেমন কোনও আকর্ষণ বা উৎসাহ বোধ জন্মায় না। বরং একপ্রকার অনীহা সৃষ্টি হয়। তাদের মনে হয় আজকের দিনে ঠিকমত বাঁচতে হলে, জীবনে উন্নতি করতে হলে ওইসব বড় বড় আদর্শের কথা -- উপদেশ কোনও কাজে লাগবে না, এই মানসিক প্রবণতা ও দৃষ্টিভঙ্গি ক্রমেই বিপজ্জনকভাবে বেড়ে চলেছে।

সমস্যাটি আর একটু স্পষ্ট করে, খোলাখুলিভাবে দেখলে ভাল হবে। কয়েকজন স্মরণীয় ও বরণীয় মানুষের মূল শিক্ষার দু'একটি বক্তব্যের কথা ধরি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন 'যত মত তত পথ', সহনশীলতা (Toleration), গ্রহণ করা (Acceptance) এবং আত্মস্থ (Assimilation) করার কথা। ভিন্ন ভিন্ন মত, পথ ও বিশ্বাসকে শুধুমাত্র সহ্য করা নয়, সেগুলিকে গ্রহণ করতে ও আত্মস্থ করতে হবে এমনভাবে যার ফলে এক বিশ্বজনীন ধর্ম (Universal Religion) গড়ে ওঠে। অসীম করুণা ও সর্বজনের প্রতি ভালবাসাই হল তাঁর মর্মবাণী। স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর বার্তা সারা বিশ্বে বহন করেছিলেন। তিনি

'আস্তিক' ও 'নাস্তিক' কথা দুটির নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছিলেন, "পুরাতন ধর্ম বলে, যে ঈশ্বরে 'বিশ্বাস করে সে 'আস্তিক', যে ঈশ্বর 'বিশ্বাসী নয় সে 'নাস্তিক।' কিন্তু নতুন ধর্ম বলে, যে নিজেকে বিশ্বাস করে না সে 'নাস্তিক'। যে নিজেকে বিশ্বাস করে সেই 'আস্তিক'।" রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ ভাষণে বলেছিলেন, "মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো সবচেয়ে বড় পাপ। সেই পাপ আমি করব না।" শ্রীঅরবিন্দ 'দিব্য-জীবনসাধনা'র কথা বলেছিলেন। গান্ধীজির মূল শিক্ষা ছিল 'অহিংসা' ও 'শান্তি'। তিনি বলেছিলেন, "আমার জীবনই আমার বাণী।"

এইসব মহান মানুষের শাশ্বত বাণীর কতটুকু প্রাসঙ্গিকতা আমরা লক্ষ্য করছি? যদি এঁদের জীবন ও সাধনার মর্মকথা আজকের প্রজন্মের কাছে অলীক অসার মনে হয়ে থাকে তার জন্যে দায়ী কি তারা, না আমরা? আমরা অর্থে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্বকালে এবং তার অব্যবহিত পরে যারা জন্মেছে। সামগ্রিকভাবে, আমরা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছি রাষ্ট্র পরিচালনায়, জন জীবনে, সামাজিক ও ব্যক্তি জীবনে ওইসব আদর্শের কোনও অর্থবহ ছাপ রাখতে। ১৯৪১ সালে রবীন্দ্রনাথ মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানোর যে পাপের কথা বলেছিলেন, তার বহু পূর্বে নিজের ওপর বিশ্বাস হারানোর যে নাস্তিকতার কথা বিবেকানন্দ বলেছিলেন তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও স্বাধীনোত্তর যুগে কমতে কমতে একেবারে তলানিতে এসে পৌঁছেছে। নেতাজি সুভাষ স্বাধীনতার রক্তদানের আহ্বান জানিয়েছিলেন। আজ রক্তদানের বদলে নিজের ও দলের স্বার্থে রক্তপাতই স্বাভাবিক ঘটনা বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। অন্যের ওপর বিশ্বাস (সে যে কোনও পদমর্যাদা বা সামাজিক প্রতিষ্ঠার মানুষ হোক না কেন) প্রায় সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গেছে। নিজের ওপর 'বিশ্বাস' কার্যত নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে যে কোনও উপায় গ্রহণের স্থির সঙ্কল্পের রূপ নিয়েছে। 'ভাল মানুষ', 'বড় বড় নীতি কথার যুগ' আর নেই, এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে।

এই পরিবর্তন না হয়ে উপায় ছিল না। তার একটি কারণ অবশ্যই হল যুগ প্রভাব। একটি সহস্রাব্দ (millennium) ও একটি শতাব্দীর অবসানে এক নতুন সহস্রাব্দ ও শতাব্দীর যুগ সন্ধিক্ষণে এই পট পরিবর্তন, আদর্শ, মূল্যবোধ ও জীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে সংশয় ও দ্বন্দ্ব অনিবার্য। এই বড় প্রশ্ন কিন্তু আলোচ্য বিষয় নয়। প্রশ্ন হল আমাদের আত্ম-সমীক্ষার ও আত্মানুসন্ধানের, একবার পিছনে ফিরে দেখার। বিশেষ করে স্বাধীনতার পববর্তী অর্ধশতাব্দীর দিকে তাকিয়ে ভেবে দেখা। আমি নিজে সারা জীবন শিক্ষকতা করেছি। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে শিক্ষকদের সম্পর্ক মাছ ও জলের মত। তাই স্মৃতিচারণধর্মী কোনও লেখায় এই দিকটি সর্বাগ্রে এসে পড়ে। একটি আপ্তবাক্য আছে — একজন ছাত্রের জীবনে শিক্ষকের প্রভাব কখন শেষ হয়ে যায় তা নির্ণয় করা যায় না। সুস্থ একজন নাগরিক গড়ে তোলায় সর্বাধিক প্রভাব শিক্ষকের। ব্রিটেনের প্রখ্যাত প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন ডিজরেলী বলেছিলেন, "একটি ভাল বই নিঃসন্দেহে ভাল জিনিস। তবে একজন মহান ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলা তার চেয়েও ভাল।" আমি পড়াশোনা করেছি হাওড়ার বিবেকানন্দ স্কুলে। স্কুলের বাড়ি ঘর, আসবাবপত্র, ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি ইত্যাদি কোনও কিছুই দেখার বা বলার মত ছিল না। ভাড়াটে বাড়ি। রঙ করার, সংস্কার করার বালাই ছিল না, কোনও কোনও ক্লাস রুম অন্ধকার, আলো বাতাস প্রায় ঢোকে না। টালির চাল। হেডমাস্টার মশায়ের ঘর এত ছোট যে তাঁর ঘরে একটি মাত্র অতিরিক্ত চেয়ার। দু'চার জন্যের বেশি দাঁড়াবার জায়গা পর্যন্ত নেই। স্কুলের মাস্টার মশাইদের মধ্যে কে যে কী পাশ, কে কেমন ছাত্র ছিলেন, কোন বিভাগে পাশ করেছিলেন — তার কোনও ধারণা আমাদের ম্যাট্রিক পাশ করা পর্যন্ত ছিল না। কোনও কৌতূহল পর্যন্ত ছিল না জানার। এখন তো স্কুলের ছেলেমেয়েদের শিক্ষক শিক্ষিকাদের কে কি পাশ তা জানা। কলেজের ছেলেমেয়েদের অনেকেরই তো অধ্যাপকদের Bio-data সব মুখস্থ! কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই তারা অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের নাম জানে না। 'অশোক কুমার ঘোষ' এ কে জি (A.

K. G) বা বন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় 'বিবি' (B B) নামেই চেনা। পাশ করে যাওয়ার পরেও। এর কারণ অধ্যাপক তাঁর ছাত্রছাত্রীদের মনে সে রকম কোনও দাগ কাটতে পারেননি-- কী পড়ানোয়, কি চরিত্রগুণে। কিংবা ক্লাসে ছাত্রছাত্রীর লেকচার শোনা এতই অপ্রাসঙ্গিক এবং অপ্রয়োজন যে অধ্যাপকের নাম জানা তাঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার চিন্তা পর্যন্ত উদয় হয়নি।

যে কথা বলছিলাম তাতে ফিরে আসি। আমাদের একজন শিক্ষক ছিলেন -- অবনীবাবু। খুব প্রিয় শিক্ষক, তখন চীন-জাপান যুদ্ধ চলেছে। জাপান চীন আক্রমণ করেছে। অবনীবাবু চীনের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের প্রবল সমর্থক। যে দিন আমাদের ক্লাসে পড়াশোনার ইচ্ছা হত না সেদিন আমাদের কেউ একজন উঠে দাঁড়িয়ে মাস্টার মশাইকে বলতো, "স্যার, জাপান খুব শক্তিশালী দেশ, চীনারা ওদের সঙ্গে পারবে না", সঙ্গে সঙ্গে অবনীবাবু গর্জন করে উঠতেন, "বোকার মতো না জেনে কথা বলবি না, মূখ্যু কোথাকার।" তারপর শুরু করতেন চীনের কথা। কেন ওই যুদ্ধ এত গুরুত্বপূর্ণ, চীন কেন হারতে পারে না ইত্যাদি। সে দিনের মতো পড়ার ইতি। কিন্তু পরে বুঝেছি, সেদিন পড়ার ইতি হয়নি। জানার ইচ্ছার শুরু হয়েছিল। এরকম বহু ঘটনা মনে পড়ে আরও অনেক শিক্ষকদের সম্পর্কে। একদিন হঠাৎ স্কুলে গিয়ে শুনলাম অবনীবাবু B.A পাশ করেছেন Distinction নিয়ে। শুনে তো অবাক। অবনীবাবু যে B.A. পাশ নন তাই তো জানতাম না এতদিন। এত দেশের এত কথা। উনি জানেন, এত ভাল পড়ান, এত ভালবাসেন এই পরিচয়েই আমরা মুগ্ধ ছিলাম। ক'দিন পরে খুব হৈ চৈ করে অবনীবাবুকে ছাত্ররা সংবর্ধনা জানিয়েছিল।

কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে স্কুল কলেজে পড়ারই সময় ডিজরেলির ভাষায় 'মহান ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলার' কোনও সুযোগ পাইনি। দূর থেকে স্কুলের সভা-সমিতি উৎসবে অবশ্য খুব "নামকরা" কিছু মানুষকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। কিন্তু প্রকৃত কিছু "মহান" শিক্ষককে কাছ থেকে দেখার কথা বলার ও অসীম ভালবাসা পাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। তাঁদের আচরণে, কথাবার্তায়, জীবনযাত্রায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শের বাস্তব দৃষ্টান্ত দেখেছিলাম। তখন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্বন্ধে পড়াশোনা বেশি করিনি। দেখে শিখেছিলাম হেডমাস্টার মশাই সুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য, হিমাংশুশেখর ভট্টাচার্য, মৃগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কাছে। কলেজ জীবনেও সুযোগ হয়েছিল বেশ কিছু শিক্ষকের সান্নিধ্য ও স্নেহ পাওয়ার যেমন বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য, নিশীথরঞ্জন রায়, ফণিভূষণ সান্যাল। আমাদের মতো যারা স্কুল-কলেজ জীবনে ওই সুযোগ পেয়েছিল তাদের সকলেই যে পরে খুব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বা আদর্শ চরিত্রের মানুষ হয়েছিল তা নয়। তবে অনেকেরই মনে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, গান্ধী-সুভাষ বা রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের, একটা ছাপ পড়ে গিয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। গত পঞ্চাশ বছরে স্কুল-কলেজে পড়াশোনায়, শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্কের ফলে সেই রকম ছাপ আর তেমন পড়ছে না। এর দায়িত্ব প্রধানত কার-- শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষকদের, না ছাত্র-ছাত্রীদের? ছাত্র-ছাত্রীদের সম্পূর্ণ দায়মুক্ত না বললেও নির্দ্বিধায় বলা যায়, যে এই ব্যর্থতার সিংহভাগ নিতে হবে শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষকদের।

অষ্টাদশ শতকের এক আমেরিকান লেখিকা, লিডিয়া সিগোরনি (Lydia Sigovrney) বলেছিলেন যে, শিক্ষকদের সবচেয়ে বেশি সম্মান করা উচিত। দেশের আইন রচনায়, অপরাধ নিবারণে, সামাজিক পরিবেশ উন্নয়নে ও সারা দেশের হৃদয়ে প্রাণশক্তি ও বিশুদ্ধতা সঞ্চারে শিক্ষকদের ভূমিকাই সর্বাগ্রে। ওই আমেরিকান লেখিকার উল্লেখের প্রয়োজন ছিল না। বহু শত বছর পূর্ব থেকে শুরু করে আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ও গান্ধীজির মত মনীষী ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা ওই কথা বারবার বলেছেন। শুধু বলেননি, নিজেরা হাতে নাতে তা করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। তবুও শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের ব্যর্থতা কত প্রকট তা বলার অপেক্ষা রাখে না। শিক্ষকদের জীবনের প্রয়োজন ও চাহিদা অন্যান্য জীবিকার মানুষের

মতই। তারা ন্যায্য বেতন ও সুখ-সুবিধা চাইবেন, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য প্রত্যাশা করবেন। তার মধ্যে অন্যায় বা অস্বাভাবিক কিছু নেই। কিন্তু তবুও সমাজে বিশেষ সম্মান পেতে হলে, মানুষ গড়ার কারিগর-এর স্বীকৃতি পেতে হলে, অতিরিক্ত কিছু দায়িত্ব এসে পড়ে। তা অস্বীকার করলে মর্যাদাহানী ঘটবেই। আজ সমগ্র পরীক্ষা ব্যবস্থা, পরীক্ষাপত্র দেখার ক্ষেত্রে দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, শিক্ষাদানের অনিয়ম ও অমনযোগ, নিজের 'কোচিং ক্লাসে'র প্রতি অধিকতর মনোযোগ, দলীয় স্বার্থে শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষতিসাধন, অন্য যে কোনও জীবিকা বা পেশায় নিযুক্তদের মতো ধর্মঘট বা কর্মবিরতির সিদ্ধান্ত, উচ্চহারের বেতনক্রম (Pay Scale) গ্রহণে ব্যগ্রতা, কিন্তু 'আচরণবিধি' (Code of conduct) ও পঠন-পাঠনের মান পরীক্ষার নিয়মাবলী প্রবর্তনে ঔদাসীন্য শিক্ষক সমাজের সম্মানহানী করেছে। কথায় আছে, "একমাত্র সৎ ব্যক্তিরাই অন্যকে কঠোরভাবে তিরস্কার করতে পারে।" এই তিরস্কার করার নৈতিক অধিকার শিক্ষকরা হারিয়ে ফেলছেন। আরো উদ্বেগ ও দুঃখজনক ঘটনা হল বহু ক্ষেত্রে পিতা-মাতা ও পরিবারের অন্যান্য অগ্রজদেরও তাঁদের পুত্র কন্যাদেরও বয়ঃকনিষ্ঠ স্নেহাস্পদদের নিন্দা-সমালোচনা করার উপদেশ দেবার নৈতিক অধিকার নেই।

শৈশবে লেখাপড়া শেখা শুরু হয় বাবা ও মার কাছে। বিশেষ করে মার কাছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছেলেবেলা'য় লিখেছেন, "শিশুদের মন-ভোলানো প্রথম সাহিত্য শেখানো মায়ের মুখে ছড়া দিয়ে, শিশুর মন-ভোলানো গান শেখানোর শুরু সেই ছড়ায়।" 'শিক্ষা বিধি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ শিশুর শিক্ষারম্ভ প্রসঙ্গে বলেছেন, "শিশুদের পালন ও শিক্ষণের যথার্থ ভার পিতামাতার উপর। কিন্তু পিতামাতার সে যোগ্যতা অথবা সুবিধা না থাকাতেই, অন্য উপযুক্ত লোকের সহায়তা আবশ্যক হইয়া উঠে। এমন অবস্থায় গুরুকে পিতামাতা না হইলে চলে না।" কিন্তু বাবা-মার বিকল্প হয়ে গুরুর ভূমিকা নিতে পারে এমন শিক্ষকের সন্ধান স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্বভারতীতে সহজে পাননি। তাঁর জীবনের শেষ দিকে তিনি বিশ্বভারতী নিয়েও উদ্বেগের মধ্যে পড়েছিলেন। সুতরাং ক্রমে ক্রমে তেমন শিক্ষক, বিশেষ করে গৃহ শিক্ষক, পাওয়া আরও কঠিন হয়ে পড়ছিল। এখন কঠিনতর হয়ে পড়ছে তারই সঙ্গে আজকের বাবা-মারা নানান কারণে নিজেদের ছেলেমেয়েদের দিকে নজর রাখার সময় পাচ্ছেন না। অনেকে সময় দিচ্ছেন না। আর্থিক সংগতি থাকলে 'Private Tktor', 'Coaching Class'-এর ব্যবস্থা করে দায়িত্ব পালন করছেন। স্কুল-কলেজেই যে পড়াশোনার কাজ সুষ্ঠুভাবে হওয়ার কথা তা না হওয়ায় ছেলেমেয়েরা বাধ্য হচ্ছে বাড়িতে বা কোচিং ক্লাসে শিক্ষকের সাহায্য নিতে। অভিভাবকদের আর্থিক সংগতি না থাকলেও তাঁরা বাধ্য হচ্ছেন এক বিরাট বাড়তি আর্থিক চাপ বহন করতে। এর ক্ষতিকর বিভিন্ন দিকগুলির প্রসঙ্গ বাদ দিলেও একটি মস্তবড় ক্ষতির কথা উল্লেখ করা দরকার। এটির সঙ্গে বর্তমান কালের যে সঙ্কটের কথা আমরা ভাবছি তার নিকট সম্পর্ক আছে।

এই ক্ষতির বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "মানুষ মানুষের কাছ থেকেই শেখে, যেমন জলেতেই জলাশয় পূর্ণ হয় ; শিখার দ্বারাই শিখা জ্বলে ওঠে।" এর একমাত্র প্রতিকার, আংশিক হলেও, করতে পারেন পিতা-মাতা, পরিবারের অগ্রজ কেউ যেমন দাদা, দিদি, কাকা -- যাঁদের সঙ্গে নিবিড় স্নেহের সম্পর্ক রয়েছে। সৌভাগ্যক্রমে ঠাকুমা-দাদু, দিদিমার কাছে বসে প্রথম শিক্ষার সুযোগ কেউ যদি পায় তাহলে সে শিশু ভাগ্যবান। তার পিতা-মাতাও। যদি পরিবারে এমন কেউ না থাকেন যিনি বাড়ির শিশুদের সেইটুকু শিক্ষা দিতে পারেন তাহলে তা দুর্ভাগ্যের কথা। পিতা-মাতা যদি পুত্র-কন্যার লেখা-পড়া, স্কুল-কলেজের পড়াশোনা তাদের প্রাত্যহিক জীবন, কোন বিষয়ে তাদের আগ্রহ-উৎসাহ জন্মাচ্ছে, কাদের সঙ্গে মেলামেশা করছে, বন্ধুত্ব গড়ে উঠছে এইসব বিষয়ে সস্নেহ সতর্ক দৃষ্টি রাখেন তাহলেও,

প্রথাগত শিক্ষার ক্ষেত্রে কোনও প্রত্যক্ষ সহায়তা না করলেও, পুত্রকন্যার জীবন শিক্ষা ও তাদের গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নিতে পারেন।

একটি দৃষ্টান্ত দিতে পারি। এটি আমাব নিজের অভিজ্ঞতা হলেও, এই অভিজ্ঞতা বহু পরিবারের। আমাব মার খুব কম বয়সে বিবাহ হয়েছিল। চতুর্থ শ্রেণীর বেশি পড়তে পারেননি। কিন্তু মা খুব ভালভাবেই বাংলা পড়তে ও লিখতে পারতেন। সারা জীবন বৃহৎ পরিবারের সব দায়-দায়িত্ব পালন করেও প্রচুর পড়াশোনা করতেন। মার বাক্‌পটুতা ছিল অসাধারণ, রামায়ণ-মহাভারত, পুরান, পঞ্চতন্ত্র, রূপকথা, লোককাহিনী, দেবদেবীর গল্প-উপাখ্যান, ব্রত কথা, ছড়া, বাংলা প্রবাদ, উপমা ছিল তাঁর কণ্ঠস্থ। অফুরন্ত ভাণ্ডার। আমার পুত্র, এক ভাইঝি ও ভাইপো সময় পেলেই তাদের 'নানাভাই'-এর কাছে বসে সেই সব গল্প শুনত। মা-ও সানন্দে ক্লান্তিহীনভাবে গল্পের পর গল্প বলে যেতেন। এই ছেলেমেয়েরা সকলেই বড় হয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উচ্চশিক্ষা লাভ করেছে। তাদের ঠাকুমার কাছে শৈশবে ও কৈশোরে যে শিক্ষা তারা পেয়েছিল তার মূল্য ছিল অসীম। 'মানুষ মানুষের কাছ থেকেই শেখে' -- এই কথাটি কত সত্যি তা আমি আমার নিজের পরিবারে ও পরিচিত অন্য পরিবারে দেখেছি। কিন্তু কালক্রমে সেই বৃহৎ যৌথ পরিবার ক্রমশ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে, ব্যক্তিস্বার্থকেন্দ্রিক চিন্তার প্রাধান্যে যৌথ পরিবার ভেঙে পড়ছে। সুখি যৌথ পরিবার অমৃত বৃক্ষ, অসুখি যৌথ পরিবার বিষবৃক্ষ। এখন ছোট্ট পরিবার (Nuclear Family) সবাই পছন্দ করছে। একান্ত নিজের সংসারটুকু ছাড়া বৃহত্তর পরিবারের, ছোট ছোট নাবালক ভাই, অবিবাহিত বোন, বেকার ভাই, আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত কোনও নিকট আত্মীয়, এমন কি বহু ক্ষেত্রে বৃদ্ধ, ভগ্নস্বাস্থ্য পিতা-মাতার দায়দায়িত্ব পালনে অনীহা প্রবলতর হয়ে উঠছে। এই সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশে, ব্যক্তি স্বার্থসর্বস্ব পরিমণ্ডলে যে প্রজন্ম গড়ে উঠছে তাদের কাছে আমরা কতটা মূল্যবোধ, ও ন্যায়-নীতির প্রতি নিষ্ঠা বা বিশ্বাস আশা করতে পারি? শুধুমাত্র তাদের ওপর সব দোষ দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে আমরা কি আত্মসন্তুষ্টি ভোগ করব?

এক শিক্ষাবিদ বলেছিলেন, "পরিবারের সকলে যেখানে একত্রে গল্পগুজব করছে, সেটাই সবচেয়ে ভাল স্কুল।" এই ভাল স্কুলে ভরতি হওয়ার সমস্যা নেই, কোনও টাকাকড়ি খরচ নেই। কটি পরিবারে এই স্কুল গড়ে উঠেছে, স্কুলের দুই প্রধান, বাবা ও মা তাঁদের দায়িত্ব পালন করছেন? সিডনি হ্যারিসের কথায়, "সেই পিতা-মাতার জুটিই শ্রেষ্ঠ, যেখানে পিতার কড়া শাসনের তলায় রয়েছে কোমলতা আর মার কোমল মনের গভীরে রয়েছে দৃঢ়তা।" এই উপমা বর্তমান যুগে হয়ত সম্পূর্ণ প্রযোজ্য নয়, কিন্তু মূল কথাটি অচল হয়ে যায়নি। Home University is the best University — এই সত্যটি কিন্তু প্রাচ্য পাশ্চাত্য তথা সারা বিশ্বে স্বীকৃত। Broken home-এ একটি সম্পূর্ণ সুস্থ মানসিকতার সন্তান গড়ে ওটা খুবই কঠিন। সামাজিক চিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় অনেক অসুবিধার মধ্যেও আজকালকার মায়েরা পরিবার ও সন্তান-সন্ততির প্রতি যে দায়িত্ব পালন করছেন, পিতারা তুলনামূলকভাবে তা করেন না। বিত্তশালী, স্বচ্ছল পরিবারের ক্ষেত্রে এটি বেশি প্রযোজ্য।

ছেলেমেয়েদের মধ্যে আদর্শ, কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা, বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা, সৌজন্য প্রকাশের অভাব, দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ইত্যাদির প্রবণতা দেখে বড়রা খুবই উদ্বিগ্ন। নিন্দা-সমালোচনায় মুখর। কেন এমন অধঃপতন, ক্ষয়িষ্ণুতা, অরাজকতার লক্ষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে সে নিয়ে বিচাব বিশ্লেষণ বিতর্কের অন্ত নেই। দোষী সাব্যস্ত হচ্ছে আজকালকার ছেলেমেয়েরা। এই পরিবেশ কেন সৃষ্টি হয়েছে, কেন আরো খারাপ হচ্ছে তার পিছনে বেকার সমস্যা, আর্থিক ও সামাজিক অন্যায়, বৈষম্য, রাজনীতি, শিক্ষা, প্রশাসনের সর্বস্তরে দুর্নীতি, ভ্রষ্টাচার ও দুর্বৃত্তায়ন আছে সে নিয়ে দ্বিমত নেই। কিন্তু কিছু সহজ প্রশ্ন আমরা কখনো

নিজেদের করি না। প্রশ্ন করলে আমরা বলি, "আমি কি করতে পারি? আমি তো ক্ষুদ্র মানুষ, আমার কথা কে শুনবে? বড় বড় নেতারাই যখন চোর জোচ্চর, দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে তখন আমরা তো কোন চুনোপুঁটি। আরো কত কি দেখব কে জানে! সারা দেশটাই একেবারে শেষ হয়ে গেল।"

এ সবই সত্যি কথা। কিন্তু আপনার নিজের পরিবার, নিজের ছেলে-মেয়েদের ওপর আপনার কিছুটা প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ কি নেই? নিজের গৃহে, কর্মক্ষেত্রে, প্রাত্যহিক আচার-ব্যবহারে আপনি কী দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন? আপনি নিজে কারণে-অকারণে মিথ্যা কথা বলেন। আপনি নির্দিষ্ট সময়ে কর্মস্থানে যান? আপনার সময়জ্ঞান কতখানি। আপনি তো রবীন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের পথের কথা বলেন। সব সভা-সমিতিতে যান। কিন্তু আপনার আচার-আচরণে তার কতটুকু প্রকাশ পায়? আপনি কি দুর্নীতি মুক্ত? আপনি তো 'কর্মসংস্কৃতি' (Work Culture) নেই বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন? কিন্তু আপনি যে কাজই করুন না কেন, আপনার যে পেশাই হোক না কেন আপনি নিজে কোন্ নজির সৃষ্টি করছেন আপনার পরিবারের কাছে? আপনি কী আপনার পুত্রের বিবাহে পণ নিয়েছেন? জাত-পাত-সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে, মুখে নয়, কাজে ও চিন্তায়? আপনার অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ পিতা-মাতা আপনার পরিবারে কতটুকু মর্যাদা পান? আপনার যে অতীত ছেলে-মেয়েরা জানে, প্রত্যক্ষ করেছে, তা তাদের মনে কী ছাপ রেখেছে? আমরা এইসব প্রশ্ন শুনতে পছন্দ করি না। আয়নায় নিজেকে দেখতে চাই না।

আর একটি প্রশ্ন। বাড়ির বড়রা কতটুকু সময় ছোটদের সঙ্গে কাটান? সবাই একসঙ্গে বসে গল্পগুজব করার সময় আমরা পাই কি? যতই কর্মব্যস্ত থাকুন না কেন, অন্তত কিছু সময় এর জন্যে দিতে হবে। এটা আমরা জেনেও জানি না। তার থেকে অনেক সহজ হল আজকালকার ছেলেমেয়েদের 'যুগপ্রভাব'কে দায়ী করে নিজে খালাস হওয়া। একটি কথা আছে-- সবাই শুনেছে। 'স্নেহ নিম্নগামী। এখন ওই আপ্তবাক্য আর ঠিক নয়। বরং 'নিন্দা-সমালোচনা নিম্নগামী' বললে সমাজের সঠিক বিশ্লেষণ করা হবে।

আধুনিক সমাজের চিত্র বিশ্লেষণে দুটি প্রসঙ্গ অনিবার্যভাবে ওঠে। একটি হল অপ্সংস্কৃতি ও টিভি এবং সিনেমার কু-প্রভাব। অন্যটি হল বল্গাহীন 'ভোগবাদ' (Consumerism)। সংস্কৃতি 'অপ' হয় না। 'অপসংস্কৃতি' কথাটির মধ্যে স্ব-বিরোধ আছে। সে প্রসঙ্গ থাক। যেটি মনে রাখা প্রয়োজন, তাহল, আমরা পছন্দ করি না করি, চাই-না চাই, টিভি ও 'সিনেমাকে ঠেকিয়ে রাখার কোনও উপায় নেই। টিভির অনুষ্ঠানের মান ও রুচি সম্বন্ধে কিছু সতর্কতা, বাধা নিষেধ পাশ্চাত্য দেশেও আছে। আমাদের দেশেও তার প্রয়োজন আছে। কিন্তু তার কার্যকারিতা খুবই সীমাবদ্ধ। বাড়িতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের টিভি/সিনেমা দেখার ওপর নজর ও নিয়ন্ত্রণ অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু ওই রকম বাধা-নিষেধ সুচিন্তিত ও পরিমিত না হলে অপরিণত কৌতূহলী মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত গৃহ পরিবেশের বাইরে যখন তারা যাবে, টিভির সব রকমের অনুষ্ঠান অবাধে দেখার সুযোগ পাবে, তখন তার পরিণাম হবে অনেক বেশি ক্ষতিকর। অভিভাবকদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সজাগ দৃষ্টির সামনে ছেলেমেয়েদের ভালো ও মন্দ নিজেই বিচার করা শিখতে হবে। সব কিছু নিয়ন্ত্রিত কাঁচের ঘরের মধ্যে গুরুতর অসুস্থ ব্যক্তিকে কিছু কাল রাখার প্রয়োজন হতে পারে। চিরকাল রাখা সম্ভব নয়। ধীরে ধীরে খোলা আকাশ, বাতাস, রোদ, জল-বৃষ্টি, ধুলো-কাদার মধ্যে স্বাভাবিকভাবে চলা-ফেরা, বাঁচা না শিখলে মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা অনেক বেশি।

তেমনি বর্তমান যুগে, বিংশ শতাব্দীর শেষে একবিংশ শতাব্দীর আসন্ন সূচনাকালে ছেলেমেয়েদের 'ভোগবাদ' সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ নিরাসক্ত করে গড়ে তোলার চিন্তাও

অবাস্তব। জীবনযাপনের মান উন্নয়নের (Quality of life) প্রচেষ্টা, উচ্চাশা, ভোগাপণ্যের প্রতি আকর্ষণ, বর্তমান এবং আগামী প্রজন্মের কাছে দুর্বার। এই প্রত্যাশা ও প্রচেষ্টা অস্বাভাবিক, সকল ক্ষেত্রে নিন্দনীয় নয়। কম্পিউটর, ফ্যাক্স, ই-মেল, ক্যালকুলেটর, টেলিভিশন, রোবট, ভিডিও, ছেলে-মেয়েদের মেলামেশা, পছন্দমত বিবাহের স্বাধীনতা, নিজের জীবন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকাব শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতির বিষয়ে মুক্ত চিন্তা অপ্রতিরোধ্য। সমুদ্রের ঢেউ-এর মতো এই স্রোতকে আটকাবার চেষ্টা করলে ইতিহাসের রাজা ক্যানিউটের মতো অবস্থা হবে। রাজা ক্যানিউটকে তাঁর স্তাবকরা বুঝিয়েছিলেন যে তাঁর আদেশে সাগরের ঢেউ পর্যন্ত শান্ত হয়ে যাবে। সেই চেষ্টা করে রাজা ক্যানিউটের সব জামাকাপড় ভিজে গিয়েছিল। তিনি অপদস্থ হয়েছিলেন। তেমনি যুগপ্রবাহ ও কালের পরিবর্তনকে না মানার উপায় নেই। কিন্তু সমুদ্রস্নানের নিয়মবীতি আছে। তা জানা না থাকলে সমূহ বিপদ। সাঁতার শেখা ও অনভিজ্ঞ স্নানার্থীর পক্ষে দক্ষ নুলিয়ার সাহায্য নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের দায়িত্ব হল সাঁতার শেখানো ও নুলিয়ার ভূমিকা পালন করা। শুধু তীরে বসে ছেলে-মেয়েকে বিপন্ন হতে, স্রোতের টানে ভেসে যেতে দেখে ভর্ৎসনা বা আক্ষেপ করলে কোনও ফল হবে না।

জি য়া দ আ লি

সংখ্যালঘু রাজনীতি

সংখ্যালঘু হিসাবে বেঁচে থাকার বিড়ম্বনা কম নয়। বিশেষ করে আমাদের মতো দেশে। সাধারণভাবে দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণায় তো সব মানুষই নাজেহাল। আর দশজনের মতো সংখ্যালঘু সমাজের মানুষকে সেই সাধারণ সংকটের বোঝা তো বইতেই হয়। কিন্তু সংখ্যালঘু বলেই তার ওপর বাড়তি কিছু সংকটের বোঝা চেপে যায়।

যেমন নারীদের ক্ষেত্রে। এদেশে নারী-পুরুষ উভয়কেই সাধারণভাবে নানান সংকটের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। কিন্তু পুরুষপ্রধান সমাজে পুরুষের চেয়ে নারীর কিছু বাড়তি সংকট থেকেই যায়। অর্থাৎ নারী-পুরুষ উভয়ের সংকটের মাপ যদি হয় ৫ তাহলে আলাদা করে নারীর সংকট হয়ে যায় ৫+২=৭। সংখ্যালঘুদের দশাও তাই।

আবার নারী সাধারণভাবে নারী-সুলভ কিছুটা হীনম্মন্যতায় ভোগে। তেমনি সংখ্যালঘুও আবার সংখ্যালঘু-সুলভ মানসিকতার শিকার হয়ে পড়ে। যেমন এদেশে বেকারির সমস্যা মারাত্মক চেহারা নিয়েছে। এই মুহূর্তে (১৯৯৫) ভারতে রেজিস্ট্রিকৃত অর্থাৎ বেকাব হিসাবে সরকারের খাতায় নাম লেখানো বেকারের সংখ্যা ৩৬,৭৩৭,০০০। এর মধ্যে হিন্দু বেকার আছে। তপসিলি জাতি-উপজাতি ও জনজাতি গোষ্ঠীর লোকও বেকার হয়ে বসে আছে। আবার মুসলমান বেকারও আছে। জনসংখ্যার বিচারে যার যেমন অনুপাত সে অনুপাতেই সব সম্প্রদায়ের মধ্যেই বেকারির সংকট রয়েছে। ১টা চাকরি। ১ হাজার ছেলে পরীক্ষা দিচ্ছে। হয়তো যোগ্যতার গুণেই হিন্দু ছেলেটার চাকরি হয়ে গেল। কিন্তু সংখ্যালঘু বলেই মুসলমান ছেলেটার মনে অনেক সময় এমন ধারণাও তৈরি হয় যে, ইন্টারভিউ বোর্ডের সদস্যদের মধ্যে তো একজনও মুসলমান ছিল না। সকলেই হিন্দু। সেজন্যেই বোধ হয় চাকরিটা হলো না।

উচ্চবর্ণের হিন্দু যেভাবে তপসিলি জাতি-উপজাতি দেখলে নাক শেঁটকায় তাতে ইন্টারভিউ বোর্ডের বেশির ভাগ সদস্য যদি হয় উচ্চবর্ণের তাহলে তপসিলি জাতি-উপজাতি কর্মপ্রার্থীর ক্ষেত্রেও এমন অবিচারের কথা মনে হতে পারে।

তবে সংকট যেখানে পাহাড়প্রমাণ, এ ধরনের অবিচার যে একেবারে হয় না এমন কথা সব সময়ে বুক ঠুকে বলা যায় না। মানুষ তো সংস্কারের ওপরে সব সময় উঠতে পারে না।

যেমন কলেজ সারভিস কমিশন হওয়ার আগে কলেজের গভর্নিংবডিগুলোর যে চেহারা-চরিত্র ছিল সেখানে এরকম সংস্কার থেকেই অনেক সময় সংখ্যালঘু প্রার্থীকে বাতিল করে দেওয়া হতো। কিন্তু কলেজ সারভিস কমিশন হওয়ার পর অনেক মুসলমান ছেলে এখন যোগ্যতার ভিত্তিতেই অধ্যাপকের চাকরি পাচ্ছে। ব্যাঙ্ক সারভিস কমিশন ও পাবলিক সার্ভিস

কমিশন সম্পর্কে একথা বলা যায়। এক সময়, এমন কি এখনো দেখা যাবে বিড়লা বা বাঙুরদের কারখানায় ও অফিসে একজন মুসলমান কেরানি চাকরি করছে এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া দুষ্কর। অথচ মজুর মিস্ত্রির চাকরিতে বিশেষ করে ইলেকট্রিক মিস্ত্রির চাকরিতে মুসলমানের অনেককেই বিড়লা-বাঙুরদের কারখানায় চাকরি করতে দেখা যায়। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার। লেখা-পড়ায় অনেক বেশি যোগ্যতা নিয়েও মুসলমান প্রার্থী বিড়লা সংস্থায় কেরানি-অফিসারের চাকরি পায় না। অথচ তা চেয়ে অনেক কম যোগ্যতা নিয়েও অমুসলমান একজন কেরানি-অফিসারের চাকরি পেয়ে যায়। এ হিসাবের ব্যাখ্যা করা যাবে কোন নিয়মে?

এ রকমের সমাজিক কাণ্ডকারখানা দেখতে দেখতে কোনো কোনো মুসলমানের এমন ধারণা তৈরি হয়ে যায় যে, এদেশে মুসলমান বোধ হয় ক্যাটালিটিক এজেন্ট। অর্থাৎ সোনা গলানোর জন্য যে ধাতুটা দরকার হয়, সোনা গলানোর পরেই সেই ধাতুকে দূরে ছুড়ে ফেলে দাও। তার আর দরকার নেই।

বিশেষ করে ভোটের রাজনীতিতে এদেশে মুসলমান বা সংখ্যালঘুদের নাকি এই ক্যাটালিটিক এজেন্ট হিসাবেই ব্যবহার করা হয়। এমন ধারণা কোনো কোনো মুসলমানের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে যাচ্ছে। ডান-বাম বেশ কিছু মুসলমান নেতার মনের মধ্যে এখনো এ রকম ধারণা রয়ে গেছে। একান্তে টোকা মারলে সেই মনোভাব ধরা পড়ে যায়। তাই নির্বাচন এলেই মুসলমানের বা সংখ্যালঘুর ভোট নিয়ে হরেক কিসিমের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ চলতে থাকে। ভোটাভুটির রাজনীতিতে সব দলই এ নিয়ে হিসেব-কেতাব করতে বসে যায়। উত্তরপ্রদেশে মুলায়ম সিংয়ের সমাজবাদী দল ও জনতা দল এক হয়ে লড়লে মুসলমানের ভোট কি কংগ্রেস বেশি টানতে পারবে? যাদবদের ভোট কাঁসিরাম কতটা ভাঙাবে? উত্তরপ্রদেশে ও বিহারে মুসলমানের সমর্থন ছাড়া কংগ্রেসের জয় কি সম্ভব? এই দুটো রাজ্যেই মুসলমানের ভোটের হার তো প্রায় ১৫ থেকে ২০ ভাগ। গত নির্বাচনে কংগ্রেসকে বয়কট করেছে মুসলমানরা। মুলায়ম সিং নির্বাচনে মুসলমানকে গুরুত্ব না দেওয়ার ফল হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন এখন। মুসলিম ও দলিতরা জোট বাঁধলে উত্তরপ্রদেশে কী হাল হবে? এরকম নির্বাচনের নানা মারপ্যাঁচ নিয়ে রাজনীতিকরা অস্থির হয়ে উঠছে। বি জে পিও বলতে শুরু করেছে, দ্যাখো যে রাজ্যে আমাদের সরকার আছে সেখানে তো দাঙ্গা হয়নি। মহারাষ্ট্রে আর এস এস ক্ষমতা পেয়েও তো দাঙ্গা বাধাচ্ছে না। আবার পশ্চিমবঙ্গের অনেক নেতাও এই ক্রেডিট নিতে চায়। মানবিক দৃষ্টিতে সংখ্যালঘুদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, চাকরি ইত্যাদির সমস্যাকে ততোটা জোর না দিয়ে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের দিকটাকেই বড্ডো বেশি জোর দিতে চায়। ভারতের অন্য রাজ্যে যাই ঘটুক পশ্চিমবঙ্গে ধর্ম ও জাত-পাত নিয়ে দাঙ্গার ঠাঁই নেই। কথাগুলো মিথ্যে নয়। এও মিথ্যে নয় যে, বিহারের মতো দাঙ্গাবাজদের জায়গাতেও লালুপ্রসাদ যাদবের মুখ্যমন্ত্রিত্বের আমলে ধর্ম ও জাত-পাত নিয়ে আগের মতো দাঙ্গা হচ্ছে না। তাহলে দক্ষিণ ভারতই কি কংগ্রেসের একমাত্র সম্বল? অবশ্য পাঞ্জাব ও হরিয়ানাতেও মুসলমান ভোট তেমন ধর্তব্য নয়। কিন্তু হিন্দী বলয় ও পূর্বভারতের মুসলমান ভোট? এসব নিয়েই নির্বাচনী যজ্ঞের ঢাক বাজতে না বাজতেই গোটা দেশ জুড়ে নানা জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে যায়। একবার এম এল এ বা এম পি হতে পারলে নেহাত অঘটন কিছু না ঘটলে তো পাঁচ বছরের জন্য নিশ্চিন্তি। আর পাঁচ বছরের মেয়াদ কাটাতে পারলেই সারা জীবনের জন্য মাসিক অন্তত দু-তিন হাজার টাকা পেনসনের গ্যারান্টি। শুধু কি তাই? তখন সদস্য না থাকলেও বউ-বিবি সঙ্গে নিয়ে রেলে বিনা পয়সায় সারা ভারত ঘুরে বেড়ানোর সুযোগও থেকে যাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ হাজার টাকা মাইনের চাকরি করেও এখনো কেউ মাসে দু হাজারী পেনসনদার হতে পারে না অথচ একটা

মেয়াদের জন্য এম এল এ বা এম পি হলেও মার দিয়া কেল্লা। মন্ত্রী হলে তো কথাই নেই। উৎকৃষ্ট সবকিছুতেই তো তাদের ভাগ আগে।

এ হেন সাধারণ নির্বাচন নিয়ে আগাম জল্পনা-কল্পনার তাই অন্ত নেই। আর এই সব অনুমান ঠাওর করার ক্ষেত্রে প্রথমেই বেছে নেওয়া হয় এ-দেশের মুসলমান নামক বিশেষ এক ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষকে। সকলের মাথাতেই এক ভাবনা — নির্বাচনে মুসলমানদের ভোটের পাল্লা কোন্ দিকে ঝুঁকবে? যেন মুসলমানদের ভোটের ভারই ভারতীয় রাজনীতির নিরিখ ! এ-দেশে খ্রিস্টান আছে, বৌদ্ধ আছে, তপসিলি জাতি-উপজাতি আর সাঁওতাল কোল ভিল নাগা মুণ্ডাদের মতো জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষ তো আছে প্রচুর সংখ্যায়। নির্বাচনে এদেরও তো একটা বিরাট ভূমিকা থাকে। অথচ খ্রিস্টান বা বৌদ্ধ কিংবা তপসিলি জাতি-উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ কোন্ দিকে ঝুঁকছে সে-সব প্রশ্ন নির্বাচনী জল্পনা-কল্পনায় তেমন ঠাঁই পায় না। সেক্ষেত্রে সম্প্রদায়গত ছাপ ধরে শুধু মুসলমানকে নিয়েই টানাহ্যাঁচড়ার ব্যাপারটা চলে আসছে সেই ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনের পর থেকেই। এই হিসেবী হকিকত মেনেই ১৯৩৭-এর নির্বাচনে ব্রিটিশ-ভারতে তখনকার যুক্তবঙ্গে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলে কৃষকপ্রজা দলের নেতা বরিশালের ফজলুল হক।

ভারত ভাগ না হয়ে যদি পাকিস্তান ও বাংলাদেশ ভারতের সঙ্গে থেকে যেত তাহলে অবশ্য মুসলমানের ভোট নিয়ে এখন বোধ হয় অন্যভাবে ভাবতে হতো। কিন্তু দেশ ভাগের ফলে এখনো সেই ট্র্যাডিশনের ব্যতিক্রম নেই। কারণ বোধ হয় একটাই যে, গোটা দেশে মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশের মতো মানুষই হলো ধর্মীয় বিচারের দিক থেকে মুসলমান। ফলে এদের সেন্টিমেন্ট বা মন-মানসিকতা নির্বাচনী ফলাফলকে যেভাবে সংক্রামিত করতে পারে অন্য কোনো ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা বোধ হয় ঠিক ততোটা ওজন ধরতে পারে না। এমন কি, ভাষা বা জাতিগত সংখ্যালঘু ও জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষের হাতেও সেরকম অস্ত্র শানান দেওয়ার ক্ষমতা নেই বলেই রাজনীতিকরা মনে করে থাকেন।

অতএব ঘুরে-ফিরে সেই একটাই প্রশ্ন—নির্বাচনের মুসলমানের ভোট কোন দিকে ধাবিত হবে? অথচ কেউ-ই এটা ধর্তব্যের মধ্যেই আনতে চায় না যে, হিন্দু ভোট যদি সম্প্রদায়গত রাজনীতির উর্ধ্বে থাকতে পারে, তাহলে মুসলমানের ভোটের বেলায় সে-নিয়মের ব্যতিক্রম হবে কেন? মুসলমানের কি সম্প্রদায়গত হিসেব-নিকেশের বাইরে রাজনৈতিক মতামত থাকতে পারে না? মুসলমান কি রাজনৈতিক জীব হিসাবে এখনো সাবালক হয়ে ওঠেনি? একজন জোতদার মুসলমানের রাজনীতিক অভিপ্রায় কি একজন ক্ষেত-মজুর মুসলমানের সঙ্গে একই বিন্দুতে মিলতে পারে? একজন মালিক শ্রেণীর মুসলমান আর একজন শ্রমিক-শ্রেণীর মুসলমানের রাজনীতিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কি কোনো তফাত থাকতে পারে না?

এ-সব প্রশ্ন সত্ত্বেও একটা জিনিস লক্ষ্য করার মতো। তাহলো সব মিলিয়ে গোটা মুসলমান সম্প্রদায়ের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অস্তিত্ব রক্ষার একটা হিসেব-কেতাব নির্বাচন এলেই ভীষণভাবে চাগাড় দিয়ে ওঠে। তখন সমস্ত স্তরের মুসলমানের মনেই কয়েকটা প্রশ্ন উৎকট হয়ে পড়ে। যেমন, মুসলমান ছেলে-পিলের চাকরি-বাকরির ব্যাপারে কোন্ দল কতোটা সহানুভূতিশীল। অনেক মুসলমানের মনে এ-নিয়ে এখন অনেক ধন্দ। এ-দেশের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির অনেক নিচের স্তরের স্থানীয় নেতাকেও বলতে শুনেছি এমন কথাও যে, মুজফ্‌ফর আহমদ, আবদুল্লাহ রসুল, সৈয়দ শাহেদুল্লাহ প্রমুখ নেতাদের প্রয়াত হবার পর থেকে এ-দেশে কমিউনিস্ট বা বামপন্থী দলগুলোতে মুসলমান নেতৃত্বের বিকাশের এখন আর তেমন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। তাই মুসলমানের প্রাণের কথা মন দিয়ে শোনার লোকও কমে যাচ্ছে।

কলকাতার হিন্দু বাড়িওলারা মুসলমানকে বাড়ি ভাড়া দেয় না। এটা অনভিপ্রেত হলেও সামাজিক বাস্তবতা। অথচ সরকারি আবাসনেও মুসলমানের ঠাঁই হয় না। এ নিয়েই এক বামপন্থী মুসলমান নেতা একবার একটা হিসেব দিয়েছিলেন। কলকাতার এক মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলের সরকারি আবাসনে না কি ৬৮০টা ফ্ল্যাট আছে। ১৯৬৭-র যুক্তফ্রন্ট আমলেই প্রথম সেই আবাসনের ফ্ল্যাট বণ্টন করা হয়। ৬৮০-র মধ্যে সাকুল্যে ২ জন 'আধা-মুসলমান' এখন পর্যন্ত সেই আবাসনের বাসিন্দা (এরা 'আধা-মুসলমান' বোধ হয় এ কারণেই যে, এদের দুজনই হিন্দু রমণীর স্বামী এবং নাস্তিক্যবাদে বিশ্বাসী)।

খিদিরপুরের এক সমাজসেবী সংস্থার জনৈক মুসলমান কর্মী এ-রকম প্রশ্ন তুলেছিলেন এক আলোচনাসভায়। কলকাতার রাজাবাজার, তালতলা, তপসিয়া, পিলখানা, খিদিরপুরের চেহারা তো প্রায় এক শতাব্দী ধরে একই রকম আছে। সেখানকার বেশির ভাগ মানুষ মুসলমান বলেই কি এই দুর্দশা।

চাকরি, শিক্ষা, বাসস্থান ইত্যাদির প্রশ্ন ছেড়ে সব চাইতে মারাত্মক বিষয় বোধ হয় মুসলমানের কাছে তার ধর্মীয় আইডেনটিটির প্রশ্নটা। ধর্মীয় দাঙ্গা তো কংগ্রেসের আমলেও কম হয়নি। ভারতের কোথাও না কোথাও প্রতিদিন ধর্মীয় দাঙ্গার ক্ষয়ক্ষতি ঘটে চলেছে সেই ১৯৪৬ থেকেই। তবুও পাঁচের দশকে, এমন কি, ছয়ের দশকের গোড়ার দিকেও এ-দেশের মুসলমানদের টান ছিল কংগ্রেসের দিকেই। ১৯২২-এ গান্ধীজী খেলাফত আন্দোলনে মদত দিয়েছিলেন, তখন থেকেই মুসলমানের মনে গান্ধীজীর একটা স্থায়ী ছাপ পড়ে গিয়েছিল। ১৯৪৭-এ জিন্না আর তার মুসলিম লিগ পাকিস্তানের ভাগে চলে যাওয়া এ-দেশের মুসলমানদের একটা বড়ো অংশ 'রাজার পার্টি' কংগ্রেস পার্টিকেই ঢেলে ভোট দিয়ে যেত।

১৯৬৪-তে মুসলমানদেরই একটা বড়ো অংশ কংগ্রেস-বিরোধী হয়ে যায় ১৯৬৪ সালের ধর্মীয় দাঙ্গার কারণে। ১৯৬৭-তে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরা বামপন্থীদের ঢেলে ভোট দেয়। যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনে মুসলমানরা অবশ্যই একটা ভূমিকা পালন করেছিল। শুধু তাই নয়, সেই প্রথম গোটা ভারতবর্ষে ৯টা রাজ্যে কংগ্রেস সরকারের পতন ঘটেছিল নির্বাচনের মাধ্যমেই। অবশ্য এর পেছনে দায়ী ছিল কংগ্রেসের সামগ্রিক প্রশাসনিক ব্যর্থতা।

আবার সেই ধর্মীয় অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্ন সংকটের চরম সীমায় পৌঁছে যায় ১৯৯১-এর বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ঘটনায়। এ-কারণেই বোধ হয় কংগ্রেসের পাকাপোক্ত ঘাঁটি উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেস দল ভেঙে তছনছ হয়ে যায় এবং মুলায়ম সিং যাদবের সরকার গঠিত হয়। অন্ধ্রের বিগত নির্বাচনেও এই ফলশ্রুতি দেখা গেছে।

এখন নির্বাচনে অবশ্য বাবরি মসজিদের ব্যাপারটা তেমন জোরদার ইস্যু হিসাবে খাওয়ানো আর সম্ভব হবে না বলে কেউ কেউ মনে করছে। ব্যাপারটা অনেকটা গা-সওয়া হয়ে গেছে মুসলমানের কাছে। এমন কি, নরসিংহ রাওয়ের নতুন মসজিদ তৈরির প্রতিশ্রুতি নিয়েও মুসলমানদের মধ্যে আবেগ উসকে ওঠার মতো পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে না। তাছাড়া ধর্মীয় অস্তিত্বের প্রশ্নে মুসলমান ভোটের মেরুকরণ জনিত যে-চেহারাটা আগে দেখা যেত, এখন পরিস্থিতি আর তেমন জায়গায় দাঁড়িয়েও নেই। বরং মুসলমানের মধ্যে রাজনৈতিক ভাবাদর্শ এখন একটা স্থায়ী আদল নিচ্ছে। দেশের অন্যান্য নাগরিকের মতো মুসলমানরাও এখন তাদের ভোট নামক অস্ত্রটাকে রাজনৈতিক ভাবেই ব্যবহারের অভ্যাস রপ্ত করতে চাইছে। ফলে কোন দল জাতীয় সংকট মোচনে কতোটা বিশ্বস্ত বা কোন দল সাধারণভাবে কতোখানি নাগরিক সুখ-সমৃদ্ধির গ্যারান্টি দিতে পারে সেই বিচারবুদ্ধি এখন মুসলমানের একটা বড়ো অংশকে প্রভাবিত করছে। ১৯৮৯-এর মীরাট বা ভাগলপুরের ভয়াবহ দাঙ্গার স্মৃতি নিশ্চয়ই মুসলমানকে ভাবিত করে। কাশ্মীরের মুসলমান বা আসামের মুসলমানের

ওপর কংগ্রেস সরকারের অমানবিক আচরণের দিকটা নিয়েও ভারতীয় মুসলমান নিশ্চয়ই ভাবিত হয়। অনুপ্রবেশকারী হিন্দু হলে শরণার্থী বলে কোলে তুলে নাও, আর মুসলমান হলে তাকে অজুহাত হিসাবে দেখিয়ে গোটা ভারতশুদ্ধ মুসলমানকে সন্দেহ জালে জড়িয়ে ফেল এবং অকারণেও বিদেশী বলে পুলিশী জুলুমের মুখে ফেলে দাও—এই বিমাতা সুলভ দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কেও মুসলমানের ভাবনা কম নয়। বিশেষত, বোম্বে, ও দিল্লিতে হাওড়া ও মেদিনীপুরের বাঙালি মুসলমানদেরও যেভাবে হেনস্তা হতে হচ্ছে সব সময়ে পুলিশের হাতে, পাসপোর্টে মুসলমানের নাম দেখলেই যেভাবে গোয়েন্দা রিপোর্টের নামে হয়রানি চলছে গোটা দেশজুড়ে, তাতে এ-দেশের মুসলমান শঙ্কিত বৈ কি! তবুও কোনো একজন ইমাম বুখারি বা বিশেষ কোনো ফুরফুরা শরীফের পীরজাদা আগে যেভাবে ভোটের ঠিকা নিতে পারতেন এখন আর অবস্থাটা সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। তাই ধর্মীয় সম্প্রদায়ভিত্তিক বিচারে এখন মুসলমানের মতিগতি বোঝা খুবই দুরূহ।

তবে মুসলমানরা এদেশে সব দলের কাছেই ক্যাটালিটিক এজেন্ট হিসেবেই বিবেচিত হয়ে এসেছে বরাবরই। কাজের সময় কাজী, কাজ ফুরোলেই পাজী। কোনো কোনো মুসলমানের মধ্যে এই বোধটা এখন তীব্র হয়ে উঠছে। মৃত্যুর কয়েকমাস আগে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক সরোজ মুখোপাধ্যায় পার্টি কর্মীদের এক ঘরোয়া সভায় একবার এমন মন্তব্য করেছিলেন যে 'মুসলমানের কাছে শুধু ভোট চাইবেন অথচ তাদের সমস্যার কথা কিছুই ভাববেন না, এমনটা চলতে পারে না।' মুসলমানকে ক্যাটালিটিক এজেন্ট বানিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা যারা বুঝে গেছে বামগণতান্ত্রিক দলগুলোর কাছে বা বামপন্থী সরকারের কাছেও তাদের প্রত্যাশা ছিল একটু অন্য রকমের। সে-প্রত্যাশা ভেঙে গেলে সে-ধরনের মুসলমানরা কংগ্রেস-বিরোধী হয়েও বামপন্থীদের ওপর আস্থা রাখতে পারবে না। যদিও ভোটের বাক্সে এদের ভোটটা শেষমেশ বামপন্থীদের পক্ষেই চলে যাবে। আবার এই ধরনের মুসলমানকে নিয়ে অন্য ভয়ও আছে। এরা মুসলিম মৌলবাদের খপ্পরে গিয়েও পড়তে পারে। রাজনৈতিক হতাশা থেকেই তো বিচ্ছিন্নতাবাদী বা প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যান-ধারণার জন্ম হয়। ভয়টা এ কারণেই অনেক বেশি যে, পৃথিবীর বেশ কিছু দেশে এখন মুসলিম মৌলবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উসকানিতেই এসব ঘটে চলেছে। ভারতবর্ষে হিন্দু মৌলবাদ চাইছে ধর্মীয় দুর্বলতাকে আশ্রয় করে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে। ১৮৮৭-র কালে যেমন হিন্দু পুনরুত্থানবাদী আন্দোলনের প্রতিক্রিয়াতেই মূলত মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির জন্ম হয়, এখন আবার হিন্দু মৌলবাদের প্রতিক্রিয়া হিসাবে ভারতবর্ষে মুসলিম মৌলবাদী প্রবণতা সংগঠিত হতে চাইছে। এর পিছনে বিদেশী টাকার খেলাও আছে। এই বিপদ থেকে মুসলমানকে উদ্ধার করা দরকার। খুবই দরকার।

আমূল ভূমি সংস্কারের কথা শোনা যায় হর-হামেশাই। কিন্তু আমূল শিক্ষা সংস্কারের কথা তুলবে কে? সংখ্যালঘুরা তো পড়ে আছে এক সেকেলে শিক্ষার ধারণায়। কলোনিয়াল প্যাটার্ন বা উপনিবেশিক শিক্ষা কাঠামোর ভাব-ভাবনার ভেতরেই সংখ্যালঘুরা এখনো ঘুরপাক খাচ্ছে। ধরা যাক মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার কথা। আরবি মাদ্রাসা শব্দের আক্ষরিক বাংলা হলো বিদ্যালয়। তাই অনেকের কাছেই হয়তো মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার নেতিবাচক দিকটা তেমন করে ধরা পড়ে না। আসলে শব্দ নিয়ে একটা সেট কনসেপ্ট বা বদ্ধমূল ধারণা তৈরি হয়ে যায়। বিদ্যালয় বা স্কুল বলতে যেমন এক ধরনের শিক্ষার ব্যাপার বোঝায় মাদ্রাসা বললে কিন্তু তা বোঝায় না। পরিবারের এক ভাই সাধারণ একটা হাইস্কুলে

লেখাপড়া শিখলে তার মানসিক বিকাশ হয় এক রকমের। আবার সেই পরিবারের আর এক ভাই যখন মাদ্রাসায় পড়তে যায় তখন তার চিন্তা-ভাবনা হয়ে যায় অন্য রকমের। মাদ্রাসায় পড়া বেশির ভাগ পড়ুয়ার মধ্যে ধর্মভীরুতা, আধ্যাত্মিকতা ও ঈশ্বর কেন্দ্রিকতার প্রাধান্য তৈরি হয়ে যায় গোড়া থেকেই। যেমন রামকৃষ্ণ মিশনেও। মাদ্রাসার শিক্ষার পরিমণ্ডলে বড়ো হয়ে ওঠা ছাত্রদের মধ্যে ধর্মীয় মৌলবাদী প্রবণতা যেভাবে দানা বাঁধতে পারে সাধারণ স্কুল-কলেজে পড়া ছেলে-মেয়েদের মধ্যে অতোটা দেখা যায় না। খুব বাচ্চা বয়স থেকেই চোগা-চাপকান-টুপি বা লম্বা ঝুলের পাঞ্জাবি ও পায়ের গাঁটের ওপর পায়জামা পরার অভ্যাস থেকে এক ধরনের অনাধুনিক ও অবৈজ্ঞানিক মানসিকতা জন্ম নিতে থাকে। ব্যতিক্রম যে থাকে না তা নয়। কিন্তু তা খুব সামান্যই। আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীরা বাংলাদেশের মুসলমানের মৌলবাদী প্রবণতা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন যে, মাদ্রাসায় পড়া ছেলেদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে ধর্মীয় মৌলবাদী ঝোঁকের প্রাবল্য বেশি।

এ কারণেই বোধ হয় ১৯২৪ সালে তুরস্কের মতো শতকরা ৯৯ জন মুসলমান অধ্যুষিত দেশে কামেল আতাতুর্ক (কামাল নয়) ক্ষমতায় এসেই মাদ্রাসা শিক্ষা বে-আইনি বলে ঘোষণা করেছিলেন। এমন কি কামেল আতাতুর্ক আরবি ভাষায় আজান দেওয়াও নিষিদ্ধ করে দেন। মসজিদের সমস্ত সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত করে ফেলেন এবং মসজিদ কেন্দ্রিক বেসরকারি ইমাম-প্রথাকেও বাতিল করে দিয়েছিলেন। কামেল আতাতুর্কের সমাজ সংস্কারের সঙ্গে অনেকেই হয়তো একমত হবে না। বিশেষ করে যারা অটোমান সাম্রাজ্যের খিলাফতি ব্যবস্থার সমর্থক। আতাতুর্ক খিলাফতি ব্যবস্থা বা খলিফার শাসনের অবসান ঘটিয়ে এক দারুণ সামাজিক বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ আতাতুর্কের এই সমাজ সংস্কারের বিষয়টা স্বচক্ষে দেখেছিলেন এবং তাতে এতোই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, ১৯৩৮ সালে আতাতুর্কের মৃত্যু হলে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীতে ছুটি ঘোষণা করেন এবং শান্তিনিকেতনের সেই ঐতিহ্যময় আম গাছের তলায় আতাতুর্কের স্মরণ সভার আয়োজন করে নিজে এক মূল্যবান ভাষণ দিয়েছিলেন। সেই ভাষণে তিনি এদেশের হিন্দু-মুসলমানকে আতাতুর্কের সমাজ সংস্কারের দৃষ্টান্ত অনুসরণের আহ্বান জানান এবং হিন্দু ও মুসলমানের কুপমণ্ডুক সেকেলে মনকে সংস্কার করে ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষার জন্য ডাক দেন। ১৯৩৮ সালের ১৮ নভেম্বর রবীন্দ্রনাথ এই ভাষণ দিয়েছিলেন।

পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্রনেতার মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ এভাবে বিশ্বভারতীর ছুটি ঘোষণা করেননি কোনো দিন এবং এ ধরনের স্মৃতি সভাও করেননি নিজের উদ্যোগে। এ থেকেই বোঝা যায় তুরস্কের কামেল আতাতুর্ক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কতোটা আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন।

অথচ সেই একই সময়ে এদেশের মুসলমান নেতারা আরবি পারসি শিক্ষা নিয়ে মাতামাতি করেছেন এবং ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে যোগসাজশ করে মুসলমানের জন্য আলাদা বিচ্ছিন্ন শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলার আন্দোলনে মত্ত থেকেছেন। প্রশ্ন হলো ভাষার কি ধর্মীয়করণ হয়? বাইবেলের মূল ভাষা তো হিব্রু। সারা পৃথিবী জুড়ে খ্রিস্টানরা তো কোথাও হিব্রু ভাষার আলাদা স্কুল-কলেজের দাবি তোলেনি। সেই হিব্রু নিয়ে আধুনিক খ্রিস্টান জগতের কোনো মাথা-ব্যথাও নেই। কিন্তু যতো গোল এই ভারতবর্ষে। মুসলমানের ধর্মগ্রন্থ যেহেতু লেখা হয়েছে আরবি ভাষায়, তাই আরবি একটা পবিত্র ভাষা বলে মুসলমানের ধারণা তৈরি হয়ে যায়। আরবি ভাষায় যে আরবের ও পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের লোক খিস্তি-খেউড়, ঝগড়া-ফ্যাসাদও করে সেটা মুসলমানের মাথায় থাকে না। ওই ভূখণ্ডের অমুসলমানও আরবি ভাষায় কথা বলে, লেখা-পড়া করে। ইসলাম প্রবর্তনের

আগেও তো আরবি ভাষা ছিল। ৬২২ সালে হজরত মোহাম্মদ ইসলাম ধর্ম প্রবর্তন করেন। তার একশো বছর আগের আরবি কবিতায় তো যৌনতার ছড়াছড়ি দেখা যায়। ধর্মগ্রন্থের ভাষা নিয়ে এমন ধর্মীয় স্পর্শকাতরতার কী যুক্তি আছে? এদেশের সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিতদের মধ্যেও এই মানসিকতা দেখা যায়। কেন স্কুল-কলেজে সংস্কৃত আবশ্যিক হবে না তাই নিয়ে এখনো এদের লড়াইয়ের শেষ নেই।

পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষা বিশেষজ্ঞরাও ব্যাপারটা তলিয়ে দেখতে রাজি নন। তারাও এই সেকেলে মুসলমান ভাবনাকে চটাতে চান না। নিন্দুকেরা বলেন এ-ও সংখ্যালঘু রাজনীতির কথা মনে রেখেই হয়তো। তাই পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-ব্যবস্থা নিয়েও হরেক রকমের পরীক্ষা নিরীক্ষা চলে। ১৯৭৮-৭৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে সরকারি অনুমোদন প্রাপ্ত মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল ২৪৩। এখন সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪২০। এ-ও বামফ্রন্ট সরকারের কল্যাণে। ওদিকে ১৯৭৬-৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে কলেজ শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় দেড় লাখ। তখন দেড় লাখ পড়ুয়ার জন্য ছিল ২৪১টা কলেজ। এখন কলেজ পড়ুয়ার সংখ্যা হয়েছে দ্বিগুণ। প্রায় ৩ লাখ। অথচ বাড়তি দেড় লাখের জন্য কলেজ বেড়েছে মাত্র ১১৬টা। দ্বিগুণ নয়। এখন পশ্চিমবঙ্গে কলেজের সংখ্যা মোট ৩৫৭। আর বামফ্রন্ট জমানায় বিশ্ববিদ্যালয় বেড়েছে মাত্র ২ খানা। ৭ থেকে ৯। সাধারণ শিক্ষার সংকট যে কীভাবে বেড়েছে তা মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক পাস করা ছেলে-মেয়েদের বাপ-মাদের শুধু ভর্তির ফর্মের জন্য কলেজে মধ্যরাত থেকে লাইন দেওয়ার ধকল দেখলেও বোঝা যায়। উচ্চ-শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া আরও দূরূহ ব্যাপার।

বামফ্রন্ট সরকারের আর্থিক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও এই সাধারণ শিক্ষার সংকট মোকাবিলার চেষ্টা চলছে আন্তরিকভাবেই। কেন্দ্রীয় সরকার মোট বাজেটের শতকরা ৪ ভাগও শিক্ষার জন্য ব্যয় করে না। বামফ্রন্ট সরকার সেখানে শিক্ষাখাতে রাজ্য বাজেটের শতকরা ২৫ ভাগ টাকা বরাদ্দ করেছে। বামফ্রন্ট আমলে ১,১৮৬টা মাধ্যমিক স্কুল এবং ৪৪৮টা উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে বেড়েছে। রাজ্যের ৬৬.১৪ লক্ষ মানুষকে সাক্ষর করে তোলা গেছে এই কবছরের চেষ্টায়।

তবুও এক শ্রেণীর মুসলমান অধ্যাপক ও শিক্ষানুরাগী এ রাজ্যে আরবি-পারসি ভাষার আলাদা স্কুল-কলেজের দাবিতে ছেলেমানুষী করে চলেছেন একেবারেই ধর্মীয় আবেগ থেকে। বামফ্রন্ট যদি এব্যাপারে সহযোগিতা না করে তাহলে বামফ্রন্টকে ভোট দেওয়া হবে না বলেও মন্তব্য বেরোচ্ছে খবরের কাগজে।

কয়েকটা মুসলমানের স্বঘোষিত সংস্থা মুসলিম ল বোর্ড মুসলমান স্কুল-কলেজকে সরকারি অনুমোদন দেওয়ার দাবি তুলছে। এরা বলছে শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানের জন্য আলাদা সংরক্ষণ চাই। সংরক্ষণ চাই চাকরিতেও। এদের নেতা জনৈক হাজি সাহেব খবরের কাগজে বিবৃতি দিয়েছেন এই বলে যে মুসলমানের শিক্ষা ও চাকরির ব্যাপারে নাকি বামফ্রন্ট খুবই উদাসীন।

আবার এই হাজি সাহেবই উত্তর প্রদেশের নির্বাচনে মুলায়ম সিং যাদবের সমাজবাদী দলকে সমর্থনের কথা ঘোষণা করেছেন। বাবরি মসজিদ অ্যাকশন কমিটিও সমাজবাদী দলকে ভোট দেওয়ার পক্ষপাতী।

এদেশে সেই ১৮৭৩ সালে সৈয়দ আহমদের শিক্ষা বিস্তারের কাল থেকেই মুসলমানের ভেতর শিক্ষা প্রসার নিয়ে উলটো পালটা নানা ধ্যান-ধারণাকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেল আছে। নেহাতই ভোট রাজনীতির জন্য। সেখানে শিক্ষা নিয়ে ভাবনার অবকাশ নেই। দেশের শিক্ষার আধুনিকীকরণ নিয়ে কংগ্রেসের কোনো কালেই মাথাব্যথা ছিল না। বামফ্রন্টের সংখ্যালঘু সেল নেই। কিন্তু শিক্ষা সেল আছে। তবে সেই শিক্ষা সেলের

বিশেষজ্ঞের মধ্যে কিছুটা স্বচ্ছতারও অভাব আছে। বিশেষ করে মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাপারে। এরই সুযোগ নিয়ে কলকাতার কিছু মুসলমান অধ্যাপক ও শিক্ষাবিদ গাল-গলা ফুলিয়ে চেঁচাতে শুরু করেছেন বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে। বস্তাপচা ধ্যান-ধারণা নিয়ে এরা আরবি, পারসি ইত্যাদি ভাষা শিক্ষার প্রসারের জন্য দরদ দেখাচ্ছেন। এই সব বিক্ষুব্ধ মোমেনরা সত্যিই যদি এদেশের পিছিয়ে পড়া মানুষের শিক্ষা দীক্ষা নিয়ে ভাবতেন তাহলে তো মুসলমানরা এদের মাথায় তুলে রাখতো। কিন্তু আদতে ব্যাপারটা কি তাই? এমনিতেই মুসলমানের জন্য মেকি দরদের খামতি নেই। তার ওপর দুনিয়া বাদ দিয়ে শুধু মোহজাল বিস্তার করে এ কোন সর্বনাশের দিকে এই সব মেকি বুদ্ধিজীবীরা সাধারণ সাদাসিধে মুসলমানকে আরও কূপমণ্ডুক করে তুলতে চাইছেন? এ রকম বুজরুকি দিয়ে কি সত্যিই প্রতিযোগিতার বাজারে মুসলমানকে আর সকলের সঙ্গে সমানে সমানে দাঁড় করানো যাবে? যাঁরা মুসলমান নারীকে যৌন-যন্ত্রের বেশি মূল্য দিতে চান না, যাঁরা মুসলমানের বেসিক এডুকেশন বা প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা সমস্যার ধার কাছ দিয়েও হাঁটতে নারাজ, তার হঠাৎ একটা পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের এ-ধরনের উচ্চশিক্ষা নিয়ে ভাবিত হয়ে উঠছেন কেন?

যে মাতৃভাষায় প্রাথমিক পাঠ ছাড়া শিক্ষার আসল বনিয়াদ তৈরি হয় না বলে পৃথিবীর সমাজতত্ত্ববিদ ও সমাজবিজ্ঞানীরা মতামত ব্যক্ত করেছেন, এদেশের তথাকথিত পণ্ডিতরা সেই সমাজবিজ্ঞানের সূত্র অস্বীকার করে শিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্মীয় চিন্তার ভেদ টেনে আনতে চাইছেন কোন লজ্জায়? সর্বজনীন শিক্ষার ক্ষেত্রে কি ধর্মীয় বিভাজন চালু করা যায়? পৃথিবীর কোনো দেশে কি শিক্ষা নিয়ে এমন উজবুক কাণ্ডের দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে? হিন্দু ছেলে-মেয়ের জন্য আলাদা স্কুল-কলেজ, মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধদের জন্য আর এক রকমের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষানীতি—এসব করে ভারতীয় শিক্ষা শরীরে স্বাধীনতার এতো বছর পরও সত্যিই কোনো প্রত্যাশিত পুষ্টি সৃষ্টি করা গেছে কি? মাদ্রাসা নামক আলাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বানিয়ে মুসলমানকে শিক্ষিত করা দূরে থাক, সাক্ষরতার সাধারণ স্তরে কি তুলে আনা গেছে?

এখনো গোটা ভারতে ১০০ জনের মধ্যে মাত্র ৩৬ জন (নাম সই করতে পারে এমন সংখ্যাও ধরে) শিক্ষায় উন্নীত হয়েছে। বাকি শতকরা ৬৪ জন বই-খবরের কাগজ পড়া তো দূরে থাক, নিজেদের নামটাই সই করতে পারে না। এর মধ্যে আবার মুসলমানের সংখ্যা আলাদা ধরলে তো লজ্জায় হতবাক হতে হবে। পুরুষ মুসলমানরা ভূ-ভারতে মিলিয়ে একশো জনের মধ্যে এগারো জনও এখনো নিজের নাম সই করার মতো অক্ষরও চেনে না। এই মুসলমানের কথা ভাবছে কেউ?

মুসলমানের ছেলে-মেয়েকে আগে প্রাথমিক স্কুলে দেওয়ার অভ্যাস চালু করার জন্য যদি সত্যিই কোনো চেষ্টা দেখা যেত, তাহলে কথা ছিল। তা না করে একেবারে ওপর তলার কিছু সামন্তবাদী ভাবনা ও বেনে-বুদ্ধি নিয়ে ব্রিটিশ আমলের মতো হাতে গোনা কয়েক গণ্ডা এলিট শ্রেণীর ভদ্রলোক হয় তো তৈরি করা যেতে পারে, এই কুবুদ্ধি নিয়ে আর যাই হোক, মুসলমানের হাড় জিরজিরে শিক্ষা শরীরে মেদ গজানো যাবে না।

এ দেশের গ্রাম শহরে সোনার মতো শিশুরা যে অবহেলায় অশিক্ষার অন্ধকারে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, সেই অব্যবস্থার আসল গলদ কোথায়? এটা না বুঝে মুসলমানের জন্য মেকি দরদ দেখিয়ে এতো দিন অনেক সর্বনাশের বীজ বোনা হয়েছে। এবার গোড়ার গলদকে চিহ্নিত করা দরকার।

এই মুহূর্তে পৃথিবীর প্রতি চার জন নিরক্ষরের মধ্যে একজন হলো ভারতীয়। আর এখনো ১০০ জনের ভারতবাসীর মধ্যে ৬৪ জনই নিজেদের নামটুকু পর্যন্ত সই করতে পারে না। অন্য ধরনের লেখা-পড়া তো দূরের কথা। ভারতীয় শিক্ষা শরীরের এই বেহাল

অবস্থা দেখেই বিশ্বব্যাঙ্কের রিপোর্টে এমন তথ্যও প্রকাশিত হয়েছে যে, আসছে ২০০৩ সালের মধ্যে প্রতি দু'জন নিরক্ষর মানুষের মধ্যে একজন হবে ভারতীয়। ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার স্বাচ্ছন্দ্যময় অবয়ব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এতো রকমের অক্লান্ত শান-পালিশ ও কায়দা কসরৎ চালানোর পর এই যদি হয় সাধারণ চেহারা, তাহলে এরই মধ্যে আবার তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে থাকা জাতি-উপজাতি ও ধর্ম সম্প্রদায়ের অবস্থা যে আরও শোচনীয় হবে তা নিয়ে কি বিন্দুমাত্র সংশয়ের অবকাশ আছে? তবুও শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মতো আমরা বুদ্ধির ঢেঁকিতে নাচছি। আর এভাবে নাচতে নাচতেই ঔপনিবেশিক শিক্ষা কাঠামোর থাম ঘিরে ঘুরপাক খাচ্ছি। এ ধরনের ল্যাপটা-লেপটির কারণেই সারা দেশটাই চোরাবালির টানে আকণ্ঠ ডুবছে। এ থেকে কোনো উদ্ধার নেই জেনেও গতানুগতিকতার গর্ভে নিত্য-নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মহড়া দিচ্ছি। বড়োলোকের গাড়ি পালটানোর মতো বা ফ্যাশানধারী মেয়েদের শাড়ি বদলের মতো শিক্ষা ব্যবস্থার রীতি নিয়ে প্রায়ই অদল-বদলের মহড়া দিচ্ছি। গলদটা যে গোড়াতেই সে কথা কবুল করার মানসিকতাও খুইয়ে বসেছি।

দরদী দার্শনিক ডিভেরো বলেছিলেন 'যে কৃষক পড়তে পারে তাকে ঠকানো অন্য যে কোনো ব্যক্তিকে ঠকানোর চেয়ে অনেক কঠিন'। জার্মান দার্শনিক কার্ল মার্কস বলেছিলেন 'বুর্জোয়ারা শ্রমজীবীদের ঠিক ততোটুকুই জীবনধারণের স্বীকৃতি দেয় যতটুকু (তাদের উৎপাদন ব্যবস্থার স্বার্থে) একান্তভাবেই দরকার। সুতরাং অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, তারা (বুর্জোয়ারা) শ্রমিকদের ততোটুকুই শিক্ষার অধিকার দেবে যতোটুকু নেহাতই তাদের (বুর্জোয়াদের) নিজেদের স্বার্থে প্রয়োজন।' মার্কস যে বুর্জোয়াদের কথা বলেছিলেন তারা আক্ষরিক অর্থেই আধুনিক। সে তুলনায় ভারতীয় বুর্জোয়ারা তো আরও নচ্ছার। কেন না, তাদের স্বাস্থ্যে সামন্ততান্ত্রিক কু-আচার আর বাতিল মূল্যবোধের দগদগে ঘা। এ ধরনের বুর্জোয়া ব্যবস্থায় ভারতীয় শিক্ষার শারীরিক পুষ্টি হবে কেমন করে?

অষ্টাদশ শতকের শেষ মোগল সম্রাটদের শাসনকালেও অখণ্ড বঙ্গদেশে মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ 'কোর-আনের' ভাষা আরবিতে নয়, বরং বাঙলা, ফারসি ও সংস্কৃত ভাষায় লেখাপড়া শেখানোর ব্যবস্থা চালু ছিল গ্রামীণ শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে। তখনো গ্রাম-সমাজ ব্যবস্থায় জমির কোনো ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না। সামাজিক চাষ ও সামাজিক বণ্টন ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই গ্রাম সমাজ টিকে ছিল। ১৭৫৭-র পলাশি যুদ্ধে বিদেশী ইংরেজ বণিকদের হাতে দেশটাকে বিকিয়ে দিতে যে ভারতীয় ভূস্বামী ও উঠতি ব্যবসায়ীরা দল বেঁধেছিল, সেই দালালদের হাত ধরেই তো ১৭৯৩ সালে কর্নওয়ালিশ 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' চালু করে জমিদারি ব্যবস্থার পোক্তপত্তন ঘটিয়েছিলেন। ফলে গ্রাম সমাজ ভাঙলো। ভেঙে পড়লো গ্রাম্য পাঠশালা ব্যবস্থাও। নিজেদের প্রশাসন চালানোর স্বার্থেই কার্জন যখন বললেন, কৃষকদের নিজেদের জমির স্বত্ব ইত্যাদি বোঝার জন্য লেখাপড়া দরকার, তখন এ দেশের জমিদাররাই চেঁচিয়ে উঠলো কৃষকদের লেখাপড়া শেখানোর প্রতিবাদে। জমিদার শিবশেখরেশ্বর রায় বললেন ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যরা ১০০ জনের মধ্যে ১০০ জনই শিক্ষিত। সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষা প্রসার আইনে তাদের কোনো উপকার হবে না — মুসলমান, নমঃশুদ্র এবং অন্য কিছু নিচু সম্প্রদায়ের লোকই এই আইনে উপকৃত হবে। শিবশেখরেশ্বর রায় একথাও বলে ফেললেন যে 'এই আইন হিন্দুদের শক্তিশালী বিরোধিতার সম্মুখীন হবে।' মহামতি গোখলে ১৯১০ সালে ইমপিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে প্রাথমিক শিক্ষাকে আবশ্যিক করার জন্য একটা বিল উত্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। গোখলে বাধা পেলেন শিবশেখরেশ্বর রায়েদের মতো জমিদারদের কাছ থেকে। ১৯১১ সালে গোখলে আবার সেই বিল উত্থাপন করলেন। জমিদাররা ভাবলো 'ছোটলোকরা' লেখাপড়া শিখলে

বিপদ হয়ে দাঁড়াবে। তারা আবার বিরোধিতা করলো। সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাবে গোখলের সে বিল অনুমোদন পেল না।

ঊনিশ শতকের শুরুর দশকেই যে তদানীন্তন সময়ের বিত্তবানরা মুসলমান ও নমঃশূদ্রদের শিক্ষাঙ্গন থেকে দূরে ফেলে রাখতে চাইছিলো তাই নয়, খোদ ব্রিটিশ সরকারও আবার সেই ১৮৫৭ সালে ভারতীয় মহাবিদ্রোহ (সিপাহি বিদ্রোহ) ঘটে যাবার পর থেকেই মুসলমানদের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল। ব্রিটিশ সরকার তখন থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে ও সরকারি চাকরিতে মুসলমানদের নিয়োগ করতে চাইতো না। সেই শূন্য জায়গা দখল করে ফেলে হিন্দুরা। ফলে হিন্দুদের মধ্যে সরকারি চাকরি ও বশংবদ কেরানিবৃত্তির মাধ্যমে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গঠন পুষ্ট হয়ে ওঠে, ব্রিটিশদের আস্থাভাজন না হওয়ার জন্যই মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে তেমন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থান ঘটতে পারেনি। শুধু তাই নয়, একশ্রেণীর শিক্ষিত ও অশিক্ষিত মোল্লা-মৌলবিরা মুসলমানদের মধ্যে কিছু ভ্রান্ত ধারণাও ছড়িয়ে দিয়েছিল। ইংরেজি ভাষা শিখলে আর পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করলে মুসলমানদের ধর্ম নষ্ট হবে — এই ভুল ধারণা যেমন ছড়িয়েছিল তারাই, তেমনি মুসলমানদের মধ্যেকার বিত্তবান একটা ক্ষুদ্র অংশ ভারতে আবার মুসলমান রাজত্ব ফিরিয়ে আনার অলীক স্বপ্নে ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতার নামে পাশ্চাত্যের শিল্প বিজ্ঞান প্রযুক্তি সম্পর্কে মুসলমানদের অবচেতন করে রাখার পথ প্রশস্ত করে ফেলেছিল। এভাবেই সেই উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা সম্পর্কে একটা অনীহা সৃষ্টির বাতাবরণ তৈরি হয়ে যায়। ১৭৯৭-এর কালে উত্তর প্রদেশের সৈয়দ আহমদের মতো কেউ কেউ ইংরেজি শিক্ষা দরকার বলে মুসলমানদের মুখ ফেরানোর চেষ্টা করলেও বঙ্গদেশে সেই আহ্বান খুব বেশি কার্যকর হয়নি। তাছাড়া তখন হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী অর্থনীতি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে কয়েক ধাপ এগিয়ে যাবার ফলেই এবং তারা ব্রিটিশ শাসনের বশংবদ হয়ে ওঠার কারণেই মুসলমানরা পরবর্তীকালে প্রতিযোগিতায় অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছিল। ১৯১৪-তে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির মতো সংস্থা গঠনের মধ্য দিয়ে বাঙালি মুসলমানদের সর্বজনীন শিক্ষা ও সাংস্কৃতির চেতনা প্রসারের যেটুকু প্রচেষ্টা পরিচালিত হয় ১৯২৬-এর হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা, ১৯৩০-র দশকে মুসলিম লীগের ধর্মীয় রাজনৈতিক আবেগ এবং সর্বোপরি ১৯৪৭-এর দেশ ভাগ ইত্যাদি ঘটনার ফলে পশ্চিমবঙ্গীয় ভূখণ্ডের বাঙালি মুসলমান অর্থনৈতিক দিক থেকে যেমন জীর্ণদশা প্রাপ্ত হতে থাকে, তেমনি সেই ভাঙনের রেশ ধরেই শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক চেতনা গ্রহণে আরও বেশি পশ্চাদমুখি হয়ে পড়ে।

ভারতবর্ষ বহু ধর্মের দেশ। ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণের অধিকার সকলেরই থাকা দরকার। কিন্তু সর্বজনীন শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে ধর্মীয় শিলমোহরে শিক্ষা কাঠামোর বিভক্তিকরণ বা ভেদ সৃষ্টির প্রক্রিয়া ব্রিটিশ প্রশাসকরাই চালু করেছিল উপনিবেশিক স্বার্থ সংরক্ষণের মতলবে। সেই প্রথার অবিকল অনুসরণ সর্বজনীন শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে এখন আর কোনো তাৎপর্য বহন করে কি না, আধুনিক বাঙালি মুসলমানকে তা অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে। প্রশ্নটা অবশ্যই স্বাতন্ত্র্য বিবর্জিত এমালগামেশন নয়, স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেই সম্মিলনের। ভারতীয় জলহাওয়ায় লালিত হয়ে মেইনস্ট্রিম থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাইলে সর্বজনীন পরিপুষ্টি অর্জন সম্ভব নয়। এটাও ভেবে দেখার বিষয়। এদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও বুদ্ধিজীবীদের বিষয়টা নিয়ে ভাবতে হবে।

৩

দুর্ভাগ্য আমাদের, এমনই এক সমাজ ব্যবস্থার গর্ভে আমাদের বসবাস যেখানে জাতি-উপজাতি, বর্ণ ও ধর্মের বিভেদে এখনো আমরা উৎপীড়িত। সামাজিক ও রাজনৈতিক বিচারের ক্ষেত্রেই আমাদের মনের নিভৃত কোণে ওই সব ভেদ-বিভেদের ভাবনা খুবই সূক্ষ্মভাবে ছায়া ফেলে যায়। তাই একই ধর্মের মানুষ হয়েও একজন উচ্চবর্ণের হিন্দু এখনো একজন নিম্নবর্ণের হিন্দুকে খুব সহজে বুকে টেনে নিতে পারে না। সামাজিক আচার ও বিবাহ বন্ধনের বেলায় মানুষ নিজের নিজের গোত্র খুঁজে বেড়ায়। এদেশের তফসিলি জাতি-উপজাতি ও আদিবাসী মানুষেরা এখনো উচ্চবর্ণের মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা থেকে বঞ্চিতই রয়ে যায়। সাঁওতাল, কোল-ভিল, নাগা-মুণ্ডারা এখনো তথাকথিত ভদ্রশ্রেণীর কাছে কতোটুকু গ্রহণযোগ্যতা দাবি করতে পারে তা নিয়ে সংশয়ের শেষ নেই। এর ওপর সেই আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে আবার এ দেশে একেবারে নতুন উপসর্গ তৈরি হয়েছিল হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের ভেদজনিত এক অনৈতিহাসিক ও অযৌক্তিক চিন্তার সংক্রমণে। যে হিন্দু-মুসলমান সেই দশের শতক থেকে আঠারো শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত একই স্রোতে সুস্নাত হয়ে পারস্পরিক প্রীতিময় জীবন-যাপনের ঐতিহ্য তৈরি করেছিল, ব্রিটিশ শাসনের ছত্রছায়ায় এসে সেখানেই চিড় ধরা শুরু হয়। হিন্দুর জীবন ও আচার নিয়ে মুসলমান যদি বা একটু আগ্রহী হয়ে ওঠে তো, মুসলমানের সমাজ-সংস্কৃতি ও জীবন-ভাবনা সম্পর্কে হিন্দুর এক বিন্দু অনুসন্ধিৎসা অবশিষ্ট থাকে না। যে সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের ধারা সেই দশের শতক থেকে ক্রমে শ্রীচৈতন্য, হুসেন শাহ, আকবর ও দারাশিকোর কিংবা কবীরের কাল বেয়ে পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে তা ব্রিটিশ আমলের স্বদেশী ও বিদেশী উভয় ধর্মদ্বেষী ইতিহাস লেখকের কলমে বিকৃত হয়ে যায়। ফলে মুসলমান ভুল বোঝে হিন্দুকে, হিন্দু ভুল করে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়ায় মুসলমানের সম্পর্কে। উভয় সম্প্রদায়েরই ইতিবাচক ঐতিহ্য গুরুত্ব হারায়। অবিভক্ত ভারতে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ ও বিকাশরীতিকে উপেক্ষা করে শুধু ধর্মের ভিত্তিতে রাজনীতিক স্রোত সৃষ্টি যে কতোটা অনৈতিহাসিক ও অযৌক্তিক ছিল তা বোঝা গেল ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর।

এ ঘটনা এ দেশে ধর্মভেদ, জাতিভেদ ও বর্ণভেদকে আরও স্থায়ী ভিত করে দিল। ভুল বোঝাবুঝির সুযোগ আরও বিস্তৃত হলো। একের সম্পর্কে অন্যের অনীহা, অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা আরও বিশ্রীভাবে বেড়ে গেল। পাশাপাশি বাস করেও শুধু ধর্ম, বর্ণ আর জাতিভেদের মানসিক আচ্ছন্নতার দরুন একজন আর একজনকে জানতে চায় না, চিনতে চায় না, বুঝতেও চায় না। ফলে ১৯৪৭-এর পর ভারতীয় সংস্কৃতির কোনো স্বাধীন সত্তা নির্মিত হলো না। শুধু ধনবৈষম্য নয়, জাতিভেদ ও ধর্মীয় বৈষম্যও এদেশে সমানুপাতিক উন্নয়ন ঘটাতে ব্যর্থ হলো। পিছিয়ে পড়া অনুন্নত শ্রেণীর মানুষ ক্রমে আরও পিছিয়েই পড়তে থাকলো। জাতীয় বিকাশধারার কোনো সমতা সৃষ্টি হলো না। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটে এখন এই বৈষম্য এক বিষময় বিষাদে পূর্ণ করে ফেলেছে গোটা ভারতবর্ষের হৃদয়।

অথচ এ দেশে বড়ো বড়ো খবরের কাগজ আর সরকারি প্রচারমাধ্যমগুলোতেও এই বৈষম্য আর বিষাদের ছায়া তেমন করে প্রতিফলিত হয় না, আর এই বৈষম্য ও বিষাদ যদি হয় কোন পিছিয়ে পড়া অনুন্নত বা সংখ্যালঘু সমাজভুক্ত মানুষের দেহনিঃসৃত, তাহলে তার জন্য একটা শব্দ ব্যয় করাকেও প্রাতিষ্ঠানিক পত্র-পত্রিকাগুলো বিপজ্জনক বলে মনে করে।

একদা এই ভারতেরই প্রাচীন ইতিহাসে কোনো ব্রাহ্মণ যদি কোনো শূদ্রকে হত্যা করতো তাহলে স্রেফ কয়েকটা টাকা খরচ করলেই সেই হত্যাকারী ব্রাহ্মণ নিষ্কৃতি পেয়ে যেতো

রাষ্ট্রীয় আইনের হাত থেকে। নিম্নবর্ণের কেউ যদি ধর্মগ্রন্থ পড়তো বা তার আবৃত্তি শুনে ফেলতো, তাহলে তার কানে গরম তেল ঢেলে দিয়ে তার শ্রবণশক্তি নষ্ট করে দেওয়া হতো। এখনো কোনো আদিবাসী রমণী ধর্ষিত হলে বা কোনো গরিব সংখ্যালঘু খুন হয়ে গেলেও এই গণতান্ত্রিক পরিমণ্ডলেও তার যথাযথ সুবিচার পাওয়া দুষ্কর হয়ে ওঠে উচ্চবিত্ত ও উচ্চবর্ণের প্রাধান্যের দরুন। একজন পিছিয়ে পড়া মুসলমানের ক্ষেত্রে এই অবজ্ঞা ও অবিচার এ-রকমই মারাত্মক। আমরা চাই বৈষম্যের জগদ্দল পাথর সরিয়ে পিছিয়ে পড়া অবহেলিত মানুষ ফিরে পাক তার প্রকৃত স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক অধিকার, জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মবিকাশের পরিপূর্ণ বাতাবরণ। আর এর জন্যই আমরা মনে করি যে কোনো জাতি, উপজাতি এমন কি ধর্মীয় সম্প্রদায়কে নিজের সামাজিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে নিজস্ব ইনটেলিজেনসিয়া বা বুদ্ধিজীবীবৃত্ত গড়ে তুলতেই হবে। সেভাবেই জাতীয় জীবনের মূল স্রোতের সঙ্গে মিলিত হতে হবে, অবজ্ঞা বা অসম্মান নিয়ে নয়, পরিপূর্ণ সম্ভ্রম নিয়ে। জাতিগত বা সম্প্রদায়গত আশা আকাঙ্ক্ষা, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা, জাতীয় ও সম্প্রদায়গত ইতিহাসের যাবতীয় গৌরবময় ইতিবাচক ঐতিহ্যের দিক এবং সাংস্কৃতিক সত্তার দেশের মানুষের কাছে তুলে ধরতে হলে পিছিয়ে পড়া জাতি, গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে, যে যাই বলুন, সমাজসচেতন ও বাস্তব দৃষ্টিসম্পন্ন বুদ্ধিজীবী পরিবৃত্ত গঠন যেমন অত্যাবশ্যক, তেমনি উল্লেখিত উপাদানগুলো প্রকাশের জন্য যথোপযুক্ত মাধ্যমেরও প্রয়োজন হয়।

দুঃখের বিষয়, ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর এ দেশের বাঙলা ভাষাভাষী মুসলমান, সম্প্রদায়ের মধ্যে এ দুয়েরই নিদারুণ অভাব লক্ষণীয়। বাঙালি মুসলমানের মানসিক ইচ্ছা, সম্প্রদায়গত বিকাশ, দুঃখ-দারিদ্র্য, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা, অর্থনৈতিক সংকট, সম্প্রদায়গত অবজ্ঞা, অবহেলা ও লাঞ্ছনার খতিয়ান, স্বকীয় প্রতিভার প্রতিফলন প্রভৃতি কখনোই এ দেশের প্রচলিত পত্র-পত্রিকা, এমন কি, সরকারি মাধ্যমসমূহ, অর্থাৎ দূরদর্শন এবং রেডিওতেও তেমন গুরুত্ব পায় না। অমুসলমান, এমন কি অবাঙালি মুসলমানদের মধ্যেও বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়ের কৃষ্টি-সংস্কৃতি সম্পর্কে অনেক ভুল ধারণা চালু রয়েছে।

এই বিকৃতিকরণ ও ভুল বোঝাবুঝির জন্য আর পারস্পরিক অনীহা অবহেলার দরুনই ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা ফায়দা লোটার সুযোগ করে নেয়। বাঙালি মুসলমানের হাতে কোনো শক্ত সবল প্রচার মাধ্যম না থাকায় এবং প্রচলিত বেসরকারি, এমন কি, সরকারি প্রচার মাধ্যম ও পত্র-পত্রিকায় যোগ্য বাঙালি মুসলমান বহাল করার ব্যাপারেও এক ধরনের লালিত সংকীর্ণতা ও রক্ষণশীলতা সূক্ষ্মভাবে খেলা করার ফলে পশ্চিমবঙ্গের প্রচার মাধ্যমগুলোতে বাঙালি মুসলমানের আশা-আকাঙ্ক্ষার কোনো প্রতিফলন খুঁজে পাওয়া যায় না। কেউ কখনো ভেবেই দেখতে চায় না, দেশভাগের পর বাঙলাদেশের অর্থাৎ ওপার বাঙলার বাঙালি মুসলমানরা যদি প্রথম শ্রেণীর অতো অতো দৈনিক কাগজ এবং সাহিত্য-সংস্কৃতিমূলক পত্র-পত্রিকা চালানোর যোগ্যতা অর্জন করতে পারে আর তাদের রেডিও-টিভি পরিচালনার ক্ষেত্রে যদি তারা যোগ্য ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়, তাহলে এ বাঙলার বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে ১৯৪৭ সালের পর থেকে এই ৪৮ বছরে অন্তত ৪৮ জন যোগ্য লেখক, সাংবাদিক বা শিল্পীও কি খুঁজে পাওয়া গেল না, যারা পশ্চিমবঙ্গের প্রচার মাধ্যমগুলোতে বা কলকাতার রেডিও-দূরদর্শনে, এমন কি, রাজনৈতিক দলের মুখপত্রগুলোতেও এতো বছরে সব মিলিয়ে এক ডজন বাঙালি মুসলমান সাংবাদিক-লেখককেও চাকরি করতে দেখা যায় না। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি মুসলমানের সাংস্কৃতিক বিকাশধারার মান কি এতোটাই নিম্নস্তরের? অথচ, এ বাঙলার এই বাঙালি মুসলমান পদ্মা

পার হলেই প্রতিভাধর হয়ে ওঠে কী ভাবে? সমাজতত্ত্ববিদরা কখনো কি এটা ভেবে দেখেছেন?

অবশ্য এর জন্য বাঙালি মুসলমানের নিজের দায়ও কম নয়। ১৭৫৭-তে পলাশির যুদ্ধে বাঙলার পরাধীনতার ঘটনা মুসলমানের মনে লেগেছিল। তখন থেকে ব্রিটিশ দখলদারদের বিরোধিতা করতে গিয়ে মুসলমানরা ভুল করে ইংরেজি ভাষাকে বয়কট করে বসে। এই ফাঁকে যারা এদেশে 'যবনের বদলে ইংরেজ ভালো' বলে ব্রিটিশ শাসনের বশংবদ বাণীবাহক ও স্তুতিবাদীতে পরিণত হয়, তারা ইংরেজি শিক্ষা আয়ত্ত করে ব্যাপকভাবে সরকারি পদে বহাল হয়ে যাওয়ার ফলে মুসলমানরা আধুনিক শিক্ষা, অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত থেকে গেল। ব্রিটিশ সরকারের প্রশ্রয়ে অমুসলমানদের মধ্যে, অর্থনৈতিক কারণেই যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে, বিশেষত ব্রাহ্মণ্য সমাজে, সে রকম নব্যশিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গঠন মুসলমানদের মধ্যে ঘটেনি। অথচ, ইতিহাসের নিয়মে যেকোন সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীই জন্ম দেয় লেখক-শিল্পী-সাংবাদিক এবং অন্যান্য স্তরের বুদ্ধিজীবীকে। এরাই সমাজ ও রাষ্ট্রবদলের সংকেত বহন করে আনে।

১৮৫৭ সালের পর আবার মুসলমানদের দুর্দশা আরও বেড়ে যায়। ১৮৫৭-র ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ এদেশের অমুসলমান বুদ্ধিজীবীরা প্রায় কেউ-ই সমর্থন করেনি। অযোধ্যা ও বারাণসির হিন্দু কৃষকরাও কিন্তু সে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। তবু অনেকে ভাবলো ইংরেজরা হারলে আবার ভারতে মুসলমানদের রাজত্ব চলে আসবে দ্বিতীয় বাহাদুর শাহর হাত ধরে। ব্রিটিশরাও আশংকিত হলো। মুসলমানের ওপর ইংরেজের বিশ্বাস ও আস্থা রইলো না। ফলে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে বা সরকারি চাকরিতে সংকুচিত হয়ে গেল মুসলমানের চাকরির সুযোগ।

১৮৯৩-র পরে উত্তরপ্রদেশে সৈয়দ আহমদের মতো ব্রিটিশ খেতাব পাওয়া কেউ কেউ ইংরেজি শিক্ষার দিকে মুসলমানের মন ফেরানোর চেষ্টা করা সত্ত্বেও এবং বিশ শতকের গোড়ায় উত্তর প্রদেশের আলিগড়ে মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও অবিভক্ত বাঙলার মুসলমানের মধ্যে সে সব ঘটনা তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। ১৯১৪-তে কলকাতার ৯, অ্যান্টনিবাগান লেনে সাহিত্যিক মোজাম্মেল হক, সিলেটের ফজলুল হক, ভাষাতাত্ত্বিক মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখের উদ্যোগে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি গঠনের মধ্য দিয়ে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের একটা নিউক্লিয়াস বা প্রাণকেন্দ্র গড়ে ওঠে। এরই মুখপত্র হিসাবে ১৯১৮-তে কমিউনিস্ট নেতা মুজফ্ফর আহমদের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয় 'মোসলেম ভারত' পত্রিকা। এই পত্রিকাই নজরুল ইসলামের সাহিত্য-জীবনের সূতিকাগৃহ হিসাবে ভূমিকা পালন করে। অনেক বাঙালি মুসলমান লেখক-সাংবাদিক এই পত্রিকার মাধ্যমেই প্রথম শ্রেণীর লেখক হিসাবে পরিগণিত হন। মুসলমানের উদ্যোগে অনেক পত্র-পত্রিকাও প্রকাশিত হতে থাকে।

কিন্তু ১৯২৬-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ১৯৩০-এর দশকে মুসলিম লীগের ধর্ম-কেন্দ্রিক রাজনীতি, ১৯৪৬-এর গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং বা কলকাতার বীভৎস হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা এবং সর্বশেষ ১৯৪৭-এর দেশভাগের ফলে বাঙালি মুসলমান দ্বিধা-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। দেশভাগের ফলে বাঙলা সাহিত্য-সংস্কৃতির শবব্যবচ্ছেদ ঘটে যায়। এমন কি, যে আবদুল কাদির বা গোলাম মোস্তাফার মতো কবিরা দেশভাগের পরেও বেশ কয়েক বছর পশ্চিমবঙ্গে থেকে যান, তাঁরাও জন্মসূত্রে পূর্ববঙ্গীয় হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাসে তাঁদের অবদান কোনো স্বীকৃতিই লাভ করে না। পশ্চিমবঙ্গীয় বাঙালি মুসলমানদের মধ্যেকার উঠতি বুদ্ধিজীবীরা ওপার বাঙলায় চলে যাওয়ায় এ বঙ্গের মুসলমান পড়ে যায় গহ্বর গভীর পিছুর টানে।

এখনো খাস কলকাতা শহর থেকে সন্নিহিত অঞ্চলের ২০ লক্ষ উর্দু ভাষাভাষী মুসলমানের জন্য ছোট-বড়ো প্রায় ১২ খানা দৈনিক উর্দু পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বামফ্রন্টের আর এক শরিক ফরোয়ার্ড ব্লকও কলিমুদ্দীন শামসকে দিয়ে এরকম একটা উর্দু সাপ্তাহিক প্রকাশের চেষ্টা চালাচ্ছে। এমন কি বামফ্রন্টের বড়ো শরিক সি পি আই এম ও উর্দুওলা মুসলমানের জন্য একটা দৈনিক প্রকাশে সাহায্য করে যাচ্ছে। অথচ পশ্চিমবঙ্গের প্রায় এক কোটি বাঙালি মুসলমানের জন্য একখানা দৈনিক পত্রিকাও নেই যেখানে বাঙালি মুসলমানের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে পারে। এদেশের অবহেলিত আদিবাসী সমাজ, পাহাড়ি উপজাতিদের ক্ষেত্রেও একই সমস্যা লক্ষণীয়।

বাঙলা সাংবাদিকতা অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে গুণগত মান অর্জন করেছে। কূপমণ্ডুক পত্র-পত্রিকা প্রকাশের দিন এখন শেষ হয়ে গেছে। আবার উগ্র ধর্ম সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যান-ধারণার কোনো কার্যকারিতা সাম্প্রতিক যুক্তিবাদী মন কখনোই স্বীকার করে না। তাই এখন চাই এমন মুখপত্র যা সর্বতোভাবেই আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ভাবনার ধারক, আধুনিক সাংবাদিকতার রীতিতে আস্থাশীল এবং যা জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সমস্ত অবহেলিত মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার গণতান্ত্রিক চেতনা বিস্তারে বিশ্বাসী, জাতীয় সংহতি ও ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষায় উচ্চবাক, সমাজ-বিপ্লবের আদর্শে স্থির প্রাজ্ঞ।

দোহাই পাঠক, আর যাই ভাবুন, এ কথাগুলোকে ধর্ম-সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে মূল্যায়ণ করবেন না।

৪

ভি আই লেনিন নামের এক টাকপড়া মানুষ ১৯১৭ সালে এক দুনিয়া কাঁপানো কাণ্ড করে বসলেন। রাশিয়া নামের এক দেশে বড়লোকদের সঙ্গে লড়াই করে গরিব মানুষের রাজত্ব তৈরি করে ফেললেন। রাশিয়া আমাদের ভারতবর্ষ বা প্রতিবেশী চীন দেশের মতো সুপ্রাচীন সভ্যতার দেশ নয়। তখন রাশিয়ার বেশির ভাগ মানুষই ছিল খুব পিছিয়ে পড়া। মাত্র দুশো বছরের সভ্যতার ঐতিহ্য নিয়ে গড়া সেই দেশ। তখনো তাদের বর্বর নামটা ঘোচেনি। তো এ-রকম দেশের গরিব মানুষজন নিয়ে ভি আই লেনিন নামের বেঁটে খাটো একটা মানুষ সারা দুনিয়াকে তাজ্জব বানিয়ে দিলেন। গ্রামের চাষী আর শহরের মজুর নিয়েই লেনিন সাহেব সেই বিশাল এক বিপ্লব ঘটিয়ে বসলেন। আর এই বিপ্লব ছিল একেবারেই নতুন। পৃথিবীতে এ-রকম ধরনের বিপ্লব বা সামাজিক পরিবর্তন সেই ১৯১৭ সালের আগে কোথাও কখনো ঘটেনি।

একটু আধটু সংস্কারের বা মেরামতির কাজ অনেকেই অনেক দেশে করেছিলেন। আমাদের দেশেও গরিবদের কথা অনেকেই বলেছেন। বঙ্কিম, রামমোহন, মীর মশাররফ, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল প্রমুখ এমন অনেকেই। কিন্তু লেনিন সাহেব টান দিলেন একবারে গোড়া ধরে। খসে যাওয়া দেওয়ালে খুচরো-খাচরা লেপালেপি নয়, চুন-বালির মেরামতিও নয়। একেবারে সমাজের ভিত বা বনেদটাকেই উপড়ে ফেললেন। বানালেন নতুন বনিয়াদ। বড়লোক রাজা-জমিদার-জোতদার-মহাজনদের একদম হটিয়ে দিলেন সবরকমের ক্ষমতা থেকে। সেই ১৯১৭ সাল। নভেম্বর মাস। ইউরোপ আর এশিয়ার কয়েকটা দেশ নিয়ে গড়ে উঠলো সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র। শ্রমিকরাই সেখানে সেই রাজত্বের রাজা। শ্রমিক আর কৃষক মিলে সেই প্রথম দুনিয়ায় গরিব মানুষের রাজত্ব তৈরি হলো।

এ-ঘটনার দু'বছর পরেই লেনিন সাহেব পুবের দেশের মুসলমানদের জন্য একটা

ঐতিহাসিক দলিল লিখলেন। এই দলিল লেখার একটাই উদ্দেশ্য ছিল। ভারত, চীন, নেপাল, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া, ইরাক, ইরান প্রভৃতি দেশের মুসলমানরা তখনো অমুসলমান প্রতিবেশীদের চাইতে অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছিল। এমন কি, খোদ সোভিয়েত দেশের মধ্যে যে অংশটা ছিল এশিয়া মহাদেশের ভেতরে, সেই কাজাখিস্তান, উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, কিরঘিজিস্তান প্রভৃতি জায়গার মুসলমানরাও তাদের প্রতিবেশী খ্রিস্টান ও ইহুদিদের থেকে তখন শিক্ষা-দীক্ষা, সমাজভাবনা, চিন্তা-চেতনায় অনেকটা পিছিয়ে।

অথচ একটা দেশের সমস্ত মানুষকে যদি সমানে সমানে উন্নতির জায়গায় টেনে না আনা যায় তাহলে তো গোটা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। আর একই দেশের কিছু মানুষ শিক্ষা-দীক্ষায়, চিন্তা-ভাবনায়, চাকরি-বাকরির ক্ষেত্রে এগিয়ে যাবে, সুযোগ-সুবিধা পাবে, আর তাদেরই প্রতিবেশী কিছু মানুষ সেই সব সুযোগ ভোগ করতে পারবে না, পিছনে পড়ে থাকবে এমন ব্যাপার তো চলতে পারে না। তাহলে তো নিজের দেশের মানুষের মধ্যেই বৈষম্য বা উঁচু-নিচুর ভেদ-বিভেদ এবং ভাগা-ভাগি শুরু হয়ে যাবে। আর একবার এই উঁচু-নিচুর, উন্নত ও অনুন্নতের ভেদ মাথায় ঢুকলে তো রক্ষে নেই। তাই গোড়াতেই লেনিন সাহেব এই বিষ ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। সব মানুষ সুযোগ পাবে। সকলের জন্য সমান উন্নতি চাই। সকলেরই খাওয়া-পরা, শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ থাকবে। সকলের জন্যই চাই বাসস্থান, চাকরি ইত্যাদি। আর সকলেই দেশের জন্য কিছু না কিছু করবে। কিন্তু চাইলেই তো আর সবটা সমান সমান করা যায় না। বিশেষ করে যে-মানুষ কয়েকশো বছর ধরে পিছিয়ে পড়ে আছে। তাই পিছিয়ে পড়া মানুষের মধ্যেও আবার যারা আরও অনেক বেশি পিছিয়ে পড়ে থাকে, তাদের কথা একটু আলাদা ভাবে ভাবতেই হবে। তা না হলে সকলকে সমানে সমানে টেনে তুলে আনা যাবে কী করে!

ধরা যাক আমাদের দেশের কথা। আর্য ভাষাগোষ্ঠীর লোক ভারতে আসার আগে এ দেশের অনার্যরা আর্যদের চাইতে অনেক সভ্য ছিল। কিন্তু আর্যদের সঙ্গে যুদ্ধে অনার্যরা পরাজিত হয়ে গেল। আর্যদের আধিপত্য প্রবল হওয়ার অনার্যরা হয়ে গেল দাস। এদেশের সাঁওতাল, কোল, ভিল, নাগা, মুণ্ডা, ওরাং, মেচ, রাভা, রাজবংশী ইত্যাদি জনজাতি গোষ্ঠীর লোকেরা এভাবেই এ দেশের সাধারণ ভদ্রলোকদের থেকে অনেক পিছনে পড়ে গেল। লেখা-পড়া, চাকরি-বাকরি, সম্পত্তি, টাকা-পয়সা, ঘরবাড়ি — সব দিক থেকেই এরা সাধারণ ভারতবাসীর চেয়ে এখনো অনেক নিচের স্তরে পড়ে আছে। তা, এদের যদি দেশের অন্য সকলের সঙ্গে সমানে সমানে এনে দাঁড় করাতে হয় তাহলে তো এদের দিকে একটু বেশি নজর দিতেই হবে। দুর্বল ছেলের জন্যই তো মায়ের দুশ্চিন্তা হয় বেশি। ধরা যাক, ব্রিটিশ বা ইংরেজ যখন আমাদের দেশের রাজা হলো, তখন মুসলমানরা ইংরেজের বিরোধিতা করতে গিয়ে ইংরেজি শিখলো না। আর তখন ইংরেজি না শিখলে চাকরি পাওয়া যায় না। কারণ ভারতে মোগলরা যখন রাজা ছিল তখন পারসি ভাষায় দেশের শাসন চালানো হতো। ইংরেজরা পারসির জায়গায় ইংরেজি ভাষা চালু করলো। ইংরেজ আমলে মুসলমানরা ইংরেজি ভাষা না শেখায় প্রথম দফাতেই সরকারি চাকরিতে মার খেয়ে গেল। আবার ১৮৫৭ সালে ইংরেজের বিরুদ্ধে যে মহাবিদ্রোহ ঘটেছিল তাতে মঙ্গল পাণ্ডের মতো অনেক হিন্দুও ছিল। মুসলমানও ছিল। কিন্তু ১৮৫৭-র বিদ্রোহের বা স্বাধীনতা যুদ্ধের পর ইংরেজরা মুসলমানদের সেনাবাহিনীর চাকরিতে আর বহাল করার নিয়ম রাখলো না। তাদের ভয় যদি মুসলমানরা আবার সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের মতো কাউকে সামনে রেখে দেশজুড়ে বিদ্রোহ করে। এ দেশ থেকে ইংরেজদের তাড়িয়ে দেয়। ইংরেজ সরকার সে সময় মুসলমানের লাখেরাজ সম্পত্তির অধিকারও খারিজ করে দেয়। এতেও মুসলমানরা রুজি-রোজগার, সম্পত্তি, টাকা-পয়সার দিক থেকে বঞ্চিত রয়ে গেল। তা

ছাড়া এ দেশে যে সব কুটির শিল্প ছিল, যেমন ঢাকাই মসলিন শাড়ি তৈরি ইত্যাদির কাজ, সে সবও ইংরেজরা নষ্ট করে দিল। তারা ম্যাঞ্চেস্টার থেকে নতুন আধুনিক তাঁত নিয়ে এলো কাপড় বোনার জন্য। ফলে গ্রামের প্রচুর মুসলমান হাতের কাজ না পেয়ে ভিখিরি হয়ে গেল। কারণ এই হাতের কাজের মুসলমানরা ছিল সংখ্যায় অনেক বেশি। তা, একটা সম্প্রদায় যদি এভাবে টাকা-পয়সা, রুজি-রোজগারের দিক থেকে ভিখিরি হয়ে যায় তারা তো পিছিয়ে পড়বেই। উন্নতির আসল ব্যাপার তো টাকা-পয়সার ওপরই নির্ভর করে।

এভাবেই এ দেশের তপসিলি জাতি-উপজাতির মানুষ, মুসলমান, জনজাতি গোষ্ঠীর লোক, পাহাড়ি মানুষজন শহর বা আধা শহুরে ভদ্দরলোকদের থেকে সব ব্যাপারেই পিছনের সারিতে হটে গেল। হয়ে পড়লো অনেকটা কোণঠাসা।

তাই আমাদের দেশে যখন ইংরেজদের হাত থেকে ক্ষমতা চেয়ে নিল আমাদেরই প্রতিবেশী ভদ্রলোকরা, তখন তারা এই সব পিছিয়ে পড়া সারির মানুষদের জন্য একটু আলাদা নজর দেওয়ার কথা ভাবলে এখন সমস্যা এতো জটিল হয়ে উঠতো না।

কিন্তু স্বাধীন ভারতে সেই ১৯৪৭ সালে যারা ক্ষমতায় বসলো তারা ভদ্দরলোক হলে কী হবে, আসলে তো তারা ছিল ইংরেজের গোলামি করা ব্যবসায়ী, কারখানা মালিক, ছোট ছোট রাজা, জমিদার, জোতদার, মহাজন, সুদখোর শ্রেণীর লোক। তাদের রক্তের মধ্যে গরিবদের ঠকিয়ে খাওয়ার অভ্যাস। গরিবকে শোষণ করেই তো তারা বা তাদের বাবা-ঠাকুরদারা বড়লোক হয়েছিল। মানুষ তো আর জন্মের সময় পুঁজি সঙ্গে নিয়ে জন্মায় না। তখন তো মানুষ ন্যাংটো, খালি হাত। দেশ স্বাধীন করার জন্য যারা সূর্য সেনের, ক্ষুদিরামের মতো লড়াই করেছিল, সেই সূর্য সেন, ক্ষুদিরামদের যারা ইংরেজ সরকারের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল তারা বা তাদের বংশধররাই স্বাধীন ভারতে রাজা-উজির, আমলা মন্ত্রী হয়ে বসলো। এই রাজা-উজীর, আমলা-মন্ত্রীরা তো আর সেই রাশিয়ার লেনিন সাহেবের মতো লড়াই করে দেশের স্বাধীনতা আনেনি। এরা ইংরেজদের হাত থেকে ভিক্ষে করে ক্ষমতা নিয়েছিল। আর তখন ইংরেজেরই উপায় ছিল না উপনিবেশ দখলে রাখার। ১৯৩৯ সালে সারা দুনিয়াজুড়ে যে-যুদ্ধ বাধে ৬ বছর সেই যুদ্ধ চলার পর ১৯৪৫ সালে পৃথিবীর চেহারাই বদলে যায়। তখন আর ইংরেজের মতো বিদেশী রাজাদের জারিজুরি আগের মতো জোরদার ছিল না। ইংরেজের নিজের দেশ ব্রিটেনের তখনকার রাজা লেবার পার্টির নেতারাও আর ভারতের মতো এত বড় দেশের ঝামেলা কাঁধে রেখে দিতে চাইছিল না। এদিকে এদেশের বেনিয়া শিল্পপতি, রাজা-রাজড়া, জমিদাররা তো ভিক্ষের ঝুলি হাতে নিয়ে ওৎ পেতে ছিলই। তাই ইংরেজের হাত থেকে ক্ষমতা চলে গেল সেই বড়লোকদের হাতেই। ১৯৪৭-এ তাই দেশে বড়লোকরাই রাজা হলো গণতন্ত্রের নামে। ইংরেজ আমলে যে-জমিদার, জোতদার, কলকারখানার উঠতি মালিক, দেশীয় রাজা-রাজড়ারা গরিব লোককে ঠকিয়ে, দিন-রাত খাটিয়ে গরিবের চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বাজিয়ে আমোদ-ফুর্তি করতো আসল ক্ষমতা রয়ে গেল তাদেরই হাতে। এরা কেউ কারখানার মালিক, কেউ জমির মালিক, কেউ ব্যবসার মালিক। আবার কেউ-বা এই সব মালিকের পোষা দালাল। পাহারাদার। ইংরেজ রাজার পাহারাদাররা রাজা হলো। ছিদাম মুদিও হয়ে গেল শিল্পপতি। সেই রাজার আবার নতুন পাহারাদার তৈরি হলো। আর গরিব মানুষ, পিছিয়ে পড়া মানুষ, নিচের তলার না খেতে পাওয়া মানুষ পড়ে রইলো নিচের তলাতেই।

হ্যাঁ, এই নিচের তলার মানুষের জন্য খাতা-কলমে, দেশের সংবিধানে, আইনসভায় অনেক কথা লেখা হলো। বলা হলো। কিন্তু আসলে করা হলো কতোটুকু?

একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। আম্বেদকর নামে এক হরিজন বালক ছিলেন। গোবরে পদ্মফুলের মতোই। লেখা-পড়ায় দারুণ। বুদ্ধিতেও। কিন্তু হলে কী হবে, হরিজন হিন্দু। এ

হিন্দুকে বামুন-কায়েতেরা ঘরের চৌকাঠ ছুঁতে দেয় না। বামু-কায়েতের গা ছুঁতে পারবে না হরিজন। বামুনের গরুর জন্য রাখা ডাবার জল ভুল করে খেয়ে ফেলেছিল এক তৃষ্ণার্ত হরিজন বালক। তাকে বামুনরা ঠেঙিয়ে মেরে ফেললো। এই সেদিন। ১৯৯০ সালে। বিহারের একটা জায়গায়। বিহারে, মধ্যপ্রদেশে, উত্তরপ্রদেশের মতো হিন্দী ভাষী এলাকায় বামুনদের দাপট দারুণ। সেখানে হরিজন বস্তিতে প্রায় আগুন লাগিয়ে দিয়ে পুড়িয়ে মারা হয় যে-কোন অজুহাতে। সামন্ততান্ত্রিক কুসংস্কার এতোই গভীরে। তো, এই হরিজন বংশের ছেলে আম্বেদকর ১৯১৬ সালে আমেরিকায় গিয়ে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণাপত্র লিখে ডক্টরেট-এর মতো সম্মান লাভ করেন। বিলেতের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এস-সি ডিগ্রি পান ১৯২১ সালে। আইন, দর্শন, সমাজ-বিজ্ঞানে তাঁর মতো পণ্ডিত খুব কমই ছিল তার সময়ে। এহেন মানুষকে, চাকরি করার সময় হরিজন বলেই হস্টেল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। অধ্যাপকের কাজ করতে গিয়ে লাঞ্ছিত হয়েছেন কতোভাবে শুধু অস্পৃশ্য বলেই। এই আম্বেদকরই ভারতের সংবিধান তৈরির মূল কাজটা করেছিলেন। অথচ পণ্ডিত নেহরুর মন্ত্রিসভায় তিনি যখন মন্ত্রী, তখনো তার হেনস্তার শেষ ছিল না। তখন বোম্বাইতে দিল্লির কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের এক সম্বর্ধনা সভা হয়। অন্যান্য বর্ণহিন্দু মন্ত্রীদের আপত্তির জন্য আম্বেদকরকে সেই সভায় আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। মন্ত্রিত্বে থেকেও হরিজন বলেই যদি আম্বেদকরের মতো মহান মানুষের এই দুর্গতি হয়, তাহলে সেই দেশে সাধারণ গরিব পিছিয়ে পড়া আদিবাসী জনজাতির মানুষ, তপসিলি জাতি-উপজাতি সমাজের লোক বা মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, ঈশাইদের মতো ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দুর্দশা ঘুচবে কেমন করে?

জাতির জনক গান্ধীজী তো হরিজন হরিজন করে আকুল ছিলেন। কিন্তু হরিজনকে তিনি তাঁর সমাজের সমান সম্মানের জায়গায় টেনে তুলতে পারলেন না কেন? মোগল রাজা-বাদশারা তো ক্রীতদাসকেও ঘরের জামাই বানিয়ে রাজ সিংহাসনে বসার অধিকার দিতেন। গান্ধীজীর দল তেমন নিয়ম করে কি পিছিয়ে পড়া মানুষকে এগিয়ে আনার বন্দোবস্ত করতে পেরেছে? এ কারণেই আম্বেদকর উত্তর আমেরিকার কুইবেকে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে ১৯৪২ সালে প্রবন্ধ পাঠ করতে গিয়ে বলেন, 'গোঁড়া হিন্দুদের মতে অস্পৃশ্যদের কোনো অধিকার অর্জনেরই সুযোগ নেই, কারণ হিন্দু সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠার কোনো অভিপ্রায় নেই। বর্ণহিন্দুদের মতে অস্পৃশ্যতা কোনো নৈতিক ও সামাজিক অপরাধ নয়।'

'অস্পৃশ্যদের জন্য গান্ধী ও কংগ্রেস কী করেছে' নামের এক বই লেখার সময় তিনি খোলাখুলিই বলে ফেলেন যে, গান্ধীজীর চেষ্টায় অস্পৃশ্যতা বিষয় হিসেবে প্রচারিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এই সমস্যার সমাধানে কংগ্রেসের কোনো আন্তরিক ইচ্ছা ছিল না।

বস্তুত, গান্ধী, নেহরু, প্যাটেল আর তাদের কংগ্রেস দল হরিজনদের মতো পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর জন্য কোনো সম্মানের জায়গা তৈরি করার আন্তরিক চেষ্টা দেখাননি উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সামাজিক আধিপত্যের ভয়েই। আমেরিকার রাষ্ট্রক্ষমতার শীর্ষে যেমন ক্যাথলিকদের আধিপত্য, এদেশেও তেমনি উচ্চবর্ণের হিন্দুদের।

১৯১৯ সালে নির্বাচন নীতি বিষয়ক সাউথ বরো কমিটিতে দেওয়া এক সাক্ষ্যে আম্বেদকর খোলাখুলি কংগ্রেস দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে বলেছিলেন, 'জনপ্রিয় সরকার গঠনের ভিত্তিভূমি যে-নির্বাচনী নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, সেই নীতি কংগ্রেসের বৈষম্যমূলক আচরণে পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়েছে। এর ফলে বর্ণহিন্দুদের প্রতিনিধিরা দুর্বল শ্রেণীর লোকদের আবদমিত করে রাখছে।' এসব দেখেই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ বড়ো জাতকে অজগর সাপের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। বলেছিলেন বড়ো জাত অজগরের মতোই ছোট জাতকে গিলে খায়।

বস্তুত, দুর্বল শ্রেণীর মানুষ, পিছিয়ে পড়া সমাজের লোকজন ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের

সামাজিক বিকাশের সমস্যাটা এখনো সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। এখনো উপসিলি কোটায় কেউ চাকরি পেলে বা তার চাকরিতে পদোন্নতি হলে প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতৃত্বে থাকা বর্ণহিন্দুরাও নাক কোঁচকায়। সে-সমাজ নিজের ধর্মের লোকজনদের সম্পর্কে এ ধরনের ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করে তারা যে অন্য ধর্মের লোকদের কী চোখে দেখে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

এখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ ডিগ্রি পাওয়া বাংলা ভাষিক হিন্দুও আড্ডায় বসে বাঙালি মুসলমানকে বাঙলা ভাষা বলতে শুনলে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'আপনি তো মুসলমান, বাঙলা শিখলেন কী করে?' এ অজ্ঞতা, না প্রতিবেশী সম্পর্কে একধরনের ঘৃণা মিশ্রিত অবজ্ঞা তা ভেবে দেখার বিষয়। এ ধরনের মানসিকতা নিয়ে যে লোক সরকারি পদের উচ্চতম আসনে বসে আছে, তার কাছে চাকরির সাক্ষাৎকারে উপস্থিত হলে নিম্নবর্ণের মানুষ বা ভিন্নধর্মের ও গোত্রের লোক কী ধরনের সুবিচার পাবে তা নিয়ে প্রশ্ন তো উঠতেই পারে।

এখনো এই কলকাতা শহরে এবং জেলা শহরগুলোতেও মুসলমান বা হরিজন হিন্দুদের বাড়িভাড়া পাওয়া দুষ্কর। গোটা বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের 'গফুর' ও 'গহর' এর মতো বা দীনবন্ধু মিত্রের 'তোরাপ'-এর মতো মুসলমান চরিত্র ক'টা খুঁজে পাওয়া যাবে! বাংলা নাটকে মুসলমান চরিত্র মানেই ছিনতাইবাজ, পকেটমার, চোর, জোচ্চোর, খুনি, যার গলায় আল্লাহ মার্কা একটা তক্তি ঝোলে। পরনে থাকে লুঙ্গি আর মাথায় টুপি। এভাবেই মুসলমানকে আলাদা ভাবে চিত্রিত করতে করতে কিছু, বদ্ধমূল ধারণা বা সেট কনসেপ্ট চালু করে দেওয়া হয়েছে। কিছু কিছু পাহাড়ি উপজাতি হিন্দুদের সম্পর্কেও ইংরেজরা এরকম চোর-জোচ্চোর-এর ধারণা তৈরি করে দিয়েছিল, সেসব ধারণা এখনো নির্মূল হয়নি। রাজনৈতিক প্রগতিশলিতা বেড়েছে। বাড়ছে। কিন্তু সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রগতিশীলতা বাড়ছে কোথায়? তাহলে কি বিজেপি বা জামাত-ই-ইসলামির বাড় দেখা যেত? বিজেপি তো পশ্চিমবঙ্গেও ভোট বাড়াচ্ছে। ১৯৭৮-এ ভোটে বিজেপির ভোট ছিল ০.৫১%, ১৯৮৯-তে বেড়েছে ১.৭%, আর ১৯৯১-তে ১০% ভোট বেড়ে যায় বিজেপির।

কংগ্রেস ক্ষমতা দখলের জন্য জাতিগত, ভাষাগত, সম্প্রদায়গত অনেক ভেদ-চিন্তাকে প্রাধান্য দিয়েছে। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে অনেক গালভরা কথাও বলে থাকে। কিন্তু পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য সত্যিকার ভাবনা তাদের কোনো কালে ছিল না। এখনো নেই, তাই বলে বামপন্থী দলগুলোর ও বাম গণতান্ত্রিক শক্তিরও তাতে উল্লসিত হবার কোনো কারণ নেই। কারণ বামপন্থী রাজনীতি আর সত্যিকার বাম ভাবাদর্শ এক জিনিস নয়। ১৯৮৭-র তুলনায় ১৯৯১-তে বামফ্রন্টের ভোটের হার খানিকটা কমে গেছে, ৫০.৯৯% থেকে ৪৭.১%-এ নেমেছে। এটা ভাবনার বিষয় বৈকি! প্রাচ্যের মুসলমানদের জন্য লেনিনের ১৯১৯ সালের থিসিস কতো জন প্রগতিশীল নেতা উলটে দেখার প্রয়োজন মনে করেন? একটা দেশে রাজনৈতিক জিতটাই তো সব নয়। তাহলে লেনিনের দেশে ৭০ বছর পরে আবার দুর্যোগ নেমে আসে কেন? সাংস্কৃতিক ও সমাজিক চেতনার মান না বাড়লে, সেদিক থেকে একটা দেশের সমাজ-কাঠামোকে ধরতে না শিখলে চূড়ান্ত সমাজবদলের লড়াই সফল হতে পারে?

অন্তত, এই মুহূর্তে আরও পরিচ্ছন্ন বামপন্থী সরকারের বাস্তবতা সৃষ্টি হতে পারে? অথচ সর্বভারতীয় স্তরে না হলেও, এখন, এই মুহূর্তে পশ্চিবঙ্গের ক্ষেত্রে বামফ্রন্টের বিকল্প শক্তি আর কী হতে পারে? আরও পরিচ্ছন্ন বামফ্রন্ট সরকারই তো এই সময়ের বামফ্রন্টের যথার্থ বিকল্প।

আর কেন্দ্রীয় সরকার? তার চেহারা দেখলে তো মনে হতেই পারে চোর-জোচ্চোর বদমাইশদের আখড়া নাকি! রাজনীতিতে দুর্নীতি আগেও ছিল। মহাভারতেও তো 'উৎকোচ' শব্দটার সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু এখন যা চলছে তার তো কোনো তুলনাই চলে না। একটা মন্ত্রীসভার ষোলজন মন্ত্রীর নামে কেন্দ্রীয় সরকারেরই গোয়েন্দা দপ্তর চুরির অভিযোগ এনেছে। দু'জন প্রাক্তন মন্ত্রী তো জেল হাজতে। স্বয়ং দেশের প্রধানমন্ত্রীর নামেও অভিযোগ উঠছে ঘুষ খাওয়ার। কাগজে বিবৃতি দিয়ে বলা হচ্ছে, 'হ্যাঁ, প্রধানমন্ত্রীজীকে আমি ৫ কোটি টাকা ঘুষ দিয়েছি।' ভারতবর্ষের মান-মর্যাদার জায়গাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে? সারা পৃথিবীর মানুষ শুনছে প্রধানমন্ত্রী বিরুদ্ধে এই অভিযোগের কথা। আর প্রধানমন্ত্রী মশাই? তিনি মুখে কুলুপ এঁটে পাঁজি দেখছেন। কবে কোন পুণ্য তিথিতে নির্বাচনে দাঁড়ানোর আবেদনে সই করলে তাঁর জিত সুনিশ্চিত হবে। এ এক আশ্চর্য ধরনের প্রধানমন্ত্রী। তিনি নাকি আবার বিজ্ঞানের লোক। চন্দ্রস্বামীর মতো কপট সন্ন্যাসীর আশীর্বাদ ছাড়া তিনি এক পাও হাঁটতে পারেন না। একটা সময় স্বয়ং ইন্দিরা গান্ধীর মতো আধুনিক মহিলারও এই দুর্দশা হয়েছিল। তাঁরও সব কাজে নাকি ব্রহ্মচারীর দরকার হতো। আর রাজীব গান্ধীর মতো বিদেশে লেখা-পড়া করা জোয়ান যুবকও আবার এমন মাচান বাবার পাল্লায় পড়েছিলেন যে-বাবাজী হাত দিয়ে আশীর্বাদ করতেন না। রাজীবের মতো ভক্তের মাথায় পা দিয়ে শুভকামনা জানাতেন।

ব্যক্তিগত জীবনে কে কার আশীর্বাদ নেবেন না নেবেন তা নিয়ে কার কি এসে যায়? কিন্তু তিরুপতি মন্দিরে দেবতা দর্শনের জন্য যখন সরকারি কোষাগার থেকে লাখ লাখ টাকা খরচ হয় এবং প্রধানমন্ত্রীর সেই ধর্ম-কর্মের ব্যাপারটা সরকারি খরচে সারা দেশজুড়ে প্রচারের বন্দোবস্ত করা হয়, তখন দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ তো সমালোচনা করতেই পারে।

তা ছাড়া আমাদের মতো পিছিয়ে পড়া দেশের সরল ও সুবোধ নাগরিকরা এখনো রাজা-মন্ত্রী বা নেতা-শিক্ষকদের চালচলন, জীবনচর্যা দেখে দারুণভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়ে। ফলে দেশের প্রধানমন্ত্রীর বা বিশিষ্ট নেতার ব্যক্তিগত ধর্মাচরণ যখন রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়, তখন রাষ্ট্রের কি ধর্ম-নিরপেক্ষ চরিত্র ঠিক থাকে? যে-দেশের রাষ্ট্রপতি আধ-ন্যাংটা হয়ে কুম্ভমেলায় স্নান করেন আর সরকারি খরচে এই মনোরম দৃশ্যের ছবি দেশের সব খবরের কাগজে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ছেপে প্রচার করার জন্য, সে দেশে ধর্ম-নিরপেক্ষতার রাষ্ট্রীয় প্রতিশ্রুতিটাও যে ভণ্ডামিতে ভরা তা বুঝতে অসুবিধে হয় না।

যে-দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ভোগের লোভে এ ধরনের ভণ্ডামিকে প্রশ্রয় দেয় সেই দলের নেতৃত্বের কাছে আর কতোখানি সততা আশা করা যায়? ফলে হাল আমলের কংগ্রেসি নেতারা গলা পর্যন্ত দুর্নীতির পাঁকে ডুবে যাচ্ছে। নাগরওয়ালা কেলেঙ্কারি, বোফর্স কেলেঙ্কারি ইত্যাদি থেকে এখন হাওলা কেলেঙ্কারিতে এসে পৌছেছে। শুধু কংগ্রেস নয়, বিজেপির প্রধান নেতা আদবানিজীও হাওলার টাকা খেয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। রাজনীতি আর দুর্নীতি কি সমার্থক শব্দ হয়ে গেল না কি? এরপর রাজনৈতিক নেতাদের সম্পর্কে মানুষের বিশ্বাসের জায়গাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? পিছিয়ে পড়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ কোন সুবিচারই বা আশা করতে পারে?

বক্তিয়ার খালাজী (খিলজি নয়) বাংলা জয় করেন ১২০২ খ্রিস্টাব্দে। তার আগে বাংলাদেশে জাত-পাতের ভেদ-বিভেদ বীভৎসভাবে একটা সামাজিক ভিত তৈরি করে

ফেলেছিল। সেন রাজাদের আমলেই বস্তুত বঙ্গভূমিতে ব্রাহ্মণ্যবাদের আধিপত্য জোরদার হয়ে ওঠে। ফলে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের সামাজিক মান-সম্মান বা প্রতিপত্তি বলতে কিছুই ছিল না। উচ্চবর্ণের হিন্দুদের অত্যাচারে নিম্নবর্ণের মানুষ যে কীভাবে নির্যাতিত হতেন তার উল্লেখ আছে স্বামী বিবেকানন্দ, দীনেশচন্দ্র সেনের লেখায়, এমন কি, বিজয় গুপ্তের মনসা মঙ্গলেও। নিম্নবর্ণের হিন্দুদের কাছে এভাবেই হিন্দু ধর্মের উপযোগিতা ক্রমশই কমে যেতে থাকে।

এই সুযোগেই বক্তিয়ারের বাংলা বিজয় ইসলাম প্রসারের রাস্তা খুলে দেয়। নিম্নবর্ণের মানুষ দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। কারণ ইসলাম ধর্মে জাত পাতের কোনো ভেদ ছিল না। এমন কি নামের আগে বা পরে পদবী ব্যবহারেরও কোনো রীতিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি যাতে জাত্যাভিমান তৈরি হতে পারে। হযরত মোহাম্মদ নিজের নামের সঙ্গে কোন পদবী ব্যবহার করতেন না। পরবর্তীকালের খালিফারাও নন। ইসলামের এধরনের সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বাংলার লাঞ্ছিত মানুষের মনে প্রভাব বিস্তার করে।

হিন্দু নারীও তখন মানবিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত ছিল। মনুস্মৃতিতে পরিষ্কার বলা হয় নারী না কি নরকের দ্বার। সেখানে পুরষকে বাদ দিয়ে নারীর নিজস্ব অস্তিত্বের কোনো মূল্য দেওয়া হতো না। কালিদাসের শকুন্তলা নাটকেও আছে 'নারীর কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই।' অথচ ইসলাম নারীর সামাজিক মর্যাদা ও সম্পত্তির অধিকারকে বৈধ বলে গ্রহণ করে। শুধু তাই নয়, একাদশ শতকে দিল্লির সিংহাসনে মুসলমান বাদশাহরা তাদের ক্রীতদাসদেরও রাজা হওয়ার স্বীকৃতি দেয়। কুতবুদ্দীন আইবক প্রমুখ ক্রীতদাসরা যখন বাদশাহী তখতে অভিষিক্ত হতে থাকেন তখন ইসলামের ক্রীতদাস প্রথার বিরোধিতার শ্লোগানও এদেশে মানুষকে এক ধরনের সাম্যবাদী চেতনায় প্রাণিত করে।

এখনো কোরান না পড়া বহু মুসলমানের ধারণা রয়েছে যে, ইসলামে সেই ৬২২ খ্রিস্টাব্দে যে সাম্যবাদের কথা বলা হয়েছে আদর্শ হিসাবে তার তুলনা নেই। যারা আরও একটু গভীরে নেমে ভাবতে অভ্যস্ত তারা আবার ইসলামের অর্থনীতিক সাম্যের কথাও টেনে আনে। কোরানে সুদ খাওয়া একেবারেই নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত। এমন কি, এমন কথাও বলা হয়েছে যে, প্রতিবেশী কেউ যদি খাবার না খেয়ে উপোস থাকে তাহলে অন্য প্রতিবেশীর ঘরে খাবার মজুদ রাখাও হারাম বা একেবারেই নিষিদ্ধ। আর মহাজনী সুদ প্রথার মধ্য দিয়ে যে গরিব কৃষক ও মজুরেরা কী নিদারুণ ভাবে শোষিত হতে হতে ভিটে-মাটি ছাড়া হয়ে যায়, সেই অভিজ্ঞতা কৃষিজীবী ভারতবাসী বা বঙ্গদেশীদের কাছে তো অজানা নয়। তাই হিন্দু ধর্ম যখন ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যবাদের কারণেই স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে, জাত-পাত আচার-বিচারের নানা-রকমের ভেদ-বিভেদ তৈরি করে হিন্দু ধর্মকে জরাজীর্ণ দশায় পৌঁছে দেয়, হিন্দুধর্মের মানবিক আবেদন ও উপযোগিতা নষ্ট করে ফেলে, নিম্নবর্ণের শোষিত-বঞ্চিত হিন্দুদের কাছে তখন ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া ও সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবার আকাঙক্ষা প্রবল হয়ে ওঠে। এই আশা নিয়ে জাত-পাত ও পুরোহিত-প্রথা বিহীন ইসলাম ধর্মের আশ্রয় চেয়েছিল ওই শোষিত-বঞ্চিত নিম্নবর্ণের হিন্দুরা।

অথচ ইসলাম ধর্মকে এমনভাবে হাজির করা হয় যেন এটা একটা রক্ত-খেকো ধর্ম। আসলে ব্রিটিশ রাজশক্তি নিজেদের অনুপ্রবেশকে জাস্টিফাই করা বা ভারতীয়দের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার মতলবেই কিসসা কাহিনী বানিয়ে এদেশের কিছু বুদ্ধিজীবীকে গিলিয়েছিল। আরব তাতার তুর্কি মোগলরা এদেশের মানুষকে মেরে ধরে জোর করে পিটিয়ে-পাটিয়ে মুসলমান করলে আওরঙ্গজেবের আমলেও মুসলমানের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৮ ভাগের ১ ভাগ মাত্র হয় কী করে? শুধু স্মিথ বা হলওয়েল নয়, তার অনেক

আগেই লেখা হয়েছিল দান্তের 'ডিভাইন কমেডি'। তাতে ইসলাম ধর্মের সেই ৬২২ সালের প্রবর্তক হযরত মোহাম্মদকে স্থান দেওয়া হয় নরকে, একেবারে শয়তানের পাশে। যদুনাথ বা রমেশ মজুমদার ঠিক এ রকম না করলেও মুসলমানদের অসভ্য বর্বর জাত হিসেবেই চিত্রিত করতে চেয়েছিলেন।

আবার ভারতীয় মুসলমান মহারাষ্ট্রের সুলেমান বাশেদিন বিলেতে গিয়ে সলমন রুশদি নাম নিয়ে উপন্যাস লেখেন। তিনিও পশ্চিমী বদলোকের খপ্পরে পড়ে যান। তা না হলে তার 'স্যাটানিক ভার্সেস'-এর মতো উপন্যাস লেখার কী দরকার ছিল? আর তার প্রথম প্রকাশ ভারতের মাটিতেই বা ঘটাতে চাইলেন কেন? আসলে ওই উপন্যাসের নামে তিনি চেয়েছিলেন অর্থের বিনিময়ে ইসলাম ধর্মকে কুৎসিতভাবে চিহ্নিত করতে। পশ্চিমী দুনিয়া তো ইসলামকে রাজনৈতিকভাবে পরাস্ত করতে পারেনি। যে ধর্ম ৬২২ থেকে ৬৩২ সালের মধ্যে গোটা আরব দুনিয়ায় ছড়িয়ে যায় এবং পরবর্তী চার দশকের মধ্যে স্পেন পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে, সেই ধর্মের বিরুদ্ধে পশ্চিমী দেশের একটা জাতক্রোধ ছিল অনেক দিন থেকেই। দান্তের লেখা 'ডিভাইন কমেডি'র মতো রুশদির উপন্যাসেও হযরত মোহাম্মদের চরিত্রের নাম দেওয়া হয় মাহুন্ড। ইংরেজি বানানে লেখা হয় MAHOUND। স্কটিশ ভাষায় এই মাহুন্ড শব্দের অর্থ হলো শয়তান। খ্রিস্টানদের সঙ্গে যখন মুসলমানদের ধর্মযুদ্ধ চলতে থাকে সেই এগারো শতকে, তখনো ইসলামের প্রবর্তক হযরত মোহাম্মদকে মাহুন্ড বা শয়তান বলে অভিহিত করা হতো পশ্চিমী দুনিয়ায়।

এসব না জেনে-বুঝে ভারতীয় অমুসলমানরাও সলমন রুশদির লেখা নিয়ে হৈ চৈ করে দেখাতে চাইছিল মুসলমানরা কতো অসহিষ্ণু। কট্টর। বাঙলাদেশের মেয়ে তসলিমা নাসরিন যখন ধর্মীয় জেহাদ তুলে প্রগতিশীল বা কারোর কারোর মতে বিপ্লবী সেজে বসেন তখনো ভারতীয় অমুসলমানদের একটা অংশ বাংলাদেশের লোক কতো অসহিষ্ণু ও মৌলবাদী সেটা প্রমাণ করার জন্য লম্ফঝম্ফ শুরু করে। আসলে লড়াই কোন স্তরে করতে হবে সেই বোধ-বুদ্ধি নিয়ে কেউ তসলিমা নাসরিনকে মূল্যায়ন করতে চায়নি। তাহলে বুঝতো বাংলাদেশের বামপন্থী প্রগতিশীল শক্তি যখন সেখানকার পশ্চিমী দেশের দ্বারা পুষ্ট রাজনৈতিক মৌলবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে যাচ্ছে, তখন তসলিমা নাসরিন সেই রাজনৈতিক মৌলবাদের বিরুদ্ধে না গিয়ে গোটা ইসলামের বিরোধিতা করতে চেয়ে এক ধরনের নৈরাজ্যবাদী প্রবণতাকেই উসকে দিচ্ছে। এতে রাজনৈতিকভাবে মৌলবাদ তার ভিত গড়ারই যে সুযোগ পেয়ে যায়। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতীয়রা তসলিমা নাসরিনের জেহাদকে দেখতে চেষ্টাই করেনি। ভারতীয়রা যেন প্রমাণ করতে চাইছিলো দেখো বাংলাদেশের মুসলমানরা কতো সাংঘাতিকভাবে মৌলবাদী চিন্তায় আচ্ছন্ন। আর রুশদি বা তসলিমা কখন এসব কাণ্ড করছেন? যখন ইরাকের মতো দেশ পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে চাইছে। যখন যুক্তিবাদী মুসলমানরা ইসলামের ইতিবাচক দিক নিয়ে নতুন ভাবে মানুষকে সচেতন করে তুলতে চাইছে। যখন আলজিরিয়ার মতো লড়িয়ে দেশেও রাজনৈতিক মৌলবাদ ধর্মের নাম ভাঙিয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। আর ভারতের মতো বহুভাষিক ও বহু ধর্মের দেশে বিজেপি নামের একটা রাজনৈতিক দল হিন্দু মৌলবাদের উসকানি দিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে উদ্যত হচ্ছে এবং তারই প্রতিক্রিয়ায় মুসলিম মৌলবাদও ভারতের মাটিতে এক ধরনের রাজনৈতিক অবয়ব নিচ্ছে।

এ সময়েই আবার এই বঙ্গভূমির এক তরুণ লেখক দেশ পত্রিকায় পুজো সংখ্যায় এমন এক উপন্যাস লিখছেন যার সব কটা মুসলিম চরিত্রই সেক্সপারভার্ট বা যৌন বিকৃতির দাস। এই ধরনের উপন্যাস হাতে পেয়ে গিয়ে অনেক বয়স্ক কমিউনিস্টকেও আনন্দে গদগদ হয়ে উঠতে দেখা গেছে। এই উল্লাস এজন্য নয় যে, মুসলমান সমাজের চালচিত্র ওই উপন্যাসে

উঠে এসেছে। বরং এই উল্লাস এ কারণেই যে ওই উপন্যাস দেখিয়ে বলা যায়, দেখো গোটা উপন্যাসে একটা মুসলমান চরিত্রও সৎ নয়। সবগুলোই যৌন বিকৃতিতে ভোগে। আসলে যে-কথাটা উহ্য থাকে তা হলো মুসলমান শুধু রক্তপিপাসু, নোংরা, পিতৃঘাতক অসভ্য বর্বরই নয়, মুসলমান যৌন বিকৃতিরও দাস।

তখন এক ইতিহাসের অধ্যাপককে এমন কথাও বলতে শোনা যায়, আরে মোগল বাদশাহরা শত শত হারেম রাখতো তো এজন্যই। আসলে হারেম যে শুধু মুসলমান রাজা-বাদশাহরা রাখতো না, হিন্দু-রাজা-বাদশাহরাও হারেম রাখতো, সে খবর ওই অধ্যাপক হয় জানতেন না, না হয় জেনেও পুরনো চিন্তার দাসত্ব থেকে ওই ধরনের বিজাতীয় মানসিকতা পোষণ করতেন। মানসিংহের হারেমে যে দেড় হাজার হিন্দু-মুসলিম সব ধরনের নারীই ছিল এতো ইতিহাসেরই তথ্য। আর এ তথ্যও অনেকে চেপে যেতে চায় যে আওরঙ্গজেবই এই হারেম প্রথা তুলে দিয়েছিলেন এধরনের কাজকে অন্যায় ও পাপের কাজ মনে করে। যেমন আওরঙ্গদেব মদ্যপানও নিষিদ্ধ করেছিলেন। নিষিদ্ধ করেছিলেন হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় গরু কাটা বা গো-হত্যা। দক্ষিণ ভারতের একটা অঞ্চল জয়ের পর আওরঙ্গজেব লিখিত ফরমান পাঠিয়েছিলেন সেখানে গোহত্যা না করতে, কারণ তিনি জানতেন সেখানকার বেশিরভাগ বাসিন্দা ছিলো হিন্দু। উজ্জয়িনীর মহাকালেশ্বর মন্দিরে প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখার জন্য প্রতিদিন ৪ সের করে ঘি বরাদ্দ করেছিলেন যে লোক তাঁর নাম আওরঙ্গজেব।

কোনো ধর্মই শেষাবধি গরিব মানুষকে শোষণ ও বঞ্চনার হাত থেকে মুক্তি দিতে পারে কি না তা নিয়ে অবশ্যই প্রশ্ন আছে। কারণ যে খ্রিস্টান বা ইসলাম ধর্ম একটা সময় সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে স্থানীয়ভাবে প্রতিবাদের ভাষা নিয়ে জন্ম লাভ করে, অচিরেই সেই ধর্ম রাজকীয় চরিত্র পায় এবং তা তখন প্রাতিষ্ঠানিক ও কায়েমি স্বার্থের হাতিয়ারে পরিণত হয়। তা না হলে গরিবের ধর্ম হয়েও ইসলাম এতো গরিব মুসলমানের দিকে চোখ তুলে তাকায় না কেন?

এ জন্যেই বোধ হয় ইসলামী সাম্য-ধারণার বাইরে বেরিয়ে এসে বিজ্ঞান ও বস্তুবাদ নির্ভর সাম্যবাদী সমাজ গঠনের চেষ্টায় এগিয়ে এসেছিলেন এদেশের পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের মানুষ নোয়াখালির কট্টর মুসলিম পরিবেশে জন্ম নেওয়া মুজফ্ফর আহমদ, বীরভূমের আবদুল হালিম, শামসুদ্দীন হুসয়ন, ২৪ পরগনার আবদুর রাজ্জাক খান, বর্ধমানের চুরুলিয়ার কবি নজরুল ইসলাম, কলকাতায় বাস করা কুতবুদ্দীন আহমদ কিংবা লাহোরের মীর আবদুল মজীদের মতো মহান মানুষেরা। নজরুল ইসলাম ১৯২৯-এর গোড়ায় মুজফ্ফর আহমদ, আবদুল হালিম ও রাজ্জাক খানদের সঙ্গে এদেশে কমিউনিসট্ পার্টি গঠনের কাজে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯২০-এর কালের কুতবুদ্দীন আহমদ বা লাহোরের মীর আবদুল মজীদ-এর মতো অবাঙালি কমিউনিস্ট সংগঠকদের ভূমিকা স্মরণে রেখেও বলা যায় বঙ্গদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের একবারে গোড়ার যুগে বাঙালি মুসমানের উদ্যোগ আয়োজনের তুলনা ছিল না। ১৯২০-২২-এর কালে বাঙলার জাহাজী শ্রমিক ও চটকল শ্রমিক আন্দোলনে এবং কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের লড়াইয়ে খুবই নিচু তলার বাঙালি মুসলমানদেরও যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়।

এক সময়ের নিম্নবর্ণের হিন্দু ও হীনযান বৌদ্ধদের মধ্য থেকে আসা এই বাঙালি মুসলমানের বেশিরভাগই হলো গরিব ও বিত্তহীন । এখনো এ বঙ্গেও এই ধরনের মুসলমানের সংখ্যা, খুব কম নয়। প্রায় এক কোটির ওপরে। এই মুসলমানরা এদেশে ওয়াহাবি আন্দোলন করেছে। সন্ন্যাসী আন্দোলন, নীল বিদ্রোহ, ফরায়জি আন্দোলনের মতো অনেক ঘটনার মধ্য দিয়ে জমিদার জোতদারের বিরুদ্ধে রক্তাক্ত লড়াইয়ের সাহস

দেখিয়েছে। ১৯৪৬ এর আগস্ট মাসে কলকাতায় অতো বড়ো হিন্দু মুসলিম দাঙ্গার মতো বীভৎস কাণ্ডের পরও এই গরিব মুসলমানরা তেভাগা আন্দোলন সংগঠিত করেছে ১৯৪৬ সালেই। এভাবেই শহরে দাঙ্গাবাজদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে তখনকার যুক্ত বঙ্গ জুড়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সৃষ্টি হয়েছিল গ্রামের চাষাভুষো গরিব মানুষের চেষ্টাতেই।

এই মুসলমানরা পটচিত্র বানায়। যে-পটচিত্রে থাকে হিন্দুর দেব-দেবীর প্রতিকৃতি। এই পটুয়া মুসলমান মারা গেলে এদের কবরও দেওয়া হয়, আবার পুড়িয়েও হিন্দুদের মতো সংকার করা হয়। ধর্মঠাকুরের পুজোয় এই মুসলমান যোগ দেয়। যোগ দেয় গ্রামের দুর্গা পুজোর উৎসবেও। মা শীতলার পুজোতে এই মুসলমান চাল-ডাল-পয়সা দেয়। মনসার পুজোতেও এই মুসলমান দেয় টাকা-পয়সা। এরা জলের দেবতার নামে ভেলা ভাসায়। হিন্দুকে সঙ্গে নিয়ে মানত করতে যায় একই পীর সন্ন্যাসীর থানে।

তবু এই মুসলমানকে নিয়ে এখনো ঘৃণা ও বিদ্বেষের শেষ নেই। মুসলমানরা না কি বাপকে খুন করে রাজা হয়। তা, রাজার সঙ্গে এই মুসলমানের সম্পর্ক কী? কোন রাজা না বাপকে, ভাইকে খুন করে সিংহাসনের লোভে? সিংহাসনের লোভেই কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ। সে-যুদ্ধ তো ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ। অভিমন্যুর মতো বালককে হত্যা করেছিল কে? নিজের কাকা-জ্যাঠারাই তো? অশোক সম্রাট হওয়ার জন্য ভাইদের খুন করেননি? অজাতশত্রু কী করেছিলেন? বাবা বিম্বিসারকে বধ করেননি? ভগবদগীতায় শ্রীকৃষ্ণ তো ক্ষমতার জন্য গুরু ও আত্মীয়কে খুন করার উপদেশ দিয়েছেন।

আর ইউরোপের ইতিহাসে তো সিংহাসন নিয়ে বাপ-বেটায় এমন যুদ্ধের অনেক নজির আছে খ্রিস্টানদের মধ্যেও। কথায় বলে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়। এও তাই। মুসলমান সম্রাটের বদগুণের দায় চাপিয়ে দেওয়া হয় মুসলমান চাষীর ওপর। গরিব মানুষের ওপর। জাত তুলে চলে টানাটানি। খুনখারাবি যেন শুধু মুসলমানের জাতের দোষ। ভদ্রলোক, লেখাপড়া জানা মানুষের মধ্যেও মুসলমান সম্পর্কে এরকমই ধারণা এখনো রয়ে গেছে। বামপন্থী রাজনীতি করা লোকের মধ্যেও। এই ধারণাকেই এখনও পুষ্ট করে তোলা হচ্ছে। মুসলমান মানে নোংরা জীব। ঘেন্নার বস্তু। চটকল এলাকার বস্তিগুলো ঘুরলেই বোঝা যাবে সেখানে ঘিঞ্জি পরিবেশে বিহার উত্তর-প্রদেশের গরিব-হিন্দু শ্রমিক যে-নোংরা জঞ্জালের সামনে খায়-দায়-ঘুমায়, মুসলমান মজুরেরও সেই দুর্দশা। কোন মানুষ না চায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ। যদি সামর্থ্য না থাকে?

কলকাতার রাজাবাজারে, তালতলায়, খিদিরপুরে দু ফুট জায়গায় ছত্রিশটা বুড়ো, মেয়ে, শিশু গাদাগাদি করে। সেখানে পরিচ্ছন্নতা আশা করা যায়? কলকাতার বস্তি সংস্কারের দায় কার? দেশভাগের আগে সি আর দাশ আর সুভাষ বসু ছাড়া কলকাতায় যতো মেয়র হয়েছেন বেশিই ছিলেন মুসলমান। অবশ্য তাঁরা ভদ্দরলোক মুসলমান। তখন খাস কলকাতায় মুসলমান বস্তি নিয়ে আলাদা করে কখনো ভাবেননি। এখনও রাজাবাজার, খিদিরপুর, তালতলা প্রভৃতি মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে তেমন করে কেউ ভাবছেন কি? যে ওয়ার্ডে জনসংখ্যা বেশি, বাসের ঘনত্ব বেশি সেই ওয়ার্ডে কি সুইপারের সংখ্যা বাড়ানো হয়? পেচ্ছাব-পায়খানার জায়গা? রাজাবাজারের বাসিন্দারা সত্যিই বড়ো নোংরার মধ্যে জীবন যাপন করে। এর সামাজিক কারণ তো খতিয়ে দেখতে হবে। অযথা জাত তুলে নোংরা বলে নাক সেঁটকালে কী হবে? সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে তো গোটা সমস্যাটাকে দেখতে হবে।

কলকাতার খেলার মাঠের রাজনীতি আজকের নয়। কংগ্রেস আমলে, প্রফুল্ল সেন যখন মুখ্যমন্ত্রী, সাউথ ক্লাবের মতো সেরা ও সুন্দর লনটেনিস মাঠকে পেট্রোল জ্বালিয়ে পুড়িয়ে

দেওয়া হয়। মাতব্বরদের মধ্যে কেউ মুসলমান ছিল না। দেশভাগের পরেও একটা ক্লাবের নাম কেন মহামেডান বা ইস্টবেঙ্গল থাকে তা নিয়ে কেউ ভেবেছে কি? এ সেই 'আদর্শ হিন্দু হোটেল', 'হিন্দু ছাত্রাবাস' থাকার মতো ব্যাপার। এখনো প্রেসিডেন্সি কলেজের ইডেন হস্টেলে ওই কলেজের মুসলমান ছাত্রদের থাকার নিয়ম নেই। আবার বেকার হস্টেলেও কোনো হিন্দু ছাত্র থাকতে পারবে না। দুটোই সরকারি হস্টেল। দুটোতেই থাকে সরকারি কলেজের ছাত্ররা। যৌবনের শুরুতেই এই ভেদ ভাবনার বীজ। বড়ো হয়ে সে যখন খেলার মাঠে যায়, তখন ভারত-পাকিস্তানের খেলায় কে ভালো খেলে জিতলো, কে খারাপ খেলে হারলো সে-বিচারের জ্ঞান তার থাকে না। খেলাও যে সংস্কৃতির একটা বিষয় সে কথা কে মনে রাখে? খবরের কাগজ, দূরদর্শন খেলা নিয়ে এক পাগলামি চালু করে দিয়েছে। এ-এক ম্যাডনেস। আজহার ক্যাপ্টেন না থেকে যদি টেন্ডুলকর ক্যাপ্টেন থাকতেন তাহলে 'মুসলমান বেইমান' কথাটা অতো চটজলদি মাথায় আসতো না। খেলার গুণাগুণ বিচার প্রাধান্য পেত। গোড়ায় গলদ এবং তা পাহাড়-প্রমাণ। এখন চেঁচালে কী হবে? কলকাতার ক্রিকেট মাঠে পাকিস্তান জিতে গেলে আজহারকে একবাক্যে বলা হতো 'বিশ্বাসঘাতক'। এটা অস্বীকার করা যাবে?

এখনো ইতিহাস বইয়ে রামায়ণ-মহাভারতকে ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলে প্রচার চালানো হচ্ছে। ও দুটো যে গ্রিকদের ইলিয়ড-ওডিসির মতো মহাকাব্য সে কথা জোর দিয়ে ইতিহাসবিদরাও সব সময় বলেন কি? এখনো পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক বোর্ডের সপ্তম শ্রেণীর বাংলা টেকসট বইয়ে বাংলা উপন্যাসের এমন অংশ পড়ানো হয় যা ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতাকেই প্রশ্রয় দেয়। বিজ্ঞান-প্রযুক্তি চিন্তার বদলে ছাত্রদের পাঠক্রমে এখনো অধ্যাত্মবাদী ভাবাদর্শ সংক্রামিত করা হচ্ছে। সরকারের শিক্ষা সেলের বিশেষজ্ঞরা এতো উদাসীন হবেন কেন?

কংগ্রেস ইংরেজের বিরুদ্ধে ভাবাবেগ তৈরি করেছিল যার অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভিত ছিল না। শুধু বিদেশী তাড়ানোর রাজনীতি দিয়ে কি আর একটা আধুনিক জাতি গঠন করা যায়? আধুনিক মন? এখনো গোটা দেশ জুড়ে যে রাজনীতির লড়াই সেখানে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নীতি-নৈতিকতার জায়গা কতোটুকু? চিন্তার দাসত্ব, অভ্যাসের দাসত্ব তৈরি হয় কয়েকশো, হাজার বছর ধরে। একটা রক্তাক্ত বিপ্লবও অতো সহজে সেই দাসত্ব নির্মূল করতে পারে না। জার্মান দার্শনিক এঙ্গেলস একথা বলতেন। ভারতীয় রাজনীতির কুর্সি বদলের লড়াইয়ে সেই মানসিক অভ্যাসের দাসত্ব কি অতো সহজে বদলায়?

যে চূড়ান্ত লড়াইয়ে সেই দাসত্ব বদলের কাজ শুরু করা যায় তার জন্যই চাই জাত্যাভিমান ঝেড়ে মুছে ফেলা। আধুনিক যুক্তিবাদী মন তৈরি করা। সম্প্রদায়গত অভিমানগুলোকে সমাজ-বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে গুরুত্ব দেওয়া। আগে গ্রামে একটা টিউবওয়েল বসিয়ে দিলেই একরাশ ভোট পাওয়া যেত। এখন ভোটের রাজনীতি ঠিক সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। গ্রামের গরিব মানুষ এখন তার মান-মর্যাদা সম্পর্কে অনেকটা বুঝতে শিখেছে। কিন্তু ওপরতলায় এখনো তাদের নেতৃত্ব নেই। পিছিয়ে পড়া, অবহেলার মধ্যে পড়ে থাকা মানুষ একটু একটু করে জেগে উঠতে চাইছে। এ-মানুষকে শুধু ভোটাভুটির আন্দোলনে ব্যবহার করলে হবে না। সমাজ-বদলের মূল কর্মকাণ্ডে তাদের অগ্রণী ভূমিকাকে মর্যাদা দিতে হবে। মুজফ্ফর আহমদ, আবদুল হালিম, রাজ্জাক খানরা যে কাজ শুরু করেছিলেন তাকে এভাবেই এগিয়ে নিয়ে যাওয়া চাই। ইসলামের জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল হযরত মোহাম্মদের জন্মভূমি মক্কা শহরে ব্যবসায়ীদের নিয়ে নয়। মদিনা শহরের কৃষিজীবী মানুষ, গরিব শোষিত পাহাড়ি উপজাতিদের নিয়ে। গরিব মানুষের শৃঙ্খল ছাড়া হারাবার মতো কিছু থাকে না। পেছুটানও তাদের কম। পাহাড়ি উপজাতিদের জঙ্গিপনা ও

দুঃসাহসিকতার তুলনা মেলা ভার। যারা বহুদেবতা ও আচার সর্বস্ব ধর্মে বিশ্বাসী তাদের ধর্মের টান থাকে অনেক বেশি। যারা একেশ্বরবাদী তাদের মাথা থেকে একজন ঈশ্বরকে ছেঁটে দেওয়া অনেক সহজ তুলনামূলকভাবে। এদের শুধু ভোটযুদ্ধের ক্যাটালিটিক এজেন্ট হিসেবে ব্যবহার করলে ভুল করা হবে না কি?

৬

সে ১৯৭৪ সালের ঘটনা। ইসরাইলী বন্দিশালায় তখনো প্রায় ২ হাজারেরও বেশি প্যালেস্তাইনী মহিলারা আটক রয়েছেন। এ বন্দি মহিলারা রাষ্ট্রসংঘের তৎকালীন সেক্রেটারি জেনারেল ডঃ ওয়ালড্ হাইমের কাছে লিখিত অভিযোগপত্রে বন্দিশালায় তাদের ওপর যে অমানবিক অত্যাচার চালানো হচ্ছিল তার বিস্তারিত বিবরণ পাঠিয়ে দেন। তারা দাবি করেন তেল আবিব সরকার ব্যাপারটা তদন্ত করুক। প্যালেস্তাইনী মহিলা বন্দিদের ওপর ইসরাইলী কর্তৃপক্ষের ওই অত্যাচারের বিরুদ্ধে সে-সময় ৫১ বছর বয়স্ক গ্রিক ক্যাথলিক খ্রিস্টান আর্চবিশপ হোলারিয়ন বেশ জোরালো প্রতিবাদ ঘোষণা করেছিলেন। ফলে ইসরাইলী আদালত ওই খ্রিস্টান আর্চবিশপকে ১২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের শাস্তি-বিধান করে।

মিশরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসমাইল ফাহমী তখন ইসরাইলী আদালতের সেই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে বিশ্বের শান্তিপ্রিয় জনসাধারণ ও রাষ্ট্রগুলোর কাছে আহ্বান জানান প্রতিবাদ ধ্বনিত করার জন্য। তখন সাংবাদিকতার কাজে সবরকমের নেতাদেরই দ্বারস্থ হতে হতো। সে-সময় একজন জবরদস্ত মুসলমান নেতাকে প্রশ্ন করেছিলাম — স্টেটসম্যান পত্রিকার একটা সম্পাদকীয় নিবন্ধ নিয়ে যে বিশুদ্ধ মোমেনরা দেশসুদ্ধ হৈ-হৈ ফেলে দেয় তারা এখন কোথায়? প্যালেস্তাইনী মহিলা বন্দিদের সকলেই তো মুসলমান। মুসলমান রমণীদের ওপর খ্রিস্টান শাসকরা এতো নিপীড়ন চালাচ্ছে এতে মুসলমানত্বে ব্যথা লাগছে না?

সেই জবরদস্ত মুসলমান নেতা একটু হেসে আমার প্রশ্ন এড়িয় যেতে চেয়েছিলেন। অথচ পরে তাঁকেই দেখেছি মুসলিম ব্যক্তিগত আইন নিয়ে এক ধরনের সাম্প্রদায়িক জিগির ছড়াতে। মুসলমান বউকে মারধর করলে, এমন কি মারতে মারতে মেরে ফেললেও স্বামীর বিচার হবে ভারতীয় পেনাল কোড আইনে। তার জন্য মুসলিম ব্যক্তিগত আইন চলবে না। অথচ বউকে বরখাস্ত করলেই চাই মুসলিম ব্যক্তিগত আইন। মুসলমান মেয়ে বা ছেলে প্রেম করতে গিয়ে গোলমাল পাকালে ভারতীয় পেনাল কোড আইনের আওতায় যাবে। কিন্তু তারাই যদি প্রেমপর্বের পর বিবাহ পর্বে যায় তাহলে মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের অধীনস্থ হয়ে গেল। কোনো মুসলমান কাউকে ধর্ষণ করলে বিচার হবে পেনাল কোড আইনে। কিন্তু বিয়ে করলে চাই মুসলিম ব্যক্তিগত আইন। সামগ্রিকভাবে ভারতীয় আইন ও বিচারব্যবস্থার অসঙ্গতি ও অসম্পূর্ণতা এমন কি অন্তঃসারশূন্যতা নিয়ে অনেক কথাই বলা যায় যুক্তির মাধ্যমে। সপক্ষে-বিপক্ষে জনমতও গঠন করার গণতান্ত্রিক রীতিও রয়েছে। তা না করে কবে কোন্ ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে ভারতীয় মুসলমানদের এক খুবই ক্ষুদ্র বিত্তশালী অংশের জেদাজেদীতে "ব্রিটিশ প্রভুরা" একটা আইন চালু করে দিল — আর সেই আইনই আমৃত্যুকাল জাতীয় জীবনের অপরিবর্তনীয় আদর্শ হিসাবে সমস্ত মুসলমানদের অন্ধ আনুগত্য চাইবে এমনটা কি চলতে পারে?

ভারতীয় মুসলমানদের 'মুসলমানত্ব' গেল গেল বলে যারা সব সময় নিজেদের রাজনৈতিক আখের চাঙ্গা করে তুলতে চায় তাদের যদি প্রশ্ন করা যায়, আচ্ছা, পাকিস্তান তো একেবারেই একটা ঘোষিত মুসলিম রাষ্ট্র। তো, সেখানে বিয়ের আইনটা কেমন বলুন তো? তার সঙ্গে ভারতীয় মুসলমানদের বিবাহ সম্পর্কিত আইনটা মিলছে না কেন? এ-ধরনের প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠবে।

বস্তুত, পাকিস্তানে যে ভাবেই বিয়ে করুক না কেন, তা সরকারি খাতায় রেজিস্ট্রিকৃত হতেই হবে। ভারতবর্ষের মুসলমানদের মধ্যে এই রেজিস্ট্রিকরণের ব্যাপারটা এখনো আবশ্যিক বিধি বলে বিবেচিত হয় না। বিয়ে করার চাইতে বিয়ে বিচ্ছেদের ঘটনাজনিত পাকিস্তানি আইনের সঙ্গে ভারতীয় মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের যথেষ্ট ফারাক রয়েছে। পাকিস্তানের আইন অনুযায়ী আদালতের অনুমোদন ছাড়া বিয়ের বিচ্ছেদ ঘটানো যাবে না। অথচ ভারতীয় মুসলমানদের বেশিরভাগের ধারণা স্বামী ইচ্ছা করলেই তিনবার 'তালাক' বলে যে-কোনো মুহূর্তে স্ত্রীকে ত্যাগ করতে পারে। আদালত, এমন কি গ্রামীণ সামাজিক সংস্থার অজান্তেই এভাবে বিবাহ-বিচ্ছেদের ঘটনা এ-দেশে বৈধ বলে স্বীকৃতি পেয়ে আসছে। এ ক্ষেত্রে মুসলমানদের একমাত্র ধর্মগ্রন্থ কোরানে (উচ্চারণভেদে কোর আন, কুর আন বা কুরান) যে নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে তা কিন্তু একেবারেই অন্য রকম। কোরানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে একসঙ্গে দাম্পত্য জীবন বজায় রাখা একেবারেই অসম্ভব মনে হলে স্বামী প্রথম মাসে একবার তালাক দিয়ে সতর্কতা রক্ষার চেষ্টা করবে। দ্বিতীয় মাসে স্ত্রীকে আবার তালাক দিয়ে সতর্ক করে দেবে। তখনো পুনর্বিবেচনার পথ খোলা থাকবে। তৃতীয় মাসে শেষবারের মতো তালাক দিয়ে আরও এক মাস অপেক্ষা করবে। এভাবে পর পর (consecutive) তিন মাসে তিন বার তালাক দিয়ে মোট ৪ মাস অপেক্ষা করতে হবে। এর মধ্যেও যদি পুনর্মিলনের সম্ভাবনা না থাকে তাহলে তালাক বৈধ হবে।

কিন্তু কোনো মাসে যে-কোনো সময় তালাক শব্দটা উচ্চারণ করা যাবে না। মেয়েরা দেহগত দিক থেকে মাসের মধ্যে যেদিন ঋতুস্রাবের অধীন থাকে সেই অশৌচ অবস্থায় হাজার বার তালাক বললেও তালাক গ্রাহ্য হবে না। তালাক বলতে হবে তোহরা অর্থাৎ মেয়েদের দেহগত শুচিকালের সময়। অর্থাৎ স্ত্রীর প্রতি যে সত্যিই অনাসক্তি জন্মেছে স্ত্রী দেহগত শুচিকালে সেই অনাকর্ষণের প্রমাণ দিতে হবে। এর সঙ্গে আরও শর্ত রয়েছে। প্রথম মাসে তালাক বলার পর স্ত্রীর সঙ্গেই থাকতে হবে। এর মধ্যে যদি স্বামী স্ত্রীর প্রতি কামাসক্ত হয়ে পড়ে তাহলে তালাক ভেঙে গেল। পর পর চার মাস যে কোনো সময় স্বামীর কামাসক্ত হয়ে পড়ার ঘটনা ঘটে গেলে তালাক আর বৈধ হবে না। ওই নিয়ম মেনে প্রথম মাসে তালাক দেবার পর দ্বিতীয় মাসে যদি কেউ তালাক না দেয় তাহলেও তালাক হবে না।

কোরানে 'নারী' বা 'নিসা' নামে একটা অধ্যায় আছে। এই অধ্যায়ের ৩৫ অংশে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে : And if ye fear a berach between them twain (the man and wife) appoint an arbiter from his folk and an arbiter from her folk. If thery desire amendment Allah will make them of one mind. অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের পরিবার-পরিজনদের পক্ষ থেকে বিচারক নিযুক্ত করে পরস্পর মিলনের চেষ্টা করতে হবে। আর এই মিলনই ঈশ্বরের কাছে অভিপ্রেত বা কাম্য। বিচ্ছেদ নয়।

সুতরাং বিরোধ বাধলেই চটজলদি তালাক বলে বিচ্ছেদ ঘটানো যায় না। কোরানে 'তালাক' নামেই একটা অধ্যায় আছে। সেই অধ্যায়ের প্রথম অংশে এমনিক 'নবী' অর্থাৎ ঈশ্বরের পরম বিশ্বস্ত ধর্মপ্রচারকদের উদ্দেশেও বলা রয়েছে : A prophet ! When ye (men) put away women put them away for their (legal) period and reckon the period, and keep duty to Allah, your Lord. Expel them not from their house nor let them go forth unless they commit open immorality.

অর্থাৎ এই বলে সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে যে বৈধ সময়কাল মানে তিন ঋতুকালের

দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং খোলাখুলি চরিত্রহীনতার কবলে না পড়লে স্ত্রীকে স্বামীর বাসগৃহ থেকে কখনোই বার করে দেওয়া যায় না।

আর কোরানে এই চরিত্রহীনতার অভিযোগ সম্পর্কেও খুব শক্ত রীতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, "যে পুরুষ সৎ চরিত্রের নারী সম্পর্কে অপবাদ দেয় কিন্তু (তার পক্ষে) চারজন সাক্ষী হাজির করতে পারে না তাকে আশিবার কষাঘাত করো আর কখনোই তার প্রমাণসমূহ গ্রহণ করো না ---- তারাই তো দুষ্কৃতি --

"যদি একবার কেউ মার্জনা চায় ও নিজেদের সংশোধন করে তাহলে তার প্রতি আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু... ..

"তবে স্ত্রীর শাস্তি রহিত করা হবে যদি সে (স্ত্রী) চারবার আল্লাহর নামে শপথ করে ঘোষণা করে যে তার স্বামীই মিথ্যেবাদী।" কোরানে স্ত্রীকেও অধিকার দেওয়া হয়েছে স্বামীর দুর্ব্যবহার ও উপেক্ষার কারণে স্বামীকে ত্যাগ করার।

কোরানে বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কে যে-সব কথা বলা হয়েছে তার মূল মর্মার্থ হলো সুপ্রমাণিত চারিত্রিক অধঃপতন না ঘটলে এবং ধর্মত্যাগ না করলে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটানো খুবই শক্ত ব্যাপার। বিবাহ-বিচ্ছেদকে কোরানে একেবারেই উৎসাহিত করা হয়নি। হাদিসেও বলা হয়েছে 'তালাক হলো সবচাইতে ঘৃণিত বৈধ কাজ'। আবু দাউদ, ইব্ন-ই মাজা, হাকেম প্রমুখ এই মন্তব্য করেছেন তালাক সম্পর্কে। বলা হয়েছে 'দাসকে মুক্তি দেওয়া যেমন সবচাইতে প্রিয় কাজ, তেমনই স্ত্রীকে তালাক দেওয়া হলো সবচাইতে ঘৃণার কাজ।' (মনছুর ২-২৭৮)

অথচ মুসলমান সমাজের এক অংশ কোরান বর্ণিত 'তালাক' বিষয়ক এই কঠোর অনুশাসন না জেনে বা না বুঝে বিবাহ-বিচ্ছেদের ঘটনাকে হাঁড়ি-বাসন বদলের মতো জল-ভাত বা খুবই সহজ-স্বাভাবিক ব্যাপার বলে মনে করে থাকে। আসল ঘটনা কিন্তু তা নয়।

'বহুবিবাহ' সম্পর্কেও ভারতীয় সমাজের এক অংশে অনুরূপ ভ্রান্ত ধারণা চলে আসছে। বহুবিবাহের দায় যেন স্রেফ মুসলমানদের। এমন ধারণা অমুসলমানদের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে। আবার মুসলমানদের একাংশের মধ্যেও এই ভুল ধারণা রয়েছে যে কোরান যেন সব সময়েই চার মেয়েকে বিয়ে করার অনুমোদন দিয়েছে। ব্যাপারটা আদৌ সঠিক নয়।

প্রথমত, ইসলাম ধর্ম প্রবর্তিত হওয়ার (৬২২ খিস্টাব্দে) কয়েক হাজার বছর আগে থেকেই পৃথিবীর সব দেশেই বহুবিবাহ প্রথা চালু হয়ে গিয়েছিল। আর পৃথিবীর মধ্যে এ ব্যাপারে সবচাইতে বেশি টেক্কা দিয়েছে প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণ্য সমাজব্যবস্থা। ব্রাহ্মণ্য সমাজব্যবস্থাই বহুবিবাহের ঢালাও প্রচলনকে পৃথিবীর যে-কোনো দেশের চাইতে ব্যাপকভাবে প্রশ্রয় দিয়েছে এবং ধর্মশাস্ত্রের অনুমোদন সৃষ্টি করেছে। এই সেদিনও, উনিশ শতকের শুরুতেও অর্থাৎ দেড়শো বছর আগেও ভারতের কুলীন ব্রাহ্মণরা অন্তত ১০০টা মেয়ে বিয়ে না করলে ধর্মাচরণ করা হতো না বলে মনে করতো। মৃত্যুপথযাত্রী কুলীন ব্রাহ্মণ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগের মুহূর্তেও নাবালিকা মেয়ে বিয়ে করতো — এমন ঘটনার ভূরি ভূরি উদাহরণ পাওয়া যায় উনিশ শতকের ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের ইতিহাসে। উনিশ শতকে এ নিয়ে অনেক প্রহসনও লেখা হয়েছে। 'কুলীন কুলসর্বস্ব' ইত্যাদি পড়লেই ভারতীয় হিন্দুদের এই বহুবিবাহের অসংখ্য নজির পাওয়া যায়। এখনো দক্ষিণ ভারতে 'মিতাক্ষরা' বিয়ের নামে হিন্দু সমাজে বহু-বিবাহ চালু রয়েছে। আসলে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে তাকালেই বহুবিবাহের এ রকম অজস্র নিদর্শন পাওয়া যায় যা মুসলমানের বহু-বিবাহের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যাবে। ধর্মীয় কুসংস্কার ও সম্পত্তি করায়ত্ত করার নানা আর্থিক স্বার্থ এই প্রথার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। ভারতীয় হিন্দু সমাজে এখনো বহুবিবাহের ঘটনা সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে মুসলমানদের চাইতে এমন কিছু কম নয়। প্রায় সমান সমান। ভারতীয়

মুসলমান সমাজে অবশ্য বহুবিবাহের প্রবণতা এসেছে একটু অন্যভাবে। এ ব্যাপারে এ দেশের আরবি ভাষা না জানা অশিক্ষিত মোল্লা মৌলভিদের দায়ই সবচাইতে বেশি। এঁরা আরবি অক্ষর চিনে চিনে কোরান পড়েন। কিন্তু কোরানের আরবি ভাষার অর্থ একেবারেই বোঝেন না। ফলত কদর্থের সূচনা।

ভারতের মুসলমানরা আসলে ভারতেরই মানুষ। বংশের বিচারে এদের প্রায় সকলেরই পূর্ব পুরুষ হয় ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী, নয় তো খ্রিস্টপূর্ব দশো অব্দের ধর্মান্তরিত ভারতীয় হীনযান বৌদ্ধদের একটা খুব ক্ষুদ্রাকার অংশ। খোদ আরব বা ইরান থেকে ক'জন মুসলমান ভারতে এসে স্থায়ী আস্তানা গেড়েছিল তা আঙুলে গোনা যায়। ফলে ভারতে যারা ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান বনে গেলো ত্রয়োদশ শতকে, তাদের পূর্বপুরুষের লালিত অভ্যাস হঠাৎ বদলাবে কী করে? ধর্মান্তর ঘটলেই সংস্কৃতি বদলায় না। বদল ঘটে না হাজার হাজার বছর ধরে গড়ে ওঠা রীতি-নীতি, জীবনাচার ও সংস্কারসমূহে। ভারতীয় মুসলমানদেরও সেই লালিত অভ্যাস বদলাবার কথা নয়। আজও গাঁয়ে গঞ্জে ধর্মঠাকুর হিন্দুরও দেবতা। মুসলমানেরও পরিত্রাতা। ভারতীয় মুসলমানের বিয়েতে এখনো গায়ে হলুদের রীতি বর্তমান। রয়ে গেছে ধান, দূর্বা, কড়ি, পান হাতে বিয়ের গীত গাওয়া বা নৃত্য প্রদর্শনের রীতি নীতি। এমন হাজার হাজার উদাহরণ রয়েছে যা ভারতীয় হিন্দু ও ভারতীয় মুসলমানের সংস্কৃতির শরীর নির্মাণ করেছে একই উপাদানের ভিত্তিতে। বহুবিবাহকে এ-ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে ভুল করা হবে।

তবে কোরানে বহুবিবাহের ঢালাও অনুমোদন কোথাও নেই। কোরানে বহু বিবাহ বিষয়ক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় মাত্র একটা জায়গাতেই। ইসলাম ধর্ম প্রচারের শুরুর দিকেই, সপ্তম শতকে ওহোদের যুদ্ধ ঘটে। তখন মুসলমানের সংখ্যা হাতে গোনা যায়। সেই যুদ্ধে ৭০ জন মুসলমান নিহত হয়। এটা বদর যুদ্ধের পরের ঘটনা। এই যুদ্ধে হজরত মোহাম্মদের নিজের জীবনও বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। সেই যুদ্ধে নিহত মুসলমানদের সন্তান ও স্ত্রীদের কথা মনে করেই হিজরি সনের ৪র্থ বছরে অর্থাৎ ৬২৬ খ্রিস্টাব্দে কোরানে চতুর্থ অধ্যায় 'নিসা'র ২য় অংশে বলা হয়েছে : 'Give unto orphans their wealth. Exchange not the good for the bad (in your management thereof) nor absorb their wealth into your own wealth. Lo' that would be a great sin.'

অর্থাৎ 'অনাথদের সম্পত্তি অনাথদেরই দিয়ে দাও। আর উৎকৃষ্ট বস্তুর বদলে নিকৃষ্ট বস্তু দিও না কিংবা তোমাদের সম্পত্তির মধ্যে তাদের সম্পত্তি গ্রাস করে নিও না। সেটা হবে ভয়ানক দোষণীয়'। ওহোদের যুদ্ধে নিহত মুসলমানদের অনাথ সন্তানসন্ততিদের ওপর এভাবে সুবিচারের নির্দেশ ব্যক্ত হবার পরই, সেই সুবিচার করা যে বেশ দুরূহ বা কষ্টসাধ্য সেকথা অনুভব করেই ওই নির্দেশের ঠিক পরের অংশে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে :

'আর যদি আশঙ্কা করো যে, অনাথদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত আচরণ করতে পারো না, তাহলে সেই অনাথদের মায়েদের মধ্যে তাদের বিয়ে করে নাও যাদের তোমার পছন্দ হয় — দুই, তিন বা চারজন। কিন্তু যদি আশঙ্কা করো যে, তাদের ওপর ন্যায়বিচার করতে পারবে না তবে একজনকেই (বিয়ে করো) অথবা তোমাদের অধীনে আসা দাসীদের। এটাই অধিকতর সঙ্গত যে, তোমরা অবিচার করবে না।'

এই অংশ থেকে কী শিক্ষা গ্রহণ করা যেতে পারে? প্রথমত যুদ্ধকালীন একটা জরুরি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই যুদ্ধপীড়িত অনাথ ছেলে-মেয়েদের রক্ষণাবেক্ষণের স্বার্থেই যুদ্ধে নিহত মুসলমানদের বিধবা স্ত্রীকে বা যুদ্ধবন্দি দাসীকে প্রয়োজনে চারজন পর্যন্ত বিয়ে করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু পরক্ষণেই সাবধান করে দেওয়া হয়েছে 'যদি তাদের সকলের প্রতি সমান ও ন্যায়বিচার করতে পারো।' আবার পরক্ষণেই বলা হয়েছে 'এবং তোমরা যতই

ইচ্ছা করো না কেন তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সমান ব্যবহার করতে কখনোই পারবে না।'

মানবিক দৃষ্টিতে দেখলে কী মনে হয়? একজন পুরুষ দুজন স্ত্রীকে সমান ভালোবাসা দিতে পারে? যদি তা না দিতে পারে তাহলে তো একজন নারীকেই বিয়ে করাটাই আদর্শ ব্যাপার। কোরানের উপরোক্ত বাক্যগুলোর মধ্যে কি তাহলে এক পতি-পত্নী ব্যবস্থাকেই শ্রেয়তর বলে বর্ণনা করা হচ্ছে না? আর যুদ্ধকালীন পরিপ্রেক্ষিতে যদি একাধিক বিয়ের কথা হয়েই থাকে বলে ধরে নিই তাহলে স্বাভাবিক জীবনে স্বাভাবিক অবস্থায় চার বিবাহ কীভাবে বৈধ বলে স্বীকৃত হবে? অথচ ভারতীয় মুসলমানদের একাংশ এ নিয়ে বিভ্রান্তির শিকার হয়ে আসছে। আর এ নিয়ে ভারতীয় হিন্দুদেরও ঠাট্টারও সীমা নেই, না জেনে বা না বুঝে তারাও ধরে নেয় মুসলমানরা বোধহয় চার বিয়ে করতেই পারে। হিন্দুদের ভেতরও যে বহুবিবাহ চালু রয়েছে, এমন কি তার শাস্ত্রসম্মত অনুমোদন রয়েছে সে কথা তারা ভুলে যায়। খোদ মনুই যে নারীকে 'নরকের কীট' বলে মন্তব্য করেছেন সে কথা ভুলে গিয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের কেউ কেউ মুসলমানদের ব্যঙ্গ করে।

ভারতীয় মুসলমানদের একাংশ যেমন কোরানের মূল শিক্ষাকে অনুধাবনে অক্ষম, তেমনি আবার পৃথিবীর অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রে এসব বিষয় নিয়ে কতো সময়োপযোগী পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে তারও খোঁজখবর রাখে না কুশিক্ষা, শিক্ষাহীনতা ও কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে। যেমন ইউরোপের একমাত্র মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠের দেশ তুরস্কে ১৯২২ সালে কামেল আতাতুর্কের নেতৃত্বে যে বিপ্লব সংঘটিত হয়, সেই বিপ্লবের পরে সুইজারল্যান্ডের সিভিল কোডের অনুসরণে তুরস্কে বিবাহ ও তালাক বিষয়ক আইন একেবারে বদলে গেছে। তুরস্কে ১০০ জনের মধ্যে ৯৯ জন মুসলমান। তবু তারা বিবাহ ও তালাক নিয়ে ভারতের মতো মুসলিম ব্যক্তিগত আইন মেনে চলে না। তুরস্কের আইনে সিভিল কোর্টে রেজিস্ট্রি করে বিবাহকার্য সিদ্ধ হয়। রেজিস্ট্রির পর কেউ ইচ্ছা করলে ধর্মমতে বিয়ের অনুষ্ঠান করতে পারে। কিন্তু বেশির ভাগ মানুষ আর সেই অনুষ্ঠান করার প্রয়োজন মনে করে না। শুধু তাই নয়, তুরস্কে বহুবিবাহ আইনত নিষিদ্ধ। সিভিল কোর্টের অনুমোদন ছাড়া বিবাহ-বিচ্ছেদও ঘটানো যায় না। স্ত্রী না চাইলে পুরুষ বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে না। আইন সেখানে পুরুষের চাইতে বেশিটা নারীর পক্ষে।

পাকিস্তানেও কোর্টের অনুমোদন ছাড়া তালাক দেওয়া যায় না। বউ থাকতেও আর একটা বিয়ে করতে হলে পাকিস্তান কোর্টের সম্মতি লাগে। কেউ যদি বন্ধ্যা হয়, অর্থাৎ সন্তান উৎপাদনে অক্ষম বা যৌনকার্যের ক্ষেত্রে ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়ে, সেক্ষেত্রে বউয়ের অনুমতি মিললে তবেই দ্বিতীয় বিয়েতে পাকিস্তানের কোর্ট সম্মতি দেয়। ১৯৬২ সালে পাকিস্তান সরকার বহুবিবাহ বন্ধ করার জন্য আরবিট্রেটর কাউনসিল গঠন করে। এই আইন না মানলে জেল ও জরিমানা দু'রকমেরই শাস্তি দেওয়া হয় পাকিস্তানে। মিশরেও দ্বিতীয় বিয়ে করতে গেলে প্রথম স্ত্রীর সম্মতি লাগে। এই আইন না মানলে মিশরে ২০০ পাউন্ড জরিমানা বা ৬ মাস জেল খাটতে হয়।

মিসেস অ্যানি বেসান্ত মন্তব্য করেছিলেন খ্রিস্ট ধর্মের চাইতে ইসলাম ধর্মে মেয়েদের স্বাধীনতা অনেক বেশি। ভারতীয় মুসলমানরা অনেকেই কোরান-বর্ণিত নারীদের সেই স্বাধীনতা দেওয়ার ব্যাপারটা বোঝেই না। ইসলাম ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে যে আরব ভূমণ্ডলে সেই সৌদী আরবে মেয়েরা হাত মুখ ঢাকা বোরখা পরে না। অথচ ভারতের অবাঙালি মুসলমানদের অনেকেই এখনো মেয়েদের আপাদমস্তক বোরখায় ঢেকে রাখতে চায়। সৌদী আরবে মেয়েরা ব্যাঙ্কে চাকরি করে, হাসপাতালে নার্সের কাজেও নিযুক্ত রয়েছে। হাসপাতালে মহিলা সেবিকারা পুরুষ রোগীর সেবা করলে যে দোষের হয় না একথা ভারতীয় মুসলমানদের অনেককেই বোঝানো মুশকিল। যে বিশুদ্ধ মোমেনরা

মেয়েদের আব্রু নিয়ে, সতীত্ব নিয়ে চেঁচায়, তার কিন্তু সেই দরিদ্র মুসলমান মেয়েদের কথা কখনোই গুরুত্ব দেয় না যারা ছেঁড়া-ফাটা ন্যাকড়া পরে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করে বেড়ায়।

সৌদী আরবে সব রকমের ভিক্ষাবৃত্তি নিষিদ্ধ। ভিক্ষা করতে দেখলেই তাকে জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ক'জন ভারতীয় মুসলমান এ খবর রাখে? সৌদী আরবে পীর প্রথা নিষিদ্ধ। পাকা কবর বানিয়ে রাখাও নিষিদ্ধ। মাদুলি তাবিজ, জলপড়াও নিষিদ্ধ। তুকতাক ও অবৈধ যৌনাচার দুইই নিষিদ্ধ। আর ভারতবর্ষে? এখানে তো মুসলমান সমাজে এসব কুসংস্কার, কুআচার ও অন্ধ ভাবাবেগ পাকাপোক্ত ভিত গেড়ে বসে আছে। সৌদী আরবের কাবাক্ষেত্র বিশ্বের তাবৎ মুসলমানদের কাছে সবচাইতে বড়ো পবিত্র স্থান। সেই কাবা প্রাঙ্গণে পুরুষ ও মেয়েরা তো এক সঙ্গে পাশের সারিতে একই ইমাম বা নেতার পিছনে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা বা নমাজে অংশ নেয়। ভারতে কোনো মসজিদে বা ঈদগাহে মেয়েদের কি এ সুযোগ দেওয়া হয়? তা তো নয়, এর নাম আব্রু রক্ষা? পশ্চিম এশিয়ার সব মুসলিম রাষ্ট্রেই পুরুষেরা কোট প্যান্ট টাই পরে নমাজ পড়ে। ও সব দেশে শতকরা পাঁচজন মানুষকেও দাড়ি রাখতে দেখা যায় না। বরং বালক থেকে বৃদ্ধ সকলেই প্রায় দেদার ধূমপান করে। ভারতের মোল্লা মুসলমানরা এসব ভাবলে বোধ হয় ডিগবাজি খেয়ে যাবে।

কোরানে দাসপ্রথার ঘোরতর বিরোধিতা আছে। সম্পদ মজুদ করা, মহাজনী সুদ চালিয়ে মানুষকে শোষণ করা, প্রতিবেশীকে উপবাসে দিন কাটাতে দেখেও নিজের সম্পদ গচ্ছিত রাখা নিদারুণভাবে নিষিদ্ধ। সম্পদকর না দেওয়া, মুনাফার অংশ দান না করাও মহাপাপ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আর আক্ষরিক ও লৌকিক শিক্ষাকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সামগ্রিক শোষণ, ব্যাভিচার, মদ্যপান ইত্যাদি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কই, কোরানের এসব ইতিবাচক শিক্ষাকে তো তেমন করে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না এদেশে। শুধু শাদী তালাক আর বোরখা পর্দার ফতোয়া দিয়ে কি একটা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অগ্রগমন ঘটে?

পৃথিবীর অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্র যুগ ও জীবনের তাগিদে নতুন পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিচ্ছে। অনেক পুরনো মূল্যবোধ পেরিয়ে নতুনতর মূল্যবোধ সৃষ্টি করছে। দেশ রক্ষার জন্য মহিলারাও রাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনীতে অংশ নিচ্ছে। হজরত মোহাম্মদের আমলেও মেয়েরা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। হজরত মোহাম্মদের স্ত্রী আয়েষাও তো যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন বলে জানা যায়। সেই শিক্ষাকে মনে রেখেই মুসলিম রাষ্ট্রের মেয়েরা নৃত্য-গীত, খেলাধুলা, অভিনয় — সর্বত্রই পুরুষের পাশে হাঁটছে। অথচ ভারতবর্ষে মুসলমানদের একটা বড়ো অংশে তথাকথিত 'মুসলমানত্ব' রক্ষা করার নামে পেছুগামিতা, যুক্তিহীনতা, অনাধুনিকতা, কুসংস্কারাচ্ছন্নতা পায়ের বেড়ি হয়ে পড়েছে। এই শৃঙ্খলে গোটা ভারতবর্ষই বাঁধা। শুধু মুসলমান নয়, অমুসলমানরাও ভাববাদ, অলৌকিকতা ও কূপমণ্ডুকতায় নানাভাবে আচ্ছন্ন। এই আচ্ছন্নতা জেঁকে বসছে ভারতবর্ষের স্বভাবে। কোনো কবি একদা বলেছিলেন এদেশে পুজোও বাড়ে, প্রগতিও বাড়ে — তাহলে আসলে বাড়ে কোন্‌টা? প্রশ্নটা বোধহয় খুবই প্রাসঙ্গিক। মুসলমানদের জন্য তো বটেই।

এই অবোধ মুসলমানকে ভোটের লড়াইয়ে লড়িয়ে দিচ্ছি সকলে মিলে। কিন্তু মুসলমানের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক লড়াই লড়বে কে?

৭

প্রতি বছরই প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে রাষ্ট্রপতি তাঁর প্রথাগত বাণী বিতরণের সময় ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে উদ্ভূত সাম্প্রদায়িকতা নিরসনের জন্য জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে

থাকেন। বলাবাহুল্য, রাজনীতিবিদ থেকে শুরু করে সমাজবিদ, বুদ্ধিজীবী ও সংবাদপত্রসেবীদের মাথায় সাম্প্রদায়িকতা নামক অশুভ উন্মাদনাকে বর্তমান ভারতবর্ষের প্রধান বিপদ হিসাবে সূচিহ্নিত করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর শাসনকালে সাম্প্রদায়িকতার জায়গায় স্বৈরতন্ত্রকে প্রধান বিপদ হিসাবে সুপ্রমাণিত করার তাত্ত্বিক কেতা-কৌশল নিয়ে যারা উচ্চবাক ছিলেন তারাই পরে রাজীব গান্ধীর প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণের সময় স্বৈরতন্ত্রের বিপদকে প্রধানতম বিপদ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করার ক্ষেত্রে খুব স্পষ্টভাবে উচ্চকিত হওয়া থেকে কিছুটা নিঃশ্চেষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন। এই রাষ্ট্রকাঠামোকে অক্ষুণ্ণ রেখে প্রধানমন্ত্রীর আসনে ব্যক্তি বদল দিয়ে যদিও যথার্থ রণনীতির হেরফের ঘটার কারণ নেই বলেই অনেক বামপন্থী নেতৃবৃন্দ সঠিক ভাবেই মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, তবুও অবস্থাদৃষ্টে এমন মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, উনিশশো আশিতে মোরারজী দেশাইয়ের প্রধানমন্ত্রিত্বের সময়ে যেমন সাম্প্রদায়িকতার বিপদকে মূল সংকট বলে মোকাবিলা করতে গিয়ে পরোক্ষভাবে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর পুনরাগমনের পথ প্রশস্ত হয়ে গিয়েছিল যথার্থ বিকল্পের অভাবে, তেমনি আবার রাজীবের আমলে শাসকশ্রেণীর চরিত্রগত মৌল পরিবর্তন না ঘটিয়েও শাসকশ্রেণীর ও শাসকদলের পক্ষ থেকেই সাম্প্রদায়িকতার বিপদকে মূল বিপদ বলে সর্বত্র প্রচার চালিয়ে রাজীব প্রশাসনের স্থায়িত্বকে সুদৃঢ় করে তোলার প্রক্রিয়াই কার্যকর হয়ে যায়! রাজীব গান্ধী খুন না হয়ে গেলে ভারতীয় রাজনীতির চেহারা কোন জায়গায় গিয়ে দাঁড়াত, সে কল্পনায় না গিয়েও প্রশ্ন তোলা যায়।

বুর্জোয়া-জমিদার নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্র কাঠামোয় সাম্প্রদায়িকতাকে মূল সংকট হিসাবে চিহ্নিত করা যায় কি না, কিংবা, সাম্প্রদায়িকতা রাষ্ট্র কাঠামোর মূল সংকটের কোনো একটা শুধু বহিরাবরণ কি না, মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির সে-বিতর্কে না গিয়েও বলা যেতে পারে যে, সাম্প্রাদায়িকতা নিঃসন্দেহে সমাজ প্রগতির ক্ষেত্রে বুর্জোয়া সমাজের অন্যান্য অনেক অশুভ সংকেতের মতোই একটা প্রতিবন্ধক উপাদান বলেই বিবেচিত হয়। কিন্তু এটা যে বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্টি এবং বুর্জোয়ারাই যে তাদের শ্রেণীস্বার্থের রক্ষক শাসকদলকে দিয়েই এই সাম্প্রদায়িকতা নামক বিষবাষ্পকে সৃষ্টি করে, পুষ্ট করে এবং সময় ও সুযোগ মতো নিজেদের শাসন ও নিয়ন্ত্রণকে বলবৎ রাখার জন্য কাজে লাগায় এই আসল ব্যাপারটা আমরা অনেক সময়েই ভুলে যাই। ফলে শাসকদলের পক্ষ থেকে মাঝে মাঝে যখন 'আই ওয়াশ' করানোর জন্য সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী জিগির চালানো হয়, তখন অনেকেই হঠাৎ শুভবুদ্ধিসম্পন্নের দাবিদার হয়ে গিয়ে কিছু মোটা মোটা দাগের কথা বলে ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ি। প্রজাতন্ত্র দিবসের আগের দিন রাষ্ট্রপতির প্রথাসিদ্ধ বাৎসরিক বাণী বিতরণের মধ্যে শাসকদলের সেই ভণ্ডামিই যে লুকিয়ে থাকে, বস্তুত একথা অবিশ্বাসের কোন কারণ নেই। কেন না, ভারতীয় সাংবিধানিক বিধি-বন্ধনে রাষ্ট্রপতির মুখ দিয়ে যা বলানো হয় তা শাসক দলেরই মুসাবিদা ছাড়া আর কিছুই নয়।

সুতরাং এদেশে শাসকদলের তথাকথিত 'ন্যায় নীতি ও কার্যকলাপের' দিকে নজর দিলেই এসব কথা যে নিছক ভণ্ডামি ও মানুষকে নতুন করে বিমোহিত করার প্রয়াস ছাড়া আর কিছুই নয় তা স্পষ্ট হয়ে যায়।

ধরা যাক প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর নির্বাচনী কৌশলের কথা। যে বি জে পি দল ভারতবর্ষের সমস্ত মানুষকে হিন্দু ধর্মের দ্বারা ধর্মান্তরিত করে ইন্ডিয়ানাইজেশন বা ভারতীয়করণের আদর্শ নিয়ে প্রকাশ্যে ও গোপনে গোটা দেশজুড়ে দীর্ঘদিন ধরে কর্মতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে রাজীব গান্ধীর এ রকম সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর সঙ্গে নির্বাচনী আঁতাত করতে এতোটুকু বাধেনি স্রেফ রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির কারণেই। প্রকৃতপক্ষে উত্তর

ও দক্ষিণ ভারতের অ কংগ্রেসী নেতারাই শুধু নয় পশ্চিমবাংলার মতো পাকা মাথার অনেক বামপন্থী দলও তখন রাজীব গান্ধীর এই হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদী রাজনৈতিক কৌশল সম্পর্কে যথাযথ মূল্যায়ন করতে চেষ্টা করেনি। এমন কি তখনকার নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে রাজীব গান্ধীর সেই মনোভাবের কঠোর সমালোচনাও তেমনভাবে দেখা যায়নি। শাসকদল যখন দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হিন্দু সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক স্বার্থের দাবিদার হয়ে ওঠে, তখন জনসংঘের মতো সাম্প্রদায়িক শক্তির ওপরও আর হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের ভরসা রাখার প্রয়োজন হয় না। দেওবসও তখন রাজীবের স্বপক্ষে প্রচারে নামতে উৎসাহিত হয়।

শুধু কি তাই? রাজীবের প্রিয় জননী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীও তো উনিশশো আশীর নির্বাচনের সময় থেকেই এই কৌশল নিয়েছিলেন নিজেকে রাজনৈতিকভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠ করার জন্য। তিনিও তো যখন মন্দিরে যেতেন বা সন্ন্যাসী বাবাদের দর্শনের জন্য আকুল হয়ে উঠতেন তখন ধর্মকে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অঙ্গ হিসাবে বিবেচনা না করে রাষ্ট্রীয় জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে দেখানো হতো সরকারি প্রচারযন্ত্রে ও সরকারপুষ্ট সংবাদপত্র গুলোতে। বহু ধর্মের দেশে একটা বিশেষ ধর্মকে যখন রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয় তখন ধর্ম স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায়। শ্রীমতী গান্ধী ও তাঁর দল এভাবেই ধর্মীয় ভেদবুদ্ধিকে পুষ্ট করে তুলেছিলেন এই রাজনৈতিক ফায়দা লোটার তাগিদেই।

এমন কি, যে যাই মূল্যায়ন করুন না কেন, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সোভিয়েত ঘেঁষা নীতি ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকা নিয়ে, নেহরুও আগাগোড়া ধর্মকে ব্যবহার করেছেন তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্ব পাওয়া ও তাকে বলবৎ রাখার প্রয়োজনে। উনিশশো ছেচল্লিশে ক্রিপস মিশন প্রস্তাবে শেষাবধি মুসলিম লিগের মহম্মদ আলি জিন্না যে ভারত ভাগ না করে 'জয়েন্ট ইলেকটোরেট' ব্যবস্থা মেনে নিয়েছিলেন সে তো 'ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডাম' বইয়ে মাওলানা আজাদ লিখেই গেছেন। অথচ? সেদিন রাত্রেই সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে নেহরুজী 'জয়েন্ট ইলেকটোরেট' প্রস্তাব অমান্য করলেন কোন স্বার্থে? ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ভাগের ঘটনা ঘটাতে না পারলে তড়িঘড়ি স্বাধীন ভারতের অবিসংবাদী প্রধানমন্ত্রী হওয়া যাবে না, বা বৃহত্তম জনসংখ্যা অধ্যুষিত অবিভক্ত বাংলার নেতৃত্বকে কোণঠাসা করে হিন্দীভাষী উত্তর ভারতের প্রধান্য ভরতীয় শাসনে একচ্ছত্রভাবে প্রতিষ্ঠা করা যাবে না — এমন আশংকা কি নেহরুর মনে দানা বাঁধেনি তখন?

আর নেহরু থেকে ইন্দিরা — ৩৭ বছরের ইতিহাসই বা কি সাক্ষ্য দেয়? স্বাধীনতার পর এমন একটা দিনও কি কেটেছে যেদিন হয় ধর্মীয়, নয় ভাষাগত কিংবা জাত-পাত নিয়ে ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক সংঘাত না ঘটেছে? সেক্ষেত্রে ভারত সরকার এতো বছরেও সেই সাম্প্রদায়িকতা নির্মূল করতে পারল না-ই বা কেন?

আসলে ধর্মকে রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের মধ্যেই জীইয়ে রাখা ও রাষ্ট্রীয় মদতেই ধর্মীয় ভেদাভেদকে পুষ্ট করে তোলার নীতি থেকে কংগ্রেস দল এতটুকু সরে আসতে পারেনি নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার স্বার্থেই। আর বামপন্থী দলগুলো সাম্প্রদায়িকতার রাজনৈতিক বিপদ সম্পর্কে যতোটা সচেতনতা দেখিয়ে থাকে, এর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভয়াবহতা নিয়ে ততোটা মাথা ঘামাতে চায়নি বললেও কি খুব ভুল বলা হবে?

পাশাপাশি সমাজতান্ত্রিক দেশের দিকে তাকালে ঠিক উল্টো দৃষ্টান্তই চোখে পড়ে। সেখানে ধর্ম নিছক মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ব্যাপার। রাষ্ট্র তাকে মদত দিয়ে পুষ্ট করে না। তা নিয়ে প্রচার চালায় না। অথচ ভারতবর্ষে, প্রাথমিক স্কুলের পাঠ্যবই থেকে শুরু করে রাষ্ট্র ও সমাজের সর্বস্তরে ধর্মীয় বিশ্বাসকে ইন্ধন দিয়ে পুষ্ট করে তোলা হয়।

এক ধর্মকে ছোট করে আরেক ধর্মকে বড় করে তোলার বা দেখানোর অপপ্রয়াস চালানো হয় সরকারি প্রচারযন্ত্র ও পাঠ্য বইয়েও। মানুষকে বস্তুবাদী বিজ্ঞান চেতনায় বিশ্বাসী ও যুক্তিনির্ভর করে না তুলে রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপের মধ্যে অদৃষ্টবাদী, কূপমণ্ডুক, অধ্যাত্মবাদী করে তোলার চেষ্টা চালানো হয়। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিও এসবে মদত দেয়। সরকার তাকে বাহবা দিতেও দ্বিধা করে না। স্কুল-কলেজ — বিশ্ববিদ্যালয়, চাকরি, পাশপোর্ট, ব্যবসা, নির্বাচন ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের সবক্ষেত্রেই ধর্মীয় পরিচয় অত্যাবশ্যক। কেউ যদি ধর্মে বা ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হয় তার ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রীয় এই বিধির বাইরে যাবার উপায় নেই। ধর্মীয় অনুশাসন অনুযায়ী পদবী ছাড়া একটা শিশুরও স্কুলে ভর্তির অধিকার নেই এই দেশে। ধর্মকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর এমন জবরদস্ত একটা ভিত হিসাবে ব্যবহার করে কি ধর্মীয় গোঁড়ামির অবসান ঘটানো যায়? সমাজবিজ্ঞানীরা কী বলেন? ধর্ম থাকবে অথচ ধর্মীয় ভণ্ডামী, ধর্মীয় গোঁড়ামি, ধর্মীয় ভেদ-ভাবনা, ধর্মীয় কুসংস্কার থাকবে না এটা কেমন করে হয়? একদা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী অমৃতসর মন্দিরে সেনা অভিযান চালিয়ে বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তিকে দমন করতে গিয়েছিলেন বলেই তো শিখ ধর্মের মানুষের হাতে তাঁকে প্রাণ দিতে হয়!

গান্ধীজীকে মুসলমান ঘেঁষা বলে যে আর এস এস কর্মি খুন করে সেই আর এস এস এর সঙ্গে ভোটে জেতার জন্য শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও রাজীব গান্ধীও তো গোপন আঁতাত করার চেষ্টা করেন।

জ্ঞানী জৈল সিংকে ভারতের রাষ্ট্রপতির পদে বসানোর পেছনে শ্রীমতী গান্ধীর শিখ সম্প্রদায়কে তুষ্ট করার সংগোপন বাসনা ছিল না এমন কথা কি জোর দিয়ে বলা যাবে? ফকরুদ্দীন আলি আমেদকেও রাষ্ট্রপতির আসনে বসানোর পেছনে সেই কপট অভিসন্ধিই মনে মনে কাজ করেছিল। ভারতীয় শাসনব্যবস্থার ধর্মনিরপেক্ষ চারিত্র্য সত্যিই এইভাবে রক্ষা করা যেতে পারে?

এদিকে আবার সরকারি খরচে এ দেশের রাষ্ট্রপতি কুম্ভমেলায় গিয়ে স্নান করেন পুণ্যের আশায় আর রাষ্ট্রপতির সেই আধ ন্যাংটো ছবি প্রচার করা হয় সরকারি খরচেই। এতে সাধারণ দেশবাসীর সামনে কি ধর্মীয় কুসংস্কার কমে? না বাড়ে? ঐ এক বিচিত্র দেশ! ইতিহাসাবিদরাও এখানে মন্তব্য করেন যে সিরাজের সেনাপতি মোহনলালের দেশপ্রেম ব্যাপারটা কিছু নয়। আসলে সিরাজ উদদৌলাহ-এর বউ মোহনলালের ভগিনী বলেই না সে পলাশির মাঠে ১৭৫৭-তে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়ে গেছে। এই মন্তব্য দিয়ে এদেশে ইতিহাস লেখা হয়! সে ইতিহাস স্কুলে পড়ানো হয়। এর চেয়ে তাজ্জবের কথা আর কী হতে পারে!

যে টিপু সুলতান রঙ্গনাথজীর মন্দির দর্শন না করে সকালে জলগ্রহণ করতেন না, তিনিই না কি তিন হাজার ব্রাহ্মণ হত্যার আদেশ দিয়েছিলেন সেই ব্রাহ্মণরা মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত হতে অস্বীকার করেছিলেন বলে। যে ইংরেজ সাহেব এই মিথ্যে অপবাদ দিয়েছিলেন টিপুর নামে তাঁর মতলব বোঝা যায়। কেন না তিনি ইংরেজ এবং প্রাক ব্রিটিশ আমলের মুসলমান শাসনকে নোংরাভাবে চিত্রিত না করলে ব্রিটিশ সাহেবদের পক্ষে এ দেশের জনমতকে, বিশেষ করে সংখ্যাগুরু হিন্দু জনমানসকে প্রভাবিত করা যাবে না বলে তিনি মনে করতেন। কিন্তু ভারতীয় ইতিহাসবিদরা কিংবা হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতো বিদ্বান মানুষও যখন টিপুর নামে এই অপবাদ দিয়ে প্রবন্ধ লেখেন এবং সেই প্রবন্ধ বছরের পর বছর উত্তর ভারতের কলেজে পড়ানো হয়, তখন সেই মানসিকতাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে?

প্রশাসনিক স্তরে বিশেষ একটা ধর্মের জয়ঢাক পিটিয়ে অন্য ধর্মের মানুষের কাছে ধর্মীয়

নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষার আদর্শের কথা বললে তা এক ধরনের ভণ্ডামি বলেই তো মনে হতে পারে। ধর্মকে ব্যক্তিগত বিশ্বাস অবিশ্বাসের চৌহদ্দীতে আটকে রাখা যাবে না কেন? প্রশাসনিক স্তরে সত্যিই যদি বস্তুবাদ, যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞান চেতনাকে প্রাধান্য না দেওয়া হয়, তাহলে রাষ্ট্রপতির ভাষণ বিলিয়ে সাম্প্রদা[illegible]তা রোধ করা যাবে?

৮

আসাম বা কাশ্মীর নিয়ে বস্তুত কেন্দ্রীয় সরকারের পরীক্ষা-নিরীক্ষার অনেক কসরৎ ইতিমধ্যেই দেখা গেছে। জৈল সিং যখন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্বে তখন তিনিও অন্য অনেকের মতোই বুদ্ধির ঢেঁকিতে নাচতে নাচতে বলাবলি শুরু করেছিলেন যে, আসামে একটা নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করলেই এ রাজ্যের রাশ টেনে ধরা যাবে। অথচ সে-সময়, সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে মন্ত্রিসভা গঠনের কথা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই আসামে আন্দোলন নতুন মোড় নিতে শুরু করে। ৩৪ ঘন্টার জন্য আসাম বন্ধ আন্দোলনও শুরু হয়ে যায়। প্রেস-সেন্সরশিপ আইনও চালু করতে হয় কেন্দ্রীয় সরকারকে। কেন্দ্রীয় মিলিটারি বাহিনী নামাতে হয়। তাতেও কোনও সুরাহা হয়নি তখন। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীও অবশেষে নববর্ষের বাণী বিতরণের সময় দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা কবুল করেছিলেন যে, আসামের হিংসাজনিত পরিস্থিতিকে কঠোর হস্তে মোকাবিলা করা হবে। তখনো প্রশ্নটা ছিল হিংসা-অহিংসা, আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে। অর্থাৎ শ্রীমতী গান্ধীও তখন যে-মূল সমস্যাকে কেন্দ্র করে বৈদেশিক নাগরিক সমস্যার উদ্ভব তার গভীরে যেতে চাননি বা যেতে পারেননি। আন্দোলনকারীরাও ১৯৫১ সালের জাতীয় নাগরিক তালিকা ও ১৯৫২ সালের ভোটার তালিকা অনুযায়ী বৈদেশিক নাগরিক চিহ্নিতকরণের ব্যাপারে জিদ্ ধরে বসে থাকার কৌশল নিয়েছিলেন আর কেন্দ্রীয় সরকারও ১৯৭৯ সালকে ভিত্তি বৎসর বলে গণ্য করতে চেয়েছিল।

তখনও আসাম নিয়ে যে সব কথাবার্তা উঠেছে তা সেই সন-তারিখের চৌহদ্দীর মধ্যেই। গোটা দেশের সংহতি রক্ষার ক্ষেত্রে যেমন পাঞ্জাব, কাশ্মীর, গুর্খাল্যান্ড ইত্যাদি, তেমনি আসামও বিতর্কিত ইস্যু হিসাবেই রয়ে যাচ্ছে। অথচ ভারতবর্ষের আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও জাতীয় সংহতি রক্ষার প্রশ্নটা যে খুব সোজা বা মামুলি একটা ব্যাপার নয়, সেটা রাজনীতিবিদদের উপলব্ধিতে আসছে না। আসাম সমস্যার সঙ্গে যে ভারতবর্ষের অ-সম উন্নয়ন ব্যবস্থার ত্রুটিও জড়িয়ে রয়েছে এই বাস্তব অবস্থার মূল ধরে নাড়া দিতে চাইছেন না কেউই।

তা করলে তো একথা বলতেই হয় যে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অখণ্ডতা নিয়ে এতো কথা, অতীতে তেমন অখণ্ডতা কি সত্যিই আমাদের ছিল? তা থাকলে আমরা বহিরাগত আর্যদের কাছে পরাজয় বরণ করলাম কেন? মুঘল রাজত্বকালেও 'তামাম হিন্দস্থানের' ধারণা অখণ্ড ভারতবর্ষের রূপকে সুচিহ্নিত করে না। বলা যেতে পারে বিদেশী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরাই সর্বপ্রথম অষ্টাদশ শতকের শেষাশেষি ও উনবিংশ শতকের শুরুতে ভারতের আঞ্চলিক অখণ্ডতার ধারণাকে পুষ্ট করে তোলে তাদের নিজেদের শাসনের স্বার্থেই। আর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের সূত্র ধরেই ভারতে অখণ্ড জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটে। উনবিংশ শতাব্দীর নবোত্থিত জাতীয়তাবাদ পবরর্তীকালে স্বাধীনভাবে বিকশিত হয়ে ওঠার সুযোগ না পাওয়ায় জাতীয় চেতনার মূল স্পিরিট দারুণভাবে ব্যাহত হয়। সে কারণেই স্বাধীনতার মূল্য দিতে হয় দেশকে দু-টুকরো করে। দায়টা ইংরেজের

ওপর চাপিয়ে দিলেও তৎকালীন জাতীয় নেতৃত্ব এ থেকে কোনও মতেই ছাড় পেতে পারেন না। মূলত তারাই এর ইন্ধন যোগায়।

তাই স্বাধীনতা-উত্তরকালে সেই জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের কাছে জাতীয়তাবাদী ধারণা, জাতি সমস্যার সমাধান, জাতি-গোষ্ঠীর বিকাশ ইত্যাদি ব্যাপারগুলো সঠিকভাবে মূর্ত হয়ে উঠতে পারেনি। বিশেষত ১৯৪৭-এর পর জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব যে কংগ্রেস দলকে আশ্রয় করে দেশের শাসনক্ষমতা কুক্ষিগত করে তারা মূলত বুর্জোয়া-জমিদার গোষ্ঠীর লেজুড়বৃত্তির নীতি গ্রহণ করায় ভারতবর্ষের কাঠামোটা অক্ষুণ্ণই থেকে যায়। আর পুঁজিবাদী কাঠামোর মূল নীতিটাই যেহেতু দেশের যাবতীয় সম্পদ, উদ্যোগ, ক্ষমতা ও অর্থনীতির কেন্দ্রীভবন, ফলত প্রত্যেক জাতিগোষ্ঠীর সুসমঞ্জস বিকাশ, উন্নয়ন, সম্পদের সুসম বণ্টন ইত্যাদি ব্যাপারগুলো ১৯৪৭-এর পর অমীমাংসিতই থেকে যায়। জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারও বিকশিত হবার পথ পায় না। জাতীয় সংস্কৃতির পরিপুষ্টি ব্যাহত হয়। ভাষাগত বৈষম্যের বীজও বজায় থেকে যায়। এভাবেই জাতীয় ঐক্যের ধারণাটা ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে ভারতবর্ষের পুঁজিবাদী আর্থ-সামাজিক কাঠামোর মধ্যে। ফলে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন ধরনের স্বাতন্ত্র্যবাদী ঝোঁক মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। অর্থনৈতিক সংকটের চাপে ও কোথাও কোথাও যথার্থ জাতীয় চেতনার অভাব থাকায় নানা ধরনের উসকানিমূলক প্ররোচনায় ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অশুভ মদতে অনেকে বিভ্রান্তির শিকার হয়ে পড়ে। কাশ্মীর, পাঞ্জাব, আসাম, মিজোরাম প্রভৃতির ক্ষেত্রে এ ব্যাপারগুলো কার্যকর হতে দেখা যায়।

ঘটনা বিশ্লেষণেই দেখতে পাবো ১৮২০-২১ সালে আসাম ছিল বার্মার দখলে। ১৮২৬ সালে আসামের কিছু অংশ ব্রিটিশরা দখলে এনে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করে। ১৮৩৮ সালে গোটা আসাম ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। ব্রিটিশ আমল থেকেই আসামের জনসংখ্যা অ-অসমীয়াদের দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকে। ১৯৪৭-এর পরেও মূল অসমীয়া জনসংখ্যা দ্রুত গতিতে পরিবর্তিত হতে থাকে ওপার বাংলার জনসংখ্যার চাপে। আর সামন্তবাদী ও পুঁজিবাদী সামাজিক কাঠামোয় এটাই স্বাভাবিক যে অনুন্নত পার্বত্য জাতি ও উপজাতিরা তুলনামূলকভাবে কিছুটা উন্নত সমতলবাসীদের দ্বারা আর্থিক ও সামাজিক সব দিক থেকেই কোণঠাসা হয়ে পড়বে। আসাম কেন, ত্রিপুরার ক্ষেত্রেও একই অবস্থা লক্ষণীয়। ১৯৪৭ সালে যেখানে ত্রিপুরী জনসংখ্যা ও অ-ত্রিপুরী জনসংখ্যার অনুপাত ছিল ৩ : ১, পরবর্তী ৩০ বছরে সেই ত্রিপুরায় জনসংখ্যার অনুপাত পালটে গিয়ে দাঁড়ায় ১ : ৩। পরিবর্তন শুধু জনসংখ্যার দিক থেকে নয়, আর্থিক ও সামাজিক প্রাধান্যের দিক থেকেও অসমীয়া ও ত্রিপুরী জনসংখ্যা পিছিয়ে পড়তে থাকে।

ফলে এই অসম বিকাশের সূত্রেই অসন্তোষের বীজ রোপিত হয়। একে দূরীভূত করার জন্য যে সু-সম বিকাশ নীতির প্রয়োগ প্রয়োজন ছিল ভারতবর্ষের বর্তমান আর্থসামাজিক কাঠামোয় তা অনুপস্থিত বলেই বৈষম্যের বাস্তব উপাদানগুলোকে বিমোচিত করা সহজসাধ্য হয়ে ওঠে না। আর জনগণের যথার্থ আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করে যারা কায়েমি স্বার্থকে রক্ষা করতে চায় তারা এই সুযোগ ব্যবহারের জন্য ওৎ পেতে থাকে সর্বত্রই। দার্জিলিংয়ে গুর্খাল্যান্ড সমস্যা তৈরি হয় এভাবেই।

তাই দেখা যায় আসামে অর্থনৈতিক বিকাশ ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সামাজিক অগ্রগতির জন্য যে ধরনের আন্দোলন সংগঠিত হওয়া উচিত ছিল, আসাম আন্দোলনকারীরা সেই সঠিক পথে না গিয়ে "আশু সমাধান" হিসাবে "বিদেশী" বিতাড়নের দাবিতে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। বস্তুত এই আন্দোলন প্ররোচনামূলক হয়ে পড়ে এ কারণেই। কংগ্রেস দলও এতে মদত জুগিয়েছে। এখন সেটাই তাদের ক্ষেত্রে বুমেরাং হয়ে দেখা দিয়েছে। আন্দোলনের নেতৃত্বের

ভেতর গণতান্ত্রিক ঝোঁক না থাকায় তা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের শিকার হয়ে পড়েছে ও উগ্রজাতীয়তাবাদীদের খপ্পরে চলে গেছে। অন্যদিকে আসাম আন্দোলনকারীরা যদি যথার্থভাবে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের প্রশ্নে সোচ্চার হতে পারতো কিংবা সু-সম জাতীয় বিকাশ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের দাবিতে লড়ে যেতো হয়তো তাহলে সেই আন্দোলন ভারতের অন্যান্য রাজ্যের শোষিত বঞ্চিত মানুষেরও ব্যাপক সমর্থন আদায় করতে পারতো। আর শাসক দলও যেভাবে সাম্প্রদায়িকতা, জাতিগত বৈরিতা, অসম উন্নয়ন ব্যবস্থা, ভাষাগত দ্বন্দ্বকে জীইয়ে রেখে ও জাতীয় অর্থনৈতিক সম্পদ একচেটিয়াধিপতিদের হাতে কুক্ষিগত করিয়ে আসাম সমস্যার সমাধান করতে চাইছে কোনও বিশেষ সময়কালের পরে আগত অ-অসমীয়াদের বিতাড়িত করে তাতে কখনোই জাতীয় ঐক্যের ধারণা সুগঠিত হতে পারে না ও আসাম সমস্যার স্থায়ী সমাধানও করা যাবে না। বস্তুত একটা জায়গায় বিশ-ত্রিশ বছর ধরে গড়ে ওঠা একটা প্রজন্ম থেকে কিছু অংশ বিচ্ছিন্ন করে বিতাড়নের মধ্য দিয়ে কখনোই প্রকৃত সমস্যাকে ধামাচাপাও দেওয়া যায় না। ভারতের সাংবিধানিক দিক থেকেও তা বেআইনি ও অমূলক। জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার মূল সূত্রের মধ্যেই যে এই ধরনের সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান সে বোধ-বুদ্ধি অবশ্য ভারতবর্ষের শাসকশ্রেণীর থাকার কথাও নয়। তাই ব্যাধি ছেড়ে আধি ধরে টানাটানি চলছে।

৯

নির্বাচনী প্রচারে কংগ্রেস আবার কিছু বস্তাপচা বুলি আওড়াতে শুরু করেছে। ভাবখানা এই রকম যেন তামা-তুলসী ছুঁয়ে গঙ্গা জলে ডুব দিয়েই দুঃশাসনের সব স্মৃতি মুছে ফেলা যায়।

দেশের আর্থ-সামাজিক সংকটের তীব্রতা বিগত কালের তুলনায় বর্তমান পরিবেশকে আরও জটিল করে তুললেও কংগ্রেসীরা শ্রীমতী গান্ধীর বহুশ্রুত প্রতিশ্রুতিগুলোকেই আবার ঝালাই করতে চাইছে। দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যাবতীয় শোকদুঃখ নিরসনের প্রতিশ্রুতি তাদের দলীয় নির্বাচনী ইস্তাহারেও ফলাও করে ছাপা হয়েছে।

আগেও এ আই সি সি (ই)-র অনুন্নত শ্রেণী সম্পর্কিত বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে অনেক নেতাই বলেছেন যে, দল ক্ষমতায় এলে অনুন্নত শ্রেণীর মঙ্গলের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করা হবে।

কংগ্রেসের এই সংখ্যালঘু বা অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতি এতোটা উদার হয়ে ওঠার কারণ এমন নয় যে, এতো দিনে তাদের শুভবুদ্ধির উদ্রেক হয়েছে। বরং বলা যায় আসন্ন নির্বাচনে অতি সহজে এই সব সরল মানুষের কাছ থেকে ভোট কুড়োনো ভাঁওতাটাই এই ধরনের প্রতিশ্রুতির পিছনে কাজ করছে।

কংগ্রেস যদি এদেশের সংখ্যালঘু ও অনুন্নত শ্রেণী সম্পর্কে এতোই সহানুভূতিসম্পন্ন হবে তাহলে এতো বছরের একনায়কতন্ত্রীসুলভ ক্ষমতা বিস্তারের স্থায়ী সুযোগ পেয়েও কংগ্রেস সেই দায়িত্ব পালনে উদগ্রীব হয়ে উঠলো না কেন?

বরং ইতিহাসের আদ্যশ্রাদ্ধ না করে যদি যথার্থ ইতিবৃত্তের অনুসন্ধান করা যায় তাহলে দেখা যাবে এদেশের মুসলমান, তফসিলি জাতি-উপজাতি, আদিবাসী ও হরিজন সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে সারা দেশে সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, জাতিভেদজনিত বিদ্বেষ ও আঞ্চলিকতাবাদী ভেদ-বিভেদের অশুভ অরাজকতাকে পরিপুষ্ট করে তোলার পরিকল্পনাকেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মদত দেওয়া হয়েছে।

স্বাধীনতার আগে, সেই ১৯৩৭ সালের নির্বাচন থেকে শুরু করে স্বাধীনতা

পরবর্তীকালের কংগ্রেসী শাসনের প্রাথমিক পর্বের ইতিহাস ঘাঁটলেও দেখা যাবে কীভাবে নির্বাচনী লড়াইয়ে ধর্মীয় ভেদ-ভাবনাকে ব্যবহার করা হয়েছে। ইন্দিরা রাজত্বের মাত্র আট বছরের একটা বিশেষ খতিয়ান নিলেই কংগ্রেসের মুসলমান প্রীতির নমুনা ধরা পড়ে যাবে। ১৯৬৯ থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত শুধু দু হাজার সাতান্নটা হিন্দু-মুসলিম ধর্মীয় দাঙ্গার ফলেই এক হাজার একশ তিনজন মানুষ নিহত হয় বলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সে সময়ের বাৎসরিক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। ইন্দিরা রাজত্বের ওই আট বছরের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিবরণ হলো এ-রকম :

সাল	দাঙ্গার সংখ্যা	মৃতের সংখ্যা
১৯৬৯	৩১৯	৬০৩
১৯৭০	৩২১	২৯৭
১৯৭১	৩২১	১৩৩
১৯৭২	২৪০	৭০
১৯৭৩	২৪২	—
১৯৭৪	২৪০	—
১৯৭৫	২০৫	—
১৯৭৬	১৬৯	—

(কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের বাৎসরিক রিপোর্ট)

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের বাৎসরিক রিপোর্টে উল্লেখিত বিবরণের চাইতে বস্তুত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সামাজিক, আর্থিক ও সম্পত্তিগত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ যে আরও ভয়াবহ কুশ্রীতা সৃষ্টি করে তা কি কেউ অস্বীকার করতে পারে?

কংগ্রেসী রাজনীতির প্রতিক্রিয়াশীল ভাবনার গর্ভে দীর্ঘকাল ধরে সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোকে পরিপুষ্ট করে তোলার ফলে এমন কি, কেন্দ্রে ১৯৭৭ সালে সাময়িকভাবে জনতা সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পরও মুসলমানদের জান-মালের নিরাপত্তা বিধানের কোনো চেষ্টা দেখা যায়নি। ফলে জনতা সরকারের আমলেও ১৯৭৭ ও ১৯৭৮ সালে যথাক্রমে ১০৮ ও ২৩০টা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়। আর এসব দাঙ্গায় হাজার হাজার সংখ্যালঘু মানুষের জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে এক গভীর সংকট নেমে আসে।

কংগ্রেসের সংখ্যালঘু প্রীতি যদি এতোই গভীর হবে তাহলে তার দলের সরকার থাকা সত্ত্বেও অন্ধ্রে মাসাধিককাল ধরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লেগে ছিল কেন? হায়দারাবাদের দাঙ্গা পরিস্থিতি সম্পর্কে শ্রীমতী গান্ধীর তদানীন্তন কংগ্রেস সরকার কি কোনো সদুত্তর দিতে পেরেছিল?

শুধু কি তাই? শ্রীমতী গান্ধীর রাজত্বকালে বিচ্ছিন্নতাবাদী উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তির হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়। ফলে সারা দেশের জাতীয় ঐক্যের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ নেমে আসতে দেখা যায়।

শ্রীমতী গান্ধীর রাজত্বকালে আমেদাবাদ, রাঁচী, ভিওয়ান্দি ও জলগাঁওয়ের মতো বিভিন্ন জায়গায় শত শত মুসলমানকেই যে শুধু হত্যা করা হয়েছিল তাই নয়, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় গরিব হরিজন মানুষকেও বর্ণভেদ প্রথার নামে নৃশংসভাবে পুড়িয়ে মারা হয়। এই হরিজন নিধনের ঘটনা থেকে নারী ও শিশুদেরও রেহাই দেওয়া হয়নি। শ্রীমতী গান্ধীর অনুগামী ভূস্বামীজোটের নির্দেশে হিন্দীভাষী রাজ্যের এক একটা গোটা হরিজন পল্লীকে আগুন লাগিয়ে ভস্মীভূত করে দেওয়ার মতো ঘটনা আর যাই হোক শ্রীমতী গান্ধীর হরিজনপ্রীতির ইতিবাচক নিদর্শন হতে পারে না।

এসব ক্ষেত্রে শ্রীমতী গান্ধীর আপস সুলভ মনোভাব প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে আরও পুষ্ট করে তুলেছিল এবং এভাবেই কংগ্রেসের সবচাইতে ক্ষমতাশালী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর রাজত্বকালে জাতীয় ঐক্যের ধারণা ক্রমান্বয়েই ভেঙে যেতে থাকে।

সে সময় যে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি ভারতবর্ষের ভাষা-ভিত্তিক রাজ্যকে ভাঙার দাবি তুলেছিল সেই তেলেঙ্গানা প্রজা সমিতির মতো লোকদের সঙ্গে শ্রীমতী গান্ধীর সরকারকে তখন শলাপরামর্শ করতে দেখা যায়। এমন কি মহারাষ্ট্রে শ্রীমতী গান্ধীর নায়েক মন্ত্রিসভা তখন শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে সেখানকার উন্মত্ত মারাঠী প্রাদেশিকতার মতো ফ্যাসিস্ত কায়দায় দলকে মদত দিতে এতোটুকু দ্বিধা করেনি।

শ্রীমতী গান্ধী অনুন্নত শ্রেণীর জন্যও বরাবর নাকি কান্না কাঁদতেন নির্বাচনের সময় এলেই। তারপর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার কালে তাঁর অনুন্নত ও সংখ্যালঘু সমাজের জন্য লেশমাত্রও মাথাব্যথা থাকতো কি? তাহলে ভাষাগত সংখ্যালঘুদের ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার দাবি তাঁর শাসনকালে উপেক্ষিত ছিল কেন? নেপালী ভাষাভাষী জনগণ, উত্তর ভারতের উর্দু ভাষাপ্রিয় নাগরিকরা বা অন্যান্য পার্বত্যবাসীরা কি শ্রীমতী গান্ধীর রাজত্বকালে গণতান্ত্রিক বিকাশের সমান সুযোগ অর্জন করতে পেরেছিলেন? সাঁওতাল জনগণকে তাদের প্রাণের বর্ণমালা অলচিকি লিপির মাধ্যমে অক্ষর পরিচয় করানোর ন্যূনতম অধিকার কি শ্রীমতী গান্ধীর রাজত্বকালে স্বীকার করা হয়েছিল?

পশ্চিমবঙ্গে সাঁওতাল আদিবাসীদের সংখ্যাই তো চোদ্দ লক্ষ। আর মোট জনজাতির সংখ্যা এখন প্রায় ৪০ লক্ষের মতো। এই মানুষ এখনো তো নিজভূমে পরবাসীর মতো তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিকসুলভ অনুভব নিয়ে দিন কাটায়। শ্রীমতী গান্ধী তো যথেষ্ট সময় পেয়েছিলেন। এগারো বছরের স্থায়ী একচ্ছত্র শাসনে এই সব ভুটিয়া, লেপচা, গারো, রাভা, টোটো, সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাও, কড়া, মাহলি, লোধা, খেড়িয়া, বিরহড় ইত্যাদি জনসংখ্যার জন্য অন্তত এইটুকু অনুভব কাতরতা সৃষ্টি করতে পারতেন, যাতে ওরা সমান নাগরিক মর্যাদাটুকু অর্জন করতে সক্ষম হয়। এইসব আদিবাসী মানুষের রাজনৈতিক উন্নয়নের এমন কোন পরিকল্পনা শ্রীমতী গান্ধীর সরকার গ্রহণ করেছিলেন যা তাঁর অনুন্নত শ্রেণী প্রীতির সততাকে প্রতিপন্ন করে? চা-বাগান বা খনি অঞ্চলের উপজাতি জনগণের সামনে কোন সুখী ভবিষ্যতের রূপরেখা শ্রীমতী গান্ধীর সরকার তুলে ধরেছিলেন যার দাবি নিয়ে তিনি অনুন্নতদের স্বার্থ সংরক্ষণের বড়াই করতে পারতেন? বরং তাঁর মৃত্যুর পর দিল্লিতে দেড় হাজার শিখ খুন হয় কংগ্রেসের হাতে।

আসলে ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক ভাবনার মূল ব্যাপারটাই যে ভূস্বামী গোষ্ঠী আর একচেটিয়া শিল্প স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে তৈরি এই সহজ কথাটা স্বীকারের সাহসও কংগ্রেস দলের নেই। বস্তুত নেহরু সরকার থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত যে ধরনের উন্নয়ন প্রকল্প অনুসৃত হতে দেখা যায় তা মূলতই পুঁজি-অভিমুখী (ক্যাপিটাল অরিয়েন্টেড)। এ দেশের আর্থ-সামাজিক বিকাশ ভাবনার মূল রূপরেখা কখনোই জনগণ অভিমুখী বা পিপলস অরিয়েন্টেড নয়।

ফলতঃ অর্থনৈতিক অগ্রগতির যেটুকু অবয়ব বিকশিত হয় তার সমস্তটাই পুঁজির মালিক ও ভূস্বামীদের স্বার্থেই কাজে লাগে। যে কোটি কোটি সাধারণ মানুষের মেহনতের ফলে শিল্প ও কৃষি অর্থনীতির উপযোগিতা সৃষ্টি হয় তা কৃষক-শ্রমিক বা সাধারণ মেহনতি মানুষের কল্যাণে আসে না।

আর এই মেহনতি মানুষেরই একাংশ হিসাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের গরিব প্রজা সাধারণ এবং অনুন্নত সমাজের মানুষের জীবনেও আর্থিক ও সামাজিক শোষণের বিড়ম্বনা চরম আকার ধারণ করে।

একটা বহুজাতি ও বহু ভাষাভিত্তিক দেশের জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা যদি প্রফিট মোটিভেশন বা মুনাফা প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত হয়ে সমানুপাতিক অগ্রগতির অনুগামী না হয় তাহলে শোষণের বহর ক্রমশই বাড়তে থাকে। আর এই শোষণভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় জনগণের বিক্ষোভকে বিপথে পরিচালিত করতে হলে শোষক শ্রেণীর কাছে ধর্ম, ভাষা, বর্ণ, আঞ্চলিকতা ও প্রাদেশিকতা প্রভৃতি সেন্টিমেন্টাল সুড়সুড়িজনিত উপাদান স্বকীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার স্বার্থেই উপযোগী অস্ত্র হিসাবে জরুরি হয়ে পড়ে। পাঞ্জাবে খালিস্তানীপন্থী আন্দোলনের নেতা ভিনদ্রানওয়ালাকে তো প্রথম মদত দিয়েছিলেন স্বয়ং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। আবার পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারকে বেকায়দায় ফেলার জন্যই কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকেই প্রথম দিকে দার্জিলিং জেলার গুর্খা নেতা সুবাষ ঘিষিংকে উসকানি দেওয়া হয় পশ্চিমবঙ্গে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দানা বাঁধানোর জন্য। আসাম যে এতো টুকুরো হলো তার পিছনেও তো অর্থনৈতিক বিকাশের অসমতা ইন্ধন জুগিয়েছে। ত্রিপুরায় পার্বত্য উপজাতিদেরও উসকানি দেওয়া হচ্ছে নানা কায়দায়।

স্বাধীনতা উত্তরকালের ভারতবর্ষে পুঁজিপতি ও জমিদারবর্গ শাসিত প্রশাসনিক কাঠামোয় যেহেতু অনুন্নত ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থের অনুগামী কোনো কল্যাণমুখী পরিকল্পনা অনুসৃত হয়নি, সে কারণেই সমাজের অন্যান্য শোষিত মানুষের মতো অনুন্নত ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষেরাও স্বকীয় মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে।

আর এই সংখ্যালঘু অনুন্নত সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদা সংগ্রামকে যেহেতু বামপন্থী দলগুলো দেশের সার্বিক অগ্রগতির স্বার্থেই পরিপুষ্ট করে তোলার সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করে সে কারণে বামপন্থী শক্তির সংহতি বিনাশের জন্যও সংখ্যালঘু ও অনুন্নত সম্প্রদায়কে নিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল চক্র নানা রকমের রাজনৈতিক খেলা শুরু করে।

কংগ্রেসীরা কি এ কথা অস্বীকার করতে পারে যে, সংখ্যালঘু ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য বিগতকালের ৪৮ বছরের প্রশাসন কোনো উল্লেখযোগ্য পরিকল্পনাই কার্যকর করতে অপারগ ছিল?

যে দল তার একচ্ছত্র আধিপত্যের কালে সংখ্যালঘুদের জীবনে ন্যূনতম নিরাপত্তা দিতেও শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়, সেই দলের মুখে সংখ্যালঘু প্রেমের প্রতিশ্রুতি ভোট কুড়োনোর ভাঁওতা ছাড়া আর কোন অর্থ বহন করে?

১০

কংগ্রেস দলের নির্বাচনী ইস্তাহারে অজস্র প্রতিশ্রুতির ফোয়ারা ছড়ানো হচ্ছে। গালভরা কথা ছড়িয়ে গ্রামের মানুষের মধ্যে আবার এক ধরনের মোহ বিস্তার করতে চাইছে। আর একবারটি ক্ষমতায় আসার সুযোগ পেলেই নাকি গ্রামের মানুষের যাবতীয় দুর্গতি দূর করে দেবে।

প্রকৃত প্রশ্নে এ-কথা উল্লেখ করা কি অযৌক্তিক হবে যে, কংগ্রেসি রাজত্বের গোটা চার দশকই গ্রামাঞ্চলে জমিদার-জোতদারদের একচ্ছত্র আধিপত্যের দ্বারা গ্রামের মানুষকে অর্থনৈতিক শোষণে জর্জরিত করে তোলা হয়েছে? লুধিয়ানা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধনী ভাষণে ১৯৬১ সালে স্বয়ং নেহরুজীকেও এই কথা বলতে হয়েছিল যে, 'যে-দেশের জনসংখ্যার শতকরা ৭০ ভাগ মানুষ কৃষিকাজে নিযুক্ত, সেই দেশকে খাদ্যের জন্য বিদেশের ওপর নির্ভর করতে হয় দেখে লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে যায়।'

ভারতবর্ষ মূলত কৃষি-অর্থনীতির দেশ। সাতচল্লিশের স্বাধীনতার পর প্রধানমন্ত্রী নেহরু সেই কৃষি অর্থনীতিকে গুরুত্ব না দিয়ে ভারি শিল্প তৈরির ফাঁদের পা দিলেন। টাটা-

বিড়লাদের সঙ্গে নেহরু আর তাঁর কংগ্রেস দলের আঁতাতের ফলেই শিল্পসমৃদ্ধ ভারত গড়ার সঙ্গে একচেটিয়া পুঁজিপতির বিকাশ ঘটলো। যে দেশের শতকরা ৭০ ভাগ মানুষ কৃষির সঙ্গে যুক্ত সেই কৃষি-অর্থনীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত এমন শিল্পের বিকাশকে প্রাধান্য দিলে এই একচেটিয়া পুঁজির বিকাশ ও শোষণের সুযোগ এতো বিস্তৃত হতো না। নেহরুই গোড়াতেই গলত করেছিলেন। বস্তুত গ্রামের মানুষের জন্য কিছু করতে না পারার ব্যর্থতায় নেহরুজীর অন্তত লজ্জাবোধজনিত ভাবাবেগ থাকলেও, তাঁর একমাত্র কন্যা শ্রীমতী গান্ধী সে বালাইটুকুও ঝেড়ে মুছে সাফ করে ফেলেছিলেন। তা না হলে ১৯৬৬ থেকে ১৯৭৭-এর সামগ্রিক অপশাসন বৈধ বলে বাহবা কুড়োনো মতো নির্লজ্জ ন্যাকামি দিয়ে তিনি গ্রামের মানুষকে বোকা বানাতে চান কোন্ বুদ্ধিতে।

কংগ্রেসের স্বাধীন কৃষি অর্থনীতি গড়ে তোলার ব্যাপারটা যে, প্রকৃতপক্ষে গ্রামের সাধারণ মানুষের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে না — বরং কংগ্রেসের কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনৈতিক প্রকল্প জমিদার-জোতদারের স্বার্থ পুষ্ট করে তোলে — সে সম্পর্কে সরকারি পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যরাই তো বার বার মন্তব্য করেছেন বলে জানা যায়। পরিকল্পনা কমিশনের প্রাক্তন সহসভাপতি প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডঃ গ্যাডগিল ও তদানীন্তন কমিশনের অন্যতম কৃষি-বিশেষজ্ঞ ডি কে আর ডি রাওয়ের রিপোর্টে তো এই সত্যেরই স্বীকারোক্তি ছিল।

বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ডঃ পি আর ব্রহ্মানন্দের ভাষণেও গ্রামীণ মানুষের অগ্রগতির ক্ষেত্রে এ জাতীয় বিপদের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে (ইনস্টিটিউট অফ পলিটিক্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সভা, মে ১৯৬৮)।

ইন্দিরা সরকারের আমলে যে স্থায়ী কোনও পরিকল্পিত অর্থনীতি গঠনের চেষ্টা হয়নি ডঃ ভবতোষ দত্তের মতো অর্থনীতিবিদও একথা বার বার উল্লেখ করেছেন। ইন্দিরা গান্ধীর শাসনে কৃষি-অর্থনীতি বিষয়ক যে পরিকল্পনা গৃহীত হয় তা গ্রামীণ কৃষিকে পুনরুজ্জীবিত করা দূরে থাক, গ্রামের সাধারণ মানুষের এতোটুকু উপকারেও আসেনি।

শ্রীমতী গান্ধী দাবি করতেন তাঁর ২০ দফা কর্মসূচি নাকি ছিল মূলতই গ্রামমুখী। যদি তাই হয় তাহলে তো সেই কর্মসূচির দৌলতে গ্রামের সবচাইতে অবহেলিত মানুষের স্বার্থই সংরক্ষিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু প্রকৃত বিচারে তা কি হয়েছে? শ্রীমতী গান্ধীর কর্মসূচির ধাক্কায় দারিদ্র্য সীমার নিচে ছিলেন গ্রামাঞ্চলে এমন মানুষের শতকরা হার বাড়তে বাড়তে ৭০ ভাগে গিয়ে দাঁড়ায়।

শ্রীমতী গান্ধীর রাজত্বের ৭১-৭২ সালের পরিসংখ্যানের দিকে একটু নজর বুলোলেই দেখা যায় সে সময়ে গ্রাম ও শহরে দারিদ্র্য সীমার নিচে থাকা মানুষের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে শতকরা ৪৪.৫৭ ও ৫১.৩৪ জন। ১৯৭৫ সালে জরুরি শাসন বলবত করার সময় দেখা যায় সেই সংখ্যা উভয় ক্ষেত্রেই শতকরা ৭০ ভাগে পৌঁছে গেল। যে-শাসন ব্যবস্থায় মানুষ ক্রমশই গরিব হতে থাকে তা কি জাতীয় জীবনের অগ্রগতিকে চিহ্নিত করে? অথচ ৭১-৭২ থেকে ৭৬-৭৭ সাল পর্যন্ত গ্রামের কায়েমি স্বার্থের দিকে তাকালে খুব স্পষ্টভাবেই দেখা যাবে ইন্দিরা শাসনের ফলে তাদের অবস্থা ক্রমশই ফুলে-ফেঁপে উঠেছিল। গ্রামে শতকরা ৩৫ থেকে ৪০ ভাগ আবাদী জমি এই সময়কালের ভেতর শতকরা ৫ ভাগ জমিদার-জোতদারদের হাতে কুক্ষিগত হয়ে গেছে। সংখ্যালঘু কায়েমি স্বার্থবাদীদের হাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জমি-জোত কেন্দ্রীভূত হবার ঘটনা আর যাই হোক পরিকল্পিত অর্থনীতির পরিচায়ক হতে পারে না। বরং এ অবস্থা দেখে এমন সিদ্ধান্তে আসা কি অমূলক হবে যে ইন্দিরা গান্ধীর অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রামে গরিব জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার পক্ষে উপযোগী ছিল না? তার বিশ দফা কর্মসূচির কোনোটাই যে, সাধারণ মানুষের স্বার্থকে সংরক্ষণ করেনি, এটাই হলো ইন্দিরা রাজত্বের আসল বাস্তবতা।

ইন্দিরা প্রশাসনের ১১ বছরে গ্রামীণ ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড একেবারেই যে নড়বড়ে অবস্থায় উপনীত হয় সরকারি পরিসংখ্যান থেকেই তার অসংখ্য নজির স্থাপন করা যায়। যোজনা কমিশনের দলিলেও দেখা যায় যে ১৯৬৭-৬৮ এবং ১৯৭৪-৭৫ সালের মধ্যে গ্রামের ক্ষেতমজুরদের প্রকৃত রোজগার দৈনিক ১.২৭ টাকা থেকে কমে ১.১৭ টাকায় এসে দাঁড়ায়। আর ইন্দিরার আমলেই যে গ্রামের কৃষক বেশি বেশি করে ভূমিহীন ক্ষেতমজুরে পরিণত হতে থাকে এ তথ্য কি তাঁর বশংবদ প্রচারবাহিনী অস্বীকার করতে পারে? শ্রীমতী গান্ধীর কায়েমি স্বার্থবাদী রাজনীতির ফলে গ্রামাঞ্চলে শতকরা ১০টা উপরতলার কৃষক পরিবার মোট গ্রামীণ সম্পদের শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশি অংশ নিয়ন্ত্রণ করে আর সব চেয়ে দরিদ্র শতকরা ১০টা কৃষক পরিবারের হাতে থাকে মোট সম্পদের ০.১ শতাংশ মাত্র। এই অসম অর্থনৈতিক অবস্থা সৃষ্টি করার পরেও শ্রীমতী গান্ধীর দল কোন্ মুখে গ্রামের মানুষের জন্য নাকি কান্না শুরু করে, তা ভাবলে একটু অবাক হতে হয় বৈকি।

ইন্দিরা গান্ধীর রাজত্বকালে এমন ঘটনাও দেখা যায় যেখানে জাতীয় নমুনা সমীক্ষার ২৭তম পর্যায় অনুযায়ী ৭০ লক্ষ ক্ষেতমজুরকে গ্রামের মহাজন ও ভূস্বামীরা দৈনিক ১২ থেকে ১৬ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করতে বাধ্য করে। শ্রীমতী গান্ধী যদি গ্রামের মানুষ সম্পর্কে এতোই দরদী হয়ে উঠবেন তাহলে এই বেগার প্রথা অবসানের জন্য একটা সাধারণ আইন তৈরি করার মতো আন্তরিকতাও কি তাঁর থাকতো না?

বরং কংগ্রেসের জমিদার-জোতদার ও মহাজন-তোষণ নীতির ফলে দেখা গেল ১৯৬৪-৬৫ সালেও যেখানে একজন পুরুষ ক্ষেতমজুর বছরে ২০৮ দিন কাজ পেতেন ১৯৭৪-৭৫ সালে তাঁর কাজের দিন সংখ্যা কমতে কমতে ১৮৫ দিনে এসে দাঁড়াল। ভাগচাষ ব্যবস্থা, দিনমজুর সমস্যা, বেগার খাটা, মহাজনী শোষণ প্রভৃতি অব্যবস্থার জোয়াল থেকে ইন্দিরা প্রশাসন গ্রামের মানুষকে মুক্তি দিতে ব্যর্থ হলো, নিত্যব্যবহার্য জিনিসের দাম বল্গাহীনভাবে বাড়ার ফলে কৃষকের প্রকৃত আয় গেল কমে এবং কৃষিজাত উৎপাদনের যথাযথ দাম না পাওয়ার ফলে ছোট ছোট চাষী পরিবারও গভীর সংকটের মুখোমুখি হলো।

শ্রীমতী গান্ধীর বিশ দফা কর্মসূচি এমনভাবে রূপায়িত হলো যাতে কৃষিঋণ, সেচ ও সার প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সুবিধা গ্রামের সাধারণ চাষীর আয়ত্তের বাইরে থেকে যায়। এই সমস্ত সুবিধা-সুযোগ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই জোতদার ও বড়ো চাষীদের করায়ত্তের মধ্যে রয়ে গেল। উল্টে ভাগচাষী উচ্ছেদ করে গ্রামে গ্রামে যুবশক্তি লেলিয়ে দিয়ে খুন-জখম, রাহাজানির রাজত্ব বানিয়ে এমন এক অসহনীয় অবস্থা বলবত করা হল যেখানে গ্রামীণ পরিবেশও এক ধরনের উৎকেন্দ্রিক বেলেল্লাপনার অসুস্থ-শিকারে পরিণত হয়। ফলে কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষের কৃষি অর্থনীতির মূল সমস্যার তো কোনও সমাধান হলোই না, উপরন্তু গ্রামীণ জীবনে এক ধরনের নাগরিক কুশ্রীতার তাণ্ডব অনুপ্রবিষ্ট হওয়ায় সামাজিক মূল্যবোধগুলো বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলো।

আসলে কংগ্রেস কায়েমি স্বার্থের রক্ষক হতে গিয়ে পূর্বসূরীর পথকেই আঁকড়ে রয়েছে যা দিয়ে গ্রামের সাধারণ মানুষ বা কৃষিকর্মে নিযুক্ত লোকজনের দুঃখমোচনের মতো ব্যাপার কখনোই সম্ভব নয়। শিল্পাঞ্চলে যেমন একচেটিয়া শ্রেণীর স্বার্থকে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যই কংগ্রেসী প্রশাসনের মূল নীতি, তেমনি গ্রামাঞ্চলে জোতদার-জমিদারবর্গের কৃষি-পুঁজি রক্ষার ও সম্প্রসারণের মূল দায়িত্বও তারই। স্বভাবতই কংগ্রেসের কাছে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশার মতো কিছু অবশিষ্ট থাকে না বা থাকতেও পারে না।

এর জন্য কংগ্রেস মিথ্যা প্রতিশ্রুতি এবং অসত্য ভাষণ ছড়াতেও এতোটুকু লজ্জা অনুভব করেনি। বরং স্বকৃত স্বৈরাচারী শাসনকে বিধিসম্মত বলে চালু করার কুমতলবে

একদা, ইন্দিরা গান্ধী ক্রমেই বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলেন, তার নিজের দলেই তিনি গণতন্ত্রবিহীন বংশানুক্রমিক প্রথা চালু করতেও কুণ্ঠিত হননি, এক ধরনের ফ্যাসিস্ট কায়দায় তিনি দলীয় কাঠামোকে এমনভাবে সংগঠিত করতে চেয়েছেন যাতে এ-দেশের যাবতীয় গণতান্ত্রিক রীতিনীতিকে নস্যাৎ করে তাঁর ভাবী বংশধরদের কায়েমি পত্তনী দিয়ে যেতে পারেন। এহেন দলের কাছে গ্রামের সাধারণ মানুষের কল্যাণ-ভাবনা নিয়ে কোনো মাথা ব্যথ্যার কারণই থাকতে পারে না। বরং গ্রামীণ ভারতবর্ষে যারা চিরকাল শোষণ ব্যবস্থাকে জীইয়ে রাখার পরিকল্পনায় রাজনৈতিক নেতৃত্বকে পরিপুষ্ট করে তোলে, তাদের সঙ্গে স্বার্থ সম্পর্কের গাঁটছড়া তৈরিই কংগ্রেসের চিরকালের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। সুতরাং গ্রামের সাধারণ মানুষের জন্য কংগ্রেস দলের নির্বাচনী ইস্তাহারে লিখিত প্রতিশ্রুতিগুলোকে একটা বড়ো ধরনের ধাপ্পা ছাড়া আর কি বলে অভিহিত করা যায়?

আসল কথা হলো কংগ্রেস দল বা তার পূর্ববর্তী কংগ্রেসি নেতৃত্ব একথা কখনোই বোঝার চেষ্টা করেনি যে, সামাজিক উৎপাদন শক্তির বিকাশ যুগে যুগে নতুন উৎপাদন সম্বন্ধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ইতিহাসের গতিপথে যখন একটা বিশেষ উৎপাদন সম্বন্ধ সমাজের অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তখন তাকে শেষ করে যুগোপযোগী নতুন উৎপাদন সম্বন্ধের মাধ্যমে উৎপাদন পরিচালিত না হলে অন্য যাই কিছু করা হোক না কেন উৎপাদন শক্তির মৌলিক বিকাশসাধন করা যায় না।

ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থার দিকে তাকালেই দেখা যায় উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রাক-স্বাধীনতা যুগের সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ও পুঁজিবাদী নীতি এক প্রচণ্ড অচলাবস্থা সৃষ্টি করে। গ্রামের মানুষের কথা ভেবে শ্রীমতী গান্ধী কেন, তার আগেও অনেক নেতাই অনেক হাহুতাশ করেছেন বটে, কিন্তু সেই অচলাবস্থা দূর করে নতুন উৎপাদন সম্বন্ধ সৃষ্টির প্রয়োজনে সামন্তবাদী বা পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্বন্ধকে নস্যাৎ করতে চাননি। তাই জমিদারী ব্যবস্থা উচ্ছেদ হলেও প্রকৃত কৃষকের হাতে জমি যায় না। মায়াপুরের মায়াবী শ্লোগান কৃষকের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। বরং বলা যায় পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারের আমলেই এই আর্থ-সামাজিক কাঠামোর ভেতরে দাঁড়িয়েই অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সামন্তবাদী ও পুঁজিবাদী স্বার্থকে কিছুটা ঘা দেওয়ার মতো সম্ভাবনা তৈরি করার চেষ্টা চলছে গ্রামাঞ্চলে বর্গা অধিকার প্রতিষ্ঠা বা সরকারি জমি উদ্ধার করে বিলি-বণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে।

বস্তুত কংগ্রেসের মতো যে রাজনৈতিক দল উৎপাদন সম্বন্ধের এই নিয়মকে অস্বীকার করে এখনও সামন্তবাদী বা পুঁজিবাদী শোষণ কাঠামোকে জিইয়ে রাখতে চাইছে। তারা গ্রামের মানুষকে দুঃখ মোচনের যে প্রতিশ্রুতিই দিক না কেন, সে সবকিছুই শূন্য বাগাড়ম্বরে পরিণত হবে।

১১

নির্বাচনে অপ্রত্যাশিত রকমের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জেতার পর প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীও অনেক নতুন পরিকল্পনা ও সাধ আহ্লাদ ব্যক্ত করেছিলেন। ভারতীয় অর্থনীতির আসল প্যাঁচটা যে কোথায় সে-সব প্রশ্নে না গিয়েই দেশের যুব সম্প্রদায়ের কাছেও এক ধরনের মোহময় আবেষ্টনী তৈরির চেষ্টা চলে প্রধানমন্ত্রীর কথাবার্তায়। অথচ সেই প্রথম পঞ্চবার্ষিকী যোজনা থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বেকার সমস্যার পরিসংখ্যানগত চেহারা ক্রমশই অতিকায় হয়ে উঠছে কেন--এ ব্যাপারে যথাযথ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের নামগন্ধও শোনা

যাচ্ছে না কংগ্রেসের মুখে। ৫০ লক্ষ বেকার নিয়ে প্রথম পরিকল্পনা শেষে দেখা গেল তা বেড়ে দাঁড়াল ৯০ লক্ষ। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে তা গিয়ে দাঁড়ায় ১ কোটি ২০ লক্ষে। এখন তো বেকারের সংখ্যা প্রায় ৩৬,৭৩৭,০০০। সমস্যাটা কি শুধু জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুন? ১৯৯৫ সালের সরকারি হিসেব থেকেই জানা যায় যে নরসিংহ রাও সরকারের সামনে শতকরা ৪.৬৭ ভাগ চাকরির সুযোগ কমে গেছে। ১ লক্ষ ৪০ হাজার লোক চাকরি খুইয়েছে। মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির হার কমে গেছে। ১৯৯৩ থেকে ৯৫ এর মধ্যে এই হার ৫.৩ শতাংশ থেকে নেমে এসেছে ৩ শতাংশে। ভারতে ৪ লক্ষ বেসরকারি শিল্প-কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। বিদেশী ঋণ বেড়েছে ১৯৯৫ সালের হিসেব অনুযায়ী ২ লক্ষ ৯৯ হাজার ৬৮৫ কোটি টাকা। আর এই সঙ্কটে পড়ে ২৫০ মিলিয়ন লোক অপুষ্টিতে ভুগছে। দারিদ্র্যসীমার নিচে পড়ে আছে ৪০.৭ শতাংশ মানুষ। অর্থাৎ এই মানুষদের মাথাপিছু আয় মাসে ৫০ বা ৬০ টাকারও কম।

মেলবোর্ন থেকে প্রকাশিত 'ভ্যানগার্ড' পত্রিকায় এক নিবন্ধে বেশ কয়েক বছর আগে অস্ট্রেলিয়ার বেকার সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছিল 'Economic crisis (in Australia) is developing rapidly. Everyday now sees massive dismissals of workers.' ওই নিবন্ধের এক জায়গায় বলা হয়েছিল 'Australian workers and other people are moving quickly into action against unemployment created by the monopoly capitalist.'

অর্থাৎ অস্ট্রেলিয়ার অর্থনৈতিক সংকট ক্রমশই বেড়ে চলেছে। ফলে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের ঘটনা হয়ে উঠছে নিত্যকার ব্যাপার। আর শ্রমিক ও অন্যান্য স্তরের জনসাধারণ তীব্র আন্দোলনের মুখে এগিয়ে যাচ্ছে একচেটিয়া পুঁজিবাদের দ্বারা তৈরি এই বেকার সমস্যার বিরুদ্ধে।

অস্ট্রেলিয়া তো দূরস্থান, ধনতন্ত্রের পীঠস্থান খোদ মার্কিন মুলুকে ও গ্রেট ব্রিটেনেও যে বেকার সমস্যা বেড়ে চলেছে লন্ডন থেকে প্রকাশিত টাইমস পত্রিকায় প্রায়ই এমন বহু ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোতে ১৯৮২-র হিসাবে দেখা যাচ্ছে বেকারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২ কোটি ৪০ লক্ষ। প্রশ্ন হচ্ছে, আমেরিকা ও ব্রিটেন কিংবা অস্ট্রেলিয়ার অর্থনৈতিক কাঠামোতে যে একচেটিয়া পুঁজিবাদের আধিপত্য, ভারতের ক্ষেত্রেও তো সেই একচেটিয়া পুঁজি ছড়ি ঘোরাচ্ছে। তাহলে?

১৯৮৫-তে আন্তর্জাতিক লেবার অফিস থেকে যে রিপোর্ট বেরিয়েছে তার দ্বিতীয় খণ্ডে উন্নত অর্থনীতির দেশগুলো সম্পর্কে যে অর্থনৈতিক সংকটের ছবি হাজির করা হয়েছে তা বেশ আশঙ্কার উদাহরণ বলেই মনে হয়। তাছাড়া আমেরিকা বা ব্রিটেনের মতো দেশগুলো পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ বিকাশ-সীমায় পৌঁছেও যদি এই অবস্থার মুখোমুখি হয় তাহলে ভারতের অবস্থাটা কী দাঁড়াবে? ভারতে তো হেলদি ক্যাপিটালিজম বা সুগঠিত ধনতন্ত্রের বিকাশ বলতে যা বোঝায় এখন পর্যন্ত — এই সুদীর্ঘকালের টানাপোড়েনে সেটাও সম্ভাবিত হয়ে ওঠেনি। ঔপনিবেশিক অর্থনীতি বিকাশের সূত্র অনুযায়ী পরাধীন ভারতবর্ষে সস্তা শ্রম আর কাঁচামাল ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পণ্য উৎপাদন করার জন্য যেটুকু না করলে নয় সেই সীমাবদ্ধ শিল্পবিকাশ এবং তারই সঙ্গে রাশ টেনে টেনে পরিবহন ইত্যাদি যেটুকু উন্নয়নের ব্যবস্থা ব্রিটিশরা করেছিল তাতে সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির অবশেষটাও রয়ে গিয়েছিল পাকাপোক্তভাবে আর ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বিকাশ হয়েছিল। অনেকাংশেরই বিকাশ হয়েছিল নড়বড়ে, অসম্পূর্ণ বা আধখেয়ো ধরনের।

১৯৪৭-এর পর স্বাধীন দেশের "স্বাধীন" কর্মকর্তারা ব্রিটিশ আমলের অর্থনীতির খোল নলচে তো বদলালেনই না, বরং ব্রিটিশ ও মার্কিন পুঁজি ১৯৪৭-এর আগে যেভাবে ভারতের

শিল্প-কারখানায় খাটতো সেই বিদেশী পুঁজির নিয়ন্ত্রণ বহুজাতিক সংস্থা ইত্যাদির ভেক ধরে আরও ফুলে ফেঁপে উঠলো।

ফলে যেমন কৃষিতে সামন্তবাদী, মহাজনী শোষণ অব্যাহত রয়ে গেল, শিল্পেও তেমনি পুঁজিবাদী শোষণ রয়ে গেল অটুট। বিদেশী পুঁজির পাশাপাশি দেশী পুঁজিপতিরাও ১৯৪৭-এর পর শাসক দল কংগ্রেসের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রক হয়ে দাঁড়ালো। ফলে শ্রমজীবী মানুষ আগেও যেমন শ্রম বিক্রি করে উৎপাদন ব্যবস্থা চালু রাখতো এখনো শ্রমজীবী মানুষ সেই শ্রম বিক্রি করার পর্যায়েই পড়ে রইলো। আর আগেও শ্রমের ন্যায্য মজুরি থেকে যেমন বঞ্চিত হতো এখনো তারা সেভাবেই, এমন কি আরও বেশি বেশি পরিমাণে বঞ্চিত হতে থাকলো। এর জন্যই শ্রমের মালিক আর পুঁজির মালিকের মধ্যে সংঘাত বাড়তে থাকলো।

কারণ পুঁজির মালিক চায় এমন জিনিস এমনভাবে ও এমন পরিমাণে তৈরি করতে যা দিয়ে জনগণের উপযোগিতা মেটানোর প্রশ্নটা মুখ্য হয়ে দেখা দেবে না, বরং তা দিয়ে পুঁজিমালিকের মুনাফা গাণিতিক হারে বাড়ানো উদ্দেশ্যই হবে মুখ্য।

সে জন্যই পুঁজির মালিক প্রয়োজনে কম পণ্য তৈরি করে দেশে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে কিংবা পণ্য গুদামজাত ক'রে রেখে অর্থাৎ যোগান নিয়ন্ত্রণ ক'রে চাহিদার তুলনায় কম পণ্য বাজারে ছেড়ে দাম বাড়িয়ে বেশি লাভ করে। বিক্রির পরিমাণ কমিয়ে লাভ বেশি করা গেলে পুঁজিপতির কিছু যায় আসে না। জনসাধারণের প্রয়োজন মিটলো কি মিটলো না তা নিয়ে পুঁজির ব্যবসাদারদের কিছু মাথাব্যথা নেই। এই যে প্রফিট মোটিভেটেড সোসাইটি বা মুনাফা বৃত্তির মনোভঙ্গিসুলভ যে সমাজ, যেখানে উৎপাদন ব্যবস্থার চরিত্রই যদি হয় এই যে লাভের জন্য দরকার হলে ভেজাল জিনিস তৈরি করা, লাভের জন্য দরকার হলে কম জিনিস বানিয়ে জিনিস প্রতি দামের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে কম বিক্রিতেও বেশি লাভ করা সেখানে দেশের কোন যুবক কাজ পেল কি না পেল, কোথায় কতো শ্রমিককে ছাঁটাই করা হলো কি না-হলো, তা নিয়ে পুঁজির মালিকদের কোনো মাথাব্যথা থাকতে পারে কি?

আর এই পুঁজির মালিকরাই যেখানে যে দেশে একচেটিয়াভাবে পণ্য উৎপাদন আর বণ্টন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখে যে শুধু তাই নয়, দেশের সরকার ও সরকারি দলকেও একচেটিয়া কায়দায় অধীনস্থ করে ফেলে সেই দেশে বেকারি থাকবে কি থাকবে না তা দেশের সরকার ঠিক করতে পারে কি?

অবস্থা বিশ্লেষণ করলে কি দেখা যায়? পুঁজিবাদী গোষ্ঠী চাইলেও কি তা পারে? তাহলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটাকেই তুলে দিতে হয়। পুঁজিবাদীরা কি তা করতে পারে? পারে না বলেই ব্যবস্থাটাকে জীইয়ে রেখেই তারা কিছু কিছু চমক দেয়। কিছু কনসেসন দিয়ে কিছুটা সময় মানুষকে মোহগ্রস্ত করতে চায়। কিন্তু তাও কি সম্ভব বেশি দিনের জন্য? তাহলে তো মার্কিন দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিরাই তা পারতো। তা পারছে কি?

আসলে একচেটিয়া পুঁজিবাদের নিয়মই হলো বিকাশের একটা স্তর পর্যন্ত গিয়ে উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন না করতে পারায় কনসেসন রীতির সীমাবদ্ধতার মধ্যে পড়ে যায়। ফলে অর্থনৈতিক সংকট ক্রমশই গভীর হতে থাকে। তারপর সেই সংকটই ক্রমশ রাজনৈতিক সংকটে পরিণত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমরা কী দেখতে পাই? পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ জনসংখ্যা অধ্যুষিত ভূভাগ পুঁজিবাদী অর্থনীতির জোয়াল থেকে মুক্ত হয়ে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের পথ বন্ধ করে দেয়। ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার সেই বাজারগুলো হাতছাড়া হয়ে যাবার ফলে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা ধাক্কা খেতে থাকে।

এর ফলে উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপাদনক্ষম শ্রমকে কাজে লাগানোর যে সুযোগ যুদ্ধ-পূর্ব

সময়ে পুঁজিবাদীদের হাতে ছিল ক্রমশ তা নিঃশেষ হয়ে যেতে থাকে যুদ্ধ পরবর্তীকালে। এর জন্য নতুন করে উৎপাদন ব্যবস্থা সম্প্রসারণের পথও আটকে যেতে থাকে। এক্ষেত্রে উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন না ঘটিয়ে পুঁজিবাদীরা পুরাতন উৎপাদন সম্পর্কের আধারেই বেশি বেশি লাভ করে যেতে চায়। পুঁজিবাদীদের এটাই রীতি। তাই বেশি বেশি উদ্বৃত্ত মূল্য আদায়ের ধান্দায় তারা উৎপাদন ব্যবস্থার সর্বপ্রধান উপাদান যে শ্রম বা মেহনত সেই শ্রমের বা মেহনতের মূল্য কমিয়ে দিতে থাকে। শ্রমের সংখ্যা কমিয়ে অর্থাৎ শ্রমিক লাগিয়ে মাথাপিছু কাজের বোঝা বাড়িয়ে দিয়ে বেশি বেশি উৎপাদনের মাধ্যমে মুনাফা বাড়িয়ে যাবার খেলা চালাতে থাকে।

পুঁজিবাদী অর্থনীতির নিয়মের এই সীমাবদ্ধতা সব দেশের উৎপাদন ব্যবস্থার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ভারত তো এর বাইতে থাকতে পারে না। যতো দিন না এদেশের পুঁজিবাদী অর্থনীতির উৎপাদন কাঠামোকে বদলানো যাবে ততো দিন বেকার সমস্যা কমবে না, বেড়েই যাবে। গোটা ভারতের জনসংখ্যা যখন ছিল ৩৩ কোটি, তখন সেই ব্রিটিশ আমলেও লোক বেকার ছিল। কাজ না পেয়ে অনাহারে মরতো। শুধু জনসংখ্যার দোহাই দিয়ে লাভ কি? এখন তো আবার বিদেশী পুঁজিপতিদের সঙ্গে কংগ্রেস সরকারের যে চুক্তি হয়েছে তাতে বোঝা যাচ্ছে ভারতের ৯০ কোটি বা ১০০ কোটি সাধারণ মানুষের জন্য নয়, মাত্র ১০ কোটি ওপরতলার মানুষের জন্যই তারা বাজার তৈরি করতে চাইছে। বাকি মানুষ গোল্লায় যাক। এই যদি হয় একটা সরকারের অর্থনৈতিক নীতি, তাহলে সেই সরকারের কাছে যুবকেরা কি চাকরি প্রত্যাশা করতে পারে?

এভাবেই ভারতের জাতীয় অপচয়ের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে সরকারি নীতির ভুলের জন্যই। যে মানুষ বেকার থাকে, দেশের জন্য কোনও উৎপাদন করে না, সে-ও তো দেশের কিছু না কিছু সম্পদ ভোগ করে। সম্পদ উৎপাদনে অংশ না নিয়ে এই যে সম্পদ ভোগ করে যাওয়া এও এক ধরনের ন্যাশনাল ওয়েস্টেজ বা জাতীয় অপচয়।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির নিয়ম একেবারেই উল্টো। মানুষ তার ক্ষমতা অনুযায়ী দেশের কিছু না কিছু কাজ করবে। আর দেশ সেই মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী সবকিছুই তাকে দেবে। কাজ, শিক্ষা, বাসস্থান, পরিবার-পরিজন নিয়ে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার গ্যারান্টি।

ভারতবর্ষের শাসক দল এই সহজ সত্যটা এতো কালেও বুঝলো না। তাই সারা দেশজুড়ে আজ বেকারির মিছিল। বাড়ছে এবং আরও বাড়বে। কংগ্রেস দলের সাধ্য নেই একে ঠেকানোর।

১২

যে-যেভাবেই জনপ্রিয়তার শীর্ষে থাকুন না কেন, শেষাবধি রাজনৈতিক ক্ষমতায় পৌছতে না পারলে বোধ হয় তার স্বস্তি নেই। জনপ্রিয় পণ্ডিত, অধ্যাপক থেকে শুরু করে ডাক্তার, সমাজসেবক, গাইয়ে-বাজিয়ে, লেখক, অভিনেতা — সকলেরই বোধ হয় মনের ভেতর সেই একই গোপন ইচ্ছা খেলা করে। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার বোধ হয় এটাই রীতি।

এ না হলে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতো মানুষই বা পশ্চিমবঙ্গের বিধান পরিষদের চেয়ারম্যান হতে যাবেন কেন? সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পাণ্ডিত্যের তুলনা ছিল না। রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণ সঙ্গী হিসাবে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন সুমাত্রা-জাভা ইত্যাদি দ্বীপময় দেশে। রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতায় ভাষাবিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নাম লেখা হয়ে গেছে রবীন্দ্রনাথেরই হাতে। এরপরও তিনি তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র

রায়ের অনুরোধেই যোগ দিয়েছিলেন বিধান পরিষদের সদস্য হিসাবে। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও বিধানসভার সদস্য হয়েছিলেন ফরোয়ার্ড ব্লকের টিকিটে।

সুনীতিবাবু বা অধ্যাপক রেজাউল করিম কিংবা গোপাল হালদারের মতো মানুষের ব্যাপারটা হয় তো একটু স্বতন্ত্র। কেন না, সংসদীয় রাজনীতিতে বিধান পরিষদ বা দিল্লির রাজ্যসভার মতো দ্বিকক্ষ ধরনের শাসন বিধির চল হয়েছিল এই উদ্দেশ্যেই যে, দেশের বিদ্বান, পণ্ডিত, জ্ঞানী-গুণী মানুষ তো আর সাধারণ নির্বাচন নামক খেয়োখেয়ির যুদ্ধে সহজে নিজেকে জড়াতে চাইবেন না। অথচ দেশের আইন প্রণয়নের স্বার্থেই এসব জ্ঞানী-গুণী মানুষের মতামতের যথেষ্ট মূল্য থাকে। তাই একেবারে সাধারণ মানুষ নিয়ে যে নির্বাচনী লড়াই, সেই স্তরে এদের নামিয়ে না এনে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মতামতের ভিত্তিতেই এসব গুণী মানুষকেও রাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িয়ে রাখাটা দরকার হয়ে পড়ে।

কিন্তু এখন বোধ হয় এই দৃষ্টিকোণ থেকে রাজ্যসভা বা বিধান পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার রীতি নেই। অবশ্য এর শুরু সেই কংগ্রেস আমলের পঞ্চাশের দশক থেকেই। তখনো এম এল এ বা এম পি নির্বাচনে হেরে যাওয়া প্রার্থীকে রাজ্যসভা ও বিধান পরিষদের সদস্য করে দেওয়ার রীতি ছিল। তবে এখন যেমন একেবারে হালকা বয়সের অনভিজ্ঞ ও অনামী এবং একেবারে অপরিচিত স্তরের ব্যক্তিকেও রাজ্যসভায় ঢুকিয়ে দেবার রেওয়াজ চালু হয়েছে তখনকার আমলে বোধ হয় তেমনটা ছিল না। আসলে সামগ্রিক বিচারে রাজনীতির মান অনেক নিচে নেমে যাওয়াতেই বোধ হয় এখন এ ধরনের মাথা গুনতি সদস্যের কদর বেড়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের মতো কোনো কোনো রাজ্যে বিধান পরিষদ জাতীয় দুকক্ষ-ব্যবস্থার এখন আর চল নেই। কিন্তু দিল্লিতে এখনো রাজ্যসভা আছে। আর রাজ্যসভার সদস্যরা পার্লামেন্টের সদস্যদের মতোই সমান সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার ভোগ করে থাকেন। কিন্তু সেখানে সব সময় যে জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিত্বের বিচারে সকলেই ঠাঁই হয় এখন আর তেমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় কি?

অথচ রাজনীতির রোজকার কাজকর্মের সঙ্গে সক্রিয় ও সরাসরি যোগ নেই এমন কিছু কিছু ব্যক্তিত্বকে এখন সরাসরি এম এল এ ও এম পি আসনে লড়াই করতে দেখা যাচ্ছে। একদা ইন্দিরা গান্ধী লাখনৌ-এর জদ্দন বাঈয়ের মেয়ে নার্গিসের মতো অভিনেত্রীকে রাজ্যসভায় স্থান করে দিয়েছিলেন ঠিকই। কিন্তু তারই স্বামী সুনীল দত্তের মতো চলচ্চিত্র শিল্পীকে শেষে এম পি নির্বাচনে নেমে পড়তে দেখা গেল। ভারতীয় চলচ্চিত্র আন্দোলনে সুনীল দত্তের কী ধরনের ভূমিকা ছিল বা আছে সেসব বিতর্কে না গিয়েও বলা যায় পার্লামেন্টে ভারতীয় চলচ্চিত্রের উন্নয়নের বা সংকটের সমস্যা নিয়ে সুনীল দত্ত যে খুব কার্যকর কোনো ভূমিকা পালন করেছেন সংসদীয় কার্যবিধিতে তার স্বাক্ষর খুঁজে পাওয়া দুষ্কর বলেই মনে হয়। কিংবা সেরকম কোনো ভূমিকা তিনি পালন করে থাকলেও জনসাধারণের কাছে হয় তো তার কোনো প্রচার নেই বলেই চলচ্চিত্র অভিনেতা হিসাবে তার সংসদীয় রাজনীতিতে যোগদানের তাৎপর্য জনমানসে তেমন করে অনুভূত হয় না। তবে ছেলেকে টাডা আদালত থেকে জামিন আদায়ের ব্যাপারে তাঁর এম পি হওয়ার ইমেজ যে একেবারে কাজে লাগেনি তা কি বুকে হাত দিয়ে বলা যাবে?

আর সাহিত্যসেবী, বিজ্ঞানী, সংগীতকার, চলচ্চিত্রকার, ইতিহাসবিদ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে সরকার তো অন্যভাবেও ব্যবহারের সুযোগ নিতে পারে। তেমন সুযোগ যে সরকারি ব্যবস্থায় নেই তা তো নয়। প্রশান্ত মহলানবীশের মতো অর্থনীতিবিদকে একদা পণ্ডিত নেহরু পরিকল্পনা কমিশনের প্রধান পরামর্শদাতা হিসাবে তো গ্রহণ করেছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারও এমন কিছু জ্ঞানী-গুণী মানুষকে নাটক ও সঙ্গীত একাডেমিত কিংবা নন্দন ও রবীন্দ্রসদনের কাজ-কর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়েছেন এমন দৃষ্টান্তের তো ভুরি ভুরি প্রমাণ দেওয়া যায়। অবশ্য সব ক্ষেত্রে সকলের মনোনয়ন যে সব সময় সঠিক গুণের ভিত্তিতেই হয় এমন কথা ঢালাওভাবে বলার ক্ষেত্রে অনেকের আপত্তি থাকতে পারে। তবুও বামফ্রন্ট সরকারের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা অন্তত এক্ষেত্রে করাই যায়।

কিন্তু সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে বি জে পি-র হয়ে প্রচারে নামছেন মাধুরী দীক্ষিত, গোবিন্দা, দেবানন্দ প্রমুখ তারকারা। শত্রুঘ্ন-রাজেশ খান্নার ব্যাপারটা তো পুরনো। এ রকম কিছু ব্যক্তি, বিশেষ করে চলচ্চিত্র শিল্পী মনোনয়নের ব্যপারটা জনসাধারণের বেশ ক্ষুদ্র একটা অংশে হলেও কিছুটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এতে কি রাজনীতির মান বাড়বে? সাংস্কৃতিক অঙ্গনের মানুষজনের রাষ্ট্রনৈতিক বিধি সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল থাকাই সচেতন নাগরিকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলেই বিবেচিত হয়। কিন্তু মানসিকতাটা যদি এমন হয় যে, রাজনৈতিক ক্ষমতা না পেলেই বোধ হয় জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গেল, তাহলে গোটা উদ্দেশ্যটা নিয়েই সংশয় থেকে যায়। আর রাজনীতিক ক্ষমতায় থাকাটা কি কারোর মৌরসী পাট্টা না কি? মন্ত্রী থাকলে দলে আছি। মন্ত্রী না করলে দল ছেড়ে আর এক দলে। এটাই বা কোন রাজনীতি? পীযূষ তিরকে কংগ্রেস থেকে আর এস পি তে এসেছিলেন কি শুধু এম পি হবার জন্য? আর ব্যাপারটা যদি এমন হয় যে, বিভিন্ন শ্রেণীর ও সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব বিধানসভায় থাকাটা জরুরী তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায়। কেন না, আমাদের মতো উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশে শ্রেণীর বিচারে শ্রমিক প্রতিনিধি কিংবা সংখ্যার বিচারে কৃষক প্রতিনিধি কতো জন এখন এদেশের আইনসভায় স্থান পান? বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তো এখনো সমাজের ওপর তলার বা খানিকটা উচ্চবিত্ত অংশের মানুষজনই আইনসভায় আসর সাজান। যাদের বাপ-ঠাকুর্দারা কৃষককে শোষণ করে বিত্তবান হয়ে উঠেছেন তাদেরই অনেকেই তো এখন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কৃষক সমাজকে প্রতিনিধিত্ব করছেন। এম এল এ বা এম পি পদে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সামাজিক অবস্থান ও অর্থনৈতিক চালচিত্রের চুলচেরা বিচার করলেই এ সত্য অনেকটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। সত্যিই কি তারা শ্রমিক শ্রেণীর বা কৃষক সমাজের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব দাবি করতে পারেন?

এক মধ্যপ্রদেশের সিন্ধিয়া রাজ পরিবারের ৯ জন নির্বাচনে প্রার্থী। ভি পি সিং, অর্জুন সিং প্রমুখের মতো কতো যে রাজা-রাজড়ার হাতেই ঘুরে-ফিরে দেশের ক্ষমতা চলে যায় তার হিসাব কে রাখে? আগে রাজা, রাজপুত্র, জমিদার, জোতদার হয়ে ক্ষমতা ভোগ করতো যারা, এখন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার নামে তারাই জনপ্রতিনিধি হয়ে ছড়ি ঘোরায়। গরিব পিছিয়ে পড়া মানুষ সেই তিমিরেই।

অমুক নেতার পেয়ারের পাত্র বা তমুক নেতার ভাগ্নে বা জামাই — এ ধরনের সম্পর্কসূত্রের বিচারেও যে কেউ কেউ মনোনয়ন পান না এমন কথা কি জোর দিয়ে বলা যায়? গণ-সংগঠনের সফল চরিত্র হিসাবে উঠে আসা কর্মিকে কি সবক্ষেত্রে নেতৃত্বের আসনে ঠাঁই দেওয়া হয়?

সম্প্রতি আইনসভায় আলোচনার বা তর্ক-বিতর্কের মান ভয়ানকভাবে নেমে যাচ্ছে কি এসব কারণেই? রাজনৈতিক দলগুলোকে সহানুভূতির সঙ্গে বিষয়টা বিবেচনা করতেই হবে। কেন না জনসেবক এখন জননেতা হিসাবে বিবেচিত হচ্ছেন এ কথা তেমন জোর দিয়ে আর বলা যাচ্ছে না। রাজনীতি করাটা কি ফ্যাসন প্যারেড বা গ্ল্যামার শো-র ব্যাপার? দৌড়ে প্রথম হওয়াটাই একমাত্র লক্ষ্য? ভাবাদর্শগত বিশ্বাস এবং সে বিশ্বাসের ভিত্তিতে লড়াই করার গুণাবলী আয়ত্তের ব্যাপারটাই কি কিছুই নয়?

দ্বিতীয় পর্ব

ক ম ল ভ ট্টা চা র্য

পশ্চিমবঙ্গ : ১৯৯৮

প্রায় ৩১ বছর আগের কথা। ১৯৬৭ সাল, সেদিন পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে সংযোজন হয়েছিল এক নতুন অধ্যায়ের। জনসাধারণের বিপুল সমর্থন ও আশীর্বাদ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম ক্ষমতায় এল যুক্তফ্রন্ট। ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৭৭ নানান রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাত। এল ৭২-এর সন্ত্রাস, ৭৫-এর জরুরি অবস্থা। রাজনৈতিক স্রোত বইতে শুরু করল ভিন্ন খাতে। সংগ্রামে পোড় খেয়ে পোক্ত ও মজবুত হয়ে উঠল বামফ্রন্ট। শহর ও গ্রামে এক নতুন বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল। এই প্রেক্ষাপটে এল নির্বাচন। মানুষের সমর্থন ও আশীর্বাদ নিয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল বামফ্রন্ট সরকার। ২২ বছর ধরে বামফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গে নিজেদের জনমুখি ও কল্যাণকর সরকার কায়েম রেখেছে। বিনয়-বাদল-দীনেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত মহাকরণে সগৌরবে উড়ছে বামফ্রন্টের জয়গাথার লাল পতাকা।

১৯৭৭ সালের সেই স্মরণীয় দিনটি আজও মনে পড়ে। রাজভবনে জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে প্রথম বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভার শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান। রাজভবন থেকে মহাকরণ কেবল মানুষের উচ্ছ্বাস। শ্লোগানে শ্লোগানে মুখরিত শহর কলকাতাসহ পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চল। মানুষ এবং জনজীবন অনুরণিত হয়েছিল নতুন স্পন্দনে। ক্ষমতায় আসীন হওয়ার আগে বামফ্রন্ট নানা অঙ্গীকার করেছিল নির্বাচনী ইস্তেহারে — মূলত মানব কল্যাণে। আজ বামফ্রন্ট সরকার শৈশব ও কৈশোর পেরিয়ে ২২ বছরের যুবক। এর মধ্যে হয়ে গেছে বেশ কটি সাধারণ নির্বাচন ও রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন। বামফ্রন্ট ঘোষণা করেছে নানান কর্মসূচি। তার অনেক কর্মসূচি রূপায়িত হয়েছে। আবার বাস্তবায়ন হয়নি অনেক কিছুর। আজ ২২ বছরের বিশ্লেষণ আর আত্মসমীক্ষা। টানা ২২ বছর ক্ষমতায় থাকা নিশ্চয়ই বিস্ময়ের। কিন্তু বহুক্ষেত্রে আত্মসন্তোষ সরকারের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে।

এটা অনস্বীকার্য, ২২ বছরে ভূমিসংস্কার, পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন, উদ্বাস্তু সমস্যা, তফসিলি ও আদিবাসী এবং অন্যান্য অনগ্রসর কল্যাণ, ক্ষুদ্রশিল্প, প্রাণীসম্পদ বিকাশ, পর্যটন, কৃষি, মৎস্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকার উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে। ২২ বছরে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের যে সব কর্মসূচি তৃণমূলকে স্পর্শ করেছে তার মধ্যে অবশ্যই উল্লেখের পঞ্চায়েত, ·গ্রাম উন্নয়ন এবং সার্বিক সাক্ষরতা অভিযান।

১৯৭৮ সালের পর থেকে গ্রামোন্নয়ন প্রকল্পগুলি মূলত পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে

রূপায়িত হচ্ছিল। পরে ১৯৯৬ সালে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর দুটিকে একীভূত করা হয় কর্মসম্পাদনে দ্বিত্ব ও উপস্থাপনার ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব এড়ানোর জন্যই। এটা ঠিক, ৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার কায়েম হওয়ায় পঞ্চায়েত সম্পর্কে ধারণার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। গ্রামীণ ক্ষেত্রে তিনটি কাজকে প্রাথমিক দায়িত্ব বলে বামফ্রন্ট গ্রহণ করে। (১) পঞ্চায়েতগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা, (২) গ্রামীণ অর্থনীতির স্থিতাবস্থায় পুনরায় গতি সঞ্চার করা, (৩) গরিব মানুষের সপক্ষে শ্রেণীসমূহের পারস্পরিক ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটানো। এইলক্ষ্যে বামফ্রন্টের বড় কৃতিত্ব হল, ভূমিসংস্কারের কর্মসূচি সাফল্যজনক রূপায়ণের সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানের উত্থানের ফলে গ্রামাঞ্চলের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। ২২ বছরের বামফ্রন্ট সরকার প্রসঙ্গে প্রথমেই বলতে হয় :

(১) পশ্চিমবঙ্গই একমাত্র প্রথম রাজ্য যেখানে অশোক মেহতা কমিটির সুপারিশেরও আগে রাজনৈতিক পঞ্চায়েতের পথে যাওয়া যায়। পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্যে দলীয় অংশগ্রহণের বিষয়ে দু ধরনের অবস্থা দেখতে পাওয়া যায়। অন্ধ্রপ্রদেশ ও কর্ণাটকের মতো রাজ্যে পঞ্চায়েতে দলীয় অংশগ্রহণ আছে, কিন্তু সর্বস্তরে দলীয় অংশগ্রহণ নেই। একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই পঞ্চায়েতের সর্বস্তরের নির্বাচনেই দলগুলি অংশগ্রহণ করে। ভবানী সেনগুপ্তকে উদ্ধৃত করে বলা যায়, "এই সাধারণতন্ত্রের ইতিহাসে সর্বপ্রথম ক্ষমতার তৃণমূলে তীব্র রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা ঘটে। ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসে কখনো এমন উন্মুক্ত গণতান্ত্রিক এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশে একটি রাজনৈতিক দল এত গভীরভাবে, সংগঠিতভাবে দেশের গ্রামগুলির প্রাচীন ধারাকে ভেদ করতে পারেনি।"

(২) পশ্চিমবঙ্গই দেশের মধ্যে একটি প্রথম রাজ্য যেখানে গ্রামীণ নেতৃত্বের সামাজিক গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে অতীতের রাজনৈতিক গঠনের একটি পরিবর্তন ঘটে। অশোক মেহতা কমিটি মন্তব্য করেছিল, "পঞ্চায়েতগুলি সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিধাভোগী অংশের দ্বারাই প্রভাবিত।" বহু গবেষণার দ্বারাই এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৭৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই পরিস্থিতি পরিবর্তন এনেছিলো। একটি সামগ্রিক গবেষণা এবং বেশ কয়েকটি গ্রামভিত্তিক গবেষণায় দেখা গেছে পাঁচ একরের নিচে জমি আছে এমন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীরাই দ্বিতীয় প্রজন্মের পঞ্চায়েতগুলিকে প্রভাবিত করেছে। দাশগুপ্ত এবং মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "গ্রামীণ সমাজে গরিব ও ভূমিহীনদের মধ্যে বৃহৎ জমির মালিকরা আধিপত্যরক্ষার একটি যন্ত্রহিসাবে পুরাতন পঞ্চায়েতগুলিকে ব্যবহার করতো। রাজ্যস্তরে বামফ্রন্টের ক্ষমতায় আসা এবং পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলির প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে এইসব পুরাতন নেতাদের ক্ষমতা থেকে সরে যেতে বাধ্য করে এবং পঞ্চায়েত বৃহত্তর সামাজিক ভিত্তিতে গঠিত হয়।"

(৩) পশ্চিমবঙ্গই দেশের প্রথম রাজ্য যেখানে ১৯৭৮ সাল থেকেই নির্দিষ্ট সময় অন্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ সংবিধানের তিয়াত্তরতম সংশোধনী গৃহীত হওয়ার এক দশক আগে থেকেই এই সংশোধনীর একটি অন্যতম উদ্দেশ্য রাজ্যগুলিকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে বাধ্য করা — যা পশ্চিমবঙ্গে আগেই শুরু হয়ে গেছে। আশ্চর্যজনকভাবে এই সংবিধান সংশোধনী গৃহীত হওয়ার পরেও কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, বিহার, ওড়িশার মতো রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে বাধ্য করার জন্যে মানুষকে আদালতের দ্বারস্থ হতে হচ্ছে।

(৪) পশ্চিমবঙ্গই একমাত্র প্রথম রাজ্য যেখানে দ্বিতীয় প্রজন্মের পঞ্চায়েতের সময়েই পঞ্চায়েতকে গ্রামীণ কায়েমীস্বার্থের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মঞ্চ হিসাবে উপস্থিত করা হয়।

প্রথমবারের নির্বাচনী শ্লোগান ছিল "বাস্তুঘুঘুর বাসা ভাঙো" তৎকালীন বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান এই নির্বাচনকে গ্রামের কায়েমীস্বার্থ ও শোষণকারী শ্রেণীর বিরুদ্ধে গরিব কৃষক, খেতমজুর ও গ্রামীণ কারিগর ইত্যাদির অধিকার প্রতিষ্ঠার একটি লড়াই হিসাবে আখ্যায়িত করেছিল।

দ্বিতীয় প্রজন্মের পঞ্চায়েতগুলি তাদের কার্যকরী ভূমিকার প্রমাণ দেয় ১৯৭৮ সালে। পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপক অঞ্চল বিধ্বংসী বন্যায় তখন ক্ষতিগ্রস্ত। পঞ্চায়েত এই ঘটনার মোকাবিলায় রুখে দাঁড়ায় এবং কার্যকরীভাবে এর মোকাবিলা করে। আগেকার মতো এইরকম ঘটনায় গ্রাম থেকে শহরে বানভাসি মানুষ আসার পরিমাণ খুবই কম যায়, যা পঞ্চায়েতগুলির কাজের সাফল্যের প্রমাণ।

ভূমিসংস্কার কর্মসূচি রূপায়ণে পঞ্চায়েতের অংশগ্রহণের কথায় এবার আসা যেতে পারে। ভূমিসংস্কার কর্মসূচির তিনটি দিক আছে। ভাগ-চাষীদের নাম নথিভুক্ত করা যা "অপারেশন বর্গা" নামে বহুল পরিচিত, সিলিং বহির্ভূত উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীনদের মধ্যে পুনর্বণ্টন এবং ভূমিসংস্কারে উপকৃতদের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্যের হাত বাড়ানো।

সান্ধ্যকালীন শিবির গঠনের মাধ্যমে "অপারেশন বর্গা" কর্মসূচি রূপায়ণে পঞ্চায়েতগুলি অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সান্ধ্য শিবিরগুলির মাধ্যমে পঞ্চায়তেগুলি ভবিষ্যতে বর্গাদার হলে সাহায্য ও সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভাগচাষীদের নাম নথিভুক্ত করলে প্রাণোদনার সৃষ্টি করে। বর্তমান লেখকের গবেষণায় ব্যাখ্যা করা হয় যে এই সমর্থন ভাগচাষীদের মধ্যে মর্যাদাবোধ এবং আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। ৭০ শতাংশের বেশি নথিভুক্তকারী বর্গাদার জমির মালিকের সাহায্য ছাড়াই শস্যোৎপাদন করার ক্ষমতার কথা বলেন। এই কর্মসূচির সাফল্য ছিল প্রশংসনীয়। গড় নথিভুক্তকরণের হার ৩০০ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পায় বলে দাবি করা হয়েছিল।

পঞ্চায়েতগুলি জমি পুনর্বণ্টনের কাজে সরাসরি অংশ নেয়। জেলা পরিষদ এবং পঞ্চায়েত সমিতি স্তরে এই কাজ দেখার জন্য স্থায়ী কমিটি আছে। যখন খাস জমি পুনর্বণ্টন করা স্থির হয়, তখন স্থায়ী কমিটিগুলি প্রাপকদের তালিকা তৈরি করে। এবিষয়ে সারাদেশে পশ্চিমবঙ্গের রেকর্ড সবচেয়ে ভালো। যেখানে সারা দেশে চাষযোগ্য জমির তিন শতাংশ পশ্চিমবঙ্গে, সেখানে ১৯৯১ সালের শেষ দিক নাগাদ এখানে চাষযোগ্য জমির এক পঞ্চামাংশ কৃষিসংস্কার কর্মসূচিতে পুনর্বণ্টন করা হয়েছে। সারা দেশে ভূমিসংস্কারের উপকার গ্রহীতার ৪০ শতাংশেরও বেশি এ রাজ্যেই পাওয়া যাবে।

ভূমিসংস্কারের কাজ অধিক মাত্রায় সাফল্য লাভ করার ফলে এবং পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানের উন্নতির ফলে গ্রামাঞ্চলের আর্থিক সামাজিক অবস্থার এক অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটেছে।

ক) যেখানে জাতীয় ক্ষেত্রে মোট কৃষিজমি গড়ে ২৯ শতাংশ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীর মালিকানাধীন, সেখানে এ রাজ্যে এই পরিমাণ ৬০ শতাংশ। এখানে কৃষকদের মধ্যে পাট্টা দেওয়া হয়েছে এমন ৯৫ শতাংশের কার্যকরী অধিকৃত জমির পরিমাণ দুই হেক্টরের নিচে।

খ) ১৯৮১ সালে মোট শ্রমিকদের মধ্যে যেখানে ২৫.২ শতাংশ ছিল কৃষি শ্রমিক সেখানে ১৯৯১ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ২৪.৫ শতাংশ। একই সময় সারা দেশে মোট শ্রমিক সংখ্যার মধ্যে কৃষি শ্রমিকদের পরিমাণ ২৪.৯ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ২৬.২ শতাংশ।

গ) সপ্তম পরিকল্পনার সময়েই পশ্চিমবঙ্গ কৃষি উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনে। ১৯৮৩-৮৪ সাল থেকে ১৯৯১-৯২ সালে পশ্চিমবঙ্গে গড় খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল ৬.৫ শতাংশ, যেখানে দেশের ক্ষেত্রে এই হার ২.৭ শতাংশ। ১৯৮০ সাল পর্যন্তও

দেশের বাকি অংশের তুলনায় এই রাজ্যের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি অত্যন্ত কম ছিল সেখানে সপ্তম পরিকল্পনার সময় খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির হার ৩৪ শতাংশে পৌঁছায়, যা ছিল দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং হরিয়ানা (২৪ শতাংশ) ও পাঞ্জাবের ২৩ শতাংশ থেকেও অনেক এগিয়ে। ৯০ দশকের শুরুতেই পশ্চিমবঙ্গ দেশের সবচেয়ে বেশি উৎপাদনের রাজ্যে পরিণত হয়। হ্যারিসের মতো গবেষক এই যুক্তি দেখিয়েছেন যে কৃষিক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের সাফল্য অতি প্রশংসনীয়। এবং এই সাফল্যের মূল কারণ হচ্ছে ক্ষুদ্র সেচ সম্পর্কে এর সুসম্বদ্ধ নীতি।

সেচের আওতায় যে জমি ছিল তা কুড়ির একটু বেশি থেকে বেড়ে চল্লিশ শতাংশে পৌঁছেছে। পশ্চিমবঙ্গে শস্যোৎপাদনের ঘনত্বের পরিমাণ বর্তমানে ১৬২ শতাংশ দাঁড়িয়েছে যা পাঞ্জাব (১৭৮) এবং হরিয়ানার (১৬২) পরেই, যেখানে সর্বভারতীয় গড় ১৩০ শতাংশ।

সেচ প্রকল্প যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিহার, ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশে সেচের জন্য যে ব্যয় হয়েছিল, উৎপাদন কিন্তু সেই হারে বৃদ্ধি পায়নি। পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েতগুলি যে সমস্ত গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচিগুলি রূপায়ণ করেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল জওহর রোজগার যোজনা এবং সুসংহত গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচি (আই আর ডি পি)। ১৫টি রাজ্যে আই আর ডি পি রূপায়ণের বিষয়ে ন্যাশনাল এগ্রিকালচার ব্যাঙ্ক ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট একটি সমীক্ষা করে। যাতে দেখা যায় উপকার গ্রহীতা চিহ্নিত করলে এ রাজ্যে একটিও ভুল হয়নি। গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃকই সমস্ত উপগ্রহীতা নির্বাচিত হয়েছেন। এবং ৯১.৭ শতাংশটি ক্ষেত্রে এ রাজ্যে সম্পদের গুণমান ভালো, যেখানে জাতীয় গড় ৮১ শতাংশ। ওয়েবস্টার দেখিয়েছেন যে আই আর ডি পি-তে কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুফল গরিবদের মধ্যে গিয়েছে। মথুরা স্বামীনাথন তাঁর তুলনামূলক সমীক্ষায় বলেছেন যে যেখানে আই আর ডি পি-র সুযোগ তামিলনাড়ুতে স্থানীয় জমিদারদের বন্ধু এবং ঘনিষ্ঠদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই লক্ষ্য বহির্ভূত অংশে এই সুযোগ গিয়েছে কম পরিমাণে। সি এন রায় তাঁর গবেষণায় বলেছেন আই আর ডি পি-র আওতার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের অনেক বেশি পরিমাণে কৃষি শ্রমিককে নিয়ে আসা হয়েছে, উত্তরপ্রদেশ এবং গুজরাটে সেরকম হয়নি। এন আর ই পি এবং এল ই জি পি-এর মতো আগেকার কর্মসংস্থান সৃষ্টির কর্মসূচিগুলি সম্পর্কে দেখা গিয়েছে যে দরিদ্ররাই সকলে কাজ পেয়েছেন। ওয়েস্টার গাড উল্লেখ করেছেন যে এন আর ই পি এবং আর এল ই জি পি তহবিলকে কাজে লাগাতে পঞ্চায়েতগুলির ভূমিকা এই কারণে উল্লেখযোগ্য যে জনসাধারণের প্রকৃতভাবে বঞ্চিত অংশের সাহায্যার্থেই এই তহবিল ব্যয়িত হয়েছে। এন আই আর ডি ডি এ জি-র সমীক্ষাও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে কর্মসংস্থান সৃষ্টির কর্মসূচিগুলিতে স্থানীয় মানুষ কাজের মাধ্যমে দারিদ্র্যের মোকাবিলা করতে পেরেছেন এবং কিছু সম্পদ সৃষ্টি করতে পেরেছেন। এন আর ই পি কর্মসূচি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে এক যৌথ মূল্যায়নে দেখা গেছে উপকৃত ব্যক্তিদের মধ্যে ৮২ শতাংশই ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক এবং এর মধ্যে তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতির সংখ্যা ৬৫ শতাংশ। যেখানে জাতীয় গড় যথাক্রমে ৩৪ ও ৫২ শতাংশ। এই প্রতিবেদনে আরও দেখা যায় যে এন আর ই পি-তে সৃষ্ট সম্পদের ৯৯ শতাংশ উপযুক্তভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে যদিও এক্ষেত্রে জাতীয় গড় ৩৫ শতাংশ যেখানে জাতীয় গড়ে শ্রমিকরা ১৫ শতাংশ ক্ষেত্রে দৈনিক মজুরি পেয়েছেন সেখানে এ রাজ্য পেয়েছে ৮৮ শতাংশ ক্ষেত্রে। দরিদ্র মানুষদের যে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল তখন রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বের কোনও প্রশ্নই ওঠেনি।

জে আর ওয়াই রূপায়ণ সম্পর্কে এক সমীক্ষায় এচেভরি জেন্ট লক্ষ্য করেন যে,

প্রকল্পটি কার্যকরীভাবে উদ্দিষ্টজনের কাজে লেগেছে এবং একই সঙ্গে তুলনামূলকভাবে দুর্নীতিমুক্ত।

এই প্রসঙ্গে যদিও উল্লেখযোগ্য যে বিনিয়োগ প্রকল্প নির্ণয় উপকৃতদের প্রশিক্ষণ মেরামতি কাজের মতো অন্যান্য বিষয়ে ভারতের অন্যান্য অংশের তুলনায়, পশ্চিমবঙ্গের রেকর্ড ভালো নয়।

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচির সফল রূপায়ণের ফলে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটে, সুতরাং পঞ্চায়েতের কার্যকরী ভূমিকা একটি পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। প্রথমত গ্রামীণ কর্মসংস্থান ১৯৮০ সালে ২২.২৪ লক্ষ থেকে ১৯৯১ সালে ৬৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৩৬.৪৭ লক্ষ। দ্বিতীয়ত সুদখোরের সংখ্যা কমে গেছে। যেখানে ১৯৭৭-৭৮ সালে মোট 'অনাদায়ী গ্রামীণ ঋণের ২৬ শতাংশের একটু কম অংশ ছিল বেসরকারি মহাজনী প্রথায়, সেখানে একই সূত্র অনুসারে ১৯৯৩ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ১২ শতাংশে। তৃতীয়ত ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার যখন ক্ষমতায় আসে তখন দরিদ্র লোকের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। ১৯৮৭ সাল থেকে এই সংখ্যা কমতে থাকে।

চতুর্থত, নিপীড়িত জনগণের অধিকার সম্পর্কে কোন জ্ঞান ছিল না। তাদের সংগঠিত করার ফলে তাদের মধ্যে অধিকারবোধের সচেতনা বৃদ্ধি পেয়েছে। মুখার্জি - বন্দ্যোপাধ্যায়-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে পঞ্চায়েতগুলি গ্রামাঞ্চলের অবদমিত মনুষ্যত্বকে টেনে তুলেছে এবং সমস্ত অংশেই উচ্চমাত্রার সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনার সৃষ্টি করেছে। একই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়নমূলক কর্মসূচির সফল রূপায়ণ সম্ভব বয়েছে বৃহত্তর জনগণের অংশগ্রহণের ফলে। স্থানীয়, মানুষের অংশগ্রহণের ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহীতাদের স্থানীয় তথ্য সংগ্রহে ব্যাপক সুবিধা পাওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা আজ পর্যন্ত আবশ্যিক না হলেও অধিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণ এবং মধ্যাহ্ন খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তফসিলি এবং অ-তফসিলি প্রভৃতি জাতির ক্ষেত্রে শিক্ষাদান চলছেই। এর পাশাপাশি চলছে বিদ্যালয়ের বাইরের শিক্ষা অর্থাৎ (মাস এডুকেশন), ফলে সকলে সাধারণ প্রচেষ্টার মাধ্যমে তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতিসহ সকলের মধ্যে শিক্ষিতের হার প্রায় দেড় গুণ বেড়েছে বিগত ২০ বৎসরে। এক্ষেত্রে তফসিলি জাতি ও উপজাতি শিশুদের জন্য হোস্টেল এবং আশ্রমের ব্যবস্থা করা এবং যে সমস্ত পরিবারে পড়াশুনোর পরিবেশ নেই সেই সমস্ত শিশুদের পড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই কাজটি তফসিলি কল্যাণ বিভাগ থেকেই করা হয়ে থাকে। এ কৃতিত্ব বামফ্রন্ট সরকারের।

মাধ্যমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়িয়ে মাধ্যমিকস্তরে তফসিলি জাতিসহ সকল ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াবার ব্যাপক ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০ বৎসরের মধ্যে এই বিষয়ে সাফল্য অর্জন করেছে। তপসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতিভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীরা পুস্তক ক্রয় বাবদ শ্রেণী ভেদে (ক্লাস) বিভিন্নহারে প্রতি বছর বুক গ্রান্ট পেয়ে আসছে। ১৯৭৭-৭৮ সালে সারা রাজ্যে ৪৬,৮৮৪ জন তফসিলি জাতি ও ১৫,৩৩২ জন তফসিলি উপজাতি মাধ্যমিক ছাত্র-ছাত্রীদের বুক গ্রান্ট পেয়েছিল। ১৯৯১ ও ১৯৯৫ সালে পেয়েছে যথাক্রমে ৮,৩১,৯০৪ জন ও ১,২০,২৬৩ জন। বৃদ্ধির হার ১৮ গুণ ও ৮ গুণ গরিব তফসিলি জাতি ও ৭,৪১৭ জন, তফসিলি জাতি ৪,১৮৩ জন তফসিলি উপজাতির ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে একটা অংশকে হোস্টেলে রেখে পড়াবার ব্যবস্থা করা হয়। ২০ বৎসর আগে মাথা পিছু ৭৫ টাকা করে হোস্টেল চার্জ পেত ২৯,২৩০ জন তফসিলি জাতি ও

২৭,০৭৮ জন তফসিলি উপজাতি ছাত্র-ছাত্রী। বর্তমানে প্রত্যেক বৎসরে মাসিক ৩০০ টাকা করে হোস্টেল চার্জ পায়। হোস্টেলে থাকার সুযোগ যারা পায়নি অথচ গরিব, তাদের জন্য বাড়িতে খোরাকি সাহায্য হিসাবে বৎসরে ৩০০ টাকা করে দেবার ব্যবস্থা আছে। ২০ বৎসর আগে কিন্তু এই প্রকল্পটি ছিল না। ১৯৭৯ সালে শুরু করা হয়েছিল। বর্তমানে সারা রাজ্যে ১,১০,০০০ জন তফসিলি জাতি ও ৬৭,০০০ জন তফসিলি উপজাতিভুক্ত মাধ্যমিক ছাত্র-ছাত্রী এই সাহায্য পায়। তফসিলি জাতি ও তপসিলি উপজাতি মেয়েদের শিক্ষার উৎসাহ দানের জন্য মেধার ভিত্তিতে ২৪০০ জন মাধ্যমিক ছাত্রী মাসিক ১০০ টাকা থেকে ১৫০ টাকা পর্যন্ত সাহায্য পায়। এই প্রকল্পটি সম্প্রতি শুরু করা হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রী নির্বিশেষে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ১২০০ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের ৫০০ টাকা করে অতিরিক্ত মেধাবৃত্তি দেওয়া হয়। ফলে জয়েন্ট এন্ট্রান্স ও অন্য প্রবেশিকা পরীক্ষাসমূহের এবর্গের ছাত্রছাত্রীরা আগের চেয়ে ভালো ফল করেছে।

স্নাতক, স্নাতকোত্তর, ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষিবিজ্ঞান, পশুচিকিৎসা, পলিটেকনিক, শিক্ষণ শিক্ষা প্রভৃতি মাধ্যমিকোত্তর পর্যায়ে বর্তমানে মাসিক ৩০০ টাকা থেকে ৪৫০ টাকা পর্যন্ত খোরাকি বাবদ বৃত্তি দেওয়া হয়। ১৯৭৬-৭৭ সালে তফসিলি জাতির ২৫,১৪৩ জন ও তফসিলি উপজাতির ১৩,৮৪৩ জন এবং ১৯৯৪-৯৫ সালে ৭৩,৯৯৭ জন তফসিলি জাতির ও ৮,০৫৬ জন তফঃ উপজাতির ছাত্র-ছাত্রী এই বৃত্তি পায়। বই কেনা টিউশান ফি অন্যান্য ব্যয়ের জন্য আলাদা টাকা দেওয়াও হয়। বৃদ্ধির হার তফঃ জাতির বেলায় ৩ গুণ ও তফঃ উপজাতির বেলায় প্রায় সাড়ে ৪ গুণ। তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতিভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে সিভিল সার্ভিস বা অন্যান্য চাকরি পেতে পারে তার জন্য জলপাইগুড়ি ও কলকাতায় প্রাক্ পরীক্ষা শিক্ষণ কেন্দ্র (পি ই টি সি) চালু আছে। তাতে ১৯০ জন শিক্ষার্থী শিক্ষাগ্রহণ করেছে। ২০ বছর আগে এ ব্যবস্থা ছিল না।

গরিব অর্ধশিক্ষিত তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি যুবক-যুবতীরা যাতে নানারকম জীবিকায় শিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে কোনও বিশেষ প্রকল্পে যোগদান করতে সক্ষম হয়, তার জন্য ৩২টি ট্রেনিং কাম প্রোডাকশন সেন্টারে (টি সি পি সি) বর্তমানে ৮৯১ জন শিক্ষার্থী নানা ধরনের ট্রেনিং পাচ্ছে। ট্রেনিং শেষে বিভাগীয় উদ্যোগে তাদের স্বনিযুক্তি প্রকল্পে সুযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি সব মিলিয়ে ৪০ ভাগের মত মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করছে। যদি উভয় সম্প্রদায়কে আলাদাভাবে হিসাব করা যায় তবে শতকরা ৭৫ ভাগের মতো মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে। আই আর ডি পি প্রভৃতি জাতীয় কর্মসূচিতে তফসিলি জাতিসহ সব মানুষের দারিদ্র্য দূরীকরণের চেষ্টা চলছে। আবার স্পেশাল কমপোনেন্ট প্ল্যান (এস সি পি) ও ট্রাইবাল সাব প্ল্যান (টি এস পি) উপ-পরিকল্পনার কাজও পাশাপাশি চলছে তফসিলি জাতির দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য। সাধারণ গ্রামীণ উন্নয়ন বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত আই আর ডি পি প্রকল্পের মধ্যেও সারা রাজ্যে শতকরা ৫০ জন খুবই উপকৃত ব্যক্তি তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতিভুক্ত হতেই হবে। তাছাড়া তফসিলি জাতি-উপজাতি কল্যাণ বিভাগের এস সি পি ও টি সি পি প্রকল্প-সমূহের মাধ্যমে প্রতি বৎসরে কমবেশি ৯০ হাজার তফসিলি জাতি ও ২৫ হাজার তফসিলি উপজাতি পরিবার এই সুযোগ পেয়ে আসছে ১৯৮১ সাল থেকে (১৯৮০-৮১) এস সি পি-তে এ যাবৎ ১৬,৯৭,৩২৩ জন ও টি এস পি-তে ৪,৭৩,১৪৩ জন দরিদ্র পরিবার উপকৃত হয়েছে।

সাবসিডি মার্জিন মানি ও ব্যাঙ্ক ঋণ মিলে মোট বিনিয়োগ হয়েছে তফসিলি জাতির

জন্য ৫৫৮ কোটি ৬৬ লক্ষ ৮৮ হাজার ও তপসিলি উপজাতির জন্য ১৫৪,৫৪,৭৪,০০০ টাকা। সবচেয়ে বড় কথা পশ্চিমবঙ্গে ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে ৮.৩২ লক্ষ তফসিলি জাতি ও ৪.৬৫ লক্ষ তফসিলি উপজাতি কৃষক সরকারি জমি পেয়েছেন ও এত জন ৪.৪৭ লক্ষ উপজাতি ও ১.৬২ লক্ষ তফঃ উপজাতিভুক্ত বর্গাদারের বর্গা রেকর্ড হয়েছে। এটা খুবই গর্বের বিষয় যে এ রাজ্যের জনসংখ্যার মধ্যে তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতিরা সংখ্যায় যদিও যথাক্রমে ২৩.৬ ও ৫.৬ শতাংশ তথাপি সরকারি জমির প্রাপকদের ক্ষেত্রে তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতির অংশ যথাক্রমে ৩৬.৬% ও ২০.৫%। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট এ রাজ্যে ক্ষমতায় আসে। অবশ্যই এসময় থেকে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক সার্বিক সুসংহত কর্মসূচি অনুসরণ করে বামফ্রন্ট সরকার নিজেদের লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে।

১৯৯৮-এর ২১ জুন ২২ বছরে পা দিল বামফ্রন্ট সরকার। ভারতবর্ষ বিশেষ করে সংসদীয় রাজনীতিতে এমন এক সমভাবাপন্ন জোট সরকারের ২২ বছর ক্ষমতায় থাকা বিস্ময়ের। আজ প্রয়োজন 'রেট্রোস্পেকশন' বা আত্মানুসন্ধান। অবশ্যই উল্লেখ প্রয়োজন গত কয়েক বছরে ভিন রাজ্যে মানুষের কৌতূহল বামফ্রন্ট সরকার নিয়ে। সংবাদ সংগ্রহে হিন্দি বলয় অথবা দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে বারবার যেতে হয়েছে এই প্রতিবেদককে। সারাভারতে ভাঙাগড়ার রাজনীতির খেলায় অবসন্ন মানুষজনের প্রশ্ন, কোন যাদুর কাঠিতে বামফ্রন্ট টিকে আছে? পশ্চিমবঙ্গে যা সম্ভব, কেন্দ্রে তা হল না কেন? বছরের পর বছর বামফ্রন্ট কীভাবে টিকে থাকে সব আশঙ্কা নস্যাৎ করে। একদলীয় শাসনের যুগ পার হয়েছে। বামফ্রন্টের ধাঁচে স্থায়ী সরকার গড়া সম্ভব নয় কেন কেন্দ্রে? বিশেষ করে এখন এই রাজ্যে দশ টাকায় পেটভরা খাবার মেলে অথবা সাম্প্রদায়িকতার গরলে বিভিন্ন রাজ্য আকণ্ঠ ডুবে গেলেও পশ্চিমবঙ্গে তা ছোঁয়াচে রোগের মত ছড়িয়ে পড়েনি কেন? এমনকি জাতপাতের গন্ধ থেকে 'বঙ্গাল' মুক্ত শুনে গালে হাত রেখে অবাক উত্তর-দক্ষিণের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ। সি পি এম, সি পি আই, আর এস পি, ফরওয়ার্ড ব্লকের জোট তারা বোঝে না। কেবল জানে লাল ঝাণ্ডার নেতৃত্বে অনেক দলের সরকার। যা মানুষকে শান্তিতে রেখেছে। সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ, জাতপাতের নোংরামি পশ্চিমবঙ্গকে স্পর্শ করেনি।

এ রাজ্যের মানুষের কালচার বরাবরই ভিন্ন জাতের। কিন্তু জাতপাতে সরকার মদত দেয় না অথবা দাঙ্গা বাধলে সবাই মিলে ঠেকায় এসব এই দুই বলয়ের মানুষের কাছে বিস্ময়ের। বামফ্রন্ট সরকার নিয়ে সমালোচনা নেই তা ঠিক নয়। লোকমুখে, খবরের কাগজে, নেতাদের বক্তৃতায় তারা এ সরকারের দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, ভোটে কারচুপি এবং ব্যর্থতার অনেক কথা শোনে। কিন্তু এক আধটা সাল নয়, ৭৭ থেকে বছরের পর বছর নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় আসার চাবিকাঠি অন্যরাজ্য রপ্ত করতে পারে না কেন, সে আত্মজিজ্ঞাসা তাদের নিজেদের। এমনকি বিহারে রাবড়ি দেবী মুখ্যমন্ত্রী হলেও মুখ্যমন্ত্রীর তখতে জায়া কমল বসুকে যে জ্যোতি বসু কখনওই বসাবেন না তা শুনে চোখ গোল গোল করে পাল্টা প্রশ্ন, 'তাজ্জব কি বাত হ্যায়।' অসম্ভব এই ব্যাপারটা বিশ্বাস করাতে এই প্রতিবেদকের হাড়কাঁপা শীতেও ঘাম বেরিয়েছিল দরদর করে। মুখ্যমন্ত্রী জায়াকে এভাবে বামফ্রন্ট কোনদিনও বসায়নি। শুনে তারা নিজেরাই কথা চালাচালি শুরু করল। তাদের কাছে বামফ্রন্ট সরকার এক বেনজির দৃষ্টান্ত।

কেন পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের স্পন্দমান অস্তিত্ব? সে প্রসঙ্গে পরে আসা যাক। ৭৭ সালে ক্ষমতায় আসার পর কলকাতায় এক ঐতিহাসিক জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলেছিলেন, 'সাধারণ হাটবাটের মানুষই আমাদের মানবিক শক্তির উৎস।' প্রকৃতপক্ষে

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের জন্ম হয়েছিল এক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে। ৬৭ সালের ইউনাইটেড ফ্রন্টের সাফল্য ও ব্যর্থতার অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখে দীর্ঘ এবং লাগাতার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রক্রিয়া চলছিল। এরপর এল ৭২ সালের সন্ত্রাসের যুগ। ৭২ সালের পর জরুরি অবস্থা। প্রতিবাদে মুখর সারা দেশ। ৭৭ সালের জুন মাসে রাজ্য বিধানসভার সাধারণ নির্বাচন হল। বামফ্রন্ট তখন ইস্পাতের মত মজবুত। সি পি এমের নেতৃত্বে বামফ্রন্ট নিরঙ্কুশ এবং বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সরকার গঠন করল। ফ্রন্টের পুরোভাগে প্রমোদ দাশগুপ্ত এবং জ্যোতি বসুর মত বলিষ্ঠ, বিচক্ষণ, অভিজ্ঞ, পোক্ত নেতা। ফ্রন্টের নেতা এবং বামফ্রন্ট সরকারের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী পদে বৃত হলেন জ্যোতি বসু। বামফ্রন্ট সরকারের সেই জয়যাত্রা শুরু। সারা ভারত আলোড়িত হয়েছিল এই অভিনবত্বে। জনগণের স্বার্থে এক নয়া কর্মসূচি গ্রহণ করে সেদিন বিস্ময় জুগিয়েছিল বামফ্রন্ট এবং বামফ্রন্ট সরকার।

এরপর কয়েক দশক কেটে গেছে। ভারতের রাজনীতিতে এসেছে নানান পরিবর্তন। কেন্দ্রে কংগ্রেসের একচ্ছত্র শাসনের অবসান হয়েছে। নানান এক্সপেরিমেন্ট হয়েছে দিল্লিতে। কখনও জনতা সরকার, কখনও কোয়ালিশন, আবার কখনও সংখ্যালঘু কংগ্রেস সরকার (পি ভি নরসিংহ রাওয়ের নেতৃত্বে) গঠিত হয়েছে। কিন্তু নানান সংকটের আবর্তে পড়লেও কেন্দ্রে স্থায়ী সরকার হয়েছিল রাওয়ের সরকার। বাকি সর্বক্ষেত্রে সব দলগুলির মধ্যে চলেছে অদ্ভুত টানাপোড়েন আর দল ভাঙাভাঙি। কংগ্রেস, জনতা এবং অন্যান্য কয়েকটি বড় আকারের দল ভেঙেছে। দলত্যাগ ঘটেছে রাজ্যে রাজ্যে। একদলীয় বা কোয়ালিশন সরকারের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়েছে। বার বার বদল হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী। আভ্যন্তরীণ কলহ ও বিবাদে জীর্ণ হয়েছে রাজ্য সরকারগুলি। এই প্রেক্ষপটে বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গে মাথা উঁচু করে রয়েছে। ইতিমধ্যে কেন্দ্রে যুক্তফ্রন্ট ও মোর্চা সরকার গঠিত হয়েছিল। তাও টিকিয়ে রাখা যায়নি। সর্বশেষ কেন্দ্রে ক্ষমতায় বিজেপি-র নেতৃত্বে জোট সরকার। কিন্তু সেখানেও শরিকদের হুমকি, সমর্থন সাময়িক স্থগিত ইত্যাদিতে গোড়া থেকেই অস্বস্তিতে কেন্দ্রের বাজপেয়ী সরকার। কিন্তু দলাদলি, সংকীর্ণতা, শরিকি সংঘর্ষ সত্ত্বেও বামফ্রন্ট সরকাব ব্যতিক্রমী।

গত ২১ বছরে গোটা বিশ্ব তোলপাড় হয়েছে নানান ঘাত-প্রতিঘাতে। বিপর্যয় ঘটেছে সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পূর্ব ইউরোপের সমাজতন্ত্রের। এর ধাক্কা পড়েছে সব দেশে। বিশেষ করে কমিউনিস্ট পার্টির ওপর। কিন্তু তা সত্ত্বেও পার্টি টুকরো হয়নি। ভাঙেনি বামফ্রন্ট। বরং সবকটি সাধারণ নির্বাচন, লোকসভার সাম্প্রতিক নির্বাচন এবং সবেমাত্র হওয়া ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে বামফ্রন্ট তার আধিপত্য বিপুলভাবে বজায় রেখেছে। শত প্ররোচনা, অপপ্রচার, নিজেদের আত্মকলহ এবং কোথাও সার্বিক ঐক্য, কোথাও অনৈক্যের মধ্যেও বামফ্রন্ট বিজয়ী হয়েছে। এই সাফল্যের কারণ কী—গভীরভাবে তা উপলব্ধির প্রয়োজন রয়েছে।

বামফ্রন্টের সবচেয়ে বড় চাবিকাঠি, সি পি এমের একক গরিষ্ঠতা, মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর মত বিরল ব্যক্তিত্বের অসাধারণ বাস্তববুদ্ধি, রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা এবং তুখোড় প্রশাসনিক দক্ষতা ও সর্বোপরি একটি কর্মসূচি সামনে রেখে সব শরিকদলের একসঙ্গে চলার অঙ্গীকার। বড় শরিক হিসাবে সি পি এমের কর্তৃত্ব কেবল মুখে নয়, অঙ্কের হিসাবেও। তেমনি বাকি শরিকদের সহিষ্ণুতা, সহযোগিতা এবং ফ্রন্টকে টিকিয়ে রাখার মানসিকতাই বামফ্রন্ট সরকারের চাবিকাঠি। এরপরই উল্লেখ করা প্রয়োজন, পশ্চিমবঙ্গই একমাত্র রাজ্য যেখানে ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, আঞ্চলিকতা এবং

জাতপাতের কোন জায়গা নেই। এ ধরনের সংকীর্ণতাবাদী এবং ভেদপন্থী বিবাদ পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের সবচেয়ে কম। ১৯৭৭ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার কলঙ্কজনক ঘটনা ঘটলেও, কিন্তু দলমত নির্বিশেষে মানুষ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখেছে। সবচেয়ে গৌরবের, হিন্দুবলয়গুলি যখন জাতপাতের চুলচেরা বিচার ও হানাহানিতে লিপ্ত, পশ্চিমবঙ্গ তখন প্রায় মুক্ত এই কলঙ্ক থেকে। তবে এই সময়ে পশ্চিমবঙ্গে গভীর ক্ষত তৈরি করেছিল দার্জিলিংয়ে গোর্খাদের স্বাতন্ত্র্যের দাবি। এটা অনস্বীকার্য, সুবাস ঘিসিং সন্ত্রাসের পথ নিয়ে চাপ সৃষ্টির রাজনীতি চালাচ্ছিল বুটা সিং-দের মদতে। কিন্তু সে সময়ে রক্ত দিয়ে দার্জিলিং-রক্ষার শ্লোগান অথবা সংঘাতের পথে গিয়ে বামফ্রন্ট ভুল পদক্ষেপ নিয়েছিল।

বিরোধী কংগ্রেস বা বিজেপি-তৃণমূল কংগ্রেস বামফ্রন্ট সরকারের সমালোচনায় সরব। অবশ্যই নানা কারণ রয়েছে। কিন্তু এটা অস্বীকার করা যায় না, হাজারো ব্যর্থতা ও ত্রুটি থাকলেও গ্রামাঞ্চলে শ্রমজীবী মানুষের জীবন থেকে দারিদ্র্য, দুর্গতি ও সামাজিক অবিচার দূর করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়েছে এবং চালাচ্ছে। এ রাজ্যে অপারেশন বর্গা বড় অংশের ভাগচাষীর জীবনে রূপান্তর ঘটিয়েছে। বামফ্রন্টের আমলে পাল্টেছে ক্ষেতমজুরের জীবনযাত্রা। পরিপূর্ণ মানুষের সব সুযোগ-সুবিধা তারা পায়নি। কিন্তু মৌলিক অন্ন-বস্ত্র ও বাসস্থানের অভাব মিটেছে দরিদ্রতম শ্রেণীর। দরিদ্র মানুষের আত্মমর্যাদা ও সমান অধিকারবোধ এসেছে। এই রূপান্তর বামফ্রন্ট সরকারেরই। বামফ্রন্টের সাফল্যের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, পক্ষপাতমূলক আচরণ, টাকা অন্য খাতে খরচের বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। সব অভিযোগ অসত্য, তাও নয়। কিন্তু পঞ্চায়েত প্রকৃত অর্থে রূপান্তর ঘটিয়েছে। একেবারে তৃণমূলস্তরে ক্ষমতা ভোগ, মেয়েদের আসন সংরক্ষণ ও উন্নতির দায়দায়িত্ব হাতে আসায় গ্রাম-বাংলার মানুষ অধিকার অর্জন করেছে। শিখেছে ঘুরে দাঁড়াতে।

সব কিছু সত্ত্বেও বামফ্রন্টের বেশ কয়েকটি নেতিবাচক দিক রয়েছে। ২২ বছরে ধীরে ধীরে নষ্ট হয়েছে ওয়ার্ক কালচার, শিল্পক্ষেত্রে সাফল্য আসেনি। বক্তৃতার তুফান যে গতিতে ছুটেছে, কাজ সে হারে হয়নি। অনেকাংশে ব্যর্থ উচ্চশিক্ষা ও স্বাস্থ্যদপ্তরও। গত কয়েকবছর দম্ভ, অহঙ্কার, সাধারণ মানুষের কাছ থেকে কোন কোন মন্ত্রী ও নেতার দূরত্ব বাড়া এবং বিরোধীদের এবং সংবাদপত্রের মতামতকে আঁস্তাকুড়ে ফেলার এক অদ্ভুত প্রবণতা বামফ্রন্ট সরকারের কাঁধ জাঁকিয়ে বসেছে। সাধারণ মানুষের প্রয়োজনের বদলে ফ্রন্ট সরকারের প্রধান স্তম্ভ সি পি এমের উল্লেখযোগ্য অংশ দলের স্বার্থ, দলীয় কর্মীদের প্রয়োজন এবং নিজের ও নিজের পরিবারকে গোছাতেই ব্যস্ত। হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি মানুষ মারার জাঁতাকল হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রাধান্য তাদের, যারা সি পি এমের সঙ্গে লেপটে। প্রাথমিক শিক্ষা অবহেলিত। শিল্পায়নের যে জোয়ার আসার জন্য ড্রাম বাজানো হল তার বিকাশ নেই। একটার পর একটা কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বন্ধ থাকা কল-কারখানা খোলার প্রয়াস স্তিমিত। ২২ বছরে অনেক সাফল্যের মাঝে হারিয়ে গেছে পশ্চিমবঙ্গে বাম ছাত্র, যুব, মহিলা এবং শ্রমিক আন্দোলন। কেরিয়ার গোছাতে এবং সরকারি অনুগ্রহ জোগাড়ে ব্যস্ত ছাত্র, যুব ও মহিলাদের বড় অংশ। শ্রমিকরা দেখছেন, আন্দোলনের বদলে আপসের এক রাজনীতি। ধার কমে গেছে বামফ্রন্টের।

বিশেষ করে একসময়ে এই রাজ্য ছিল শিল্পে অগ্রণী। শিল্পের সেই উজ্জ্বল দিনগুলো ফেরাতে রাজ্য সরকার একটি নীতি গ্রহণ করেছে। বিবিধ প্রচেষ্টায় এবং পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন পর্ষদের উদ্যোগে বহু নাম করা বহুজাতিকের আবাস হয়ে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গ। কিন্তু

এই প্রচেষ্টা সত্ত্বেও শিল্পক্ষেত্রে তেমন সাফল্য আসেনি। বরং একের পর এক কলকারখানার বন্ধ হয়েছে। দরজা খোলেনি। নতুন করে বন্ধ হয়েছে ডানলপসহ কয়েকটি জুট মিল। রুটি চলে গেছে হাজার হাজার পরিবারের। এই প্রেক্ষাপটে যে আন্দোলন শ্রমজীবী মানুষের কাছে প্রত্যাশিত ছিল তা গড়ে ওঠেনি পশ্চিমবঙ্গে। বামফ্রন্ট এ ব্যাপারে লাগা 'ব আন্দোলনের কর্মসূচি নিতে পারেনি।

পঞ্চায়েতের ত্রিস্তরে আবারও বামফ্রন্ট জয়ী হয়েছে। এখন বামফ্রন্ট সরকারের দায়িত্ব আরও বেশি। পঞ্চায়েতের কাজ সহ গঠনমূলক অন্যান্য কাজের দায়িত্ব যেমন রয়েছে, তেমনি প্রয়োজন শান্তি বজায় রাখার। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু রাজনীতি নয়, মানুষের কাজে সব দলকে এগিয়ে আসার ডাক দিয়েছেন। বর্ষীয়ান অভিজ্ঞ জাতীয় নেতা মুখ্যমন্ত্রী বসু জাতীয় রাজনীতির সঙ্কটজনক পরিস্থিতি সম্পর্কে উদ্বিগ্ন। কিন্তু বাম গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ জোটের প্রয়োজনীয়তা কত জরুরি তা তিনি বারবার বলেছেন। পাশাপাশি পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর ফ্রন্টের শরিকি হানাহানির রাজনৈতিক সমস্যা যে গুরুত্বপূর্ণ তা তিনি বলেছেন। বলেছেন ফ্রন্ট বাঁচানোর দায়িত্ব সব শরিকের সমান। এই পটভূমিতে সবচেয়ে আগে দরকার নির্মোহ আত্মানুসন্ধানের। জবাব খুঁজে বার করতে হবে কেন নতুন প্রজন্ম আর বামফ্রন্টে ঝুঁকছে না। কেন ভোটারদের উল্লেখযোগ্য অংশ দূরে। ২২ বছরে আজও সি পি এমকে ঘিরে কঠিন লোহার কাঠামো। সি পি এমের সদর দপ্তরে এক অদ্ভুত কাঠিন্য। খোলা হওয়া সেখানে প্রবেশ করে না। বাস্তবতার নিরিখে বিচারের প্রয়োজন, পরিবর্তনের এই জোয়ারে আরও খোলামেলা হওয়া আবশ্যক কি না। ২২ বছরে বামফ্রন্ট সরকার একটানা চলছে। সাফল্যের নানা কারণের মধ্যে অন্যতম অবশ্যই মুখ্যমন্ত্রী বসুর প্রশ্নাতীত নেতৃত্ব। বামফ্রন্ট ও কেন্দ্রের যুক্তফ্রন্টের বেশিরভাগ দল ও মানুষ তাঁকে দিল্লির মসনদে চেয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী রূপে। তাঁকে অথবা কেন্দ্রীয় সরকারে যোগ দেওয়া নিয়ে পার্টির নীতি নির্ধারণ করেছিল সি পি এম কেন্দ্রীয় কমিটি। পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃত্ব এবং বসু সে অধ্যায়কে 'ক্লোজড চ্যাপ্টার' বলেছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে সে বিতর্ক দ্বন্দ্ব প্রশ্নের আকারে আজও রয়েছে। হয়ত বসু প্রধানমন্ত্রী হলে দেশের চালচিত্র বদলে যেত। বিশেষ করে সারা ভারতে নিঃসন্দেহে প্রভাব ফেলত বামফ্রন্ট। ২২ বছরে তা হত এক নতুন সংযোজন।

সু দে ষ্ণা চ ক্র ব র্তী

পশ্চিমবঙ্গ : সমাজ ও অর্থনীতি

এটা সুবর্ণজয়ন্তীর বছর। স্বাধীনতার, দেশভাগের, তেভাগা আন্দোলনের সুবর্ণজয়ন্তী। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের কথাও এসে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গও স্বাধীনতা আর দেশ ভাগের শরিক। পশ্চিমবঙ্গ নামেই তার পরিচয়। বিভক্ত পাঞ্জাবের ভারতীয় অংশকে কেন পূর্ব পাঞ্জাব বলা হয় না, কে জানে। তাই অর্ধশতাব্দীর শেষে পশ্চিমবঙ্গের দিকেও এক নজর তাকানো অন্যায় হবে না।

নানাদিক দিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে একটি ব্যতিক্রমী রাজ্য বলে বর্ণনা করা যায়। পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি বিশেষত্ব অন্য কোনো কোনো রাজ্যে পাওয়া গেলেও সবগুলি নয়। পাঞ্জাবের মত বাংলা বিভক্ত হয়েছিল। কিন্তু বিভাজনের ফল ও প্রভাব দুই রাজ্যে এক রকম হয়নি। '৬৭ পর্যন্ত কংগ্রেস শাসন একচ্ছত্র ছিল। তবে পরবর্তীকালে কেন্দ্রে এবং অধিকাংশ রাজ্যে বার বার ক্ষমতার হাত বদল হয়েছে। কেবল পশ্চিমবঙ্গেই বোধহয় দুই দশক ধরে টানা একই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আছে। ভারতীয় উপমহাদেশের প্রায় প্রতি প্রান্ত যখন জাতি, বর্ণ, জাতপাত বা ধর্মীয় সম্প্রদায় নিয়ে উদ্বেলিত, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন এলাকা রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধে উত্তাল, তখন পূর্ব ভারতের এই অঙ্গনটুকু অপেক্ষাকৃত শান্ত রয়েছে। অবশ্য এ কথা গাঙ্গেয় বঙ্গের বিষয়েই প্রযোজ্য। উত্তরবঙ্গের পর্বতাঞ্চলে চলছে গোর্খাল্যান্ডের পতাকা ওড়াবার চেষ্টা। কিন্তু সে আন্দোলনও এখন অনেকটা স্তিমিত। কিছু মিটিং মিছিল ও বন্ধের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এমনকি আশির দশকের মাঝামাঝি যখন সুবাস ঘিসিং পরিচালিত সংগ্রাম তুঙ্গে উঠেছিল, তখনো তা কাশ্মীর, পাঞ্জাব বা উত্তরপূর্ব ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদী লড়াইয়ের সঙ্গে তুলনীয় ছিল না। দাবিও ছিল নিতান্ত মামুলি। ভারত থেকে বেরিয়ে এসে নতুন রাষ্ট্র কায়েম নয়, কেবল রাইটার্সের আওতার বাইরে গিয়ে স্বতন্ত্র রাজ্য গঠন। সংক্ষেপে বলতে গেলে, খণ্ড জাতীয়তাবাদ বা জাতপাত, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি অনুপস্থিত না হলেও, অন্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে তেমন আমল পায়নি।

তাহলে পশ্চিমবঙ্গ নিজের স্বরূপ, ইংরিজিতে যাকে আইডেনটিটি বলে, তা কোথায় খুঁজে পায়। সমাজতাত্ত্বিকদের মতে, প্রত্যেক মানুষের একাধিক সত্তা বা পরিচয় আছে। সে কোনো রাষ্ট্রের নাগরিক, কোনো বিশেষ অঞ্চলের বাসিন্দা, কোনো বিশেষ ভাষাভাষী, কোনো চাকরি বা পেশার মাধ্যমে জীবিকা অর্জনে ব্যস্ত। শ্রেণীগত দিক থেকে সে চাষী, মজুর, বড় বা ছোট ব্যবসায়ী। অর্থের মানদণ্ডে ধনী, দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত। আবার ব্যক্তিগত

ও পারিবারিক জীবনের ক্ষেত্রে সে অমুকের স্বামী বা প্রেমিক, অমুকের ছেলে, বা পিসেমশাই। কোন সত্তাটিকে বা সত্তার কোন দিকটিকে সে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব বা মর্যাদা দেয়, সেটাই বড় কথা। রাজনীতি বা রাজনৈতিক দল সৃষ্টি হয় এমনি বিভাজন রেখার উপর। যেমন, পশ্চিম ইউরোপের প্রধান দলগুলির ভিত্তি শ্রেণী ও মতাদর্শ। অর্থাৎ শ্রমিকভিত্তিক বাম দল ও উচ্চবিত্তভিত্তিক দক্ষিণপন্থী, — এই দুইয়ের মধ্যে রাজনৈতিক শিবির বিভক্ত। এই বিভেদ বা বিশ্বাসের মাটিতে দাঁড়িয়েই মানুষ ভোট দেয় ; রাজনৈতিক দল ট্রেড ইউনিয়ন বা চেম্বার অফ কমার্সের মত সংগঠন গড়ে তোলে। তুলনায় জাতি বা ধর্মভিত্তিক পরিচয় ততটা গুরুত্ব পায় না, এক হয়ত' আয়ারল্যান্ড বাদে। ইদানীং অবশ্য মতাদর্শগত পার্থক্য ঐ মহাদেশে ক্ষীণ হয়ে আসছে, খণ্ড জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি বাড়ছে। সে প্রশ্ন ভিন্ন।

পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি যখন রাজনৈতিক সত্তা বা পরিচয় নিয়ে ভাবে, তখন সে নিজেকে মনে করে দক্ষিণ বা বাম শিবিরের অন্তর্গত। আরো সাদামাঠা ভাবে বলতে গেলে, কংগ্রেস বা সি. পি. এম-এর সমর্থক। গত কয়েক বছর ধরে ভারতীয় জনতা পার্টি কিছুটা শক্তি সংগ্রহ করেছে। কিন্তু তারা সমগ্র ভোটের পাঁচ ছ'শতাংশের বেশি পায়নি। এ কথাও লক্ষ্যণীয়, যে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে দাঁড়িয়ে এই দল উগ্র হিন্দুবাদের সুরটা কিছুটা নরম করেছে। রামমন্দির বা সংখ্যালঘু বিদ্বেষ নিয়ে ততখানি মুখর হয়নি। বরং বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ, ফরাক্কার জল, বামফ্রন্টের দুর্নীতি ইত্যাদি আপাতদৃষ্টিতে ধর্মনিরপেক্ষ 'ইস্যু' তুলেছে। কাজের পশ্চিমবঙ্গে দক্ষিণপন্থার প্রতিনিধি বলতে কংগ্রেসকে ও বামপন্থার প্রতিভূ বলতে সি. পি. এম.-কেই বোঝায়। সি. পি. আই. কম্যুনিস্ট পার্টির ভাঙনের পর কখনোই পশ্চিমবঙ্গে প্রধান বাম দলের আসনটি পায়নি। নকশালপন্থীরা একসময় যথেষ্ট শক্তিশালী হলেও এখন অনেকটা খণ্ডিত ও প্রান্তিক। অবশ্য সাহিত্য, সংস্কৃতি, সাধারণ চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে এখনো তাদের কিছুটা প্রভাব আছে। সব মিলিয়ে খণ্ড জাতীয়তাবাদ, ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ, সম্প্রদায় বা জাতপাতের বদলে রাজনৈতিক মতাদর্শ ও শ্রেণীগত অবস্থান অনুসারে জোট বাঁধা পশ্চিমবঙ্গের মানুষদের পছন্দ। আজকের পরিপ্রেক্ষিতে এ ব্যাপারটা একটু বিস্ময়জনক ও ব্যতিক্রমমূলক বৈ কি। বর্তমানে অধিকাংশ দেশ খোলাখুলিভাবে আঞ্চলিক বা জাতি (caste) দলের হাতে। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত একই ছক চোখে পড়ে। এক দিকে পাঞ্জাবের পরাজিত খালিস্তানী, কাশ্মীরের আধা পরাজিত মুজাহিদ, উত্তর পূর্বাঞ্চলে নানা রঙের উগ্রপন্থী — অন্য দিকে তেলুগু দেশম, অসম গণ পরিষদ, আকালি দল, শিবসেনা প্রমুখ সংগঠন, যারা বিচ্ছিন্নতাবাদী না হলেও জন সমর্থন খোঁজে আঞ্চলিক স্বার্থ ও আবেগের মধ্যে। যে ভারতীয় জনতা দল সর্বদা দেশের সার্বভৌমত্ব ও ঐক্যের কথা বলে, তারাও এই আঞ্চলিক দলগুলির সাহায্য ছাড়া কোথাও ক্ষমতায় আসতে পারেনি। সি. পি. এম-ও কার্যত প্রাদেশিক দলে পরিণত হয়েছে। তিনটি প্রদেশের বাইরে তার উপস্থিতি নেই বললেই চলে। তবে মতাদর্শের দিক থেকে অবশ্যই আঞ্চলিক নয়। কাঁসিরাম, মায়াবতী বা বিভিন্ন যাদব কুলপতির মত পশ্চিমবঙ্গের কোনো নেতা অন্তত প্রকাশ্যে জাতপাতের অঙ্ক ধরে আনুগত্য দাবি করেন না।

পশ্চিমবঙ্গ তার অপেক্ষাকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার গুণেও সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে ব্যতিক্রম রূপে চিত্রিত হতে পারে। বিগত দু'এক দশকে উত্তর ভারতে বা মহারাষ্ট্রে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রূপ সুপরিচিত। সে তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের স্বাধীনতা ও দেশভাগের পর বড় রকমের সাম্প্রদায়িক সংঘাত ঘটেনি। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সম্বল করে কোনো বড় দল

সমর্থন সংগ্রহের চেষ্টা করেনি। এমন কি ভারতীয় জনতা দলও, আমরা দেখেছি, এখানে সুর নরম করতে বাধ্য হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু বাঙালী যে যথেষ্ট পরিমাণে উগ্র ও ধর্মান্ধ নয়, এ নিয়ে কেউ কেউ আক্ষেপ করেছেন। যেমন, উনবিংশ শতাব্দীর এক মান্য ব্যক্তি কালীকে 'বীভৎস সাঁওতাল মাগি' বলেছেন, এ কথা জেনে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ হিন্দুর রক্ত গরম হয় না। মকবুল ফিদা হুসেন সরস্বতীর নগ্ন চিত্র এঁকেছেন শুনে তাদের দাঙ্গা করার উন্মাদনা জাগে না। অনেক দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের মানসিকতা ব্যতিক্রম বৈ কি!

অথচ পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ জন্ম নেবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। ব্রিটিশ আমলে অবিভক্ত বাংলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কলঙ্কময় ঐতিহ্য ছিল। দেশভাগ, পূর্ববঙ্গে দাঙ্গা, লাখ লাখ হিন্দু উদ্বাস্তুর সীমান্ত পার হয়ে আসা — এ সবই সংখ্যালঘু বিদ্বেষের আগুনে ইন্ধন জোগাতে পারত। ভারতীয় জনতা দল মনে করাতে ছাড়ে না, জনসংঘের অন্যতম নেতা ছিলেন একজন সুপরিচিত বাঙালি। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। কিন্তু যা হতে পারত তা হয়নি। এমন কি উদ্বাস্তুরাও সাম্প্রদায়িক দলের বদলে বামপন্থীদের বেছে নিয়েছিল। কেন এমন হয়েছিল, কেন গত পঞ্চাশ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গ সাম্প্রদায়িকতার বিষ থেকে অপেক্ষাকৃত মুক্ত ছিল, তা নিয়ে প্রচুর বিতর্ক আছে। এ কি বাংলা রেনেসাঁসের প্রভাব, না বামপন্থী আন্দোলন ও চিন্তার ফসল। অপেক্ষাকৃত আলোকপ্রাপ্ত ঐতিহ্যের জন্যই কি বাম রাজনীতি এখানে সফল হয়েছে। না কি বাম রাজনীতির শক্তি এই ইতিবাচক ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছে। তৈলাধার পাত্র না পাত্রাধার তৈল। বাংলা রেনেসাঁস অথবা বামপন্থীদের সঙ্গে তার সম্পর্ক আবার সরল, একমুখী কিছু নয়।

পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থার স্বরূপ বা গতিপ্রকৃতি হয়ত' আর এক ব্যতিক্রম। কেন এই প্রদেশ 'লাল দুর্গে' পরিণত হল? অন্যান্য রাজ্যেও বামপন্থা কম বেশি আছে ; কেরল, ত্রিপুরা, অন্ধ্র, বিহার, কিছু পরিমাণে পাঞ্জাব। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মত একচ্ছত্র প্রভাব, গ্রামচিয়ান অর্থে 'হেগোমনি', সম্ভবত বাম শক্তিরা অন্যত্র বিস্তার করতে পারেনি। বিহার বা কেরলে বাম রাজনীতির প্রতিদ্বন্দ্বী বা সমান্তরাল শক্তি, জাতপাত। কেরলের ক্ষেত্রে কিছু পরিমাণে সাম্প্রদায়িকতাও বটে। তেলেঙ্গানা, শ্রীকাকুলামের রাজ্য এক ম্যাটিনি আইডলকে পূজনীয় নেতার স্থানে বসিয়েছিল। এক পশ্চিমবঙ্গ সতী স্ত্রীর মত বিগত দুই দশক ধরে বামপন্থাকে অনুসরণ করেছে। এই ব্যতিক্রমের কারণ নিয়েও কম বিতর্ক বা আলোচনা হয়নি। এ রাজ্যে বিপরীত শক্তির দুর্বলতা কারণ হিসেবে তুলে ধরা হয়। কিন্তু অন্য অনেক রাজ্যের বিরোধী পক্ষের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস তাও শত অভ্যন্তরীণ বিরোধ সত্ত্বেও শক্তিশালী। তবু অন্য রাজ্যে পালাবদল বার বার ঘটেছে ও ঘটছে।

বাংলা রেনেসাঁস, অগ্নিযুগের ঐতিহ্য ছাড়াও (বেশ কিছু স্বাধীনতার যুগের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী পরে কম্যুনিস্ট দলে যোগ দিয়েছিলেন। বামপন্থীরা, পরবর্তীকালে বিশেষ করে নকশালবাদীরা, স্বাধীনতা আন্দোলনের সর্বাপেক্ষা র‍্যাডিকাল ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার দাবি করে) কিছু কাঠামোগত বা Structural কারণ নিশ্চয় পশ্চিমবঙ্গের র‍্যাডিকাল রাজনীতিকে নিশ্চিত ও সমৃদ্ধ করেছে। সে বিষয়েও গবেষণা ও অনুসন্ধান কম হয়নি। রস মালিক, ফ্রানসিস ফ্রাংকেল প্রমুখ বিদেশী গবেষকরা এক বড় কারণ খুঁজে পেয়েছেন রাজ্যের অর্থনীতির ছকে। সাধারণভাবে ভারতের ও তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করে বিদেশী অথবা অবাঙালি ভারতীয় ধনপতিরা। বড়লোক বাঙালি বলতে বোঝায়

মাঝারি ব্যবসায়ী, বা উচ্চস্তরের পেশাজীবী। ডাক্তার, উকিল, ইঞ্জিনিয়ার, অ্যাকাউন্টান্ট প্রমুখ। বিদেশী শিল্প বা পুঁজি মালিকদের কথা ছেড়ে দিলেও ভারতীয় ধনকুবেরদের 'ফার্স্ট লিগ' থেকে তারা বহু যোজন দূরে। তাই সাধারণভাবে পুঁজিবাদ সম্পর্কে এক ধরনের অনীহা বা বিদ্বেষ, বিশেষভাবে 'মাড়োয়ারিরা বাংলাকে শোষণ করছে' জাতীয় মনোভাব বাঙালিদের মধ্যে বেশ ছড়িয়ে পড়েছিল। বামপন্থার সঙ্গে মিশেছিল আঞ্চলিক বা জাতিগত ক্ষোভ। অথবা অন্যভাবে বলতে গেলে, বামপন্থা হয়ে উঠেছিল পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক প্রতিবাদ ও পরিচয়ের রূপ। অবিভক্ত সি. পি. আই. ও পরে সি. পি. এম 'পশ্চিমবঙ্গকে কেন্দ্রের উপনিবেশ হতে দেব না' জাতীয় শ্লোগানের মাধ্যমে এই মনোভাব আরো বাড়িয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কিন্তু এই ব্যাখ্যা যথেষ্ট নয়। মোটামুটি একই অবস্থার অন্য রকম প্রতিক্রিয়া হতে পারে, হয়েছে। মহারাষ্ট্রের কথাই ধরা যাক না কেন। এই রাজ্যটি অত্যন্ত শিল্পোন্নত। বোম্বাই বা মুম্বাই ভারতের অর্থনৈতিক রাজধানী। কিন্তু সেখানেও শিল্প বাণিজ্যের সিংহভাগ মারাঠিদের হাতে নয়। তা নিয়ে ক্ষোভ ছিল এবং সেই ক্ষোভ বাম ধারায় প্রবাহিত হতে পারত। বস্তুত ষাটের দশকের মাঝামাঝি, অর্থাৎ ভাঙনের আগে পর্যন্ত, কম্যুনিস্টরা মহারাষ্ট্রে যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। কিন্তু ক্রমে তাদের কোণঠাসা করে ক্ষমতার পথে এগিয়ে এল শিবসেনারা। মার্কস লেনিন নয়, শিবাজির স্ব-ঘোষিত উত্তরাধিকারীরা। প্রাদেশিকতা বা খণ্ড জাতীয়তাবাদের চরম প্রতিক্রিয়াশীল রূপ। আরো মজার কথা, যে অ-মারাঠি অথচ মহারাষ্ট্রভিত্তিক শিল্পপতিদের বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়ে শিবসেনা জনপ্রিয় হয়েছিল, তাদেরই ভাড়াটে গুণ্ডা হিসেবে ট্রেড ইউনিয়ন ভেঙে শ্রমিক ঠেঙিয়ে সংগঠনটি বর্তমানে ক্ষমতার শীর্ষে উঠেছে। অর্থাৎ অন্যান্য রাজ্যের দেখাদেখি পশ্চিমবঙ্গে যা গড়ে ওঠার প্রবল সম্ভাবনা ছিল — উগ্র সাম্প্রদায়িক রাজনীতি বা খণ্ড জাতীয়তাবাদ — তার কোনোটাই তেমনভাবে আসেনি।

পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থার অতএব নানা ধরনের ভিত্তি বা স্তম্ভ আছে। রাজ্য যে বঞ্চনার শিকার সত্যিই হয়েছে তা নিয়ে ক্ষোভ। যে উচ্চতম ঐশ্বর্য, সম্পদ, ও সম্পদজনিত ক্ষমতা এমনকি বেশিরভাগ ধনী বাঙালিদেরও হাতের বাইরে, সে সম্বন্ধে ঈর্ষামিশ্রিত বিরূপতা। একটু নাক উঁচু, বুদ্ধিজীবীসুলভ মনোভাব। বাঙালিরা সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামায়। 'খোট্টা' বা 'মেড়ো'দের মত দিন রাত টাকার পিছনে ছোটে না। আমাদের উপাস্য রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, সুভাষচন্দ্র, সত্যজিত। কোনো সফল শেয়ার মার্কেট মার্কা ফাটকাবাজ নয়। ইদানীং অবশ্য কিছু উচ্চবিত্ত বাঙালি, বা মধ্যবিত্তের একাংশ নয়া অর্থনীতির রথে চড়ে কোটিপতি হবার স্বপ্ন দেখছে। কবিতার চেয়ে স্টক মার্কেটের ব্যাপারে এখন বাঙালি তরুণ-তরুণীদের আগ্রহ বেশি, এমন কথাও শোনা যাচ্ছে।

সব মিলিয়ে কোনো স্পষ্ট উত্তর দেওয়া যাবে বলে মনে হয় না। পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে বাম পথে ঠেলে দেওয়ার অনেক কারণ ছিল। দেশভাগ, উদ্বাস্তুর স্রোত, এক বড় অংশের দারিদ্র, বেকারি, কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে ক্ষোভ, অবাঙালিদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রাধান্যের ব্যাপারে অসন্তোষ, অসাম্য, দুর্নীতি, আরো অনেক কিছু। তবে এই সব কাঠামোগত কারণ অন্য রাজ্যকে ভিন্ন পথে নিয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গকেও নিয়ে যেতে পারত। সেখানে কি ভাবগত কারণ কাজ করেছে? বাংলা রেনেসাঁস — তার প্রকৃত স্বরূপ যাই হোক না কেন — মুক্তিযুদ্ধ ও অগ্নিযুগের ধারা, বাঙালির মধ্যে নেই নেই করেও কিছুটা সাধারণ বুদ্ধি .... কে বলতে পারে? বস্তুগত (objective) অবস্থানও পারিপার্শ্বিক

মানুষকে গঠন করে। আবার মানুষের চিন্তা-ভাবনা ও অবস্থানকে, পারিপার্শ্বিককে বদলায়। সেই অর্থে চিন্তাও শক্তি। এ যেন সেই ডিম ও পাখির ছানার, বীজ ও গাছের পুরানো বিতর্ক।

যাইহোক, বস্তুগত অবস্থানের দিকেই দৃষ্টি দেওয়া যাক। গত পঞ্চাশ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গ সামাজিক অর্থনৈতিক দিক থেকে কোন পথে চলেছে। কি পেয়েছে আর কি পায়নি। শিল্পের ক্ষেত্রে যে এই রাজ্য অন্তত আপেক্ষিকভাবে নীচের দিকে নেমেছে, প্রতিযোগিতায় অন্য রাজ্যদের তুলনায় পিছু হটেছে, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। অথবা অন্যরা যতটা এগিয়েছে, সে তুলনায় অগ্রসর ততটা হয়নি। কেন এমনটা হয়েছে, এটাই যাকে বলে 'মিলিয়ন ডলার' প্রশ্ন। সাধারণভাবে দুই ধরনের উত্তর দেওয়া হয়। এক দলের মত, এখানে বাম আন্দোলন, শ্রমিক অসন্তোষ ও সংগঠন, কর্ম সংস্কৃতির অভাব, একদা সশস্ত্র বিপ্লব প্রচেষ্টা, এ সবই শিল্পায়নের ক্ষেত্রে এ রাজ্যের তমসাবৃত অবস্থার জন্য দায়ী। মুনাফা যেখানে নিরাপদ নয়, কোন দেশী বিদেশী কোম্পানি সেখানে বিনিয়োগ করতে আসবে কেন? বরং রাজ্যের বেশ কিছু পুরানো কলকারখানা বন্ধ হয়েছে বা অন্যত্র সরে গেছে। কোন কোন তাত্ত্বিক আবার এক সঙ্গে জুড়েছেন ধর্মবিশ্বাসের অভাব। যে হিন্দু বাঙালি নগ্ন সরস্বতীয় নামে দাঙ্গা করে না বা রামমন্দিরের দাবিতে আগুন লাগায় না, সে আবার আধুনিক শিল্প গড়বে কি ভাবে?

র‍্যাডিকাল আন্দোলন, এবং ১৯৬৭-৭২ এর মধ্যে সশস্ত্র বিপ্লব প্রচেষ্টা, পুঁজিবাদীদের আকর্ষণ করার সেরা উপায় নয়, একথা স্বীকার্য। যদি দেশী বিদেশী পুঁজির দাক্ষিণ্য অর্থনৈতিক অগ্রগতির একমাত্র শর্ত ধরা হয়, তবে কোনো আন্দোলন না করাই শ্রেয়। তবে ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে সত্তরের দশকের শুরু — এই ছ-সাত বছর বাদ দিলে পশ্চিমবঙ্গের শান্তি এমন কিছু বিপন্ন হয়নি। আন্দোলন যা ছিল, তা অন্য রাজ্যেও দেখা গেছে। এমন কি দেশের অর্থনৈতিক রাজধানী, বোম্বাই চিরকাল শিবসেনা ও ভারতীয় জনতা পার্টি শাসিত পুঁজির স্বর্গ ছিল না। প্রথমে অবিভক্ত কম্যুনিস্ট দল, তারপর সি. পি. আই., তারপর দত্ত সামন্তের নেতৃত্বে সেখানে শ্রমিক আন্দোলন ও সংগঠন যথেষ্ট জোরদার ছিল। আশির দশকের গোড়ায় মহারাষ্ট্রে এক বছর ধরে যে সুতাকল শ্রমিকদের আন্দোলন চলেছিল, সে রকম বড় হারের সংগ্রাম এ রাজ্যে ৭২-এর পর হয়েছে বলে মনে হয় না। কাজেই র‍্যাডিকাল রাজনীতির ভয়ে পুঁজিপতিরা পশ্চিমবঙ্গে আসতে চাইছে না বা এখান থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে পালাচ্ছে, এমন মনে করার কারণ নেই। তেমনি এ রাজ্যের কর্মসংস্কৃতি অতি উন্নত না হলেও বাকি ভারতের তুলনায় উল্লেখযোগ্য রকম খারাপ, এমন প্রমাণ নেই। তাছাড়া কর্মসংস্কৃতি একেবারেই না থাকলে কৃষির ক্ষেত্রে উন্নয়নই বা সম্ভব হল কিভাবে। উন্নতি যে ঘটেছে, এটা তর্কাতীত। বিতর্ক রয়েছে গ্রামীণ উন্নতির পরিমাণ ও স্বরূপ নিয়ে। সে প্রসঙ্গে আমরা পরে আসব। একদা সমাজতান্ত্রিক দেশে পদধূলি দিতেও ত' বহুজাতিক কোম্পানিরা কৃপণতা করে না। সে তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ মোটামুটি বাম মনোভাবাপন্ন হলেও তার বিপ্লবী রেকর্ড আর এমন কি।

অবশ্য এই যুক্তির এক সূক্ষ্ম সংস্করণও আছে। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান অবস্থান নরমপন্থী হলেও তার র‍্যাডিকাল ভাবমূর্তি বিনিয়োগের পক্ষে ক্ষতিকর। জনৈক হিন্দুবাদীর পরামর্শ অতীতের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে উচিত, শিল্প বিপ্লবের প্রথম যুগে ফিরে যাওয়া। পুঁজি মালিকের কাছে দাসখত লিখে দেওয়া।

কেন্দ্রের বঞ্চনা ও বিমাতৃসুলভ ব্যবহার সম্বন্ধে অভিযোগ কিছুটা সত্য। স্বাধীনতার পর

তথাকথিত freight equalization নীতির বৈষম্য — কারণ এই equalization একতরফা ছিল --- এ রাজ্যের অর্থনীতির প্রভূত ক্ষতি করেছিল। এর দরুন পশ্চিমবঙ্গ, ধরা যাক, বেশি দাম দিয়ে পশ্চিম ভারত থেকে তুলো কিনত অথচ নিজের কয়লার জন্য বেশি দাম পেত না। পশ্চিম পাঞ্জাবের উদ্বাস্তুদের তুলনায় পূর্ববঙ্গ থেকে আসা ছিন্নমূল মানুষেরা অনেক কম সরকারি বদান্যতা পেয়েছিল, এ কথাও অজানা নয়। কেন্দ্র যেমন নিজে থেকে যথেষ্ট রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগ এ রাজ্যে শুরু করেনি, তেমনি ব্যক্তিগত পুঁজি মালিকদেরও নিরুৎসাহ করেছে।

এসব অভিযোগের অনেকটাই সত্য। সত্য হলেও কিছুটা যেন রহস্যময়। যুক্তফ্রন্ট বা বামফ্রন্টের আমলে না হয় বৈষম্যের কারণ বোঝা যায়। কিন্তু স্বাধীনতার প্রথম দুই দশক জুড়ে এবং তারপর আবার '৭২-'৭৭ সাল পর্যন্ত দিল্লি ও কলকাতা, উভয়ের উপর উড়ত তেরঙা কংগ্রেসি পতাকা। তখন পশ্চিমবঙ্গকে দুয়োরাণী করে রাখা হল কার স্বার্থে? তবে কি কংগ্রেস সরকার আগে থেকেই বুঝে গিয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গ বাম প্রভাবে পড়বে, তাই প্রদেশটির সর্বনাশ করে রাখছিল। তাছাড়া স্বাধীনতার শুরু থেকে ষাটের দশকের গোড়া পর্যন্ত এ রাজ্যের কর্ণধার ছিলেন বিধানচন্দ্র রায়। সর্বভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর গুরুত্ব কম ছিল না। বস্তুত বিধানচন্দ্র বোধহয় একমাত্র পশ্চিমবঙ্গীয় নেতা, যাঁর কথা দিল্লি কিছুটা শুনতো বা শুনতে বাধ্য হত। বিধান রায় কেন এই বৈষম্য মেনে নিলেন। তিনি দুর্গাপুরে ইস্পাত প্রকল্পের বিনিময়ে বাকি সব মেনে নিয়েছিলেন, এমন ইঙ্গিতও কেউ কেউ দেয়। কলকাতা-ভিত্তিক, অবাঙালি বড় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা নিজেদের স্বার্থেই এ ব্যাপারে প্রতিবাদ জানাল না কেন? দিল্লিতে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি কম ছিল না। সব প্রশ্নের উত্তর মেলা কঠিন। যে কোনো ভাবেই বা কারণেই হোক, স্বাধীনতা-উত্তর যুগে ভারতীয় শাসক শ্রেণীর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অংশ পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রতি অনুকূল ছিল না অথবা বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেনি।

বাম আমলে কংগ্রেস শাসিত কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগ নিষিদ্ধ না করলেও খানিকটা নিরুৎসাহিত করেছিল, এই অভিযোগও সহজেই গ্রহণযোগ্য। তবে ঠিক কতখানি করেছিল, কেন্দ্রের বাধা ছাড়া শিল্পায়ন ও বিনিয়োগ কত দূর অগ্রসর হত, তা বলা অসম্ভব। স্বভাবতই এ বিষয়ে কোন দলিলপত্র নেই। মালিক এ ব্যাপারে কিছু সংশয় প্রকাশ করেছেন। এ কথা ঠিক যে ১৯৯১ সালে শুরু করা নয়া অর্থনীতির পূর্ববর্তী যুগে সরকার লাইসেন্স পারমিট প্রথার মাধ্যমে শিল্পায়নের প্রক্রিয়া, স্থান কাল অনেকটা প্রভাবিত করতে পারত। তবে ভারতীয় আমলাতন্ত্র কি এতই দক্ষ ও তৎপর যে পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কোনো শিল্পপতিকে চিরকাল ঠেকিয়ে রাখবে। বড়জোর কিছুটা দেরি করাতে পারে।

কার্যকারণ সম্বন্ধে বিতর্ক থাকলেও অর্থনীতি, বিশেষ করে শিল্পের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছে, একথা তর্কাতীত। বন্ধ কারখানা, মান্ধাতার আমলের যন্ত্রপাতির দরুন অ-লাভজনক উদ্যোগ। বেকার শ্রমিকের হতাশ মুখ, নতুন চাকরির পথ খুলে যাওয়ার বদলে পুরানো চাকরি হাওয়ায় মিলিয়ে যাওয়া, এটাই পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক চিত্র। অবশ্য কেবল পশ্চিমবঙ্গে নয়, সারা ভারতীয় উপমহাদেশে আলোর বন্যা, পশ্চিমবঙ্গ একমাত্র অন্ধকার বিন্দু — এ জাতীয় প্রচার সত্য নয়। আবার পুঁজিবাদী উন্নয়ন সাধারণ মানুষের অবস্থা কতখানি উন্নত করে সে প্রশ্নও আছে। মহারাষ্ট্র বা গুজরাটের কথাই ধরা যাক না কেন। এ দুই রাজ্য সূর্যোদয়ের শিল্পের কেন্দ্রবিন্দু। পক্ষান্তরে পশ্চিমবঙ্গের অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিল্প, যেমন পাট, সূর্যাস্তের পথে চলেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কি আরব সাগরের পাশে খেটে

খাওয়া মানুষরা বেশি সুখ-শান্তিতে আছে। সেখানে বেকারি, দারিদ্র্য কি নেই! নেই এশিয়ার বৃহত্তম বস্তি! তবু মানুষ নিজের অবস্থাই দেখে। সে দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের খেটে খাওয়া মানুষের আশান্বিত বা গর্বিত হওয়ার বিশেষ কোন কারণ নেই। বর্তমানে দেশী বিদেশী পুঁজির হাত ধরে যে শিল্পায়নের কথা বলা হচ্ছে, তা যদি সফলও হয়, কর্ম সংস্থান বা দারিদ্র্য দূরীকরণ কতদূর হবে, তা নিয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

অর্থনীতির কয়েকটি দিক ও সাধারণ মানুষের জীবনের উপর তার প্রভাব নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমে কৃষির কথা ধরা যাক। পশ্চিমবঙ্গ মোটামুটি শিল্পোন্নত রাজ্য হলেও কৃষির গুরুত্ব অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে নগণ্য নয়। স্বাধীনতার সময় এই রাজ্যের মোটামুটি ৭০ শতাংশ মানুষ ছিল কৃষিজীবী। বর্তমানে ৫৫ শতাংশ এই বিভাগে পড়ে। স্বাধীনতার সময় যে কৃষি ব্যবস্থা ও তার উপর নির্ভরশীল শ্রেণীবিন্যাস পশ্চিমবঙ্গ পেয়েছিল, তা অনেকটাই দুই শতাব্দী আগেকার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উত্তরাধিকার। রাষ্ট্র ও বিভিন্ন শ্রেণীর কৃষিজীবীর মধ্যে প্রায় এক বিশাল 'পিরামিড' ছিল। ফ্লাউড কমিশনের মতে পিরামিডের ছিল চল্লিশটি ধাপ। অর্থাৎ প্রকৃত উৎপাদক ও করগ্রাহী রাষ্ট্রের মধ্যে অন্তত চল্লিশ জন মধ্যস্বত্ব-ভোগী ছিল। কারো কারো মতে, এই সংখ্যা আরো বেশি। সাধারণভাবে কৃষির অবস্থা ও উৎপাদনের হার, কোনোটাই অগ্রগতির পরিচয় দেয়নি। কৃষিজীবীদের মধ্যে প্রায় সিকি ভাগ ছিল বর্গাদার বা ভাগ চাষী। প্রায় ১৭ শতাংশ কৃষিশ্রমিক বা ক্ষেতমজুর। বাকিরা ছোট, মাঝারি, ধনী চাষী বা জোতদার জমিদার। শেষোক্তরা অবশ্যই মুষ্টিমেয় কিন্তু ধনে মানে, ক্ষমতায় গ্রামীণ সমাজের প্রভু। তার মধ্যেও আবার ছিল জাতপাত ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের টানাপোড়েন।

দু'বছর আগে যে তেভাগা আন্দোলনে অবিভক্ত বাংলা উত্তাল হয়ে উঠেছিল স্বাধীনতার সময়ও পশ্চিমবঙ্গের নানা অংশে তা অব্যাহত ছিল। তেভাগা আন্দোলন মূলত ভাগচাষীদের সংগ্রাম হলেও কৃষিজীবীদের অন্যান্য অংশ তাতে যোগ দিয়েছিল। আধা সামন্তদের বিরুদ্ধে এই লড়াই স্বভাবতই গ্রামবাংলা ও আরো ব্যাপক অর্থে পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক, রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রভাবিত ও পরিবর্তিত না হয়ে পারেনি। বিধান রায়ের সরকার প্রথম দু'আড়াই বছর আন্দোলনের বিরুদ্ধে নির্মম নিপীড়ন চালাবার পর বোধহয় বুঝতে পেরেছিল, কেবল লাঠি নয়, গাজরেরও দরকার আছে। তাছাড়া রাজনৈতিক অর্থনৈতিক কারণে ঠিক প্রচলিত গ্রামীণ কাঠামোর আর টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। ৫১-এর গোড়ায় সরকার যে বর্গাদার আইন পাস করেছিল, তা '৪৬ এর সুরাওয়ার্দি সরকারের আইনের আদলে রচিত ছিল। '—৫৩ সালে সরকার Estate Acquisition Act পাস করে কার্যত জমিদারি প্রথা বাতিল করল! অবশ্য আইন কার্যকরী হওয়ার জন্য আরো দু'বছর সময় দেওয়া হল। এর মধ্যে ধনী মালিকরা জমি বেচা, সিলিং প্রযোজ্য হয় না এমন ব্যবস্থার আওতায় আনা (ফল বাগান, দেবোত্তর সম্পত্তি, শিল্পের জন্য জমি ইত্যাদি), বাড়তি জমি বেনামী করা ও অন্যান্য বিলি বন্দোবস্ত পাকা করেছিল। পঞ্চাশ থেকে যাটের দশক পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলে জোতদার, মাঝারি চাষী, বর্গাদার, ক্ষেতমজুর নিয়ে এক নতুন ধরনের শ্রেণীবিন্যাস গড়ে উঠেছিল।

তার উপর যাটের দশকের মাঝামাঝি ভারতে কৃষির ক্ষেত্রে এল সবুজ বিপ্লবের জোয়ার। সবুজ বিপ্লবের পীঠস্থান ছিল পাঞ্জাব, হরিয়ানা, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ। তবে অন্যান্য প্রদেশের বেছে নেওয়া দু'একটি এলাকায় 'মিনি' সবুজ বিপ্লব নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছিল। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে বেছে নেওয়া জেলা ছিল বর্ধমান। এখানে ওখানে আরো

কয়েকটি ছোটখাটো জায়গায়। সবুজ বিপ্লবকে সংক্ষেপে বলা যায়, ভূমিসংস্কার বা পুনর্বণ্টন ছাড়া কৃষি উৎপাদন বাড়াবার চেষ্টা বা উপায়। এর ফলে উৎপাদন বেড়েছে, কিছু পরিমাণে খাদ্য সমস্যার সমাধান হয়েছে, এ কথা অনস্বীকার্য। কিন্তু সেই সঙ্গে বেড়েছে অসাম্য ও দ্বন্দ্ব। গ্রামীণ সমাজে গভীর হয়েছে ধনী চাষী ও দরিদ্র বা ভূমিহীন কৃষক, ক্ষেতমজুরদের মধ্যে মেরুকরণ। পশ্চিমবঙ্গেও ছোট মাপের মধ্যে এই প্রক্রিয়া লক্ষণীয়।

তারপর এল ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে সত্তরের দশকের প্রথম দু'তিন বছর পর্যন্ত আগুন ঝরা দিন। খাদ্য আন্দোলন, প্রথম ও দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট, নকশালবাড়ির সশস্ত্র বিপ্লব প্রচেষ্টা। '৬৭ থেকে '৭০ সালের মধ্যে বেশ কিছু কৃষিজমি দরিদ্র বা ভূমিহীন চাষীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে রাষ্ট্রপতির শাসনের সময় বা সিদ্ধার্থশংকর রায়ের কংগ্রেস সরকারের আমলেও চাকা পুরোপুরি ঘুরিয়ে দেওয়া যায়নি। যেমন বিধান রায় সরকার পারেনি কর্নওয়ালিস মার্কা ব্যবস্থা বজায় রাখতে। '৭৭ সালের বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ও অপারেশন বর্গার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ চিত্র অনেকখানি পরিবর্তিত হয়েছে। যদিও পরিবর্তনের প্রকৃতি ও পরিমাণ সম্বন্ধে বিতর্ক রয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের ভূমিসংস্কার সমস্ত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও কেরল বাদে (এবং হয়ত কিছুটা মুখ্যমন্ত্রী দেবরাজ আর্সে-র আমলে কর্ণাটক। এখন অবশ্য ঐ দক্ষিণী রাজ্যে প্রচুর পরিবর্তন ঘটেছে) সব ভারতীয় প্রদেশের তুলনায় বেশি গভীর ও ব্যাপক। কিভাবে এটা সম্ভব হয়েছিল? আবার সেই ব্যতিক্রমের প্রশ্ন। রাষ্ট্রনীতি ও সমাজতত্ত্ব বিশেষজ্ঞ পার্থ চ্যাটার্জী কয়েকটি কারণ অনুসন্ধান বা অনুমান করেছেন। রস মালিকও নিজের মত করে ব্যাখ্যা করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ একমাত্র ভারতীয় রাজ্য, যেখানে কোনো ধনী কৃষক বা কুলাক ভিত্তিক শক্তিশালী দল গড়ে ওঠেনি। অজয় মুখার্জির বাংলা কংগ্রেস হয়ত একমাত্র ক্ষণস্থায়ী ব্যতিক্রম। কংগ্রেস এক সময় জোতদার শ্রেণীর প্রধান প্রতিনিধি ছিল। তবে এতখানি একমুখী ভাবে নয়। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত শ্রেণী অবিভক্ত বাংলার মধ্যবিত্তের ভূমি-নির্ভরতা কাটিয়ে উঠেছিল। যারা পূর্ববঙ্গ থেকে এসেছিল, তারা ত জমির সঙ্গে সব বাঁধন কাটতে বাধ্য হয়েছিল। অন্যরাও জমিদারি বিলোপ, জমির সিলিং ইত্যাদি পদক্ষেপের কারণে কিছুটা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়েছিল। অতএব ভূমিসংস্কারের ব্যাপারে শহরে পেশাজীবী ও বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে প্রবল বাধা আসেনি। এক রকম উদাসীনতা অথবা প্রচ্ছন্ন সমর্থন ও সহানুভূতি ছিল। মধ্যযুগীয়, সামন্ততান্ত্রিক ব্যাপার-স্যাপার আধুনিক সমাজের, এমন কি ধনবাদী সমাজের সঙ্গে খাপ খায় না, এমন এক ধারণা হাওয়ায় ভাসত। অনেক রাজ্যে সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে ভূস্বামী শ্রেণীর প্রাধান্য ভূমিসংস্কারের পথে এক বড় বাধা। পশ্চিমবঙ্গে ততটা নয়। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে, অমর মিত্রের উপন্যাস, 'পাহাড়ের মত মানুষ'-এর কথা। কাহিনীতে এক জোতদারের স্ত্রী দুঃখ করে বলছে, গ্রামে যে সব আমলাদের পাঠানো হয়, তাদের হওয়া উচিত জমির মালিকের ঘরের ছেলে। তাহলেই তারা জমির মালিকের দুঃখ-দরদ বুঝবে।

হয়ত আরো একটা কারণে ভূমিসংস্কার সম্ভব হয়েছে। শিল্পপতিদের কেন্দ্রে যতখানি প্রভাব প্রতিপত্তি, জোতদার ও গ্রামীণ মালিকদের সে তুলনায় ঢের কম। তাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধি সাধারণত বিভিন্ন রাজ্য সরকার। কেবল ভূমিসংস্কারের জন্য বা জোতদারদের অভিযোগ শুনে কেন্দ্র কোনো রাজ্য সরকারকে বরখাস্ত করবে, এমন সম্ভাবনা কম। কেরলে অবশ্য ১৯৫৯ সালে অনেকটা তাই হয়েছিল। তবে তারপর ভারতের অবস্থা অনেক

পাল্টেছে। কেন্দ্রের একাধিপত্য বা শাসকশ্রেণীর প্রধান প্রতিভূরূপে কংগ্রেস দলের ক্ষমতা ঢের কমেছে। পক্ষান্তরে বৃহৎ শিল্পপতি, সর্বোপরি বিদেশী কোম্পানিদের অসন্তুষ্ট করলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী।

অপারেশন বর্গা ও পঞ্চায়েত ব্যবস্থা রাজ্যের গ্রামীণ চালচিত্র আমূল পরিবর্তিত করেছে। প্রাক্ স্বাধীনতা যুগের মধ্যস্বত্বভোগী জমিদারদের মত পঞ্চাশ বা ষাটের দশকের পল্লী সমাজের কর্তারাও অনেকাংশ নিয়েছে ইতিহাসের পাতায়। পূর্ণ সাম্য এসেছে, এমন নয়। তবে এলিটের রূপ বদলেছে। কারোর কারোর মতে, যে নারীলোলুপ জোতদারের কথা আগের দু'তিন দশকের বাম প্রচারে শোনা যেত, তার বদলে প্রথম সারিতে এসেছে নীল ছবি দেখা, আধুনিক গ্রামীণ কর্তাব্যক্তি। সে কিছু জমি ট্রাক্টর ও উন্নত সেচের সাহায্যে চাষ করে। তবে সিলিং-এর চেয়ে খুব উপরে নয়। লাভ বিনিয়োগ করে বাস, লরি বা কোল্ড স্টোরেজের মালিকানায়। সাধারণ চাষীরাও বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে অতটা ভয় পায় না।

সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে এসেছে অর্থনৈতিক উন্নতি। আগেই বলা হয়েছে, গত দুই দশকে এ রাজ্যের অর্থনীতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে উজ্জ্বল ছবি কৃষির। যে অগ্রগতি হয়েছে, তা স্বাধীনতা উত্তর প্রথম তিন দশকের তুলনায় অথবা সর্বভারতীয় মানদণ্ডে উপেক্ষণীয় নয়। এমন কি ভারতের শস্যভাণ্ডার পাঞ্জাব হরিয়ানার সঙ্গে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তুলনীয়। ঠিক কতখানি উন্নতি হয়েছে, কেন হয়েছে, কে এর জন্য কৃতিত্ব দাবি করতে পারে, কেই বা এর সুফল ভোগ করছে, এ সব নিয়ে প্রচুর বিতর্ক চলেছে ও চলছে। আর সব ক্ষেত্রের মত এখানেও আছে সংখ্যাতত্ত্বের খেলা। ইংরিজিতে যাকে বলে, lies damned lies, statistical lies। তবে অগ্রগতি যে লক্ষণীয় তা কেউ বোধহয় অস্বীকার করে না। চরম বাম-বিরোধী মমতা ব্যানার্জিও নয়। আরো বড় কথা, অন্তত সীমিত পরিমাণে পুনর্বণ্টন (redistribution) যে উৎপাদনশীলতার বিপক্ষে যায় না, পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ পরীক্ষা নিরীক্ষা যেন তা প্রমাণ করে।

তবে চাঁদের উল্টো পিঠও আছে। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের বর্তমান নেতিবাচক বা অসম্পূর্ণ দিকগুলি একাধিক বিশেষজ্ঞ তুলে ধরেছেন। দুই প্রধান বিতর্কের কেন্দ্র, আজকের দিনে এ রাজ্যে বর্গাদারদের অবস্থা ও বিভাজন আর বর্গাদার বনাম কৃষিশ্রমিক। কারোর কারোর মতে, ভাগচাষীরাও সবাই এক পর্যায়ের নয়। তাদের মধ্যেও বড় ছোট, অপেক্ষাকৃত সচ্ছল ও দরিদ্র মানুষ আছে। সাধারণভাবে বড় ভাগচাষীরাই বর্গা রেকর্ড করেছে। কারণ মালিকদের উপর তাদের নির্ভরশীলতা অপেক্ষাকৃত কম। নিজের পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা অধিক। যেখানে সব ধরনের বর্গাদার নাম রেকর্ড করিয়েছে, সেখানেও আর্থিক সংস্থাগুলির ঋণ (institutional credit) ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধালাভের ব্যাপারে বড় বর্গাদাররা স্বাভাবিকভাবেই অগ্রণী। ফলে গত দুই দশকে বর্গাদারদের মধ্যে এক ধরনের বিভাজন রেখা ফুটে উঠেছে। অন্যভাবে বলতে গেলে, বড় বর্গাদাররা মধ্য চাষীতে পরিণত হয়ে গ্রামীণ অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি হয়ে উঠেছে। এরা যে কেবল বড় চাষী বা জোতদারদের জমি ভাগে চাষ করে তা নয়, কোথাও কোথাও নিজেদের চেয়ে ছোট চাষীর জমিও ভাগে দিতে দ্বিধা করে না। এ ভাবেই রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে এক নতুন এলিট ক্রমে সংগঠিত হয়েছে। এই এলিট অবশ্যই প্রাক্ ১৯৭৭ পল্লীসমাজের কর্তাদের তুলনায় অনেক কম ধনী। মাটির বেশি কাছাকাছি। তাদের কৃষক পরিচয় মুছে যায়নি। আগের তুলনায়, বা

অন্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে গ্রামাঞ্চলে অসাম্য নিশ্চিতভাবে কম। তবু অপারেশন বর্গার জোয়ারে সব নৌকো সমান ভাবে ভেসে ওঠেনি।

এই বিভাজনের সঙ্গে আবার জড়িয়ে আছে জাতপাত বা আদিবাসী সমস্যা। আমরা দেখেছি, অন্য রাজ্যের তুলনায় এমন প্রশ্ন এ রাজ্যের রাজনীতিতে তেমন প্রত্যক্ষভাবে আসেনি। তবে পর্দার আড়ালে জাত বা উপজাতি বস্তুটির অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়ে গেছে, এ কথা ভাবলে ভুল হবে। পাত্র পাত্রীর বিজ্ঞাপনই তার প্রমাণ। পিছিয়ে পড়া মানুষদের মধ্যে নিম্নবর্ণ ও আদিবাসীদের সংখ্যা এখনো বেশি। অন্যান্য মানদণ্ড অনুসারেও তারা পিছিয়ে পড়েছে। তপসিলি জাতি ও আদিবাসী সমাজে প্রাথমিক স্কুলে ঢোকা ছেলে-মেয়ের সংখ্যা আর বাকি সামাজিক স্তরে অনুরূপ সংখ্যার সঙ্গে পার্থক্য বেড়েছে। অর্থাৎ শিক্ষার ক্ষেত্রে নিম্ন বর্গ ও বর্ণরা পিছিয়ে পড়ছে। পশ্চিমবঙ্গে তপসিলি জাতির মধ্যে মাত্র ২৪.৩৭ শতাংশ সাক্ষর। সর্বভারতীয় হিসাবে এ ক্ষেত্রে রাজ্যের স্থান দশম। অবশ্য এটা '৯৩ সালের হিসাব। গত তিন-চার বছরে সাক্ষরতা অভিযানের দরুন এই সংখ্যা বেড়ে থাকতে পারে।

দ্বিতীয়ত, আসে ক্ষেতমজুরদের প্রশ্ন। তারা ভূমিসংস্কারের দরুন কতখানি উপকৃত হয়েছে, জমির মালিকানা বা বর্ধিত মজুরি পেয়েছে কি না, তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। প্রয়াত বামপন্থী অর্থনীতিবিদ অশোক রুদ্রের মতে, পশ্চিমবঙ্গের কৃষিতে বর্গাদারদের তুলনায় কৃষি শ্রমিকরা সংখ্যাগুরু। কিন্তু তাদের স্বার্থ অপেক্ষাকৃত অবহেলিত হয়েছে।

> আরও দেখেছি যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি আয়তনের চাষীরাও বেশ অধিক পরিমাণেই ক্ষেতমজুরদের শ্রমের ব্যবহার করে থাকে। ...যার ফলে তাদের সঙ্গে ক্ষেতমজুরদের সম্পর্কটা দ্বন্দ্ব-মূলক। ক্ষেতমজুরদের মজুরি বৃদ্ধির জন্য আন্দোলনে নামতে যে কোনো পার্টিরই অসুবিধা হয় এই কারণে যে তার দরুন মধ্য ও ধনী চাষীদের সমর্থন হারাবার ভয় থাকে। ক্ষেতমজুরদের মজুরি বাড়লে ক্ষতিগ্রস্ত হবে শুধু বৃহত্তম জমির মালিকেরা নয়, শুধু জোতদারেরা ও ধনী কৃষকেরা নয়, অনেক মধ্যচাষী ও এমন কি অনেক ক্ষুদ্র চাষীও। এদের সমর্থন হারানোর চেয়ে এইসব পার্টিগুলি ক্ষেতমজুরদের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেওয়াকেই বেশি সুবিধাজনক মনে করে এসেছে। মজুরি বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন করা হয়নি বললেই চলে। এই বিষয়ে যদি কিছু করা হয়ে থাকে তো তা হল মালিকপক্ষকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মজুরির হার কিছুটা পরিমাণে বাড়ানো — কোনো সত্যিকারের শ্রেণীসংগ্রাম ছাড়াই।
>
> *(পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেতমজুর · অশোক রুদ্র)*

এ কথার অর্থ এই নয় যে কৃষি শ্রমিকদের অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি। Economic Review অনুসারে ১৯৭৬-৭৭ থেকে ১৯৭৯-৮০-র মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত মজুরদের মজুরি ২০ শতাংশ বেড়েছিল। তারপরও বেড়েছে। তবে ন্যূনতম মজুরি সব ক্ষেত্রে দেওয়া হয় না। কর্মসংস্থানের জন্য NREP (National Rural Employment programme) ও স্থায়ী সম্পদ (asset) বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রচলিত I. R. D. P. (Integrated Rural Development Programme) কৃষিশ্রমিকদের পায়ের তলায় সামান্য হলেও কিছু মাটি দিয়েছে। কৃষিকাজ যখন থাকে না, সে সময় তাদের একেবারে না খেয়ে মরতে হয় না। অবশ্য এই ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গের বিশেষত্ব নয়। সারা ভারতেই বিস্তৃত। তবে এ রাজ্যে বিকেন্দ্রীভূত পঞ্চায়েত ব্যবস্থার কল্যাণে প্রকল্পের অর্থ মোটামুটি সঠিকভাবে খরচ করা হয়, দুর্নীতি বা অন্য রাজ্যের তুলনায় কম, এমন দাবি করা হয় বটে।

সব মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে এক ধরনের স্থিতাবস্থা (status quo) গড়ে উঠেছে, যার ভিত্তি কিছু পরিমাণে গণতন্ত্রীকরণ, উৎপাদনশীলতা ও জীবনের মানের উন্নতি। তবে আর অগ্রসর করা সম্ভব হবে কি না, যারা পালাবদলের খেলায় জেতেনি তাদের জন্য কিছু করা যাবে কি না, তা স্পষ্ট নয়। এমন কি স্থিতাবস্থার ক্ষেত্রেও ফাটল দেখা দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের গর্ব, এখানে তথাকথিত de-peasantization এর প্রক্রিয়া - কৃষকদের জমি হারিয়ে অ-কৃষকে পরিণত হওয়া ঠেকানো গেছে। কিন্তু সম্প্রতি উত্তরবঙ্গে চাষীরা বড়, অনেক সময় অ-কৃষক মালিকদের বা চা বাগানের কাছে জমি হস্তান্তর শুরু করেছে। পশ্চিমবঙ্গের কৃষি কি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে, যেখানে সাফল্যের ভরসায় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা মানে পিছু হটা?

শিল্প, শহরাঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের দুর্বল স্থান। ঐতিহাসিক দিক থেকে দেখলে পশ্চিমবঙ্গ ভারতীয় উপমহাদেশে আধুনিক শিল্পায়নের এক প্রধান কেন্দ্র। ব্রিটিশ আমলে, বিশেষত ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে, এ রাজ্যে পাট, ইঞ্জিনিয়ারিং, খনিশিল্প ইত্যাদি গড়ে উঠেছিল। অবিভক্ত বাংলার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ছিল অপেক্ষাকৃত শিল্পোন্নত। সেই সঙ্গে এক শ্রমিকশ্রেণী গড়ে উঠেছিল। সমগ্র জনসংখ্যার অপেক্ষাকৃত ছোট অংশ হলেও তারা অনেক সময় সচেতন, সংঘবদ্ধ শক্তির পরিচয় দিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গভিত্তিক শিল্পপতিদের অধিকাংশের মত অনেক শিল্প-শ্রমিকও অবাঙালি। তারা পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এনেছিল নিজস্ব প্রদেশ বা সম্প্রদায়ের প্রভাব, চিন্তা-ভাবনা, পারস্পরিক যোগাযোগ, যাকে বলে নেট ওয়ার্ক।

পশ্চিমবঙ্গে যে শিল্পের ক্ষেত্রে বা শিল্পজনিত কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অবনতি ঘটেছে, একথা অনস্বীকার্য। পুরনো কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেছে, নতুন শিল্প তার স্থান নিতে পারেনি। ১৯৭৭-৭৮ এ শিল্পের দিক থেকে সর্বভারতীয় চিত্রে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ছিল দ্বিতীয়, মহারাষ্ট্রের নিচে। আশির দশকের মাঝামাঝি আমরা নেমে এসেছি পঞ্চম স্থানে। তামিলনাড়ু, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ আমাদের পিছনে ফেলে গেছে। এই ঘোড়দৌড়ে পিছিয়ে থাকার নানা সম্ভাব্য কারণ নিয়ে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। এই অবস্থার মধ্যে ব্যাপক শিল্পায়ন ঘটলে সাধারণ মানুষের অবস্থার কতখানি উন্নতি ঘটত, অন্য রাজ্যে অধিক শিল্পায়ন কি উপহার দিয়েছে, তাও অনুমান করা যায়। কিন্তু সে প্রশ্ন ভিন্ন। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর থেকেই সমৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের আশায় বিনিয়োগ আকর্ষণের চেষ্টা করেছে। বিশেষ করে '৯৪ সাল থেকে নব শিল্পনীতি শিল্পের ক্ষেত্রে রেনেসাঁস সৃষ্টির আশ্বাস ও স্বপ্ন বয়ে এনেছে। এই প্রতিশ্রুতি যে একেবারে ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়েছে, তাও বলা যায় না। বামফ্রন্টের প্রথম পাঁচ বছরে যা বিনিয়োগ হয়েছিল, তা পূর্ববর্তী কংগ্রেসি আমলের পাঁচ বছরের তুলনায় বেশি। বিদ্যুতের অভাব খানিকটা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল, এ কথা স্বীকার্য। সত্তরের দশকের গোড়া থেকে প্রায় আশির দশকের শেষ পর্যন্ত এ রাজ্যে এক ধরনের 'বিদ্যুৎ-দুর্ভিক্ষ' চলেছিল। তবে গত সাত আট বছরে অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। এমন কি উদ্বৃত্ত বিদ্যুতের কথাও শোনা যায়।

শিল্পায়নের পথে আর একটি তথাকথিত বাধা, জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলন, ইতিহাস হয়ে গেছে। আগেই দেখেছি, বিগত পঁচিশ বছর এ রাজ্যে কোনো বড়মাপের শ্রমিক আন্দোলন হয়নি। যাও বা হয়েছে, যেমন কানোরিয়া বা ভিক্টোরিয়া জুট মিল, তা প্রচলিত ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের বাইরে। বরং শিল্পপতিরাই সংগঠিত আক্রমণ চলিয়েছেন। যত শ্রম

দিবস ধর্মঘটের দরুন নষ্ট হয়েছে, তার চেয়ে ঢের বেশি নষ্ট হয়েছে লক আউটের কল্যাণে। রস মালিকের সমীক্ষা অনুসারে,

Wage gains under the Left Front have been less than in the past and less than in the two other most industrialized states. As seen in table 5.8 strikes have declined to only 3.5 per cent of the national total in mar-days lost during 1993, while employer lock-outs have increased to 88.5 per cent of the national total.(Development policy of a Communist Government. West Bengal since 1977. Ross Mallick)

পশ্চিমবঙ্গে যে মজুরি অত্যধিক, সে জন্যই লোকে চাকরি পাচ্ছে না ··· অর্থনীতির ভাষায় যাকে বলে pricing themselves out of the market — তাও সত্য নয়। নব্বইয়ের দশকের গোড়ার দিকে এ রাজ্যের শিল্পশ্রমিকদের মজুরি ছিল গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের তুলনায় কম। জাতীয় গড়ের (average) তুলনায় সামান্য বেশি। তবু বেকার সমস্যা প্রবল। আমরা আগেই দেখেছি, পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকশ্রেণীর মিশ্র চরিত্র। কলকাতা কেন্দ্রিক শ্রমিকশ্রেণীর মোটামুটি ২০ শতাংশ পূর্ববঙ্গ থেকে আসা উদ্বাস্তু। ২৫ শতাংশ বিহার, উত্তর ভারত ইত্যাদি থেকে আগন্তুক। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে অ-বাঙালিরা পাট, মোটা কাপড় ও যানবাহন সেক্টরে অপেক্ষাকৃত অ-দক্ষ (unskilled) কাজ করত। বাঙালি শ্রমিকরা পেত ইঞ্জিনিয়ারিং, রাসায়নিক বা সূক্ষ্ম কাপড় কলে একটু দক্ষ কাজ। তাছাড়া শাদা কলার কাজের জন্য ছিল চিরাচরিত কলম পেষা বাঙালিবাবু। উদ্বাস্তুদের মধ্যে এক সময় বেকারির হার ছিল ৩৫ শতাংশ। বেকারির সঙ্গে রাজনৈতিক ডামাডোলের সম্পর্ক স্বাভাবিকভাবেই ছিল। এর আরো এক কারণ, বেকার তরুণ-তরুণীদের বড় অংশ এসেছিল রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় ও সোচ্চার নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে। একাধিক পর্যবেক্ষক পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে দেখেছেন র‍্যাডিকাল রাজনীতিতে শিক্ষিত বেকারির প্রতিফলন।

Nearly 60 per cent of the unemployed persons belonged to the educated vocal sections of the community. It is unemployment among the educated persons rather than amont he illiterate working classes which constitutes the crux of the peoblem.

(The City of Calcutta : S. N. Sen)

আই. এল. ও. (International Labour Organisation)-এর মন্তব্য :

"One special reason for concern with Calcutta's educated employed is that the group hardent hit is the Bengali middle class which comprises, or intellectual elite — the bhodralok — who have played a prominent part among the factions whose activities have disturbed political life in Calcutta."

(Mallick op. Cit.)

১৯৬৫-৬৯ এর মধ্যে কর্মসংস্থান ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে ২ শতাংশ ও সামগ্রিকভাবে কলকারখানায় ২ শতাংশ কমেছিল। এ সময়কার রাজনৈতিক অস্থিরতা সুবিদিত।

আজকের প্রতিশ্রুত শিল্পের রেনেসাঁস কি বাস্তবে রূপায়িত হবে? যদি বা হয়, তার

দরুন কর্মসংস্থান কতখানি হবে? মনে রাখা উচিত, সারা ভারতে কর্মরত মানুষের মাত্র ১০ শতাংশ সংগঠিত সেক্টরে কাজ করে। ভবিষ্যতের কলকারখানা আরো বেশি পুঁজিঘন (capital intensive) হতে বাধ্য। আধুনিক ম্যানেজমেন্টের নীতিই হল, সবাপেক্ষা বেশি উৎপাদন করানো। যদি শিল্পায়নের ফলে কিছু পরোক্ষ (downstream) চাকরির জন্ম হয়, এটুকুই আশা।

আধা শতাব্দী ধরে পশ্চিমবঙ্গ অনেক স্বপ্ন দেখেছে, সংগ্রাম করেছে, মূল্য দিয়েছে। কিছু স্বপ্ন সফল হয়েছে, বেশির ভাগ হয়নি। নয়া অর্থনীতি ও বিশ্বায়ন নামক স্বর্ণমৃগের পিছনে ছুটে কি সার্থকতা আসবে?

সূত্র : Land Reforms in India Harkisan Singh Surjeet
পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেতমজুর অশোক রুদ্র
পশ্চিমবঙ্গের বর্গাদার অশোক রুদ্র
পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-ব্যবস্থায় শ্রেণীবিন্যাস অশোক রুদ্র
Development policy of a Communist Government,
West Bengal Since 1977 Ross Mallick
Unsettled Settlers Migrant Workers and Industrial
Capital in Calcutta Arjan de Haan
The present History of West Bengal, Essays in Political Criticism Partha Chatterjee
The Agony of West Bengal Ranajit Ray।

গো পা ল ব ন্দ্যো পা ধ্যা য়

পশ্চিমবাংলার উদ্বাস্তু সমস্যা

১৯৪৬ সালে ভারতীয় উপমহাদেশের নানা জায়গায় বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় দিশেহারা হয়ে জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা গান্ধীজির পরামর্শ অগ্রাহ্য করে স্বাধীনতা লাভের জন্য শেষপর্যন্ত সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশ বিভাগের প্রস্তাব মেনে নেন। এই প্রস্তাব মেনে নেওয়ার পক্ষে তারা যুক্তি দিয়েছিলেন যে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হলে উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা অনেক কমবে, দুটি রাষ্ট্র মোটের উপর সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতে পারবে এবং দুই রাষ্ট্রের সংখ্যালঘুরা নিজেদের ভিটেমাটিতে বসবাস করতে পারবে। গান্ধীজি তো নয়ই কংগ্রেস নেতারাও চাননি যে সংখ্যালঘুরা পাকিস্তান থেকে ব্যাপকভাবে চলে আসুক। তারা সঙ্গতভাবেই মনে করেছিলেন যে নিজেদের ভিটেমাটিতে বাস করতে পারলে সংখ্যালঘুরা উদ্বাস্তু জীবনের অপরিসীম ক্লেশ ও লাঞ্ছনা থেকে অব্যাহতি পাবে। সংখ্যালঘুদের [illegible] ছিল স্বাভাবিক আগ্রহ। সংখ্যালঘুরা যাতে পাকিস্তানে বসবাস করতে পারে তার জন্য জাতীয় কংগ্রেস নেতারা যথাসাধ্য করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা ভালভাবেই জানতেন যে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশ বিভাগের মধ্যেই উদ্বাস্তু সমস্যার বীজ উপ্ত হয়েছিল। তাই তারা পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের এই আশ্বাসও দিয়েছিলেন যে নিরাপত্তার অভাবে যে সব সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক ভারতে চলে আসতে বাধ্য হবে তাদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য ভারত সরকার যথাসাধ্য করবে।

গান্ধীজিও এই কথা বিশেষ করে উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে ভারতীয় রাষ্ট্রের দায়িত্বের কথা ১৯৪৭ সালের ১৬ই জুন দিল্লির এক প্রার্থনা সভায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "কল্পনায় বা বাস্তবে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে যে সব হিন্দু তাদের গৃহে থাকতে পারবে না তাদের একটা সমস্যা আছে। তাদের কাজকর্মে বা গতিবিধিতে যদি বাধা সৃষ্টি করা হয় অথবা নিজেদের প্রদেশে তাদের সঙ্গে যদি বিদেশির মত আচরণ করা হয় তাহলে তারা সেখানে থাকতে পারবে না। সেক্ষেত্রে ভারতীয় রাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট প্রদেশের নিশ্চিত কর্তব্য হবে ওই সমস্ত উদ্বাস্তুদের দুহাত বাড়িয়ে গ্রহণ করা এবং সমস্ত যুক্তিসঙ্গত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া। তাদের অনুভব করাতে হবে যে তারা অপরিচিত দেশে আসেনি।"

দুটি রাষ্ট্র গঠিত হবার পরে ঘটনাবলী যেভাবে ঘটবে বলে জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা আশা করেছিলেন প্রধানত সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তর ফলে তা ঘটল না। দুটির রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ চিরস্থায়ী করে রেখে রাষ্ট্র দটিকেই দুর্বল ও তাদের উপর নির্ভরশীল করে রাখাই ছিল সাম্রাজ্যবাদীদের দেশবিভাগের উদ্দেশ্য। তারা দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ বাড়িয়ে তোলার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করেছে, আজও করছে। পাকিস্তানের সাম্রাজ্যবাদ ঘেঁষা শাসকগোষ্ঠী এবং দুই রাষ্ট্রের মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলিকে তারা এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজন মত ব্যবহার

করেছে। সুতরাং রাষ্ট্র দুটি গঠিত হবার পর থেকেই তাদের মধ্যে অবিরাম বিরোধের সম্পর্ক চলে আসছে। এই বিরোধ কখনও থেকেছে ছাই চাপা আগুনের মত আবার কখনও দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে। তাদের মধ্যে যুদ্ধও হয়ে গেছে। দুই রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ যখনই প্রবল হয়েছে তখনই দুই রাষ্ট্রের মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলেছে, বীভৎস দাঙ্গা লাগিয়েছে, সংখ্যালঘুদেব উপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছে এবং তাদের দেশত্যাগে বাধ্য করেছে। এই দেশত্যাগীরাই উদ্বাস্তু হয়ে আশ্রয় ও পুনর্বাসনের আশায় অন্য রাষ্ট্রে চলে এসেছে। মোট কথা জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা যা আশা করেছিলেন ঘটনাবলী তার বিপরীতভাবেই ঘটতে লাগল। আর এই পরিস্থিতিতেই, দেশের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে উদ্বাস্তু সমস্যা তার রূপ পরিগ্রহ করতে লাগল।

পশ্চিমবাংলার উদ্বাস্তু সমস্যা

দেশ বিভাগের অব্যবহিত পরেই পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাবে নারকীয় দাঙ্গার ফলে মাত্র দুমাসে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কমপক্ষে এক কোটি লোক বিনিময় হয়ে গেল। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে হিন্দু ও শিখদের দেশত্যাগ বন্ধ করার কোন প্রচেষ্টা আর থাকল না। পশ্চিমপ্রান্তে এক ধাক্কায় উদ্বাস্তু সমস্যা পরিপূর্ণ আকার ধারণ করল। তা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত ৫০/৬০ লক্ষ হিন্দু ও শিখ উদ্বাস্তুর ত্রাণ ও পুনর্বাসনের এক বিপুলায়তন সমস্যায় পরিণত হল। ভারত সরকারের পক্ষে এই সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব অস্বীকার করার কোন উপায় ছিল না।

পশ্চিমপ্রান্তে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যত লোক দুই রাষ্ট্র ছেড়ে চলে গেল, থেকে গেল তার থেকে অনেক বেশি। পূর্ব পাকিস্তানে রইলো ১ কোটিরও বেশি হিন্দু আর ভারতে থাকল কয়েক কোটি মুসলমান। সুতরাং পূর্বপ্রান্তে সমস্যার দুটো দিকই থাকল : প্রথম, পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুদের বসবাসের ব্যবস্থা করা এবং তাদের দেশত্যাগ বন্ধ করা আর দ্বিতীয়, পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের জন্য ত্রাণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

দুই রাষ্ট্রের উচ্চপর্যায়ে আলোচনা মারফৎ পাকিস্তান সরকারকে দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার জন্য ভারত সরকার সঠিকভাবেই আলোচনা চালাচ্ছিল। দুটি রাষ্ট্র গঠিত হবার পর এই ধরনের প্রচেষ্টার অবশ্যই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু একইসঙ্গে বিশেষ করে পশ্চিমপ্রান্তের মর্মান্তিক ঘটনার পরে পশ্চিমবাংলায় আগত উদ্বাস্তুদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের একটি পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা তার থেকে মোটেই কম ছিল না। অথচ ভারত সরকার তা করেনি। উদ্বাস্তুদের আন্দোলনের চাপে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ত্রাণের জন্য যেটুকু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল তার সামান্য সাহায্য দিতেও তারা টালবাহানা করছিল। পুনর্বাসনের কোন ব্যবস্থাই করেনি। একটি সুচিন্তিত নীতি অনুসরণ করেই ভারত সরকার এসব করছিল।

সরকারি দলিলে এই নীতি সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু ঐ সময় সংসদে নেহরুর বক্তৃতা বিশেষ করে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে লেখা তার কয়েকটি চিঠি থেকে এই নীতি সম্পর্কে একটা ধারণা অবশ্যই করা যায়। ১৯৪৮ সালের ১৬ ও ২২ আগস্ট নেহরু ডাঃ রায়কে যে চিঠি লিখেছিলেন তার সারমর্ম ছিল যে পূর্বপাকিস্তান থেকে ব্যাপক উদ্বাস্তু আগমন হলে সমস্যার কোন যুক্তিসঙ্গত সমাধান সম্ভব নয়। সুতরাং তা যে কোন ভাবেই বন্ধ করতে হবে। এই দুটি চিঠি থেকে একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে নেহরুর কাছে পূর্ব পাকিস্তান থেকে হিন্দুদের দেশত্যাগ বন্ধ করাই ছিল একমাত্র না হলেও মুখ্য বিষয়। পশ্চিমবাংলায়

আগত উদ্বাস্তুদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের বিষয়টি ছিল নিতান্তই গৌণ।

ডাঃ রায়ের একটি জরুরি চিঠির জবাবে ১৯৪৯ সালের ২ ডিসেম্বর নেহরু তাকে যে চিঠি লেখেন তাতে তিনি পূর্বপাকিস্তান থেকে হিন্দুদের দেশত্যাগ বন্ধের উপর অধিকতর জোর দেন। উপরন্তু তিনি লেখেন যে ভারত সরকার ও রাজ্য সরকারের পক্ষে এমন কিছু করা একেবারেই উচিত হবে না যাতে পূর্ব পাকিস্তান থেকে হিন্দুরা দেশত্যাগ করতে উৎসাহিত হয়। এর সহজ অর্থ হল এই যে পশ্চিমবাংলায় উদ্বাস্তুদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা এমনই সীমিত করতে হবে যাতে পূর্বপাকিস্তানের হিন্দুরা তাকে তপ্ত কটাহ থেকে জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দেওয়া বলে মনে করে এবং দেশত্যাগে নিরস্ত হয়।

নেহরুর ধারণা ছিল যে পূর্বপাকিস্তানের হিন্দুরা পশ্চিমবাংলায় চলে আসবার জন্য পা বাড়িয়েই আছে। নিরাপত্তার অভাব সম্পর্কে তাদের অভিযোগ অতিরঞ্জিত এবং দেশত্যাগের অছিলা। তিনি মনে করতেন পূর্বপাকিস্তানের অবস্থা ক্রমেই স্বাভাবিক হবে। তাছাড়া পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে পূর্বপাকিস্তানের হিন্দুদের নিরাপত্তার জন্য কিছু ভাল ব্যবস্থাও নেওয়া যাবে। তার সঙ্গে পশ্চিমবাংলায় উদ্বাস্তুদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা যথাসম্ভব সীমিত করলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে হিন্দুদের দেশত্যাগ একেবারে বন্ধ করতে না পারলেও প্রায় বন্ধ করা যাবে।

১৯৪৬ সালের নোয়াখালি দাঙ্গার পর থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত পূর্বপাকিস্তানে কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি। আপাতদৃষ্টিতে পূর্বপাকিস্তানের অবস্থা স্বাভাবিক হচ্ছে বলে মনে হচ্ছিল। তাছাড়াও ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে আন্তঃডোমিনিয়ন সম্মেলন থেকে পাকিস্তান সরকারকে দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের নিরাপত্তার জন্য কিছু ভাল ব্যবস্থা গ্রহণ করানোও সম্ভব হয়েছিল। হিন্দরা নিরাপত্তার অভাব কিছুটা কম বোধ করছিল কিন্তু আশ্বস্ত হতে পারেনি। কারণ তখন পূর্বপাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি হিন্দুদের আশ্বস্ত হওয়ার মত ছিল না। উত্তম সরকারি ব্যবস্থা সত্ত্বেও মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষী দুষ্কৃতকারী হিন্দুদের নিরাপত্তা দারুণভাবে বিপন্ন করতে পারত। আর বাস্তবে তাই ঘটেছে। হিন্দুরা দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। এই বাস্তব সত্যকে নেহরু প্রায় অস্বীকার করেছেন এবং সম্ভবত তা করেছেন পশ্চিমবাংলায় উদ্বাস্তু সমস্যাকে ক্ষুদ্রাকৃতি করার জন্য তীব্র আগ্রহ থেকে।

পূর্ববাংলার হিন্দুদের দেশত্যাগ ও পশ্চিবাংলার উদ্বাস্তুদের জন্য ত্রাণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থার মধ্যে কোনো সম্পর্কই ছিল না। ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পশ্চিমবাংলায় উদ্বাস্তুদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য কোনো ব্যবস্থা ছিল না বললেই চলে। অথচ ১৯৪৯ সালের মধ্যে সরকারি হিসাব মত ১৬ লক্ষ এবং ১৯৫০ সালের প্রথম ছ'মাসে আরও কয়েক লক্ষ উদ্বাস্তু পশ্চিমবাংলায় চলে এসেছিল। ১৯৫০ সালে এপ্রিল মাসে নেহরু লিয়াকৎ চুক্তি স্বাক্ষরের পরে পূর্বপাকিস্তানে হিন্দুদের নিরাপত্তার অভাব কিছুটা কমে। আর দেশত্যাগ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। অথচ তখন পশ্চিমবাংলায় উদ্বাস্তুদের ত্রাণের জন্য একটা প্রণালীবদ্ধ ব্যবস্থা চালু হয়েছিল।

পাকিস্তান থেকে বাধ্য হয়ে যেসব হিন্দু ভারতের আসবে তাদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের যথাযোগ্য ব্যবস্থা ভারত সরকার করবে বলে দেশবিভাগের আগে কংগ্রেস নেতারা যে আশ্বাস দিয়েছিলেন একমাত্র তার উপর নির্ভর করেই পূর্বপাকিস্তান থেকে হিন্দুরা পশ্চিমবাংলায় এসেছে অন্য কিছুর উপরে নয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে পূর্বপাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে ভারত সরকারের নীতির নিম্নলিখিত সারসংক্ষেপ করা যায়।

— পূর্বপাকিস্তান থেকে হিন্দুদের ব্যাপক দেশত্যাগ, সম্ভব হলে দেশত্যাগই একেবারে বন্ধ করা।

— পূর্বপাকিস্তান থেকে যেসব শরণার্থী পশ্চিমবাংলায় এসেছে তাদের পূর্বপাকিস্তানে ফেরত পাঠানো।

— পূর্বপাকিস্তানের হিন্দুরা যাতে দেশত্যাগে উৎসাহিত না হয় এবং যারা দেশত্যাগ করে এসেছে তারা যাতে পূর্বপাকিস্তানে ফিরে যেতে আগ্রহী হয় তার দিকে লক্ষ্য রেখে পশ্চিমবাংলায় উদ্বাস্তুদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

— পাকিস্তান সরকার যাতে পূর্বপাকিস্তানের হিন্দুদের নিরাপত্তার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে তার জন্য পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে প্রয়োজনবোধে আলোচনা করা।

কেন্দ্র ও রাজ্যের কংগ্রেস সরকার এই নীতি অনুমান করেই পশ্চিমবাংলায় উদ্বাস্তুদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। তবে পূর্বপাকিস্তান থেকে হিন্দুদের দেশত্যাগ বন্ধ করতে তারা যতই ব্যর্থ হয়েছে পশ্চিমবাংলায় উদ্বাস্তুদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা ততই সীমিত কঠোর ও পীড়াদায়ক করার প্রবণতা তাদের মধ্যে বেড়েছে। এরফলে উদ্বাস্তুদের ক্রমাগত বেশি দুর্দশা ও লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে। তাদের পুনর্বাসন দারুণ বিলম্বিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অর্থের বিপুল অপচয় হয়েছে। এই নীতিকে উদ্বাস্তুরা তাদের নিপীড়নের হাতিয়ার বলে মনে করেছে। এই কারণেই কেন্দ্র ও রাজ্যের কংগ্রেস সরকারের সঙ্গে তাদের বিরোধ ক্রমাগত বেড়েছে। ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য যে সীমিত সুযোগ আদায় করা সম্ভব হয়েছে তা বজায় রাখার জন্য এবং নতুন সুযোগ আদায়ের জন্য তাদের অবিরাম কঠোর সংগ্রাম করতে হয়েছে। সমস্যা অসহনীয় হয়ে উঠলে তারা নিজেদের উদ্যোগেই তার সমাধানের চেষ্টা করেছে। আইন-কানুনের বিধিনিষেধ মানেনি। পুলিশ ও প্রশাসনকে অগ্রাহ্য করেছে।

পশ্চিমবাংলায় উদ্বাস্তুদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ এরই সাক্ষ্য বহন করেছে।

উদ্বাস্তুদের ত্রাণ ব্যবস্থা

একথা আগেই বলা হয়েছে ১৯৪৯ সালের শেষভাগ পর্যন্ত পূর্বপাকিস্তান থেকে হিন্দুদের দেশত্যাগ নিবারণ ও শরণার্থীদের পূর্বপাকিস্তানে প্রেরণ ছিল কেন্দ্র ও রাজ্যের কংগ্রেস সরকারের একমাত্র চিন্তা। স্বাধীনতার অল্প পরেই পশ্চিমবাংলার তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এই উদ্দেশ্যেই পূর্বপাকিস্তান সফর করেন। তিনি হিন্দুদের দেশত্যাগ না করতে এবং নিজেদের ভিটেমাটিতে থাকতে বলেন। তিনি তাদের আশ্বস্ত করেন পূর্বপাকিস্তানের পরিস্থিতি ক্রমেই স্বাভাবিক হবে এবং পাকিস্তান সরকার তাদের নিরাপত্তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

তথাপি কোনো শরণার্থী পূর্বপাকিস্তানে ফিরে গেল না। সেখান থেকে হিন্দুদের দেশত্যাগও বন্ধ হল না। এইসময়ে পূর্বপাকিস্তানে কোনো দাঙ্গা হয়নি। কিন্তু হিন্দুদের নিরাপত্তার বেশ অভাব ছিল। প্রধানত এই কারণেই হিন্দুরা দেশত্যাগ করছিল। বিত্তবান হিন্দুদের নিরাপত্তার অভাব ছিল অপেক্ষাকৃত বেশি। কারণ তাদের বিত্ত ও সম্পত্তির উপর কিছু স্বার্থান্বেষী মুসলমানের লোলুপ নজর ছিল। তদুপরি তাদের আশঙ্কা ছিল যে তারা পুরনো সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিপত্তি নিয়ে পূর্বপাকিস্তানের বসবাস করতে পারবে না। এই কারণেই বিত্তবান পরিবারের একটা বড় অংশ পশ্চিমবাংলায় চলে আসে। তথাপি দেশবিভাগজনিত নানাবিধ বাস্তব ও সম্ভাব্য আর্থ-সামাজিক কারণেও হিন্দুরা দেশত্যাগ করছিল। এই দেশত্যাগীদের মধ্যে

ছিল পূর্বপাকিস্তানের সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী যারা ভারতে চাকুরির জন্য অপশন দিয়েছিল, যেসব পরিবারের উপার্জনশীল ব্যক্তি কলকাতা ও শহরতলিতে থাকত কিন্তু পরিবারের অন্য সবাই থাকত পূর্বপাকিস্তানে এমন পরিবার, পশ্চিমবাংলার মুসলমানদের সঙ্গে সম্পত্তি বিনিময় করেছে পূর্বপাকিস্তানের এমন সব পরিবার ইত্যাদি। এদের পূর্বপাকিস্তানে ফিরে যাবার কোনো সম্ভাবনাই নেই।

নিরাপত্তার অভাবের জন্য অনেক স্বল্পবিত্ত ও নিঃসম্বল হিন্দুও দেশত্যাগ করে পশ্চিমবাংলায় চলে আসে। ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য তাদের সরকারি সাহায্য ছিল অপরিহার্য। অথচ তার কোনো ব্যবস্থা করা হল না। শিয়ালদহ স্টেশন ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ক্রমাগত তাদের ভিড় বাড়তে লাগল। ১৯৪৮ সালের প্রথমদিকে উপরোক্ত দুইধরনের কিছু সংখ্যক পরিবার অনন্যোপায় হয়ে যুদ্ধের সময় রিকুইজিশন করা সব বাড়ি এবং যুদ্ধের সময় তৈরি মিলিটারি ক্যাম্প খালি পড়ে ছিল সেগুলি দখল করে আশ্রয়ের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করে নেয়। পরবর্তীকালে সরকারের পক্ষ থেকে এইভাবেই শিয়ালদহ স্টেশনের উদ্বাস্তুদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়। পরে এইসব পরিবার ডোলও আদায় করে নেয়।

১৯৪৯ সালের শেষভাগ পর্যন্ত পশ্চিমবাংলায় উদ্বাস্তুদের ত্রাণের নামে একটা প্রহসন চলছিল। ১৯৪৯ সালের ১ ডিসেম্বর নেহরুকে লেখা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের চিঠি থেকে দেখা যায় যে ১৯৪৮-৪৯ ও ১৯৪৯-৫০ এই দুই বছরে পশ্চিমবাংলার উদ্বাস্তুদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ৩ কোটি টাকা অনুদান ও ৫ কোটি টাকা ঋণ মিলিয়ে মোট ৮ কোটি টাকা দিয়েছিল — অর্থাৎ দবছরে মাথাপিছু ২০ টাকা। আর ওই টাকা থেকেই মুষ্টিমেয় উদ্বাস্তুকে খাপছাড়াভাবে ক্যাশ ডোল দেওয়া হচ্ছিল।

যাহোক ১৯৪৮ সালের এপ্রিলে অনুষ্ঠিত আন্তঃডোমিনিয়ন সম্মেলনের পরে পূর্বপাকিস্তান থেকে দেশত্যাগ কমে গেল। কিন্তু শরণার্থীদের কেউ ফেরত গেল না।

সরকার তখন উদ্বাস্তুদের ওপর চাপ সৃষ্টির পথ গ্রহণ করল। আন্তঃডোমিনিয়ন সম্মেলনের মাস দুয়েক পরেই পশ্চিমবাংলার সরকার হঠাৎ ঘোষণা করল যেহেতু ওই সম্মেলনের পরে কোনো হিন্দু সাম্প্রদায়িক গোলযোগের দরুন দেশত্যাগ করেনি তাই ১৯৪৯ সালের ২৫ জুনের পরে আগত কোনো শরণার্থীকে আর উদ্বাস্তু বলে গণ্য করা হবে না এবং তাদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য কোনো সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে না। সরকারি হিসাব অনুযায়ী ১৯৪৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত পশ্চিমবাংলায় ১৯ লক্ষের কিছু বেশি উদ্বাস্তু এসেছিল। উপরোক্ত ঘোষণার দ্বারা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার মাত্র ১১ লক্ষ উদ্বাস্তুর ত্রাণ ও পুনর্বাসনের দায়িত্ব স্বীকার করে ভবিষ্যতে যারা পূর্বপাকিস্তান থেকে আসবে তাদের দায়িত্ব অস্বীকার করতে চেয়েছিল। শুধু তাই নয়, এর অল্প পরেই যেসব উদ্বাস্তু ক্যাশ ডোল পাচ্ছিল তাদের ক্যাশ ডোল বন্ধ করার হুমকি দেওয়া হয়। দক্ষিণ কলকাতার ক্যাম্পের উদ্বাস্তুরা এর প্রতিবাদ জানাবার জন্য মহাকরণ অভিযান সংগঠিত করে। পুলিশ যতীন দাস পার্কের কাছে মিছিলের পথ রোধ করে। উদ্বাস্তু ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। পুলিশ গুলি চালায়।

এই সময়ে উদ্বাস্তুদের প্রতি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের ঔদাসীন্য ও অবহেলার প্রতিবাদে পশ্চিমবাংলার জনমত ক্রমশ উত্তাল হয়ে ওঠে। সভা সমাবেশ, মিছিল ইত্যাদির মারফৎ কলকাতার বুদ্ধিজীবী, ছাত্র. যুব ও মহিলারা প্রতিবাদ জানাচ্ছিল। ফলে উপরোক্ত ঘোষণা দুটি কাগজপত্রেই থেকে যায়।

১৯৪৯ সালের মধ্যভাগে ডাঃ রায় পুনর্বাসন দপ্তরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অভিজ্ঞ প্রশাসক হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় রিলিফ কমিশনার নিযুক্ত হন। ডাঃ রায়ের নিরলস প্রচেষ্টার

ফলে কেন্দ্রীয় সরকার কিছু আর্থিক সাহায্য দিতে রাজি হয়। এসবের ফলে উদ্বাস্তুদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজে বিশৃঙ্খল অবস্থা দূর হতে থাকে।

১৯৫০ সালের জানয়ারি ফেব্রুয়ারিতে দুই বাংলায় সাম্প্রদায়িক গোলযোগের পরে পরিস্থিতি একেবারে বদলে গেল। তিন মাসের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে বেসরকারি মতে ১২/১৩ লক্ষ হিন্দু সীমান্তের নানা জায়গা দিয়ে বন্যাস্রোতের মত পশ্চিমবাংলায় চলে এল। এদের অধিকাংশ ছিল কৃষিজীবী এবং স্বল্পবিত্ত বা নিঃসম্বল। সরকারি সাহায্য ছাড়া এদের চলাই সম্ভব ছিল না। অথচ সরকারের পক্ষ থেকে শরণার্থীদের সীমান্তে অভ্যর্থনা করার জন্য ও তাদের ত্রাণের জন্য কোন ব্যবস্থাই ছিল না। তারা সারা রাজ্যে যে যেখানে পারল আশ্রয় গ্রহণ করল।

এই সাম্প্রদায়িক গোলযোগের জন্য পশ্চিমবাংলার সীমান্তবর্তী কয়েকটি জেলার অনেক মুসলমান পরিবার বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র পূর্বপাকিস্তানে চলে গিয়েছিল। সীমান্ত অতিক্রম করার পর কিছু সংখ্যক উদ্বাস্তু ঐ সব বাড়িঘরে আশ্রয় নিল। পূর্ব কলকাতায় এই ধরনের ঘটনা ঘটল। এর ফলে বাস্তুচ্যুত মুসলমানদের পুনর্বাসনের একটি নতুন সমস্যা সৃষ্টি হল। অন্যান্য শরণার্থীরা শিয়ালদহ স্টেশনে আবার ভিড় জমাতে শুরু করল।

যাহোক, শেষ পর্যন্ত কম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হল। ১৯৫০ সালের ২ মার্চ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মোহনলাল সাক্সেনা কলকাতায় এসে নবাগত শরণার্থীদের সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। তিনি জানান যে কেন্দ্রীয় সরকার এই উদ্বাস্তুদের শুধু ত্রাণের দায়িত্ব নেবে, পুনর্বাসনের কোন দায়িত্ব নেবে না। তিনি পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে বললেন যে শান্তি ফিরে এলে উদ্বাস্তুরা পূর্বপাকিস্তানে ফিরে যাবে। সুতরাং তাদের পুনর্বাসনের কোন প্রশ্ন উঠতেই পারে না। তিনি আরও বললেন যে আনুমানিক ২ লক্ষ শরণার্থী সরকারের উপর পুরোপরি নির্ভরশীল হবে। এদের মধ্যে ২৬,০০০ করে উদ্বাস্তুদের দায়িত্ব নেবে ত্রিপুরা ও ওড়িশা, বিহার ৫০,০৫০ আর বাদবাকি পশ্চিমবাংলা। তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সীমান্তবর্তী অঞ্চলে আশ্রয় শিবির খুলতে নির্দেশ দেন। সেই অনুযায়ী কুপার্স ক্যাম্পে ও ধুবুলিয়ায় দুটি বড় আশ্রয় শিবির খোলা হয়।

পশ্চিমবাংলার উদ্বাস্তুদের জন্য এই প্রথম একটা প্রণালীবদ্ধ ত্রাণ ব্যবস্থা চালু হল। বর্ডার স্লিপ নিয়ে সীমান্ত থেকে শিয়ালদহ স্টেশন। সেখান থেকে ট্রানজিট ক্যাম্প হয়ে ত্রাণ শিবির বা রিলিফ ক্যাম্প। কিন্তু ত্রাণ শিবিরগুলির অবস্থা হল ভয়াবহ। পঞ্চাশের দশকের সংবাদপত্রে গল্পে উপন্যাসে ক্যাম্পজীবনের মর্মান্তিক চিত্র বর্ণনা করা আছে। এখানে সে বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন।

ক্যাম্পের উদ্বাস্তুদের এই নারকীয় জীবনযাপনে বাধ্য করার জন্য আর যে কারণই থাক না কেন নবাগত উদ্বাস্তুদের ক্যাম্পে ভর্তি হওয়া থেকে যথাসম্ভব বিরত করা এবং দেশত্যাগ থেকে পূর্বপাকিস্তানের হিন্দুদের নিরস্ত করা এই দুটি কারণ অবশ্যই ছিল। পশ্চিমবাংলায় সীমান্তবর্তী অঞ্চলে রিলিফ ক্যাম্প খোলার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও ৭৬,০০০ উদ্বাস্তুকে সীমান্ত থেকে অনেক দূরে ওড়িশা ও বিহারে পাঠানোর পিছনেও এই দুটিই ছিল প্রধান কারণ। আর একটি কারণও ছিল। পশ্চিমবাংলায় উদ্বাস্তুরা তাদের দাবী নিয়ে প্রায়ই আন্দোলন করছিল। পশ্চিমবাংলাকে এই বিস্ফোরক জনতা থেকে যথাসম্ভব ভারমুক্ত করা ছিল অন্যতম কারণ।

১৯৫০ সালের পরেও শরণার্থী আগমন চলতেই থাকে। এই আগমনের হার কখনও বেড়েছে আবার কখনও কমেছে।

শরণার্থী আগমন বন্ধ করার জন্য ১৯৫৮ সালের প্রথমদিকে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করে যে ১৯৫৮ সালের ৩১ মার্চের পর পশ্চিমবাংলায় কোন শরণার্থী আসলে তাকে ত্রাণ

ও পুনর্বাসনের জন্য কোন সাহায্য দেওয়া হবে না। ১৯৫৮ সালের ১লা এপ্রিল থেকে ক্যাম্পে ভর্তি বন্ধ করে দেওয়া হল। সরকারি হিসাব অনুযায়ী তখন পর্যন্ত ৩১.৩২ লক্ষ উদ্বাস্তু পশ্চিমবাংলায় এসেছিল। এদের নাম দেওয়া হল ওল্ড মাইগ্রান্ট। এরা ছাড়া আর কেউ পশ্চিমবাংলায় ত্রাণ ও পুনর্বাসনের সাহায্য পাওয়ার অধিকারী থাকল না। তখন ক্যাম্পে উদ্বাস্তুর সংখ্যা ছিল ২.৭১ লক্ষ।

১৯৫৮ সালের জুলাই মাসে আর একটি ঘোষণায় কেন্দ্রীয় সরকার জানাল যে ক্যাম্পের সব পরিবারকে পুনর্বাসন দিয়ে ১৯৫৯ সালের ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে সমস্ত রিলিফ ক্যাম্প বন্ধ করে দেওয়া হবে। ১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বরে সমস্ত রিলিফ ক্যাম্প বন্ধ করে দেওয়া হল। পূর্বপাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের জন্য সরকারি ত্রাণপর্বের এখানেই যবনিকাপাত হল। মাত্র ১৪টি পি এল ক্যাম্প থাকল।

১৯৫৮ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত মোট ৭.৯২ লক্ষ উদ্বাস্তু অর্থাৎ ওল্ড মাইগ্রান্টদের মাত্র ২৫ শতাংশ পশ্চিমবাংলায় রিলিফ ক্যাম্পে ভর্তি হয়েছিল। তারাই শুধু ত্রাণের জন্য সরকারি সাহায্য পেয়েছে। ১৯৭৩ সালের শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবাংলায় উদ্বাস্তুদের ত্রাণের খাতে মোট ব্যয় হয়েছে ৬১ কোটি টাকা।

পুনর্বাসনের কাজ অযথা বিলম্বিত হবার দরুন উদ্বাস্তুদের ক্যাম্পজীবন অস্বাভাবিক দীর্ঘ হয়েছে। সরকার নিযুক্ত একটি তথ্যানুসন্ধান কমিটির সমীক্ষা থেকে দেখা যায় যে ১৯৫৪ সালে ক্যাম্পের ২৫ শতাংশ পরিবার ৬ মাস থেকে একবছর এবং ৭৫ শতাংশ পরিবার এক বছরের বেশি সময় ক্যাম্পে ছিল। পরে এই অবস্থার আরও অবনতি হয়েছিল। প্রতিটি পরিবারের পুনর্বাসনের কাজ ক্যাম্পে ভর্তি হবার ৬/৭ মাসের মধ্যে শেষ করতে পারলে ত্রাণের খাতে ব্যয় অর্ধেকেরও কম হত। সুতরাং পুনর্বাসনের অব্যবস্থার জন্য অন্যূন ৩০ কোটি টাকা অপচয় হয়েছে।

সরকারের পক্ষ থেকে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কোন সাহায্য পাবে না জেনেও ১৯৫৮ সালের ১ এপ্রিল থেকে ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সরকারি হিসাব অনুযায়ী মাত্র ৫৫,০০০ শরণার্থী পশ্চিমবাংলায় এসেছে। এদের কোন সরকারি নাম নেই।

১৯৬৪ ও ১৯৬৫ সালে শরণার্থী আগমনের হার অনেক বেড়ে যায়। এই শরণার্থীদের সম্পর্কে ভারত সরকার নিয়ম করল যে পশ্চিমবাংলার বাইরে গেলেই তাদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য সাহায্য দেওয়া হবে। পশ্চিমবাংলায় থাকলে তারা কোন সাহায্য পাবে না। তৎসত্ত্বেও ১৯৬৪ সালের ১ এপ্রিল থেকে ১৯৭১ সালের মার্চ পর্যন্ত ৬ লক্ষ শরণার্থী পশ্চিমবাংলায় আসে। এদের নাম দেওয়া হয় নিউ মাইগ্রান্ট।

১৯৭১ সালের মার্চে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার পরে আনুমানিক ১ কোটি হিন্দু মুসলমান পূর্বপাকিস্তান থেকে পশ্চিমবাংলায় চলে আসে। বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হবার পরে বাংলাদেশের হিন্দুদের নিরাপত্তার দায়িত্ব বাংলাদেশ সরকারের উপর বর্তায়। এই বিষয়ে ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ঐ চুক্তির পরে কিছু সংখ্যক হিন্দু ছাড়া মুক্তিযুদ্ধের সময় আসা সব শরণার্থীই বাংলাদেশে ফিরে যায়। বাংলাদেশ থেকে হিন্দুদের পশ্চিমবাংলায় আগমন বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু মুজিব হত্যার পর আবার দেশত্যাগ শুরু হয়। ১৯৭১ সাল থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে কত শরণার্থী পশ্চিমবাংলায় এসেছে তার কোন হিসাব সরকারি দলিলে পাওয়া যায় না। বেসরকারি হিসাব অনুযায়ী ৬ লক্ষ শরণার্থী পশ্চিমবাংলায় এসেছে।

উদ্বাস্তু সংগঠনগুলির ভূমিকা

পশ্চিমবাংলায় উদ্বাস্তুদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে উদ্বাস্তুদের স্থানীয়, আঞ্চলিক ও রাজ্যব্যাপী সংগঠনগুলি বাস্তবিকই সদর্থক ও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। এইসব সংগঠন সময়োচিত হস্তক্ষেপের ফলে উদ্বাস্তুরা অনেক লাঞ্ছনা ও হয়রানি থেকে অব্যাহতি পেয়েছে।

১৯৪৮ সালে উদ্বাস্তুরা কলকাতায় খালি বাড়ি ও মিলিটারি ক্যাম্প দখল করার পরেই একদিকে উচ্ছেদ বন্ধ করার জন্য অন্যদিকে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের দাবি আদায়ের জন্য স্থানীয় সংগঠন গড়ে তোলে। বৃহত্তর আন্দোলন গড়ার জন্য এইসব সংগঠন সম্মিলিত হয়ে নিখিল বঙ্গ বাস্তুহারা কর্মপরিষদ গঠন করে। প্রধানত এই সংগঠনের উদ্যোগ ও প্রেরণাতেই জবরদখল কলোনি গড়ার কাজ শুরু হয়। জমিদারদের গুণ্ডা ও পুলিশের উচ্ছেদের প্রচেষ্টা প্রতিহত করার জন্য প্রতিটি জবরদখল কলোনিতেই কমিটি এবং একাধিক আঞ্চলিক সংগঠন গড়ে ওঠে। ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত উদ্বাস্তু সমস্যা ছিল কলকাতা ও শহরতলি এবং অন্যান্য শহরের উদ্বাস্তুদের সমস্যা। ১৯৫০ সালে উদ্বাস্তুরা সারা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ল। বাস্তুচ্যুত মুসলমানদের সমস্যা সৃষ্টি হল। উদ্বাস্তু সমস্যা রাজ্যব্যাপী উদ্বাস্তুদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের সমস্যায় পরিণত হল। এইসব সমস্যায় সময়োচিত হস্তক্ষেপ করার জন্য এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসনের বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য উদ্বাস্তুদের একটি রাজ্যব্যাপী সংগঠন প্রয়োজন হয়ে পড়ল। প্রখ্যাত বিপ্লবী অম্বিকা চক্রবর্তী উদ্বাস্তুদের স্থানীয় ও আঞ্চলিক সংগঠনগুলিকে সম্মিলিত করে একটি রাজ্যব্যাপী সংগঠন গড়ার উদ্যোগ নেন। তাঁরই প্রচেষ্টার ফলে রাজ্যের প্রায় সব বামপন্থী দল এই উদ্যোগকে সমর্থন করে। এর ফলে ১৯৫০ সালের আগস্ট মাসে সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ (ইউ আর সি) গঠিত হয়। বামপন্থী আন্দোলনের খ্যাতনামা নেতারা এই সংগঠনের দায়িত্বপূর্ণ পদ অলংকৃত করেন। পূর্ববাংলা থেকে আগত উদ্বাস্তু এবং পশ্চিমবাংলার বাস্তুচ্যুত মুসলমান উদ্বাস্তু এই দুই ধরনের উদ্বাস্তুর সমস্যা সমাধানকে এই সংগঠন তার উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা করে। এই সংগঠন সমস্ত ধরনের উদ্বাস্তুর সমস্যায় হস্তক্ষেপ করেছে এবং তাদের সব আন্দোলনের পুরোভাগে থেকেছে। এর ফলে অচিরেই ইউ সি আর সি উদ্বাস্তুদের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী সংগঠন হয়ে ওঠে।

১৯৪৯ সালে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তরের ভার গ্রহণ করার পরেই উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সম্পর্কে চিন্তাভাবনা শুরু হয়। ক্যাম্প ও ক্যাম্পবহির্ভূত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের সম্পর্কে চিন্তা থাকলেও ক্যাম্পবাসী উদ্বাস্তুদের দায়মুক্ত হওয়ার জন্য তাদের পুনর্বাসনের উপর নজর ছিল বেশি। তখন কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ক্যাম্পগুলিতে ১২,৫০০ পুনর্বাসনযোগ্য পরিবার ছিল।

কিন্তু পুনর্বাসন সম্পর্কে সরকার কাজ শুরু করার আগেই বাসস্থানের তীব্র সংকট জর্জরিত কলকাতা ও শহরতলির কিছু সংখ্যক উদ্বাস্তু পরিবার জমিদার ও জমির ফাটকাবাজদের শহরতলির ফাঁকা জমি দখল করে তার উপর চালাঘর বেঁধে বাসস্থানের সমস্যা সমাধানের পথে পা বাড়ায়। ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাস থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে দক্ষিণ যাদবপুর টালিগঞ্জ থেকে শুরু করে উত্তরে নৈহাটি কাঁচড়াপাড়া পর্যন্ত এলাকায় ১৪৯টি জবরদখল কলোনি গড়ে ওঠে। জমির মালিকরা ভাড়াটিয়া গুণ্ডা এবং পুলিশ ও প্রশাসনের সাহায্যে জবরদখলকারীদের উচ্ছেদ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। তাদের এই চেষ্টা সফল হয় না। তখন সরকার আইনের সাহায্যে উচ্ছেদের পথে অগ্রসর হয়। এজন্য একটি নতুন আইন প্রণয়নের চেষ্টা হয়। উদ্বাস্তুরা এই আইন প্রণয়নের বিরোধিতা করে এবং কলোনিগুলির স্বীকৃতি অর্থাৎ দখলিকৃত জমি উদ্বাস্তুদের মধ্যে বণ্টন করার দাবি জানায়। শেষপর্যন্ত যে

আইন পাশ হয় তাতে বলা হয় যে ১৯৫০ সালের মধ্যে যেসব উদ্বাস্তু জমি দখল করেছে তাদের জীবিকার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিকল্প পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে উচ্ছেদ করা হবে। ১৯৫০ সালের পরের জবরদখলকারিদের সরাসরি উচ্ছেদ করা হবে। দীর্ঘ চার বছরব্যাপী আন্দোলনের পরে সরকার এই জবরদখলকলোনীগুলোকে স্বীকৃতি দেয়। অর্থাৎ দখলিকৃত জমি হুকুমদখল করে উদ্বাস্তুদের দিতে রাজি হয়। এই ১৪৯টি কলোনির পরিবার সংখ্যা প্রায় ৩০,০০০।

উপরোক্ত আইনে উচ্ছেদের হুমকি থাকা সত্ত্বেও ১৯৫০ সালের পরেও রাজ্যের প্রায় সর্বত্র জবরদখল কলোনি গড়ে উঠতে থাকে। সত্তরের দশক পর্যন্ত এগুলির সংখ্যা ছিল ৭৬৬ ও পরিবার ছিল ৭১,০০০। এ সব কলোনি প্রধানত সরকারি জমিতে গড়ে উঠেছে বলে এগুলির উপর হামলা কম হয়েছে। মোট কথা হল, সত্তরের দশক পর্যন্ত ৯১৫টি জবরদখল কলোনিতে ১ লক্ষের কিছু বেশি উদ্বাস্তু পরিবার কোন সরকারি সাহায্য ছাড়াই সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগে মাথা গোঁজার মত একটা ব্যবস্থা করে নিয়েছে। সত্তরের দশকের পরেও এই ধরনের কলোনি গড়া বন্ধ হয়নি। তাছাড়াও রাজ্যের সর্বত্রই রেল লাইন ও সড়কের ধারে, নদী ও খালের বাঁধের উপর বহু সংখ্যক জবরদখলকারী কুঁড়েঘর বেঁধে বসবাস করছে। এদের সংখ্যা কত কেউ জানে না।

সরকারি পুনর্বাসন ব্যবস্থা

সরকারি ত্রাণ ব্যবস্থার মত পুনর্বাসন ব্যবস্থারও প্রধান লক্ষ্য ছিল পূর্বপাকিস্তান থেকে হিন্দুদের দেশত্যাগ নিবারণ। আমাদের দেশ ছিল যুগ যুগ ধরে অনগ্রসর। তার উপর দেশ বিভাজনের ফলে পশ্চিমবাংলার আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি বেশ খানিকটা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এই ধরনের একটা পরিস্থিতিতে চাষযোগ্য ও বাসযোগ্য জমি সংগ্রহের যথাসম্ভব প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপকভাবে পতিত ও অনাবাদী জমির উদ্ধার, কুটির ছোট ও মাঝারি শিল্প সমেত কিছুসংখ্যক উপনগরী স্থাপন, শহরাঞ্চলের স্বল্পবিত্তদের জন্য ব্যাপক গৃহনির্মাণ ইত্যাদি মারফৎ রাজ্যের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার দর্বলতা দূর করার একটা সামগ্রিক পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করলেই উদ্বাস্তুরা জীবিকার একটা ন্যূনতম সংস্থান করে নতুন জীবন গড়ার সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারত। উদ্বাস্তুদের জীবিকায় প্রতিষ্ঠিত করাই হত এই দৃষ্টিভঙ্গির মূল বিষয়। সরকারের হয়ত আশঙ্কা ছিল যে পুনর্বাসনের এই ধরনের ব্যবস্থার কথা জানতে পারলে পূর্বপাকিস্তানের হিন্দুরা দলে দলে পশ্চিমবাংলায় চলে আসতে উৎসাহিত হবে। তাই এই ধরনের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গৃহীত হল না।

একটা যেমন তেমন বাড়ি তৈরি করার জন্য কিছু ঋণ এবং অকৃষিজীবীদের কিছু ব্যবসায় ঋণ ও কৃষিজীবীদের জমি, হালবলদ কেনার জন্য কিছু ঋণ দিয়ে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কাজ শেষ করা — এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করেই ১৯৪৯ সাল থেকে পশ্চিমবাংলায় উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের যাবতীয় ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। পুনর্বাসনের জন্য বাসস্থানই ছিল মুখ্য, জীবিকা নিতান্তই গৌণ। অর্থব্যয়ই ছিল পুনর্বাসনের অগ্রগতির মাপকাঠি। পরিবারগুলি জীবিকায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারল কি না তা দেখার কোন বালাই ছিল না।

গ্রামাঞ্চলের পুনর্বাসনের জন্য পরিবারদের অকৃষিজীবী ও কৃষিজীবী এই দুই প্রধান ভাগ করে অকৃষিজীবী পরিবার পিছু ১২২৫ টাকা এবং কৃষিজীবী পরিবার পিছু ১৯৭৫ টাকা সর্বোচ্চ ঋণ ধার্য করা হল। এই ঋণ ছিল প্রয়োজনের তুলনায় কম। চাষের জমির সর্বোচ্চ ঋণ ধার্য করা হল বিঘা প্রতি ১০০ টাকা। ঐ দামে তখন চাষের জমি পাওয়া যেত না। পুনর্বাসনে কাজ বিলম্বিত হতে লাগল।

সরকারি ঋণ নিয়ে কেনা অথবা সরকার থেকে দেওয়া বাস্তুজমিতে উদ্বাস্তুদের পাঠিয়ে দেওয়া হত। বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ ঋণ তারা পেত কয়েক কিস্তিতে অনেকদিনের ব্যবধানে। জমিতে যাবার পর তাদের দেখাশোনা করার জন্য কেউ ছিল না।

উপরোক্ত মাত্রার ঋণের ভিত্তিতে পুনর্বাসনের কয়েকটি প্রকল্প চালু করা হল। এগুলির অন্যতম ইউনিয়ন বোর্ড স্কিম অল্পসংখ্যক উদ্বাস্তু পরিবারকে এক একজন ইউনিয়ন বোর্ড প্রেসিডেন্টের জিম্মায় পাঠিয়ে দেওয়া হত। জমি দেওয়ার দায়িত্ব ছিল প্রেসিডেন্টের। তাদের অনেকে জমি দিতে পারত না আর দিতে পারলে তা হত চাষের অযোগ্য। অন্য একটি প্রকল্প ভেরিয়েন্ট ইউনিয়ন বোর্ড স্কিমে কোন জমির মালিক উদ্বাস্তুদের বাস্তুজমি বিক্রি করতে রাজি একথা সরকারকে জানালে অকৃষিজীবী পরিবারদের সরকার সেই জমিতে পাঠাত। অসাধু জমির মালিক ও দালালরা লাভের আশায় একসঙ্গে অনেক পরিবারকে নিকৃষ্ট ধরনের জমিতে নিয়ে যেত। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার রামচন্দ্রপুর মৌজায় একসঙ্গে ১১০০ পরিবারকে পাঠিয়ে সবাইকে ব্যবসায়ী ঋণ দেওয়া হল। সবাই বিক্রেতা, ক্রেতা কেউ নেই। অপর একটি প্রকল্প টাইপ স্কিমে অকৃষিজীবী ও কৃষিজীবী পরিবার সরকারি ঋণ নিয়ে সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে পুনর্বসানের চেষ্টা করত। এদের মধ্যে একাংশ পরিবার যৌথ প্রচেষ্টায় অনেক কলোনিও গড়েছে। এগুলিই প্রাইভেট কলোনি নামে পরিচিত। আর একটি প্রকল্পে সরকার জমি ও অন্যান্য ঋণ দিয়ে অকৃষিজীবী ও কৃষিজীবী পরিবারদের নতুন কতকগুলি কলোনি গড়ে তুলেছে। এগুলিকেই সরকারি কলোনি বলা হত।

এই ধরনের পুনর্বাসনের যে পরিণাম অবধারিত ছিল তাই হল। এইসব প্রকল্পে যেসব পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য পাঠানো হয়েছিল, জীবিকার কোন ব্যবস্থা করতে না পেরে অল্পদিনের মধ্যেই বাড়ি বিক্রি করে তারা পুনর্বাসনের স্থানত্যাগ করে কলকাতা ও অন্যান্য জায়গায় চলে আসতে লাগল। ক্যাম্পের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনেও আশানুরূপ অগ্রগতি হচ্ছিল না। বিহার ও ওড়িশার ক্যাম্পে যেসব উদ্বাস্তুদের পাঠানো হয়েছিল তাদের মধ্যে কেউ কেউ পুনর্বাসনের কোন ব্যবস্থা না দেখে সেখান থেকে চলে আসতে লাগল। এইসব মিলিয়ে একটা চরম বিশৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টি হল।

এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবাংলায় পুনর্বাসনের কাজের সমীক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫২ সালের নভেম্বর মাসে একটি তথ্যানুসন্ধান কমিটি গঠন করে। এই কমিটি ১৯৫৩ সালে মন্ত্রী পর্যায়ের একটি কমিটির কাছে তাদের রিপোর্ট পেশ করে।

পশ্চিমবাংলায় পুনর্বাসনের কাজে যে বিশৃঙ্খল অবস্থা চলছিল তা দেখে এই সময়েই ইউ সি আর সি-ও একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। এই কমিটি কয়েকমাস অক্লান্ত পরিশ্রম করে পুনর্বাসন সম্পর্কে সরকারি ব্যবস্থার একটি মূল্যায়ন সহ এবং পুনর্বাসনের কাজ সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার জন্য কতকগুলি সুপারিশ করে একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করে। ঐ রিপোর্ট সরকার ও তথ্যানুসন্ধান কমিটিকে দেওয়া হয়। তথ্যানুসন্ধান কমিটি কর্তৃক রিপোর্টটি প্রশংসিত হয়। ঐ রিপোর্টের সমীক্ষার ফলাফল ও সুপারিশ অনেকক্ষেত্রেই তথ্যানুসন্ধান কমিটির সমীক্ষার ফলাফল ও সুপারিশের অনুরূপ ছিল।

তথ্যানসন্ধান কমিটির সমীক্ষায় পশ্চিমবাংলায় উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের এক চরম অসন্তোষজনক চিত্র প্রকাশিত হয়। ঐ সমীক্ষা থেকে দেখা যায় যে ১৯৫২ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মোট ৭ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়ে ১,৮৯,১২৫টি পরিবারকে পুনর্বাসনে পাঠানো হয়েছিল। তাদের মধ্যে ১১.৩ শতাংশ পরিবার পুনর্বাসনের স্থান ত্যাগ করে চলে এসেছে এবং মাত্র ১৪ শতাংশ পরিবার মোটের উপর স্বাবলম্বী হয়েছে।

যা হোক তথ্যানুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট বিবেচনা করে মন্ত্রী কমিটি ১৯৫৪ সালে তার

রিপোর্ট প্রকাশ করে। ঐ রিপোর্টে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করা হয়। তার মধ্যে কয়েকটি ছিল ঃ পশ্চিমবাংলার সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনা হিসাবেই উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের প্রকল্পগুলি তৈরি করতে হবে, উদ্বাস্তুদের শ্রমের সাহায্যে পতিত ও অনাবাদী জমি উদ্ধার করে কৃষিজীবী পরিবারদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে, এই ধরনের প্রকল্পে যত সংখ্যক পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হবে তাদের নিয়েই ওয়ার্কসাইট ক্যাম্প খুলতে হবে, ১৯৪৬ সালের জমি একুইজিশন করার আইনগত বাধা দূর করার জন্য সংবিধান সংশোধন করতে হবে বাস্তুজমি ও কৃষিজমি ক্রয়ের জন্য ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে, অন্যান্য রাজ্যে ব্যাপক সংখ্যক উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করতে হবে।

মন্ত্রী কমিটির সুপারিশগুলি পশ্চিমবাংলায় পরিকল্পনামাফিক উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কাজের একটা বাস্তব ভিত্তি তৈরি করে। এর ফলে সরকার উদ্বাস্তু ও উদ্বাস্তু সংগঠনগুলির একটা সম্মিলিত প্রয়াসের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়। উদ্বাস্তুদের মধ্যে দারুণ উৎসাহের সৃষ্টি হয়, হেড়োভাঙ্গা, বাগজোলা ও অন্যান্য কয়েকটি ভূমি উন্নয়ন প্রকল্প অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে অগ্রসর হতে থাকে। নতুন প্রকল্প গ্রহণ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা হতে থাকে। কিন্তু এই পরিস্থিতি দীর্ঘস্থায়ী হল না।

১৯৫৫ ও ১৯৫৬ সালে পূর্বপাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু আগমনের হার আবার হঠাৎ বাড়তে থাকে। কারণ ছিল পূর্বপাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির অবনতি। কিন্তু সরকারের ধারণা হল যে মন্ত্রী কমিটির সুপারিশগুলির জন্য বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার বাইরে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করার সুপারিশের জন্যই উদ্বাস্তু আগমন বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং মেহের চাঁদ খান্না ঘোষণা করলেন যে নতুন উদ্বাস্তু আগমনের ফলে পরিস্থিতি বদলে গেছে। তাই মন্ত্রী কমিটির উপরোক্ত সুপারিশ মানা যাবে না। পনর্বাসনের জন্য উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবাংলার বাইরে যেতেই হবে। মন্ত্রী কমিটির সুপারিশগুলি আন্তরিকভাবে কার্যকর করার আগেই রিপোর্টটি হিমঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হল। পশ্চিমবাংলায় উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কাজ আবার সেই গতানুগতিকভাবে চলতে লাগল।

এই সময়ের কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করল যে পূর্বপাকিস্তান থেকে আগত বহুসংখ্যক উদ্বাস্তু পরিবারকে একত্রে পুনর্বাসনের জন্য প্রায ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে দণ্ডকারণ্যে একটি পরিকল্পনা গ্রহণের সিদ্ধান্ত তারা নিয়েছে। এই পরিকল্পনায় উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবাংলা থেকে বেশি হারে পুনর্বাসনের সাহায্য দেওয়া হবে। ১৯৫৮ সালের জুলাই মাসে খান্না ঘোষণা করলেন যে পশ্চিমবাংলার ক্যাম্পগুলিতে তখন যে ৪৫,০০০ পরিবার ছিল তাদের মধ্যে ১০,০০০ পরিবারকে পশ্চিমবাংলায় এবং ৩৫,০০০ পরিবারকে দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসন দেওয়া হবে।

অথচ দণ্ডকারণ্য উন্নয়নের থেকে অনেক কম ব্যয়ে ও সময়ে পশ্চিমবাংলায় যে সব ভূমি উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ চলছিল এবং আরও যে সব প্রকল্প গ্রহণের কথা চলছিল সেগুলি শেষ করে ক্যাম্পের ৪৫,০০০ পরিবারকে পশ্চিমবাংলার মধ্যেই পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব ছিল। বস্তুতপক্ষে ১৯৫৮ সালের আগস্ট মাসে ইউ সি আর সি-র পক্ষ থেকে "পশ্চিমবাংলায় ক্যাম্প উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য বিকল্প প্রস্তাব" শীর্ষক একটি সুচিন্তিত দলিলে এই ধরনের একটি পরিকল্পনা দেওয়া হয়েছিল। দলিলটি খান্নাকে দেওয়া হয়। খান্না দলিলটি উল্টেও দেখেন না।

দণ্ডকারণ্য সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্য জানার পরে এবং পশ্চিমবাংলার বাইরে পুনর্বাসনের তিক্ত অভিজ্ঞতার দরুন উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা সম্পর্কে গভীর সন্দেহ হয়। তথাপি

তারা দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার বিরোধিতা করেনি। তারা খান্নাকে প্রস্তাব দেয় যে উদ্বাস্তুদের কয়েকজন প্রতিনিধিকে দন্ডকারণ্য পরিকল্পনার এলাকা দেখে আসার জন্য পাঠানো হোক। ঐ প্রতিনিধিদের কাছ থেকে বিস্তারিত তথ্য জানার পরে যারা স্বেচ্ছায় দণ্ডকারণ্য যেতে চাইবে তাদেরই সেখানে নেওয়া হোক। অন্যদের পশ্চিমবাংলার মধ্যেই পুনর্বাসন দেওয়া হোক। খান্না এই প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করলেন। উদ্বাস্তুদের সন্দেহ আরও বেড়ে গেল। যাদের জন্য পরিকল্পনা তাদের তা দেখতে দিতে আপত্তি কেন?

উদ্বাস্তুদের জোর-জবরদস্তি করে দণ্ডকারণ্যে নিয়ে যাবার চেষ্টা শুরু হল। দণ্ডকারণ্যে যেতে অনিচ্ছুক পরিবারদের ডোল বন্ধ করা হল। এই জোর জবরদস্তির বিরুদ্ধে উদ্বাস্তুরাও আইন অমান্য অন্দোলন শুরু করল। তিনমাস আন্দোলনের পরে সরকার আশ্বাস দিল যে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন পরিবারকে দণ্ডকারণ্যে নেওয়া হবে না। অথচ কিছুদিন পরেই সরকার ঘোষণা করল যে ক্যাম্পের সব কৃষিজীবী পরিবারকেই দুমাসের মধ্যে এক হয় দণ্ডকারণ্যে যেতে হবে আর না হয় পুনর্বাসন সাহায্য হিসাবে ৬ মাসের ডোল নিয়ে ক্যাম্প ছেড়ে চলে যেতে হবে। এর পরে অনেক পরিবার দণ্ডকারণ্যে চলে গেল। কিন্তু ১০,০০০ পরিবার দণ্ডকারণ্যে গেল না, ৬ মাসের ডোলও নিল না। তারা ক্যাম্পের জমিতেই বাস করতে লাগল। ১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বরে সব ক্যাম্প বন্ধ করে দেওয়া হল। তারপরেই ঘোষণা করা হল যে পশ্চিমবাংলায় পুনর্বাসনের কাজ শেষ হয়ে গেছে। তবে কিছু কাজ বকেয়া আছে। তার জন্য ২২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হল। সরকারি আদেশে ১৯৫৮ সালের মার্চ পর্যন্ত পূর্বপাকিস্তান থেকে আগত যে ৩১.৩২ লক্ষ ওল্ড মাইগ্রান্টকে পুনর্বাসন সাহায্য লাভের অধিকারী করা হয়েছিল। এইভাবেই তাদের পুনর্বাসনের কাজের সমাপ্তি ঘোষণা করা হল।

অথচ তখন ওল্ড মাইগ্রান্টদের মধ্যেই বহু ক্যাম্প বহির্ভূত পরিবারের সাহায্যের দরখাস্ত মঞ্জুর করা, জবরদখল, বেসরকারি ও সরকারি কলোনীর পরিবারদের জমির দলিল দান, ঐ সব কলোনির উন্নয়ন এবং সর্বোপরি পুনর্বাসন সাহায্য পেয়েও যে সব পরিবার জীবিকায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে স্বাবলম্বী হতে পারেনি তাদের জীবিকায় প্রতিষ্ঠিত করার মত অনেক কাজই বাকি পড়ে ছিল। অর্থাৎ পুনর্বাসনের কাজ যতটা হয়েছিল বাকি পড়েছিল তার থেকে অনেক বেশি।

উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের দায়িত্ব এড়ানোর এই কৌশলের বিরুদ্ধে শুধু সমস্ত অংশের উদ্বাস্তুরাই নয়, পশ্চিমবাংলার সব রাজনৈতিক দলও তীব্র প্রতিবাদ জানায়। আর উদ্বাস্তুরা এর বিরুদ্ধে সাধ্যমত আন্দোলনও করে। ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবাংলায় যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে কেন্দ্রীয় সরকারের বকেয়া কাজের তত্ত্ব নস্যাৎ করে, উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য ২৩৫ কোটি টাকার একটি কর্মসূচী কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে উপস্থিত করে। ১৯৭৩ সালে তদানীন্তন কংগ্রেস সরকার উদ্বাস্তুদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের জন্য ১৫০ কোটি টাকার একটি মাস্টার প্ল্যান কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পেশ করে। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য সপ্তম অর্থ কমিশনের কাছে ৫০০ কোটি টাকা অনুদানের দাবি জানায়। ১৯৬১ সালের পর থেকে কেন্দ্রীয় সরকার সম্ভবত এই মনোভাব নিয়ে চলছিল যে, সময়ই সব সমস্যার সমাধান করে দেবে। তাই ছয় বছর পরে ১৯৬৭ সালের জানুয়ারি মাসে বকেয়া কাজ আবার খতিয়ে দেখার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার একটি রিভিউ কমিটি গঠন করল। দীর্ঘ ৭ বছর ধরে কাজ করে এই কমিটি ২০টি রিপোর্ট তৈরি করল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সেগুলি সম্পর্কে কোন ব্যবস্থাই নিল না। আর রাজ্য সরকার খুব বেশি পীড়াপীড়ি করলে থেকে কিছু অর্থ বরাদ্দ করে দায় সারতে লাগল। শেষ পর্যন্ত পার্লামেন্টের ভিতরে ও বাইরে প্রবল আন্দোলনের চাপে পুনর্বাসনের বকেয়া কাজ খতিয়ে দেখে সেগুলি শেষ করার আনুমানিক ব্যয় সম্পর্কে

সুপারিশ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৭৫ সালে একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করল। ওয়ার্কিং গ্রুপ বকেয়া কাজ শেষ করার জন্য ৭২.৭১ কোটি টাকা ব্যয়ের সুপারিশ করে ১৯৭৬ সালে রিপোর্ট পেশ করল। ঐ রিপোর্ট বিচার করে কেন্দ্রীয় সরকার মাত্র কয়েক বছর আগে বকেয়া কাজ শেষ করার জন্য ৭৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। এর বেশির ভাগটাই জবরদখল, বেসরকারি ও সরকারি কলোনির উন্নয়নের জন্য। ছোট ও প্রান্তিক চাষীদের জীবিকায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উদ্বাস্তু অধ্যুষিত জেলার ৯টি প্রকল্প ৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

১৯৭৩ সাল থেকেই কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দপ্তর এই মত পোষণ করে আসছে যে উদ্বাস্তুদের প্রদত্ত জমির মালিকানা স্বত্বের দলিল দেওয়া হলেই তারা রাজ্যের মূলস্রোতের অঙ্গীভূত হয়ে গেছে বলে গণ্য করতে হবে। ওয়ার্কিং গ্রুপ এই মত মেনে উদ্বাস্তুদের জীবিকায় প্রতিষ্ঠিত করার কোন পৃথক প্রকল্পের জন্য অর্থবরাদ্দ করেনি। অর্থাৎ এখন থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রকল্পের মারফৎই উদ্বাস্তুদের জীবিকায় প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব রাজ্য সরকারকেই নিতে হবে। ঐ সব প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে যেটুকু সাহায্য আদায় করা যাবে তাই নিয়েই তাদের এই দায়িত্ব পালন করতে হবে।

যা হোক, ওয়ার্কিং গ্রুপের রিপোর্ট থেকে ১৯৭৫ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত পশ্চিমবাংলায় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য যে ব্যয় হয়েছে তার একটা হিসাব পাওয়া যায়। তাতে দেখা যায় যে গ্রামাঞ্চলে ১.৩৬ লক্ষ কৃষিজীবী ও ২.৪৮ লক্ষ অকৃষিজীবী পরিবারকে এবং শহরাঞ্চলে ১.৩৯ লক্ষ অকৃষিজীবী পরিবারকে মোট ৫.৩২ লক্ষ পরিবারকে গৃহনির্মাণ ও অন্যান্য খাতে সর্বসাকুল্যে ৫৮.৯৩ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ৬.২৬ লক্ষ ওল্ড মাইগ্রান্ট পরিবারের মধ্যে প্রায় ৮৩.৫ শতাংশ পুনর্বাসনের জন্য সরকারি সাহায্য পেয়েছে। তাছাড়াও জমি একুইজিশনের জন্য ও উন্নয়নের জন্য ১৫.৩৮ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। এর সঙ্গে শিক্ষা স্বাস্থ্য ইত্যাদি খাতে ব্যয় যোগ করলে মোট ব্যয় হয়েছে ১১৯ কোটি টাকা।

ওয়ার্কিং গ্রুপের সুপারিশ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার এরপরেও আরও প্রায় ৮০ কোটি টাকা দিয়েছে। এই টাকা ব্যয় হলে পশ্চিমবাংলায় উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য সর্বমোট ব্যয় হবে প্রায় ২০০ কোটি টাকা। এই সাহায্য পেতে উদ্বাস্তুদের অবস্থা কি হয়েছে সে সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার কোন সমীক্ষা করেনি। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ১৯৭৮ সালে যে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন কমিটি গঠন করেছিল তার একটি সমীক্ষা থেকে এর একটা চিত্র পাওয়া যায়। পুনর্বাসন কমিটি ১৯৮০ সালে রাজ্যের উদ্বাস্তু সংখ্যা নিরূপণ করে ৮০ লক্ষ। অর্থাৎ ১৬ লক্ষ পরিবার। উদ্বাস্তু পুনর্বাসন কমিটির সমীক্ষায় উদ্বাস্তুদের আর্থিক অবস্থার কয়েকটি দিক নিয়ে ৫.২৫ লক্ষ পরিবারের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

সমীক্ষার ফলাফল থেকে দেখা যায় যে মাত্র ১৭ শতাংশ পরিবার সরকারের কাছ থেকে পুনর্বাসনের জন্য সাহায্য পেয়েছে এবং ৮৩ শতাংশ পরিবার পুনর্বাসন সাহায্য হিসাবে সরকারের কাছ থেকে কোন জমি বা অর্থ পায়নি। সমীক্ষার ফলাফল থেকে এটাও দেখা যায় যে ৬৬ শতাংশ পরিবারের মাসিক আয় ১০০ থেকে ৫০০ টাকার মধ্যে। ২৭ শতাংশ পরিবারের মাসিক আয় ১০০ টাকারও কম। অর্থাৎ ৯৩ শতাংশ উদ্বাস্তু পরিবারের অবস্থানই দারিদ্র্যসীমার নিচে। মাত্র ৭ শতাংশ পরিবারের মাসিক আয় ৫০০ টাকা বা তার বেশি। এরা মোটামুটি স্বাবলম্বী বলা চলে।

স্বাধীনতার পর ৫০ বছর ধরে উদ্বাস্তুদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য প্রায় ৩০০ কোটি টাকা ব্যয় করে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার যে সব খাপছাড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এই তার পরিণাম।

দেশ বিভাগের দরুন পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবাংলায় আগত উদ্বাস্তুর সংখ্যা এখন হয়েছে ৮০ লক্ষেরও বেশি। কংগ্রেস নেতারা ক্ষমতায় এসে আগের প্রতিশ্রুতি খেলাপ করে

তাদের ৬০ শতাংশের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের দায়িত্ব অস্বীকার করেছে। এই ৬০ শতাংশ উদ্বাস্তু ৫০ বছর ধরে তাদের জীবন সংগ্রাম চালিয়ে গেল কিভাবে? আত্মীয়ের মত উদ্বাস্তুদের দুহাত বাড়িয়ে গ্রহণ করার জন্য গান্ধীজি স্বাধীনতার অল্প আগেই পশ্চিমবাংলার মানুষের কাছে আবেদন করেছিলেন। তারা উদারভাবে এই আবেদনে সাড়া দিয়েছে বলেই ঐ হতভাগ্য মানষগুলি জীবনসংগ্রাম চালিয়ে যেতে পেরেছে। পশ্চিমবাংলার মানুষ রাজ্যের যাবতীয় সম্পদ উদ্বাস্তুদের সঙ্গে মিলেমিশে ভোগ করছে। তা নিয়ে বিগত ৫০ বছরে স্থানীয় মানুষের সঙ্গে উদ্বাস্তুদের বিরোধ বা সংঘাতের কোন ঘটনা অতি বড় ছিদ্রান্বেষীরাও খুঁজে বের করতে পারেনি। উদ্বাস্তুরাও তাদের শ্রম ও দক্ষতা দিয়ে পশ্চিমবাংলার সম্পদ বৃদ্ধির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। অমানুষিক পরিশ্রম করে তারা পতিত ও অনাবাদী জমি চাষযোগ্য করেছে। তাতে নানা ধরনের ফসল ফলিয়ে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করেছে। বহুবিধ কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে তুলেছে। উদ্বাস্তুরা পুনর্বাসনের জন্য তাদের কঠোর সংগ্রামের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছে যে পশ্চিমবাংলার সামগ্রিক উন্নয়ন হলেই তাদের পুনর্বাসনের প্রচেষ্টা সফল হবে। পশ্চিমবাংলার উন্নয়নের জন্য অভিন্ন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তারা দ্রুত পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক দলগুলির অনেক দায়িত্বশীল কর্মী উদ্বাস্তুদের মধ্য থেকেই আসছে। সর্বস্তরে নির্বাচিত সংস্থাগুলিতেও তারা নির্বাচিত হচ্ছে।

সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশ বিভাগের ফলে শুধু পূর্বপাকিস্তান থেকে হিন্দুরাই দেশত্যাগ করে পশ্চিমবাংলায় আসেনি পশ্চিমবাংলা থেকে মুসলমানরাও কিছু কম সংখ্যায় দেশত্যাগ করে এখনকার বাংলাদেশে চলে গেছে। এই দেশবিভাগ এপার বাংলা ওপার বাংলার ১ কোটিরও বেশি মানুষকে ভিটেমাটি ছাড়া করেছে। এক বাংলার মানুষ অন্য বাংলায় গিয়ে উদ্বাস্তুদের অভিশপ্ত জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়েছে। দেশ বিভাগের চরম আঘাত তাদেরই সহ্য করতে হচ্ছে। উদ্বাস্তু সমস্যা দুই বাংলারই সমস্যা। দেশ বিভাগ দুই বাংলার আর্থ সামাজিক জীবনকে বিপর্যস্ত করে দিয়ে দুই বাংলার সব মানুষের উপরেও বড় আঘাত দিয়েছে। বিগত ৫০ বছর ধরে দুই বাংলাই এই আঘাত সামলানোর জন্য চেষ্টা করেছে এবং কিছুটা সফলও হয়েছে। কিন্তু দুই বাংলার মধ্যে মৈত্রীর সম্পর্ক গড়ে উঠলে ও বজায় থাকলে এই আঘাত আরো বেশি সামলানো যেত। দুই বাংলা থেকে সংখ্যালঘুদের এত বেশি দেশত্যাগ হয়তো ঘটত না। পাকিস্তানী শাসকরা এই সম্পর্ক গড়ে উঠতে দেয়নি। বাংলাদেশ গঠনের পর তার উজ্জ্বল সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল। ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী গড়ে তোলার জন্য কিছু পদক্ষেপও নেওয়া হয়েছিল। ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি স্বাক্ষরের পরে বাংলাদেশ থেকে হিন্দুদের দেশত্যাগ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নকরা বঙ্গবন্ধুকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করার পরে সেই সম্ভাবনা বিলীন হয়ে যায়। আবার সংখ্যালঘুদের দেশত্যাগ শুরু হয়। সাম্প্রতিক নির্বাচনে বাংলাদেশে রাজনৈতিক পালাবদলের পরে ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী গড়ে তোলার নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। গঙ্গার জলবণ্টন নিয়ে ভারত-বাংলাদেশ চুক্তির মত আশাব্যঞ্জক ঘটনাও ঘটেছে। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি করা, যাতায়াত সহজ করা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা চলছে। এই আলোচনা সফল হলে দুই বাংলাই সব থেকে বেশী লাভবান হবে। দুই বাংলার সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার অভাব অনেকটা দূর হবে। তারা নিজের দেশে নিজের ভিটেমাটিতেই থাকতে পারবে। নতুন করে দেশত্যাগ ও উদ্বাস্তু সৃষ্টি বন্ধ হবে।

দেশ বিভাগের কিছু আগে থেকেই পূর্বপাকিস্তানের হিন্দুরা প্রধানত নিরাপত্তার অভাবের জন্য প্রবল অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে নতন জীবন গড়ার আশায় পশ্চিমবাংলায় চলে আসতে শুরু করে। স্বাধীনতার ৫০ বছর পরেও তাদের সে আশা পূর্ণ

হয়নি। এইসব শরণার্থীদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য ভারত সরকার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করবে বলে কংগ্রেস নেতারা স্বাধীনতার আগে যে আশ্বাস দিয়েছিলেন তার উপর নির্ভর করেই তারা দেশত্যাগ করেছিল। তারা আশা করেছিল যে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের কাছ থেকে সহৃদয় আচরণ ও উদার সাহায্য লাভ করে তারা নতুন জীবন গড়ে তুলতে পারবে আর ভুলতে পারবে দেশত্যাগ ও শরণার্থী জীবনের মর্মান্তিক যন্ত্রণা। কেন্দ্রের ও রাজ্যের কংগ্রেস সরকারের কাছ থেকে তারা পেয়েছে ঔদাসীন্য অবহেলা বঞ্চনা ও পীড়ন।

পশ্চিমবাংলায় শরণার্থীর সংখ্যা এখন ৮০ লক্ষেরও বেশি। সরকার এদের মধ্যে মাত্র ৩১ লক্ষ শরণার্থীর ত্রাণ ও পুনর্বাসনের দায়িত্ব নিয়েছিল। প্রায় ৫০ লক্ষ শরণার্থীর দায়িত্ব অস্বীকার করেছে। বিগত ৫০ বছরে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবাংলার উদ্বাস্তুদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য প্রায় ৩০০ কোটি টাকা ব্যয় করেছে। কিন্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজে চরম অব্যবস্থার ফলে এর অর্ধেক টাকাই অপচয় হয়েছে। এই টাকা ব্যয় করার পরেও উদ্বাস্তুদের ৯০ শতাংশের অবস্থান দারিদ্র্যসীমার নিচে। তারা এক অসহনীয় জীবন যাপন করছে। তৎসত্ত্বেও তারা ভেঙ্গে পড়েনি। সরকারের সাহায্যের অপেক্ষায় না থেকে তারা নিজেদের উদ্যোগে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য অবিরাম সংগ্রাম করে চলেছে। অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে তারা কিছু কিছু দাবি আদায়ও করেছে। বৃহত্তম সংগ্রামের সাহায্যে নতুন জীবন গড়ে তোলার জন্য তারা দৃঢ়পণ।

ম হা শ্বে তা দে বী

তপসিলি, আদিবাসী ও এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ

বিমলা হরির বয়স ছিল চব্বিশ। সে কাঁচড়াপাড়ার এক গরিব হরিজন মেয়ে। ডেঙাপাড়া মেথর কলোনির বাসিন্দা। কল্যাণী কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে ও ১৯৭৯ সালে নাম লেখায়। আজ আর তার ডাক আসার জন্য বসে থাকার দরকার নেই। বিমলার সমস্যা ও নিজেই সমাধান করেছে আত্মহত্যা করে। ১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ডেঙাপাড়ায় গিয়েছিলাম তরুণ, সাহসী সমাজসেবী হরিজন তরুণ রাজেন্দ্র বাশফোরের নির্মম হত্যার পর। তখন বিমলাকে কি দেখেছিলাম? মনে করতে পারি না। কাঁচড়াপাড়ার হরিজন বসতিগুলিতে চুল্লুর ঠেক বসিয়ে যে মস্তানরা দাপটে রাজত্ব করছিল, "চোলাই কারবার বন্ধ করো" বলে রাজেন্দ্র তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় দুঃসাহসে। হরিজন কল্যাণ সমিতি অনেক কিছুর জন্য লড়ছে, চোলাই কারবার তার অন্যতম। ডেঙাপাড়ার হরিজন প্রাথমিক স্কুল ভেঙে পড়ছে, পথ বলতে কিছু নেই, কাঁচা নর্দমাগুলো ভয়ানক অস্বাস্থ্যকর, দারিদ্র্য আর সরকারি ও পৌর ঔদাসীন্যের নগ্ন ছবি চারদিকে। অথচ কাঁচড়াপাড়ায় হাজার হাজার হরিজন থাকে। তাদের বসতি হয় রেলের জমিতে, নয় পৌরসভাধীন এলাকায়। ওরা নিজেদের জীবন বদলাতে চায়, সত্যিই চায়। কিন্তু অন্যেরা তো চায় যে ওরা ওইভাবে পচে মরুক। বিমলা হরিও বাঁচতে চেয়েছিল। চার বছর ও অপেক্ষাও করেছিল। এক্সচেঞ্জে ওর ডাক এল না। কখনোই আসে না।

আমার হাতের সামনে যে তালিকা, তাতে কল্যাণী, বারাকপুর ও নৈহাটি এক্সচেঞ্জে নাম লেখানো পঁয়তাল্লিশ জন হরিজনের নাম আছে। অনেকে ১৯৭৮-এ নাম লিখিয়েছেন, আজও সাড়া পাননি।

পুরুলিয়া হল যেমন গরিব, তেমন পিছিয়ে থাকা জেলা। পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে অবহেলিত জেলা। জেলার মধ্যে বান্দোয়ান ও মানবাজার-২ আবার তার মধ্যেও অবহেলিত দুই ব্লক। ওখানেই থাকে হতভাগ্য খেড়িয়া, বিরহড়, পাহাড়িয়া, সাঁওতালরা। ওই দুটি ব্লকে আজও কোনো পাকা রাস্তা নেই যাতে সদরে যাওয়া চলে। মানবাজার-২তে তো কোথাও যেতে হলেই মাইল মাইল পায়ে হাঁটতে হয়। স্বাধীনতার পঁয়ত্রিশ বছরেও পুরুলিয়া নগ্ন ঔদাসীন্যে অবহেলিত। যেসব জায়গার নাম করলাম, ওগুলি প্রধানত আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা। সাঁওতালরা অবশ্যই ওদের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রগামী এবং ওদের মধ্যে শিক্ষার হারও তুলনায় বেশি। ওদের মধ্যে সমাজ ও রাজনীতিচেতনাও বেশি। চুরকু গ্রামে থাকেন স্বাধীনতাসংগ্রামী বৃদ্ধ কানুরাম শবর। উনি একটা বৃত্তি পান বটে, কিন্তু এই খেড়িয়াশবর

বৃদ্ধের ছেলেরা পুরুলিয়া এক্সচেঞ্জের বান্দোয়ান শাখা থেকে কোনো ডাক পায়নি।

বান্দোয়ান এক্সচেঞ্জে নাম লেখানো পঞ্চান্ন জনের তালিকা দেখছি। কয়েকজন গ্রাজুয়েটও। সাঁওতাল জীবনচন্দ্র মুরমু ১৯৭০ সালে নাম লেখায়। ১৯৭৫ থেকে লেখানো অনেক নামও আছে। সাঁওতাল গ্রাজুয়েট হতে পারে, এক্সচেঞ্জে নাম লেখাতে পারে, তবু কাজের সুযোগ সে পায় না। নাম লেখানো ছেলেমেয়েদের গ্রামে প্রাথমিক স্কুল খোলা হয়, শিক্ষক নেয়া হয়, শিক্ষাপ্রাপ্ত আদিবাসী কিন্তু বেকারই থেকে যায়। তারপর বহু বছর ব্যর্থ প্রতীক্ষার পর ওরা শিক্ষাতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার তুলনায় মেদিনীপুর অনেক বেশি রাজনীতিক ঘূর্ণাবর্তের মধ্য দিয়ে গেছে। দক্ষিণ-পশ্চিম মেদিনীপুরে অনেক আদিবাসী। এখানে আছেন সাঁওতাল, মুণ্ডা, ভূমিজ, লোধা, হো, মাহালী, কোড়া, বাইগা ও অন্যরা। দারিদ্র্যের কারণে গরিবরা ভাতকাপড়ের বিনিময়ে শিশুদের গরুবাগালী কাজে পাঠান। বর্তমান রাজ্য সরকার গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক স্কুল খুলেছেন বটে, তবে জনসংখ্যা অনুপাতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা খুবই কম। তা সত্ত্বেও যখন কোনো গরিব ছেলে বা মেয়ে বৃত্তি পরীক্ষা দেয়, তাতে পরিবারকে অনেকটা স্বার্থত্যাগ করতে হয়। কেননা ওই ছেলেমেয়েদের রোজগার থাকে না শিক্ষাকালে। যখন লোধা জাতির গান্ধী মল্লিক ডালকাটি গ্রাম থেকে, বা কৃষ্ণপ্রসাদ ভক্তা চাকুয়া গ্রাম থেকে অষ্টম বা নবম শ্রেণী অবধি পড়ে, ঝাড়গ্রাম এক্সচেঞ্জে নাম লেখায়, ততদিনে তারা চাকরি পাবার বয়সে পৌঁছেছে। ওদের মতো আর যারা আছে, সকলেরি মনে হয় যে পড়ার জন্য পারিবারিক দায়দায়িত্ব অনেক অবহেলা করা হয়েছে, এখন কাজ পাওয়া দরকার। গান্ধীর নাম ১৯৭৬ থেকে এবং কৃষ্ণপ্রসাদের নাম ১৯৭৮ থেকে লেখানো আছে।

ঝাড়গ্রাম, বেলদা, মেদিনীপুর ও খড়গপুর এক্সচেঞ্জে লেখানো ১৭৭ জন শিক্ষাপ্রাপ্ত কুর্মী, সাঁওতাল, মুণ্ডা, লোধা ও মাহালি ছেলের নাম আমার সামনে। মাহালিরা সংখ্যায় খুবই কম। ১৯৭৫ থেকে লেখানো অন্তত একশোটি নাম দেখছি। তার মধ্যে ছয়জন মাহালি হতভাগ্যের নামও আছে।

মুর্শিদাবাদের পরমেশ্বর মারাণ্ডি সাঁওতাল। এই উৎসাহী সমাজকর্মী যুবকটি বহরমপুরের কৃষি আয়কর আপিসে কর্মি এবং স্বীয় সংগঠনের মাধ্যমে নানা কাজ করে। মুর্শিদাবাদ জেলা হিসেবেই অত্যন্ত উপেক্ষিত, অতি অনুন্নত। পর্যটন স্থান হিসেবে এর যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল, সে বিষয়ে চূড়ান্ত অবহেলা। বিখ্যাত হাজারদুয়ারী প্রাসাদের যথোপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ, উপযুক্ত কর্মী নিয়োগ, অন্তত সেখানে পৌঁছবার পথঘাটের ব্যবস্থা, এজন্য জেলাবাসী আজও অপেক্ষা করে বসে আছে। সাঁওতালরা কবে কেমন করে মুর্শিদাবাদে এল, তা জানবার জন্যই পরমেশ্বর প্রথমে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে। জেলার বেশ কিছু সাঁওতাল দীর্ঘকাল ধরেই ক্রীশ্চান। তাদের মধ্যে শিক্ষার হারও যথেষ্ট উন্নত। ভাবলে অবাক লাগে, দুঃখও হয়, আজও আমাদের সমাজে অনেকে আদিবাসী মানেই সাঁওতাল বলেন। কত শুনেছি যে বীরসা মুণ্ডা সাঁওতাল বিদ্রোহ করেছিলেন। প্রতিবেশীকে আমরা এত কম চিনি কেন?

পরমেশ্বরের পাঠানো এক্সচেঞ্জে নাম লেখানো শিক্ষাপ্রাপ্ত সাঁওতাল ছেলেমেয়েদের একশো নয়টি নামের তালিকায় দেখছি, মুর্শিদাবাদের এক্সচেঞ্জগুলি এদের কোনদিন ডাকেনি। ধোবাগুড়িয়া গ্রামের সুরেন মুর্মুর নাম ১৯৭৪ সালে লেখানো। বহু ছেলে, বহু মেয়ের নাম ১৯৭৫ থেকে লেখানো আছে।

পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, কাঁচড়াপাড়া, মুর্শিদাবাদ, এ তো সামান্য কয়েকটি মাত্র। বলা

চলে বিন্দুপরিমাণ, ওইসব জেলা ও অন্য জেলাতে সিন্ধুপরিমাণ এক্সচেঞ্জে নাম লেখানো আদিবাসী ও তপসিলি নিশ্চয় আছেন।

এইসব নাম যাদের, তেমন কয়েক শত জনকে তো আমি চিনি। চিনি বলেই ওদের বেকারত্বের ব্যাপারটা আমার কাছে খুব সত্যি।

স্বীকার করছি যে সারা পশ্চিমবাংলায় বেকারি আজ এক নিদারুণ, ভয়ংকর সমস্যা। যুব সমাজের সামনে এক বিরাট অন্ধকার অনিশ্চয়তা। যারা তপসিলি বা আদিবাসী নন, তাদের সমস্যা নিশ্চয় বিশাল, অপার। একথাও সত্যি যে সংরক্ষিত পদের বিরুদ্ধে অনেক চিঠিপত্র খবরের কাগজে দেখি।

মজা হচ্ছে, "এইসব আসন সংরক্ষিত", এ ঘোষণা কিন্তু সত্যি সত্যি আদিবাসীর বেকার সমস্যার সমাধানে কোনো সাহায্য বলতে গেলে করছে না। আদিবাসীর শিক্ষালাভের সুযোগটা দেখুন। প্রাথমিক পর্যায়ের পর যে পড়বে, মাধ্যমিক বা কলেজ তার গ্রাম থেকে অনেক দূরে। আবাসিক ব্যবস্থা এত কম, যে সেজন্যও সে পড়তে পারে না। তারপর সমীক্ষা করলে দেখা যাবে, বাণিজ্যিক বা বিজ্ঞান শাখায় আদিবাসী শিক্ষার্থী খুব কম। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উচ্চতর শিক্ষা, বা প্রযুক্তি শাখায়, তার কাছে স্বপ্ন। পশ্চিমবঙ্গে কয়জন আদিবাসী বি. এস-সি./ এম. এস-সি. / বি. কম. / এম. কম. / ডাক্তার / ইঞ্জিনিয়ার / বিজ্ঞানী হয়েছেন? অথবা হাইস্কুলে শিক্ষক / শিক্ষিকা, বা কলেজে অধ্যাপক / অধ্যাপিকা কয়জন?

তাই যেসব চাকরিতে স্নাতক / স্নাতকোত্তর ডিগ্রি দরকার, বিশেষ করে স্পেশালাইজ্ড স্টাডিতে, সেখানে সংরক্ষিত পদের ঘোষণাটি আদিবাসীর ক্ষেত্রে প্রহসনমাত্র। কোন্ আদিবাসী মেরিন বায়োলজিস্ট, নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট বা হেমাটোলজিস্ট পদে চাকরি পান? ওরা তো বাণিজ্যিক পাঠক্রমেও বলতে গেলে পড়েন না, সুযোগই পান না। ইকনমিক্স, অ্যাকাউন্টেসি বা বিজনেস ম্যানেজমেন্ট পড়ছেন, এমন আদিবাসী কোথায়?

সাধারণত আদিবাসীর শিক্ষা প্রাথমিক স্কুলেই শেষ হয়। বড় জোর ছয় ক্লাস, নয়তো আট ক্লাস। লোধা বা মাহালি ক্বচিৎ মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক অবধি পৌঁছান। সাঁওতাল, ওরাওঁ, মুণ্ডা বা ভূমিজ হয়তো মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক শেষ করতে চেষ্টা করেন। যখন পারেন না, সে তো দারিদ্র্যেরই কারণে। সাঁওতালরা সবচেয়ে অগ্রণী। তারা যদি বা সামান্য কয়জন বি. এ. বা এম. এ. পড়েন, তারও আর্টসে, বিজ্ঞানে বা অন্য বিষয়ে নয়। তাই যখন চাকুরি যারা দেবেন, সেই সংস্থা আদিবাসী ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, টেকনিশিয়ান চেয়ে বিজ্ঞাপন দেন, একশোর মধ্যে নিরানব্বই ভাগ ক্ষেত্রে "আদিবাসী যোগ্য প্রার্থী পাওয়া গেল না" বলে বাইরে থেকে লোক নিতে হয়। যে-কোন নিরপেক্ষ সমীক্ষায় প্রমাণ হবে ভালো মাইনের প্রতিযোগিতামূলক চাকরিতে আদিবাসী প্রার্থী বাস্তবে পাওয়া যায় না।

অবশ্যই এমন চাকরিও আছে যাতে আদিবাসী ও তপসিলি প্রার্থী পরীক্ষায় বসতে পারেন। ব্যাঙ্ক ও সরকারি অফিসে কেরানির কাজ যেমন। এসব চাকরির বিজ্ঞাপন যখন বেরোয়, তখন সুদূর গ্রামে বসে তার খবর পাওয়াও কঠিন, এবং খবর পেলেও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফর্ম পূরণ ও দাখিল (সহস্র নিয়ম মেনে) করাও কঠিন। আদিবাসীর জন্যে এখানেও পদ সংরক্ষিত আছে। কিন্তু জেলার এক্সচেঞ্জ সেসব খবার রাখেন না। আমি জেনে খুব অবাক হয়েছি যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আদিবাসী কল্যাণ মন্ত্রকের খোদ রাইটার্স বিল্ডিঙে একটি আদিবাসী এমপ্লয়মেন্ট সেল্ আছে। এই সেল্ কি কাজ করে, আদিবাসীদের চাকরি পেতে কি সাহায্য করে, তা কেউ জানে না।

এই সেলের তো উচিত, প্রথমত রেজিস্টার্ড আদিবাসী সংগঠনগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করা। আদিবাসীদের বিভিন্ন সংগঠনই বেকার ও এক্সচেঞ্জে নাম লেখানো ছেলেমেয়ের

তালিকা জোগাতে সক্ষম। তারপর এই সেলের উচিত, কোথায় আদিবাসীর জন্য চাকরি খালি আছে সে খবর (ক) সংগঠনগুলির কাছে পৌঁছানো (খ) জেলার এক্সচেঞ্জকে নাম পাঠাতে চাপ দেয়া।

ব্যাঙ্কের রিক্রুটমেন্ট বিভাগে আমি জানতে চেয়েছিলাম, আপনারা আদিবাসীর জন্য যে সংরক্ষিত পদ রাখেন, তাতে আদিবাসী কিভাবে নিয়োগ করেন। তিনি বললেন, যে তাকে নাকি কয়েকটি আদিবাসী সংগঠনের নাম তালিকা দেয়া আছে, তিনি সেখানে জানান। জানতে চাইলাম, ওভাবে কোনো আদিবাসীকে কোনোদিন চাকরি পেতে দেখেছেন কিনা। তিনি মাথা নাড়লেন। কোথা থেকে তার কাছে সংগঠনের তালিকা এল, সেসব সংগঠনের ঠিকানা কি, আর কোনো কথাই বের করতে পারিনি। সরকারের আদিবাসী এমপ্লয়মেন্ট সেল্ এ বিষয়ে কি বলেন? রাইটার্সের ওই সেল্ কাদের নিয়ন্ত্রণে? ওই সেলের সাহায্যে রাইটার্স বিল্ডিংে বা কতজন আদিবাসী কাজ পান, সবই আমরা জানতে ইচ্ছা করি।

জেলার এক্সচেঞ্জগুলিকে তো চাপ দিয়ে জানতে চাওয়া উচিত, যে ১৯৭৩ থেকে ১৯৮৩ মার্চ, এই এক দশকে ওইসব এক্সচেঞ্জ কতগুলি আদিবাসী সংরক্ষিত পদের খবর ছিল, এবং সঠিক কতজন আদিবাসী চাকরি পেয়েছেন।

এটা কেমন কথা, যে আট-নয়-দশ বছরেই আদিবাসী এক্সচেঞ্জ থেকে ডাক পান না? আদিবাসীদের জন্য সংরক্ষিত চাকরিগুলি কারা পাচ্ছেন? যা শোনা যাচ্ছে, তা কি সত্যি? শোনা যাচ্ছে এবং দেখা যাচ্ছে যে তপসিলি ও আদিবাসীদের পক্ষে জাতি পরিচয়পত্র পাওয়া এখন খুব কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং প্রায়ই শোনা যাচ্ছে যে ঘুষ দিয়ে অন্যেরা তপসিলি বা আদিবাসী সার্টিফিকেট নিচ্ছেন এবং সংরক্ষিত পদে চাকরি পাচ্ছেন। এক্সচেঞ্জগুলিও এখন চরম দুর্নীতির কেন্দ্র। টাকার লেনদেন না হলে ডাক আসবে না, এ তো জেলায় জেলায় শুনি।

সংরক্ষণ নীতি অতীব উদার। কয়েকটি চাকরির উদাহরণ দিই। হিন্দুস্থান এয়ারোনটিকস্ লিমিটেড চেয়েছেন মেডিকাল অফিসার (সার্জন) এবং সার্ভিস ইঞ্জিনীয়ার। দ্বিতীয় চাকরিটিতে MIG এয়ারক্রাফট-এর ১ থেকে ১০০ অবধি খুঁটিনাটি জানা আবশ্যিক।

ইফফকো চান সিকিউরিটি সুপারভাইজার। যে-কোন বিষয়ে স্নাতক চাই, চাই সেনাবিভাগে অন্তত ৫ বছরের অভিজ্ঞতা এবং কোন শিল্প কারখানায় উক্ত যোগ্যতায় কাজ করবার অভিজ্ঞতা থাকলে আরো ভালো।

ফেরো স্ক্র্যাপ নিগম চান অ্যাসিস্টান্ট ম্যানেজার / জুনিয়র ম্যানেজার - ফিনান্স ও অ্যাকাউন্টস্ একজিকিউটিভ। এর জন্য ভারত সরকারের চার্টার্ড অ্যাকাউন্টস্ ফার্মের সদস্য তো হতেই হবে, আরো মহাভারত আছে।

এখন দেশজোড়া লক্ষ লক্ষ বেকার যখন দেখেন যে সব কাজেই কিছু পদ "সংরক্ষিত", স্বভাবতই চাকরি না পাবার হতাশা থেকে তাদের মনে শিক্ষা ও চাকরি ক্ষেত্রে "সংরক্ষিত" ব্যাপারটির বিষয়ে ক্ষোভ জমায়, সেটা স্বাভাবিকও।

এসব কাজ প্রতিযোগিতামূলক। বিজ্ঞাপিত সত্তর ভাগ কাজ তারাই পান, যাদের অভিভাবকরা তাদের দামী স্কুল-কলেজ স্পেশালাইজড্ ধারায় পড়িয়ে বর্তমান ক্ষুধিত বর্বর সময়ে ক্ষুরের ফলার উপর দিয়ে দৌড়বার জন্য তৈরি করে দিয়েছেন। এ কথাও খুব সত্য, যে বড় বড় কলকারখানায় এমন সব চাকরিতে যারা ঢুকছেন, তারা প্রায়শ আদিবাসী নন, এবং বিহারের শিল্পাঞ্চলে আদিবাসীকে টাকা খাইয়ে তার উত্তরাধিকারী সেজে সেই শ্রমিক অবসর নিলে তার ছেলে/মেয়ে বা অন্য ন্যায্য উত্তরাধিকারী যে কাজ পেতে পারত, তাতে অন্য জাতি কত ঢুকে যাচ্ছেন, কেউ তার হিসাব রাখবে না কেননা এই দুষ্টচক্রে বহু বাঘ

সিংহ ও ইউনিয়ান তা জড়িত। জামশেদপুর টেলকোতে কত আদিবাসী নেবার কথা এবং প্রকৃত আদিবাসী কজন নিযুক্ত আছেন? এ কথা কি সত্যি, (পশ্চিমবঙ্গ হরিজন কল্যাণ সমিতি যা বলছেন), হরিজনদের জন্য যে চতুর্থ শ্রেণীর কাজ, সেই মেথর, ক্লিনার, জমাদার পদে বহু অন্য জাতি ঢুকে বসে আছেন। তারা নালা নর্দমায় বা পায়খানায় ঝাটা ধরেন না। সে কাজ সামান্য হরিজনরাই করছে, এরা নাকি তৃতীয় শ্রেণীতে চলে যাচ্ছেন, যাবেন।

"সংরক্ষিত পদ" দেখে যারা ক্ষুব্ধ, তারা নিশ্চিন্ত হোন। বেশির ভাগ চাকরি এমন যে অন্য জাতিকেও ভীষণভাবে তৈরি হয়ে পরীক্ষা ও ইন্টারভিউ দিতে হয়, এবং এ কথা কে না জানে যে পিছনে "দাদা" না থাকলে কোনো কাজই মেলা মুশকিল।

আদিবাসীর অস্তিত্ব কিরকম পশ্চিমবঙ্গে? বেঁচে থাকার তেল-নুন-লাকড়ি ফুট ফরাক, এর জন্যই যে প্রতিযোগিতা, সে ভীষণ রণে হার মেনে তারা নামাল খাটতে যান। তিনি যে স্কুলে পড়েছেন, তাতে তিনি এমন শিক্ষা লাভ করেননি, যা তাকে ওরকম কোনো বড় কাজে প্রার্থী হিসেবে তৈরি করে।

সোজা কথা, কি কেন্দ্রীয় সরকারে, কি রাজ্য সরকারে আদিবাসী প্রার্থী এখন অবধি অধিকাংশই চতুর্থ শ্রেণীতে কাজ পাবার উপযুক্ত। আজকাল একটি অভিযোগ সকল জাতি নির্বিশেষে জেলায় শোনা যায়, যে স্থানীয় রাজনীতিক ক্ষমতাশালী "দাদাকে খুশি" করতে পারলে তবেই আঞ্চলিক এক্সচেঞ্জ থেকে ডাক আসবে এবং এক্সচেঞ্জ আপিস থেকে কর্মদানকারী সংস্থা অবধি "খুশি করার" ব্যবস্থা খুবই চালু। যদি কোনো আদিবাসী কপালজোরে স্থানীয় ব্যাঙ্ক বা আপিসে চাকরি পেলও, সে চাকরিতে ঢোকার ও থাকার জন্য তাকে পার্টিমদতপুষ্ট ইউনিয়ন দাদাদের "খুশি" রাখতে হবে। এর মধ্যে কি কোনো সত্যতা নেই? কয়েকটি ঘটনার বিষয়ে চিঠি তো আমার হাতেই আছে।

শোনা যায় যে পুরুলিয়া ও মেদিনীপুরের একাংশে ঝাড়খণ্ডী হাওয়া আছে। এবং এ কথাও সত্যি যে রাজ্য সরকার বড় দরের মস্তান, ঠিকাদার, অসাধু ব্যবসায়ী, কালোবাজারী তেলের ডিলার, অত্যাচারী পুলিশ, জাল বর্গা রেকর্ড, সব সইতে পারেন, "ঝাড়খণ্ড" নাম সইতে পারেন না। ভালো, খুব ভালো। তবে এ কথাটাও তো ভাবতে হয় যে পুরুলিয়ার বংশীর মতো কোনো শিক্ষাপ্রাপ্ত, নাম লেখানো তপসিলি বা আদিবাসীকে যদি তেরো বছরেও এক্সচেঞ্জ থেকে ডাকা না হয়, তাদের মনে হবে যে তারা ইচ্ছাকৃত নির্মম ঔদাসীন্যের ফলে অবহেলিত হচ্ছে। তখন তারা কেন বিক্ষুব্ধ হবে না? বিক্ষোভের কারণ তো অপসারণ করলেই হয়।

রাজ্য সরকারের নীতি যদি সংখ্যালঘিষ্ঠ আদিবাসীদের প্রতি বিশেষ সংবেদনশীল হয় (যা শোনা যায়), তাহলে চার থেকে আট ক্লাস পড়া লোধা বা খেড়িয়া কেন বনরক্ষী কাজের জন্যেও বিবেচিত হয় না? তারপর বিগত সাত/আট বছরে ঘোষিত আদিবাসী এলাকায় যে হাজার হাজার প্রাথমিক শিক্ষক/শিক্ষিকা নিযুক্ত হয়েছেন, তার বাস্তব চিত্র কেমন? কতগুলি ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন, এক্সচেঞ্জে নাম লেখানো আদিবাসী ওইসব চাকরি পেয়েছেন? বহু অ-আদিবাসীও বলেছেন, "উপযুক্ত আদিবাসী প্রার্থী নেই বলে অন্য জাতি থেকে লোক নেয়া হল" এটি অনেক সময়েই মিথ্যা দ্বারা সত্যকে ঢেকে রাখা।

এ রাজ্যের শিক্ষাপ্রাপ্ত আদিবাসীদের বিষয়ে ঈর্ষা করার কোনো ভিত্তি নেই। যারা জানেন না, তারা মনে করেন যে এরা হল রাজ্য সরকারের আদরের সন্তান। দুর্গম, দূরবর্তী আদিবাসী এলাকায় কষ্ট করে ঘুরলেই এ ধারণা মুছে যাবে। দেশের অগণিত বেকাররা

ক্ষুব্ধ, আদিবাসীরা চাকরি ক্ষেত্রে সংরক্ষিত পদ পাচ্ছে। বাস্তব ঘটনা হল, তা তো তারা পাচ্ছেই না, বরঞ্চ অনেক ক্ষেত্রে যে কাজ তার যোগ্য, সে কাজের বেলাও সে সংরক্ষিত পদের সুবিধা পাচ্ছে না। লোধা ও মাহলিদের লেখাপড়া শেখা ও এক্সচেঞ্জে নাম লেখানোর অভিজ্ঞতা এমন নৈরাশ্যজনক যে লেখাপড়া ব্যাপারটাতেই ওরা আগ্রহ হারায়। পুরুলিয়ার বান্দোয়ান মহকুমার যে সাঁওতাল মেয়েরা মাধ্যমিক অবধি পড়েছে, বা পাশ করেছে, তারা পড়েছে উভয় সঙ্কটে। চাকরি পাবার সুবিধে নেই, কোনো কার্যকরী প্রশিক্ষণ মাধ্যমে ওরা স্বয়ম্ভর হবে এমন ব্যবস্থা রাজ্য সরকার করেননি। এতটা লেখাপড়া শিখে দিনমজুর হিসেবে খাটতে ওরা যেমন চায় না, তেমনি জমিমালিক ওদের নিয়োগ করতে নারাজ। যারা লেখাপড়া জানে, তারা ন্যায্য মজুরির দাবি তুলতে পারে। স্কুলে শিক্ষাসমাপ্তি আদিবাসীর ক্ষেত্রে একট প্রতিবন্ধক, তার সহায়তা নয়।

গোমস্তাপ্রসাদ সরেন লিখেছে, "তালিকাটা দেখুন। ওদের সাহায্য করতে চেষ্টা করুন। ওরা অনেকেই পুরুলিয়া থেকে অনেক দূরে জংলা বা পাহাড়ী এলাকায় থাকে। পথঘাট নেই। রেডিও বিরল, ওরা খবরের কাগজও রাখে না। ডাক-ব্যবস্থায় চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা, ফলে কাজের চিঠি এলেও তা সময়ে ওদের হাতে পৌঁছয় না। এখন এক্সচেঞ্জগুলি দুর্নীতির ডিপো। এক্সচেঞ্জ এবং রাজনীতিক দলগুলি এদের প্রতি উদাসীন। ওরা এক্সচেঞ্জে কার্ড রিনিউ করার পরেও ডাক পায় না। ওরা কি করবে, কোথায় যাবে?"

প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই। আমি শুধু জানি যে আদিবাসী ও তপসিলিদের বেকারির সমস্যা এক ভয়াবহ সমস্যা। কলকাতায় সবচেয়ে বেশি কাজের খবর থাকে। কলকাতার এক্সচেঞ্জগুলি জেলার এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ থেকে আদিবাসী-তপসিলি সংরক্ষিত কোটা পূরণের জন্য তালিকা চাইবে, এমনটিই হওয়া উচিত, তা হয় না। আদিবাসী কলকাতায় বাস করে না, জেলায় বাস করে। সে খবর পায় না। কলকাতায় যে আদিবাসী-তপসিলি সংরক্ষিত কোটা বিজ্ঞাপিত হয়, সেগুলি কারা পায়? রাইটার্সের আদিবাসী কর্মবিনিয়োগ সেল কি সরকারি খরচে রাখা এক দারুভূত জগন্নাথমাত্র?

জেলায় এক্সচেঞ্জগুলি এদের কোন সাহায্য করে না। সমগ্র অবস্থাটি আদিবাসী ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষালাভে কোন উদ্যম যোগায় না। যে-কোনো সরকারের পক্ষেই আদিবাসীকে খানিক শিক্ষাদান, তারপর তাকে বছরের পর বছর বেকার ফেলে রাখা কিন্তু বিপজ্জনক। এর ফলে প্রথমে মনে জমে হতাশা, হতাশা থেকে জন্ম নেয় ক্রোধ। ফলে ওদের ও সরকারের মধ্যে যে ব্যবধান, তা বাড়তে থাকে। চার দশক ধরে আদিবাসী স্বার্থ যেভাবে উপেক্ষিত হয়েছে, যে আদিবাসী দৃঢ় বিশ্বাস করে, যে রাজা আসবে, রাজা যাবে, কিন্তু তাদের স্বার্থ কিসে রক্ষা হয়, সে কথা কেউ ভেবে দেখবে না।

প শু প তি প্র সা দ মা হা তো

পশ্চিমবঙ্গে আদিবাসী দলিত মানুষেরা কেমন আছেন

সুন্দরবনের লক্ষ্মীকান্তপুর লাইনের রঘুনাথপুর। স্টেশনের পাশেই একটি চায়ের দোকানে আলাপ করিয়ে দিলেন ধূর্জ্জটি নস্কর স্মিতহাস্য কালো-চাবুকের মত চেহারার এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। তিনি চায়ের দোকানের মালিক ও চা-বিক্রেতা। শুনলাম কবিও। ভদ্রলোকের নাম সাধনচন্দ্র নস্কর। আঞ্চলিক ভাষাতে তাঁর একটি কবিতার বইও দেখলাম। সাধনবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম — স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পার হল, আপনার কেমন লাগছে? স্মিতহাস্যে ছড়ার মত করে বললেন,

শিশু শ্রমিকের কঙ্কালগুলো
বিবেকবানের কারাগারে কেন
বন্দি থাকিবে জান?
কালাহাণ্ডির ক্ষুধিত মানুষ
ক্ষুধায় মরিবে কেন?
নিরক্ষর রয়ে গেল কেন এত
শিক্ষার কাঁধে, কেন ভিক্ষার ঝোলা?
প্রকাশ্যে আজ, দেখি কেন মোরা
দেশ-বরেণ্যদের গলায় জুতোর মালা?
কথায় কথায় মানুষ কেন রুষ্ট?
কাজের কাজিরা জাগিয়া ঘুমাবে কেন?
কর্তব্য কেন ঘুষের চাকায় পিষ্ট?
স্বাধীনতার সুবর্ণ-জয়ন্তীতে এ কেন হবে সৃষ্ট?

পুরুলিয়া জেলার চিতরপুর গ্রামের স্বভাব কবি ও টুসুগানের লেখক যুধিষ্ঠির মাহাতো তাঁর একটি টুসুগানে লিখেছেন,

ভোটের আগে আনাগোনা
তারপরে সে হয় কানা
সত্যটাকে মানতে লারে
সে-ও শিকলে টানা।

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে দলিত মানুষের মূল্যায়ন যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে বা হচ্ছে তা ভেবে দেখার বিষয়।

সিংভূম জেলার ট্রুমাংকচা গ্রামে 'খাড়িয়া' নামক এক উপজাতির বসবাস। ঘাটশিলা থেকে যাদুগোড়া পার হলে সেই গ্রাম। পাওড়া পাহাড়ের কোলে এই সুন্দর মনোরম পরিবেশ। গ্রামের মানুষেরা কি কি খায়, কেমন কাপড়-চোপড় পরে, তাদের স্বাস্থ্যের ও পানীয় জলের কি ব্যবস্থা, এ সব দেখার জন্য পৌঁছেছিলাম সেই গ্রামে। দু দিন ছিলাম। ওই দু-দিনেই দেখলাম, মোট ১৮টি পরিবারে একবেলা ভাত রান্না হয়েছে। শুধু নুন-ভাতে খেয়ে তারা ধুঁকছে। ১২টি পরিবারের কোন রান্না হয়নি একদিন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য জল মেশানো মাড়ভাত এবং বাসিভাতের জল খাওয়ানো হচ্ছে। মায়েদের স্তনে দুধ নেই। ৮-১০ বছরের ছেলেমেয়েরা গেঁড়ি, গুলি, ঢ্যামনা-সাপ, কালই, উইপোকা, কুরকুটি, পাখির ডিম, পাখির বাচ্চা যোগাড় করছে খাবারের জন্য।

পাঁচটি বীরহোর পারিবারের অবস্থা আরও খারাপ। 'ইন্দিরা আবাস' পরিকল্পনা অনুসারে এই বীরহোর পরিবারদের জন্য নির্মিত হয়েছে তাদের বাসস্থান। একটি স্যাঁতসেতে উঠানসহ ছাত-ফুটো একটি ঘর। মানুষের জন্য আদিবাসী তথা আদিম-উপজাতি দরদি সরকারের মঞ্জুরিকৃত অর্থে বিহারী ঠিকাদাররা বানিয়েছেন সেই ঘর। একটি ঘরের এককোণে রান্না, স্বামী-স্ত্রী বাচ্চারা সেখানে, কিন্তু কাপড়-চোপড় বলতে এক চিলতে ছেঁড়া কাপড়ে কোন মতে লজ্জা নিবারণ করছেন যুবতী রামী বিরহোর। ১৫ বছর বয়সেই সে হয়ে গেছে যেন ৩৫ বছরের মহিলা, কোলে শিশুসন্তান। বাকি চারটি ঘরে কোন লোক থাকে না। বীরহোরদের জন্য নির্মিত ঘরে গ্রামের জাতি-গোষ্ঠীর মানুষেরা গরু-ছাগল রাখার জায়গা করেছেন।

'বীরহোর' গোষ্ঠীর মানুষেরা চলে গেছেন জঙ্গলের ভিতরে, আছেন 'কুম্বা' বা পাতার কুঁড়েঘর করে। গ্রামের মানুষদের কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ওরা কি খায়, কি পরে, শীতের সময় কি গায় দেয়? অত্যন্ত বিমর্ষ ও দুঃখে মোহন শবর বলেছিলেন, সপ্তাহে দু-দিন পেটভরে খেতে পারলে ওরা ও আমরা নিজেদের ভাগ্যবান মনে করি। আর কাপড় সেটা যদি কিনতে পারি তো ভাগ্য ভাল — না হলে 'প্যাটকার' বা যাদু-পর্দুয়ারা যেমন শ্মশান থেকে মৃতদেহের কাপড় সংগ্রহ করে, তেমনি আমরাও করি।

পুরুলিয়া জেলার বীরহোর গোষ্ঠীই বা কেমন আছেন? অযোধ্যা পাহাড়ের পাদদেশে মাদলা গ্রামের 'ভূপতি কলোনি'তে যারা বসবাস করেন তাদের অসহায় মুখগুলি দেখলে মনে হয় যেন তারা এক 'বন্দি' জীবন-যাপন করছেন। উকাদা, বাড়েডি তথা তোড়াং ডাভাতে 'জিহড় লতা' দিয়ে তৈরি দড়ি বিক্রি করার জন্য এসেছিলেন লক্ষ্ণ শিকারী ও তার স্ত্রী বালি শিকারী। তাদের কথা হল, 'বাড়ড়িয়া থেকে পাহাড়ের মধ্যে গবরিয়া জঙ্গল থেকে 'চিহড়-লতা' সংগ্রহ করতেই তাদের দু-দিন লেগে যায়। 'চিহড়-লতার' দড়ি আগে কৃষকেরা কিনতেন। কিন্তু এখন বাজারে এসে গেছে নাইলনের দড়ি। অনেক শক্ত ও টেকসই। 'লোকে আর কিনছে নাই দাদা।' 'চিহড়-লতার' দড়ি তৈরি করা, মধু সংগ্রহ, জঙ্গলের ফল, যেমন, নিম, বহড়া, হরতকি, কুসুম, শাল, পিয়াল কেঁন্দ, ভুঁড়রু ইত্যাদি ফলের গাছগুলোর জঙ্গল শেষ হয়ে যাচ্ছে।

পুরো অযোধ্য পাহাড় মাঠাবুরুর দিক থেকে অথবা মুরগুমার দিক থেকে শাহারজুড়ি পর্যন্ত আর এদিকে আড়যাশিরকাবাদ থেকে জঙ্গল শেষ হয়ে গেছে। যেটুকু বেঁচে আছে জঙ্গল সেইটুকু হল হাতির বাসস্থান। এর ফলে বীরহোর সমাজ সম্পূর্ণভাবে হতাশ হয়ে পড়েছে। মানুযের জন্য মানুষের কোন মর্মবেদনার ইঙ্গিত দিতে পারেনি আমাদের পরিকল্পনাবিদেরা। স্থানীয় নেতা সুধীর কুমার আমাদের জানালেন, "স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর কি বটে। কোন রিলিফ বটে ন টি আর আর জি, আর উঠা বীরহোর না নাই বুঝে। হামরা উয়ারাকে ঠিক ঠাক রাখার জন্য কাজ দিছি।"

স্থানীয় এম এল এ ও তরুণ নেতা নিশিকান্ত মেতা জানালেন যে "অযোধ্যা পাহাড়ের ওপরে ম্যালেরিয়ার রোগে লক মরছে—ডাক্তার নাই, ওষুধ নাই, কিন্তু চেষ্টা করছি পাহাড়লে লক যাথ্যে পালাএঃ না যায়। বীরহোর, পাহাড়িয়া মানব গোষ্ঠীদের বাঁচাতেই হবে।" বান্দোয়ান, বরো, মানবাজার ও বরাবাজার থানার খাড়িয়া-শবরদের অবস্থা ধীরে ধীরে এমন হতে আরম্ভ করেছে যে চায বাস অথবা নামালিয়া কিংবা ইটভাটাতে কাজ করতে না গেলে তাদের পেটে দানা পড়বে না। অনেকেই দিনের পর দিন টটকো, কুমারী নদীতে সোনার সন্ধানে ব্যস্ত। ওজন, পরিমাপ তথা টাকা-পয়সার হিসাব না রাখতে পারার জন্য ব্যবসায়ীদের কাছে তারা ঠকছেন নানাভাবে।

হুড়া-পুঞ্চার খাড়িয়া-শবরদের অবস্থা ভয়ানক। ক্ষুধার যন্ত্রণাতে ছট-পট করতে হয় শিশুদের দু-একদিন। ঢ্যামনা সাপ, ইঁদুর, পাখির ডিম, পাখির বাচ্চা, মৃত পশুর মাংস ইত্যাদি খেয়ে জীবন চলে তাদের।

ঝাড়গ্রামের লোধাশবর গোষ্ঠীর মানুষেরা জীবিকার সন্ধানে রেল লাইনের ধারে সুদূর বালেশ্বরের কাছে অথবা পাঁশকুড়া, হলদিয়ার জলা জায়গাতে গো-সাপসহ বিভিন্ন ধরনের জলজ প্রাণী ধরে এক-দু সপ্তাহ পরে বাড়ি ফেরে। জঙ্গল দ্রুত শেষ হচ্ছে। তার জন্য জঙ্গলের ঝুড়ি-ঝাঁটি আনতেও সময় লাগছে তাদের। পরনের কাপড় কোনমতে লজ্জা নিবারণ করার মত। মাথাতে কতদিন তেল পড়েনি তাদের।

বিনপুর বেলপাহাড়ি অঞ্চলে বর্গাদারদের জন্য পঞ্চায়েতের টাকাতে চাষীদের কাছ থেকে জমি কিনেছেন পঞ্চায়েতের বাবুরা, আর সেগুলো দিয়েছেন লোধাদের। একেবারে পাথুরে কাঁকর মিশ্রিত এবড়ো-খেবড়ো জমি। শুশুনিয়া পাহাড়ের কাছে হাপানিয়া গ্রামে 'করগা' নামক একটি দেশজ গোষ্ঠীর লোকরা জমি পেয়েছে শুনেছে। কিন্তু জমিটা গ্রামের উত্তরে না দক্ষিণে তারা এখনও জানে না।

'করগা' গোষ্ঠীর মানুষেরা ছিল এক সময় সাঁওতাল গোষ্ঠীর মক্কেল। সাঁওতালরা ছিল তাদের 'প্যাট্রন' বা পৃষ্ঠপোষক। কিন্তু সাঁওতাল গোষ্ঠী এই 'মিতান' বা 'মিত্র' গোষ্ঠীকে আর সাহায্য করতে পারছে না, কারণ তাদের অর্থনীতিই আজ বিধ্বস্ত। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুরসহ সাঁওতাল পরগনার 'হড়-মিতান' ক্ষেতমজুররা অর্থাৎ মূলত সাঁওতাল, বাউরি, দেশওয়ালি মাঝি, দণ্ডমাঝি, ভুঁইএঞ, রাজোয়াড়, মাহাতো, মুণ্ডা, ভূমিজ, লোহার, কামার প্রভৃতি গোষ্ঠীর মানুষেরা 'নামালিয়া' (পূর্ব দেশে কাজ করতে আসা) শ্রমিক না হলে বর্ধমান, হাওড়া, হুগলিসহ বালেশ্বর এবং উত্তর বিহারে, হরিয়ানা, পাঞ্জাবে সবুজ-বিপ্লব সম্ভবই হত না। প্রশাসক ও সমাজবিজ্ঞানী অশোক মিত্র লিখেছেন, "মধ্য বা নিচু জাতের চাষীদের পক্ষে পশ্চিমবঙ্গে সেচের দাবি ঠিকমত করার জন্য উপযুক্ত জাত সমিতি একটিও নই।"

অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক দলের নেতারা বা সংগঠনগুলিও চাষের ফলন সম্বন্ধে হয় নিতান্ত উদাসীন, না হয় অজ্ঞ। ফলে তারা সেচের প্রকৃত মূল্য বা প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মোটেই তৎপর নয়। এই কারণে পশ্চিমবঙ্গে জমি পর্যন্ত নদী বা খালের জলের সেচের নালি চালু রাখা বরাবরই অবহেলিত হয়েছে, বিশেষত ছোট চাষী বা ভাগচাষীর জমির ক্ষেতে। এই অবহেলার ফলে চাষের ফলন বৃদ্ধির জন্যে অন্যান্য উপাদানের — যেমন পাম্প, বীজ, সার, কীটনাশক ইত্যাদির উপযুক্ত চাহিদাও যথা সময়ে হয় না বা সেগুলি মেটাবার উদ্যম আসে না। ফলে চাষ মজুরের চাহিদাও বাড়ে না। এইভাবে নিজেদের ক্ষতি করেও চাষ মজুরের চাহিদা এইভাবে দমিয়ে রাখার ফলে বড় চাষীরা

ক্ষেতমজুরের মজুরিও দাবিয়ে রাখে। এমন কি আইন করা নিম্নতম মজুরির চেয়েও অনেক কম মজুরি দিতে সমর্থ হয়। নিজের নাক কেটে মজুর বেটাদের জব্দ করার অপার আনন্দ লাভ করে। পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী দলগুলিতে উঁচু ও মাঝারি জাতের চাষী মালিকদের প্রাধান্যই বেশি। তারা কিছুতেই মনেপ্রাণে চাইবে না যে তাদের কোল থেকে ঝোল অন্যত্র চলে যায়। সেই উদ্দেশ্য বজায় রাখার জন্য তারা নানারকম আগডুম বাগডুম নজির দেখায়। যাতে নিচু বা ভাগচাষীদের রোজগার অযথা বৃদ্ধি না পায়।'

'আমূল ভূমি সংস্কার' ও 'সকল বেকারের কাজের সুযোগ' ইত্যাদি স্লোগান-সর্বস্বতার পিছনে লুকিয়ে আছে এক আশ্চর্য দমনশীল ও সামন্ত মনোভাব যা পশ্চিমবাংলার প্রভাবশালী মানুষেরা পেয়েছেন ইংরাজি শাসন ও ব্রাহ্মণ্যবাদী উত্তরাধিকার থেকে। মানুষকে দাবিয়ে রাখার, ভীত ও সন্ত্রস্ত করার এই অপকৌশলের সৃজনশীল উৎস হল মনুবাদ। অশোক মিত্র আরও বলেছেন, "রাজনৈতিক দলগুলির অধিকাংশ কর্মী উঁচু বা মধ্যশ্রেণীর জাতের। কৃষিতে পরিশ্রম করে বেশি ফলন ফলিয়ে উপার্জন বা লাভ বাড়াবার চাইতে ফড়েমির সাহায্যে অথবা কেনাবেচা মহাজনি বা তেজারতির মাধ্যমে কি করে সবচেয়ে কম শ্রমে বেশি টাকা করা যায় সেইদিকেই তাদের লক্ষ এবং সে কাজ হাসিল হয় যদি নিচু জাতের মানুষদের ওপর মাতব্বরি বা উৎপাত করা যায়।

"আমি মোটেও বলছি না যে গ্রামবাংলার উঁচু জাতরা পয়সা করার পিছনে ছোটে না। নিশ্চয় ছোটে। তবে এ ব্যাপারে তারা ভাল করে চাষ করা বা যাবতীয় কৃষি কাজে তদারক করা বা প্রতিবাদে নজর রেখে বেশি ফলনের জন্যে চেষ্টা করার মত কষ্টসাধ্য পরিশ্রমের ওপর নির্ভর না করে অপেক্ষাকৃত কম পরিশ্রমের উপায়ের আশ্রয় নেয়। যথা বীজ, সার এবং অন্যান্য উপকরণের বিক্রি ব্যবস্থা নিজেদের হাতে রাখে। সুবিধামত মাল এনে বা লুকিয়ে রেখে দর কমবেশি করে বেশি মুনাফার ব্যবস্থা করে এবং সমস্ত কারচুপির শিকার হয় নিচু জাতের ছোট চাষীরা।... উঁচু জাতের মানুষেরা যে উপায়ে নিচুজাতের মানুষদের ওপর সবচেয়ে ভাল করে প্রভুত্ব বজায় রাখতে পারেন তা হচ্ছে তাদের সবরকম কার্যকলাপ ইচ্ছেমত নিয়ন্ত্রণ করে। প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবন মৃত্যু থেকে যাবতীয় সংবাদ ও জ্ঞান এবং প্রতিষ্ঠানভিত্তিক সাহায্য পর্যন্ত। রাজনৈতিক সংগঠন ও নেতৃত্বও খুব দক্ষতা সহকার ব্যবহৃত হয়। এর প্রধান অস্ত্র হচ্ছে কোনও আন্দোলন একেবারে হাতের বাইরে চলে যাওয়ার আগে কিছু আইনগত সংস্কার প্রয়োজন। কিংবা কিছু কিছু ছাড় বা ভরতুকি অথবা এককালীন বা দফায় দফায় যৎসামান্য সাহায্য, যার থেকে আবার বিতরণ ব্যবস্থার কারচুপিতে সেই অর্থের বা সুযোগের মোটা অংশ পুনরায় উঁচুজাতের গর্ভে ফিরে যায় অথবা সামান্য কিছু কিছু ক্ষমতার ছাড় যার চাবিকাঠিটি অবশ্য যথাসম্ভব উঁচুজাতের মানুষের হাতেই থাকবে।"

১৯৯৫ সালের ৯ জানুয়ারি থেকে ১৯ জানুয়ারি শিয়ালদহ স্টেশনের বাইরে ১৪ এপ্রিল কমিটি, ডিপ্রেসড্ ক্লাস লিগসহ কয়েকটি সংগঠনের ডাকে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে দলিত ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির সুযোগ-সুবিধা আদায় করার জন্য এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ওই ব্যাপারে চূড়ান্ত অবহেলা ও ব্যর্থতার প্রতিবাদে এক হাঙ্গার স্ট্রাইকের আয়োজন করেছিলেন। যারা এই 'ভুক-হরতাল'-এ অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন সুকৃতি রঞ্জন বিশ্বাস, অলকেশ বিশ্বাস, গৌতম বিশ্বাস, শিশুবচন পাসোয়ান, সুশান্ত শিকারী, পুরুযোত্তম শীট, সুবোধ সরকার। মনতোষ রায়সহ মুর্শিদাবাদের জীতেন ওঁরাও। এক ৭৪ বৎসরের 'জোয়ান' এবং আরও এক তরুণ আদিবাসী যোগেন ওরাঁও। নূর মহম্মদ ও বিজয় সরকার।

সমস্ত আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন অরুণকুমার মাঝি, মতীশ বিশ্বাস, অলককুমার হাজরা, সুকৃতিরঞ্জন বিশ্বাস প্রমুখ। আন্দোলনটিকে সমর্থন জানিয়েছিলেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও প্রভাবশালী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আন্দোলনটি যাতে হাতের বাইরে না চলে যায় তার জন্য তড়ি-ঘড়ি এক সদস্যের একটি কমিশন নিযুক্ত করলেন। কমিশনের নাম বাসুদেব বর্মন কমিশন। অধ্যাপক বাসুদেব বর্মনের কমিশনে যে রিপোর্ট দিয়েছেন তাতে আমরা জানতে পারি যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে (মোট বারোটি) ৫০১টি আসন সংখ্যার মধ্যে ১৯৯০-৯১ সালে ২৪ জন, ১৯৯১-৯২ সালে ৩০ জন ১৯৯২-৯৩ সালে ৩৯ জন (তার মধ্যে একজন তপসিলি উপজাতি), ১৯৯৩-৯৪ সালে ২৩ জন এবং ১৯৯৪-৯৫ সালে মাত্র ১২ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সুযোগ পেয়েছেন। পরে অধ্যাপক বর্মন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৮৮-৮৯ সালের ইউ জি সি রিপোর্ট অনুসারে পশ্চিমবাংলার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে তপসিলি জাতি ও তপসিলি উপজাতির যে বিবরণ ছাপা হয়েছে তাতে হিসাব হল, কলা বিভাগে মোট ছাত্র সংখ্যা ১২৮০২৬, তপসিলি জাতি সংখ্যা ১০.৫% এবং তপসিলি উপজাতির সংখ্যা ১.৭%, বিজ্ঞানে মোট ছাত্র সংখ্যা ৪৪৯৫৯, তপসিলি জাতি ৩.৬% এবং তপসিলি উপজাতি ০.৭% বাণিজ্য বিভাগে ছাত্র সংখ্যা ২৯৫০৩, তপসিলি জাতি ৫.২%, তপসিলি উপজাতি ১.০%, শিক্ষা বিভাগে ছাত্র সংখ্যা ৫২৭০, তপসিলি জাতি ২.৯%, তপসিলি উপজাতি ০.৫%, ডাক্তারীতে মোট ছাত্র সংখ্যা ৯৭৭৯, তপসিলি জাতি ৪.৩%, তপসিলি উপজাতি ০.০৭%, কৃষিতে মোট ছাত্র সংখ্যা ৫৭৭৬, তপসিলি জাতি ২.৮%, তপসিলি উপজাতি ০.৮%, পশু চিকিৎসায় মোট ছাত্র সংখ্যা ৯২৬, তপসিলি জাতি ১.৫%, তপসিলি উপজাতি শূন্য। আইন বিভাগে মোট ছাত্র সংখ্যা ২৩০৩, তপসিলি জাতি ১.৮%, তপসিলি উপজাতি ০.২%, অন্যান্য বিভাগে মোট ছাত্র সংখ্যা ৩২৭৯, তপসিলি জাতি ১.৭%, তপসিলি উপজাতি ০.৪%।

১৯৯৫ সালের অধ্যাপক বাসুদেব বর্মন কমিশনের রিপোর্ট ও ১৯৮৮-৮৯ সালের ইউ জি সি-র তথ্য আমাদের বুঝিয়ে দেয় যে উচ্চ-শিক্ষার জন্য ভারত সরকার ও রাজ্য সরকার অনুদান বা ভর্তুকি সবচেয়ে বেশি দিলেও,'শিক্ষার মানের' স্বার্থে এবং পশ্চিমবাংলার সুনামের স্বার্থে তথা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্ব-শাসনের স্বার্থে যেন উচ্চ-বর্ণ ও জাতিগোষ্ঠীর অবাধ মৃগয়াক্ষেত্র এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। ভারতের শতকরা ৮৫ ভাগ মানুষের কি অবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সেটা ভারতের করদাতারা অনুধাবন করুন। তবে 'মনু-স্মৃতি'র সময়ে শূদ্রদের বিদ্যালাভ ধন-সম্পত্তি রাখার যেমন অধিকার ছিল না, আজকের প্রগতিশীল মানুষেরা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে রক্ষা করে চলেছেন জমিদারি-জোতদারি-মহাজনি ব্যবস্থা উচ্ছেদ হওয়ার পর নতুন নতুন জমিদারি।

জজিয়াতি, অধ্যাপনা, ব্যারিস্টারি, সর্বত্র এক অমোঘ নিয়ন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে চলছে, যার নাম জাত-পাতের অদৃশ্যমান ঘৃণা।

পশ্চিমবঙ্গে তপসিলিজাতি ও তপসিলি উপজাতি মানুষের জন্য যথাযথ পরিমাণ অর্থও বরাদ্দ করা হয় না রাজ্যের বাজেটে, যা বরাদ্দ করা হয় তাও খরচ করা হয় না। দলিত মানুষের মধ্যে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত তপসিলিজাতি ও তপসিলি উপজাতি সমাজের লোকসংখ্যা যথাক্রমে ২৩.৬২% এবং ৫.৫৯ ভাগ। সুতরাং তাদের উন্নয়নের জন্যও সমপরিমাণ অর্থ বরাদ্দ হওয়া দরকার বলে ন্যাশনাল কমিশন ফর সিডিউলড কাস্ট অ্যান্ড সিডিউলড ট্রাইবের মাননীয় আনন্দমোহন বিশ্বাস অভিযোগ করেছিলেন যে মাত্র ৪%

বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছে তপসিলি জাতিদের জন্য special component programme এ এবং মাত্র ২% বরাদ্দ করা হয়েছে ট্রাইব্যাল সাব-প্ল্যানে যা তপসিলি উপজাতির মানুষের জন্য নির্ধারিত হয়েছে। গত পাঁচ বছরে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে জাতীয় কমিশন ভয়ানক অসন্তুষ্ট হয়েছে বলে জানা গেছে। বাজেট বরাদ্দের শতকরা ১০% মাত্র খরচ করতে পারেনি তপসিলি জাতির মানুষের জন্য বিশেষত স্পেশাল কমপোনেন্ট প্রোগ্রামে। ১৯৯২-৯৩ সালে ট্রাইবাল সাব প্ল্যানে মাত্র ৩৬৬০ টাকা খরচ করা হয়েছিল। কমিশনের মাননীয় সদস্যের মতে এই প্রগতিশীল এবং সাম্যবাদী সরকার তপসিলি জাতি ও তপসিলি উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত ৭০,০০০ পদ অপূর্ণ রেখেছেন যা মানব-অধিকার লঙ্ঘন এবং তপসিলিজাতি ও উপজাতির প্রতি চরম বঞ্চনা।

ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনসহ পশ্চিমবাংলাতে যত কর্পোরেশন আছে, সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে তপসিলি জাতি, তপসিলি উপজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষদের জন্য সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। মাননীয় বিধানসভা সদস্য নরেন হাঁসদা যাদবপুরসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তাদের চিঠি দিয়েছিলেন সংরক্ষিত তপসিলি উপজাতি পদগুলিতে লোক নিয়োগের জন্য। কিন্তু কোন ফল হয়নি। আজ থেকে তিন-চার বছর আগে বিজ্ঞাপন মারফত মালি, সুইপার ইত্যাদি পদে বিজ্ঞাপন দিয়ে লোক নিয়োগ করার কথা বলেছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, যে পদগুলি ছিল তপসিলি উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তাসহ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আরও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় কতজন দলিত মানুষ অর্থাৎ তপসিলি জাতি উপজাতির মানুষ কাজ করেন তার সঠিক তথ্য আজও তারা প্রকাশ করেননি। বিশ্বব্যাঙ্কের একটি রিপোর্টে জানা গেছে যে ভারতের ৯০ কোটি মানুষের মধ্যে ১৫ কোটি মানুষের অবস্থা আর্থিকভাবে স্থিতিশীল। বিশ্বব্যাঙ্ক জানিয়েছে যে এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্রদেশ ভারত ও বাংলাদেশ। 'সাম্যবাদী ধাঁচের সমাজ', 'গরিবি হটাও', 'বিশ্বায়ন' প্রভৃতি লোকভোলানো স্লোগানে ভারতের ৮৫ ভাগ মানুষের মধ্যে শতকরা ৪৫ ভাগ মানুষ বসবাস করেন গরিবি সীমার নিচে। এরা সকলেই অর্থাৎ ৯৯% মানুষ দলিত, সংখ্যালঘু, আদিবাসী তথা অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষ।

চৌদ্দ-পুরুষ ধরে 'মেরিটোরিয়াস' ব্যক্তিদের হাতেই তো দেশের পরিকল্পনা রচনা ও প্রয়োগের ভার রয়েছে, তা হলে কেন এমন হল? ২৫ বছরেও সরকারি অনুমোদন পায়নি উত্তর চব্বিশ পরগনার মধ্যমগ্রামের একটি আদিবাসী প্রাথমিক স্কুল। বগুলা কলেজ, যেখানে মূলত তপসিলি মানুষের সন্তানেরাই পড়াশুনা করেন সেখানে অধ্যক্ষ নিয়োগ নিয়ে দীর্ঘদিন গড়িমসি চলছিল, জানি না এখনও তার সুরাহা হয়েছে কি না।

ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটের একটি রিপোর্টে জানা গেছে, যে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে সরকারি স্কুলগুলিতে মূলত বাবু-মধ্যবিত্ত-এলিট শ্রেণী থেকে শতকরা ৫ জন ছাত্র তপসিলি জাতির। শতকরা ৩ জন ছাত্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এবং তপসিলি উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা মাত্র শতকরা একজন। শতকরা ৯২ জন ছাত্র-ছাত্রী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ভর্তি হন যাঁরা মূলত অন্য বিভিন্ন জাতি থেকে এসেছেন। অথচ সরকারি আদেশে ১৩১টি ডব্লিউ/ইসি ২২/৩/৯৩ তারিখ অনুসারে এস সি শতকরা ২২ ভাগ এবং এস টি শতকরা পাঁচ ভাগ মোট ২৭ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করার কথা।

সরকারের এই নীতি একেবারে তঞ্চকতা ছাড়া আর কিছু নয়। অস্পৃশ্যতার অভিশাপের জন্য ধনম নাম্নী পাঁচ বছরের ফটফুটে সোনার টুকরো মেয়ে দলিত কন্যা কাট্টিনায়কানপাট্টি বিদ্যালয়ে ভুল করে উচ্চ-বর্ণ জাতির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য রক্ষিত একটি কাচের গ্লাসে জল

পান করে ফেলেছিল। দলিত ছাত্র-ছাত্রীরা জলপান করবে আঁচলা দিয়ে, আর জল ঢেলে দেবে উচ্চ-জাতি বর্ণের ছাত্র-ছাত্রীরা। স্কুলে শিক্ষক ছাত্রীটিকে বেত দিয়ে মেরে এমন শিক্ষা দিলেন তার কৃতকর্মের জন্য ধনম একটি চোখ হারালো। ঘটনাটি ঘটেছিল ৯৫ সালের আগস্ট মাসে তামিলনাড়ুতে।

ওড়িশার কেন্দ্রপাড়া জেলার আওল-এ এক সাব ডিভিসন্যাল অফিসার (ইলেকট্রিসিটি) গিরিধারী মল্লিক নামে এক পিওনকে অকথ্য ভাষাতে গালাগালি করেছিলেন এই জন্য যে সে সাহেবের জন্য খাবার জল এনেছিল। এস ডি ও সাহেব ভেবেছিলেন যে তাঁকে জল দেবে কোন উচ্চ-বর্ণজাতির পিওন। দাই দলিত গিরিধারীর এই অশোভন আচরণে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন সাহেব। ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৯৫ সালের আগস্ট মাসে। দিল্লি থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদপত্রে আমরা দেখেছিলাম যে দিল্লির জুডিশিয়াল সার্ভিসে কর্তব্যরত দলিত অফিসারদের সঙ্গে খুবই দুর্ব্যবহার করা হয়। ম্যাডাম সন্তরওয়ালের পর জেড এস লোহাট নামে আরও একজন দলিত অফিসার-এর ওপর দিল্লির জুডিসিয়াল ডিপার্টমেন্ট প্রতিহিংসামূলক নিপীড়ন চালাচ্ছে।

পশ্চিমবাংলার প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা ঠিক এই ধরনের আচরণ করে সংবাদপত্রের শিরোনাম হয় না। দলিতদের ওপর মানসিক অত্যাচার করা হয় খুবই হাসতে হাসতে। বিধিবদ্ধ নিয়মভঙ্গের অভিযোগ এনে, ট্রেড ইউনিয়নের নাম করে, অথবা কাজ না করার অভিযোগ এনে খুবই ধূর্ততার সঙ্গে দলিত-আদিবাসী মানুষদের তটস্থ করে রাখা।

মনুবাদীদের মত ভীতিসঞ্চার করে ট্রেড ইউনিয়নের নেতারা এবং অফিসের কর্তারা কিছু 'বাগে না আসা' দলিতদের ওপর ভয়ানক অত্যাচার চালান। জয়সিং হাঁসদা স্টেট ব্যাঙ্কের কর্মী। ট্রেড ইউনিয়ন ও ব্যাঙ্কের বড় অফিসার বা ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের যোগসাজশে তাকে বছরের পর বছর গাধার খাটুনি খাটতে হয়েছে। প্রতিবাদ করলে তাকে ঘরে আটকে রেখে মানসিক নির্যাতন করা হয়েছে। তার চিঠিপত্র এমনকি ছুটির দরখাস্ত পর্যন্ত ব্রাঞ্চ ম্যানেজার নিতে অস্বীকার করেছে। তাকে কোনও স্পেশালাইজড ট্রেনিংও দেওয়া হয়নি। সুদীর্ঘ দিন একই জায়গাতে কাজ করিয়ে অন্য বিভাগে (কাউন্টারে) কাজ করতে গিয়ে ভুল করলে মেমোর পর মেমো ধরানো হয়েছে তাকে। অবশেষে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় জিজ্ঞাসাবাদ করেও সে যখন কিছুতেই মাথা নত করছে না তখন তার বিরুদ্ধে নারীমুক্তি আন্দোলনের এক নেত্রীকে দিয়ে ট্রেড ইউনিয়নের নেতারা কর্তৃপক্ষকে অভিযোগ করিয়েছেন। ট্রেড ইউনিয়ন নেতার যখন খুশি তখন আসবেন দু-এক ঘণ্টা একটি প্রায় ফাঁকা কাউন্টারে অথবা চেয়ারে বসে থাকবেন। প্রতিবাদ করলেই 'বেয়াড়াকে শাস্তি দিতে হবে' বলে এক সংগঠিত সন্ত্রাস চালানো হচ্ছে।

জয় সিং জাতিতে সাঁওতাল। আর সাঁওতাল হওয়াটাই অপরাধ। "মাটি কাটবে যারা, দারোয়ানি করবে যারা, তারা কেন কাউন্টারে বসবে?" এটাই বাবুদের কাছে প্রশ্ন। এই মানসিক অত্যাচারের ভয়ে যারা মনুবাদী ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের কাছের লোক হয়ে গেছেন এমন কি হাওলাদারি করেছেন তারা ভালই আছেন। তারা তো চিরকালই গাছেরও খান, তলারও কুড়ান।

শ্যামলী শিকদার ক্যাজুয়াল কর্মী হিসাবে কাজ করেন ভিক্টোরিয়াতে। সুন্দরী, সপ্রতিভ এই দলিত কন্যাটিকে বাগে আনতে না পেরে ট্রেড ইউনিয়নের নেতারা তাকে করেছেন সাটেল কক। আজ ওখানে, কাল ওখানে, পরশু এ কাজ, তরসু সে কাজ। শ্যামলী দেবীও বাপকা বেটি। কিছুতেই কর্তাদের পা জড়িয়ে ধরতে রাজি নন। এমনি বহু ঘটনার কথা বলা যেতে পারে।

সর্বোপরি চুনী কোটালের আত্মহত্যাকে কেন্দ্র করে যখন তোলপাড় হল সারা পশ্চিমবাংলায়। তখন কিন্তু কলকাতার নামী-দামি স্কুলের, কলেজের তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ছাত্র-সংগঠন প্রকাশ্য রাস্তাতে নামেনি। কিন্তু উচ্চশিক্ষা প্রাপ্তির পর চাকরি লাভের একশভাগের ২৭ ভাগ মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ করে দিয়ে গেলেন ভি পি সিং, সেটা পশ্চিমবাংলার এলিটদের সন্তানেরা ভাল চোখে দেখলেন না — ওরা প্রতিবাদে রাস্তায় নামলেন। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে অনগ্রসর দলিত মানুষেরা পেয়েছেন আশার আলো। মহামান্য বিচারপতি সত্যব্রত সিনহা ১৯৯৭ সালের ১৫ জুলাই একটি ঐতিহাসিক রায় দিয়েছেন। ১২ সপ্তাহের মধ্যে রাজ্য সরকার প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত ভর্তির জন্য সুপ্রিম কোর্টের পৃথক পৃথক সিদ্ধান্তগুলির দিকে দৃষ্টি রেখে মণ্ডল কমিশনের সুপারিশগুলি গ্রহণযোগ্য কি না যেন বিবেচনা করেন।

দেশজ মানুষদের আন্দোলন গত পঞ্চাশ বছরে তীব্র রূপ নিচ্ছে। মালদহ, মুর্শিদাবাদের চাঁই সমাজ নিজেদের তপসিলি উপজাতি হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য দাবি করেছেন, তেমনি পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুরসহ উত্তরবঙ্গে বসবাসকারী 'কুরমী' গোষ্ঠী উপজাতি হিসাবে তালিকাভুক্ত হওয়ার আন্দোলন দীর্ঘদিন ধরে চলছে। তেমনি দেশওয়ালি মাঝি, দণ্ডছত্রমাঝি, কোল-কামার বা বিশ্বকর্মা গোষ্ঠীর আন্দোলন আজও অব্যাহত। পাহাড়িয়া, করগা, ঠেঁঠরী, ব্যাইদা, ঘুন্যা, প্যাটকার, অঘোরী প্রভৃতি অন্ত্যজ দলিত মানুষদের তপসিলি জাতির মধ্যে তালিকাভুক্ত করা দরকার।

ভাষা-সাহিত্যের আন্দোলনে গত পঞ্চাশ বছরে সবচেয়ে বেশি ও দীর্ঘকাল আন্দোলন করেছেন ও করছেন সাঁওতাল সমাজ। নিজস্ব ভাষার, তেজে ও বিক্রমে এই ভাষা একেবারে অনন্য। কিন্তু এই ভাষার স্বীকৃতির কোন সরকারি অর্ডার এখনও বার হয়নি যেমন বার হয়নি 'অলচিকি' লিপির মান্যতার সরকারি আদেশ। সাঁওতালি ভাষা। পশ্চিমবঙ্গের বহু 'হড়-মিতান' গোষ্ঠীর মানুষ ওই ভাষাতে কথা বলেন। সাঁওতালি ভাষা তাই দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মাতৃভাষা, এরপর আছে কুড়মালি ও সাদরী ভাষা, উত্তরবঙ্গ, সুন্দরবন এবং পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুরে কুড়মালী ও সাদরী ভাষা প্রচলিত হলেও ওই ভাষার মাধ্যমে কোন পঠন-পাঠন এখনও শুরু হয়নি। অদূর ভবিষ্যতে ওই ভাষাগুলি বৃহৎ ভাষাগোষ্ঠীর চাপে ও ক্রমাগত আক্রমণে অবলুপ্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই ভাষাগুলিকে বাঁচানোর দায়িত্ব সকলের।

দে ব ব্র ত মু খো পা ধ্যা য়

কোথায় গেলেন বিশ কোটি মধ্যবিত্ত

মনে হচ্ছিল যেন এসে গেছে স্বর্গরাজ্য, অথবা আমরা পৌঁছে গিয়েছি মার্কিন মুলুকের কোনও এলাকায়, অন্তত ইউরোপের কোনও ধনী দেশে তো বটেই।

দুনিয়ার যত মহার্ঘ্য, উজ্জ্বল ব্রান্ড — নাম, তা এসে গেছে আমাদের নাগালে। এখন আর শুধু অ্যাম্বাসাডার-ফিয়াটের একঘেয়েমি নয়, এমন কি নয় মারুতির একাধিপত্যও। এখন বাসনা হলেই আমরা বাহিত হতে পারি ওপেল অ্যাস্ট্রা, সিয়েলো, ফোর্ড, উনো, পিজো এবং — ভাবলেও শিহরিত হতে হয় — মার্সিডিজ গাড়িতে। গায়ে চড়াতে পারি অ্যারো, ভ্যান হিউসেন, পিয়ের কার্দাঁ, লাকাস্তে, লী অথবা বেনেটোনের পোশাক। জকি অন্তর্বাস এখন অনায়াসেই হয়ে থাকতে পারে আমাদের দেহলগ্ন। আমাদের পদযুগলে শোভা পেতে পারে গুচ্চি, রিবক বা আদিদাসের পাদুকা।

এখন আমাদের বাড়ির অন্দরমহল আলোকিত করে তুলতে পারে ওয়ার্লপুল, সামসুং, টমসন, সোনি কিংবা আকাই-মার্ক টেলিভিশন অথবা রেফ্রিজারেটর। কেলগের কর্ন ফ্লেকস্ দিয়ে আমাদের সুপ্রভাত শুরু হতে আর কোনও বাধা নেই। সারা দিনই আমরা পান করতে পারি কোকাকোলা, পেপসি অথবা মিরান্দা। সান্ধ্য আসরের জন্যও রাখিনি কোনই অভাব। বলতে গেলে প্রায় সব স্কচ হুইস্কি এখন জলের মত সহজলভ্য। আর একেবারে আক্ষরিক অর্থেই এখন আমাদের হাতের মুঠোয় নোকিয়া, মোটোরোলা অথবা এরিকসনের সেলুলার ফোন।

এখন তো আমাদের ভুবনীকরণের ঋতু, সব বেড়া ভেঙে ফেলার কাল। তাই তো ভারতজননী খুলে দিয়েছেন সব দ্বার এবং সকলকে ডেকে বলছেন, তুমি এসো, তুমিও এসো, তুমি এসো এবং তুমি। এতদিন আমরা দরজা বন্ধ করে রেখেছিলাম, মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল ভারতমাতার সন্তানসন্ততিকে। তারা "ফোরেন" জিনিস শুধু দূর থেকে দেখেছে, অথবা বেআইনিভাবে কিনেছে চোরাবাজার থেকে। আজ আর কোন হীনম্মন্যতা নেই আমাদের। সাহেব-মেমরা যেসব জিনিস ভোগ করে অথবা উপভোগ করে আমরাও তাই এখন করতে পারি স্বচ্ছন্দে। সুতরাং আমরা আমেরিকা অথবা নিদেনপক্ষে ইউরোপের কোনও সচ্ছল দেশে আছি, একথা ভাবতে বাধা কোথায়?

আমরা এই পোড়া দেশের বাসিন্দারা যারা স্বাধীনতার পর থেকে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের ঘেরাটোপের মধ্যে থেকেছি, তারা তো এই ভুবনীকরণের যুগে (অথবা হুজুগে) দুনিয়ার সব দোকানদারকে আমাদের হাটে ডেকে আনতে চাইবই। কিন্তু ওইসব দোকানদার, যাদের

দেশে দেশে ব্যবসার রমরমা, বিক্রিবাটার হিসেব যাদের আর লক্ষ নিযুতে কুলোয় না, ধরে রাখতে হয় শতকোটি ডলারের অঙ্কে, তারা কেন ছুটে এলো একাধিক সমুদ্র এবং বেশ কিছু নদী পেরিয়ে? নিশ্চয় ধন ধান্য-পুষ্প ভরা এই দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য বিদেশী বণিকের দল এখানে আসেনি। তারা এসেছে একটি মাত্র কারণে - নতুন বাজারের সন্ধানে।

কেন তাদের নিজের-নিজের দেশের বাজারের কী হল? সেই সব বাজার অবশ্যই আছে, কিন্তু চাহিদার বিচারে তারা হয়ে এসেছে প্রায় কানায়-কানায় ভর্তি। শুধু ওই সব বাজারের চাহিদা মিটিয়ে সুতরাং খিদে আর মিটছে না ওই কোম্পানিগুলোর। তাই এখন চাই নতুন নতুন বাজার, যেখানে বিক্রি করা যাবে তাদের তৈরি হরেক রকমের পণ্য, পারফিউম থেকে শুরু করে মোটরগাড়ি, সবকিছু।

আর বাজারের খোঁজ যদি করতে হয় তবে ভারতের মত সম্ভাব্য বাজার আর কোথায় হতে পারে? হ্যাঁ, এ-কথা ঠিকই যে, ভারত গরিব দেশ অথবা গরিব মানুষের দেশ বলেই পৃথিবীতে পরিচিত। কিন্তু ভুললে চলবে না যে, এটা হল জনসংখ্যার বিচারে দুনিয়ার দুই নম্বর দেশ। এক শ' কোটির মধ্যে বেশ কয়েক কোটি লোক না-হয় দারিদ্র্যসীমা নামে একটা কাল্পনিক রেখার নিচে বাস করে, কিন্তু তার পরেও তো থেকে যাচ্ছে আরও কয়েক কোটি লোক এবং তারা তো প্রত্যেকই এক-এক জন ক্রেতা। দরিদ্র লোকের সংখ্যা ঠিক কত, তা নির্ধারণ করতে আমাদের পণ্ডিতেরা উনিশ পিপে নস্য ফুরিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু আমাদের দেশে মধ্যবিত্তের সংখ্যা কত তা নিয়ে মোটামুটি একটা সিদ্ধান্তে অনেকেই পৌঁছে গেছেন। সেই ম্যাজিক-সংখ্যাটি নাকি বিশ কোটি। দুনিয়ার যত দোকানদার, তাদের নজর ওই বিশ কোটির দিকে। লক্ষ্যভেদ করার সময় অর্জুন অন্য সব কিছু ভুলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন শুধু মাছের চোখের দিকে। মাল্টিন্যাশনাল নানা কোম্পানিও ভারতের দারিদ্র্য ও অন্যান্য কলুষিত সমস্যার কথা ভুলে চোখ রাখতে চেয়েছে শুধু ওই বিশ কোটির দিকে।

সুতরাং এই বিশ কোটির মন জয়ের জন্য তারা যে উঠে পড়ে লাগবে তাতে আর অবাক হওয়ার কী আছে। তাই তো আমরা দেখতে পেয়েছি খবরের কাগজ এবং সাময়িক পত্রের পাতা জুড়ে, টেলিভিশনের পর্দা জুড়ে এবং হোর্ডিংয়ের টিনের পাত জুড়ে কত না মনোহারি বিজ্ঞাপন। অবশ্য এই মন-জয়ের দৌড়ে যে শুধু বিদেশী দোকানদারেরাই সামিল তা নয়, তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে আমাদের স্বদেশী ব্যবসায়ীরাও কারণ এদের লক্ষ্যও তো ওই বিশ কোটি মধ্যবিত্ত। তাই টিভিতে ক্রিকেট খেলা ভাল করে দেখার উপায় নেই, কাহিনী-চিত্রও উপভোগ করার উপায় নেই। ক্ষণে-ক্ষণেই ভেসে উঠছে বিজ্ঞাপনের ছবি আর সেই সব দেখে ভারতমাতার সন্তান-সন্ততিদের আরও বেশি করে মনে হতে থাকে, এদেশের দারিদ্র্য মিথ্যে, এদেশের দুর্ভোগ মিথ্যে, অভাব-অনটন মিথ্যে, সত্য শুধু নিত্য-নতুন পণ্য কেনার স্বপ্ন।

যাদের উপর চিত্রনাট্য রচনার দায়িত্ব পড়েছিল তারা গল্পটাকে এই ভাবেই সাজাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কে জানে কী ছিল বিধাতার মনে, হঠাৎ যেন মনে হতে লাগলো, সব হিসেব মিলছে না, কোথায় যেন একটা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। কারখানায়-কারখানায়, এমন কি দোকানে-দোকানেও জমে যাচ্ছে নানা পণ্যের পাহাড়। এক দিকে উৎপাদন দিতে হচ্ছে কমিয়ে, অন্য দিকে ঘোষণা করতে হচ্ছে বিশেষ ছাড়, ডিসকাউন্ট, রিবেট, এক্সচেঞ্জ, কিস্তিতে বিক্রির কথা। যথেষ্ট ক্রেতা কি তবে মিলছে না? তবে তারা গেলেন কোথায়, সেই বিশ কোটি মধ্যবিত্ত? তাদের চাহিদার কথা ভেবেই তো হরেক পণ্য উৎপাদনের মাসিক বা বার্ষিক হিসেব করা হয়েছিল। সেই হিসেব মিলছে না কেন?

দামের উপর ছাড় (এমন কি ৪০ শতাংশ পর্যন্ত) অথবা একটি পণ্য কিনলে সঙ্গে একটি উপহার তো ব্যবসায়ীরা এমনি এমনি দেয় না। ক্রেতা যখন সহজে দোকানমুখো হতে চায় না তখনই করতে হয় এই সব কৌশল। একটি রেফ্রিজারেটর কিনলে পেয়ে যাচ্ছেন একেবারে বিনামূল্যে একটি অটোম্যাটিক ক্যামেরা। একুশ ইঞ্চির একটি টেলিভিশন সেট কিনলে ১৪ ইঞ্চির ছোট একটি টেলিভিশন সেট পেয়ে যাবেন মুফতে। একটি রেফ্রিজারেটর কোম্পানি আপনাকে লোভ দেখাচ্ছে, একটি বড় মাপের ফ্রিজ কিনলে সঙ্গে একই দামে পাওয়া যাবে একটি ছোট মাপের ফ্রিজ, যেটি আপনি রাখতে পারবেন শয়নকক্ষে। এর সঙ্গে আছে পুরনো টিভি বা ফ্রিজ একচেঞ্জের আহ্বান। পুরনো যন্ত্রটি জমা দিলে হাজার দশেক টাকা পর্যন্ত ছাড়। এ-ছাড়া হরেক রকমের প্রতিযোগিতা আর উপহার তো আছেই। সেই সঙ্গে লক্ষ করে দেখবেন, কিস্তিতে কেনার শর্ত কেমন শিথিল হয়ে আসছে। কিস্তিতে কিনতে গেলে এখন অনেক দোকানেই আর কোনও গ্যারান্টি লাগছে না। অথচ কিছুদিন আগে পর্যন্ত এটা ছিল অন্যতম পূর্বশর্ত। মোটর গাড়ি কিনতে মোটা টাকার ঋণ দেওয়ার জন্যও টাকার থলি নিয়ে বসে আছে বিভিন্ন কোম্পানি।

দেশ জুড়ে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে একটা মন্দা চলছে তা তো আমরা জানি। এই মন্দার হাওয়াটা সবেচেয়ে বেশি করে লেগেছে ওই ফ্রিজ-টিভি-ওয়াশিং মেশিনের মত পণ্যের ক্ষেত্রে, যেগুলো ভোগ্যপণ্য ঠিকই, কিন্তু লোকে রোজ-রোজ কেনে না। রঙিন টেলিভিশন তৈরির হার বেড়ে চলেছিল প্রায় হু হু করে, হঠাৎ গত বছরে তা পড়ে গেছে ধপাস করে। রেফ্রিজারেটরের অবস্থাও অনেকটা তাই। আর নামি-দামি মোটর গাড়ি? তাদের কথা যত কম বলা যায় ততই ভাল।

বিশ কোটি মধ্যবিত্তের মধ্যে আবার যারা উপরের দিকে, অর্থাৎ যারা উচ্চ মধ্যবিত্ত অথবা ধনী শ্রেণীতে পড়েন তাদের কব্জা করার জন্যই বাজারে নেমেছে মোটর গাড়ি প্রস্তুতকারকেরা। তাই মোটর গাড়ির বাজারেও রীতিমতো ভিড় লেগে গেছে খরিদ্দার ধরার জন্য। কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যক খরিদ্দারেরই যে দেখা নেই। মার্সিডিজ গাড়ির নাম জগৎ-জোড়া। দুনিয়ার সেরা তিনটি গাড়ির নাম করতে হলে বলতে হবে রোলস্ রয়েজ, ক্যাডিলাক এবং মার্সিডিজ। সেই মার্সিডিজের তেমন ক্রেতার খোঁজ মিলছে না এই পোড়া দেশে। দাম তো সামান্য মাত্র — ২৫ লাখ টাকা। এই দাম শুনেই ভয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে ক্রেতারা। তাই এখন প্রস্তুতকারকেরা ক্রেতাদের ডেকে ডেকে বলছে, আরে আসুন, আসুন, গাড়ি এখনই কিনতে হবে না, গাড়িটা খানিকক্ষণ চালিয়ে দেখুন না, পরে ইচ্ছে হলে কিনবেন। কিন্তু বিনা পয়সায় কিছুক্ষণের জন্য হলেও মার্সিডিজ চড়ে ঘুরে বেড়াবার লোভ দেখানো সত্ত্বেও বেশি ক্রেতার মন ভেজানো যাচ্ছে না। পণ্য বিপণনের পরিভাষায়, মার্সিডিজ এদেশে ব্রান্ড হিসেবে এ পর্যন্ত 'ফ্লপ' হিসেবে চিহ্নিত হতে চলেছে, যা প্রায় অকল্পনীয় বলা চলে।

বিভিন্ন ধরনের পণ্যের ক্ষেত্রে চাহিদায় যে মন্দার লক্ষণ দেখা দিয়েছে তার আরও উদাহরণ দেওয়া যায়। কিন্তু তা দিয়ে খুব বেশি লাভ নেই। মূল প্রশ্ন হল, কেন এমন হল? চাহিদা কি হঠাৎ কমে গেল? নাকি গোড়াতেই গলদ ছিল অর্থাৎ বাজারটা যত বড় ধরা হয়েছিল আসলে তা ঠিক তত বড় নয়? বিদেশ থেকে যে-সব কোম্পানি এসেছে তারা কি ভারতীয় ক্রেতাদের ধরন-ধারণ ঠিকমতো বুঝতে পারেনি? এই রকম নানা প্রশ্ন এই মুহূর্তে উঠেছে এবং সেগুলির উত্তর খোঁজারও চেষ্টা চলছে জোর কদমে।

গোড়ায় গলদ যে একটা ছিল তা বিভিন্ন কোম্পানির বিপণনের সঙ্গে যুক্ত কর্তাব্যক্তিরা

মোটামুটি স্বীকার করে নিচ্ছেন। অর্থাৎ ওই বিশ কোটি সংখ্যাটা ততটা সঠিক নয় এবং যদি সঠিক হয় তবু ওই বিশ কোটি মানুষকে সমগোত্রীয় বলে ভাবা উচিত নয়। অর্থাৎ ওই সংখ্যাটা যত বিপুল, সুতরাং আকর্ষক দেখাক, ওদের সকলের ক্রয়ক্ষমতা সমান নয়। এদের কেনার ক্ষমতা বিভিন্ন মাপের।

এই প্রসঙ্গে একটি সঙ্গত প্রশ্ন উঠতেই পারে। এই যে তথাকথিত মধ্যবিত্ত অর্থাৎ প্রধান ক্রেতাসমাজ, এর প্রকৃত আকার নির্ধারণের বিজ্ঞানসম্মত কোনও প্রয়াস হয়েছে কি? অবশ্যই হয়েছে। এর একটি সাম্প্রতিক নিদর্শন হিসেবে ন্যাশনাল কাউন্সিল অব অ্যাপ্লায়েড ইকনমিক রিসার্চের (এন সি এ ই আর) তিন অর্থনীতিবিদ ও পরিসংখ্যানবিদের একটি গবেষণাপত্রের উল্লেখ করা যায়। এখানে তাঁরা আয়ের ভিত্তিতে আমাদের জনসংখ্যাকে মোট পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছেন। এই ভাগ অনুসারে বাজারের কাঠামোটি দাঁড়াচ্ছে এই রকম :

(এক) **খুব বড় লোক (ভেরি রিচ)** : ১০ লাখ পরিবার। লোকসংখ্যা ৫৭ লাখ।

(দুই) **প্রধান ক্রেতা শ্রেণী (কনসিউমিং ক্লাস)** : ২ কোটি ৮৬ লাখ পরিবার। লোকসংখ্যা ১৬ কোটি ৩৭ লাখ।

(তিন) **আরোহী শ্রেণী (ক্লাইম্বার্স)** : ৪ কোটি ৮০ লাখ পরিবার লোকসংখ্যা ২৭ কোটি ৬১ লাখ।

(চার) **অভিলাষী শ্রেণী (অ্যাসপিরান্টস)** : ৪ কোটি ৮০ লাখ পরিবার ; লোকসংখ্যা ২৭ কোটি ৭১ লাখ।

(পাঁচ) **দরিদ্র বা নিঃস্ব শ্রেণী (ডেস্টিটিউটস্)** : সাড়ে তিন কোটি পরিবার লোকসংখ্যা ২০ কোটি ২০ লাখ।

এই পঞ্চ শ্রেণীর বার্ষিক আয়ের মাপকাঠি ধরা হয়েছে এইরকম :

(এক) ২ লাখ ১৫ হাজার টাকার উপরে।

(দুই) ৪৫,০০১ থেকে ২ লাখ ১৫ হাজার টাকা।

(তিন) ২২,০০১ থেকে ৪৫,০০০ টাকা।

(চার) ১৬,০০১ থেকে ২২,০০০ টাকা।

(পাঁচ) ১৬,০০০ টাকা পর্যন্ত।

এই যে বিশেষজ্ঞরা আমাদের ক্রেতাদের এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছেন, এদের মধ্যে প্রথম এবং পঞ্চম শ্রেণী দুটি নিয়ে খুব অস্পষ্টতা নেই। খুব বড়লোক বলতে কী বোঝায় তা আমরা মোটামুটি জানি, একেবারে নিচের তলার মানুষ সম্পর্কেও আমাদের একটা ধারণা আছে। আমরা একটু সমস্যায় পড়ি মাঝের তিনটি শ্রেণী নিয়ে। দেখা যাক, বিশেষজ্ঞরা শুধু আয়ের কথা বাদ দিয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর কেনাকাটার ধরন বিচার করে কীভাবে তাদের চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। শুরু করা যাক উপরের দিক থেকে।

(এক) সবচেয়ে দামি জিনিসই এরা অর্থাৎ খুব বড়লোকেরা কিনবেন।

(দুই) প্রধান ক্রেতাশ্রেণী হিসেবে যাদের চিহ্নিত করা হয়েছে তারাই যে অধিকাংশ ভোগ্যপণ্য কিনবেন তা তাদের নামকরণ থেকেই পরিষ্কার।

(তিন) আরোহী শ্রেণী অর্থাৎ যারা ক্রমশ উপর দিকে উঠছেন তারা বেশ কিছু ভোগ্যপণ্য (খাবার-দাবার, পোশাক ইত্যাদি বাদে) কিনবেন, কিন্তু সেগুলি হবে অপেক্ষাকৃত কম দামের। যেমন সাদা-কালো টিভি, সেলাই মেশিন, মশলা গুঁড়ো করার মেশিন ইত্যাদি।

(চার) আরোহী শ্রেণীর পরের ধাপে যারা, অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা আছে অথচ তেমন রেস্ত নেই তারা কিনবেন ট্রানজিস্টার বা বাইসাইকেল।

(পাঁচ) এদের নিয়ে বিশেষ মাথাব্যথা নেই, কারণ এদের কল-কারখানায় তৈরি পণ্য কেনার ক্ষমতা নিতান্তই সীমাবদ্ধ।

আমরা যদি মোটামুটি উপরের এই শ্রেণীবিভাগকে মেনে নিই তবে বোধ হয় গোলমালটা কোথায় হচ্ছে তা বুঝতে পারব। নিত্য-নতুন নামী-দামি পণ্য নিয়ে যারা বাজারে নামছেন, তা তারা দেশী শিল্পপতিই হোন আর বিদেশী বণিকই হোন, তারা লক্ষ্য হিসেবে বেছে নিয়েছেন প্রথম দুটি শ্রেণীকে এবং তৃতীয়োক্ত শ্রেণীর একটা অংশকে। এখানে আলোচনার সুবিধের জন্য আমরা যদি আপাতত এই তিনটি শ্রেণীর দিকেই নজর দিই তবে দেখতে পাবো এদের সকলকে সমগোত্রীয় ভাবা ঠিক নয় তো বটেই, এমন কি একটি শ্রেণীর মধ্যেও সকলের ক্রয়ক্ষমতা সমান বলে ধরে নেওয়া ঠিক নয়।

প্রথম শ্রেণীতে বার্ষিক আয় যদি হয় ২ লাখ ১৫ হাজার টাকার উপরে তবে মাসিক আয় দাঁড়ায় ১৮ হাজার টাকার ঊর্ধ্বে। কিন্তু এর তো কোনও ঊর্ধ্বসীমা নেই। এই গরিব দেশেও এমন অনেক ব্যবসায়ী-ডাক্তার-আইনজীবী আছেন যাদের মাসিক আয় কয়েক লাখ টাকা। এদের অনেকেই আবার আয়কর ফাঁকি দেন। সুতরাং কালো টাকার মালিক। মাসে ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা উপার্জন করেন এমন চাকুরিজীবী অনেক আছেন এবং তাদের ভালো টাকাই আয়কর হিসেবে দিতে হয়। তাদের সঙ্গে কি ওই ব্যবসায়ী-ডাক্তার-আইনজীবীর ক্রয়ক্ষমতার তুলনা চলতে পারে?

দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণী, অর্থাৎ যারা হলেন দোকানদারদের প্রধান ভরসা, তাদের অবস্থাটা খতিয়ে দেখলে ছবিটা আরও স্পষ্ট হবে। এদের মাসিক আয় হবে ৩৭৫০ টাকা থেকে ১৮ হাজার টাকার কাছাকাছি। নিতান্ত শিশুও বলে দিতে পারবে এই শ্রেণীর মধ্যে সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ স্তরের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা সমান হতে পারে না। তৃতীয়োক্ত শ্রেণী সম্পর্কেও একই কথা খাটবে।

এই তো গেল হিসেবের একটা গোলমাল। দ্বিতীয় গোলমালটা ঘটেছে অন্যভাবে। প্রধান ক্রেতা শ্রেণী বলে যাদের চিহ্নিত করা হয়েছে তাদের সংখ্যা ১৬ কোটির উপরে হতে পারে, কিন্তু এরা প্রত্যেকই ক্রেতা নন। এদের মধ্যে শিশু থেকে নাবালক পর্যন্ত সকলেই আছে। এদের প্রত্যেক্যেরই খাদ্যদ্রব্য এবং পোশাক-আশাক দরকার হয়, কিন্তু প্রত্যেকের একটা করে ফ্রিজ, টিভি অথবা সেলুলার ফোন লাগে না। এমন কি খুব বড়লোক শ্রেণীতে ৫০ লাখ নারী-পুরুষ থাকলেও তারা প্রত্যেকে একটি করে গাড়ি অথবা এয়ার কন্ডিশনার কিনবেন না। এন সি এ ই আর সংস্থার তিন অর্থনীতিবিদ পরিবার পিছু গড়পড়তা লোকসংখ্যা ধরেছেন পৌনে ছয়। ধনী পরিবারের সংখ্যা যদি হয় ১০ লাখ তবে পরিবার পিছু পাঁচ-ছয়টা গাড়ি থাকবে, একথা ধরে নেওয়া যায় না কোন মতেই।

বিদেশ থেকে যারা এখানে পণ্য বেচতে এসেছেন তারা আরও একটা ভুল করেছেন। তারা ভারতীয় ক্রেতাদের মানসিকতা ঠিকমত ঠাহর করতে পারেননি। ইউরোপ আমেরিকার নানা দেশে ভোগ্যপণ্যের কারবারিদের যে এত রমরমা তার একটা বড় কারণ, ওদেশে ক্রেতারা সাধারণত একটা জিনিস খুব একটা বেশি দিন ব্যবহার করেন না। ফ্রিজ-টিভির কথা তো ছেড়ে দেওয়া গেল, মোটর গাড়ি পর্যন্ত তাঁরা কয়েক বছর অন্তর বদলে ফেলেন। সেই কারণে ওই সব দেশে জিনিসপত্র এমনভাবে তৈরি হয় যাতে দু-চার বছর চলে এবং তারপরই বেরিয়ে যায় নতুন মডেল।

আমাদের দেশে ব্যাপারটা একেবারেই উল্টো। এখানে যখন আমরা কোন জিনিস কিনি

তখন ধরে নিই তা সারা জীবন না চললেও দশ-বিশ বছর তো চলবেই। তিরিশ বছর আগেকার মোটর গাড়ি দিব্যি আমাদের রাস্তায় বিহার করছে এবং তা নিয়ে যে আমাদের কোনও লজ্জাবোধ আছে তা নয়। ইউরোপ-আমেরিকায় এ কথা ভাবাই যায় না। শুধু যাকে বলা হয় "কনজিউমার ডিউরেবল্" শ্রেণীর পণ্য, যেমন ফ্রিজ বা টিভির ক্ষেত্রেই নয়, জামাকাপড় জুতোর বেলাতেও আমরা চাই এই সব বেশ কিছু দিন ধরে পরতে। এ দেশে আমরা যতটা শৌখিন বা হাল ফ্যাশনের জিনিস চাই, তার চেয়ে বেশি চাই মজবুত জিনিস।

আরও কয়েকটি কারণে ভোগ্যপণ্যের বাজারে মন্দা দেখা দিয়েছে। মনমোহন সিংয়ের অর্থনৈতিক সংস্কার পর্ব শুরু হওয়ার কিছুদিন পরে হঠাৎ চাকুরিজীবীদের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধে লাফিয়ে-লাফিয়ে বাড়তে শুরু করেছিল। সদ্য এম বি এ পাস করা ছেলেমেয়েরা মাসিক পঞ্চাশ হাজার টাকায় চাকুরিজীবন আরম্ভ করছিল। ওদিকে, উপরের দিকেও কোনও সীমা ছিল না। প্রধানত বিদেশী ব্যাঙ্ক, অর্থ প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি এই ধারার সূত্রপাত করে। অন্যান্য কোম্পানিও বেতন বৃদ্ধি করতে বাধ্য হয়। কিন্তু গত বছর দুই ধরে এই ধারা বদলে গেছে। কারণ বাজারি বাড়বাড়ন্তের যে আশায় এই বিপুল আয়োজন করা হয়েছিল সেই আশা পূরণ হয়নি: ফলে এখন শুরু হয়েছে বেতনভুক ব্যক্তিদের সুযোগ-সুবিধে ছাঁটাই। বেতন বাড়ানো নিয়ে আগের মাতামাতিও আর নেই।

যে-সময়ে বেতন বৃদ্ধির হুজুগ ওঠে সেই সময়েই হর্ষদ মেটা ও তার সমগোত্রীয়দের কল্যাণে শেয়ার বাজারেও রমরমা দেখা দেয়। ফলে বেশ কিছু লোকের হাতে চলে আসে বাড়তি পয়সা। বাজারেও তার প্রভাব পড়ে। কিন্তু আমরা সকলেই জানি, সেই ফানুসও বেশ কিছুদিন হলো ফেঁসে গেছে। শুধু তাই নয়, ইদানীং অনেক কোম্পানিরই লাভের অঙ্ক কমে যাচ্ছে, সুতরাং তারা ডিভিডেন্ডের অঙ্ক কমাতে বাধ্য হচ্ছে। ফলে এই খাতে মধ্যবিত্তের আয় কমে যাচ্ছে।

এই পটভূমিতে নামী-দামি পণ্যের চাহিদার ক্ষেত্রে মন্দা দেখা দেওয়াটা অস্বাভাবিক বলে মনে হবে না। যারা এই ধরনের পণ্য বিপণন করেন তারা এই কথাটা মনে রাখেননি যে, আমাদের মতো দেশে মানুষের খরচের ধারাটা অন্য ধরনের। এখানে খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-আশাক বাড়ি ভাড়া, স্কুলের বেতন ইত্যাদি জরুরি খরচ মেটাবার পর অধিকাংশ মানুষের হাতেই যথেষ্ট বাড়তি পয়সা থাকে না, যা দিয়ে তারা নিত্য নতুন ফ্রিজ-টিভি-স্কুটার-মোটর গাড়ি শ্রেণীর পণ্য কিনতে পারেন।

ভারতের মতো দেশের বাজারটা ঠিক মতো বুঝতে না-পারার ফল যা হবার তাই হয়েছে। মোট জনসংখ্যার তুলনায় মুষ্টিমেয় না-হলেও অল্প সংখ্যক মানুষের চাহিদা মেটাতে বাজারে নেমে পড়েছে দেশী-বিদেশী হরেক কোম্পানি। যারা জুতো প্রস্তুত করেন তাদের অবস্থাটা উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়। তারা হাজার-দু'হাজার টাকা দামের জুতো বাজারে ছেড়েছেন। শুধু এই কঠিন বাস্তবটাকে মনে রাখেননি যে, স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরেও এ দেশে সব মানুষের এক জোড়া কম দামি জুতো কেনার সামর্থ্য নেই। গড়পড়তা হিসেবে এখানে এক পাটি জুতো বিক্রি হয়ে থাকে মাথা পিছু অর্থাৎ প্রতি দুজনে এক জোড়া সহজ ভাষায় বলতে গেলে, অর্ধেক মানুষই থাকেন খালি পায়ে। সুতরাং দামি জুতো যারা তৈরি করছেন এবং বাজারে ছাড়ছেন তাদের মাত্র কয়েক লাখ লোকের পদবন্দনা করা ছাড়া গতি নেই।

সামান্য (বা অসামান্য) জুতোরই যদি এই অবস্থা হয় তবে আরও দামি-জিনিসের কী হাল হতে পারে তা তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি।

হোসেনুর রহমান

৫০ : স্বাধীনতা ও মধ্যবিত্ত বাঙালি

স্বাধীনতার যুদ্ধ, স্বাধীনতার জন্যে ত্যাগ, স্বাধীনতার জন্যে অনুরাগ একটি প্রার্থনা। এই অনুরাগের ভাষা হল : উদয়ের পথে শুনি কার বাণী....। জিজ্ঞাসা হল : রাত্রির তপস্যা কি আনিবে না দিন....। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে অন্য এক সময়। স্বাধীনতার অর্থ : মানুষ সৃষ্টি করতে পারে, যুক্ত হতে পারে, যুক্তি করতে পারে, অবুদ্ধি থেকে বুদ্ধিতে পৌঁছতে পারে কেবল স্বাধীন মানুষ হিসেবে, পরাধীন মানুষ হিসেবে নয়। আমরা স্বাধীনতার যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলাম একটি মানুষের চিন্তার, ধারণার মাটিতে দাঁড়িয়ে। তিনি মহাত্মা গান্ধী। গান্ধী আমাদের বোঝাতে চেয়েছিলেন স্বাধীনতার জন্যে আমাদের বিশেষভাবে প্রস্তুত হতে হবে — দেহে মনে প্রবৃত্তিতে। অর্থাৎ মানুষ কেবল রাজনৈতিক অর্থনৈতিক হয়ে উঠলেই স্বাধীনতা সার্থকলাভ করবে না। তাকে গোটা মানুষ হতে হবে, যেমন ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা এ বসুন্ধরা।

১৯৪৭ পরবর্তীকালে এই মানুষ, বিশেষত মধ্যবিত্ত যারা তারা বিয়াল্লিশের বিপ্লব-কে অচিরে বিস্মৃত হল। তদের যুক্তি : সময় কোথা সময় নষ্ট করার। এখন নিজের ঘর-বাড়ি সাজানোর সময়। এতদিন তো গেল ত্যাগে, পরাধীনতায়, ক্লেশে। এবার শ্রীবৃদ্ধি চাই। মধ্যবিত্ত উত্তর স্বাধীনতার জীবনে ইতিহাস বিমুখ হল। চারণকবি মুকুন্দদাসের গান কেবল বন্ধুবর সবিতাব্রত দত্তই রক্ষা করে গেলেন। আজ তিনিও নেই। সুশীল পাঠক বলবেন এত হাতাশা কেন? আরও তো কত নতুন এসেছে। এত ট্রাডিশনাল হলে চলে?

কিন্তু হতাশা এই জন্যে যে একদা মধ্যবিত্ত বাঙালি তার বুদ্ধি ও চিত্তবৃত্তির জন্যে সারা ভারতবর্ষে এক বলিষ্ঠ, উদার, শিক্ষিত, সাহিত্য-বিজ্ঞান-দর্শন সচেতন জনগোষ্ঠী বলে সুপরিচিত ছিল। এই পরিচয়ে কোন গ্লানি ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর কথা বাদ দিচ্ছি। এই শতাব্দীর গোড়া থেকে ডাক্তার, উকিল, শিক্ষক, অধ্যাপক, সাহিত্যিক বাঙালি বাংলা, বিহার, ওড়িশা, অসম, উত্তর ভারতে ছড়ি ঘুরিয়েছে ক্রমাগত। ছুটি কাটাতে চলে গেছে মধুপুর, শিমুলতলা, জসিডি, গিরিডি অবলীলাক্রমে। দার্জিলিং কিংবা শিলং-এ অমিত রায়-লাবণ্যদের দেখা গেছে — সুললিত কণ্ঠে শুদ্ধ ইংরাজি উচ্চারণে, রবিঠাকুরের আর নিয়মরক্ষায় আভিজাত্যের পতাকা বহন করে চলেছে সগৌরবে। কাশী, বেনারসে সম্পন্ন বাঙালি পরিবারের বাড়ি থাকতে হত আবার ওই আভিজাত্য নামক কবচটি রক্ষা করার জন্যে।

সেকালে এহেন মধ্যবিত্ত বাঙালি পোশাকে, পরিচ্ছদে, শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে বাঙালি ছিল

প্রভূত পরিমাণে। আবার ইংরাজি ভাষায় তাদের অধিকার ছিল অনায়াস, স্বচ্ছন্দ। এই সাবলীল বাঙালিকে দেখেই বাকি ভারতবর্ষ সচকিত হত, বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় হয়ত বা কিছুটা আতিশয্যও করে বসত। 'এমনটি আর ভারতবর্ষে দেখা যায় না'। হ্যাঁ, লখনউ-এর কফি হাউসে সেকালে সমাজবিজ্ঞানী ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে পেয়ে উত্তর প্রদেশের মানুষ সচকিত হত বৈকি? নৃ-বিজ্ঞানী ডি এন মজুমদারকে লখনউ বিশ্ববিদ্যালয় আজও ভুলে যেতে পারেনি। ভুলে যেতে পারেনি বিহারের মানুষ বনফুল, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়কে। কিন্তু উত্তর স্বাধীনতার ভারতবর্ষে বাঙালি যে নিজেকে ভুলে গেছে। এই হল বর্তমান বাঙালি জীবনের এক নম্বর কড়চা।

এখন বলা হচ্ছে ইতিহাসে শেষ থেকে শুরুতে যাওয়া বিজ্ঞানসম্মত। কারণ এ-কালকে যত ভাল প্রত্যক্ষ করি, বুঝি, ধরতে পারি তেমন যে পারি না সে কাল-কে। পাঠাগার, মহাফেজখানা, দলিল-দস্তাবেজ এসব বুঝি। এও বুঝতে পারি মানুষের স্বভাব কত বেশি কিংবা কম বলা, কিংবা নাই বলা। এই তো অতি সম্প্রতি বি বি সি একটি ঐতিহাসিক অতিকথন (যা আমরা এতদিন চরম, মর্মান্তিক সত্য বলে জেনে এসেছি) ছিন্নভিন্ন করে দিল একটি অসাধারণ তথ্য চিত্রে। তা হল 'দ্য মিথ অব স্প্যানিশ ইনকুইজেশন'। আজ বাঙালি মধ্যবিত্ত যার নাকি বাড়বাড়ন্ত এত যে বহুজাতিক সংস্থাদের ভিড় কলকাতায়, বিদেশী গাড়ি, ফ্রিজ, টেলিভিসন সেট, বস্ত্র, পাদুকার দোকানে ছয়লাপ, কলকাতা সুন্দরীর কোলে এখন বিশ্বায়ন দর্শনের বই, তার হাতের কাছে স্কচ হুইস্কি। পথঘাট ভাঙাচোরা এই যা! এদিকে অর্থনীতিবিদ আর সংবাদপত্র বাজার সমীক্ষা করে চলেছে, আর সংবাদপত্র খবর দিয়ে যাচ্ছে নিত্য দিন যে সারা দেশে জনসংখ্যা ৯৫০ মিলিয়ন ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এই সংখ্যাসমুদ্রে মাত্র ২৫০ মিলিয়ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত। এদের পকেটের রসদ দিয়ে কোন মতে দেশের তৈরি ফ্রিজ, মারুতি, টিভি কেনা যেতে পারে। এই মধ্যবিত্ত কষ্টেই আছে। কিন্তু তার এসব চাই। এখন আবার কর্ডলেস আর সেলুলার মধ্যবিত্ত বাঙালির অভিজাতকরণের প্রধান সহায়। কিন্তু তারপর? ঘণ্টা বাজিয়ে বিশ্বায়নস্পৃহায় মত্ত শ্রেষ্ঠীরা ইতিমধ্যে প্লেনের টিকিট বাতিল করে অন্যত্র বাজার সন্ধানে প্রবৃত্ত। কারণ তারা দেখতে পাচ্ছে জিনিস দোকানে পড়ে পড়ে মরচে ধরে গেল। মধ্যবিত্ত বাঙালি কলকাতার কোন একটি তথাকথিত অভিজাত ক্লাবে (যে দু-চারটে আছে) বছর তিন-চার আগে যত চঞ্চল হয়ে বিদেশী মদের জন্য হা পিত্যেশ করেছে, তার এক সিকিও মাদ্রাজ মহানগরের তেমন তথাকথিত অভিজাত ক্লাবে কেউ করেনি । সেখানে দেশের দু-চারটে উচ্চাঙ্গের পানীয় ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায়নি।

বস্তুত মধ্যবিত্ত বাঙালি ধনের ঐশ্বর্যে কোনদিন ভারতবর্ষে বহুখ্যাত ছিল না। তাই নিয়ে তার কোন আত্মক্ষোভ ছিল না। কেন থাকবে? তার আত্মশক্তি ছিল অন্যত্র। বিবেকানন্দের 'বর্তমান ভারত', রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী সমাজ', সুভাষচন্দ্রের 'তরুণের স্বপ্ন', প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মনীষা ও জীবন সাধনা, রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন বাঙালিকে বিশ্বায়নের (যার অর্থ globalisation of finance, market) নেশা ধরিয়ে দেয়নি, দিয়েছিল যা তাকে বলে বিশ্বচেতনা। রামমোহন থেকে রামকৃষ্ণ এই বিশ্বচেতনাকে আমাদের মধ্যে সযত্নে গড়ে তুলেছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী আমাদের জীবনে ইতিহাস চেতনা, রসবোধ, সাহিত্য-শিল্পে ধারণা পরিস্ফুট করেছিলেন প্রভূত পরিমাণে। সেদিন আমরা শিখেছিলাম জীবনটা কেবল নিত্য সুখভোগের ভোগ্যবস্তু নয়। আমরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাইনি। সময় ছিল না এসব চাইবার। নৈতিক মনোবল ছিল বাঙালির সেদিন অপরিসীম। সে পপুলার রিলিজন নিয়ে তেমন 'মাথা

ঘামায়নি। বিবেকানন্দ এই কাজটি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে পারলেন। 'মানুষই যে ভগবান। তার সেবা করা চাই।' বন্ধু চল ফিরে মনোনিকেতনে। জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ তাঁর মত করে বললেন, 'মানুষের দায় মহামানবের দায়, কোথাও তার সীমা নেই। অন্তহীন সাধনার ক্ষেত্রে তার বাস।...'

আমরা এখানেই সর্ব-ভারতীয় হয়েও ভিন্নপ্রকৃতির মানুষ বলে পরিচিত ছিলাম। বুঝতে পারা গিয়েছিল a free man is a creative man। সৃজনশীল মানুষ সব সময় অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে। কারণ সে মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা-কে শ্রদ্ধা করতে পারে। বিশ্বাস করে প্রতিটি ব্যক্তির বাক্-স্বাধীনতা আছে, ধর্মাচরণে স্বাধীনতা আছে, আর আছে 'ফ্রিডম টু চুস'। এই মধ্যবিত্ত বাঙালি, বিত্তশূন্য বাঙালি, চিত্তবৃত্তি দিয়েই শিল্প সাহিত্য চর্চা করেছে। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ বুঝেছে। আর এখন জনৈক বিত্তবান বঙ্গসন্তান যিনি গর্বে স্ফীত যে বাংলাভাষা তার তেমন আসে না। হঠাৎ থ্রিপিস সুটের অন্তর্দেশ থেকে একটা লকেট বের করে দেখাতে পারেন : যাই করি রামকৃষ্ণকে সঙ্গে রাখি সব সময়। বটেই তো! সোস্যাল এলিটকে কত অলংকার এই দুর্বল দেহে ধারণ করতে হয়। আহা, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যে উচ্চবিত্ত বাঙালির জীবনে এমন আভিজাত্যের প্রতীক হয়ে উঠবেন তা কি তারা কোনদিন কল্পনা করতে পেরেছিলেন। তারা তো বাঙালিকে তথা ভারতবাসীকে সকল ভেদজ্ঞান থেকে মুক্ত করতেই এসেছিলেন!

এখন একটাই প্রশ্ন! এমন হল কেন? আমরা রাতারাতি বড়লোক হতে চাইলাম। বিদ্যাবুদ্ধি এবং নিয়মশৃঙ্খলা এসব জলাঞ্জলি দিয়ে বসে আছি। যেন-তেন প্রকারে লবণ হ্রদের জলশূন্য জগতে একটি ক্ষুধিত পাষাণ, একটি নয় একটির বেশি ৭-১০ লক্ষ মার্কা মোটরগাড়ি, আর সেই প্রাসাদের ডাইনিং স্পেসের জন্যে একটি ৪৮-৫০ হাজার টাকার ডাইনিং টেবল। এসব এখন আলোচনার জিনিস নয়। অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। যত ভয় এখানে। যত সংশয় এখানে। এরই পাশে শুনতে পাচ্ছি বইবাজারের আর্তনাদ। কিন্তু বই যে এখনও সবচেয়ে সস্তা। বই যে এখনও সবচেয়ে প্রাণবন্ত। আমার পড়ার টেবিল-এ একটা বই বেশ কিছুদিন উপস্থিত। বইটি লিখেছেন এক নবীনা সাংবাদিক Geraldine Brooks. বইটি হল : Nine Parts of Desire, The Hidden World of Islamic Women (Anchor Books) এ বইয়ের যত দামই হোক, তবু তা কম দাম। আমাদের দেশের নারীরা যদি এই বই বার বার পড়তেন তাহলে এ জগৎ সংসার সুন্দর হতে পারত। এ কথা সহস্রবার সত্য : সবাই আমরা এক সঙ্গে একই সময় ধনের ঐশ্বর্যে ধনবান হতে পারব না। কিন্তু সবাই ঐশ্বর্যবান হতে পারি আমাদের নিজেদের স্বতন্ত্র সুখের ধারণা নিয়ে।

স্বাতন্ত্র্যের মূলধন নিয়ে আমি বলতে পারি আমি নইলে মিথ্যে হত....। এ জগতে দ্রুত বহু জিনিস হারিয়ে যাচ্ছে। তার মধ্যে একটি হল জীবনযাপনের বৈচিত্র্য। সবাই যদি, একটি ধরা গেল, বিশ্ববিখ্যাত দোকান থেকে হাজার টাকার বিনিময়ে এক ছাপা মারা গেঞ্জি পরে কলকাতার কোন অভিজাত (?) সমাবেশে এসে বেলা ১২টার সময় হাজির হয়! তাহলে কেমন লাগবে? একই ছাঁচের বাড়ি কলকাতা, দিল্লি, ঢাকা, জাকার্তায় তৈরি হচ্ছে। পৃথিবীটা কি নিদারুণ একঘেয়ে হয়ে গেল। এই বৈচিত্র্যহীনতাকে মধ্যবিত্ত বাঙালি একদা চূড়ান্ত আঘাত করতে পেরেছিল। আবার রবীন্দ্রনাথে ফিরে আসতে হয়। তাঁর সুযোগ্য পুত্র রথীন্দ্রনাথ পিতৃদেব প্রসঙ্গে লিখছেন। বিষয় : পিতার পোশাক পরিকল্পনা। জনৈক ভদ্রলোকের মন্তব্য : গুরুদেব খু-ব দামি জামাকাপড় পরেন। বড় ভাল মানায় ওঁকে। পুত্রের আপত্তি : না, না, বাবামশায় আদৌ দামি কাপড় করান না। কমদামের কাপড় কিনে নিজের পছন্দমত দর্জিকে দিয়ে তৈরি করিয়ে নেন। সে সব জামাকাপড় তাঁকে এত মানায়। আবার

মানবতাবাদী বিজ্ঞানী আচার্য পি সি রায় ভাণ করার সময় পেতেন না। যাঁর জীবনটাই জ্ঞানের ও প্রেমের অনির্বাণ শিখা তাঁর অন্য অলংকারে কি দরকার। নীতিশূন্য অর্থপূর্ণ জীবনের কি কোন পরমার্থ আছে? এসব কথায় মধ্যবিত্ত বাঙালি স্বাধীনতার পূর্বকালে বিশ্বাস করেছিল। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে তাদের এ বিশ্বাসে ভাটা পড়ল। দেশব্রতী, সাহিত্যসেবী, সাংবাদিক, বিশেষত শিক্ষক, অধ্যাপক, ডাক্তার, বিজ্ঞানী -- যারা মধ্যবিত্ত সমাজের গতি ও প্রগতির নির্ধারক ও দেশের চিন্তক -- তারা কেউই সে দিন (ধরা যাক গান্ধীর লবণ সত্যাগ্রহ কিংবা '৪২-এর বিপ্লব)। এতটুকু প্রচ্ছন্ন প্রলোভনের শিকার হননি। প্রত্যেকটি বৃত্তির মানুষ সমাজে একটি দৃষ্টান্ত নির্মাণ করতে ব্যস্ত ছিলেন। সততা, যথাসম্ভব ত্যাগ, দূরদৃষ্টি, দুর্বলের প্রতি কর্তব্য এদের অত্যুজ্জ্বল করেছিল। জীবনের জন্যে এই মানুষেরা নিজের নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে স্বরাজ ঘোষণা করেছিলেন। ১৯৪৭-১৯৯৭-এর ইতিহাস এই ইতিহাসকে বড় বেশি ম্লান করেছে। কারণ প্রলোভন, কারণ মিথ্যা আস্ফালন, মিথ্যা দর্প। এই মানুষ আর ভয়শূন্য থাকল না। কেবলই ক্ষমতার অলিন্দে দাঁড়িয়ে নিজেকে অভিজাত, শক্তিমান, ধনবান ঘোষণা করল।

গান্ধী এই ব্যক্তি দুর্বলতাকেই সবচেয়ে আগে ক্ষয় করতে উদ্যত হয়েছিলেন : মানুষের যে কেবলমাত্র দক্ষ হলে চলবে না, শিক্ষিত হতে হবে, মুক্ত হতে হবে, তবেই তো সে সবার সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে। যে মানুষ কেবলমাত্র দক্ষ হল সে যে মুক্ত শিক্ষার স্বাদ এ জীবনে পেল না। কেবলমাত্র দক্ষ মানুষে দেশ ভরে গেল। এই মানুষ মিথ্যে অহংকারে শক্তিমদমত্ততায় দুর্নীতি থেকে হিংসায় উত্তীর্ণ হয়ে যেতে পারে।

দুর্নীতির যত সংকট এখানে। আরও চাইয়ের নেশা, আরও সুযোগ সন্ধানের উন্মত্ততা মধ্যবিত্তকে উচ্চাশার সিংহদ্বারে পৌঁছে দেয়। এইসঙ্গে যুক্ত হয় রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক। এই সম্পর্ক করে তোলে মধ্যবিত্তকে অপ্রতিরোধ্য। সে সর্বত্রগামী এখন থেকে। সব তার চাই। ভ্রষ্টাচার যাত্রা করে এখান থেকে। অতীতদিনের সব অনুশাসন একটু একটু করে শিথিল হতে থাকে। মনোবাসনা কেবলই চাহিদার তাগিদকে পূর্ণ করে চলে। অহেতুক, অনাবশ্যকের দিকে দৃষ্টি পড়ে বারবার। এদিকে যা অত্যাবশ্যক, যা নইলে রাত্রির তপস্যা ব্যর্থ হবে তা হারিয়ে যেতে থাকে।

বাঙালি মধ্যবিত্ত কটক, পাটনা, গৌহাটি, লখনউ-এ আর অনিবার্য নয়। এক, আঞ্চলিকতার দাবি তাকে ঘরে ফিরতে বাধ্য করে। এখানে বাঙালি আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আজও নিষ্কলঙ্ক, আজও সর্বভারতীয়। দুই, এই পঞ্চাশ বছরে জাতীয়তাবাদের জায়গা হরণ করেছে উপ-জাতীয়তাবাদ।

আঞ্চলিকতাবাদ নামক রাজনৈতিক মনস্তত্ত্ব প্যাথোলজিতে পরিণত হয়েছে। এবং এর জন্যে সম্পূর্ণত দায়ী রাজনৈতিক দল। কম-বেশি সমস্ত রাজনৈতিক দল এই এখন নির্বাচন 'জেতার' নেশায় মত্ত হয়ে দেশের কি নিদারুণ ক্ষতি করে চলেছে (এবং এ ক্ষতি তাদেরও ক্ষতি) তা এখুনি টের পাওয়া যাচ্ছে। আদর্শশূন্য রাজনীতি, বর্ণবিদ্বেষ, জাতি-বিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িকতার আগুন নিয়ে খেলছে।

এসব নিয়ে যেন মধ্যবিত্ত বাঙালির আজ আর কোন মাথাব্যথা নেই। কিন্তু একদিন ছিল। এই কারণেই একদিন (অর্থাৎ স্পষ্টত পঞ্চাশ বছর আগে) শিক্ষক বাঙালি, ডাক্তার বাঙালি, গবেষক বাঙালি, সাংবাদিক বাঙালি সর্ব-ভারতীয়দের চিত্তহরণ করেছে, এবং তাদের চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ হয়েছে। কারণ সে দিন সে প্রতিবাদী ছিল, যুক্তিপন্থী ছিল, আপসহীন ছিল। আবার প্রবল বাঙালি ছিল। কল্পনা করুন পঞ্চাশের দশকে কোন একটি বহুপরিচিত ইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের স্বাধীন আচরণ। কোন এক জেলা ইস্কুলের প্রধান

শিক্ষক অপরাধী ছাত্রকে শাস্তি প্রদান করেছেন। পরে জানা গেছে ওড়েন ছাত্র যথার্থই বিশেষ প্রভাবশালী ব্যক্তির পুত্র। তারপরও কিন্তু প্রধান শিক্ষকের সিদ্ধান্ত এতটুকু ম্লান হয়নি। এবং সেই প্রভাবশালী ব্যক্তি প্রধান শিক্ষকের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছিলেন সহজে, নিশ্চয়ই মনঃকষ্টে। এই নৈতিক মনোবল অধিকতর সুযোগ ও ক্ষমতার কাছে সমর্পণ করা হয়েছে নির্বিচারে পরবর্তীকালে। হারিয়ে গিয়েছে ব্যক্তি স্বাধীনতার ঐশ্বর্য, লুপ্ত হয়েছে শিক্ষা ও সংস্কৃতির সার্বভৌমত্ব, প্রাধান্য পেয়েছে সস্তা ভোগ্যপণ্যবাদী মানুষের অহংকার ও প্রচারমনস্কতা।

সেকালের শিক্ষকের একটা নমুনা না দিয়ে পরছি না। বর্ণনা দিচ্ছেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : 'জগদানন্দবাবু ইস্কুলে ছাত্রদের অংক শেখাতেন। তাই বলে তিনি অংকের মাস্টার নন।...। যিনি প্রকৃত শিক্ষক তিনি কোনও বিশেষ বিষয়ের শিক্ষক নন — গোটা মানুষটিই শিক্ষক অর্থাৎ তাঁর অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, কথাবার্তা, হাসিখেলা, রুচি-মরজি। তাঁর গুণগ্রাম, তাঁর মুদ্রাদোষ, সমস্ত মিলিয়ে যে ব্যক্তিত্বটি সেটিই তাঁর শিক্ষক চরিত্র। বাংলাদেশে শিক্ষক চরিত্রের সর্বোত্তম আদর্শ বিদ্যাসাগর — সে কি শুধু তাঁর অধ্যাপনার কৃতিত্বগুণে? তিনি সংস্কৃত কলেজে 'মেঘদূত', 'কুমারসম্ভব' পড়াতেন, না পাণিনির ব্যাকরণ পড়াতেন সে খবর নিয়ে আজ কে মাথা ঘামায়? প্রতিদিনের বাক্যে-কর্মে-চিন্তায় তিনি যে মহান ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তাতেই তার শিক্ষকজীবনের পূর্ণ মহিমা প্রকাশ পেয়েছে।

মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজ থেকে 'গোটা মানুষটিই' আজ হারিয়ে গিয়েছে। খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত বহু দক্ষ বাঙালি আমাদের স্বল্প সময়ের জন্যে মুগ্ধ করে বৈকি। কিন্তু যে নৈতিক মনোবল পাহাড় পর্বতপ্রমাণ ক্ষমতা কিংবা বাধাকে একদা স্বচ্ছন্দে অতিক্রম করেছিল আজ সে সব কেবলই স্মৃতি হয়ে গেল। পঞ্চাশ বছরে আমরা বড় বেশি করে ধনের ঐশ্বর্যের তাড়নায় স্মৃতি, সত্তা, স্বকীয়তাকে বিসর্জন দিয়েছি।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর উৎসবে আত্মসমীক্ষার পাশাপাশি দেখতে পাচ্ছি ধনী আর দরিদ্র, নিম্নবিত্ত আর উচ্চবিত্ত একই সঙ্গে উৎসবমুখর। কিসের এই উৎসব, কোথায় তার উৎস, কোথায় তার গতি? বিষণ্ণ মন বলছে, জানি না। কেবল এটুকু আমরা এই দ্রুত বিভক্ত হয়ে যাওয়া (ধনী আরও ধনী, দরিদ্র আরও দরিদ্র) ভারতবর্ষে দেখতে পাচ্ছি স্বাধীনতার এই উৎসবের আনন্দে দরিদ্রতম ভারতবাসী বলছে, উদাত্ত কণ্ঠে বলছে, তোমার পতাকা যারে দাও তারে দাও বহিবারে শকতি। দাদ্রিসীমার নিচে দাঁড়িয়ে বলছে : স্বদেশ আমার জননী আমার। আজকের এই উৎসবের দিনে আমরা কি আর একবার এত বড় সুযোগ পাব? আত্মশুদ্ধির, গ্লানি মোচনের, মুক্তির? আর একবার কি বলতে পারব, ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের প্রাণ যারা, তারা আমাদের রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছে। আমরা কি তাদের ফিরিয়ে দেব ব্যর্থ নমস্কারে?

স্বাধীনতার শতবর্ষে যারা উৎসব পালন করবে, যারা পতাকা তুলে ধরবে, যারা দেশ শাসনের অধিকার পূর্ণ মাত্রায় পালন করবে তারা আজ আমাদের পথ-পরিক্রমায় জীবন সংগ্রামে (সংগ্রাম তো ভঙ্গি দিয়ে আপস করে সমঝোতা করে হবার নয়) জীবন জিজ্ঞাসায় কোথায়? তারা যে জীবন নামক আগুন স্পর্শ করে স্বাধীনতার সূর্যসাক্ষী করে বলে চলেছে, মানুষই একমাত্র প্রাণ যার পরমার্থের বোধ আছে, চিন্তা আছে। সেই মানুষ বলছে বেঁচে থাকি কেন, কি করে? তিনটি মাত্র চাহিদা মানুষের। আশা, লক্ষ্য, আত্মমর্যাদা। আগামী শতবর্ষের স্বাধীনতার উৎসবে যারা জীবনের এই রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত থাকবে আজ তাদের উদ্দেশে আমাদের প্রীতিপূর্ণ নমস্কার। আমাদের যত গ্লানি, যত অপূর্ণতা, যত মালিন্য যেন স্বাধীনতার শতবর্ষের উৎসবকে এতটুকু স্পর্শ না করে।

সু ধী র চ ক্র ব র্তী

বাংলা গানের দিগ্‌দর্শনী

দেশ যখন স্বাধীন হয়েছে অর্থাৎ ১৯৪৭ সালে, আমাদের বাংলা গান তার আগেই স্বাধীন আর স্বয়ম্ভর হয়েছে অর্থাৎ নিজের ভূমিকায় স্বপ্রতিষ্ঠ হয়েছে, তার কারণ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতনায়কত্ব। কথাটা বুঝিয়ে বলা দরকার।

গানের স্বয়ম্ভরতা অনেক কঠিন ও মগ্ন সাধনায় আসে, আসে অনেকের সম্মেলক প্রয়াসে। তার জন্য লাগে দীর্ঘ সময়েরও দাবি। কিন্তু অনেক সময় একজন প্রতিভাশালী স্রষ্টার একক অসামান্য সাধনায় শিল্পের বহুযোজন পথ-অতিক্রমণ সামান্য সময়ে ঘটে যায়, অনায়াসে সেই দেশের চিত্তক্ষেত্রের সত্য পরিচয় ঊর্ধ্বারোহী হয়ে দিশা দেখায়। সেই দেশের বহুদিনের ধারাবাহিক আত্মসন্ধানের চিহ্ন প্রচেষ্টা সংহত ও বাণীময় হয়ে ওঠে একজনের গভীর স্বজনবোধের আলোয়। রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর প্রথম যৌবনে বাংলা গানের কারিগরি শুরু করেন তখন সব অর্থেই বাংলা বিদ্বৎসমাজ ছিল তাঁর ভাষায় 'প্রাণহীন' ও 'গানহীন', তাই তাঁর 'চিত্ত পিপাসিত' হয়েছিল 'গীতসুধার তরে'। এই গীতসুধা বলতে তিনি বুঝেছিলেন, রাগরাগিণীর ছাঁচে গানের ঢালাই নয় বা তানকর্তবের কেরামতি নয়, বরং ব্যক্তিমনের প্রতিষ্ঠা, বিচিত্র মানসের স্পর্শ, বাণী ও সুরের সামঞ্জস্য, নানা হৃদয়বৃত্তি স্ফুরণসৌন্দর্যে গানে নন্দনের প্রতিষ্ঠাভূমি গড়ে তোলা। এককথায় তিনি চেয়েছিলেন গানেরও আধুনিকতা, যা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল, নানা প্রসঙ্গে ব্যাপ্ত, রাগমিশ্রণে সুন্দর, বহু মানুষের উপভোগ্য এবং বহু কণ্ঠের উপযোগী। কাজটা তখনকার দিনে কঠিন ছিল, কারণ দেশের পরিবেশ ছিল অন্যরকম। তখন কালোয়াতিকে মনে করা হত গানের পরাকাষ্ঠা, হিন্দুস্থানী গানই ছিল সকলের আদর্শ, গানে বাণীর ভূমিকা ছিল গৌণ। সেই ছুৎমার্গ আর ক্ষুদ্রতার বৃত্ত ভেঙে রবীন্দ্রনাথ বাংলা গানে আনলেন দেশজ গানের প্রবর্তনা, বিদেশী সুরের গতিময় ছন্দ এবং হিন্দুস্থানী রাগরাগিণীর রস। এ দেশের বাউল-কীর্তনের বহুদিনের ধরনটিকেও সম্পৃক্ত করলেন গানে। নানা উৎসবে-অনুষ্ঠানে, নানা উপলক্ষ ও সমসাময়িকতার উত্তেজনায়, শারদোৎসবে-বর্ষামঙ্গলে, নাট্যে ও নৃত্যে, স্বদেশী আন্দোলনে এবং এমনকি বসন্তবন্দনায় কিংবা বৃক্ষরোপণে তাঁর গান আমাদের মনের অব্যক্ত ভাষাকে রূপময় করে তুলল। তার পাশাপাশি তাঁর একান্ত ভক্তিগানের সমৃদ্ধ সঞ্চয় আবিষ্ট করল মানুষকে, প্রেমের গান চিহ্নিত করল বিচিত্র নিগূঢ় আধুনিকতার করুণরঙিন পথ। গানের এতখানি স্বাধীনতা ও ব্যাপকতা, এত বড় উন্মোচনের বার্তা অবশ্য তখনও অর্থাৎ ১৯৪৭ সালে, বাঙালির হৃদয়ঙ্গম হয়নি। 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে' উচ্চারণে যে-

পরাধীন দেশে তিনি জাগাতে চেয়েছিলেন দেশজ জীবনমোহ, 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে'-র মন্ত্রে যাদের অন্তরে উদ্দীপ্ত করেছিলেন শপথের শক্তি, 'বাঁধ ভেঙে দাও বাঁধ ভেঙে দাও' বলে ঘোচাতে চেয়েছিলেন জীর্ণ পুরাতনের সংস্কার, 'ঐ মহামানব আসে' ঘোষণায় অপরাজিত মনুষ্যত্বের যে-জয়বার্তা তিনি দিয়েছিলেন তা সমকালে বাঙালি ততটা বোঝেনি, ক্রমে বুঝেছে। দেশ স্বাধীন হবার ছ'বছর আগে (১৯৪১) রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ ঘটে। বলতে গেলে বঙ্গভূমির দ্বিখণ্ডিত শরীর গত পঞ্চাশ বছর ধরে রবীন্দ্রসঙ্গীতের হাত ধরে এগিয়ে চলেছে। পূর্ব পাকিস্তান বহু দুঃখের তিমিরান্ধ। সময়ে পথ দেখেছে তাঁর গানের উৎসমুখে। স্বাধীন বাংলাদেশ তার সত্তায় ও স্বরূপে মর্মে আপন বলে জেনেছে এই বিশেষ গানের বাণীকে। আর কী আশ্চর্য যে, ভারত ও বাংলাদেশ দুই রাষ্ট্রেরই জাতীয় সঙ্গীত বলে মনোনয়ন পেয়েছে অনিবার্য রবীন্দ্রসঙ্গীত।

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরকে সামনে রেখে বাংলা গানের বৃত্তান্ত লিখতে গিয়ে প্রথমেই যে রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে সাতকাহন লিখতে হল তার কারণ গত পঞ্চাশ বছর, অন্তত গানের ক্ষেত্রে, আমাদের রবীন্দ্রগানের সান্নিধ্য, উন্মোচন ও অবলোকনের চমৎকারিত্বে ভরে আছে। স্বাধীন বঙ্গভূমির রুচিমান মধ্যবিত্তের কাছে রবীন্দ্রগীতি সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও সম্প্রচারিত, সভাশোভন ও বিপণনযোগ্য, যশখ্যাতি প্রতিষ্ঠার সুনিশ্চিত হস্তামলক এবং বঙ্গ সংস্কৃতির সর্বোজ্জ্বল প্রতিনিধি। এ-গানের পরিমণ্ডলের সমান্তরালে বয়ে যাচ্ছে দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ ও নজরুলের গান। এঁদের চারজনই গানের মধ্যে দিয়ে দেখেছিলেন স্বাধীনতার স্বপ্ন, দেশের মুক্তি ও গৌরবময় পটভূমি। কিন্তু প্রথম তিনজন দেশের স্বাধীনতা দেখে যাননি। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রয়াণ ঘটেছে ১৯১৩ সালে, রজনীকান্তের ১৯১০ আর অতুলপ্রসাদের ১৯৩৪-এ। তবু গত পঞ্চাশ বছরে আমরা তো এঁদের গানই গেয়েছি বারে বারে, কারণ রবীন্দ্রনাথ থেকে অতুলপ্রসাদের গানক্রিয়া সবচেয়ে স্বতঃস্ফূর্ত, অব্যবসায়িক, পরাধীন দেশের গানের রূপরসসংগঠনে স্বপ্নময়। আর এক সম্পন্ন গীতিকার নজরুলের প্রয়াণ ঘটেছে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির অনেক পরে ১৯৭৬ সালে, কিন্তু স্বাধীনতার লগ্ন আসার আগে থেকেই তিনি ছিলেন মূক ও জড়তাগ্রস্ত। কারার লৌহপাট ভেঙে, গাজনের বাজনা বাজিয়ে, হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয়বাদি এই দরদি গানের যাদুকর তাঁর ঘুমঘোরে মনোহরের আবির্ভাবকে স্বাগত জানাতে পারেননি। একই সময়ে পণ্ডিচেরি আশ্রমের স্বনির্বাসে তখন প্রবাসী ছিলেন দিলীপকুমার রায়। ১৯৫০ সালে গুরু শ্রীঅরবিন্দের প্রয়াণের পর দিলীপকুমার চিরতরে বাসা বাঁধেন পুণের হরিকৃষ্ণ মন্দিরে। ১৯২৮ সালে পণ্ডিচেরি বসবাস থেকে ১৯৮০ সালে পুণেতে প্রয়াণ পর্যন্ত তিনিই সম্ভবত হতে পারতেন আধুনিক বাংলার সবচেয়ে সমৃদ্ধ সঙ্গীতকার, ১৯৩৭ থেকে ১৯৪২ এই পাঁচ বছর কলকাতায় এসে ফুটিয়েও ছিলেন রূপে বর্ণে ছন্দে বাংলা গানের হরেকরকম বন্দিশ কিন্তু শেষপর্যন্ত শরণ নিলেন তিনি ভক্তিগানের বলয়ে। নতুন দেশের নবজাগ্রত জনমানসের ভাবনা কামনার রসরূপ তাঁর গানের রূপমন্ত হল কই?

এ জাতীয় প্রশ্ন বা বিতর্ক তোলার আগে আমাদের বুঝে নিতে হবে বৃহত্তর ভারতীয় গানের পরিপ্রেক্ষায় বাংলা গান ব্যাপারটি প্রকৃতপক্ষে কী? বাণীর নিজস্বতায় বাংলা গান নিশ্চয়ই আঞ্চলিক, কিন্তু তার রূপবন্ধে বহু রকমের ভারতীয় সঙ্গীতধারার মিশ্রণ বা সংযোগ ঘটেছে। যেমন ধরা যাক ধ্রুপদ। একসময়ে বাংলার বিষ্ণুপুরে ধ্রুপদ ঘরানার যে পরম্পরা তৈরি হয়েছিল তা ব্রাহ্মসমাজের গানে এবং রবীন্দ্রজীবনের প্রস্তুতিপর্বে প্রবলভাবে সক্রিয় ছিল। নবাবি আমলে ও আঠারো উনিশ শতকে নানা ঘটনা ও সমাপতনে বাংলা

গানের আসরে এসে গেছে টপ্পা, খেয়াল, ঠুংরি ও ভজন গানের ধরন। বাঙালি সঙ্গীতকাররা তাঁদের নিজস্ব বোধবুদ্ধি অনুসারে অনুকরণ অনুসরণ করেও একরকম বাঙালিয়ানাও জুড়ে দিয়েছেন তার মধ্যে, যে অর্থে নিধুর টপ্পা একটা নতুন ধারা তৈরি করেছিল, কিংবা দ্বিজেন্দ্রলালের টপখেয়াল, অতুলপ্রসাদের ঠুংরি, নজরুলের গজল ও দিলীপকুমারের ভজন গান স্বরূপত বাঙলা ও বাঙালির একান্ত নিজস্ব রচনা। আসলে বাংলার সঙ্গীতে কোনদিনই সংকীর্ণ চিন্তা বা ছুৎমার্গ নেই। তাই সর্বভারতীয় রাগরাগিণী বাঙালি যেমন চর্চা করেছে তেমন বুঝতে চেয়েছে পাশ্চাত্য গানের সুরের চলন ও নাটকীয় ওঠানামা, তার ওজস্বিতা ও স্বরক্ষেপের বৈচিত্র্য। আবার এসবের সঙ্গে আমাদের দীর্ঘপ্রচলিত কীর্তনকে তার নানা রূপরীতিতে আত্মস্থ করতে চেয়েছেন সঙ্গীতকাররা। বাংলা গানের যথার্থ কিছু লক্ষণ দেশজ ধারাতে খুঁজে নেওয়া যায়, যেমন বাউল ও ভাটিয়ালি, টুসু ও ভাদু গান, মাইজভাণ্ডারি ও বাউল্যা, খনগান ও ঝুমুরে, ধুয়োজারি ও মারিফতি গানে, মর্শিয়া জারি ও শব্দ গানে। গত পঞ্চাশ বছরের বাংলা গানের নির্মাণে এসব লৌকিক রূপরীতির টান কিছু কম নেই। হয়তো সংখ্যায় তত বেশি নয় কিন্তু আঙুরবালা-ইন্দুবালা জাতীয় গায়িকাদের বিশেষ জনতোষিণী চাল বাংলা গানের সজীব গানের অংশ। আব্বাসউদ্দিনদের পরম্পরায় ভাওয়াইয়া এখনও সচল। অনন্তবালা বৈষ্ণবী জাতীয় শিল্পীদের শ্রেণী ততটা আর তৈরি হচ্ছে না কিন্তু উত্তরা দেবী বা কৃষ্ণচন্দ্র দে-র ধারায় ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় এসে যান অতি সহজেই। ভবানী দাস বা মৃণালকান্তি ঘোষের মতো শ্যামাসঙ্গীত গায়ক আর কই কিন্তু ধনঞ্জয় বা পান্নালালের শ্যামাসঙ্গীত সগর্বে সঞ্চয় করেছে গীতরসিক বাঙালি। তবে দেশভাগ হয়ে বাংলা গানের একটি বিশেষ ধারার আজ স্রোতরুদ্ধ অবস্থা, যাকে বলা হত ইসলামি গান। স্বাধীন দেশে নিঃসন্দেহে ভাটা পড়েছে হাসির গান আর কমিক গানে। এসব ধারায় যাঁরা অসামান্য দখলদার ছিলেন সেই বরদা গুপ্ত, রণজিৎ রায়, নবদ্বীপ হালদার বা যশোদা-দুলালের মত শিল্পী ক্রমেই কমছে। সম্ভবত মিন্টু দাশগুপ্তই এ-পর্যায়ে শেষ গণনীয় গায়ক ও স্রষ্টা। স্বাধীনতার আগে বাংলার মঞ্চ-সঙ্গীতের যে-রমরমা আর জনপ্রিয়তা ছিল আজ তা নেই। ডি. এল. রায়ের নাটকের গান কিংবা আলিবাবার গান সারাদেশে যে-অভূতপূর্ব প্রসার লাভ করেছিল এ শতকের গোড়ার দিকে, তার তুল্য থিয়েটারের গান আর হল না। কিন্তু স্বাধীনতার পরে বাংলা গানের সবচেয়ে জনপ্রিয় ধারা হল ফিল্মের গান। দেশ স্বাধীন হবার বছর পনেরো আগে এদেশে টকী বা সবাক ছবির প্রচলন হয়। তখন থেকেই অখণ্ড বাংলায় ফিল্মের গান সবচেয়ে লোকপ্রিয়। এমনকি 'মুক্তি' ছবি থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের জনপরিচিতির হাতেখড়ি পঙ্কজ মল্লিক আর কাননবালার গায়নে, পরে তার সঙ্গে যুক্ত হয় সায়গলের স্বর্ণকণ্ঠ। এই সব নানা বিচিত্র ধারায় উৎসারিত হয়েছে বাংলা গান, যার আরও তিনটি বিশিষ্ট ধরন হল আধুনিক গান, রাগপ্রধান গান ও গণসঙ্গীত। এর মধ্যে স্বাধীনতার ঠিক আগে জ্ঞান গোঁসাই, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় ও শচীন দেববর্মন রাগপ্রধান গানে যে-রকম ঝলক আর বর্ণাঢ্য জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন, আজকের অজয় চক্রবর্তী তার ধারে কাছে নেই। তবু ধারাটি আছে, তবে ও জাতীয় গানে জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ বা দীপালি নাগের মত ক্রিয়াসিদ্ধ স্রষ্টা প্রায় নেই বলা যায়।

আসলে গত পঞ্চাশ বছরের বাংলা গানের বৃত্তান্ত রচনায় দুটি তিনটি প্রসঙ্গ বিচার্য। প্রথমত, দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদের মত অব্যবসায়িক ভাবে গানের জন্য গান লেখার আনন্দ বেশিদিন চলেনি।

দুই—বিশ্বযুদ্ধের ঝাপটা সমাজে আর অর্থনীতিতে যে পরিবর্তন এনেছিল তাতে

শিল্পীদেরও জীবিকার সংকট দেখা দেয়। নজরুল ইসলামই এদেশে প্রথম পেটের টানে গান লেখেন। দ্বিতীয়ত, রেডিও, সিনেমা আর রেকর্ড কোম্পানির চাহিদায় গড়ে উঠেছিল একদল পেশাদার স্রষ্টা ও শিল্পী। আগে গান যিনি লিখতেন, সুর দিয়ে সে গানটি স্বকণ্ঠেই গাইতেন তিনি। নতুন যুগে গান হল বিপণনের বস্তু, তার বিনিময়মূল্য নির্ধারিত হল, শুরু হল তার চাহিদা আর জোগান। ফলে বিপণনের দিকে চোখ রেখে গান লিখলেন একজন, তাতে সুর দিলেন আর একজন, গাইলেন অন্য আর একজন। শ্রম বিভাজনের এই নীতিতে বাংলা গান হল ত্রিধাবিভক্ত। কিন্তু তার ফলে তিন শ্রেণীর নির্মাতা গড়ে উঠল। গীতিকার, সুরকার ও শিল্পী তাঁদের নিজের নিজের মত জীবিকার পথ খোলা পেলেন। তুলসী লাহিড়ী, হেমেন্দ্রকুমার রায়, অজয় ভট্টাচার্য বা প্রেমেন্দ্র মিত্র পেশাদার গানলিখিয়ে ছিলেন। তেমনই রাইচাঁদ বড়াল, পঙ্কজ মল্লিক, কমল দাশগুপ্তরা ছিলেন টাকা নেওয়া সুরকার। শচীন দেববর্মন, সায়গল, শৈলদেবী, যূথিকা রায়রা গান গেয়ে সংসার চালাতেন। তৃতীয়ত, স্বাধীনতার পরে জোর পড়েছে বাংলা গানের সম্প্রচারে। রেডিওর প্রচারতরঙ্গ ট্রানজিস্টার যন্ত্রের সহায়তায় উপচে পড়েছে গৃহস্থের অঙ্গন থেকে চষা জমিতে, কলকারখানা আর ছোট দোকানে। সাবেক কালের হাতল-ঘোরানো কলের গানে ৭৮ ইঞ্চি রেকর্ডের বদলে বৈদ্যুতিক উৎকর্ষে তৈরি বিদ্যুৎচালিত রেকর্ড প্লেয়ারে লং প্লেইং রেকর্ডে ঘনশ্রুতি ব্যবস্থা, এমনকি তাকে ছাপিয়ে হালফিলের ক্যাসেট, মাইক্রো-ক্যাসেট, সিডি আর উন্নত-মানের টেপরেকর্ডার ও কমপ্যাক্ট ডিস্ক প্লেয়ার বাংলা গানকে ছড়িয়ে দিচ্ছে সর্বত্র। গত ক'দশক তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দূরদর্শনের কায়াবিশ্ব। গানের নিরঙ্গ জগৎ এখন অবয়বী। গানের সঙ্গে গায়ক-গায়িকা মায় যন্ত্রীদলকেও দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য তাতে একটা বাড়তি আকর্ষণ বা কারও কারও মতে উট্‌কো ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি হচ্ছে। দূরদর্শনে রবিশঙ্করের সচেতন বাদনকৌশলের দেখনদারি, আমজাদের নিমীলিত চোখ, জাকির হোসেনের চুল ঝাঁকানো, পূর্ণ দাসের নাচ, পীযূষকান্তির হস্তবিক্ষেপ, সুমন-নচিকেতার গায়নভঙ্গির অভিনবত্ব — এমনতর দৃশ্য স্থান নিচ্ছে শ্রব্য বিনোদনের। এর ফলে কেউ কেউ গানের সত্তার অনুভবের চেয়ে গানের চেহারাটাই যেন বেশি দেখছেন। ওস্তাদ বদল খাঁ, আলাউদ্দিন খাঁ সায়েব বা বড়ে গুলাম আলি, দিনেন্দ্রনাথ বা দেবব্রত বিশ্বাসের গায়ন ভাগ্যিস আমাদের সংস্কারে প্রধানত শ্রুতিবাহিত হয়ে আছে! স্বাধীনতার পরে ক্রমে ক্রমে গানের আসরে দুটি জিনিস প্রাধান্য পাচ্ছে — এক, গানের চেয়ে যন্ত্রের দাপট আর গান শোনার চেয়ে গান দেখা। ফলে এক রসিক সঙ্গীতশিল্পীর কথা যথার্থ বলে মনে হয়, তিনি বলেছিলেন 'আগে ছিল গানবাজনা এখন বাজনাগান'। আর গান দেখার ব্যাপারটা তো যত্রতত্র। কারণ এখন কণ্ঠ রাগদুরস্ত হবার আগেই শিল্পীর রানি কালারের র-শিল্কের গুরু পাঞ্জাবিতে সোনালি সুতোর কাঁথার কাজ অর্ডার দেওয়া হয়, আদরের কন্যা টিভিতে ডাক পেলেই জনকজননী কিনে দেন সিল্ক টাঙাইল শাড়ি। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, বাংলা গানের জগৎ আজ বিপণনের হাত ধরে আর পাঁচটা ভোগ্যপণ্যের মত নিত্য নব প্রতারক প্রচ্ছদে মুড়ে চড়া দামে বিকোচ্ছে। স্বাধীনতার সমসময়ে বাঙালি নামী সঙ্গীতশিল্পীরও আর্থিক অনিশ্চয়তা, ট্যুইশনি আর প্রোগ্রামের জন্য ছোটাছুটি আজ নেই। এখন আছে স্পনসর ও কনসার্ট, ক্যাসেট বিক্রির হুড়োহুড়ি আর গোল্ডেন ডিস্ক প্রাপ্তির সংবাদ। সেদিন সংবাদপত্রে দেখা গেল নবীনা এক সঙ্গীতশিল্পীর এক সঙ্গীতানুষ্ঠানের আগে তাঁর একশো জন ছাত্র-ছাত্রীর সম্মেলক গানের বিবরণ। একশো জন ছাত্র-ছাত্রী!

সদ্যতন বাজারি অর্থনীতির চড়া দরের ওঠানামার অনিশ্চয়ে গড়ে উঠছে চট্‌জলদি

বাংলা গানের তাৎক্ষণিক ক্ষণবিশ্ব। ক্যাসেট গান দিয়ে শুরু করে সিরিয়ালের দিকে গড়িয়ে যাওয়া। বাড়িতে গান শেখানোর টোল। গান গেয়ে কাঁচা পয়সায় কেনা চটকদারি গাড়ি চেপে, পকেটে রেখে অনুষ্ঠানের অ্যাপয়েন্টমেন্ট ডায়েরি, হাতে ধরে সেলুলার ফোন পশ্চিমবঙ্গ দাপিয়ে চলেছে বাংলা গানের শিল্পীর রঙিন জীবন। সাম্প্রতিকের জড়জগতে ভোগবাদ তো অবশ্যম্ভাবী, মুখও ঢেকে যাবে বিজ্ঞাপনে সেটাও জানা, শিল্পীর স্বাভিমান থাকতেই পারে কিন্তু গত পঞ্চাশ বছরের বাংলা গানের সালতামামির লেখকের নিরঞ্জন লেখনীও কেঁপে ওঠে, তার চোখ জলে ভরে ওঠে কমল দাশগুপ্তের জন্য, অখিলবন্ধুর জন্য, রাধারানীর জন্য। বিপণনের হৃদয়হীন সমাজে সবাই তো পণ্য নন।

স্বাধীনতার পরে বাংলা গানের সংবৃত সমাজ অনেক বড় হয়ে গেছে নানারকম সম্প্রচার মাধ্যম আর যন্ত্রমাধ্যমে। সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ সকলের হাতে নেই। প্রকৃত তালিমপ্রাপ্ত গুণী শিল্পী যে আজকের শ্রোতা বা ক্রেতাসমাজে সম্মান বা প্রতিষ্ঠা পাবেন এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। গানের ইতিহাস তো কেবল সৃষ্টি ও পরিবেশনের নয়, শ্রোতাদেরও তাতে ভূমিকা থাকে। তবে স্বাধীনতাপূর্ব সামন্তসমাজ কাঠামোর পরে এ-দেশের গণতন্ত্রভিত্তিক যে শিল্পজগৎ গড়ে উঠেছে তার চাবিকাঠি শিল্পীর হাতে নেই, ব্যবসায়ীর হাতে আছে। সেই ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হতে পারে এমনকি বহুজাতিক। এর ফলে সঙ্গীত এখন ইন্ডাস্ট্রি, তার বাজার ভারতের ভোগ্য তবু মধ্যপ্রাচ্যেও বহু বিস্তৃত। ভারতীয় যন্ত্রসঙ্গীতের সমাদর রয়েছে প্রতীচ্যেও। কিন্তু সেসব অনেক উচ্চদরের ব্যাপার। আলি আকবর, রবিশঙ্করদের বাতাবরণ অনেক আন্তর্জাতিক স্পনসর নিয়ন্ত্রিত। আর আমরা ভাবছি মোদের গরব মোদের আশা বাংলা গানের প্রসঙ্গ। সঙ্গীতবিদ্ অনন্তকুমার চক্রবর্তী যথার্থই লিখেছেন যে, 'উৎপাদন হচ্ছে এক পরিবর্ত শিল্পপণ্যের — জনতার ভোগের উদ্দেশ্যে — সাধারণের জন্যেই তৈরি, সাধারণের দ্বারা নয়। ... ক্রমশ ঐতিহ্য থেকে যত সরে আসছি বিকারও তত প্রকট হচ্ছে। বলা হচ্ছে জনগণের রুচিই নাকি এমনি। কিন্তু এই রুচিটাও তো একটা বানিয়ে তোলা পদার্থ, ব্যবসার প্রয়োজনে সংগঠিত। কই কিছুদিন আগেও তো রুচিটা এমন ছিল না।'

এবারে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা গানের মূল অন্তর্ঘাতের স্বরূপ বুঝতে পারছি — তার একটা হল ঐতিহ্যভ্রষ্টতা আর একটা হল রুচিদূষণ। এই দূষণ কেবল বাণীতে নয় সুরেও, বরং বলা যায় সুরহীনতায়, যন্ত্রের অতিকৃতিতে। আর একটু নজর করলে শিল্পীর পোশাক নির্বাচনে, অঙ্গভঙ্গিতেও। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে শ্রোতাদের চিৎকার, সিটি মারা, নাচা। এই ব্যাপারটা আগে ছিল না, কারণ শিল্পী ও শ্রোতাদের মধ্যে অধিকারীভেদ ছিল, ছিল সম্ভ্রম ও মুগ্ধতার আড়াল। এখন স্টেজে উঠলেই শিল্পী — যদি বিজ্ঞাপন তা বলে, সংবাদমাধ্যম তাতে সায় দেয়। টিকিট কাটলেই শ্রোতা। শীৎকার ও কটু মন্তব্য করার অধিকার শ্রোতা পয়সায় কিনেছেন। এবারের সদ্য আয়োজিত কলকাতার সঙ্গীতমেলায় এমন একটি দৃশ্য প্রত্যক্ষ করা গেল। রবীন্দ্রসদনে রবীন্দ্রনাথের গান গাইছিলেন বাংলাদেশ থেকে আমন্ত্রিত শিল্পী ইফ্‌ফাত আরা দেওয়ান। তিনটি গানের পর ব্যালকনি থেকে জনৈক শ্রোতা বললেন, 'আমাদের গান নয়, আপনাদের গান শোনান'। স্তম্ভিত শিল্পী বললেন, 'এটা তো আমাদেরও গান'। প্রতিবাদে শোনা গেল, 'না, না। এ তো এপার বাংলার গান, ওপার বাংলার গান শোনান'। ব্যাপারটা ওইখানেই থামে, ইফ্‌ফাত আবারও রবীন্দ্রসঙ্গীত ধরেন, কিন্তু এমন অশিষ্ট মন্তব্য এলো কোথা থেকে? কোন্ স্পর্ধায়? উত্তর সকলের জানা, শিল্পকে পরিবর্ত-শিল্প বানালে এমন হওয়াটা অবশ্যম্ভাবী। গান যখন ক্রয়যোগ্য সামগ্রী তখন তাতে

শ্রোতার মর্জির অনপনেয় কলঙ্ক লাগবেই। রবীন্দ্রনাথ থেকে অতুলপ্রসাদ পর্যন্ত কাউকে গান রচনা করতে গিয়ে এমন জনরুচির দাস্য করতে হয়নি। তাঁদের গান ছিল রসের বিচারে উপভোগ্য, টাকা দিয়ে কেনার যথেচ্ছ অধিকারচিহ্ন তাতে ছিল না। তাঁরা গান রচনার মধ্যে দিয়ে শিল্পই সৃষ্টি করেছেন, শ্রোতাদের রুচি গঠন করেছেন, শ্রোতৃসমাজ তৈরি করেছেন — বিচিত্র অচিহ্নিত অদীক্ষিত হলভর্তি শ্রোতাদের তাৎক্ষণিক বিনোদনের জন্য গান রচনা করতে হয়নি তাঁদের। গড়তে হয়নি পরিবর্ত-শিল্প।

স্বাধীনতার আগে আর পরে বাংলা গানে একটা মস্ত ফারাক হয়েছে এইখানে। একদিকে স্বতঃস্ফূর্ত শিল্প, আর একদিকে বানিয়ে তোলা পরিবর্ত শিল্প। প্রকৃত শিল্পের উদ্দেশ্য আত্মবোধন তথা আত্মপ্রকাশ, তার লক্ষ্য কেবল সমকাল নয়, অনাগত কালও। অথচ পরিবর্ত-শিল্পের কাজ সমকাল ও সমসময়কে পরিতৃপ্ত করাই কেবল, চটজলদি শ্রোতাদের চমকে দেওয়ার কৌশল তার। পরিবর্ত-শিল্প তাই চলতি হাওয়ার পন্থী। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পুরতে না পুরতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বাংলা গান আজ পরাধীন। তাকে নিয়ন্ত্রণ করছে প্রচ্ছন্ন প্রচারমাধ্যম আর প্রকাশ্য আমজনতা।

দুই

একটা দেশকে কতভাবেই না দেখা যায়। দেখা যায় তার ভৌগোলিক বাতাবরণে, ইতিহাসের ধারায়, রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তনে, লোকায়তের বুনটে কিংবা চিত্তক্ষেত্রের সনাক্তকরণে। গানের ভিতর দিয়েও দেশ দেখা যায়, বোঝা যায় তার চৈতন্য। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে একটা কথা তো স্পষ্ট — এ দেশ একান্তভাবে গানের দেশ। ভিক্ষুকের কণ্ঠে, শোকগ্রস্তের কান্নায়, ফিরিঅলার ডাকে, মাঝিমাল্লার পারানির টানেও থাকে সুরের বয়ন, বাণীর মহিমা। ছাদ পেটানোর ছন্দে, প্রবাসী মইশাল বন্ধুর জন্য রোদনে, ভারি জিনিস সকলে-মিলে-তোলার দমকে জেগে ওঠে গান। যদিও বাঁশি বাজে, শিঙা বাজে, বাজে ধামসা মাদল, দোতারা সারিন্দা — তবু ভারতীয় মানস স্বরূপত বা স্বভাবত যন্ত্রসঙ্গীতের ভক্ত নয়, তারা কণ্ঠকেই বারবার প্রকাশের সেরা মাধ্যম বলে মানে। প্রতীচ্যের সঙ্গে এইখানে ভারতীয় মানসের তফাত। সেখান কণ্ঠের তুলনায় যন্ত্রসঙ্গীতের সৃষ্টি ও সমাদর অনেক বেশি। ফলে বিদেশি সঙ্গীতকার (আসলে সুরকার) বলতে যেমন বাখ্‌, মোজার্ট, বেতোফেন, চাইকভ্‌স্কি, শুমান, শুবার্ট, হুগো উলফ, স্ট্রস, ওয়াগনার এসব নাম আমাদের উঠে আসে — আমাদের মনে আসে তানসেন হরিদাস স্বামীর কথা, আলবারদের স্মৃতি, তুকারাম, মীরাবাঈ, সুরদাস-কবীর-নানক-দাদূ-রজ্জব পরম্পরার কথা। আসে সুব্রহ্মণ্য ভারতীর কথা, ফৈয়াজ খাঁ, কালে খাঁ, গহরজান, মালকাজানদের স্মৃতি। বৈজু বাওরা আর উমরাওজানের কাহিনী তো কিংবদন্তির মতো। স্বাধীন দেশের সূচনায় কেমন ছিল এ দেশের গানের সমাজ? সেই প্রশ্নের নিরাকরণ না করলে বাংলা গানের তৎকালীন ছবি ফুটে উঠবে না। স্বাধীনতার উনিশ বছর আগে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'কথা ও সুর' বইয়ের ভূমিকায় লিখেছিলেন : 'সর্বত্রই খানদানী কিংবা সত্যকারের পুরানো ঘরোয়ানা চাল লুপ্তপ্রায়। ...তাঁরা নির্বংশ, নচেৎ তাঁরা শহরবাসী। সেনীয়া-বংশের গায়ক-গোষ্ঠীর কুলপতি গিধৌড়ের বিখ্যাত গায়ক মহম্মদ আলি খাঁ এবং বীণকার-গোষ্ঠীর প্রধান অধিনায়ক উজির খাঁ জীবিত নেই। সেনীয়ার একটি ঘর এখনও জয়পুরে আছেন, তাঁরা সেতারই বাজান। জাফরুদ্দীন, আলাবন্দে খাঁ এবং তাঁর পুত্র নসীরুদ্দিন এখন জনস্মৃতির মণিকোঠায়। রবাবী আরেকজনও নেই। শরদের পীঠস্থান রোহিলখণ্ড, বিশেষত রামপুরে। সেখানকার বিখ্যাত শরদীয়া ফিদা

হোসেনের এবং মহীশূরের বিখ্যাত বীণকার শেষান্না ও রামপুরের বীণকার উজির খাঁর মৃত্যু প্রায় সমসাময়িক। পীঠাপুরমের সঙ্গমেশ্বর শাস্ত্রী কয়েক বৎসর পূর্বে নিজের বীণার পাশে দেহরক্ষা করেছেন। ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বেহালা বাজিয়ে নাইডু ভিজিয়ানাগ্রামে থাকেন। তিনি অন্ধ হয়ে আসছেন, দেওয়াসের রাজাব আলির বয়স সত্তরের কাছাকাছি। ইন্দোরের বিখ্যাত বীণকার মুরাদ আলি অল্প দিন হল মারা গেছেন, গোয়ালিয়রের অদ্বিতীয় ধ্রুপদীয়া ওমরাও খাঁ, টিকমগড়ের মৃদঙ্গী হরচরণ লাল অশীতিপর বৃদ্ধ। গোয়ালিয়রের রাজা ভাইয়া, বরোদার ফেয়াজ খাঁ, মৈহারের আলাউদ্দিন করবার যোগ্য ব্যক্তি নেই।'

বর্ণনায় ভারতীয় সঙ্গীতের অবনয়ন খুব বেদনাদায়ক। অবশ্য এ বিবরণে জোর পড়েছে যন্ত্রসঙ্গীতবিদ্‌দের বিষয়ে। এ লেখার এক দশক আগে 'ভ্রাম্যমাণের দিনপঞ্জিকা'য় দিলীপকুমার সারা ভারত ঢুঁড়ে বিষণ্ণ চিত্তে মন্তব্য করেছিলেন : 'আমি প্রায় সারাভারত খুঁজে এত কম ভাল গায়কের গান শুনেছি যে, — ভাবলে মন বিস্ময়ে ও আক্ষেপে অভিভূত না হয়েই পারে না।' প্রথম চৌধুরী তাঁর ছাত্রজীবনে কলকাতায় এসে কলকাতায় গানের পরিবেশকে 'সঙ্গীতছুট' বলে মন্তব্য করেছিলেন। সেকালের ওস্তাদিগান সম্পর্কে তাঁর টিপ্পনী হল : 'বিকৃত মুখভঙ্গী, কর্কশ কণ্ঠ, বিকট চীৎকার, সুরের ডনবৈঠকে, তালের দৌড়ঝাঁপ ... যেমন দৃষ্টিকটু তেমনি শ্রুতিকটু'। দিলীপকুমার তাঁর যৌবনকালের ভারতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করেছেন : 'আমাদের সঙ্গীতের মধ্যে সত্যকার শিল্পের অবস্থা আজ মুমূর্ষু। অশিক্ষিত পেশাদারের হাতে সঙ্গীতের সহস্রদল যে প্রস্ফুটিত হতে পারে না, এ-সত্যটি সম্বন্ধে সচেতন না হলে আমাদের সঙ্গীতের মুক্তি নেই।' এখানে মনে রাখা চাই যে, দিলীপকুমার মুগ্ধ হয়ে শুনেছিলেন আলাউদ্দিন খাঁ, চন্দন চৌবে, আবদুল করিম, ফৈয়াজ খাঁ, মন্মোহনলাল, ফিদা হোসন, শেযন, উজির খাঁ, অচ্ছন বাঈ প্রমুখের গান বা বাজনা। তবু বুঝেছিলেন 'আমাদের হিন্দুস্থানি সঙ্গীতের বিকাশধারার একটা মূলগত পরিবর্তনের সময় এসেছে' এবং 'সঙ্গীতানুরাগী মাত্রেরই কর্তব্য আমাদের সঙ্গীতের প্রতি শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।'

অমিয়নাথ সান্যালের নানা রচনায় স্বাধীনতার আগের দশকের বাংলার সঙ্গীত পরিবেশ সম্পর্কে কিছু তথ্য ও মন্তব্য আছে। শিক্ষিত ব্যক্তিরা যে সেকালে গানবাজনা বিষয়ে সংকীর্ণচিত্ত ও সংস্কারগ্রস্ত ছিলেন তা বোঝাতে তাঁর বর্ণনা 'শিক্ষিত ব্যক্তি ডুগিতবলা দেখে চমকে উঠে সরে যেতেন।' অমিয়নাথ তাঁর ছাত্রজীবনে ও যৌবনে গোঁদলপাড়ার রামবাবু, রাণাঘাটের নগেন ভট্টাচার্য, উত্তর কলকাতার সতীশ মুখোপাধ্যায়, ভবানীপুরের নগেন্দ্রবাবু ও হাওড়ার কালীপদ পাঠকের কাছে বহুরকমের বাংলা গান শুনে চমৎকৃত হয়েছিলেন। এককালে কলকাতার ও বাংলার নানা জমিদার বা ধনাঢ্যদের অর্থানুকূল্যে বিখ্যাত গুণী কলাবৎরা বাংলায় আসতেন। শেঠ দুলিচাঁদ, নাটোরের মহারাজা জাতীয় সামন্তশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষণা ছিল গানের বিষয়ে। তাই মৌজুদ্দিন, ফৈয়াজ খাঁ, কালে খাঁ, গহরজান, মালকাজান, গণপৎরাও ভাইয়া কিংবা বদল খাঁর মত গুণীরা বাংলায় এসে থাকতেন। স্বাধীনতার ঠিক আগে থেকে এবং পরে এই আনাগোনা লেনদেন কমে আসে, তার জায়গায় শুরু হয় সারারাতব্যাপী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসর, যার ভোক্তা ছিলেন বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজ। এই সূত্রে গানের ধারায় একটা বড় পরিবর্তন এল। গায়কগায়িকারা অভিজাতদের সমজদারির বাইরে বাজার খুঁজতে চাইলেন জনমানসে। শিক্ষিতরাই সেই শ্রোতার আসন-পূর্ণ করলেন। গানে বাঈজি ঘরানারও বিদায়লগ্ন ঘনিয়ে এলো।

আমাদের দেশে গানের ধরন আর গাইবার ধরনের একটা বিরোধের সম্পর্ক রবীন্দ্রনাথ

আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল, 'সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা জগতে বিরল। যাদের শক্তি আছে তারা গান বাঁধে, যাদের শিক্ষা আছে তারা গান গায় — সাধারণত এরা দু জাতের মানুষ। দৈবাৎ ইহাদের জোড় মেলে, কিন্তু প্রায় মেলে না। ফলে দাঁড়ায় এই যে, কলাকৌশলের কলা অংশটা থাকে গানকর্তার ভাগে, আর ওস্তাদের ভাগে পড়ে কৌশল অংশটা। কৌশল জিনিসটা খাদ হিসাবেই চলে, সোনা হিসাবে নয়। কিন্তু ওস্তাদের হাতে খাদের মিশল বাড়িতেই থাকে। কেননা, ওস্তাদ মানুষটাই মাঝারি, এবং মাঝারির প্রভুত্বই জগতে সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা। এই জন্যে ভারতের বৈঠকী সঙ্গীত কালক্রমে সুরসভা ছাড়িয়া অসুরের কুস্তির আখড়ায় নামিয়াছে সেখানে তান-মান-লয়ের তাণ্ডবটাই প্রধান হইয়া ওঠে, আসল গানটা ঝাপ্‌সা হইয়া থাকে।' এই জায়গা থেকে 'সঙ্গীতের মুক্তি' খুঁজতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ আর দ্বিজেন্দ্রলাল, এবং তাঁরা সফল হয়েছিলেন 'নতুন নতুন উদ্‌ভাবনের মুখে'। সঙ্গীতকে তাঁরা 'অচলতার বাঁধন' থেকে মুক্ত করে 'বিশ্বযাত্রার তালে তাল' রেখে চালাতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এটাও বুঝেছিলেন যে, 'সঙ্গীতের স্বাতন্ত্র্য যন্ত্রে সবচেয়ে প্রকাশ পায়। বাংলার আপন কোনো যন্ত্র নেই, এবং প্রাচীন কালেই হোক আর আধুনিক কালেই হোক, যন্ত্রে যাঁরা ওস্তাদ তাঁরা বাংলার নন। বীণ রবাব শরদ সেতার এসরাজ সারেঙ্গী প্রভৃতির তুলনায় আমাদের রাখালের বাঁশি বা বৈরাগীর একতারা কিছুই নয়।... এই সমস্ত লক্ষণ দেখে আমার বিশ্বাস হয় বাংলা দেশে কাব্যের সহযোগে সঙ্গীতের যে বিকাশ হচ্ছে, সে একটি অপরূপ জিনিস হয়ে উঠবে।'

স্বাধীনতার ছাব্বিশ বছর আগে রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য অনেকাংশে সত্য, আবার সত্য নয়। কারণ কাব্য-সহযোগে রচিত গানই যে বাংলার শ্রেষ্ঠ সম্পদ তা বুঝতে আজ অসুবিধে নেই। তবে বাঁশি ও একতারা বাদে বাঙালির দোতারা ও সারিন্দার কথা রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেননি। অবশ্য এই যন্ত্রদুটির স্বতন্ত্র প্রকাশক্ষমতা নিয়ে তেমন পরীক্ষা হয়নি, কেবল গানের সঙ্গে সহযোগী যন্ত্রের ভূমিকা স্বীকৃত এই তারযন্ত্র দুটির, তবে স্বাধীন ভারতে কণ্ঠসঙ্গীতের পাশে বাঙালির যন্ত্রসঙ্গীতবাদনে সিদ্ধি রবীন্দ্রনাথ দেখে যাননি, যদিও সূচনা দেখে গেছেন। আলাউদ্দিন ও তিমিরবরণের সমাদর করতেন তিনি।

বস্তুত সঙ্গীতের সর্বভারতীয় পটভূমিকায় স্বাধীনতাপ্রাপ্তির আগে পরে সবচেয়ে যেটা লক্ষণীয় তফাত, তা হল, কণ্ঠসঙ্গীতের জায়গায় যন্ত্রসঙ্গীতের প্রতিষ্ঠা। এই সময়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতীয় সঙ্গীত সেতার সরোদ বাঁশির ক্ষেত্রে জনপ্রিয়, কিন্তু সেই মাপের কণ্ঠসঙ্গীত শিল্পী কই? রবীন্দ্রনাথ তাঁর মন্তব্যে বাঙালির যন্ত্রসঙ্গীতে অদক্ষতা বিষয়ে যে ইঙ্গিত করেছেন তার বিরুদ্ধে বহু নাম করা যায়। স্বাধীনতার পরে গত পঞ্চাশ বছরে এসব শিল্পী আমাদের গর্ব ও গৌরব। আলাউদ্দিন খাঁ আর তাঁর পরম্পরায় আলি আকবর, রবিশঙ্কর ও নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় গত কয়েক দশক সর্বভারতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি পেয়েছেন। সেতারে এমদাদ-এনায়েত ঘরানার বিলায়েত খাঁকে আধা বাঙালি বলা চলে। বাঙালি নন কিন্তু বাংলাকেন্দ্রিক যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পীদের মধ্যে ভি. জি. যোগ, ভি. বালসারা, আমজাদের নাম অনায়াসে এসে পড়ে। সেতারে বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী, গোকুল নাগ ও মণিলাল নাগ, এস্রাজে অশেষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোদে তিমিরবরণ-ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য-রাধিকামোহন মৈত্র-বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, হার্মোনিয়মে মণ্টু ব্যানার্জি ও জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, বেহালার শিশিরকণা ধর চৌধুরী, বাঁশিতে গৌর গোঁসাই-পান্নালাল ঘোষ — এসব নামকরা পরম্পরা। একইভাবে উল্লেখ্য আলাউদ্দিনের ভাই আফতাবউদ্দিন ও তাঁর পুত্র বাহদুর খাঁর কথা, শ্যাম গাঙ্গুলির প্রসঙ্গ। স্বাধীনতার পরের

পঞ্চাশ বছর এঁরা গানের জগতে অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন ও দেখাচ্ছেন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ প্রয়াত হয়েছেন গত পঞ্চাশ বছরের বলয়ে। এই তালিকায় তবলিয়াদের নাম আনিনি বাহুল্যদোষে। তাঁদের অনেকে আজ প্রতিষ্ঠিত ও উচ্চমানসম্পন্ন।

এই সুযোগে স্বাধীনতার আগে প্রয়াত বিশিষ্ট কজন গন্ধর্ব ও গান্ধর্বিকার (শব্দদুটি অমিয়নাথ সান্যাল-কৃত) নাম ও মৃত্যুসাল উল্লেখ করছি। তাঁরা বদল খাঁ (১৯৩৭), ভাস্করবুয়া বাখালে (১৯২২), গহরজান (১৯৩০), মৌজুদ্দিন (১৯২৬), আল্লাদিয়া খাঁ (১৯৪৬), বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে (১৯৩৬), আব্দুল করিম খাঁ (১৯৩৭)। স্বাধীনতার পরে যেসব সঙ্গীতগুণী তাঁদের প্রতিভার ছটায় দেশকে আলোকিত করে অস্তমিত হয়েছেন তাঁদের তালিকাটিও বেশ বড়। এ-তালিকাটি নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ নয় এবং মৃত্যুসালগুলিও কালানুক্রমিক নয়। শিল্পীদের নাম : ফৈয়াজ খাঁ (১৯৫০), কণ্ঠে মহারাজ (১৯৬৯), ওঙ্কারনাথ ঠাকুর (১৯৬৩), বিনায়ক রাও পটবর্ধন (১৯৭৫), আমীর খাঁ (১৯৭৪), কেশরবাঈ কেরকর (১৯৭৭), ডি. ভি. পালুসকর (১৯৫৫), ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় (১৯৭৭), বেগম আখতার (১৯৭৪), শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ রতনজনকর (১৯৭৪), আলাউদ্দিন খাঁ (১৯৭২), আহমদ জান থিরাকুয়া (১৯৭৬), ধ্রুবতারা যোশি (১৯৯৩), হাফিজ আলি খাঁ (১৯৭২), পান্নালাল ঘোষ (১৯৬০), পারুর সুন্দরম আয়ার (১৯৭৪), পণ্ডিত শঙ্করনারায়ণ ব্যাস (১৯৫৮) ও দিলীপকুমার রায় (১৯৮০)। এই প্রয়াণপঞ্জিতে উল্লেখ থাক আল্লারাখা, নিখিল ঘোষ, কানাই দত্ত, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, গোকুল নাগ, তিমিরবরণ, বাহাদুর খাঁ, তারাপদ চক্রবর্তী, সিদ্ধেশ্বরী দেবী, চিন্ময় লাহিড়ী, কুমার গন্ধর্ব, মল্লিকার্জুন মনসুর, কেরামতুল্লা খাঁ, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ ও প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। বাঙালি সঙ্গীতনায়কদের মধ্যে গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, নগেন দত্ত ও কালীপদ পাঠকের নাম চিরস্মরণীয়। এখনও যেসব বাঙালি গায়কগায়িকা সক্রিয় আছেন মার্গ সঙ্গীতে তাঁদের মধ্যে প্রবীণতম যামিনীনাথ গাঙ্গুলি। নিরানব্বই বছর বয়সে এখনও তালিম দিচ্ছেন। উল্লেখযোগ্য অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও নীহাররঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। সদ্যতন কালের শিল্পী অজয় চক্রবর্তী ও অরুণ ভাদুড়ির কাছে বাঙালির অনেক প্রত্যাশা রয়েছে। মালবিকা কানন ও মীরা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বীকৃত দুটি নাম। বাঙালি নন তবু বঙ্গদেশবাসী এ. কানন শ্রদ্ধেয় গায়ক। পশ্চিমবঙ্গেই এখন ভাল গাইছেন রাশিদ খাঁ। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এই সময়ে সর্বজনপরিচিত শিল্পী এম. এস. শুভলক্ষ্মী, বালমুরলিকৃষ্ণ, ভীমসেন যোশী, গিরিজা দেবী ও কিশোরী আমনকর। উঠে আসছেন উল্লাস কোশলকর। পশ্চিমবঙ্গে মার্গসঙ্গীতের উন্নতিকল্পে প্রাচীন গুরুকুলের আদলে গড়ে উঠেছে সঙ্গীত রিসার্চ অ্যাকাডেমি। সামূহিক গানের পোষকতা করবার জন্য রাজ্য সরকার প্রতিষ্ঠা করেছেন রাজ্য সঙ্গীত অ্যাকাদেমি। সেখানে গবেষণা, সংরক্ষণ ও প্রশিক্ষণ চলছে। প্রকাশিত হচ্ছে নানা সঙ্গীতবিষয়ক গ্রন্থ ও স্বরলিপি, পত্রিকা ও ক্যাসেট। রাজ্য তথ্যবিভাগের অধীনে লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। সেখানে রাজ্যের তৃণমূল স্তরের লোকগানের নানা নমুনা সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হচ্ছে। আর্থিকভাবে পুরস্কৃত হচ্ছেন প্রতি বছর নানা স্তরের শিল্পীরা। হচ্ছে ওয়ার্কশপ ও সেমিনার। বিপুল জনাদরে শুরু হয়েছে গানের মেলা। অলিতে গলিতে গান শেখানোর স্কুল, ডিপ্লোমাপ্রাপ্তির সর্বভারতীয় নেটওয়ার্ক। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে গানের সুযোগ বেড়েছে, মান বেড়েছে কতটা?

তিন

পঞ্চাশ বছরের বাংলা গানের দিকে সিংহাবলোকন করলে দেখা যাবে বাংলা ফিল্মের গানের একটা বড় ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে, তার কারণ, বিশেষ করে পঞ্চাশের দশক থেকে যাট-সত্তর পর্যন্ত বাংলার ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির ব্যাপক বিস্তার ও বাণিজ্য গড়ে ওঠে। সত্তরের পরেই অবশ্য এই বিস্তারের চেহারা পাল্টে এখন প্রায় অবনয়নমুখী। পাশাপাশি মুম্বাই ও দক্ষিণ ভারতের চলচ্চিত্র ব্যবসা ক্রমশ ফুলে ফেঁপে উঠছে। চলচ্চিত্রে বাঙালির এই পশ্চাদপসরণের অনেক সঙ্গত কারণ আছে। সে আলোচনা উপস্থিত অপ্রাসঙ্গিক। তিরিশ দশকের পরে বাংলা ফিল্মের গান সর্বভারতীয় সম্ভ্রম আর স্বীকৃতি আদায় করেছিল তার কারণ রাইচাঁদ বড়াল, শচীনদেব বর্মন, পঙ্কজ মল্লিক, সায়গল, হীরেন বসু, ধীরেন দাস, কাননবালা, উমাশশী, ইন্দুবালা, আঙুরবালার মত একঝাঁক সঙ্গীত-প্রতিভার আবির্ভাব। স্বাধীনতর পরেই আসে উত্তমকুমার-সুচিত্রা জুটির অপূর্বকল্পিত জনপ্রিয়তা এবং তা স্থায়ী হয় দু'দশক ব্যেপে। এঁদের সঙ্গে নেপথ্যে গলা মিলিয়ে হেমন্ত, মান্না দে, শ্যামল, ভূপেন হাজারিকা, সন্ধ্যা, গীতা দত্ত, আরতি মুখোপাধ্যায় দুর্নিবার জনাদরের অভ্যর্থনা পান। এই স্বীকৃতির নেপথ্যে ছিল সুরকারদের চমকপ্রদ শ্রম ও সুরকল্পনা। অনুপম ঘটক, রবীন চট্টোপাধ্যায়, সলিল চৌধুরী, সুধীন দাশগুপ্ত, ভূপেন হাজারিকা, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, নচিকেতা ঘোষদের সাফল্য অবিস্মরণীয়। তাঁদের কৃতিত্ব মধ্যম পর্যায়ের গীতিকারদের (গৌরীপ্রসন্ন, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্যামল গুপ্ত) রচনাকেও শিল্পগুণে মণ্ডিত করেছিলেন। তুলনায় স্বাধীনতা পূর্ববর্তী গীতিকাররা ছিলন অনেক শক্তিশালী, যাঁদের একজন প্রেমেন্দ্র মিত্র, আর একজন প্রণব রায়। সে সময়ের সুরকার কমল দাশগুপ্ত তাঁর প্রতিভা অনুযায়ী স্বীকৃতি পাননি। নতুনকালের ফিল্মের গানরচনায় বিমলচন্দ্র ঘোষ, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সলিল চৌধুরী দক্ষতার ছাপ রেখেছেন। বাংলা ফিল্মের গানে গত পঞ্চাশ বছরে আরও যাঁরা স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য ধনঞ্জয়, মানবেন্দ্র, কিশোরকুমার, আলপনা, প্রতিমা, সুপ্রভা সরকার, উৎপলা সেন ও সবিতা চৌধুরী। কিন্তু গানের এই স্বর্ণযুগ বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। প্রধানত হিন্দি ফিল্মের টানে প্রধান কটি বাঙালি সঙ্গীত-প্রতিভা মুম্বাই প্রবাসী হন। তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন শচীনদেব বর্মন, ও অনিল বিশ্বাস, সলিল চৌধুরী, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও মান্না দে। এঁদের সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠা একইরকম আছে এখনও। সলিল ও হেমন্ত পরে কলকাতায় ফেরেন কিন্তু তাঁদের হারানো দিনের কৃতি তেমনভাবে পুনরাবৃত্ত হয়নি। বরং মুম্বইয়ে গিয়ে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন রাহুল দেববর্মন ও বাপ্পী লাহিড়ী। এত সব সফল বাঙালি প্রতিভার মধ্যে মান্না দে ও বাপ্পী ছাড়া এখন সবাই প্রয়াত। হিন্দি ফিল্মের জগতে বিস্ময়কর সাফল্য পান কিশোরকুমার কয়েক দশকব্যাপী, তিনি প্রবাসী বাঙালি। গত একদশকের বেশি সেখানকার তথা সর্বভারতীয় ফিল্মের গানে একচ্ছত্র সম্রাট বঙ্গসন্তান কুমার শানু। এখানে উল্লেখ থাকে যে গত তিন দশকে ফিল্মের গান এক লাভজনক পণ্যে পরিণত হয়েছে। শিল্পীদের আকাশছোঁয়া দক্ষিণা, বিলাসবহুল ফ্ল্যাট, গাড়ি আর জাঁকালো পোশাকের আড়ম্বর, তাঁদের নারীবিলাস ও যাপনের মিথ, তাঁদের আন্তর্জাতিক কনসার্ট ও অবিশ্বাস্য সংখ্যক ক্যাসেট বিক্রির রেকর্ড এখন বিনোদন পত্রিকার রোচক প্রসঙ্গ। সুরকার ও গীতকারদের অর্থকৌলিন্যও উল্লেখ্য। পরিকল্পিত ও অতিবিন্যস্ত ওই গানের বিপণন ও তার প্রবাদপ্রতিম শিল্পীসমাজ আজ ঈর্ষাযোগ্য একটি বিষয়। লতা মুঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে, মহম্মদ রফি, মুকেশ, কিশোরকুমার, কুমার শানু, উদিতনারায়ণ, মহেন্দ্র কাপুর, 'কবিতা কৃষ্ণমূর্তি, অনুরাধা পড়োয়াল, অলকা ইয়াগনিক যুবসমাজের আলোচনার মধ্যমণি।

রজতপটের মায়াজগতের গানে, তার সুনিশ্চিত জনস্বীকৃতি সুরকার ও শিল্পীদের আর্থিক সচ্ছলতা ও প্রচার মাধ্যমের ঢক্কানিনাদের নেপথ্যে আর এক রকমের বাংলা গানের প্রচ্ছন্ন কিন্তু স্বস্তিকর আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। এক কথায় একে বলা যায় বাংলা লোকসঙ্গীত। দেশ স্বাধীন হবার আগে আব্বাসউদ্দিন, শচীনদেব বর্মন, নজরুল ইসলাম আর অনন্তবালা বৈষ্ণবীরা যে ধরনের পল্লীগীতি গাইতেন স্বাধীনতার ক'বছর পরে সেই লোকসঙ্গীতের একটি নতুন ধারা গজিয়ে ওঠে। পঞ্চাশের দশকে একই সঙ্গে অসমীয় লৌকিক সুরে বাঁধা ভূপেন হাজারিকার বাংলা গান, রাঢ়ের বাউল সুরে পূর্ণচন্দ্র দাসের লোকগীতি এবং সিলেটের সুনামগঞ্জের শিল্পী নির্মলেন্দু চৌধুরীর কণ্ঠসম্পদ বাঙালি শ্রোতাকে অভিভূত করে ফেলে। এঁদের তিনজনের মধ্যে প্রচুর গান গেয়ে আর ব্যাপক জনপ্রিয়তার মধ্যে নির্মলেন্দু প্রয়াত হয়েছেন। ভূপেন ও পূর্ণদাস এখনও সক্রিয়। তবে পূর্ণদাসের সুসময় ও জনপ্রিয়তা এখন ততটা নেই আর ভূপেন হাজারিকা গায়ক হিসাবে নন, হিন্দি ফিল্মে সুরকার হিসেবে এখন সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। এঁদের জীবনের তিনরকম ভিন্ন গতি হলেও এঁদের প্রয়াস, কণ্ঠসম্পদ, প্রতিভা ও গায়নশৈলী এক ধরনের নতুন বাংলা গান ও অগণিত বাঙালি শ্রোতার সংখ্যা বাড়িয়ে তুলেছে। কেউ কেউ এই জাতীয় গানকে 'ফোকো-মডার্ন' বা শহরে বানানো পল্লীগীতি বলে বক্রোক্তি করেন। কিন্তু লক্ষ করা যাচ্ছে, রবীন্দ্রসঙ্গীত জাতীয় সমুচ্চ বর্গের গান যাঁদের খুশি করেনি, আধুনিক গানের সাম্প্রতিক ব্যর্থতা যাঁদের গানহীনতার দিকে ঠেলে দিয়েছিল, সাম্প্রতিক বাংলা ফিল্মের গানেও যাঁরা রস পাচ্ছিলেন না, এই ধরনের বানানো লোকসঙ্গীতে তাঁদের স্ফূর্তি এসেছে। এই জাতীয় গানে আকস্মিক জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন সত্তর ও আশির দশকে রুণা লায়লা ও স্বপ্না চক্রবর্তী। পরবর্তীকালে গোষ্ঠগোপালের লোকসঙ্গীত জনপ্রিয়তার শীর্ষস্থলে উঠেছিল। তাঁর আকস্মিক অকালপ্রয়াণ না ঘটলে তিনি নিঃসন্দেহে আজ বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় লোকশিল্পী হতেন। মনে রাখতে হবে গত তিন দশক ব্যেপে ক্যাসেট বিক্রির যে-ব্যাপক হুজুগ দেখা দিয়েছে, তা পশ্চিমবঙ্গের প্রধান শহরগুলি ডিঙিয়ে, গ্রামে-গঞ্জে খনি এলাকায় ও বস্তিতে ছড়িয়ে পড়েছে। যাদের ততটা সঙ্গীতবোধ নেই, গান সম্পর্কে ছুৎমার্গও নেই, বিনোদনেরও নেই কিছু তেমন অবলম্বন, সেই সাধারণ বর্গের শ্রোতাদের মধ্যে, কৃষিজীবীদের, শ্রমিকদের মধ্যে, হকার, লরিশ্রমিক ও বাসকর্মীদের মধ্যে এই জাতীয় হাল্কা ঢঙের লোকসঙ্গীত খুবই প্রসারলাভ করেছে। অনেক অবিখ্যাত ক্যাসেট কোম্পানি ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে গত দেড়দশক এই ধরনের গানে ব্যাপক বিপণন বাড়িয়ে তুলেছে। এর ফলে উত্তরবঙ্গের অনামা শিল্পীর কণ্ঠে ভাওয়াইয়া গান কিংবা বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার গ্রামীণ শিল্পীর কণ্ঠে ঝুমুর গান, নদীয়ার গ্রামের খ্রিস্টীয় বাউলের গান কিংবা মুর্শিদাবাদের তৃণমূলস্তরের ফকিরি গান এখন আঞ্চলিক ভাবেও কিনতে পাওয়া যায়। শুধু সাধারণ শ্রোতা, খেটে খাওয়া মানুষ বা গ্রামীণ মানুষ নয়, এ জাতীয় গানের সংগ্রহ ও সমীক্ষার প্রবণতা শহুরে শিক্ষিত শ্রেণী ও গবেষকদের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে। অনেক মাঝারি মাপের শিল্পী এই ধরনের গান ক্যাসেটে গেয়ে আজ উন্নত জীবনের স্বপ্ন সফল করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন স্বপন বসু, সনজিৎ মণ্ডল, প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী, পরীক্ষিৎ বালা, সুকণ্ঠ অধিকারী প্রমুখ।

সাধারণভাবে গত পাঁচ দশকে বাংলার লোকধর্ম, লোক সংস্কৃতি লৌকিক জীবন-বিন্যাস নিয়ে যে-সব চর্চা ও অনুসন্ধান শুরু হয়েছে ব্যক্তিগতভাবে ও প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে, তার ফলে বেশ ক'বছর ধরে লালন ফকিরের গান সম্পর্কে ব্যাপক কৌতূহল দেখা দিয়েছে। গ্রামোফোন রেকর্ডে, ক্যাসেটে, বেতার অনুষ্ঠানে ও দূরদর্শনে, ডকুমেন্টারি ছবিতে

ব্যাপকভাবে লালনের গান প্রযুক্ত হচ্ছে এবং তার যথার্থ সুরসন্ধান চলছে। বিখ্যাত গণসঙ্গীত শিল্পী অজিত পাণ্ডে সম্প্রতি লালনের গানের একটি ক্যাসেট প্রকাশ করেছেন। 'ভ্রমরা' নামে একটি গীতিসংস্থা চারটি ক্যাসেটে তৃণমূলস্তরের নানারকম লৌকিক বাংলা গান বাজারে ছেড়েছেন ব্যবসায়িক ভিত্তিতে। যশস্বী গায়ক অমর পাল ও দীনেন্দ্র চৌধুরী নিপুণ নিষ্ঠায় শুদ্ধভাবে প্রচার করে চলেছেন বাংলার মাটির সুরের নিজস্ব গান। প্রখ্যাত গবেষক খালেদ চৌধুরীর নেতৃত্বে ১৯৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে Folk Music and Folk lore Research Institute. খালেদ এবং তাঁর সহকারী রণজিৎ সিংহ গভীর নিষ্ঠায় গত তিন দশক ধরে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে চলেছেন বহু ধরনের বাংলা গ্রামীণ গীতি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে 'রাজ্য সঙ্গীত একাডেমী' লোকসঙ্গীত গবেষক কঙ্কণ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে সংগ্রহ ও শ্রেণীকরণ করেছেন বহুধরনের লোকসঙ্গীত। রাজ্যের 'লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র' গত দু'বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রাম্য জনপদে সংগ্রহ সংরক্ষণ ও সমীক্ষা চালাচ্ছেন বাউল ও ফকিরি গানের। পশ্চিমবঙ্গে শ্রোতাদের কাছে বিশুদ্ধ ভাওয়াইয়া গান পরিবেশন করে খ্যাতি পেয়েছেন সুখবিলাস বর্মা। অসমের গৌরীপুর অঞ্চলের লোকসঙ্গীত প্রতিমা বড়ুয়ার কণ্ঠ লাবণ্যে বাংলা ও বাঙালিকে আপ্লুত করেছে। এইসব সুস্থ প্রয়াস ও সনিষ্ঠ কৃতির পাশে একদল গায়ক-বাউলের দেশে বিদেশে সাম্প্রতিক বিপুল জনপ্রিয়তার প্রসঙ্গও উল্লেখ করা উচিত। এঁরা অনেকেই জীবনাচরণে ও সাধনায় বাউল নন, কিন্তু বাউল গানকে পণ্য করে, বাউলের পোশাক পরে, বিদেশিমঞ্চ দাপিয়ে বিপুল ডলার রোজগার করছেন। বাংলা গানের ধারাবাহিকতায় গান পরিবেশনের এই বিকৃতির খবরটুকুও প্রাসঙ্গিক।

আসলে লোকসঙ্গীতের সমাদর বাঙালি শ্রোতা ও বাঙালি সুরকাররা বরাবরই করে এসেছেন। রবীন্দ্রনাথ থেকে নজরুল এবং পরবর্তীকালে সলিল চৌধুরী তাঁদের গানে বাংলা লোকসঙ্গীতের নানা সূক্ষ্ম উপাদান ব্যবহার করেছেন। কিন্তু বিকৃতির প্রসঙ্গটি উঠেছে সম্প্রতিকালে, মনে হয় গত তিন দশক ধরে। হেমাঙ্গ বিশ্বাস ও ঋত্বিক ঘটক তাঁদের গায়নে ও চলচ্চিত্রে প্রয়োগের ক্ষেত্রে অবিকৃত লোকসঙ্গীতের সুর, তার আঞ্চলিক উচ্চারণ সমেত রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন। ঋত্বিকের সব ছবিতেই সেই প্রয়াস আছে। কিন্তু নির্মলেন্দু-উৎপলেন্দু চৌধুরীরা এবং অনেকাংশে পূর্ণদাস ও প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারীরা বাংলার আঞ্চলিক লোকসঙ্গীতকে মার্জিত বাণী ও কিছুটা পরিবর্তিত সুরে লোকরঞ্জক করতে চেয়েছেন। এই দুপক্ষেরই পরীক্ষা-নিরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সামর্থ্য ও প্রতিভা। কিন্তু গত দু'দশক ধরে 'সাজানো বাউল'রা বিদেশী শ্রোতাদের জনপ্রিয়তা লাভের আশায় দেশজ গানকে ভাবে ও সুরে যতটা চটকদার বিনোদনধর্মী করে তুলেছেন, তার তরঙ্গ আমাদের পল্লীপ্রান্তের গায়ককেও দিনে দিনে আকৃষ্ট করছে ও বিভ্রান্ত করছে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখলে এমনও মনে হতে পারে স্বাধীনতা লাভের পরে আমরা শিকড়ের সন্ধানে গিয়ে যে আমূল লোকসঙ্গীতের সন্ধান পেয়েছিলাম, অর্ধশতাব্দীর মধ্যেই সেই ধারা বাণিজ্যিকতায় আচ্ছন্ন ও মোহগ্রস্ত হয়ে গেল।

চার

কোনও দেশের নাট্যমঞ্চ বা চলচ্চিত্রের প্রয়োজনে যে গান লেখা হয় তাতে স্বতঃস্ফূর্ততা থাকতে পারে না কারণ সেই সৃষ্টির উৎস তাৎক্ষণিক প্রয়োজন, ব্যবহারিক এবং তাতে শিল্পীব্যক্তিত্বের চেয়েও বেশি প্রয়োজন কোনও চরিত্র বা সিচুয়েশন-কে ব্যক্ত করা। নাটক

ও চলচ্চিত্রের প্রধান কাজ যেহেতু দর্শকদের মনোরঞ্জন, অতএব এই জাতীয় গানে সহজ জনমনোরঞ্জনের উপাদানগুলি থাকে। কোনও 'চরম সঙ্গীতের গভীরতা' এর মধ্যে না খোঁজাই ভাল। কিন্তু বাংলা নাটকে ও চলচ্চিত্রে এইসব শর্ত মেনেও এমন কিছু গান সৃষ্টি হয়েছে যা উপলক্ষকে ও তাৎক্ষণিক প্রয়োজনকে মিটিয়েও চিরকালের বাংলা গানের সঞ্চয়ের তালিকাভুক্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও গিরিশচন্দ্রের বেশ কিছু নাট্যসঙ্গীত সম্পর্কে একথা যেমন সত্য তেমনি স্বাধীনতার আগে-পরে তৈরি করা অনেক বাংলা চলচ্চিত্রের গান সম্পর্কেও প্রযোজ্য। অবশ্য এর বিপরীত প্রক্রিয়ার উদাহরণও আমাদের গানে আছে। সত্যজিৎ রায় একান্তই তাঁর চলচ্চিত্রের প্রয়োজনে কিছু গান লিখেছিলেন যা তাঁর চলচ্চিত্রেরই বিষয়গত। সিনেমা হলের বাইরে সেগুলির তাৎপর্য ও জনপ্রিয় হবার সুযোগ খুবই কম। তাঁর ফিল্মের প্রয়োজনে সত্যজিৎ ভাল গান লিখতে পারতেন, সুর করতে পারতেন এবং সম্পূর্ণ আনকোরা শিল্পীকে দিয়ে (যেমন অনুপ ঘোষাল) সার্থকভাবে গান গাইয়েও নিতে পারতেন। অথচ ফিল্মের বাইরে তিনি আমাদের কাছে রসপরিবেশনের তাগিদে কখনও গান লেখেননি। আধুনিক বাংলা গান সম্পর্কে সম্ভবত তাঁর কোন দায়বদ্ধতার বোধ ছিল না। থাকলে বাংলা গান সমৃদ্ধতর হত নিশ্চয়ই। তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' আর 'হীরকরাজার দেশে'-র গানগুলিতে। এ দেশের অসংখ্য শিশু-কিশোরের হৃদয়জয় করে, যুবক ও বৃদ্ধদেরও রসবোধকে পরিতৃপ্ত করেছিল সেই গানগুলি। কোথায় গেল সেই গান? এই প্রশ্নে মনে পড়ে যে, কোনও গানের সৃষ্টি আর তার বেঁচে থাকার কারণ সব বিচার বিশ্লেষণে ধরা পড়ে না। ক্ষুদিরামের ফাঁসির ঘটনাকে উপলক্ষ করে 'একবার বিদায় দাও মা' গানটি কোন্ গুণে বা কোন্ কারণে প্রায় একশো বছর বাঙালি গীতিরসিকদের মধ্যে টিকে গেল তা অনুমান করা কঠিন। হয়তো পরাধীন দেশের ভাবাবেগ, একটি কিশোরের আত্মত্যাগ এবং পুনর্জন্ম নেবার মিথ এই গানকে আর্দ্র করে দিয়েছে। সেই সঙ্গে সার্থক একটি গৌরপদাবলীর লৌকিক সুর গানটির বেদনাকে ধারণ করে আছে প্রায় এক শতাব্দী। একইভাবে মনে আসে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও রজনীকান্ত যে-গানগুলি লিখেছিলেন তা আজও মানুষ গায়। তারও পরবর্তীকালের অতুলপ্রসাদ, মুকুন্দ দাস, মোহিনী চৌধুরী ও নজরুলের লেখা স্বদেশী গানগুলি পরাধীন ভারতে লেখা হলেও স্বাধীন দেশের পঞ্চাশ বছরে সমানভাবে প্রাসঙ্গিক ও সমানভাবে আদৃত। দেশকালের নানা অগ্নিগর্ভ উপলক্ষ ঘিরে বা তৎসাময়িক আন্দোলনের উত্তপ্ততায় যেসব গণসঙ্গীত স্বাধীনতার আগে ও পরে রচিত হয়েছিল এবং জনমনকে আপ্লুত করেছিল বিপুল আবেগে, সেগুলি কি বাংলা স্বদেশী গানের মত দীর্ঘজীবন পেয়েছে? দেশ স্বাধীন হবার বেশ ক'বছর আগে থেকেই এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের গায়ে গায়ে অনেক গান উচ্ছ্রিত হয়েছিল, তার সবই কিছু প্রগতি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। সারা বিশ্বে তখন চলছে যুদ্ধজনিত উত্তেজনা, নৈরাশ্য, ভাঙাগড়া। বাংলায় গঠিত হয়েছে ফ্যাসিবিরোধী সংগঠন, সারাদেশ উত্তাল হয়ে গেছে আগস্ট আন্দোলনে আর অখণ্ড বাংলা দুর্ভিক্ষ-প্লাবন-মন্বন্তরে ত্রস্ত। এই সময়েই গড়ে উঠেছিল 'কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ', 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ' এবং 'ক্রান্তি শিল্পী সংঘ'। সুকৃতি সেনের সুরে 'অভ্যুদয়' গীতিনাট্যের গান সে সময়ে শ্রোতাদের মন পরিপ্লাবিত করলেও আজকে তার আর স্মৃতিটুকু নেই। তেভাগা আন্দোলনের গান, ১৩৫০ সালের মন্বন্তরের গান, সেই সময়ের ব্রতী ও কর্মীদের উদ্দীপ্ত করেও গীতরসিকদের সচকিত করে তুলেছিল তার আন্তরিকতায় ও নতুনত্বে। এরই গায়ে গায়ে এলো হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা আর বেদনাদায়ক

দেশভাগের ঘটনা। সচেতনভাবে প্রগতিপন্থী সঙ্গীতশিল্পী, চিত্রকর ও রাজনৈতিক কর্মীরা নেমে পড়লেন পথে পথে। চিত্তপ্রসাদ ও জয়নুল আবেদিনের ছবিতে ধরা আছে সেই সময়। সোমনাথ হোর তাঁর তেভাগা চিত্রমালায় ধরে রেখেছেন আন্দোলনের স্বরূপ। গণনাট্যসংঘের 'নবান্ন' ও 'উলুখাগড়া' নাটকে রয়ে গেছে প্লাবন, মন্বন্তর ও কালোবাজারের কাহিনী। বাংলা গানও এই সময় রেডিও এবং রেকর্ডের বন্ধন ভেঙে, বিপণনের মায়া ত্যাগ করে, নেমে এসেছিল সন্তপ্ত মানুষের সান্ত্বনায় কিংবা তাদের বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের বেদনাকে প্রকাশ করতে। সলিল চৌধুরীর রচনা 'হেই সামালো ধানহো' গানে পঞ্চাশের লক্ষ প্রাণ বিসর্জনের মা বোনদের লজ্জা আর অপমানের ক্ষোভ গর্জে ওঠে। শুধু ক্ষোভ নয় সেই সঙ্গে প্রতিরোধের কথাটাও ঘোষিত হল হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গানে :

> তোমার কাস্তেটারে দিও জোরে শান—
> কিষান ভাইরে।
> ফসল কাটার সময় হলে কাটবে সোনার ধান রে।।
> দস্যু যদি লুটতে আসে কাটবে তাহার জান রে।।

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ঘোষণা করলেন : 'এস মুক্ত কর মুক্ত কর অন্ধকারের এই দ্বার'। দেশ বিভাগের আগে পরে স্বাধীনতার উদ্যত লগ্নে বাংলার গণসঙ্গীত আমাদের জানালো : 'আজ বাংলার বুকে দারুণ হাহাকার'। আহ্বান করা হল : 'শহীদ স্মরণে আপন মরণে রক্তঋণ শোধ কর শোধ কর।' ঘোষিত হল এমত শপথ : 'ঝঞ্ঝা ঝড় মৃত্যু দুর্বিপাক : ভয় যারা পায় তাদের ছায়া দূর মিলাক।' বিনয় রায় গাইলেন কমলাপুর, ডোঙ্গাজোড়া, চন্দনপিঁড়ির শহীদদের স্মৃতিমুখরিত গান। এমনকি সুদূর দক্ষিণ ভারতের অন্তর্গত মালাবারের কায়ুর বিপ্লবীদের ফাঁসির প্রতিবাদে তিনি গেয়ে উঠলেন : 'ফিরাইয়া দে মোদের কায়ুর বন্ধুদেরে'। দেশ বিভাগের মূল্যে যে-স্বাধীনতা আমরা অর্জন করলাম তার অনিবার্য রূপ ফুটে উঠল উদ্বাস্তু জীবনের মর্মন্তুদ জীবন ধারণে। সেই ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের উদ্দীপ্ত করে হেমাঙ্গ বিশ্বাস লিখলেন : 'বাঁচবো রে বাঁচবো/ভাঙা বুকের পাঁজর দিয়া নয়া বাংলা গড়ব'—। এইরকম বহু গান যা সমসাময়িক যন্ত্রণা-বেদনা-ক্ষোভ ও অপমানের পথে উদ্ভিদের মত জেগে উঠেছিল স্বাধীনতার আগে পরে, তার সবটা বিশেষত তার সুরের কাঠামো আর গায়নের ওজস্বিতা আমরা ধরে রাখতে পারিনি, তার কারণ এ-দেশে তখন টেপরেকর্ডার আসেনি এবং সরকারি পরিচালনার প্রচারমাধ্যম বেতার কেন্দ্র এদের সঙ্গীত-মূল্য ও সামাজিক-মূল্য বোঝেননি। গ্রামোফোন কোম্পানিগুলি এই সব নবজীবনের গানে কোনও বিপণনের সম্ভাবনা দেখেননি। পরে নানা ঘটনাচক্রে ও পার্টির নির্দেশে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, বিনয় রায়, হেমাঙ্গ ও সলিল চৌধুরী পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। বাংলার গণসঙ্গীত এদেশের গানের ধারায় বাণী ও সুরে সম্পূর্ণই নতুন গোত্রের ছিল। সমকালীন রোমান্টিক বাংলা আধুনিক গানের প্রণয় ও বিরহের মায়াজাল ছিঁড়ে সমাজ বাস্তবতার এই সব গান মানুষকে এক নতুন আশায় উজ্জীবিত করেছিল। প্রধানত সলিল চৌধুরীর সুরে ও রচনায় এবং একটি দুটি সুকান্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় সুরারোপ করে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে প্রচারিত গণসঙ্গীতগুলি এক নতুন মূল্যবোধ গড়ে তোলে বাংলা গানের সুদীর্ঘ ধারাবাহিকতায়। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের শ্রমকিণাঙ্ক জীবনের আলেখ্য ব্যালাডের মত নানা সুরের ছকে বুনে সলিল চৌধুরী 'গাঁয়ের বধূ' 'রাণার' ও 'পাল্কীর গান'-এ যে নতুনত্ব এনেছিলেন তা হেমন্তের গায়নে বাংলা গানের ক্ষেত্রে মাইলস্টোন হয়ে আছে। গণসঙ্গীতের এই সজীবধারা অবশ্য বেশিদিন স্থায়ী হয়নি কারণ জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র চলে যান

দিল্লী, সলিল চৌধুরী ও হেমন্ত চলে যান মুম্বাই-এ, বিনয় রায় চলে যান মস্কো। এর পিছনে ছিল কিছুটা পার্টির নির্দেশ, কিছুটা সচ্ছল জীবনের স্বপ্ন। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের গায়ে গায়ে গড়ে ওঠা 'কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ' এবং আর. এস. পি. সংগঠন 'ক্রান্তি শিল্পীসংঘ'ও বেশিদিন টেকেনি। ফলত আমাদের গণসঙ্গীত যেমন আকস্মিকভাবে শুরু হয়েছিল তেমনই তার উচ্চমান আকস্মিকভাবেই নিচু পর্যায়ে নেমে আসে। অবশ্য সুযোগ্য কিছু গীতিকার ও সুরকার বাংলা গণসঙ্গীতের ধারাকে অনেকদিন পর্যন্ত প্রাণবান রেখেছিলেন—তার মধ্যে প্রথম নামটি হেমাঙ্গ বিশ্বাসের এবং তাঁর সমকালীন ও অনুজ সঙ্গীতকাররা হলেন পরেশ ধর, অনল চট্টোপাধ্যায়, অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবীর মজুমদার ও হৃদয় কুশারী। এঁদের পরবর্তীকালে গণসঙ্গীতের ধারা যাঁরা সচল রেখেছেন তাঁদের মধ্যে অজিত পান্ডে, সুরেশ বিশ্বাস, মেঘনাদ, নরেন মুখোপাধ্যায়, অনুশ্রী ও বিপুল চক্রবর্তী, প্রতুল মুখোপাধ্যায় ও দিলীপ সেনগুপ্তের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে মনে রাখা দরকার যে বাংলা গণসঙ্গীতের মর্মে যে-ভাবনা ও বিশ্বাস কার্যকর তার ভিত্তি রাজনৈতিক, কাজেই রাজনৈতিক সংগঠনের ওঠানামা বা ভাঙন গণসঙ্গীতকেও টালমাটাল করে দিয়েছে। লক্ষ করা গেছে বামপন্থী দলগুলি যখনই প্রতিরোধ আর পেষণের সম্মুখীন হয়েছে তখনই সৃষ্ট হয়েছে তার চমৎকার বাস্তবধর্মী গানগুলি। গত দুই দশক বাংলায় বামপন্থী সরকার সুস্থিত ও পরিকল্পিতভাবে নানারকম সাংস্কৃতিক কর্মের উদ্যোগ ও বাতাবরণ তৈরি করেছেন। তবু, এতটা আনুকূল্যের মধ্যে কেন বাংলা গণসঙ্গীতের ধারা ক্ষীয়মাণ হয়ে গেল তার কারণ অনুসন্ধান করা উচিত।

পাঁচ

বাংলা গানের আধুনিক পর্বের ইতিবৃত্ত লিখতে গেলে রবীন্দ্রনাথের গান দিয়েই শুরু করা উচিত, কারণ প্রকৃত লক্ষণে যা গানের আধুনিকতা তার প্রথম স্রষ্টা তিনি। কিন্তু তাঁর গানকে 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' নামে চিহ্নিত করে এবং একই ভ্রান্তিতে 'দ্বিজেন্দ্রগীতি', 'কান্তগীতি', 'অতুলপ্রসাদের গান' বা 'নজরুলগীতি' নামকরণ করে কে বা কারা এসব গানকে আধুনিক গান থেকে দলছুট করে দিয়েছে বলা কঠিন। তবে এমন ঘটনা মাঝে মাঝে ঘটে। যেমন ১৯২৭ সালে কলকাতা বেতারকেন্দ্র চালু হলে যেসব নতুন বাংলা গান শ্রোতাদের শোনানো হত তার নাম ছিল 'ভাবগীতি' ও 'কাব্যগীতি'। সম্ভবত ঢাকার বেতারকেন্দ্র প্রথম 'আধুনিক বাংলা গান' কথাটা চালু করেন। এখন যেমন নতুন একটা গানের ধরনকে বলা হচ্ছে 'জীবনমুখী গান'। ১৯৩৭ সালে সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী একধরনের রাগাশ্রিত গানকে নাম দেন 'রাগপ্রধান গান'। রেডিও কিছু গানকে 'রম্যগীতি' বলে প্রচার করেছিল। আসলে এসবই বাংলা গানের এক একটি ধারা, মূল লক্ষ্য এক অর্থাৎ ভাল গানের সৃষ্টি, সুর ও বাণীর লাবণ্যে। তবু স্পষ্টত রবীন্দ্র-পরবর্তী এবং নজরুল সমকালীন একরকম বিশেষ গান আধুনিক বলে চিহ্নিত হয়ে গেছে বরাবরের জন্য। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা ভাল যে, আধুনিকতায় কালের লক্ষণ যতটা থাকে মনের ধরন তার চেয়ে বেশি ফোটে তাতে।

যাই হোক, গত পঞ্চাশ বছরে বাংলা আধুনিক গান নানা পথের বাঁকে ঘুরছে। তার দিশা বা আদর্শে কোনও স্পষ্টতা বা স্বচ্ছতা নেই। চল্লিশের দশক থেকে এই গানের সরণি জনাদরে গৃহীত, পদাতিকও প্রচুর, কিন্তু কেমন যেন দুরপনেয় একরকম কলঙ্ক বা মানহীনতাও এ গানের গায়ে লেগে গেছে। গানে কেবলই প্রণয়-প্রসঙ্গ বা ভ্রষ্টপ্রেম, চাঁদ ফুল প্রিয়া সমাধির সহজিয়া হাল্‌কা টান, লঘু ভাব ও কষ্টকল্পিত বর্ণনার ছাঁদে কবিত্বহীন প্রলাপ

আর হাস্যকর অন্ত্যমিল গভীরতা থেকে দূরে থেকেছে। মনে হয় এ ব্যাপারে বাণিজ্যিক কোনও ছক কাজ করেছে প্রথম থেকে এবং নজরুলের প্রভাব এই ধরনের গানে প্রবল। কিন্তু আধুনিক গানে বারবার একটা পেশাদারি দক্ষতার ছাপ ছিল। সুরকারের সুন্দর কাজ এবং শিল্পীর দক্ষ গায়ন বহুকাল গানের জনপ্রিয়তায় উৎসাহ দিয়েছে। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, তুলসী লাহিড়ী, নজরুলের যুগ পেরিয়ে আধুনিক বাংলা গান যখন বেশ সাবালক তখন স্বাধীনতার লগ্ন আর প্রকৃতপক্ষে চল্লিশ, পঞ্চাশ আর ষাটের দশকের স্বর্ণযুগ। পঙ্কজ মল্লিক, অজয় ভট্টাচার্য, হিমাংশু দত্ত, শৈলেন রায়, হীরেন বসু, বাণীকুমার, সুবোধ পুরকায়স্থ, অনিল ভট্টাচার্য, নিশিকান্ত, প্রণব রায়, আর মোহিনী চৌধুরী এ সময়ের প্রধান সঙ্গীতকার কেউ বাণী রচনায় কেউ সুরে। এঁদের বাইরে সুরকার হিসাবে স্মরণীয় দিলীপকুমার রায়, রাইচাঁদ বড়াল, কৃষ্ণচন্দ্র দে, সুধীরলাল চক্রবর্তী, অনিল বাগচী, কমল দাশগুপ্ত, অনুপম ঘটক, সুবল দাশগুপ্ত, শৈলেশ দত্তগুপ্ত, শচীনদেব বর্মন, নচিকেতা ঘোষ, সলিল চৌধুরী, সুধীন দাশগুপ্ত, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, মান্না দে ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন প্রধানত দিলীপকুমার, পঙ্কজ, সায়গল, সাবিত্রী ঘোষ, যূথিকা রায়, শৈল দেবী, উমা বসু, জগন্ময় মিত্র, ভীষ্মদেব, সুধীরলাল, শচীনদেব বর্মন, সন্তোষ সেনগুপ্ত, হেমন্ত, ধনঞ্জয়, মান্না দে, সুবীর সেন, শ্যামল, মানবেন্দ্র, সন্ধ্যা, সুপ্রভা, প্রতিমা, আলপনা, উৎপলা, আরতি, গীতা দত্ত, মৃণাল চক্রবর্তী, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ, নির্মলা মিশ্র, সনৎ সিংহ, দিলীপ সরকার, অখিলবন্ধু ঘোষ। গীতিকার-সুরকার-শিল্পীর এমন বিরল যৌগপদ্য আর কখনও সম্ভব হবে কি না সন্দেহ। তবু একটা ক্ষোভ থাকে যে, এত প্রতিভাবান শিল্পী-সমন্বয়, তৎকালীন দেশ কাল সমাজকে উপেক্ষা করে, বাস্তবের দিকে পিঠ ফিরিয়ে কেন শুধুই গেয়ে গেলেন বিচিত্র কাল্পনিক বেদনা-বিলাসের গান যার উৎস স্বরচিত দুঃখের কোনও মায়াজগৎ? রুগ্‌ণ রোমান্টিক এরকম বিষাদবোধ, বিরহ ও সন্তাপ, স্মৃতিসর্বস্ব বিনতি কেন এ সময়ের গানে এলো, কেনই বা তিনদশক ধরে শ্রোতারা একটানা এই গান শুনলেন, তা বোঝা যায় না।

আধুনিক বাংলা গানের পথচলা আজও থামেনি, তবে ষাট দশকের আগেকার সুদিন ও সমারোহ তার আর নেই তেমন। তার একটা কারণ দু-একটা ব্যতিক্রম বাদে যোগ্য প্রতিভার অভাব ও মাঝারিআনার দাপট, আর একটা কারণ ভাব ও সুরের পৌনঃপুনিকতা। গৌরীপ্রসন্ন, পুলক বা শ্যামল গুপ্ত এমন কোনও বড় মাপের গীতিকার নন। নীতা সেন বা স্বপন চক্রবর্তীরা গতানুগতিক সুরকার।

বনশ্রী-মাধুরী-হৈমন্তী-শ্রীরাধা-অরুন্ধতী কিংবা শিবাজী-সৈকত-সুবেদ-সুধীনরা খুব কি উঁচুদরের গায়ক? তবে আছেন মান্না দে, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও আরতি মুখোপাধ্যায় — তাঁরা বয়সে ভারাক্রান্ত। আসলে আধুনিক গানের ক্ষেত্রে চোরা অন্তর্ঘাত ঘটেছে রবীন্দ্রশতবর্ষ থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ব্যাপক উন্মোচন ও প্রসারে। দেবব্রত-হেমন্ত-সুবিনয়-অশোকতরু-অর্ঘ্য-দ্বিজেন-চিন্ময়-সাগর কিংবা সুচিত্রা-কণিকা-নীলিমা-রাজেশ্বরী-ঋতু-পূর্ব-গীতা-প্রমিতারা তাঁদের সুকণ্ঠ ও গায়নকৌশলে রবীন্দ্রনাথের গানের এমন এক অনাবিষ্কৃত মাধুর্য সংবাদ এনে দিলেন বাংলা গানের শ্রোতাদের কাছে যে সেই আনন্দযজ্ঞের বৈচিত্র্য ও বিশালতার কাছে ম্লান হয়ে গেল আধুনিক গানের মাঝারিয়ানা। সে গান আর একট বড় ধাক্কা খেল নজরুলগীতির নতুন জনপ্রিয়তার উত্তাল তরঙ্গে। মানবেন্দ্র, সুকুমার মিত্র, ধীরেন বসু, পূরবী দত্ত, অঞ্জলি মুখোপাধ্যায় অনুপ ঘোষাল, ফিরোজা বেগমদের দক্ষ কণ্ঠ ও যোগ্য গায়ন আধুনিক গানের শূন্য বেদিকে পূর্ণ করে।

এইবারে শুরু হয় পশ্চাদপসরণের পালা। রামকুমার চট্টোপাধ্যায় আসর জাঁকিয়ে বসেন পুরাতনী, টপ্পা আর বৈঠকী গানের মাদকে। হঠাৎ পপ গানের ঝলক আনেন ঊষা উত্থুপ। রাতারাতি ভজন গানে নানা কারিকুরি মিশিয়ে কিছুদিন বাজার মাত করে অনুপ জলোটা। ইত্যবসরে সৃষ্টি হয় অনিবার্য এক প্রগাঢ় শূন্যতা — ভেতরে ভেতরে অনুক্ত প্রশ্ন ওঠে আমাদের গান কই? আমাদের সময়ের গান? যেন এমনতর প্রশ্নের জবাবে নব্বইয়ের দশকে সুমন চট্টোপাধ্যায় মঞ্চে উঠে আর ক্যাসেটে গেয়ে জানিয়ে দেন নতুন গানের সম্ভাবনা, তার থিমেটিক পরিবর্তন আর বৈদ্যুতিক যন্ত্রবাদ্যের ছকে বাঁধা সুরের নির্ভীকতা। তাঁর প্রকৃত প্রাপ্য জনাদর আর বাণিজ্যিক সাফল্যর পিঠোপিঠি এসে যান নচিকেতা, অঞ্জন দত্ত, মৌসুমী ভৌমিক, কাজী কামাল নাসের, লোপামুদ্রা, শিলাজিৎ। এঁদের সবাই উঁচু মাপের নয়, সমান দক্ষতারও নন, কিন্তু নতুন রকমের। নিঃসন্দেহে এঁদের গান একটা সাহসী উন্মোচন আর অবলোকন, নষ্টভ্রষ্ট সময়ের খানিকটা পুনর্বিচার। পাশে আছেন প্রতুল মুখোপাধ্যায় তাঁর নিজস্ব গায়নরীতির শক্তি নিয়ে। উঠে আসছে নতুন নতুন ছেলেমেয়ে নতুন গানের স্বপ্নে। কাগজে কার্টুন এঁকে বা জীবনমুখী গানের ব্যঙ্গোক্তিতে এঁদের বোধহয় শেষ পর্যন্ত রোখা যাবে না। পাশাপাশি আর একদল দিশাহীন গায়ক-গায়িকা যে পুরনো গানের রিমেক করে বাজার কাঁপাচ্ছেন সে কি অগ্রগতি না পিছু হাঁটা? 'আমাদের সেই সব পুরোনো গানই ছিল ভাল' বলে যাঁরা স্মৃতির উদ্‌গার তুলেছেন তাঁরাই কি সঠিক শ্রোতা বা নির্ণায়ক জনসমাজ? নিজেদের কথা না বলে, নিজেদের সময়ের তাপকে না জেনে, অপ্রতিরোধে ও কেবল বিপণনের ঝোঁকে পুরোনো গান গাওয়া বা শোনা কি স্বাস্থ্য ও জীবনের লক্ষণ? স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে বাংলা গানের সজীব সৃষ্টিশীল ধারা তাই আজ পৌঁছেছে দ্বৈধে ও প্রশ্নে। কোন্‌টি সঠিক গান? কোন্‌টি সৎ উচ্চারণের গান? এসব গান টিকবে তো? সেটা তো সার্বিকভাবে এই যুগেরই একটা সংশয়িত জিজ্ঞাসা, এই সরকার কি টিকবে? বজায় থাকবে কি সুস্থ রাজনৈতিক আদর্শ বা সদ্য বিবাহিতের দাম্পত্য? অমল বন্ধুতা বা সুনিশ্চিত আনুগত্য? ভেঙে পড়বে না তো অর্থনৈতিক কাঠামো বা রাষ্ট্রব্যবস্থা? নবনির্মিত বাড়িটা ধসে পড়বে কি? সদ্যোজাত শিশুটি প্রতিবন্ধী হবে না তো? উপভোগ্য ম্যাচটি নাকি গড়াপেটা? রোগীর দেহে যে রক্ত দেওয়া হল তাতেই নাকি মৃত্যুর বীজ?

স্বীকৃতি : রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া), অসীমানন্দ রায় (কৃষ্ণনগর)

সু ন ন্দ সা ন্যা ল

শিক্ষা — প্রসার বনাম মান

স্বাধীনতা প্রাপ্তির মাস পাঁচেক পর সেন্ট্রাল অ্যাডভাইসারি বোর্ড অব এডুকেশন এবং ইন্টার ইউনিভার্সিটি বোর্ড ভারত সরকারকে একটি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন আর একটি মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন গঠনের পরামর্শ দেয়। কমিশন দুটির কাজ হবে, সংশ্লিষ্ট স্তরে, শিক্ষার প্রসার ও তার মান উন্নয়ন সম্পর্কে সুপারিশ করা। যথাক্রমে ১৯৪৮ ও ১৯৫২ সালে গঠিত কমিশন দুটি আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে মোটামুটি নিম্নরূপে পেয়েছিল।[১]

অল্প কয়েকটি রাজ্যে প্রাক-প্রাথমিক স্তরে 'নার্সারি স্কুল' তিন থেকে পাঁচ বছর বয়সীদের সাত বছর বয়স পর্যন্ত পড়াত। ব্যক্তিগত বা মিশনারিদের উদ্যোগে গঠিত এইসব স্কুল কয়েকটি রাজ্যে ভাল কাজ করেছিল। তারা খেলাধুলো ও ফুর্তি-আমোদের মধ্য দিয়ে পরিচ্ছন্নতা, সুরুচি, পারস্পরিক সাহচর্য ইত্যাদি মূল্যবোধ গড়ার চেষ্টা করত।

রাজ্যগুলো ইতিমধ্যেই প্রাথমিক স্কুলের সমতুল কিছু নিম্ন-বুনিয়াদি স্কুল তৈরি করেছিল, তবে সরাসরি প্রাথমিক স্কুলই সংখ্যায় অনেক বেশি ছিল। প্রাথমিক স্কুলে ছয় বা সাত বছর বয়সীরা ১০ বা ১১ বছর বয়স পর্যন্ত মোট চার বা পাঁচ বছর পড়ার সুযোগ পেত। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন কাজ করার সময়ে এই স্কুলের সংখ্যা কমতে শুরু করেছিল। সে-সময় হায়ার এলিমেন্টারি বা ভার্নাকুলার মিড্‌ল স্কুলও উঠে যাচ্ছিল। কয়েকটি রাজ্যে প্রাথমিক-উত্তর শিশুরা এই সব স্কুলে পড়ত। মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য ভাষা সেখানে পড়ানো হত না।

মাধ্যমিক স্তরের জুনিয়ার বিভাগ কোথাও কোথাও মিড্‌ল স্কুল বা লোয়ার সেকেন্ডারি স্কুল বলে কথিত ছিল। এসব স্কুলে পঠনকাল ছিল তিন বা চার বছর। আর হাই স্কুল (বা সিনিয়র স্কুল) স্তর ছিল তিন বছর ব্যাপ্ত। কিছু রাজ্যে মিড্‌ল স্কুল চার বছরের হওয়ায় সেখানে হাই স্কুলের পঠনকাল ছিল দু' বছর। আবার কিছু রাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনকাল থেকে এক বছর ছাঁটাই করে, তা স্কুলের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে, একটা হায়ার সেকেন্ডারি স্তরও তৈরি করা হয়েছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই স্তর তিন বছর ব্যাপ্ত ছিল। পশ্চিমবঙ্গে উচ্চ মাধ্যমিক আর মিড্‌ল স্তরে বুনিয়াদি স্কুল ব্যতীত আর সব ধরনের স্কুলই কমবেশি ছিল।

সেই সময়ে উচ্চশিক্ষার স্নাতক স্তর দু'বছরের প্রাক-স্নাতক (বা ইন্টারমিডিয়েট) এবং দু'বছরের স্নাতক (ডিগ্রি) স্তরে বিভক্ত ছিল। দিল্লিতে অবশ্য তখনই ইন্টারমিডিয়েট স্তর তুলে এক দিকে উচ্চমাধ্যমিক বা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল আর এক দিকে তিন বছরের

ডিগ্রি কোর্স চালু করা হয়েছিল। মহীশূর ও তৎকালীন ত্রিবাংকুরে ত্রিবার্ষিক কোর্স নিয়ে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর, অন্যান্য রাজ্যের সহযোগিতার অভাবে, তা পরিত্যক্ত হয়েছিল।

তা ছাড়াও সে-সময়ে স্যাডলার কমিশনের সুপারিশ মেনে প্রধানত উত্তর ভারতে কিছু ইন্টারমিডিয়েট কলেজও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এসব কলেজে বোর্ড অব সেকেন্ডারি বা ইন্টারমিডিয়েট এডুকেশন পরিচালিত দ্বিবার্ষিক কোর্স পড়ানো হত। অন্যান্য রাজ্যে ইন্টারমিডিয়েট ও ডিগ্রি কোর্স দুই-ই কলেজে পড়ানো হত। অনেক রাজ্যে (যেমন পশ্চিমবঙ্গে) কোর্স দুটি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণ করত। অধিকন্তু, ক্ষেত্রবিশেষে বিশ্ববিদ্যালয় মাধ্যমিক পঠনপাঠন (যথা ম্যাট্রিকুলেশন) ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ করত।

ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্ররা ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি, মেডিসিন, ভেটেরিনারি সায়েন্স, এগ্রিকালচার ও কমার্স অধ্যয়নের জন্য কিছু বৃত্তিমূলক কলেজে ভর্তির সুযোগ পেত। আর এক দিকে ১২ বছর বয়সী স্কুল ছাত্ররা ট্রেড স্কুল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল, অকুপেসন্যাল ইন্সটিটিউট এবং পলিটেকনিক বলে অভিহিত প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে জীবিকার্জনের জন্য প্রস্তুত হওয়ার সুযোগ পেত।

ভারত তখন সদ্য বিভক্ত, তবু বিরাট — এক এবং অবিভাজ্য। তার শিক্ষাব্যবস্থায় এত ভিন্নতা বাঞ্ছনীয় নয়। শিক্ষাবর্ষের মধ্যেও পিতামাতার সঙ্গে এক রাজ্যে থেকে আর এক রাজ্যে যেতে বাধ্য হলে ছাত্রছাত্রীর লেখাপড়া বিঘ্নিত হওয়া উচিত নয়। তাই মাধ্যমিক শিক্ষা (তথা মুদালিয়ার) কমিশনের বিচার্য বিষয় স্থির করে দিয়ে বলা হয়েছিল, সমগ্র দেশের প্রয়োজন এবং আর্থিক ও অন্যান্য সঙ্গতির কথা মাথায় রেখে, যথাসম্ভব একরূপ (uniform) ও কার্যকর শিক্ষাব্যবস্থা তৈরি করার উপায় যেন বলা হয়।

এই দুই কমিশন গঠনের তাগিদ এবং সংবিধানে বর্ণিত শিক্ষা সম্পর্কে নির্দেশাবলী একত্রে বিবেচনা করলে দেখা যাবে আমরা স্বাধীনতার জন্মলগ্নে ঠিকই বুঝেছিলাম যে, দেশকে অটুট রাখতে এবং তার সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের প্রয়োজনে একদিকে শিক্ষার উৎকর্ষ (excellence), এবং আর এক দিকে শিক্ষালাভের সুযোগের বণ্টনে সমবিচার (equity) করতে হবে। সোজা কথায়, সব নাগরিকের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ক্রমাগত উচ্চমানের শিক্ষার প্রসার চাই।

স্বাধীনতার ৫০ বছর গত হওয়ার পর প্রশ্ন হল, সে কাজ আমরা কতটা করতে পেরেছি? প্রসারের কথা বিবেচনা করতে মাথায় রাখতে হবে যে, ১৯৪৭ সালের ঠিক পরের জনগণনায় দেখা গেছিল, ভারতের জনসংখ্যা ৩৫ কোটি। আজ আমরা প্রায় ১০০ কোটি।

আমরা স্থির করেছিলাম, ১৯৫০ সালে ২৬ জানুয়ারি সংবিধান কার্যকর হওয়ার ১০ বছরের মধ্যে (ছয় থেকে) ১৪ বছর বয়সী সব ছেলেমেয়েকে অবৈতনিক ও আবশ্যিক শিক্ষার আওতায় আনব। এই প্রবন্ধ লেখার সময় খবর পাওয়া গেল যে, স্বাধীনতার ৫০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে ভারত সরকার সংবিধান সংশোধন করে এ-সম্পর্কে নির্দেশাত্মক নীতিটিকে মৌলিক অধিকারে রূপান্তরিত করবে। ফলে, শিক্ষাখাতে ব্যয়বরাদ্দ এখন অনেকটা বাড়াতে হবে। এরকম প্রতিশ্রুতি অতীতে কতখানি রক্ষিত হয়েছে তা আমরা ক্রমশ দেখতে পাব।

সংবিধান চালু হওয়ার ঠিক পরের আদমসুমারিতে (১৯৫১) দেখা গিয়েছিল দেশের ১৮.৩ শতাংশ (সাত বছরের উর্ধ্ববয়সী) মানুষ সাক্ষর। তা ১৯৯১ সালে দাঁড়ায় ৫২.২ শতাংশ। আবার ১৯৮১ সালের সুমারিতে দেখা গিয়েছিল, ছয় থেকে ১৪ বছর বয়সীদের

৫২ শতাংশ (বা ৮ কোটি ২০ লক্ষ) জন স্কুলের বাইরে ছিল। মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের প্রতিবেদনে (১৯৮৮-৮৯) বলা হয়েছে, প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের ৪৪ শতাংশ পঞ্চম শ্রেণী সমাপ্ত করার আগেই স্কুল ছেড়ে দিচ্ছে। যারা তার পরেও এগিয়েছে তাদের মাত্র ৩৫ শতাংশ অষ্টম শ্রেণী সমাপ্ত করছে। তফসিলি জাতি ও উপজাতিদের মধ্যে স্কুলছুটের হার আরও বেশি।

ঠিক, সাক্ষরতা প্রতি দশকেই বেড়েছে, তবু জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ১৯৫১ সালের ২৯ কোটি ৪০ লক্ষ নিরক্ষর ১৯৯১ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৪৮ কোটি ২০ লক্ষ। অর্থাৎ ৫০ লক্ষ করে বছরে নিরক্ষরের সংখ্যা বাড়ছিল।[৮] সম্প্রতি "ইউনাইটেড নেসনস্ ডেভেলাপমেন্ট প্রোগ্রাম, ১৯৯৭"-এ দেখছি, ১৯৯৫ সালে ভারতে ২৯ কোটি ৫০ লক্ষ শিশু প্রাথমিক স্কুলের বাইরে ছিল। ফলে তাবৎ দুনিয়ার শিশুশ্রমিকদের বৃহত্তম অংশের বাস ভারতে। আগে চিহ্নিত না করলে এদের স্কুলে আনা অসম্ভব। সেই উদ্যোগ এখনও নেওয়া হয়নি। পশ্চিমবঙ্গে এদের সংখ্যা নির্ণয় করতে সমীক্ষক আসছেন জেনে মালিকরা তাদের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিল।

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৯১-৯২ সালে সাক্ষরতার হার ছিল ৫৭.৭২ শতাংশ — সারা ভারতের তুলনায় একটু ভাল। বড় গলায় বলার কথা আমাদের ওইটুকুই। কারণ, ১৯৮১—৯১ দশকে সাক্ষরতা বৃদ্ধির সর্বভারতীয় হার ছিল ১৯.৬ শতাংশ — কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে ১৮.৭ শতাংশ। সর্বাগ্রগণ্য কেরালা (৯০.৫৯ শতাংশ) আমাদের ধরাছোঁয়ার একেবারে বাইরে। আরও লজ্জার কথা, খাস কলকাতায় ১৯৯১ সালে সাক্ষর ব্যক্তি হাজারে ৮৫৪ । এটা কেরালার কেবল সামগ্রিক হার (৯০৬) নয়, নারী সাক্ষর হার (৮৬৯) থেকেও কম। কলকাতায় সাক্ষর পুরুষ হাজারে ৯০৮ — নারী মাত্র ৭৮৭। হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, মেদিনীপুর, দার্জিলিং ও বর্ধমান — মাত্র এই ছটি জেলায় সাক্ষরতা হার ৫০ শতাংশের বেশি। অন্য দিকে পুরুলিয়া, মালদা, পশ্চিম দিনাজপুর ও মুর্শিদাবাদে ৩০ শতাংশের কম। এ রাজ্যে পুরুষ সাক্ষর ৬৭.২৪ এবং নারী সাক্ষর ৪৭.১৫ শতাংশ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দাবি হল, গ্রামে ও শহরে সাক্ষরতার প্রয়োজন সম্বন্ধে ব্যাপক প্রচার অভিযানের "অভূতপূর্ব... সাফল্য মিলেছে। ইতোমধ্যে বর্ধমান, মেদিনীপুর, হুগলি, বাঁকুড়া, বীরভূম, কোচবিহার সাক্ষর জেলা ঘোষিত হয়েছে.... সাক্ষরোত্তর কর্মসূচির জন্য কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। নবসাক্ষরদের শিক্ষার মানকে বাড়ানো, অর্জন করা শিক্ষাকে ব্যবহারিক প্রয়োগের সুযোগ করে দেওয়া, অবিরাম শিক্ষা ও নবসাক্ষরদের উন্নত জীবনচেতনা গড়ে তোলার কাজকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে... এই অভিযানের বিরুদ্ধে নানা ব্যঙ্গবিদ্রূপ ছুঁড়ে দিচ্ছে কয়েকটি মহল।"

ব্যঙ্গবিদ্রূপ নিন্দনীয়। তবে সাক্ষরতা হার পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭১-এ ৩৩.২ শতাংশ থেকে ১৯৮১-তে ৪০.৯৪ শতাংশ দাঁড়িয়েছিল ঠিকই, কিন্তু ওই সময়েই রাজ্য ভারতে ষষ্ঠ স্থান থেকে নবমে নেমে যায়।[৫] তা ছাড়া, তফসিলি জাতি-অধ্যুষিত রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান দশম কিন্তু এ-রাজ্যে তাদের মাত্র ২৪.৩৭ শতাংশ সাক্ষর। সম্প্রতি ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইন্সটিটিউট ও স্টেট কাউন্সিল অব এডুকেশন্যাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং যৌথভাবে সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছে যে প্রাথমিক স্তরে তফসিলি ছাত্রছাত্রীরা উচ্চবর্ণীয়দের তুলনায় অনেক খারাপ ফল করেছে। তাই বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে এ-রাজ্যে "তফসিলি জাতিরা কেবল এখনই পিছিয়ে পড়েনি, ভবিষ্যতেও পড়বে।"

স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে, ১৯৫০-৫১ সালে, পশ্চিমবঙ্গে প্রাক-প্রাথমিক স্তরে

১২টি এবং প্রাথমিক স্তরে (৮৬টি বুনিয়াদি সহ) ১৪,৭৮৫টি স্কুল ছিল। প্রাথমিক স্কুল ১৯৭৮-এ ৪২,৬৫৯টা এবং ১৯৮৬ সালে ৪৮,৪৫৬টা ও ১৯৯২ সালে ৫১,০২১ দাঁড়ায়। বামফ্রন্ট সরকারের প্রথম ১৪ বছরে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা বেড়েছে ১৯.৬ শতাংশ — অর্থাৎ বছরে মোটামুটি ১.৬ শতাংশ। আর এক দিকে প্রাথমিক স্তরে লিপিবদ্ধ শিক্ষার্থী সংখ্যা ১৯৭৮-এ ছিল ৫৫,৭৭,৫৯১ (২৪,২৭,৮০০ বালিকা এবং ৩৩,৪৯,৭৯১ বালক), এবং ১৯৯২ সালে বালিকা ও বালক মিলে মোট ৯২,০৯,০০০। অর্থাৎ ১৪ বছরে শিক্ষার্থী সংখ্যা বেড়েছে ৬৫.১ শতাংশ। অন্য দিকে শিক্ষক সংখ্যা বেড়েছে ১৯৭৮-এর ১,৫৮,৩৪৩ থেকে ১৯৮৬-তে ১,৬৭,১৭২ এবং ১৯৯২-তে প্রায় ২,০০,০০০।[৪]

শুধু এইসব সংখ্যার নিরিখে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা যাবে না। প্রথমত, এই সংখ্যাতেই খাদ আছে। সে-কথায় পরে আসছি। দ্বিতীয়ত, এই সংখ্যা বিবেচনা করতে হবে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে। পশ্চিমবঙ্গ পরিসংখ্যান সংস্থার অধিকর্তা সচ্চিদানন্দ দত্ত রায় লিখেছেন, "সর্বসাধারণের মধ্যে সামাজিক চেতনাবৃদ্ধি, শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির ক্রমাগত রূপায়ণের ফলে এরূপ আশা সঙ্গত ছিল যে ১৯৮১-৯১ দশকে এ রাজ্যে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২২ শতাংশের অনেক কম না হলেও কিছু কম তো হবেই। ভারত সরকারের জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞ কমিটি বৃদ্ধির হার ২০.৭৯ শতাংশ ধরেছিলেন। ১৯৯১ সালের জনগণনায় দেখা গেল এ হার হ্রাস না পেয়ে বরং বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৪.৫ শতাংশে।[৫]

প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ও মান আশানুরূপ না হওয়ার মস্ত বড় কারণ হল অর্থাভাব। ড. ভি এস কোঠারির নেতৃত্বে গঠিত শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪-৬৬) প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, ১৯৬১-৬২ সালে দেশে (প্রাথমিক স্তরে ভর্তির উপযুক্ত) ছয়-সাত বছর বয়সী এক কোটি ২৪ লক্ষ শিশু মধ্যে মাত্র ৫০ লক্ষ প্রথম শ্রেণীতে পড়ছিল, কিন্তু ওই শ্রেণীর পড়ুয়াদের মোট সংখ্যা ছিল এক কোটি ৫৭ লক্ষ। অর্থাৎ প্রায় ৩২ শতাংশ ছাত্রছাত্রী বেশি বয়সে ভর্তি হয়েছিল। সমস্যা হল গরিব বাপ-মা চায় ছেলেময়ে বেশি বয়স পর্যন্ত স্কুলে আটকে না থেকে কাজে লেগে যাক। ফলে স্কুলছুটের সংখ্যা বাড়ে। অশোক মিত্র কমিশন বলেছে যে, পশ্চিমবঙ্গের স্কুলব্যবস্থা থেকে প্রতি বছর প্রায় ১০ লক্ষ ছেলেমেয়ে ছিটকে বেরিয়ে যায়।[৬] অথচ অনেক দিন আগেই কোঠারি কমিশন শিক্ষাখাতে মোট জাতীয় উৎপাদনের ৬ শতাংশ বরাদ্দ করার পরামর্শ দিয়েছিল। তা মানা হলে স্কুলছুটের সংখ্যা কমত।

ভারত সরকারও ১৯৬৮ সাল থেকে ওই পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করার শুভেচ্ছা প্রকাশ করে আসছে। প্রাথমিক শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার বলে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়ার পাশাপাশি ৬ শতাংশ বরাদ্দর কথা আবার শোনা যাচ্ছে। অবশ্য কথায় আর কাজের মধ্যে ব্যবধান দেখিয়ে জঁ ড্রেজে ও অমর্ত্য সেন লিখেছেন যে, ১৯৮৬-৮৭ সালে সারা দেশে যে-শিশুরা প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিল তাদের বড়জোর এক-তৃতীয়াংশ আমাদের ঈপ্সিত আট বছর স্কুলে টিকে থেকেছে, এবং ছয় থেকে ১১ বছর বয়সী গ্রামের শিশুদের অর্ধেক কখনও স্কুলেই পড়েনি। তবু জাতীয় শিক্ষানীতিতে (১৯৮৬) অন্ধ প্রত্যাশায় ("blind optimism") ঘোষণা করা হয়েছিল যে ১৯৯৫ সালের মধ্যে সব শিশুকে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত অবৈতনিক ও আবশ্যিক শিক্ষা দেওয়া হবেই। তার পরেও ছয় শতাংশ বরাদ্দর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হয়েছে। ফলে স্কুলছুটদের সংখ্যাও কমেনি।[৭]

আদতে আমাদের আত্মমর্যাদা বোধেই ঘাটতি আছে। তাই শিক্ষায় ব্যয়বরাদ্দর ব্যাপারে আমরা কেবল উন্নত নয়, অনেক উন্নয়নকামী দেশেরও পিছনে। শিক্ষায় ভারতের তুলনায়

দক্ষিণ কোরিয়া ও থাইল্যান্ড সাত গুণ বেশি ব্যয় করে -- শ্রীলঙ্কা করে ছয় গুণ এবং মালয়েশিয়া দশ গুণ। ড্রেজে ও সেন ১১৬টি দেশের বরাদ্দর বিবেচনা করেছেন -- তাতে ভারতে স্থান ৮২। তবে তাঁরা বলেছেন, ২৫ বছর ধরে মোট জাতীয় উৎপাদন ও শিক্ষাব্যয়ের অনুপাত অনড় থেকে গেলেও, আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে একটা উন্নতি লক্ষণীয়।' ঠিক কথা। আবার পাবলিক ইন্টারেস্ট গ্রুপ দেখিয়েছে যে, উদাহরণত, ১৯৯৪-৯৫-এর তুলনায় ১৯৯৫-৯৬-এ শিক্ষাখাতে বর্তমান মূল্যমানে ১৬ শতাংশ বরাদ্দ বৃদ্ধির কথা ঘটা করে বলা হয়েছে, কিন্তু বলা হয়নি যে পরিকল্পনা-বহির্ভূত খাতে বরাদ্দ ৪.৪ শতাংশ কমানো হয়েছে। আদত বৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৮ শতাংশ। তার ওপর ১৯৯৪-৯৫ সালে ১০ শতাংশ মুদ্রাস্ফীতি ধরলে দেখা যায় ১৯৯৫-৯৬তে আগের বছরের তুলনায় বরাদ্দ কমে গেছে।'

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর শেষ লগ্নে কেন্দ্রে বি জে পি সরকার "কলেজ স্তর পর্যন্ত মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষা, সকল ছেলেমেয়েদের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা — শিক্ষা বাজেটে ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি" করেছে বলে সগৌরবে ঘোষণা করেছে। মুশকিল হল, বাজেটে বাড়তি বরাদ্দর মোটা অংশ (বিশেষত কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের) শিক্ষকদের বর্ধিত বেতন দিতে ব্যয় হবে। আর মেয়েদের অবৈতনিক কলেজ-শিক্ষা? প্রাথমিক শিক্ষা সত্যি বাধ্যতামূলক না হলে তার অর্থই হয না। কারণ ছেলেদের চেয়ে কম সংখ্যায় মেয়েরা প্রাথমিক স্কুলে আসে ; যারা আসে তাদের মধ্যেই আবার স্কুলছুটের সংখ্যাও অপেক্ষাকৃত বেশি। কেন্দ্রীয় বাজেটে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বরাদ্দ ২৭৭৮ কোটি টাকার (যার ২৫ শতাংশ দেবে বিশ্বব্যাঙ্ক) সঙ্গে রাজ্যগুলোর নিজস্ব বরাদ্দ যোগ হয়েও মোট অঙ্ক যথেষ্ট হবে না। কিন্তু ওইটুকুও ব্যয় হবে তো? সদ্যায় পরের কথা!

অনেকের মনে পড়বে কত প্রতিশ্রুতি দিয়ে সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন (Total Literacy Campaign) শুরু করা হয়েছিল। স্থির হয়েছিল, পাঁচ বছরের মধ্যে ১৫ থেকে ৩৫ বছর বয়স্ক সব মানুষকে সাক্ষর করে তোলা হবে। এ বাবদে ১৯৯৬-৯৭ সালে কেন্দ্রীয় বাজেটে ২২৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করাও হয়েছিল। সেই টাকা পুরো ব্যয়িত হল না দেখে পরের বার বরাদ্দ হল ১২৯.৮১ কোটি টাকা। তাও পুরো খরচ হল না — উদাহরণত, ১৯৯৭-৯৮ সালে বয়স্কদের সাক্ষরতা বাবদ বরাদ্দ ৪৫ কোটি টাকা অব্যয়িত থেকে গেল। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক স্বীকার করেছে যে, "এই প্রকল্প ভালভাবে কাজ করছে না।" তাই ১৯৯৮-৯৯ সালের বাজেটে সার্বিক সাক্ষরতা বাবদ বরাদ্দ করা হয়েছে মাত্র ৯৭ কোটি টাকা।

এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের রেকর্ডও ভাল নয়। বিধায়ক শ্রী পদ্মনিধি ধরের নেতৃত্বে গঠিত ১৫ সদস্যের শিক্ষা, তথ্য ও সংস্কৃতি, ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ সম্পর্কিত বিধানসভার সাবজেক্ট কমিটি তার ১৯৯৮-৯৯ বাজেটের ওপর প্রাক-ভোট সমীক্ষা রিপোর্ট গত ১৬ জুন বিধানসভায় পেশ করেছে। এই রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে, প্রাথমিক মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে গঠিত স্কুল শিক্ষা বিভাগের জন্য বরাদ্দ ৬৮.৮৬ কোটি টাকার মধ্যে মাত্র ৪২.২৪ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। অর্থাৎ বরাদ্দ অর্থের ৩৫ শতাংশের বেশি অব্যয়িত থেকে গেছে।

তার ওপর অপব্যয়ের অভিযোগও আছে। কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেলের সাম্প্রতিক রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, একদিকে, ১৯৯১-৯২ থেকে ১৯৯৬-৯৭ পর্যন্ত পশ্চিবঙ্গের ১১টি জেলার সাক্ষরতা সমিতির যে ২৩ কোটি ২২ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা

হয়েছিল তার মধ্যে ৬ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়নি অথচ, আর একদিকে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্ল্যাকবোর্ড স্লেট পেনসিল ইত্যাদি কিনে ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা নষ্ট করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক জানিয়েছে যে বয়স্ক-সাক্ষরতা আন্দোলন সারা দেশে ৪০১টি জেলায় ছড়িয়েছে এবং ফলে ৫,৩১,৯০,০০ নবসাক্ষর তৈরি হয়েছে। কিন্তু তার পরেও ১৫ থেকে ৩৫ বয়ক্রমের ৪.৪০,০০,০০০ জন নিরক্ষর থেকে গেছে এবং, দ্বিতীয়ত, কেরালা অন্ধ্রপ্রদেশ পশ্চিমবঙ্গ গুজরাত তামিলনাড়ু এবং মহারাষ্ট্রের মতো যে-সব রাজ্যে সাক্ষরতা অভিযান 'অনেকটা সফল' হয়েছে সেখানেও, উপযুক্ত সাক্ষরোত্তর কর্মসূচি না থাকায় বহু নবসাক্ষর পুনরায় নিরক্ষরে পর্যবসিত হয়েছে। কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেলের সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গেই ৩৪ লক্ষ ৪০ হাজার সাক্ষর ফের নিরক্ষর হয়ে গেছে।

আদতে আমাদের আত্মমর্যাদা বোধে ঘাটতি আছে। তাই আমরা সকলের জন্য শিক্ষায় নয়, অ্যাটম বোমা ফাটানোর সাফল্য সুনিশ্চিত করি। তাবৎ দুনিয়ার নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর আবাস আমাদের এই দেশ নিউক্লিয়ার ক্লাবের সদস্য হয়ে মান বাঁচাতে চায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ, বহু প্রতিশ্রুত "সকলের জন্য শিক্ষা" (Education for All) গত দু'বছরে একাধিকবার পিছিয়েছে। প্রথমে কথা ছিল, ১৯৯৪-৯৫ সালের মধ্যে "অতি শীঘ্র" প্রতিশ্রুতি পূরণ করা হবে, তার পরে বলা হল, "কাজটা ২০০০ সালের মধ্যে শেষ" হবে। এখন পর্যন্ত শেষ প্রতিশ্রুতি হল, নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষাশেষি ২০০২-০৩ সালের মধ্যে কাজটা সমাপ্ত হবেই।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে (১৯৫০-৫১) পাওয়া হিসেবে দেখা যায়, সারা দেশে তখন ১৩,৬৪২টি মিড্ল স্কুল, ৬,৩১৬টি হাইস্কুল, ১,০২৬টি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল এবং ১৩৩টি ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ছিল, আর ইন্টারমিডিয়েট স্তর (যা প্রধানত স্কুল স্তর) সহ এসব স্কুলে তখন লিপিবদ্ধ ছাত্রছাত্রী ছিল ৫১,৩৫,১১২ জন।[১০] প্রাথমিক উত্তর স্কুলের সংখ্যা, এবং সেখানে পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা, ১৯৯২-৯৩ সালে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৮.২ লক্ষ এবং ১৬ কোটি ৭০ লক্ষ।[১১]

সেকেন্ডারি এডুকেশন (তথা মুদালিয়ার) কমিশনের দেওয়া হিসেব অনুযায়ী ১৯৫০-৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক-উত্তর স্কুলের, এবং সেখানে পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের, সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৩৬৮ এবং ৫১,৩৫,১১২। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত পরিসংখ্যানে এক জায়গায় দেখছি, ১৯৭৮-৭৯ সালে, ৩৭৬২টি মাধ্যমিক স্কুল (পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত) এবং ৯৬৭টি উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল ছিল — সংখ্যা দুটি ১৯৯৪-৯৫ সালে দাঁড়ায় যথাক্রমে, ৫৯৩৯ এবং ১৪৩৬-এ।[১২] কিন্তু ডিসেম্বর, ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত পুস্তিকায় সরকার বলছে যে, ওই সময়ে মাধ্যমিক স্কুল ৮,৪৪৩ এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল ১৫৭৪টিতে দাঁড়িয়েছিল।[১৩] ছাত্রছাত্রী এখন মাধ্যমিক স্তরে ৬,৯৩,৭৫৪ এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ২,৮৫,৮১১ জন।[১৪] আবার অশোক মিত্র কমিশনের প্রতিবেদনে (অগাস্ট ১৯৯২) বলা হয়েছে, ছাত্রছাত্রী সংখ্যা মাধ্যমিকে ৪০ লক্ষের কাছাকাছি এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তরে আরও অন্তত ৫,০০,০০০।[১৫]

মিত্র কমিশন বলেছে, "সার্বিকভাবে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে স্কুলশিক্ষার অবস্থা লক্ষণীয়ভাবে উন্নত নয়। গত কয়েক বছরে সংখ্যার হিসেবে স্কুলশিক্ষার প্রসার অনস্বীকার্য... কিন্তু রাজ্য সরকারের সাহায্য-প্রাপ্ত স্কুলগুলোতে শিক্ষার গুণমান নিশ্চিত করার

সমস্যা বেড়ে চলেছে।” মিত্র কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশের পর পাঁচ বছর হল। ইতোমধ্যে আমরা শিক্ষার কতটা উন্নতি করতে পেরেছি? আমরা বরং প্রথমে সবচেয়ে পেছিয়ে-পড়া রাজ্যের দিকে তাকাই। তার পরে দেখব, পশ্চিমবঙ্গ তাদের চেয়ে কত এগিয়ে।

আমলা মহলে কথিত “বিমারু” রাজ্যগুলোর কথা ধরুন। শব্দটি গঠিত Bi(har), Ma(dhya Pradesh), R(ajasthan) এবং U(ttar Pradesh) দিয়ে। রাজ্যগুলি যেন 'বিমার' বা জ্বরে আক্রান্ত — তাই “বিমারু”। ইঙ্গিতটা অন্যায্য নয়। এসব রাজ্যে অনেক স্কুলের ছাদ নেই, শৌচাগার নেই, পানীয় জল নেই, আসবাবপত্র তো নেই-ই। উদাহরণত, বিহারে অনেককাল শিক্ষকদের পাওনা বকেয়া রেখে দেওয়া হয়, জাতপাতের কারণে তাদের সমানে বদলি করা হয়। আর এক দিকে শিক্ষকরা — এমন কি প্রধান শিক্ষক ও অধ্যক্ষরাও — ক্লাস কামাই করে ছাত্রদের বাধ্য করেন তাদের কোচিং বিপণি থেকে টিউশন নিতে।

কথিংকা সিংহ্-কারখফ লিখেছেন, “একবিংশ শতাব্দী বিহার থেকে কয়েক আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত।” সেখানে স্কুল-কলেজে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ভয়াবহ, পরীক্ষায় জোচ্চুরি ঢালাও, টাকা দিয়ে যেমন স্কুলে ভর্তি হওয়া যায় তেমনই সব পরীক্ষাতেই মার্কস বাড়িয়ে নেওয়া যায়, রোল নম্বর জাল করে ডিগ্রি পাওয়া যায়, আদৌ থিসিস না লিখে পি-এইচ ডি পাওয়া যায়। ডিগ্রিধারীদের লোকে সম্মান তো দেয়ই না, বরং ডিগ্রির কথা উঠলে হাসে। রাজ্যে ৫,০০,০০০ বেকার গ্রাজুয়েট। লেখাপড়ায় বীতশ্রদ্ধ বাবা-মা ছেলেমেয়েদের স্কুল-কলেজ ছাড়িয়ে নিয়ে পারিবারিক বৃত্তিতে ঢুকিয়ে দিচ্ছে — বিয়েও দিয়ে দিচ্ছে। সবচেয়ে দুরবস্থা মেয়েদের। হেনস্তার সম্ভাবনা এত বেশি যে বড় হওয়ার পর তাদের পড়া না ছাড়ালে প্রতিবেশীরা দুর্নাম দেয়।

উল্লেখ্য, এই স্কুলের প্রায় সবই হিন্দি-মাধ্যমে — যদিও এদের দুরবস্থার সুযোগে সুদূর-প্রসারিত ইংরেজি-মাধ্যম স্কুলও অনেক বেশি টাকা নিয়েও নিম্নমানের শিক্ষা দিচ্ছে। ভাষাশিক্ষা নিয়ে যে-রাজনীতি স্বাধীনতা-উত্তর কালে চলে এসেছে তাতেও শিক্ষার মান অবনমিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা (তথা রাধাকৃষ্ণণ) কমিশন ভারতীয় ভাষাকে (“হিন্দি হলেই ভাল”) উচ্চশিক্ষার মাধ্যম করতে বলেছিল। তৎকালীন প্রখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তবু ইংরেজি-মাধ্যম ত্যাগ করেনি দেখে শিক্ষা (তথা কোঠারি) কমিশন (১৯৬৪-৬৬) হিন্দি শিক্ষাকে সারা দেশে আবশ্যিক করার কথা বলেও মাতৃভাষাকে (বা আঞ্চলিক ভাষাকে) শিক্ষার মাধ্যম করার সুপারিশ করে। তবে কোঠারি কমিশনের রিপোর্ট খুঁটিয়ে পড়লে বোঝা যায় যে অহিন্দিভাষী অঞ্চলে হিন্দি শিক্ষা নিশ্চিত করার কথা মাথায় রেখেই কমিশন ভাষাশিক্ষা সম্বন্ধে যাবতীয় সুপারিশ করেছে। সেই সুপারিশের জের ধরে বহু রাজ্যে স্কুলস্তরে ইংরেজি পঠনপাঠনের সময় কমিয়েও দেওয়া হয়েছে। স্বাধীনতা লাভের কিছু পরে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায় চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজি পড়ানো বন্ধ করে নিজেই শঙ্কিত হয়ে পড়েন—এতে হয়তো রাজ্যে শিক্ষার মান নেমে যাবে, শিক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ডঃ রায় বিষয়টা খতিয়ে দেখতে বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করেন। কমিটি তৃতীয় শ্রেণী থেকে ইংরেজি পড়ানোর সুপারিশ করে। কোনও কোনও মুখ্যমন্ত্রীর ভুল শুধরোতে ৪০ বছর লাগে। ডঃ রায়ের ৪০ দিনও লাগেনি। রাজ্যে তৃতীয় শ্রেণী থেকে ইংরেজি পড়ানো শুরু হয়, এবং তা বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার আগে পর্যন্ত চলতে থাকে। ফ্রন্ট ১৯৮১ সালে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজি পড়ানো বন্ধ করে দেওয়ার মাস পাঁচেক পরে ডঃ ভবতোষ দত্তর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চশিক্ষা পরিকল্পনা কমিশন গঠন করে। উচ্চশিক্ষার মান রক্ষা ও উন্নয়ন করায় বাংলা-মাধ্যমের সীমাবদ্ধতা নিয়ে এই কমিশন

বিস্তারিত আলোচনা করে বলে যে, বাংলায় লেখা অনার্স বা তদূর্ধ্ব স্তরের জন্য উচ্চমানের বই অপ্রতুল। বাংলায় বিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দর দারুণ অভাব। বাংলায় বিজ্ঞান বিষয়ে বই ছাপার ব্যয় অত্যধিক, তাই প্রকাশকরা তাতে আগ্রহী নয়। অনার্স বা তদূর্ধ্ব স্তরের উপযুক্ত বিজ্ঞান বিষয়ে কোনও জার্নাল আদৌ ছাপা হয় না। উচ্চশিক্ষার মান উন্নত করতে, তাই "অন্তত আগামী কয়েক দশক বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের অবশ্যই ইংরেজি শিখতে হবে।"[১২]

উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নের প্রয়োজনে ১০০ মার্কস-এর ইংরেজি বা অপর কোনও বিদেশি ভাষার এক পেপার ডিগ্রি স্তরে আবশ্যিক করার পরামর্শ দেয় দত্ত কমিশন। তা ছাড়াও ডিগ্রি স্তরে এখন যে ১০০ মার্কসের 'অতিরিক্ত-আবশ্যিক' ভাষার ওপর পেপারটি আছে, সেটিকেও কমিশন বি. এ., বি. কম., বি. ই., বি. এল. এবং এম. বি. বি. এস. কোর্সের জন্যও আবশ্যিক করতে বলে। কেবল তাই নয়, উচ্চশিক্ষায় আসার আগেই তার প্রস্তুতি হিসেবে ইংরেজি শিক্ষার ভিত পাকা করে তৈরি করার জন্য ভাষাটিকে তৃতীয় শ্রেণী থেকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে পড়ার সুযোগ করে দিতে বলে।[১৩] সরকার দত্ত কমিশনের রিপোর্ট দীর্ঘকাল প্রকাশ না করে "গোপনীয়" করে রাখে, এবং ১৯৯১ সালে ডঃ অশোক মিত্রর নেতৃত্বে নতুন একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করে।

মিত্র কমিশনও পরিষ্কার বলে যে, "যতদিন পর্যন্ত উচ্চশিক্ষার উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক মাতৃভাষায় রচনার সার্থক ব্যবস্থা না করা যাচ্ছে, এবং/অথবা সেগুলো অন্য ভাষা থেকে অনুবাদের ব্যবস্থা না হচ্ছে, ততদিন ইংরেজিই উচ্চশিক্ষার মূল মাধ্যম থাকবে। এমন কি এ রকম ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হবার পরেও, রেফারেন্স বই ও জার্নালের সাহায্যে (বিশ্বের) জ্ঞানভাণ্ডারের সর্বসাম্প্রতিক সংযোজনের পরিচয় নেওয়ার প্রয়োজনে ইংরেজি আমাদের প্রধান পাঠের ভাষা (reading language) থেকেই যাবে।" মিত্র কমিশন এও বলে যে ইংরেজি-মাধ্যম স্কুলের সঙ্গেও বিবাদের কোন কারণ নেই এবং, বস্তুত, "এইসব প্রতিষ্ঠানের অনেকগুলিই সঙ্গত সামাজিক চাহিদা মেটাচ্ছে এবং সেগুলো আমাদের জাতীয় লক্ষ্য ও শিক্ষাদর্শর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।"

অর্থাৎ, ইংরেজি যে শিক্ষার মান উন্নয়ন ও তার প্রসারের জন্য অপরিহার্য, এবং ভাষাটা শেখা থাকলে যে শিক্ষার্থীর বিশেষ সুবিধে হয়, তা মিত্র কমিশন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মেনে নেয়। তার পরেও এই কমিশনের "সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা" দত্ত কমিশনের পরামর্শ বাতিল করে দিয়ে বলেন, যে, "প্রাথমিক স্তরে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে ইংরেজি পড়ার সুযোগ দিলে রাজ্যের অর্থ সাহায্য দিয়ে দুই শ্রেণীর শিক্ষার্থী তৈরি করা হবে।" তাঁরা পঞ্চম শ্রেণী থেকে ইংরেজি পড়ানো শুরু করার পরামর্শ দেন এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারও তাঁদের পরামর্শই মেনে নেওয়ার পরে 'আ স্টেপ টু লার্নিং ইংলিশ' শীর্ষক যে পুস্তিকাটি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিতরিত হয় সেটা প্রমাণ করে রাজ্যের স্কুল-শিক্ষামন্ত্রকের শিক্ষার মানোন্নয়নে কোনও আগ্রহ নেই। পুস্তিকাটি কত খেলো তা পত্র-পত্রিকায় আলোচিত হয়েছে।[১৪]

ভাষাশিক্ষা নিয়ে অবিবেকী রাজনীতি শাসকগোষ্ঠীর ছেলেমেয়েদের জন্য ইংরেজি-মাধ্যম শিক্ষার অপরিমেয় সুযোগ করে দিয়েছে, আর এক দিকে, নিম্নবিত্তদের ছেলেমেয়েদের পক্ষে ভাষাটা বিষয় হিসেবে শেখাও অসম্ভব করে তুলেছে। ফলে শিক্ষায় সমবিচারের আদর্শ এবং শিক্ষার উৎকর্ষ নিশ্চিত করার নীতিই যে কেবল পরিত্যক্ত হয়েছে তাই নয়, সেই সঙ্গে সব স্তরেই শিক্ষার প্রসারও বিঘ্নিত হচ্ছে। উদাহরণত, উত্তরপ্রদেশের মাধ্যমিক সিলেবাস ছাঁটাইয়ের প্রস্তাবে আপত্তি উঠলে পর্ষদ কর্তৃপক্ষ অজুহাত দিয়েছিলেন,

"আসলে, চালাকচতুর ছেলেমেয়েরা সব ইংরেজি-মাধ্যমে সি বি এস ই কোর্স পড়ে, আর আমাদের ছেলেমেয়েরা অধিকাংশই দেহাতি, হিন্দি-মাধ্যমে পড়ুয়া -- সিলেবাস না কমালে এ বেচারারা পাসই করবে না।" এমন সব মান বিধ্বংসী সিদ্ধান্তের সঙ্গে ভোট রাজনীতির সম্পর্ক কোথায় তা পশ্চিমবঙ্গের উদাহরণ দিলে স্পষ্টতর হবে।

মাতৃভাষা-মাধ্যম স্কুলে ইংরেজি পড়ার সুযোগ অনেক কমিয়ে দিয়েই, অন্যান্য রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গেও, অভিজাত শাসকগোষ্ঠী নিজেদের সন্তানসন্ততিদের ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে ভর্তি করে দেয়। বিপদ বুঝে মধ্যবিত্তও তাদেরই অনুসরণ করে। ফলে এক দিকে স্কুলপাঠ্য বিষয় হিসেবে মাতৃভাষা শিক্ষার সম্ভাব্য প্রসার বন্ধ হয়ে যায়। আর এক দিকে, ইংরেজি-মাধ্যম স্কুল শিক্ষার চাহিদা হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় বিস্তর নিচুমানের স্কুল গজিয়ে উঠে তারাও সাধারণভাবে শিক্ষার মান নামিয়ে দেয়।

ফলত, মাতৃভাষা মাধ্যমে স্কুলশিক্ষা কীভাবে ক্রমাগত বিপন্ন হচ্ছে তা বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলোর দিকে তাকালে বোঝা যায়। শহরাঞ্চলে ইংরেজি-মাধ্যম স্কুলের ছড়াছড়ি ; সেখানে বাংলা-মাধ্যম স্কুল ছাত্রাভাবে ধুঁকছে। আর গ্রামাঞ্চলে ইংরেজি-মাধ্যম স্কুল কম বা নেই ; সেখানে বাংলা-মাধ্যম স্কুল ছাত্রাভাবে ভেঙে পড়ছে। নির্দিষ্ট উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে সংকট কত গভীর।

নদীয়া জেলায় তিনটি উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে প্রধান শিক্ষকতা করেছেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত চাকদহবাসী সুবলচন্দ্র মণ্ডল। প্রাক্তন বিধায়ক এবং গান্ধীবাদের ব্যাখ্যাতা সুবলবাবু এই প্রাবন্ধিককে জানিয়েছেন যে, "চাকদহ থানার হিংনাড়া অঞ্চল পাবলিক ইন্সটিটিউশনে পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রী সংখ্যা কমবেশি ২০০০ — যদিও সরকারি বিধান হল, দশ ক্লাস স্কুলে অনধিক ১০০০ ছাত্রছাত্রী থাকবে। আর, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ৪৫০-এর আশেপাশে। এদের এক দিন অন্তর-অন্তর স্কুলে আনা হয়। ওই এলাকাতেই রসুল্লাপুর হাইস্কুলে দিনের প্রথম চার পিরিয়ড পঞ্চম শ্রেণীর আর পরের চার পিরিয়ড ষষ্ঠ শ্রেণীর পড়া হয়। পিরিয়ডগুলোর সময়ও কমিয়ে ফেলতে হয়েছে।" সুবলবাবু আরও লিখেছেন, "নদিয়ার প্রথম সারির স্কুল চাকদহ রামলাল একাডেমিত পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়া হয় সপ্তাহে যথাক্রমে ২৪ ও ২৯ পিরিয়ড — হওয়ার কথা ৩৯ পিরিয়ড। স্কুল-শিক্ষামন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস মহাশয় হিংনাড়া স্কুলের সংলগ্ন মাঠ দিয়ে এখনও তাঁর পুরনো 'রাজার মাঠ স্কুল'-এ যান শুনি....সব চিন্তা করলে মাথা খারাপ হবে।"

পক্ষান্তরে বামফ্রন্টের দাবি : "মাধ্যমিক স্কুল বেড়েছে, শিক্ষক বেড়েছে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১২১ শতাংশ। মনে রাখতে হবে, একই সময়ে সর্বভারতীয় বৃদ্ধির হার মাত্র ৬৪ শতাংশ...... পঠনপাঠনের মান বেড়েছে, সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা হচ্ছে বলে তা সম্ভব হচ্ছে।"[১১] এ দাবি অযথার্থ। ফ্রন্ট নিজেই বলছে যে তারা গত ১৮ বছরে নতুন ২১৭৭টি মাধ্যমিক ও ৪৬৯টি উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল করেছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক পৃথ্বীশ বসু এবং মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির সভাপতি তপন রায়চৌধুরীর দেওয়া হিসেব অনুযায়ী, ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে এখনই অন্তত ২০০০ নতুন স্কুল এবং ৪০,০০০ নতুন শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রয়োজন।

পঠনপাঠন যেখানে বন্ধ হবার উপক্রম সেখানে তার মান কী করে বাড়তে পারে? খোঁজ নিলে দেখা যাবে, সুবলবাবুর দেওয়া উদাহরণ মোটেই ব্যতিক্রমী নয়। পরীক্ষাও "সুষ্ঠুভাবে হলে নিয়মিত প্রশ্ন ফাঁস হত না, উত্তরপত্র মূল্যায়ন সম্বন্ধে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকের এমন ঢালাও অভিযোগ উঠত না। টাকা দিয়ে মার্কস বাড়ানো যাচ্ছে,

সার্টিফিকেটও কেনাবেচার খবর বেরোচ্ছে। অর্থাৎ আমরা 'বিমারু'র খুব বেশি পিছনে নেই। নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন রাজ্যের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রককে জানিয়েছে যে, "গণটোকাটুকি আবার ফিরে আসছে। শিক্ষক নিয়োগ থেকে ছাত্র ভর্তি পর্যন্ত সবই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে শিক্ষা বহির্ভূত ব্যক্তিদের দ্বারা।"

মুদালিয়ার কমিশন স্কুলে পাঠাগারের ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছিল। কোঠারি কমিশন এমন কি প্রাথমিক স্কুলেও 'শিক্ষকদের জন্য ছোট পাঠাগার' তৈরি করতে বলেছিল। স্বাধীনতার ৫০ বছর পর আজ সেই পরামর্শটিকে পরিহাস বলে মনে হয়। তবু বাংলা-মাধ্যম মাধ্যমিক স্কুল থেকেও পাঠাগার এখন নিশ্চিহ্নপ্রায়। স্কুলবাড়ি ভেঙে পড়ছে। ছাত্র বাড়লেও শিক্ষকের সংখ্যা আদতে কমে যাচ্ছে। কারণ বহু শিক্ষকপদ বছরের পর বছর শূন্য রেখে দেওয়া হচ্ছে। বাংলা মাধ্যম সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত প্রাথমিক স্কুলের অবস্থা এক কথায় অমানবিক। স্কুল শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশে করা রাজ্য-জোড়া এক জরিপে দেখা গেছে, এইসব স্কুলের ২৫ শতাংশের কোনও ঘরই নেই, ৮০ শতাংশতে শিক্ষার্থীদের বসার বেঞ্চি নেই, ৩৪ শতাংশতে একটি করে ক্লাসরুম — সেখানেই প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণীর সব ছাত্রছাত্রীদের একসঙ্গে পড়ানো হয়।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক সদ্য-নিযুক্ত স্কুল সার্ভিস কমিশন প্রায় ৮০০০ শিক্ষকের একটি প্যানেল গঠনের কাজে নিযুক্ত আছে। চাহিদার তুলনায় সংখ্যাটা খুবই কম। কারণ, মাত্র ৪০০টি স্কুল করতেই অন্তত ৮০০০ শিক্ষকের প্রয়োজন। তবু ওই সংখ্যক শিক্ষক নিযুক্ত হলে অন্তত বিদ্যমান স্কুলগুলোতে কিছু শূন্যপদ পূরণ হবে। সেটা অবশ্যই মন্দের ভাল।

কিন্তু সত্যিই যোগ্য ব্যক্তিরা নির্বাচিত হবেন কি না, এমন কী আদৌ ক'জন নিয়োগপত্র পাবেন তা নিয়ে সংশয় উপস্থিত হয়েছে। একে তো পরীক্ষার্থীদের অ্যাডমিট কার্ড দেওয়া থেকে শুরু করে পরীক্ষাকেন্দ্র স্থির করা এবং প্রশ্নপত্রে প্রদত্ত নির্দেশাবলী, এই সব কিছু নিয়েই চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা, তার ওপর আবার পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রচারিত ছাত্র : শিক্ষক অনুপাত সম্পর্কিত সাম্প্রতিক বিজ্ঞপ্তি, যাতে বলা হয়েছে যে, এখন থেকে সরকারি এবং সরকারি-সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে ৮০ জন ছাত্র-পিছু একজন করে শিক্ষক বরাদ্দ হবেন। এখানেই শেষ নয়। এই বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী একটি স্কুলে কার্যত ছাত্র-সংখ্যা যত বাড়বে শিক্ষক-সংখ্যা তত কমবে। রাজ্যের স্কুল শিক্ষা বিভাগ প্রদত্ত ছকটি নিম্নরূপ :

ক্লাসের সংখ্যা	শিক্ষক সংখ্যা	ক্লাস সংখ্যা	শিক্ষক সংখ্যা
৬	১২	১৬	১৬
৭	১২	১৭	১৬
৮	১২	১৮	১৬
৯	১৩	১৯	১৭
১০	১৩	২০	১৬
১১	১৪	২১	১৮
১২	১৪	২২	১৮
১৩	১৪	২৩	১৮
১৪	১৫	২৪	১৯
১৫	১৫	২৫	১৯

বিজ্ঞপ্তিতে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে এই নয়া নীতির নিরিখে যে সব স্কুলে অতিরিক্ত শিক্ষক ইতোমধ্যেই কর্মরত আছেন তাদের চাকরি যাবে না। কিন্তু স্পষ্টত, "অতিরিক্ত শিক্ষকরা" এক-এক করে অবসর নিলে বা কোনও কারণে চাকরি ছেড়ে দিলে তার জায়গায় আর কাউকে নিয়োগ করা হবে না। তাই, অনেক নতুন স্কুল তৈরি না হলে ৮০০০ শিক্ষকের স্থান হবে কোথায়?

প্রশ্ন এক, প্রাসাদোপম অট্টালিকাবাসী ধনাঢ্য বামপন্থীদের সন্তানসন্ততি বাংলা-মাধ্যমে পড়লে এই সব স্কুলের এমন দুর্দশা হতে দেওয়া হত? চতুর্থ শ্রেণীর শেষে এই শিশুদের অর্জিত বিদ্যার পরিচয় নিয়ে বিশেষজ্ঞ সমীক্ষকদল দেখেছেন, ওদের বড়জোর বিশ শতাংশের সাক্ষরতাটুকু কার্যকর (বা 'ফাংশনাল')। প্রশ্ন দুই, এর পরে কি বলা যায় "পঠনপাঠনের মান বেড়েছে"? অবশ্য মান বাড়বেই ধরে নিয়ে, বার্ষিক পরীক্ষা তুলে দিয়ে, প্রথম শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত প্রোমোশন অবাধ করে দেওয়া হয়েছে। ফলে বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী প্রতি বছর মাধ্যমিক স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে স্কুলছুট হয়ে যাচ্ছে। প্রশ্ন তিন, তা হলে আমরা অনিচ্ছুক শিশুদের আকর্ষণ করে শিক্ষার প্রসার ঘটাচ্ছি, না কি ইচ্ছুক ছাত্রদের স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিয়ে শিক্ষার সম্ভাব্য প্রসার বন্ধ করে দিচ্ছি? অবশ্য জাতীয় সাক্ষরতা মিশনের একজন বিশেষজ্ঞ বলেছেন স্কুলছুটদের সংখ্যার একটা বড় অংশই ভুতুড়ে। ওরা আদতে কোনওদিন স্কুলেই ভর্তি হয়নি।[১] যাই হোক, প্রাথমিক স্তরে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ৯২,০৯,০০০ ধরে নিয়ে ৪০ : ১ অনুপাতে শিক্ষক নিযুক্ত হচ্ছেন, এবং আমরা এও জানি যে রাজ্যে শিক্ষাখাতে বরাদ্দর ৯৫ শতাংশ বেতন দিতেই ব্যয় হয়ে যাচ্ছে। প্রশ্ন চার, যেসব ব্যক্তিকে দিয়ে, শিক্ষকতা নয়, অন্য কোনও কাজ করানোর জন্য শিক্ষক পদে নিযুক্ত করা হয়েছে তাদের সংখ্যার নিরিখে কি শিক্ষা প্রসারের দাবি করা যায়? অশোক মিত্র কমিশন বলেছে, "যে-ব্যক্তিকে শিক্ষক নিয়োগ করা হল তিনি হয়তো পুরোদস্তুর রাজনৈতিক কর্মী (full-fledged political functionary) অথবা পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্য। তিনি হয়তো স্কুলে পড়ানো সময়টা চাষআবাদে ব্যয় করেন। কমিশনকে এমন উদাহরণও দেওয়া হয়েছে যে পূর্ণকালীন শিক্ষকতার জন্য প্রাথমিক স্কুল থেকে বেতন নিয়ে শিক্ষকরা সক্রিয়ভাবে তেজারতি কারবার বা দোকানদারিতে নিযুক্ত আছেন।"[২]

ভাষা-রাজনীতির আর এক কুফল 'মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক সিলেবাসের বিরাট গ্যাপ'। অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মনে পড়বে, এ নিয়ে ঘ্যানঘ্যানানি শুরু হয় প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি-না-পড়া ছেলেমেয়েরা উচ্চ মাধ্যমিকে প্রথম ভর্তি হবার সময় থেকে। মিত্র কমিশন বলেছে, দুটি কোর্সের ব্যবধান ঘোচাতে বিশেষজ্ঞরা চিন্তাভাবনা করুন, তবে উচ্চ মাধ্যমিকের মান নামিয়ে মাধ্যমিকের কাছাকাছি করা চলবেন না, বরং মাধ্যমিকের মানই টেনে উচ্চ মাধ্যমিকের কাছাকাছি তুলতে হবে, কারণ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা-উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা জয়েন্ট এন্ট্রান্স জাতীয় সর্বভারতীয় পরীক্ষায় বসে। উদাহরণত সি বি এস ই-এর তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের উচ্চ মাধ্যমিক কোর্স নিম্নমানের হলে আমাদের প্রতিযোগীরা মুশকিলে পড়বে। তবে কমিশন যাই বলুক, রাজ্যের মাধ্যমিক কোর্সের মান উন্নয়নের আশু সম্ভাবনা নেই, কারণ সেটা করার আগে প্রথমেই বাংলা-মাধ্যম স্কুলগুলোতে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ ফিরিয়ে দিতে হবে। সে আশা দুরাশা।

যে দেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা এত নিম্নমানের সেখানকার উচ্চশিক্ষার মান উন্নত হবে কী করে? কেউ কেউ অবশ্য বলেন, "অত্যধিক প্রসারিত" হওয়ার ফলেই

আমাদের উচ্চশিক্ষার মান নেমে গেছে। খতিয়ে দেখলে এই অভিযোগ ভ্রান্ত। আমরা ২০টি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৬০০-র কিছু বেশি কলেজ নিয়ে স্বাধীন হয়েছিলাম। তার দুই দশক পরে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজের সংখ্যা হয়েছিল যথাক্রমে ৭০ এবং ২৫০০। তখনই আমাদের উচ্চশিক্ষাব্যবস্থা পৃথিবীর বৃহত্তম ব্যবস্থাগুলোর একটি। সংখ্যাগুলি ১৯৯০ সালে হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় ১৭২ এবং কলেজ ৭০০০। আর আজ বিশ্ববিদ্যালয় ২২০টি, বিশ্ববিদ্যালয় বলে বিবেচিত প্রতিষ্ঠান ৩৮টি এবং কলেজ ৮৬১৩টি। শিক্ষক সংখ্যা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় মিলিয়ে ১৯৯৩-৯৪ সালে ২.৯১ লক্ষ এবং ১৯৯৪-৯৫ সালে ৩.০১ লক্ষ ছিল। ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ১৯৯০ সালে ছিল ৪০ লক্ষ -- এখন ৬১.১৪ লক্ষ। ছাত্রছাত্রী সংখ্যা পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে বছরে ১২ এবং ১৩.৪ শতাংশ হারে বাড়ছিল। সত্তরের দশকে তা ৩.৮ শতাংশে নেমে যায়, তবে আশির দশকে তা বেড়ে ৫.৭ শতাংশ হয়। নব্বইয়ের দশকে এই হার খুব বাড়বে না বলে অনুমিত। আশির দশকে ৮৮ শতাংশ স্নাতক আর ৯.৫ শতাংশ স্নাতকোত্তর পাঠক্রম অধ্যয়ন করছিল। গবেষণারত ছিল ১.১ শতাংশ। উচ্চশিক্ষার্থীদের ৪০ শতাংশ কলা, ২১ শতাংশ বাণিজ্য, এবং ১৯ শতাংশ বিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যয়নরত ছিল।[১৮]

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের একটি বার্ষিক প্রতিবেদনে দেখছি, ১৯৯০-৯১ থেকে ১৯৯৪-৯৫ পর্বে প্রতি ১০ জন উচ্চশিক্ষার্থীর চারজন ইতিহাস ও সংস্কৃতি এবং ভাষাসহ বিভিন্ন মানবিকী বিদ্যা ও সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যয়ন করেছে। প্রতি দশ জনের দুজন বিজ্ঞান আর দুজন বাণিজ্য নিয়ে পড়াশুনো করেছে। আর এক দিকে, বিজ্ঞানের প্রতি দশজন উচ্চশিক্ষার্থীর তিনজন পড়েছে ইঞ্জিনিয়ারিং, ভেষজবিদ্যা, কৃষিবিদ্যা বা তৎসম্পর্কিত কোনও বিষয়। সত্তরে দশক থেকে বাণিজ্যবিদ্যায় ছাত্রসংখ্যা বাড়তে থাকে। এর ফলে প্রধানত কলা ও মানবিকী বিদ্যার ছাত্রসংখ্যাই কমে যায়। তা ছাড়া ডক্টরাল ডিগ্রি প্রাপকদের সংখ্যা ১৯৯১-৯২ সালের ৮৭৪৩ থেকে বেড়ে ১৯৯৩-৯৪-তে দাঁড়ায় ৯৩৬৯ — শেষোক্ত সংখ্যাটির মধ্যে কলা-বিষয়ক ডিগ্রি ৩৭৮৪ এবং বিজ্ঞান-বিষয়ক ডিগ্রি ৩৫০৫।

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিশেষত কলেজ) ১৯৯০-৯১ থেকে ১৯৯৪-৯৫—এই পাঁচ বছরে সবচেয়ে বেশি বেড়েছে মহারাষ্ট্রে ও কর্ণাটকে। মোটামুটি বেড়েছে আসাম বিহার গুজরাট কেরালা মধ্যপ্রদেশ ওড়িশা এবং তামিলনাড়ুতে। "বড় রাজ্যগুলোর মধ্যে বৃদ্ধি সবচেয়ে কম উত্তরপ্রদেশ আর পশ্চিমবঙ্গে।" অনুমান করা হয় ১৯৯৪-৯৫ সালে ২৯৬টি নতুন কলেজ হয়েছে (এই সংখ্যা সঠিক ধরে মঞ্জুরি কমিশনের প্রতিবেদনে বর্তমানে সারা দেশে কলেজের সংখ্যা ৮৬১৩ বলা হয়েছে।) নতুন কলেজগুলির অধিকাংশই প্রাইভেট অ্যাফিলিয়েটেড, তবে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত। সারা দেশের প্রায় ৭৫ থেকে ৮০ শতাংশ কলেজই এই শ্রেণীভুক্ত।

স্বাধীন ভারতে উচ্চশিক্ষার ভিত্তি স্থাপনের প্রধান কৃতিত্ব জওহরলাল নেহরুর। তাঁরই আগ্রহে ১৯৪৭-এর পরেই বিশেষত বিজ্ঞানশিক্ষার পরিকাঠামো তৈরি হতে থাকে। স্থাপিত হয় *বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (সেন্টার ফর সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ* বা সি এস আই আর।) আজ এই পরিষদের ৪০টি জাতীয় পরীক্ষাগার, এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে ৮০টি সম্প্রসারণ কেন্দ্র হয়েছে। পরিষদ-সৃষ্ট কৌশল (Know-how) ব্যবহার করে দেশে ৩০০০ কোটি টাকার শিল্পসামগ্রী উৎপন্ন হয়েছে গত বছর। এরকম সব তথ্যের নিরিখে মানতে হয় যে, জাতীয় শিক্ষানীতির (১৯৮৬) সমীক্ষা কমিটির চূড়ান্ত প্রতিবেদনে সঙ্গতভাবে বলা হয়েছে, "নিঃসন্দেহে উচ্চতম শিক্ষার সুযোগ দূরতম অঞ্চল

পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। প্রথম প্রজন্মের উচ্চশিক্ষার্থীর সংখ্যাও বাড়ছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন পঠনপাঠন ও গবেষণার উৎকর্ষ বাড়াতে বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে। শিক্ষকদের (আর্থিক) অবস্থার উন্নতির জন্যও সচেতন চেষ্টা করা হয়েছে। শিক্ষা-সম্পর্কিত প্রযুক্তি এবং মিডিয়ার ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।"[২২]

প্রতিবেদনে আমাদের অনেক দুর্বলতাও চিহ্নিত করা হয়েছে। তার মধ্যে আছে অপরিকল্পিতভাবে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাবৃদ্ধি, শিক্ষা ও কাজের সুযোগের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান, পরীক্ষা সংস্কারে ক্ষতিকর বিলম্ব, উত্তরপত্রে উগরে দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে মুখস্থ-নির্ভর পঠনপাঠন, এবং সমস্ত ব্যবস্থাটায় দায়বদ্ধতার অভাব। ফলে আন্তর্জাতিক মানের কাছাকাছি শিক্ষা দিচ্ছে এমন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এ দেশে খুবই কম।

অভিযোগগুলো অসত্য নয়, তবে 'অপরিকল্পিত সংখ্যাবৃদ্ধির' একটু ব্যাখ্যা দরকার। আসলে সারা দেশে উচ্চশিক্ষা-উপযুক্ত বয়সীদের (১৭ থেকে ২৩ বছর) মোট চার-পাঁচ শতাংশ উচ্চশিক্ষা পাচ্ছে। এই হার কেবল উন্নত দেশ নয়, অনেক উন্নয়নকামী দেশের তুলনায়ও মর্মান্তিকভাবে কম। আমেরিকায় এই হার ৭০ শতাংশ, দক্ষিণ কোরিয়ায় ৩০ শতাংশের বেশি, এমন কি ফিলিপিনস ও কিউবা কস্টারিকা পানামা চিলি আর্জেন্টিনা বলিভিয়া পেরু উরুগুয়ে ভেনেজুয়েলা ইত্যাদির মতো বহু লাটিন আমেরিকান দেশেও ২০ শতাংশের বেশি।[২৩] অন্তত দুটি কারণে এ দেশে উচ্চশিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক অনেক বাড়া প্রয়োজন — এক, মগজ পাচার বন্ধ করা এবং, দুই , দেশের সার্বিক উন্নয়ন।

মনে রাখা দরকার, ভারতীয় মেধার স্বীকৃতি দুনিয়াজোড়া। তাকে দেশের কাজে লাগাতে হলে উচ্চমানের উচ্চশিক্ষার প্রসার অপরিহার্য। উচ্চশিক্ষা বিশেষজ্ঞ তৈরি করে — যারা দেশের যাবতীয় উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সবেচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। আসলে আমাদের উচ্চশিক্ষার অত্যল্প প্রসার আমাদের অনগ্রসরতার একটা বড় কারণ। দ্বিতীয়ত, আজেকের দ্রুত পরিবর্তনশীল দুনিয়াতে উচ্চশিক্ষার 'উচ্চতার' নিরিখ সমধিক দ্রুততায় পরিবর্তিত হচ্ছে। আজ যা উচ্চশিক্ষা বলে গ্রাহ্য আগামী কাল তা মাধ্যমিক শিক্ষায় পর্যবসিত হতে চলেছে। যদিও আমাদের প্রায় অর্ধেক মানুষ নিরক্ষর, বর্ণমালার সঙ্গে অপরিচিত, তবু বহু দেশে এখন সাক্ষরতা বলতে কম্পিউটার পরিচিত বা 'কম্পিউটার লিটারেসি' বোঝাবে। অতএব এই মুহূর্তে আমরা যাকে উচ্চশিক্ষা বলছি তার আওতায় ক্রমাগত বেশি সংখ্যক ছেলেমেয়েকে আনার চেষ্টা করতেই হবে।

মুশকিলটা অন্য জায়গায়। উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক প্রস্তুতি, সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার নির্মাণ, বিবিধ শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ সংগ্রহ ও তার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা আগে সেরে তার পরে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনার কথা ভাবতে হয়। তার জন্য ছাত্র প্রস্তুতি বড় প্রয়োজন। কারণ স্কুলশিক্ষায় সবার অধিকার, কিন্তু উচ্চশিক্ষায় অধিকার কেবল তাদের যারা স্কুলশিক্ষায় কৃতী। এ ভাবে স্বাধীন ভারতে উচ্চশিক্ষার (এবং স্কুল শিক্ষার) জন্য প্রস্তুতি কখনওই হয়নি। তার জন্য যদি মাত্র একটি কারণই দর্শাতে দেওয়া হয় তা হলে বলব — *অবৈধ রাজনীতি। রাজনীতি ছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা হয় না। কিন্তু সেই রাজনীতি শিক্ষার* স্বার্থে — শিক্ষাকে সম্ভব করে তোলার রাজনীতি — যেমন প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় কমিয়ে তা শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করা। সেটা বৈধ রাজনীতি। সেই তত্ত্ব বিস্তারের সুযোগ এ প্রবন্ধে নেই। এটুকু বললেই যথেষ্ট, এ দেশে যা চলে আসছে তা শিক্ষার নয়, শিক্ষায় রাজনীতি *— সোজা কথা দলবাজি — যেমন যোগ্য প্রার্থীকে সরিয়ে দিয়ে পার্টির লোককে অধ্যাপক করা। শিক্ষায় যে-হস্তক্ষেপ শিক্ষার প্রসার ও উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য নয়, ভিন্ন কোনও স্বার্থ সিদ্ধির জন্য করা হয়, তাই শিক্ষায় রাজনীতি। সেটা অবৈধ।*

বহু বছর আগেই প্রখ্যাত শিক্ষা-আলোচক ফিলিপ অল্টবাক বলেছিলেন যে ভারতের অনেক রাজ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থেকে কলেজের করণিক পর্যন্ত নানারকমের নিযুক্তিই ঘটে রাজনৈতিক প্রভাবে। "ফলে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান ও শিক্ষকের আত্মবিশ্বাস ও চরিত্রের জোর (morale) কমে যায়। নতুন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে --- এমন কি তার জন্য স্থান নির্বাচন করতেও পরামর্শ করতে হয় সরকারের সঙ্গে। কোন ভাষা-মাধ্যমে (উচ্চ) শিক্ষা দেওয়া হবে সেটাই ভারতে উত্তপ্ত রাজনৈতিক ইস্যু হয়ে দাঁড়ায়।"

অন্য কথায়, শিক্ষার যে নিজস্ব চাহিদা, শিক্ষাকে সম্ভব করে তুলতে হলে কী করতে হবে, তা এ দেশে বিবেচিত হয় না। এই প্রবন্ধর পরিসরে দু ধরনের উদাহরণ দেওয়া যায়। প্রথমটি নীতি, আর দ্বিতীয়টি তৃণমূলে সিদ্ধান্ত সম্পর্কিত।

এটা স্পষ্ট, যদিও কোনও শিক্ষারই শেষ নেই, তবু মোটামুটিভাবে স্কুলশিক্ষা বদ্ধমুখ বা 'ক্লোস-এন্ডেড্' আর উচ্চশিক্ষা খোলামুখ বা 'ওপ্‌ন-এন্ডেড্' মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে বলা চলে — আমি স্কুলশিক্ষা শেষ করলাম। কিন্তু এম এ/এম এসসি কেন, ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করার পরেও বলা যাবে না — আমি উচ্চশিক্ষা শেষ করলাম। উচ্চশিক্ষার ভিত্তি হল হালনাগাদিকরণ বা 'আপডেটিং'। তাই, আমাদের মতো গরিব দেশে সব স্তরেই টেক্সট বই অপরিহার্য হলেও, উচ্চশিক্ষা টেক্সট বই-নির্ভর নয় — জার্নাল-নির্ভর। আজকে 'তথ্য বিস্ফোরণ'-এর যুগে — যখন কালকের তথ্য আজ বাতিল হয়ে যাচ্ছে তখন — শিক্ষার্থীকে নতুন তথ্য দ্রুত পৌঁছে দেয় জার্নাল, আরও দ্রুত পৌঁছে দিচ্ছে ইন্টারনেট। অগুনতি বিষয়ে জার্নাল প্রকাশ অত্যন্ত ব্যয়বহুল বলে তা স্বল্পসংখ্যক ভাষাতেই প্রকাশ করা সম্ভব। বিপুল সংখ্যক জার্নালের ভাষা ইংরেজি। আর ইন্টারনেটের ভাষা বলতে গেলে কেবলই ইংরেজি। ভারতীয়দের সামনে নির্মম বাস্তব হল, তাদের ইংরেজি শিখতে হবে, নচেৎ তারা উচ্চশিক্ষা পাবে না।

শিক্ষার এই নিজস্ব চাহিদাটা সম্পর্কে এ দেশের দুশ্চরিত্র রাজনৈতিক নেতৃত্ব ভালই সচেতন। তাই তারা আপামর দেশবাসীর পক্ষে ইংরেজি শেখা অসম্ভব করে দিয়ে নিজেদের ছেলেমেয়েদের ইংরেজি-মাধ্যম স্কুলে পড়ান। শিক্ষায় আগাপাশতলা হিন্দি ব্যবহারের প্রবক্তা, উত্তরপ্রদেশের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী, মুলায়ম সিংহ যাদবকে সাংবাদিকরা জিজ্ঞাসা করেছিলেন "নিজের ছেলেকে ইংরেজি-মাধ্যম স্কুলে পড়াচ্ছেন কেন?" মুখ্যমন্ত্রীজির উত্তর : "আমরা ওকে বাড়িতেই হিন্দি ভালবাসতে শেখাচ্ছি।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিশেষত বিজ্ঞান বিষয়ের) প্রখ্যাত অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের জিজ্ঞাসা করুন, তারা একবাক্যে স্বীকার করবেন যে, উচ্চশিক্ষার মানের ক্রমাবনমনের বড় একটা কারণ হল শিক্ষার্থীর ইংরেজি জ্ঞানে ঘাটতি। যে নিম্নমানের রাজনীতি ৫০ বছর ধরে এত বড় ক্ষতিবৃদ্ধি হতে দিচ্ছে তা তৃণমূল স্তরে আরও বড় অঘটন ঘটাবেই। রাজীব গান্ধীর বিপুল ভোটে জেতার উচ্ছ্বসিত মুহূর্তে এই সত্যর (সম্ভবত প্রথম) সরকারি স্বীকৃতি মেলে। সেই সময়ে দেশজুড়ে আলোচনার জন্য 'চ্যালেঞ্জ অব এডুকেশন' নামে যে-প্রস্তাবনা সরকার সারা দেশে প্রচার করে তাতে বলা হয়, "(এ দেশে) কলেজ এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ও শিক্ষার নিজস্ব চাহিদা বিবেচনা করে তৈরি হয় না। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন নির্ধারিত ন্যূনতম মান অর্জন না করেও এইসব প্রতিষ্ঠান আমাদের সামান্য সঙ্গতিটুকুতে ভাগ বসাতে থাকে। নীতিগতভাবে কমিশন এদের মঞ্জুরি দেওয়া বন্ধ করতে পারে, কিন্তু বাস্তবে তা করলে রাজ্য সরকার আর কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধার ঝুঁকি থাকে। তাই শেষ

পর্যন্ত দু তরফে একটা সমঝোতা করে ব্যাপারটা মিটিয়ে নেওয়া হয়। এ কথা কেউ অস্বীকার করবে না যে ইউ জি সি কর্তৃক শিক্ষার মানোন্নয়নের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়নি। এটা দুর্ভাগ্যজনক। নিম্নমানের শিক্ষা পেয়ে শেষ পর্যন্ত ভোগে ছাত্রছাত্রীরাই। ..জাতপাত, আঞ্চলিকতা এবং স্বজনপোষণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলো কুখ্যাত হয়ে পড়ছে। কয়েকটা সম্মানার্হ ব্যতিক্রম ছাড়া এই প্রতিষ্ঠানগুলো রাজনৈতিক দলগুলোর হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই লড়াই ক্ষমতা অধিকারের জন্য, আর তার শামিল হন শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীরাও। কিছু উপাচার্য তো তাঁদের সম্পূর্ণ মেয়াদই বাড়িতে বসে বা ব্যারিকেডের পিছনে থেকে কাজ করতে বাধ্য হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাফল্যের মূল্যায়ন এখন হয় ঠিক সময়ে পরীক্ষা হয়েছে কি না, অকারণে কাজ বন্ধ এড়ানো গেছে কি না, এ সবের নিরিখে — গবেষণার গুণমান আর শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা দিয়ে নয়।"[৬১]

এই চিত্র পশ্চিমবঙ্গীদের সুপরিচিত। এ রাজ্যে একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় (বিশ্বভারতী) এবং একটি বিশ্ববিদ্যালয় বলে বিবেচিত প্রতিষ্ঠান-সহ মোট নয়টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। সাধারণ ডিগ্রি কলেজের সংখ্যা (১৭টি সরকারি কলেজ-সহ) ৩১৫ — এগুলিতে বি. এ., বি. এসসি এবং বি. কম কোর্স পড়ানো হয়। তা ছাড়াও শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কলেজ, আইন কলেজ, সঙ্গীত কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজিক্যাল কলেজ ইত্যাদি মিলে আরও ৪৪টি কলেজ আছে।

উচ্চ মাধ্যমিক ফল বেরোনোর পরে সাধারণ ডিগ্রি কলেজে ছাত্রছাত্রী ভর্তি নিয়ে প্রতি বছর যে হাঙ্গামা হয় তার সাম্প্রতিককতম উদাহরণটি পাঠকপাঠিকাদের এই প্রবন্ধ প্রকাশের সমকালে দেখা হয়ে যাবে। অনেক কালই এমন হচ্ছে। সুপরিকল্পনা থাকলে এ সমস্যার কি সমাধান হত না? পূর্ববর্তী কংগ্রেস সরকারের দোষ আছে। কিন্তু সেই দোষ স্খালনের জন্য ২০ বছর খুব একটা কম সময় নয়। রাজ্যের উচ্চশিক্ষা বিভাগের প্রতিবেদন (১৯৯৫-৯৬) অনুযায়ী আমাদের কিছু ডিগ্রি কলেজে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ৩০০০-এরও বেশি আবার কয়েকটাতে সংখ্যা একশরও কম। ছাত্রসংখ্যা এত কম হওয়ার কারণ "ওই কলেজগুলোর দুর্বল পরিকাঠামো, সামান্য কয়েকটি বিষয়ে কেবল পাস কোর্স পড়নোর ব্যবস্থা, জনপদ থেকে দূরত্ব ইত্যাদি।"[৬০]

ভবতোষ দত্ত কমিশন সন্ধান নিয়ে দেখেছিল বেশ কিছু কলেজ স্থাপিত হওয়ার দশ বছর পরেও ছাত্রসংখ্যা ১০০ পৌঁছয়নি। দত্ত কমিশন, এবং তারও আগে মঞ্জুরি কমিশন, এ রকম অচল কলেজ হয় তুলে দিতে না হয় অন্য কলেজের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল। কিন্তু পরামর্শ কার্যকর হলে যে দল ও নেতা কলেজ করেছিলেন তাদের ইমেজ খারাপ হতে পারে। সুতরাং অচল কলেজ 'চলতে' থাকে। শিক্ষকরা কখন আসেন-যান কাকপক্ষী টের পায় না : পার্টি ও নেতাও গায়ে-গতরে খাটান দেওয়ার জন্য সর্বক্ষণের কর্মী পান।

আমাদের রাজ্যে ২৫০-এর চেয়ে কম ছাত্র-বিশিষ্ট কলেজ ৪৮টি এবং ২০০১ থেকে ৩০০০ ও ৩০০০-এর বেশি ছাত্র-বিশিষ্ট কলেজ হল মোট ৩৫টি। ক্লাসটাস কিন্তু শেষোক্ত কলেজেও হওয়া সম্ভব নয়। সেখানে প্রথম বর্ষেই জোর করে ১০০০/১২০০ ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়ে যায়। সংখ্যাটা এত বড় যে আস্ত একটা কলেজে তার বেশি ছাত্র থাকা উচিত নয়। ওরা ভর্তি হয়েই কলেজ ছেড়ে চলে যায় প্রাইভেট টিউটরের দোকানে। ফেরে, বছরে বার দুয়েক — একবার বার্ষিক পরীক্ষা (যদি হয়) আর একবার ফাইন্যাল পরীক্ষা দিতে।

প্রাইভেট টিউটর অব্যর্থ সাজেশনস দেন। উত্তর লিখে দেন। ছাত্র সে-সব মুখস্থ লিখে বা স্রেফ টুকে দিয়ে পাস করে। দেশ জুড়ে তৈরি হয় killer graduates বা 'ঘাতক স্নাতক'। একটা সময় ছিল যখন স্নাতকেরা হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক হয়ে জ্ঞানী-গুণী হিসেবে সর্বজনশ্রদ্ধেয় হতেন। পক্ষান্তরে ঘাতক স্নাতক কর্মক্ষেত্রে নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধির এমন পরিচয় দিচ্ছে যে লোকের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার ওপর অনাস্থা জন্মে যাচ্ছে।

অথচ একের পর এক শিক্ষা কমিশন অবনমন রোধ করে তার উন্নয়নের সম্পর্কে কত পরামর্শই তো দিয়েছে। ডঃ সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণনের নেতৃত্বে পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন (১৯৪৮-৪৯) বিশেষত কৃষিবিদ্যার ওপর জোর দিয়ে, এবং পেশাগত শিক্ষার কথা মাথায় রেখে, স্নাতক স্তরকে প্রসারিত করার কথা বলেছিল। শিক্ষকের বেতন উন্নয়ন, পরীক্ষা-সংস্কার, ভারতীয় ভাষা ("হিন্দি হলেই ভাল") মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদান এবং ব্রিটিশ মডেলে একটি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন গড়ার কাজ নিশ্চিত করতে বলেছিল। শিক্ষায় মঞ্জুরি দেওয়ার দায়িত্ব কমিশনের ওপর ন্যস্ত থাকলে সরকারের মাতব্বরি কম থাকবে, ফলে রাজনীতির লোকও শিক্ষায় সহজে তার নোংরা নাক গলাতে পারবে না।

পরামর্শ অনুযায়ী ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন বা ইউ জি সি তৈরি হয়েছিল এবং সেই সুবাদে আমাদের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাপনায় কিছু ভাল কাজ হয়েছে ঠিকই। আগে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের কোনও ব্যবস্থা ছিল না। ইউ জি সি তাদের জন্য সারা দেশ জুড়ে সামার ইন্সটিটিউট সংগঠন করেছে। তার পরে ১৯৮৬ সালে গৃহীত এবং ১৯৯২ সালে সংশোধিত জাতীয় শিক্ষানীতির ধারাবাহিকতায়, কলেজ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং রিফ্রেসার কোর্স পড়ানোর উদ্দেশ্যে, ইউ জি সি সারা দেশে ৪৫টি অ্যাকাডেমি স্টাফ কলেজ করেছে, তা ছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ৫৭টি বিভাগকেও নিযুক্ত করেছে। এইসব কেন্দ্রে ১৯৯৫ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত ৮২,০০০ কলেজ শিক্ষক প্রশিক্ষিত হয়েছেন। এ ছাড়াও, প্রধানত ইউ জি সি সহায়তাই বিলম্বে হলেও (১৯৬৯ থেকে) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বেতন উন্নয়নের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল।

উচ্চশিক্ষায় ইউ জি সি-র অপরিহার্যতা স্বীকার করে নিয়েও কিন্তু বলতে হয় যে এই শিথিল সংগঠনটি তার জন্মলগ্নে (১৯৫৬ সাল) প্রাপ্ত প্রধান দায়িত্বগুলোই পালন করতে পারেনি। ফলে সিলেবাস সংস্কার হয়নি। হয়নি পরীক্ষা সংস্কার। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পঠনপাঠনের মানে সমতা (equivalence) নিশ্চিত করা যায়নি। কথা ছিল, দেশের সেরা ("major") চিহ্নিত করে পর্যাপ্ত সহায়তা দেওয়া হবে, যাতে তারা পঠনপাঠন ও গবেষণায় আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত হতে পারে। এ কাজ ইউ জি সি করতে পারেনি, যেমন পারেনি স্বশাসিত কলেজের আদর্শকে দেশ জুড়ে গ্রহণযোগ করে তুলতে। দেখা যাচ্ছে, ইউ জি সি এত দুর্বল যে সে টাকা না দিলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হম্বিতম্বি করে কিন্তু তার কাছ থেকে নেওয়া টাকার বিধিসম্মত সদ্ব্যবহারের হিসেব (utilization certificate) আট/নয় বছরেও দেয় না।

ইউ জি সি-র অক্ষমতার বড় কারণ হল তার রাজনৈতিক নখদাঁত নেই। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো স্বাধিকার পেলে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলোকে শিক্ষায় রাজনীতি ছেড়ে শিক্ষার রাজনীতি করতে হয়। সেই সততা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের নেই। তাদের বক্তব্য দাঁড়াল, উচ্চশিক্ষা চালাবার জন্য বেশি টাকাটাই দেবে রাজ্য সরকার, অথচ তাকে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর ছড়ি ঘোরাতে দেওয়া হবে না—এ হয় না। ফলে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকার এক-রঙা হোক বা না হোক, দুয়ের মধ্যে ক্ষমতার

নানান সমীকরণে দলীয় রাজনীতির ফাঁস কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওপর চেপে বসল। স্বাধীনতার ৫০ বছর পরে উচ্চশিক্ষা এখন গতায়ু। রোদন করতে হচ্ছে ছাত্র-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী-অভিভাবক, শিক্ষার স্থানীয় অধিকর্তা — সবাইকে। কিন্তু যা ঘটছে তার জন্য এঁরা নিজেরাও কম দায়ী নন। আরও দুঃখের কথা, এঁরা নিজেদের সমবেত স্বার্থ সম্বন্ধেও সচেতন নন।

স্বাধীনতার পর অমিত ক্ষমতাধর স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা যৎপরোনাস্তি নিগৃহীত হয়ে শিক্ষকরা একসময়ে 'মা-বাপ' সরকারের 'সহৃদয় হস্তক্ষেপের' ("kind intervention") জন্য কাকুতি-মিনতি করেছেন। কলকাতার বেসরকারি স্কুলের বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত শিক্ষক-শিক্ষিকা ঠিক এই মুহূর্তে তাই করছেন। সরকার কিন্তু একা আসে না — সঙ্গে পার্টিকে নিয়ে আসে। আর পার্টি তার 'নিজেদের লোক' দিয়ে শিক্ষা-অঙ্গন ছেয়ে ফেলে। এ রাজ্যে কারও কারও ধারণা আছে, ব্যাপারটা পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্টের একচেটে। ধারণাটা ভুল। ঠিক, জওহরলালের জীবদ্দশায় শিক্ষায় রাজনীতি আজকের মতো অমার্জিত ও ব্যাপক ছিল না। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধীর আমলে তা যথেষ্টই ব্যাপক হয়ে ওঠে। উদাহরণত, ১৯৮২ সালে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত ভগৎ সিং কলেজ, রাজধানী কলেজ, মতিলাল নেহরু কলেজ, মিরান্ডা হাউস ইত্যাদিতে অধ্যক্ষ নিয়োগ নিয়ে কংগ্রেস (আই)-এর হস্তক্ষেপের স্পষ্ট অভিযোগ ওঠে।[৬৬] খাস রাজধানীতে ঘটা নষ্টামো বহুগুণ বেড়ে গিয়ে কালক্রমে রাজ্যগুলোকে গ্রাস করবেই।

পশ্চিমবঙ্গে উচ্চশিক্ষায় স্বাধিকার হরণের নাম "গণতন্ত্রীকরণ"। এই প্রক্রিয়ায় প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহর আইনসভা ও কর্মসমিতিগুলোকে পার্টিকর্মী ও সমর্থক দিয়ে ভরিয়ে ফেলা হয়েছে। একজন ভুক্তভোগীর দৃষ্টিতে "এর ফলে অযোগ্য এবং অপরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তির রাজনীতিবিদরা এবং আড়ালে থাকা আমলারা বিশ্ববিদ্যালয়-সংক্রান্ত সমস্ত প্রধান প্রধান সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনসভা ও কর্মসমিতিতে তাদের প্রতিনিধি ও সহযোগীদের মাধ্যমে কার্যকর করে চলেছেন। ....গণতন্ত্রীকরণের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতি, অসাধুতা ও কর্তব্যে অবহেলা তিরিশ-চল্লিশ বছর আগের তুলনায় অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে, শিক্ষার মানও নেমে গেছে। উন্নত দেশগুলির....বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যায় ও অসততার নির্মম ও দ্রুত দণ্ড হয়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনভঙ্গকারীদের কেবল ক্ষমা করাই হয় না, প্রায়শই পুরস্কৃত করা হয় ....অধিকাংশ ক্ষেত্রে অযোগ্যতাকে উৎসাহদানও করা হয়। সবাচাইতে নিন্দনীয়, পঠনপাঠন-গবেষণা ক্ষেত্রে মিথ্যা দাবি করে শিক্ষকরা শাস্তি থেকে কেবল অব্যাহতিই পান না, অনেক ক্ষেত্রে এই মিথ্যা দাবির ভিত্তিতে তাদের পদোন্নতিও হয়। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও গণতন্ত্রীকরণের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ যাদের হাতে চলে গেছে, আইনভঙ্গকারী ও অনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত শিক্ষকদের অধিকাংশই তাদের ছত্রচ্ছায়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করছেন এবং আশ্রয় ও প্রশ্রয় পাচ্ছেন।"[৬৭]

ঐতিহাসিকরা বলুন, এই পচনের সূত্রপাত কোথায়? সেটা ভবিষ্যতে সংস্কারকদের জেনে নিয়ে কাজে হাত দিতে হবে। তবে ছাব্বিশ বছর আগে ফিলিপ অল্টবাক লিখেছিলেন, ভারতীয় রাজনীতি গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব-বিদীর্ণ। সেই দ্বন্দ্ব দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে আক্ষরিক অর্থে খণ্ড খণ্ড করে ফেলেছে ("literally torn apart") এবং সংস্কার ও উদ্ভাবনী পরিকল্পনা রূপায়ণ তো বটেই এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কাজকর্মও অসম্ভব করে

তুলেছে।[১৯] কালক্রমে সেই বিবাদ বেড়ে ওঠে উচ্চশিক্ষা-সমাজকে ফুটিফাটা করে ফেলেছে। বিবাদ কেবল ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষর সঙ্গে অধস্তনদের নয়। বিবাদ অধ্যক্ষ তথা উপাচার্যর পক্ষে-বিপক্ষে গোষ্ঠীবদ্ধ শিক্ষক-ছাত্র ও শিক্ষাকর্মীদের মধ্যে। বিবাদ একই গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যেও।

তথ্যপঞ্জি

১। Reprot of the Secondary Education Commission (October, 1952—June, 1953) Ministry of Education and Social Welfare, Government of India, New Delhi, 1977, Pp 15-19.

২। Myron Weiner, "India's Case against Compulosry Education," in **Seminar** 413, January 1994, New Delhi-110001, Pp. 83 ff.

৩। সম্প্রতি এক সভায় জনশিক্ষা দপ্তরে সচিব কল্যাণী চৌধুরি ওই দপ্তরের মন্ত্রী অঞ্জু করের উপস্থিতিতে বলেন যে, সারা ভারতের সাক্ষরতার বিচারে পশ্চিমবঙ্গর লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যাওয়া উচিত। সাক্ষরতায় সারা দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ১৮তম। মন্ত্রী নিজে বলেন, "এতে লজ্জা কী আছে! এ ক'বছরে আমরা গোটা রাজ্যে ৭৮ লক্ষ মানুষকে সাক্ষর করে তুলেছি। এটা কম বড় সাফল্য নয়।" বর্তমান, ৩১ মে ১৯৯৭।

আর এক সভায় স্কুলশিক্ষা মন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস বলেন, "শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের রাজ্য ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছে। স্বাধীনতার পর আমরা ছিলাম দ্বিতীয় স্থানে, এখন নেমে গেছি বহু নীচে।" বর্তমান ৪ জুন ১৯৯৭।

৪। Samir Guha Ray ISI, Subir Kumar Mitra ISI. Syrja Sankar Ray SCERT, W B., **Achievement Level of Primary School Children at the End of Class IV**, Indian Statistical Institute Calcutta, & State Council of Educational Research and Training, West Bengal, February 1995. Pp. 2f.

৫। সচ্চিদানন্দ দত্ত রায়, **পশ্চিমবঙ্গবাসী**, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ ২১।

৬। Report of the Education Commission (August 1992), Government of West Bengal, p. 148.

৭। Jean Dreze and Amartya Sen INDIA : Economic Development and Social Opportunity, Oxford University Press, Delhi, 1996, Pp 116-123.

৮। I bid. pp. 121f.

৯। **The State of India's Economy (1994-95)**, Public Interest Research Group 1995. Pp 84.

১০। Repoet of the Secondary Education Commission, উল্লিখিত। p. 292.

১১। মনোরমা ইয়ারবুক ১৯৯৭। পৃ ৫৭১।

১২। জ্যোতি বসু, **বামফ্রন্ট সরকার : ১৫ বৎসর**, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ ৪০।

১৩। **পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাচিত্র : তখন ও এখন**, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯৬।

১৪। **West Bengal at a Glance**, Information and Cultural Affairs Department, Government of West Bengal, December, 1994.

১৫। Report of the Education Commission (W.B.) উল্লিখিত, p. 52.

১৬। I bid. p 52.

১৭। Seminar 450, February 1997. p. 43.

১৮। I bid, Pp. 43f.

১৯। Report of the Commission for Planning of Higher Education in West Bengal, Government of West Bengal, Department of Higher Education, April 1984, Pp 161-163

২০। সি পি আই (এম)-এর প্রয়াত নেতা প্রমোদ দাশগুপ্ত বলেছিলেন, চাষীর সন্তান উচ্চশিক্ষা নেবে না, তাই তার ওপরে ইংরেজি চাপানো অন্যায়। দত্ত কমিশনের পরামর্শ মেনে তৃতীয় শ্রেণী থেকে ইংরেজি পড়ালে প্রমোদবাবুর কথা অমান্য করা হত না।

২১। সুনন্দ সান্যাল, "পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থা", দেশ, ৮ এপ্রিল ১৯৯৫, পৃ ৯১ ৯২

২২। বামফ্রন্ট সরকার, উল্লিখিত, পৃ ৪১, ৪২।

২৩। বর্তমান ২৭ মে ১৯৯৭।

২৪। Raghabendra Chattapadhyay, quoted in Sekhar Chatterjee, "Primary Education", The Statesman, Calcutta, 3 & 4 March, 1997.

২৫। Report of the Education Commission (W B) উল্লিখিত। P 41

২৬। Professor D S Kothari, Chairman, University Grants Commission, New Delhi, 1970 (Reproduced from **The Times** (London), (supplemet on INDIA A Special Report) January, 26, 1968

(উল্লেখ্য ইউ জি সি-র Annual Report for the year 1994-95-এ কলেজের সংখ্যা ৫০০ বলা হয়েছে। আবার Report of the Commitee for Review of National Policy on Education, 1986 (Final Reoprt, 26 December 1990)-এ বলা হয়েছে যে স্বাধীনতার সময় ২৫টি বিশ্ববিদ্যালয়, ৭০০টি কলেজ আর দুই লক্ষ ছাত্রছাত্রী ছিল।

২৭। UGC Annual Report (1994-95).

২৮। Challenge of Education, উল্লিখিত, Pp. 19f

২৯। UGC Annual Report (1994-95) Pp. 13f.

৩০। I bid. P. 14.

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর শেষ-লগ্নে আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়-তুল্য প্রতিষ্ঠানের (deemed university) সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২২৮টি। এ পর্যন্ত পাওয়া তথ্যে দেখছি, ১৯৯৬-৯৭ সালে কলেজের সংখ্যা ৮২০০টি এবং সেখানে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রী ছিল ৬০,০০০০ জন।

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোট শিক্ষক-সংখ্যা ১৯৯৬-৯৭ সালে দাঁড়িয়েছিল প্রায় ৩০০,০০০। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে পড়াচ্ছেন ৯০৯৯ জন প্রোফেসর, ১৮,৬২৪ জন রিডার এবং ৪০,৫১৮ জন লেকচারার। আর কলেজ স্তরে পড়াচ্ছেন অধ্যক্ষ, প্রোফেসর, রিডার এবং সিনিয়র লেকচারার মিলে ৩৩,২৮৯ জন এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোফেসর ও অ্যাসিস্ট্যান্ট লেকচারার মিলে মোট ১৯৫,৬৬২ জন।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত রাস্তোগি কমিটি ২১শে নভেম্বর ১৯৯৭ তারিখে রিপোর্ট পেশ করে তার জের ধরে অনেক বাদানুবাদ ও কর্মবিরতির পর, উচ্চশিক্ষা স্তরের শিক্ষকদের বেতন এতটাই বাড়ানো হচ্ছে যে তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে বাড়তি ৩৫,০০০ কোটি টাকা ব্যয় করতে হবে। উল্লেখ্য, শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দায়বদ্ধতা (accountabily) নিশ্চিত করার ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায়নি, যদিও তার প্রয়োজন কতখানি তা প্রমাণ করতে কেবল বিহারের উদাহরণই যথেষ্ট। সেখানে লেকচারের সংখ্যার চেয়ে প্রোফেসরের সংখ্যা বেশি। তবু বিহারে গোটা শিক্ষাব্যবস্থাই বিপন্ন।

৩১। Dr M R Srinivasan, "Growth of Science and Technology in Post-Independence Era" in **Yojana**, January 1997. Pp. 14ff.

৩২। Report of the Commission for Review of National Policy on Education, উল্লিখিত, P. 218

৩৩। Public Interest Research Group, উল্লিখিত, Pp. 88.

৩৪। Challenge of Education, উল্লিখিত। Pp. 47f.

৩৫। Annual Report of the Department of Higher Education (1995-96), Govt of West Bengal, P. 44.

৩৬। The Indian Express, New Delhi, 17 July 1982

৩৭। সিদ্ধার্থ রায়, "বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বরূপ ও সংকট", বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী, অক্টোবর-ডিসেম্বর, 1996, P 252, Lake Town, Block A, Calcutta 700 089, পৃ. ৭।

উল্লেখ্য, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সর্বভারতীয় সংগঠন AIFUCTO'-র সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মৃণ্ময় ভট্টাচার্যের মতে পশ্চিমবঙ্গের ৭০ ৮০ শতাংশ কলেজ রুগ্ণ, এবং সেগুলোর অধিকাংশই দলীয় রাজনীতির প্রয়োজনে স্থাপিত। আনন্দবাজার, ৪ জুন ১৯৯৭।

৩৮। Philip G Altbach, "Problems of University Reform - Comparative Perspectives for the Seventies, ed Philip G Altbach Schenkman Publishing Company, Cambridge, Massachusetts, 1974, Pp. 78f

৩৯। "Teaching the Teacher : Interview with D S Kothari by Sunanda Sanyal", The Statesman, Calcutta, 20 May 1984

তা রা প দ মৃ ধা

অসংগঠিত মহিলা শ্রমিক

অসংগঠিত মহিলা শ্রমিক কারা

পুরুষ ও মহিলা একই গাড়ির দুই চাকার মত। একজন ছাড়া, আরেক জনের জীবন অসম্পূর্ণ। পুরুষ কিংবা মহিলা কখনোই নিজেদেরকে পূর্ণরূপে বিকশিত করতে পারে না, যদি তারা বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করে। এরা একে অপরের ব্যক্তিত্ব প্রকাশের জন্য একে অপরকে সাহায্য করে থাকে। একে অপরের সাহায্য ছাড়া চলতে পারে না, একে অপরের সাহায্য না পেলে কোনো মানুষ সমষ্টিগতভাবে কিছুতেই এগোতেই পারে না — এই কথা ভেবেই বিবাহ পদ্ধতি সৃষ্টি হয়েছিল। সমাজবদ্ধ জীবনযাপন করার জন্য মানুষ যে সব প্রতিষ্ঠিত আচার ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে তার মধ্যে বিবাহ ও পরিবার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাচীন এবং গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে পরিবারই একমাত্র ব্যবস্থা যা ইন্দ্রিয়সর্বস্ব জীবকে মনুষ্য পদবাচ্য করে তোলে। আরেকটি দিক থেকেও এটা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিবাহের মাধ্যমে পরিবার গঠন না করলে মনুষ্যজাতি সম্ভবত এতদিনে বর্তমান উন্নত পর্যায়ে পৌঁছুতে পারত না।

কেবলমাত্র বাঁচার তাগিদেই মানুষকে পরিবার গঠন করতে হয়েছে। আর এই পরিবারের মধ্যে থেকেই সমষ্টিগতভাবে সকলকে চেষ্টা করতে হচ্ছে ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করার জন্য। ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতে হলে সমাজের লোকদের নানারকম উৎপাদনে অংশগ্রহণ করতে হয়। ফলমূল, আহরণ, পশু-পাখি থেকে আরম্ভ করে বৃহদায়তন কলকারখানায় খাদ্যসামগ্রী ও যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সবকিছুই এর অন্তর্ভুক্ত। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এইসব উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে শ্রমবিভাজন রয়েছে। অনেক সমাজে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কাজের ভাগ থাকে। সাধারণত, ভারী কাজ পুরুষরা করে এবং অপেক্ষাকৃত হালকা কাজ মেয়েরা করে। গৃহস্থালীর কাজ মেয়েদের এবং বাইরের কাজ পুরুষদের। এইভাবে সমাজের এবং সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনধারার জটিলতা বাড়ছে এবং অর্থনৈতিক সমস্যাও বাড়ছে। তাই নারী-পুরুষের মিলিত রোজগার ছাড়া সংসার নির্বাহ করা কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে আর ক্রমশ নারীরা আরও বেশি পরিমাণে ঘরের বাইরে পা রাখতে বাধ্য হচ্ছে। বিশেষ করে অনুন্নত সম্প্রদায়ের ঘরের মেয়েদের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, এই সব সম্প্রদায়ের মহিলারা গ্রামে ও শহরে বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত। কেউ নিযুক্ত সংগঠিত প্রতিষ্ঠানে (Organised Sector) এবং কেউ নিযুক্ত অসংগঠিত প্রতিষ্ঠানে (Unorganised Sector)। কর্মরত মহিলাদের মধ্যে সংগঠিত

প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছে শতকরা ২২-২৩ জন মহিলা এবং অসংগঠিত প্রতিষ্ঠানে যুক্ত আছে শতকরা ৭৭ ৭৮ জন মহিলা। সংগঠিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মহিলাদের সংগঠিত মহিলা কর্মী এবং অসংগঠিত প্রতিষ্ঠানে বা মালিকানায় কর্মরত মহিলাদের অসংগঠিত মহিলা কর্মী (Unorganised Female Workers) বলা হয়। অসংগঠিত মহিলা কর্মীরা বিচিত্র রকম বৃত্তিতে নিযুক্ত। সংগঠিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মহিলারা কোনও না কোন নির্দিষ্ট ব্যাপারে দক্ষ এবং অসংগঠিত মহিলা কর্মীরা বিভিন্ন ধরনের কাজ করে থাকেন। তাদের যখন যেমন কাজ জোটে তখন তেমন কাজ করতে হয়। কেউ কৃষিকাজ, কেউ রাজমিস্ত্রির জোগাড়ের কাজ, কেউ কোনো দোকানে বা অফিসে ঘর মোছা, থালাবাসন ধোওয়া ইত্যাদি কাজ করে। তবে বেশির ভাগ মহিলা নিযুক্ত আছে ঝি-এর কাজে। সাতসকালে ঘর ছেড়ে বের হয়, এবং বাবুদের বাড়িতে ঝি-এর কাজকর্ম সেরে সন্ধ্যার আগেই রওনা হয় ঘরের দিকে। কেউ পৌঁছায় সন্ধের অন্ধকার ঘনিয়ে আসার আগে, আর কেউ বা পৌঁছায় রাত ৭-৮টায়। তারপর নিজের ঘর গৃহস্থালীর কাজ সেরে বাচ্চাকাচ্চা, স্বামী শ্বশুরদের সামলে রাতের জন্য কয়েক ঘণ্টা একটু বিশ্রাম নেওয়ার চেষ্টা করে। কোন রাতে ভাল ঘুম হয়, কোন রাতে ভাল ঘুম হয় না। কারণ ভাল ঘুম ঘুমাতে গিয়ে যদি চেতনা না হয় তাহলে বাবুর বাড়িতে যেতে দেরি হবে এবং বকা খেতে হবে।

এইরকম জীবিকায় নিযুক্ত অসংগঠিত মহিলার সংখ্যা যারা ট্রেনে যাতায়াত করেন, তাদের চোখে হামেশায় পড়ে। বিশেষ করে শিয়ালদহ দক্ষিণের (Sealdah South Section) ট্রেন যাত্রাপথে এদের আনাগোনা সবচেয়ে বেশি। ভোরের লক্ষ্মীকান্তপুর, ডায়মন্ডহারবার ও বারুইপুরের কলকাতাগামী ট্রেনে এদেরই জন্য সব আসন সংরক্ষিত। আসন সংরক্ষিত বললে ভুল হবে। পুরো ট্রেনের কামরাগুলোতে তিল ধারণের জায়গা থাকে না, এদের জন্য। আর, ক্যানিং লাইনের ভোরের আপ ট্রেনের বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এইসব মহিলা কর্মী এত বেশি পরিমাণে ট্রেনে ওঠেন যে, অনেক সময় ট্রেনের ভিতরে যাওয়া তো দূরের কথা ট্রেনের কামরার গেটে একটা আঙুলও গলানো যায় না। এইসব ট্রেনে চড়তে আমাদের মত বাবুদের বড় কষ্ট হয় — বড় লজ্জা হয়। কেউবা চিৎকার করে বলে ওঠেন — এদের জ্বালায় ট্রেনে ওঠা দায় হয়েছে, টিকিটও কাটবে না, ট্রেনে উঠলে বসার জায়গাও ছাড়বে না। অথচ যে বাবু এরকম কথা বলেন, তিনি যদি কোনও মণ্ডল বা কোনও সর্দার হন, তাহলে ট্রেনে খুঁজলে হয়তো কোনো না কোনো কামরায় তার আত্মীয়কে ঝি হিসেবে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। আর তিনি যদি কোনো গাঙ্গুলি, ব্যানার্জি, চক্রবর্তী বা দত্তবাবু হন তাহলে বলা যায় এই ঝি-রা যেমন মণ্ডল বা সর্দারদের লজ্জার কারণ তেমনি গাঙ্গুলি, ব্যানার্জি, চক্রবর্তী ও দত্তদেরও। এই ঝি-রাই হল, আলোচ্য অসংগঠিত মহিলা শ্রমিকদের একটা বড় অংশ।

পশ্চাদ্‌পট

আদিম মানুষের জীবন-যাপন প্রণালী আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই আদিম মানুষ নিম্ন প্রত্নপ্রস্তর যুগে নদীতীরবর্তী অঞ্চলে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বসবাস করত। ছোট ছোট শিকারী পুরষের দল তাদের প্রয়োজনীয় পাথরের হাতিয়ার নিয়ে যাযাবরের মত ঘুরে ঘুরে শিকার করত। আর মহিলারা বনে-জঙ্গলে লতাপাতা ফল-মূল, বুনো শস্যাদির সন্ধানে ঘুরে বেড়াতো। বর্তমান যুগে বিহারের পালামৌ-এর কিষাণ, বিরজিয়া, মেদিনীপুরের লোধা, সাঁওতাল-মুণ্ডা, আন্দামান, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের ওঙ্গে, জারোয়া, সেন্টিনেল প্রভৃতি আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে সেই পুরনো প্রস্তর যুগের মানুষের

সংস্কৃতি দেখা যায়। এত আধুনিক সভ্যতার মুখোমুখি দাঁড়িয়েও সমাজের একধারে সেই আদিম সংস্কৃতি এখনো দেখা যায়। শুধু আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে যে এই সংস্কৃতি দেখা যায় তা নয়। তার প্রমাণ মেলে কলকাতার ১০ কিলোমিটারের মধ্যে বসবাসকারী আদিবাসী সম্প্রদায় ও তপশিলি সম্প্রদায় ছাড়া আরও কিছু অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে। শুধু বেঁচে থাকাটাই তাদের কাছে জীবন এবং স্বপ্ন। এই জীবন জীব-জন্তুর জীবনেব সঙ্গে অনেকাংশে মিলে যায়। বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে একশ্রেণীর লোকদের মধ্যে জীবন চালানোটা একটা জ্বলন্ত সমস্যা। আধুনিক সভ্যতার কোনো আলো তারা পান না — চানও না। তারা জানেন না তাদের অধিকার বা প্রাপ্য কতটুকু।

জীবনের শুরুটা হয় জ্বলন্ত সমস্যা দিয়ে। এইসব পরিবারে যখন কোনো সন্তান জন্মায় তখন তার ভবিষ্যৎ লেখা হয়ে যায়। তার জীবনে কোনো শিক্ষার আলো প্রবেশ করাতে পারেন না তাদের বাবা-মায়েরা, তাই একটু হাঁটতে-চলতে শিখলেই শেখানো হয় কি করে বেঁচে থাকার রসদ জোগাতে হবে তার পথের কথা। যদি পুত্রসন্তান হয় তাহলে তার যা জীবনের পরিণতি দাঁড়ায় কন্যাসন্তান হলে তার পরিণতি দাঁড়ায় আরও ভয়াবহ। বাবা-মায়েরা কোনো রকমে ধরেবেঁধে বিয়ে নামক গাঁটবন্ধন বেঁধে ছেড়ে দেন। মনে হয় বিপদের হাত থেকে মুক্ত। আসলে মুক্তির নামে বন্ধনের কঠিন জালে জড়িয়ে পড়েন এই সব বাবা-মায়েরা। একটি মেয়ে সংসার থেকে কমিয়ে তৈরি করে দেন আরও একটি সংসার। সে সংসার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই চলে না।

অগ্রসর ও পদার্পণ

তাই ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য ছেলেরা প্রাণপণ লড়াই করে যখন হিমসিম খান তখন তাদের বাচ্চার মুখের দিকে তাকিয়ে তাদের মায়েরাও বেরিয়ে পড়েন রোজগারের আশায় — ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়। রোজগার করা মানে সহজ পথে ঝি-বৃত্তি করা বা রাজমিস্ত্রির জোগাড় দেওয়া বা ক্ষেতে-খামারে দিনমজুরের কাজ করা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ইটভাটায় কাজ করা।

শুরু হয় আসল জীবন — ঠিক তার মায়ের জীবনের মত। বাড়িতে তার যে ছেলেমেয়েরা থাকে তাদেরকে অভিভাকহীনভাবে ফেলে বেরিয়ে পড়েন, ভোর চারটে বা পাঁচটায়। কখনো হয়ত এক মুঠো রান্না করে দিয়ে আসেন, কখনো বা নিজেদের রান্নাটা নিজেরা সেরে নেয়। এইভাবে সারাটা দিন চলে যায় কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে, সাকুল্যে জোটে দৈনিক গড়ে ১০ থেকে ২০ টাকা, আর হয়তো বা একটু টিফিন।

সারাটা দিন বাচ্চারা একা একা থাকে। যার ফলস্বরূপ তারা আর মা-বাবার স্নেহ-মায়া-মমতা যেমন পায় না, তেমনি পায় না লেখাপড়া শেখার সুযোগ। আস্তে আস্তে তাদের ছেলেরা তৈরি হয় মুটে মজুর আর মেয়েরা মায়ের জীবনাদর্শ অনুসরণ করে হয় আর এক একটি ঝি বা অসংগঠিত মহিলা কর্মী।

দিনযাপন

মানুষের সংগ্রাম প্রবৃত্তি অপেক্ষাকৃত প্রবল। তার থেকে এই অসংগঠিত মহিলারও পিছিয়ে নেই। দিনযাপন করার জন্য প্রত্যেক মানুষের মত একজন মহিলারও প্রয়োজন দুরকমের। দৈহিক প্রয়োজন চরিতার্থ করার জন্য লাগে বায়ু, জল, খাদ্য, আশ্রয় ও বিশ্রাম এবং মানসিক প্রয়োজন চরিতার্থ করার জন্য লাগে অপরের কাছ থেকে স্নেহ, ভালোবাসা, গুণের স্বীকৃতি, প্রশংসা লাভ করা, বিভিন্ন সৃষ্টিমূলক কাজ-কর্মের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করা,

কৌতূহল নিবৃত্ত করবার জন্য পরিবেশে জানবার ও বোঝবার চেষ্টা, দুঃসাহসিক কর্মপ্রচেষ্টা, নানা প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করা ও চিন্তা করার স্বাধীনতা অর্জন করা। অন্যভাবে বলা যায় একজন মহিলা শুধু এ সবেতে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না বা শুধুমাত্র এর দ্বারা নিজের মানসিক প্রয়োজন মিটে যায় না। নিজের পাওনার সঙ্গে সঙ্গে নিজে যা যা পাচ্ছেন তা অন্যকে দান করাও তার মানসিক প্রয়োজনের ক্ষুধা মেটায়। প্রত্যেক পুরুষের মতো প্রত্যেক মহিলাই বিষয়বুদ্ধি নিয়ে আপন সিদ্ধি খোঁজেন, সেখানে আপন ব্যক্তিগত জীবনযাত্রা নির্বাহে তার জ্ঞান ও তার কর্ম তার রচনা শক্তি একান্ত ব্যাপৃত। কিন্তু বিষয়বুদ্ধি নিয়ে যখন অসংগঠিত মহিলারা তাদের জীবন-যাপনের মাধ্যমে নিজ নিজ সিদ্ধি খোঁজেন তখন চারিদিকে শুধু অন্ধকার দেখেন। সেখানে তারা প্রায় একটা নগণ্য জীবরূপে বেঁচে আছেন। দৈহিক প্রয়োজনের প্রথম ধাপে মানুষের যেটা প্রথম দরকার তা হল বায়ু, খাদ্য, পানীয় বা বাসস্থান। বায়ুর মলিকানা এখনও নির্ধারিত হয়নি, তাই বায়ু কেউ কম বা কেউ বেশি নেবে এরকম হয় না। এখানেই সামাজিক ন্যায়বিচারের ব্যাপারটা সার্থক। কিন্তু খাদ্য, পানীয় ও বাসস্থানের কথা এলেই প্রথমে এসে যায় বস্তুগত সংস্কৃতির (material culture) কথা। এই বস্তুগত সংস্কৃতির ব্যাপারটা অল্পকথায় আলোচনা করা একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে খুব দুরূহ ব্যাপার। একমাত্র একজন নৃতত্ত্ববিদ এ ব্যাপারে আলোকপাত করতে পারেন।

তাই এখানে কলকাতায় কাজ করতে আসা ১০০ জন অসংগঠিত মহিলা কর্মীর জীবন-যাবনের উপর যে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তার উপর আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হল।

সারণী ১ : পরিবারের ধরন (১০০টির মধ্যে)

দম্পতি কেন্দ্রিক		যৌথ পরিবার		মিশ্র পরিবার	
সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
৯৬	৯৬%	৪	৪%	০	—

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে ১০০ জন অসংগঠিত মহিলা কর্মীর মধ্যে ৯৬ জন বাস করেন দম্পতি কেন্দ্রিক পরিবারে এবং ৪ জন বাস করেন যৌথ পরিবারে। মিশ্র পরিবারে একজনও বাস করেন না। প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলে যেটা বোঝা যাচ্ছে তা থেকে পরিষ্কার যে সমাজ জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন ঘটছে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই একান্নবর্তী পরিবারে (Nuclear Family) পরিবর্তিত হয়েছে। তবে যে কারণগুলো এই পরিবারগুলো ভাঙনের জন্য দায়ী তা হল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অভাবনীয় উন্নতি। শিল্পায়নের প্রভাব এবং নগরায়নের প্রভাব ও অর্থনৈতিক অসাম্য এর জন্য দায়ী। সংসারের অভাব-অনটনের মধ্যে যদি সংসারে লোকসংখ্যা বেশি থাকে তাহলে ঝগড়া গণ্ডগোল অশান্তি লেগেই থাকে। যারা রোজগার করেন তারা এই অশান্তি পছন্দ করেন না। একটু সচ্ছলতার জন্য নিজেদের ছেলেমেয়ে নিয়ে আলাদা করে দম্পতি কেন্দ্রিক পরিবার গড়ে তোলেন। শুধু যে উপার্জনকারী ব্যক্তিরাই কেবল একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে ফেলার জন্য দায়ী তা নয়। অনেক ক্ষেত্রে উপার্জন করেন না এমন ব্যক্তিরাও দায়ী থাকেন। সংসারের খুঁটিনাটি কথায় তারা তিলকে তাল করে তোলেন এবং কোনওভাবেই নিজেদেরকে মানিয়ে নিতে পারেন না। এসিব ক্ষেত্রে মহিলাদের ভূমিকা অনেক ক্ষেত্রে থাকলেও, এই ১০০ জন মহিলার ক্ষেত্রে সেরকম ঘটনা একটাও ঘটেনি — কারণ এইসব মহিলাদের এরকম পরিবারের ক্ষেত্রে কোনও বক্তব্যকেই পুরুষরা গুরুত্ব দেন না।

সারণী ২ : বাসস্থান/ঘরবাড়ি

নিজেদের বাড়ি		ভাড়া বাড়ি		খাসজমিতে বাড়ি	
সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
৮৪	৮৪%	১০	১০%	৬	৬%

সারণী ৩ : জমির পরিমাণ

জমি নেই		২ কাঠার মধ্যে		৫ কাঠার মধ্যে		৫ কাঠার বেশি	
সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
১৬	১৬%	৫৯	৫৯%	২১	২১%	৪	৪%

দৈহিক প্রয়োজনের মধ্যে বিশ্রাম-এর কথা বলতে গেলে সময় ও আশ্রয়স্থল-এর কথা এসে যায়। আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে এই সব মহিলাদের বিশ্রাম বলতে বোঝায় রাতের ঘুম — খুব বেশি হলে রাত ১০টা থেকে শুরু করে ভোর ৪টে পর্যন্ত অর্থাৎ মোট ৬ ঘণ্টার মধ্যে।

এর মধ্যে যে ৮৪ জনের নিজের জায়গায় নিজের বাড়ি আছে এবং ৬ জনের খাস জায়গায় নিজের বাড়ি আছে তাঁরা কেবল স্বামী ও ছেলেমেয়ে নিয়ে রাতের ঘুমটা নিশ্চিন্তে সারার চেষ্টা করেন। বাকি ১০ জনের ঘুমটা অনেক সময় নিশ্চিন্তে সারার চেষ্টা করাও বৃথা হয়। কারণ বাড়িওয়ালার জ্বালা যন্ত্রণা থাকে। অনেক সময় ভাড়ার টাকা না মেটাতে পারায়, তলপি তলপা নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এসে নতুন আস্তানার সন্ধান করতে হয়।

সারণী ৪ : বৈদ্যুতিক সংযোগ

বৈদ্যুতিক সংযোগ নেই		বৈদ্যুতিক সংযোগ আছে	
সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
৯৮	৯৮%	২	২%

৪ নং সারণী থেকে আরও দেখা যাচ্ছে যে ১০০ জনের মধ্যে ৯৮ জনের পরিবারে বৈদ্যুতিক সংযোগ নেই। তাই সন্ধে হতে না হতে টেমির আলো জ্বালতে হয়। কারো কারো ঘরে টেমির বদলে হ্যারিকেন বা টেবিল ল্যাম্পের ব্যবস্থা আছে। এই আলো খুব বেশি সময় ধরে জ্বেলে রাখা যায় না কারণ কেরোসিনের অভাব। গরমকালের কথা ভাবলে আমাদের হয়তো ঘামে চান হয়ে যাওয়ার উপক্রম হবে। ঘুটঘুটে অন্ধকারে বদ্ধ ঘরে বাতাসহীন অবস্থায় বিশ্রামের সময় কাটে।

এরপরে আসে খাদ্য ও পানীয়ের কথা। ৩নং সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে ১০০ জন মহিলার পরিবারের মধ্যে ১৬ জনের জমি নেই, ৫৯ জনের জমি আছে ২ কাঠার মধ্যে, ২১ জনের জমি আছে ৫ কাঠার মধ্যে ও ৪ জনের জমি আছে ৫ কাঠার বেশি। অতএব এটা পরিষ্কার যে ৯৬ জনের চাষের জমি নেই। বাকি চারজনের পরিবারের যে জমি আছে তাতে ধান চাষ করা যায় না। ঘরবাড়ি তৈরি করার পর যেটুকু জমি থাকে তাতে একটু আধটু শাক-সবজি চাষ করা হয়।

সারণী ৫ : স্বামীর/বাবার বৃত্তি

চাকুরিজীবী		চাষী		দিনমজুর		মন্তব্য
সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	চাষীরা ভাগ চাষ করেন এবং
০	—	৬	৬%	৯০%	৯০%	৪ জন বিধবার সংসার আলাদা

৫ নং সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে ৬ জনের বৃত্তি কৃষিকাজ। তবে এদের নিজেদের ধান চাষের মত জমি যেহেতু নেই সেহেতু এরা বাইরের জমি ভাগে চাষ করেন।

সারণী ৬ : নিজের আয় (১ মাসে)

৫০০ টাকার কম		৮০০ টাকার কম		১০০০ টাকার কম	
সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
৩১	৩১%	৫৭	৫৭%	১২	১২%

১০০ জন মহিলার মধ্যে ৩১ জন আয় করেন ৫০০ টাকার কম, ৫৭ জনের আয় ৮০০ টাকার কম, ১২ জনের আয় ১০০০ টাকার কম ও ১০০০ টাকার বেশি, কারো রোজগার নেই। পরিবারের আয়ের কথা (সারণী নং ৭) বলতে গেলে দেখা যায় —

সারণী ৭ : পরিবারের আয়

৫০১ টাকার মধ্যে		১০০১ টাকার মধ্যে		২০০১ টাকার মধ্যে		২০০১ টাকার বেশি	
সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
৬	৬%	৪৩	৪৩%	৪৬	৪৬%	৫	৫%

১০০১ টাকার মধ্যে আয় করেন ৪৯ জন, ২০০১ টাকার মধ্যে আয় করেন ৪৬ জন, ২০০১ টাকার বেশি আয় করেন ৫ জন। এই পাঁচজনের ২০০১ টাকার বেশি আয় হওয়ার কারণ ভাগ চাষ। নিজেদের জমি না থাকলেও এরা অন্যের জমিতে চাষ করেন ভাগ-চাষী হিসেবে এবং অর্ধেক ফসল পান।

সারণী ৮ : পরিবারের সদস্য সংখ্যা

২ জনের মধ্যে		৪ জনের মধ্যে		৬ জনের মধ্যে		৮ জনের মধ্যে		১০ জনের মধ্যে	
সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
১১	১১%	৫০	৫০%	৩২	৩২%	৬	৬%	১	১%

পরিবারের সদস্য সংখ্যার (সারণী নং ৮) দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় ২ জনের মধ্যে সদস্য আছে ১১টি পরিবারের, ৪ জনের মধ্যে আছে ৫০টি পরিবারে, ৬ জনের মধ্যে আছে ৩২টি পরিবারে এবং ১০ জনের মধ্যে আছে ১টি পরিবারে।

পূর্বের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে বেশিরভাগ পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৬ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। জমির পরিমাণ ও পরিবারের আয় থেকে বোঝা যায় যে এই সমস্ত মহিলারা অভাবের তাড়নাতেই ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসেছেন। এদের খাদ্যের তালিকা অতি সাধারণ। দিনে দুবার এরা ভাত ও সবজি খান। কোনও কোনও দিন একটু আধটু মাছ জুটে যায়। সকালে বা সন্ধ্যায় টিফিন জোটে না। কারো, কারো ঘরে আধুনিক সংস্কৃতির হাওয়া এসে যাওয়ায় সকাল বা সন্ধ্যায় দু-এক কাপ চা হয়। আর যে ৪৯ জন মহিলার

পরিবারের আয় ১০০১ টাকার মধ্যে তাদের ক্ষেত্রে অনেকের পরিবারের লোকসংখ্যা ৬ জনের মধ্যে এবং এছাড়া ঘর ভাড়াও আছে। অতএব যাদের ক্ষেত্রে ৫০০-৬০০ টাকা মাসিক আয় আছে, তাদের পরিবারের ক্ষেত্রে দুবেলা খাবার জোটার কথা নয়, হয়ও তাই। আর যে সব পরিবারের সদস্যদের ভাল করে খাবার জোটে না তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ বা গয়না-গাঁটি কি আছে বা কেমন ধরনের হবে তা আমরা অনায়াসেই অনুমান করতে পারি। ১০০ জন মহিলার মধ্যে ১০০ জনই বলেছেন যে তারা তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ কেনার জন্য বাড়ির কর্তাকে বলতে হয় না। কারণ প্রতি বছর পুজোর (দুর্গা পুজো) সময় প্রত্যেকে প্রায় দুটো করে শাড়ি-জামা-কাপড় পেয়ে থাকেন যে সব বাড়িতে কাজ করেন সেখান থেকে। কেউ কেউ তিন বা চার বাড়িতে কাজ করেন বলে ৩টে বা ৪টে শাড়ি পেয়ে থাকেন। এগুলো দিয়েই এদের সারাবছর চলে যায়। আর কাজের টাকা পয়সা দিয়ে টুকটাক এক আধটা জামাকাপড় মনে হলে কেনেন। গয়নার কথা বলতে এদের ক্ষেত্রে যেটা প্রযোজ্য তা হল প্রত্যেকের শরীরে কিছু না কিছু গয়না আছে — তার সবটাই সোনা ছাড়া অন্যান্য ধাতুর। কারো কারো শরীরে তাও নেই। একমাত্র হাতে শাঁখা ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। এইভাবে অতি সাধারণ ও নিম্নমানের পোশাক-পরিচ্ছদের মধ্যে এদের কেটে যায় শীত-গ্রীষ্ম ও বসন্ত।

এরপর আসা যাক মানসিক প্রয়োজনের কথায়। মানসিক প্রয়োজনের কথা বলতে গেলে যেটা প্রথমে বলা দরকার তাহলো স্বাধীনতা মানে স্ত্রী স্বাধীনতা। ৯ নং সারণী থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ১০০ জন মহিলার মধ্যে ১৮ জনের একটু-আধটু কথা বলার স্বাধীনতা আছে। তাদের কথা, তাদের স্বামীরা বা বাড়ির ছেলেরা একটু গুরুত্ব দেন। কিন্তু বাকি ৮২ জনের ক্ষেত্রে নিজের ইচ্ছামত চলাফেরা করার স্বাধীনতা নেই। তারা রোজগার করলেও রোজগারের অর্থ তুলে দিতে হয় স্বামীদের এবং বাড়ির পুরুষদের হাতে। আয় করাই তার মানসিক ক্ষুধা মেটানোর এবং সময় কাটানোর একমাত্র পথ।

সারণী ৯ : স্ত্রী স্বাধীনতা

স্বাধীন		স্বাধীন নয়	
সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
১৮	১৮%	৮২	৮২%

মানসিক প্রয়োজনের সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা হল শিক্ষা। সেই শিক্ষার একটুও আলো এদের মধ্যে প্রবেশ করার সুযোগ পায়নি। ১০নং সারণী থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে ১০০ জন মহিলার মধ্যে ৮৫ জন নিরক্ষর। ১৫ জন শুধুমাত্র সাক্ষর অর্থাৎ এই ১৫ জনের মধ্যে কারো ১ম শ্রেণীর জ্ঞান, কারো ২য় শ্রেণীর জ্ঞান, আর কারো বা ৩য় শ্রেণীর জ্ঞান আছে। একজনও হাইস্কুলে প্রবেশ করার সুযোগ পায়নি। অতএব এই চিত্র থেকে এটা পরিষ্কার যে মানসিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য সৃষ্টিমূলক কাজকর্ম এরা করতে পারেন না, পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করার সুযোগ এদের নেই। কৌতুহল নিবৃত্ত করার উপায়ও এদের নেই কারণ স্বাধীনতা ও শিক্ষার অভাব। স্নেহ, মায়া মমতা, ভালবাসা দেখানো এবং পাওয়ার মাধ্যমে মানসিক প্রয়োজন মেটানোর মত সাধ এদের মধ্যে আছে — তবে সাধ্য অনেকের নেই। এগুলোর জন্য শিক্ষার দরকার না হলেও সময়ের দরকার; সময় না থাকার জন্য সুযোগ এদের জোটে না। মানসিক প্রয়োজনের আর একটা বড় দিক হল আনন্দ ও উপভোগ। এদের ঘরে উপভোগের কোন সামগ্রী নেই। ১০০ জনের মধ্যে ১২ জনের ঘরেও টিভি নেই। তার কারণ নিঃসন্দেহে

আর্থিক অসঙ্গতি এবং দু-একজনের আর্থিক সঙ্গতি থাকলেও বৈদ্যুতিক সংযোগ না থাকার জন্য টিভি চালানোর ব্যাপারটা ভাবা অসম্ভব। অনেকের ঘরে রেডিও আছে। এছাড়া যখন একটু আধটু সময় মেলে তখন কাছাকাছি শহরের সিনেমা হলে এরা যান। কাছাকাছি যখন যাত্রার আসর বসে, তখন সারারাত জেগে সেখানে যাত্রা দেখেন। বছরের বড় উপভোগের সময় হলো দুর্গাপুজো। এ সময়টাতে এরা ৪-৫ দিন করে ছুটি নিয়ে দুর্গাপুজো উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন মেলা প্রাঙ্গণে যান এবং কখনো বা আশেপাশের শহরে দুর্গাপুজোর প্যান্ডেলে গিয়ে আনন্দ উপভোগ করেন। তাছাড়া আর দু-একটি পুজোপার্বণ হয়। সে সময়ও এরা তা উপভোগ করতে চেষ্টা করেন।

সারণী ১০ : শিক্ষার হার

নিরক্ষর		সাক্ষর		১০ম মান	
সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
৮৫	৮৫%	১৫	১৫%	০	—

সামাজিক ন্যায়বিচার

সামাজিক ন্যায়বিচারের কথা এলে আগে এসে যায় সাম্যের কথা। সাম্য স্থাপনের শর্তগুলোর মধ্যে প্রধানতম শর্ত হল সমাজে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সমান মর্যাদার স্বীকৃতি ও আর্থিক সমতা ফিরিয়ে আনা। সমান অধিকার থাকা দরকার রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও।

আর্থিক সমতার অর্থ এটা নয় যে বিভিন্ন মনুষ্যগোষ্ঠীর মধ্যে যে আর্থিক তারতম্য আছে তার সমীকরণ হবে। সমাজে যত পণ্যদ্রব্য উৎপাদিত হয় প্রত্যেকে তার সমান ভাগ পাবে, সকলের উপার্জন সমান হবে, সকলের অভাব বোধ সমান হবে, সকলের উপভোগ করবার ক্ষমতা ও যোগ্যতাও সমান হবে এটা মনে করাও অবাস্তব। অর্থনৈতিক সমতার প্রকৃত অর্থ হল যে জীবন ধারণের জন্য যা ন্যূনতম প্রয়োজন তা প্রাপ্তির উপায় প্রত্যেক মানুষেরই থাকবে। একজন শুধু বেঁচে থাকার জন্য একটা রুটি জোগাড় করতে পারছে না আর একজন বেহিসেবী কালো টাকা নিয়ে রাতকে দিন বানিয়ে ফেলছে। এরকম পরিস্থিতি কখনো কোন প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দেশের পক্ষে শুভ সংকেত নয়।

জীবন ধারণের জন্য মানুষের ন্যূনতম যতটুকু প্রয়োজন তার বাইরে যেটা থাকবে তাতে তারতম্য হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় একজন চাষীর বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য-পানীয় বস্ত্র, স্বাস্থ্যকর আবাস, পরিবেশ, শিক্ষার সুযোগ, চিকিৎসার সংস্থান, নিরাপত্তা ইত্যাদি যেমন দরকার তেমনি একজন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আই. এ. এস, আই. পি. এস বা ডব্লু. বি. সি. এসের জন্যও এগুলো দরকার। এর বাইরে একজন চাষীর যা দরকার বাকিদের তার থেকে অন্যরকম দরকার থাকতে পারে। এরকম ক্ষেত্রে সমতা বিধানের কোন সাধারণ মানদণ্ড নেই। তবে দেখতে হবে কোনো ব্যক্তি অপরকে বঞ্চনা করে নিজের সমৃদ্ধি গঠন করছে কিনা অথবা অসাম্য তীব্র সামাজিক সমস্যায় পরিণত হচ্ছে কিনা। সে সব ক্ষেত্রে সরকারের বিভিন্ন নীতির মাধ্যমে এগুলো নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। অন্যথায় শুভবুদ্ধি সম্পন্নরাই রুখে দাঁড়াবেন। তবেই অর্থনৈতিক সমতা ফিরবে। আর অর্থনৈতিক সমতা না এলে সামাজিক ন্যায়বিচারের কথা ভাবাই যায় না। কারণ অর্থই সমস্ত পরিকল্পনা রূপায়ণের একমাত্র অস্ত্র এবং চাবিকাঠি।

কিন্তু এই অসংগঠিত মহিলাদের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সমতার কথা বলা মানে সমতা নামক ব্যাপারটাকে অসম্মান করা। পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে এদের অর্থনৈতিক

অবস্থার কথা। এরা সারাদিনে ৮ থেকে ১২ ঘণ্টা বাবুদের দোরে দোরে ঘুরে ঘুরে কাজ করে খুব বেশি হলে ১ মাসে রোজাগার করেন ৮০০ ৯০০ টাকা। অন্যদিকে একজন মহিলা সরকারি অফিসে ৮ ঘণ্টা চাকরি করে ১ মাসে রোজগার করেন ৮০০০-৯০০০ টাকা বা তারও বেশি। এর নাম কি সাম্য? এর নাম কি সামাজিক ন্যায়বিচার? না, সাম্য এর নাম নয়। সামাজিক ন্যায়বিচারও এটা নয়। এরকম পরিস্থিতিতে সামাজিক ন্যায়ের কথা ভাবাও যায় না। তাই সমাজে এত অসঙ্গতি, তাই সমাজে এত সমস্যা। একজন মহিলা যখন মান সম্মান নিয়ে সুসভ্য সমাজের অংশীদার হয়ে জীবনে আধুনিক সভ্যতার সমস্তরকম উপভোগ্য বিষয়গুলো উপভোগ করে যাচ্ছেন, তখনই পাশাপাশি একজন অসংগঠিত মহিলা রক্তঝরা পরিশ্রম করতে বাধ্য হচ্ছেন এবং আদিম মানুষের মত জীবনের সংস্কৃতি আঁকড়ে মানুষ হয়ে শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য জীবন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। কি তাদের প্রাপ্য, কি তারা পাচ্ছেন না, কি করে তারা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করবেন, কেমনভাবে বঞ্চনার প্রতিবাদ করবেন, কিছুই জানেন না।

রাজনৈতিক সমতার ক্ষেত্রে বলতে হয় রাজনৈতিক অধিকারসমূহ সমানভাবে উপভোগ্য হবে — কোনো পক্ষপাতিত্ব থাকবে না। এখানে যেসব মহিলার কথা বলা হয়েছে তাদের রাজনৈতিক সমতার মধ্যে আছে, শুধু ভোটের অধিকার। অধিকার আছে খাতা কলমে। ভোটের সময় অনেক ক্ষেত্রে তার মতামত প্রকাশের জন্য ভোটদান কেন্দ্রে যেতেই হয় না। তার হয়ে ভোট অন্য কেউ দিয়ে দেন কারণ দূরদূরান্তের গ্রাম থেকে যদি তারা না এসে পৌঁছাতে পারেন তাহলে ভোট বাক্সে ভোট আশানুরূপ পড়বে না। ভোটে দাঁড়াবার ব্যাপারে ইদানীং যে সংরক্ষণ চালু হয়েছে তার কার্যকরী ফল এদের প্রযোজ্য নয় বরং ব্যাপারটা এদের কাছে স্বপ্ন দেখার মত।

সামাজিক সাম্যের ব্যাপারটাও সামাজিক ন্যয়বিচারের একটা গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি। এই সাম্য তখনই প্রতিষ্ঠিত হয় যখন সমাজের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক নাগরিকই সমাজের নিকট সমান ব্যবহার পায়। এই সমদর্শিতা সামাজিক সাম্যের প্রকৃত নির্দশন। যেসব সমাজে বর্ণবিদ্বেষ আছে, জাত্যাভিমান বা জাতির প্রাধান্য অনুমোদন পায়, যেখানে সুযোগ-সুবিধা ভোগের ব্যাপারে গুণ বা যোগ্যতার পরিবর্তে বংশ গৌরব বা আভিজাত্য প্রশ্রয় পায়, ধনী ব্যক্তি সন্তানের শিক্ষায়, কর্মসংস্থানে নানারূপ সুযোগ উপভোগে বিশেষ বিবেচনা লাভ করে, যেখানে এমন মানুষ আছে যারা অশুচি, অচ্ছুৎ বা অপাংক্তেয় বলে ধিক্কার পায় — সে সমাজ, সে দেশও সে জাতি যে সামাজিক ন্যায় বিচারের পরিপন্থী তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে গণিত বিদ্যার পারদর্শী মহিলার সঙ্গে কি একজন ঝি-এর সমান মর্যাদা পাওয়ার কথা? তা হয়ত নয়। তবে একজন গণিতজ্ঞ ভদ্রমহিলাকে এবং একজন ঝি-কে একই সামাজিক অনুষ্ঠানে ডেকে যদি গণিতজ্ঞ মহিলাকে অতুলনীয় আদর আপ্যায়ন করা হয় এবং আলাদা করে বসিয়ে তার সমস্ত ব্যাপারে নজর রাখা হয় এবং সুবিধা অসুবিধা দেখা হয় এবং পাশাপাশি ঝি-এর কাজ করা মহিলাকে যদি কোনরকম আদর আপ্যায়ন না করা হয় এবং ভাল করে বসতেও না বলা হয় তার মত অপরাধ আর নেই। কোনও সামাজিক অনুষ্ঠান কিন্তু যোগ্যতা মাপার কেন্দ্র নয় — সেখানে সকলে আসেন নিমন্ত্রিত হয়ে। এসব ক্ষেত্রে একজন গণিতজ্ঞ মহিলাও যেমন নিমন্ত্রিত তেমনি ঝিও। দুজনের আদর, আপ্যায়ন একই ধরনের হওয়া উচিত। তবে কোনও সামাজিক ন্যায়বিচারের সেমিনারে যদি বিশেষভাবে আমন্ত্রিত সেমিনারে অংশগ্রহণকারী একজন মানব-বিজ্ঞানী বা সমাজ-বিজ্ঞানী মহিলা আসেন এবং সেমিনারে অংশগ্রহণকারী নয় অথচ দর্শক হিসেবে কোনও অসংগঠিত মহিলা আসেন তবে তাকে সেমিনারে অংশগ্রহণকারীর

মত মর্যাদা দেওয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু ঐ অসংগঠিত মহিলার সঙ্গে যদি অংশগ্রহণকারী মহিলার মত পক্ষপাত করে আদর আপ্যায়ন না করে দর্শকের আসনে বসানো হয় অসংগঠিত মহিলার সঙ্গে, তবেই সামাজিক সাম্য মানা হয়। আমরা তা করি না। কোনও কিছুই এসব নিয়ম মেনে হয় না। সামাজিক অসাম্যের অন্যতম ভয়াবহ দিক হল জাত-পাত ও ধর্ম। ভারতবর্ষের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এই বিষ ঢুকে গেছে। নিরক্ষর মানুষের চেয়ে শিক্ষিত তথা জ্ঞানীগুণী বাবুরাই এই জাতপাতের ব্যাপারটা বড় প্রকটভাবে জিইয়ে রাখতে চাচ্ছেন। ১০০ জন যে অসংগঠিত মহিলাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তাদের প্রত্যেকের ধারণা একই। তারা অবশ্য জাত-পাত ভিত্তিক ব্যাপারটা অত বোঝেন না। তাদের মধ্যে অনেকের কাছে শোনা গেছে বাবুরা রেগে গেলে ছোটলোক, ছোটজাত ইত্যাদি ভাষায় গালাগালি করেন। ট্রেনের কামরায় বাবুদের সঙ্গে প্রায়ই কথা কাটাকাটি হয় এবং হামেশা তারা এমন কথা শোনেন যা থেকে পরিষ্কার তারা বুঝতে পারেন অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ থাকার জন্য এবং খারাপ পোশাক-পরিচ্ছদ পরার জন্য তারা একটা আলাদা জাতে পরিণত হয়েছেন। এইভাবে জাত-পাত ব্যাপারটা এবং অচ্ছুৎ এবং অপাংক্তেয় হয়ে থাকার ব্যাপারটা তাদের কাছে প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে। তাই তারা তথাকথিত ভদ্রবেশী ধনী, সামাজিক সাম্যর পরিপন্থী এইসব বাবুদের থেকে নিজেদের আলাদা মানুষ হিসেবে ভাবতে শিখেছেন — যেটা কোন সুস্থ সমাজ ব্যবস্থার পক্ষে অভিশাপ।

অসংগঠিত মহিলা কর্মীদের সমস্যা

. ভারতবর্ষের একজন নারীর সমস্যা থেকে একজন অসংগঠিত মহিলার সমস্যা আলাদা করে বিচার করা যায়। প্রায় প্রতিটি সমস্যাই সকলের জন্য একরকম। তবুও সমীক্ষার সময় যে সব সমস্যার কথা বেরিয়ে এসেছে এবং যে সব সমস্যা পর্যালোচনা করার পর পাওয়া গেছে তার কথা বলতে গেলে বলতে হয় —

প্রথমত, অসংগঠিত মহিলা কর্মীদের ছদ্ম বা প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব সর্বজনবিদিত। কিন্তু পুরুষ কর্মীর তুলনায় মহিলা কর্মীদের ক্ষেত্রে এই সমস্যা আরও ব্যাপক।

দ্বিতীয়ত, পুরুষ কর্মীর তুলনায় মহিলা কর্মীকে কম পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।

তৃতীয়ত, কর্মস্থলে দায়িত্বপালন করতে গিয়ে নিজের সংসারের দায়িত্ব পালন করা খুবই কষ্টকর হয়ে ওঠে।

চতুর্থত, বিবাহিতা মহিলা কর্মীদের সন্তান পালন করা আর একটি কঠিন সমস্যা। কোনও আত্মীয়া বা নির্ভরযোগ্য লোকের সাহায্যে শিশুর খাওয়া-পরার ব্যবস্থা না হয় হতে পারে ; কিন্তু জাগ্রত অবস্থার বেশিরভাগ সময় মায়ের সান্নিধ্য না পেলে শিশুর মানসিক প্রতিক্রিয়া কি হবে বলা শক্ত।

পঞ্চমত, অবিবাহিতা মহিলা কর্মী ও বিবাহিতা মহিলা কর্মীদের পক্ষে বর্তমান সমাজে নিরাপত্তা নিয়ে একাএকা চলাফেরা করা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভবপর হয় না। চারিদিকের খবর থেকে তার প্রমাণ হিসেবে প্রতিদিনের খবরের কাগজে বিরক্ত করার এবং নারী নিপীড়নের যে খবর প্রকাশিত হয়, অপ্রকাশ থেকে যায় তার থেকে অনেকগুণ বেশি। ১০০ জন মহিলা অসংগঠিত কর্মীর মধ্যে তাদের বাবুর বাড়িতে কাজ করার সময় অসুবিধার ব্যাপারে প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে অনেকে ব্যঙ্গাত্মক হাসি হেসে প্রশ্নটা এড়িয়ে গেছেন। অনেকে বলেছেন — সব কথা আপনাদের বলা যায় না কারণ আপনারা ছেলে। আরো বলেছেন — সব কথা বললে আপনারা যদি খবরের কাগজে টাগজে ছেপে দেন তা হলে আমাদের কাজটাই চলে যাবে।

মর্যাদা : অসংগঠিত মহিলা কর্মী

বর্তমান সমাজে অসংগঠিত মহিলা কর্মীদের মর্যাদার প্রশ্ন আলোচনা করতে গেলে সামগ্রিকভাবে ভারতের সমাজে নারীদের স্থান বা মর্যাদার প্রশ্ন চলে আসে। বর্তমানে ভারতবর্ষের সমাজে নারীর স্থান যে কোথায় তা বের করাটা খুব তর্কসাপেক্ষ এবং কঠিন ব্যাপার। তবুও খুব সংক্ষেপে বলা যায় যে ভারতবর্ষের সমাজে নারীর মর্যাদা ঠিক ঠিকভাবে দেওয়া হয় না। এখানে বেশিরভাগ সমাজ পুরুষতান্ত্রিক। আসামের দু-একটা আদিবাসী সমাজে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ দেখা যায়, যে সমাজে মহিলারাই সমস্ত ব্যাপারে প্রকট ভূমিকা পালন করে থাকেন, যেমনভাবে একটি পুরুষতান্ত্রিক সমাজে একজন পুরুষ ভূমিকা পালন করেন। যেহেতু শতকরা ৯০-এর বেশির ভাগ সম্প্রদায়ের সমাজের মধ্যে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা দেখা যায়, সেহেতু মহিলাদের মর্যাদার ব্যাপারটা একেবারে গুরুত্ব দিয়ে ভাবা হয় না। বিভিন্ন সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের প্রতি নির্বিচারে অন্যায় আচরণ করে যাওয়া হচ্ছে। তবে বর্তমানে তুলনামূলকভাবে একটু শিক্ষিত মহিলারা সমাজে যে মর্যাদা পাচ্ছেন তার ১০ ভাগের একভাগ মর্যাদা পান না অসংগঠিত মহিলারা। এমনিতেই সমাজের মধ্যে পুরুষ প্রাধান্য, তার উপর যে পরিবারে শিক্ষার আলো একটুও প্রবেশ করেনি সে পরিবারে মহিলার সামাজিক মর্যাদা শুধু জীবন যাপন করে কোনও রকমে বেঁচে থাকার নামান্তর। ভারতীয় সংবিধানে ক্ষমতা ও সমানাধিকারের কথা বলা থাকলেও অসংগঠিত মহিলাদের ক্ষেত্রে এসবের বালাই-ই নেই। তাদের পরিবারের পুরুষরা তাদের নিজস্ব সম্পত্তি হিসেবে মনে করেন। তবুও মাঝে মাঝে অসংগঠিত মহিলা কর্মীরা যেহেতু টুকটাক রোজগার করেন সেইহেতু তারা মাঝে মাঝে ক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিবাদ করেন। অনেকক্ষেত্রে স্বামীর থেকে মহিলারাই বেশি রোজগার করেন। সে সব ক্ষেত্রে এইসব মহিলা মাঝে মাঝে অন্যায় আচরণ এবং মর্যাদা হানিকর ব্যাপারে রুখে দাঁড়াচ্ছেন। কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক সমাজের পুরুষ প্রাধান্যরূপ কাঁটা পুরুষদের মগজে এতটাই বেশি পরিমাণ গেঁথে গেছে যে সে কাঁটা কোনও সাধারণ সমাজসেবক দ্বারা বের করা যাবে না। এদের অনেকের সঙ্গে কথা বলে বোঝা গেছে যে তারা যখন ছোট ছিলেন তখন তারা দেখতেন যে বাবা-মারা তাদের ভাইয়ের বা কাকাদের আগে খেতে দিচ্ছেন এবং সবশেষে তাদের মায়েরা খাচ্ছেন এবং মেয়েরা খাচ্ছেন। সব পুরুষ সদস্যকে খাবার দেওয়ার পর অনেক ক্ষেত্রে বাকি মহিলাদের জন্য ঠিক পেট ভরার মত খাবার থাকত না। যা থাকত তাই ভাগ করে খেতে হত। ধারণাটা এইরকম ছেলেদের আগে খাওয়াতে হয় কারণ তারাই সবচেয়ে বেশি পরিশ্রম করেন। এই ব্যাপারটা পুরোটাই আবেগজড়িত। এই আবেগের ফলে এইসব মহিলা এখন মা হিসেবে নিজেরাই অনেক ক্ষেত্রে কঠোর পরিশ্রম করার পর ঠিক ঠিকভাবে খেতে পান না এবং অপুষ্টিজনিত রোগে ভোগেন। এরকমভাবে এই সব অসংগঠিত মহিলা কর্মীই অপরের দ্বারা যেমন অবহেলিত হন তেমনি চাপিয়ে দেওয়া মোহের বশে নিজে নিজেকে অবহেলা করেন। দিনের পর দিন যায় এবং তারা নানা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। তখন আর শরীরের কাজ করার মত ক্ষমতা থাকে না এবং আরও অবহেলার স্বীকার হন এবং মৃত্যুমুখে পতিত হন। ১০০ জন মহিলার মধ্যে অনেকেই বলেছেন তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা হল তাদেরকে বাড়ির লোকেরা যেমন সম্মান প্রদর্শন করেন না, তেমনি রাস্তার বা কর্মস্থলের লোকেরাও সম্মান প্রদর্শন করেন না। ট্রেনে, বাসে, কর্মস্থলে তাদেরকে দেখলেই কাজের ঝি হিসেবে বুঝে নিয়ে সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারটা ভুলে যান এবং অনেক চেনাশুনো ভদ্রলোকও কথা বলতে চান না — পাছে তার সম্মানহানি ঘটে। অথচ এইসব মহিলা যখন এই রকম ভদ্রলোকদের বাড়িতে এসে রান্নাবান্না করে দেন, সেই রান্না খেতে

তাদের মোটেই ঘৃণা হয় না বা সম্মানহানি হয় না। এইরকমভাবে অচ্ছুৎ ভাবার জন্য এইসব অসংগঠিত মহিলা হীনমন্যতায় ভোগেন এবং নিজেদেরকে একজন শিক্ষিতা, সুবেশা মহিলার থেকে আলাদা এবং নিকৃষ্ট হিসেবে মনে করেন। এই ধরনের চিন্তাভাবনা যেমন এই ধরনের মহিলাদের পক্ষে মর্যাদা প্রতিষ্ঠাতে ক্ষতিকারক, তেমনি দেশের পক্ষেও ক্ষতিকারক।

নেপথ্য ভূমিকা : অসংগঠিত মহিলা কর্মী

যে ১০০ জন মহিলার সঙ্গে কথা বলা হয়েছে তারা যে সব বাড়িতে কাজ করেন তা থেকে দেখা যাচ্ছে যে তারা মোট ১২০টি বাড়িতে ঝি-এর কাজ করেন এবং এরা সকলেই নিজের নিজের বাড়ি থেকে সকালে এসে কাজ করে দিয়ে সন্ধেবেলা চলে যান। এই ১২০টি বাড়ির মধ্যে ৮৬টি বাড়ির বাবুর স্ত্রীরা চাকুরিরতা এবং বাকি ক্ষেত্রে বাবুর স্ত্রীরা চাকরি-বাকরি করেন না। যারা চাকরি করেন না তারা বাড়িতে থেকে ঝিদের দিয়ে কাজ কর্ম করিয়ে নেন এবং যারা চাকরি করেন তারা কি কাজ করতে হবে তা বলে দিয়েই ক্ষান্ত হন। ২০০ জনের মুখ থেকে যে কথা শোনা গেছে তা থেকে বোঝা যায় যে যারা চাকরিরতা মহিলার বাড়িতে কাজ করেন তারা একটু শান্তিতেই কাজ করেন। এইসব ক্ষেত্রে চাকুরিরতা মহিলারা এদের কাজকর্মকে সহানুভূতি দিয়ে অনুভব করেন। আর অন্যক্ষেত্রে এদের কাজের সময় প্রায়শই অশান্তি হয়। বাড়িতে থাকা মহিলারা শুধুই কাজের খুঁত ধরেন — কাজের ভাল দিকটা তাদের নজর এড়িয়ে যায়। যারা চাকরি করেন তারা বরং সহযোগিতা করেন এবং একটু আধটুকু ভুল হলে বাড়ির অন্যরা কিছু বললে তার প্রতিবাদ করেন এবং চুপি চুপি বলেন — ওরকম কোরো না। ও চলে গেলে আর লোক পাওয়া যাবে না। তখন আমার চাকরি করা মুশকিল হবে। কারণ কাজ না হলে সে কাজ আমাকেই করতে হবে।

অনেক ক্ষেত্রে বাড়ির কর্তাদেরও অফিস বন্ধ হবে। এইভাবে চাকরি বা ব্যবসার অসুবিধা হলে ঐ সব পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং চাকরি স্থলের কাজকর্ম ঠিকভাবে চলবে না। ব্যবসা হলে উৎপাদন বা ব্যবসা বিঘ্নিত হবে। এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে অসংগঠিত মহিলাদের কাজের প্রভাব সরকারি না হলেও পরোক্ষভাবে সমাজের অগ্রগতির উপর একটা প্রকট ভূমিকা পালন করছে। এদের নেপথ্য ভূমিকাই আমাদেরই এইভাবে সাহায্য করছে — তা আমরা তলিয়ে ভাবার চেষ্টা করি না।

বাড়ির ছেলেরা কেউ রান্না-বান্না বা বাসন মাজার কাজ করবে না।

এই আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার যে এই সব কাজের মহিলারা সামান্য অর্থের বিনিময়ে যে কাজ করে দেন তার মূল্য সরাসরি নির্ধারণ করা যায় না। তবে পরোক্ষভাবে বলা যায় যে একজন অসংগঠিত মহিলা কাজ করে দেন বলে চাকুরিরতা মহিলারা চাকরি করে মাসে ৩০০০ টাকা থেকে ১০০০০ টাকা বা তার বেশি (ব্যবসার ক্ষেত্রে) রোজগার করতে পারেন। তাই এই সব পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতা এবং অগ্রগতির নেপথ্য নায়িকা কিন্তু এইসব অসংগঠিত মহিলারাই। এরাই তাদের জীবনের সব সময় উজাড় করে দেন এই সব পরিবারের জন্য এবং এই সব পরিবারগুলো সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে উন্নতির সোপান বেয়ে চড়চড় করে এগিয়ে চলেছে। এরা যদি একদিন কাজে না আসেন তাহলে এইসব পরিবারের যা দৃশ্য হয় তা দেখলে যে কোনো লোক লজ্জা পেয়ে যাবেন। এইভাবে দেখা যায় যে এই সব অসংগঠিত মহিলা যেমন এইসব পরিবারের কাজ করে নিজেরা একটু উপকৃত হন, তার থেকে সহস্রগুণ উপকৃত হন কর্মদাতারা। এরা কাজ বন্ধ করলে

একজন চাকুরিরতা মহিলা চাকুরিতে সময়মত যেতে পারবেন না বা কোনও কোনও ক্ষেত্রে চাকুরিতে যেতেই পারবেন না।

মন্তব্য

যে কোন দেশের জন্য ভাল কাজ করতে গেলে সর্বপ্রথম দরকার নারী প্রগতি ও জনজাগরণ। ভারতবর্ষের জন্যও এটা সমানভাবে প্রযোজ্য। তাই সমগ্র জাতি এবং সমগ্র দেশের কর্তব্য নারীদের উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে মহানুভবতা প্রকাশ করা। এর ব্যতিক্রম হলে তার ফল আপনা আপনি ফলে যাবে।

সৃষ্টির আদিকাল থেকে মহিলারাই হচ্ছে শক্তির উৎস। কোনও পুরুষই একা একা কিছু করতে পারবেন না যদি না তার পাশে একজন মহিলা থাকেন। এই চরম বাস্তব এবং সত্য কথাটা প্রতিষ্ঠা করার জন্য আদিম মানুষ পরিবারহীন জীবনযাপন ত্যাগ করে পরিবার গঠনের তাগিদ অনুভব করেছিল। আর সেদিন থেকে চলে আসছে নারী পুরুষের মিলিত প্রচেষ্টা কি করে উন্নতি করা যায়, কি করে উন্নত হওয়া যায়। কোনও পুরুষের একার পক্ষে যেমন কোনও ভাল কাজ করা সম্ভব নয়, কোনও নারীই তেমনি একা ভাল কাজ করতে সক্ষম হবেন না। আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে হয়ত কোনও নারী বা কোনও পুরুষ হয়ত একা কোনও বড় কাজ করে ফেলেছেন ; কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে তার পিছনে নারী-পুরুষের নেপথ্য যৌথ প্রয়াস আছে।

তাই আমাদের কখনোই উচিত নয় একলা চলার নীতি অনুসরণ করা। আমাদের উচিত সবসময় অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে মহিলাদেরকে আমাদের সমান ভাবা। মনে রাখা দরকার একমাত্র লিঙ্গজনিত পার্থক্য ছাড়া একজন মহিলার সঙ্গে একজন পুরুষের পার্থক্য খুবই কম। কাজের কথা বলতে গেলে বলতে হবে মহিলারা যেমন কোনও কাজের ব্যাপারে অনুপযুক্ত নয় তেমনি অক্ষমও নয়। আমরাই তাদেরকে ভীষণভাবে অবহেলা করে দূরে সরিয়ে রেখে দেশের উন্নতির কথা ভাবছি।

এতো গেল সামগ্রিকতার কথা। এবার যদি একটু আলাদা করে ভাবা যায় তাহলে আমাদের চোখের সামনে যে চিত্রটা ভেসে উঠবে, তা বোধহয় বিশ্বাস করতে অনেকের খুবই কষ্ট হবে।

সারণী ১১ : বিবাহ সম্বন্ধীয় অবস্থান

	সংখ্যা	শতকরা হার
বিবাহিত	৭৯	৭৯%
অবিবাহিত	১৫	১৫%
বিধবা	৬	৬%
আইনমাফিক পরিত্যক্তা	০	০

সারণী ১২ : ধর্ম

	সংখ্যা	শতকরা হার
হিন্দু	৯৯	৯৯%
মুসলমান	১	১%
অন্যান্য	০	০

সারণী ১৩ : জাত-পাত

জাতি	সংখ্যা	শতকরা হার	মন্তব্য
তফশিলি জাতি	৯১	৯১%	২ জন সাধারণ
তফশিলি উপজাতি	৫	৫%	১ জন ব্রাহ্মণ
বিধবা	২	২%	একজন মুসলমান
সাধারণ	২		

সারণী নং ১১, ১২, ১৩ থেকে বিশ্লেষণ করে যা বোঝা যাচ্ছে তা থেকে পরিষ্কার বলা যায় যে ১০০ জন অসংগঠিত মহিলা কর্মীর মধ্যে ৭৯ জনই বিবাহিত এবং ৯৯ জন হিন্দু সম্প্রদায়ের এবং তার মধ্যে ৯১ জন হল তফশিলি সম্প্রদায়ের এবং মোট নিম্নবর্গের মহিলা কর্মীর সংখ্যা হলো ৯৮ জন অর্থাৎ ৯৮%। বাকি ২% হলো সাধারণ সম্প্রদায়ের — তাদের মধ্যে ১% হল ব্রাহ্মণ ও ১% হল মুসলমান। এই যদি কোনও সমাজের চিত্র হয় তাহলে সেই সমাজ-সমন্বিত কোনও দেশের উন্নতি হতে পারে না। মুখে যতই বড় বড় কথা বলা হোক না কেন — কাজের কাজ কিছু হবে না। খাতা কলমে যতই উন্নতির কথা বলা হোক না কেন -- এই উন্নতি আসতে পারে না। পুরো পদ্ধতিটার মধ্যে ভীষণভাবে গলদ থেকে গেছে। ভাবসাম্যহীন কোন সমাজের উন্নতির জন্য মাথা না কুটে আগে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা দরকার। আর ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার দুটো পথ হল সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করা।

একদিকে একজন অসংগঠিত মহিলা কর্মী সারাদিন পরিশ্রম করবে — স্বামী পুত্র পরিবার সব পিছনে অবহেলায় ফেলে এসে, পাবে না কোন স্নেহ, মায়া-মমতা ভালবাসা, সুযোগও পাবে না স্নেহ, মায়া-মমতা, ভালবাসা প্রদর্শনের। যখন একদিকে ঐ অসংগঠিত মহিলারা ভাল করে লজ্জা নিবারণের বস্ত্রের সংস্থান করতে পারবেন না তখন অন্যদিকে চলবে নারীসৌন্দর্য প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা। সেখানে নারীরা রোজগার করবেন লাখ লাখ এবং তাদের পিছনে ওড়ানো হবে কোটি কোটি। এখানে যে সব নারী অংশগ্রহণ করবেন তারা সকলেই ভারতবর্ষের না হলেও ভারতবর্ষের নারীরাও এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবেন। একজন নারী যখন আদিমতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য লজ্জা নিবারণের বস্ত্রের সংস্থানের জন্য রক্ত জল করে পরিশ্রম করে অস্তিত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছেন তখন অন্যজন আদিম যুগে ফিরে না গিয়েও আদিমতা প্রদর্শনের খেলায় মেতে উঠছেন। অথচ দু-জন মহিলার শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। তাহলে এদের মধ্যে এত মর্যাদাগত পার্থক্য কেন — এটা মনে হতে পারে। এর আসল কারণ ভারতবর্ষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অসাম্য। যতদিন না এগুলো ভাল করে নির্মূল করা যাবে ততদিন ভারতবর্ষের কোণে কোণে উন্নতির প্রদীপ জ্বলে উঠলেও ভারতবর্ষের অবনতির স্ফুলিঙ্গ উন্নতির প্রদীপকে পরাজিত করে দাউ দাউ জ্বলে উঠবে এবং যে সব ঘরে মঙ্গলসূচক উন্নতির প্রদীপ জ্বলছে সেসব ঘরকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে। তাই এখনই বোধ হয় এসব নিয়ে ভারতবর্ষের প্রকৃত মঙ্গলকামীদের ভাববার সময় এসেছে।

কৃ ষ্ণ ধ র

স্বাধীনতা-উত্তর যুগে সম্পাদকের ভূমিকা

দেশভাগ ও ক্ষমতা হস্তান্তরের পর আমাদের দেশে সংবাদপত্র জগতেও হস্তান্তর প্রক্রিয়া শুরু হয়। অবশ্য সেগুলো ছিল ব্রিটিশ মালিকানাধীন সংবাদপত্র। কলকাতার দা স্টেটসম্যান, মুম্বাইয়ের টাইমস অব ইন্ডিয়া, চেন্নাইয়ের দ্য মেল, লখনউর দ্য পাইওনিয়ার প্রভৃতি সংবাদপত্রের মালিকানা বদল হয়। তবে তার কাঠামো, সংবাদ পরিবেশন পদ্ধতি ও সম্পাদকের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে।

দেশীয় মালিকানার সংবাদপত্রের মধ্যে যেগুলি ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তিতে এগিয়ে ছিল তাদের প্রচার ও আয়ের উৎস বেড়ে গেল। সমৃদ্ধির সম্ভাবনার দিগন্ত ক্রমশ উন্মোচিত হতে থাকে ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্টের পর থেকে। প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে সাহেবি কাগজগুলো বাদ দিলে বাংলা হিন্দি বা অন্যান্য ভারতীয় ভাষার সংবাদপত্রের কাটতি নির্ভর করত সম্পাদকের মর্যাদা, পরিচিতি ও তাঁর কলমের শক্তির ওপর। বাঘা বাঘা নামী সম্পাদক তখন সংবাদপত্র জগতে ও রাজনীতির জগতে বিরাজ করছেন। সাতচল্লিশ সালের পর কলকাতায় সংবাদপত্র জগতে যেসব সম্পাদককে আমরা দেখেছি এবং যাঁদের সাহচর্য পেয়েছি সাংবাদিকতায় যোগ দেবার পর, তাঁদের মধ্যে ছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকার সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, বসুমতীর বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, অমৃতবাজার পত্রিকার তুষারকান্তি ঘোষ, যুগান্তরের বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ সেন, সুধাংশুকুমার বসু, আনন্দবাজারের চপলাকান্ত ভট্টাচার্য, নেশন পত্রিকার সত্যরঞ্জন বক্সি, স্বাধীনতা পত্রিকার সোমনাথ লাহিড়ী প্রমুখ। এঁরা সকলেই ছিলেন প্রতিষ্ঠিত যশস্বী সম্পাদক। এঁদের নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পত্রিকাগুলির জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি ছিল ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলার বাইরে বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকদের মধ্যে পরিচিত ছিলেন ন্যাশনাল হেরাল্ডের চলপতি রাও, হিন্দুস্থান টাইমসের দেবদাস গান্ধী, দুর্গাদাস, সকাল পত্রিকার এম. ভি, মানে, বিশাল ভারতের বানারসীদাস চতুর্বেদী, ডেকান হেরাল্ডের পোথান জোসেফ, স্বরাজ্য পত্রিকার খাসা সুব্বা রাও, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের কে রামা রাও প্রমুখ। এঁদের অনেকের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ হয়েছিল সাংবাদিক আন্দোলনের সুবাদে। প্রেস কমিশন গঠনের দাবিতে যে আন্দোলন হয় তাতে নেতৃত্ব দেন চলপতি রাও। সানে, চতুর্বেদী, পোথান জোসেফ এঁরাও পঞ্চাশের দশকে সারাভারত সাংবাদিক সংগঠন তৈরির সময় সাংবাদিকতার নানা বিষয় নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

গত পঞ্চাশ বছরে ভারতে সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে গুণগত ও পরিমাণগত পরিবর্তন হয়েছে বিপুল। প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে ভারতীয় মালিকানার সংবাদপত্রগুলির ভূমিকা ছিল মোটামুটিভাবে জাতীয় আন্দোলনে সহযোগীর। ফলত তাদের ওপর ব্রিটিশ সরকারের বিষ নজর পড়ত হামেশাই। সংবাদ সংগ্রহের ব্যবস্থাও আজকের মতো পাকাপোক্ত ছিল না। সাধ্যও ছিল সীমিত। দু'চারটে বড় কাগজ বাদ দিলে অধিকাংশ পত্রিকারই প্রধান আয় ছিল প্রচারনির্ভর। পত্রিকার অঙ্গসজ্জার বৈচিত্র্যও তেমন ছিল না। হিন্দু পত্রিকা তো স্বাধীনতার পরও বেশ কিছুদিন প্রথম পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন ছাড়া কোন সংবাদ ছাপত না। পুরনো ট্রাডিশন ভাঙা হল আরও কিছু দিন পর। সে সময়ে সম্পাদকীয় রচনাই পাঠকদের আগ্রহ, রুচি ও মতামত তৈরি করত। সম্পাদকীয় লেখা হত লম্বা লম্বা। দু-কলম তিন-কলম পর্যন্ত এক একটা সম্পাদকীয় ছাপা হত। বক্তব্য শেষ না হলে ক্রমিক সংখ্যা দিয়ে পরপর দু-তিন দিন বিষয়টি নিয়ে সম্পাদকীয় চর্চা হত। তার একটা কারণ পাঠকের চাহিদাপূরণ। অন্য কারণ সংবাদের বৈচিত্র্যের অভাব। পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত বাংলা সংবাদপত্রে প্রবাদপ্রতিম সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার জলদগম্ভীর ভাষায় এক একটি প্রসঙ্গ নিয়ে সরস অথবা উত্তেজক সম্পাদকীয় লিখে পাঠক মনোরঞ্জন করতেন। তাঁরই উত্তরসূরি ছিলেন বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। তবে ভাষা ব্যবহারে তিনি ছিলেন এক ধাপ এগিয়ে। সাধুভাষা ব্যবহার করলেও বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় তাতে কথ্য বাংলার চাল অত্যন্ত সার্থকভাবে প্রয়োগ করতেন। তাছাড়া তিনি সম্পাদকীয় লিখতেন আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে। প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করার পক্ষে বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ভাষা ছল গাণ্ডীবের মত। পঞ্চাশের দশকে ট্রামভাড়া বৃদ্ধি আন্দোলনের সময় (১৯৫৩), বঙ্গবিহার সংযুক্ত বিরোধী আন্দোলন (১৯৫৫-৫৬), খাদ্য আন্দোলন (১৯৬৬-৬৭) ও সে সময়কার প্রতিটি রাজনৈতিক আন্দোলনের সময় লেখা তাঁর সম্পাদকীয় পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। তাঁর কলমে সত্যেন্দ্রনাথের মতোই ফুটে উঠত শাণিত ব্যঙ্গ। যার উদ্দেশে লিখিত তার গায়ে জ্বালা ধরত। উপভোগ করত পাঠকেরা।

ষাটের দশক থেকে সংবাদপত্রের ঘরানা বদল শুরু হয়। জোর দেওয়া হতে থাকে সংবাদ ও সংবাদভিত্তিক রচনা ও সংবাদচিত্রের ওপর। কলকাতার বাংলা সংবাদপত্রে এই পরিবর্তনটা জরুরি ছিল। স্বাধীনতা উত্তরকালে ইংরেজি সংবাদপত্রের প্রতিপত্তি না কমলেও, এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রকে উপেক্ষা করে চলা যাবে না। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মারফত সামাজিক পরিবর্তন ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বদলের যে কর্মসূচি পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে শুরু করে, সেই বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের ভূমিকার গুরুত্ব ছিল অনেক বেশি। সংবাদপত্র যাঁরা চালান তাঁদের মনেও এই উপলব্ধি কাজ করে। আনন্দবাজার পত্রিকায় সংবাদ পরিবেশনও অঙ্গসজ্জার খোলনলচে পাল্টে যায় সন্তোষকুমার ঘোষের পরিকল্পনায়। নব্বইয়ের দশকে এসে আমরা দেখতে পাই বাংলা সংবাদপত্রের মুদ্রণের উৎকর্ষ সমানে পাল্লা দিচ্ছে তার সংবাদ নির্বাচনে, ভাষা ব্যবহারে ও অঙ্গসজ্জা নিরূপণে।

আরও একটি পরিবর্তন এসেছে অতীত যুগের দিকপাল সম্পাদকের তিরোধানের পর। সম্পাদককেন্দ্রিক সংবাদপত্রের যুগ আজ অবসিত। সংবাদপত্র একটি যৌথ প্রয়াস। সম্পাদক তার শীর্ষে, অর্কেস্ট্রার পরিচালক বা জাহাজের কাপ্তানের মতো। তার সার্বিক প্রয়াসই নির্মাণ করতে পারে একটি আকাঙ্ক্ষিত সংবাদপত্র। তার প্রথম পৃষ্ঠা থেকে শেষ-

পৃষ্ঠা পর্যন্ত প্রতিটি রচনায়, শিরোনামে, চিত্র নির্বাচনে ও অঙ্গসজ্জায় থাকে এই সচেতন প্রয়াসের সুস্পষ্ট চিহ্ন। শ্রম ও মননের সমন্বয়ে তৈরি হয় আজকের যুগের সংবাদপত্র। নতুন প্রযুক্তি এসে পুরনো ধ্যান-ধারণার মূল ধরে দিয়েছে টান। তার ফলে সংবাদপত্র একটি পণ্যরূপেই পাঠকের বাজারে হাজির। এই পরিবর্তন সম্পাদকের ভূমিকা দিয়েছে বদলে। সম্পাদকের পদটি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে স্বাধীনতা-উত্তর যুগে সংবাদপত্রের উদ্যোক্তা বা পুঁজি লগ্নিকারীরা সহজে পদটি হাতছাড়া করতে চান না। বহু সংবাদপত্র আজ প্রচলিত যার সম্পাদক মালিক নিজেই। নির্বাহী সম্পাদককে দিয়ে তিনি কাজ চালান। সাংবাদিকতা জীবিকার শীর্ষস্থানটি সাংবাদিকদের নাগালের বাইরে রাখার কারণ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সম্পাদকের দায়িত্ব ও ক্ষমতা এবং সংবাদপত্রের নীতির প্রশ্ন এর সঙ্গে জড়িত। সম্পাদকীয় রচনার কি গুরুত্ব কমেছে? সম্পাদকীয় নিবন্ধের পাঠক কি আগের তুলনায় কম? এসব প্রশ্ন অনেকবার উঠেছে। কয়েকটি বিশিষ্ট দৈনিক পত্রিকা ছাড়া অধিকাংশ সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় নিবন্ধের সংখ্যা একটিতে এসে দাঁড়িয়েছে। মাত্র কয়েকটি সংবাদপত্র চিরাচরিত প্রথায় প্রধান সম্পাদকীয় সহ আরও দুটি নিবন্ধ প্রকাশ করে। দীর্ঘ সম্পাদকীয়ের বদলে স্থান নিয়েছে পরিমিত আকারের তীক্ষ্ণ ও সুসংহত সম্পাদকীয়। অনেক সম্পাদক স্বনামে কলাম লেখেন। কেননা পাঠকের আগ্রহ কলামের প্রতিই বেশি। তাছাড়া কলামে ব্যক্তিগত রচনাশৈলী ব্যবহার করা যায়। একটি পাঠকশ্রেণীও গড়ে তোলা যায়। সম্পাদকের ব্যক্তিগত পরিচিত ও জনপ্রিয়তা বাড়ে। তাতে লাভবান হয় সংবাদপত্র।

আজকের সংবাদপত্রে সংবাদের পাশাপাশি সংবাদ-আলেখ্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়েছে। সংবাদপত্রে যেন ক্রমশ ম্যাগাজিন সাংবাদিকতাকে বেশি জায়গা দিতে চায়। তার কারণ অবশ্যই প্রতিযোগিতা এবং বৈদ্যুতিন মাধ্যমের অনিবার্য উপস্থিতি। সাদাকালো ছবির পরিবর্তে রঙিন ছবির ব্যবহার দৈনিক সংবাদপত্রকে পাঠকরুচি নির্ভর করে তুলছে। এর অবশ্যই সঙ্গত কারণ আছে। সংবাদপত্র প্রকাশ করতে যে বিপুল অর্থ লগ্নি করতে হয় তা স্বাধীনতার জন্মলগ্নে ছিল অকল্পনীয়। কিন্তু এখন অন্য ব্যবসায় নিযুক্ত পুঁজিপতিরা সংবাদপত্র শিল্পে হাত পাকাতে আসছেন। তাদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়ছে।

প্রেস কমিশন (১৯৫৪) এ বিষয়টি নিয়ে তথ্যানুসন্ধান করে মন্তব্য করেছিলেন যে এ সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। সংবাদপত্র একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। তার নিজস্ব আচরণবিধি আছে, দায় আছে। সুতরাং অন্যান্য শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিরা সংবাদপত্রে পুঁজি নিয়োগ করলে তার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য স্বার্থ দ্বারা সংবাদপত্রের নীতি নিয়ন্ত্রিত হবার আশঙ্কা। তাতে তথ্য প্রকাশ, বিশ্লেষণ ও তার ওপর মন্তব্য প্রভাবিত হবে এটা জানা কথা। সে কারণেই অন্য শিল্পের সঙ্গে সংবাদপত্রের সম্পর্ক ছিন্ন করার সুপারিশ তারা করেছিলেন। তা হয়নি।

বস্তুত এর ফলেই সম্পাদকের পদটাও চলে যাচ্ছে মালিকের হাতে। ব্রিটেনে বা আমেরিকার সংবাদপত্রের মালিকদের বলা হয় পাবলিশার। এরা সম্পাদক নন। কিন্তু সংবাদপত্রের ব্যাপারটা তাঁরা বোঝেন। উপযুক্ত সম্পাদক তারা নিয়োগ করেন চুক্তি ভিত্তিতে। এই পালবিশারদের মুখ্য স্বার্থ সংবাদপত্র পরিচালনা এবং তাকে প্রচারের দিক দিয়ে সফল করে তোলা। একজন নামী সম্পাদক তাঁর ব্যক্তিত্বের দ্বারা সংবাদপত্রকে সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছে দিতে পারেন। তার জন্য চাই তাঁর কাজের স্বাধীনতা। এঁরা হলেন পেশাদার সাংবাদিক। সংবাদপত্রের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয়সাধন করে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর, ঝকঝকে সংবাদপত্র তৈরিতে তিনি হলেন প্রেরণার প্রতীক। তাঁর কাজ শুধু,

একটি সম্পাদকীয় লিখে নীরব দর্শক হওয়া নয়। এক্ষেত্রে সংবাদপত্রের মালিকের সঙ্গে তার সম্পর্কটা হবে পেশাগত এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে। দৈনন্দিন কাজে মালিকের হস্তক্ষেপ সাংবাদিকতার নীতি ও তার স্বার্থবিরোধীই শুধু নয়, এর ফলে গোটা সংবাদপত্রের চেহারাটাই হয়ে উঠবে পেশাগত দৃষ্টিতে অবাঞ্ছিত ও অপরিণত।

সম্পাদককে মর্যাদার আসন ছেড়ে দিলে কাগজের উন্নতির পক্ষে তা সহায়ক হয়। সম্পাদককে বেতনভুক সৃজনশীল প্রতিনিধি বা লিটারারি এজেন্ট-এ পরিণত করলে তার মর্যাদার যেমন হানি হয়, তেমনি সংবাদপত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হয়। গত পঞ্চাশ বছরে দুর্ভাগ্যের বিষয়, ভারতে সম্পাদকের পদের অবমূল্যায়ন ঘটেছে। যেসব সম্পাদকের কথা সংবাদপত্রের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ এবং যাদের শেষ প্রতিনিধি পঞ্চাশ ও ষাটের দশক পর্যন্ত ছিলেন তাদের স্থান পূরণ হয়নি। পেশা হিসেবে সাংবাদিকতার প্রসার ও সমৃদ্ধি ঘটেছে। সাংবাদিকতার কৃৎকৌশলে প্রভূত উন্নতি ঘটেছে। কিন্তু সাংবাদিকতার আচরণবিধি বা তার মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতনতা হ্রাস পেয়েছে। মনে রাখা দরকার যে সাংবাদিকরা ভাড়াটে লেখক নয়। সম্পাদকের ব্যক্তিত্ব, জ্ঞানবুদ্ধি ও মর্যাদাবোধই হল একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মরত সমস্ত সাংবাদিকদের রক্ষাকবচ। পেশাগত কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে সচেতনা না থাকলে সাংবাদিক জীবিকার সঙ্গে কলমপেষা অন্য জীবিকার পার্থক্য থাকে না।

নয়া প্রযুক্তি ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থার বিস্ময়কর অগ্রগতির ফলে সংবাদ হয়েছে সহজলভ্য। কিন্তু সংবাদ নির্বাচন ও তার পরিবেশন সম্পর্কে দায়িত্ববোধ গড়ে না তুললে সংবাদপত্র তার ব্যক্তিত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা হারায়। সে জন্যই প্রয়োজন এমন সম্পাদকের যিনি বাইরের ও ভিতরে চাপের মুখোমুখি হবার ক্ষমতা রাখেন এবং যিনি গোটা সংবাদপত্রকে একটি তথ্যনিষ্ঠ গতিশীল ও জীবন্ত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে পারেন। প্রাক-স্বাধীনতা যুগে ব্রিটিশ ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করলে সম্পাদককে জেলে যেতে হত। তখন সম্পাদক সেই ঝুঁকি নিতেন। স্বাধীনতা উত্তর যুগে সেই ভয় নেই। তাই যার কাগজ তার সম্পাদক হতে বাধা নেই। বরং সম্পাদকের পদে থাকলে ঈপ্সিত মহলে প্রভাব ও প্রতিপত্তি বাড়ে। বেতনভুক্ত সম্পাদক মালিকের সঙ্গে লিখিত বা অলিখিত বোঝাপড়ায় কাজ করেন। মতের সংঘাত হলে সম্পাদককে চলে যেতে হয়। এরকম ঘটনা স্বাধীনতা উত্তর যুগে অনেক সম্পাদকের ক্ষেত্রে ঘটেছে। অনেক তেজস্বী সম্পাদক ব্যক্তিত্বের জেরে মালিকের চাপ ও সরকারের চাপ অগ্রাহ্য করে কাগজ চালিয়েছেন, এমন দৃষ্টান্তও আছে। কিন্তু তা ব্যতিক্রম। এখন সম্পাদক নির্বাচনের সময়েই নীতিগত ব্যাপারটা ফয়সালা হয়ে যায়।

বস্তুত আজকের যুগের সংবাদপত্রের প্রচার ও প্রভাব ব্যক্তিগতভাবে সম্পাদকনির্ভর ততটা নয় যতটা সম্পাদক ও তাঁর সহযোগীদের চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতির সুষ্ঠু সমন্বয়নির্ভর। সম্পাদকীয় মতামতের গুরুত্ব কমেনি। কিন্তু সেই মতামতের গুরুত্ব নির্ভর করে সংবাদপত্রের দায়িত্বশীলতা ও তার বিশ্বাসযোগ্যতার ওপর যে সম্পাদক রোজই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন তার মতামত, কিছুদিনের মধ্যেই তা পাঠকের মনে একঘেয়েমি সৃষ্টি করে। আজকের সম্পাদকীয় অনেক বেশি বিশ্লেষণধর্মী ও যুক্তিনির্ভর। তথ্য ও যুক্তির সমাহারে তা হয়ে ওঠে অকাট্য। পাঠকের আস্থা জন্মে সম্পাদকের বিদ্যাবুদ্ধি এবং দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। প্রশাসনের দায়িত্ব যাদের তারাও তার মতামতকে শ্রদ্ধা করতে বাধ্য হন। গণমাধ্যম হিসেবে সংবাদপত্র স্বাধীনতা-উত্তর যুগে আমাদের দেশে তার প্রচার ও প্রভাব আগেকার তুলনায় অনেক বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। সম্পাদকের ভূমিকারও গুণগত পরিবর্তন হয়েছে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার প্রতিফলন

ঘটে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়। আমাদের দেশের সংবাদপত্রের সংবাদ ও মন্তব্যে রাজনীতির ভাগই মুখ্য। বড় বড় দৈনিকগুলির নজরও প্রধানত মহানগরকেন্দ্রিক। তার ফলে রাজনীতির বাইরে সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিল্পসাহিত্য, লোকসংস্কৃতি, গ্রামীণ সমাজ ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয় যতটা মনোযোগ দাবি করে তার প্রতিফলন ঘটে না। তবে বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমের জাল বিস্তারের পর সংবাদপত্রের দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন বেশ চোখে পড়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সর্বগ্রাসী রাজনৈতিক সংবাদ প্রথম পাতা জুড়ে রাজত্ব করছে। ইদানীং তার সঙ্গে সহাবস্থান করছে খেলার খবর—প্রধানত ক্রিকেট ও ফুটবল।

এই ক্যানভাস বদল সংবাদপত্রকে করতে হয়েছে পাঠক মনোরঞ্জনের জন্য। এই দুরূহ অথচ সুখকর কর্তব্য পালনে সম্পাদককেও সজাগ থাকতে হয় তাঁর সহযোগী বার্তা সম্পাদক, মুখ্য প্রতিবেদক ও ম্যাগাজিন সম্পাদকের কাজকর্ম ও পরিকল্পনা সম্পর্কে।

ক বি তা সিং হ

মিডিয়া এখন

উনিশশ' সাতচল্লিশের সেই মধ্যরাত্রি, ঘুম নেই সেদিন। বরং, আরও অনেক বেশি জেগে যাওয়া পনের বছর বয়সের স্কুলে পড়া মেয়েটির কাছে যে কি এক মাহেন্দ্রক্ষণ! সে অন্তর্নিহিত আনন্দ ক্রন্দন, আজকে এই পঞ্চাশ বছর পরে, জন্মেই যারা স্বাধীন, তাদের কি করে বোঝাব। সেই পরাধীনতার জ্বালা, অপমান এবং শৈশবের পশ্চাদপট কত পুরনো ক্ষতকেই না জাগিয়ে তোলে। মনোজ বসু, তাঁর 'ভুলি নাই' উপন্যাসে লিখেছিলেন 'কুন্তলদা আজও তোমাকে ভুলিনি।'। সেই প্রথম বালিকা বয়স প্রথম কৈশোরের রোমান্টিক সময়ে আমার 'ভুলি নাই'-এর তালিকাটি আজও আমার সঙ্গে রয়েছে আত্মজার মত। দক্ষিণ কলকাতায় হাজরা নফর কুণ্ডু রোডের সংযোগস্থলে আমাদের পর পর তিনখানি বাড়ি নিয়ে সিংহ পরিবার। এরা ছিল সেদিনের কলকাতার নতুন কেতার ধনী। কিন্তু কাছেই আন্দুল রাজ রোডে—এক নম্বর আন্দুল রাজবাড়িতে, অর্থাৎ আমার মামার বাড়িতে, যেখানে আমার জন্ম ও শৈশব, সেখানে পুরনো কেতার রাশভারি বনেদিআনার সঙ্গে বিলাতিআনাও কম ছিল না। সে বাড়ির পুরুষদের চুলের কেয়ারি, কথায় কথায় আতর গোলাপের ছড়াছড়ি, সাহিত্য-বাসর, ফ্রান্স থেকে কাপড় কাচিয়ে আনার কাহিনীর মাঝখানে আমার বেড়ে ওঠা। সে বাড়িতে মেয়েরা গৃহকর্ম করতেন না, পুরুষরা চাকরি বা ব্যবসা। তাদের টাকার উৎস ছিল জমিদারির আয়। অন্যদিকে আমার বাপের বাড়ি — ড্রেসিং গাউন, পোষা গ্রেট ডেন ও অ্যালসেসিয়ান, বাক্স বাক্স বিলিতি বই এবং আমার উচ্চশিক্ষিত বিলিতিআনা করা পিতার নিখুঁত সাহেব বাড়ির স্যুট বুট ও বিলিতি গাড়ির ব্যবসা, যার বিশাল কাচে মোড়া শোরুম ছিল বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামের উল্টোদিকে।

এরই মাঝখানে এই পরাধীন দেশে, আমার মা আর দিদিমার প্রভাবে বেড়ে ওঠা। আমরা যে সাহবেদের অধীন, আমরা যে পৃথিবীর স্বাধীন দেশের নাগরিক নই, পৃথিবীর অন্যত্র যেসব স্বাধীন ছেলেমেয়েরা তাদের স্বাধীন মন আর ইচ্ছে নিয়ে বেঁচে আছে, আমরা তাদের চেয়ে আলাদা, নিজেকে বুটের তলায় চেপে রাখা কীটানুকীটের মত মনে হত। ছোটবেলা থেকে কবিতা লেখার মুদ্রাদোষ নিয়ে জন্মেছিলাম। আমার যখন সাত বছর বয়স, তখন গাড়ি বারান্দায় লোহার রেলিঙে বুক ঠেকিয়ে, আকাশে চিলের ওড়ার আনন্দ দেখে মুখে মুখে কবিতা তৈরি করেছিলাম, ছেলেমানুষী ছড়ার ছন্দে —

স্বাধীনতা কী?
ছড়িয়ে ডানা
নীল আকাশে
পাখীর ওড়া টি!

আগেই বলেছি আমার আদর্শ — না আদর্শ বলব না, আমাকে পূর্ণভাবে প্রভাবিত করেছিলেন, না, আমার পিতা নয়, আমার মা এবং দিদিমা। দু বাড়ি মিলিয়ে একটি মাত্র শিশু বলে মামার বাড়ি দিদিমার কাছেই থাকতাম বেশি। আমার বিলিতি বাবা আমাকে এনে দিতেন রঙিন রঙিন বিলেতি ছবিঅলা বই, মেম পুতুল, অ্যারিজোনার চকোলেট ; আর আমার স্বদেশী মা তখন আমার হাতে তুলে দিতেন বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ, আনন্দমঠ। আমার জীবনে আমার দিদিমার প্রভাব সবচেয়ে বেশি। কেন যে আরও কিছু দিন তিনি আমার সঙ্গে রইলেন না! মাত্র ঊনচল্লিশ বছর বয়সে তিনি মারা যান। তাঁকে নিয়েই আমার উপন্যাস 'মোমের তাজমহল'। দিদিমার জীবনের একটি গল্প প্রসঙ্গতই এসে যায়। আন্দুলের এক ধনী প্রজার বাড়ি একবার তাঁরা স্বামী-স্ত্রী নিমন্ত্রণ রাখতে গিয়েছিলেন। দিদিমার পরনে সরু লাল পাড় খদ্দরের শাড়ি ও খদ্দরের মোটা চাদর। তাঁর প্রতিজ্ঞা ছিল দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে তিনি খাওয়া-পরার বিলাসিতা বর্জন করবেন। যতদূর মনে পড়ে তিনি অসম্ভব ফর্সা ছিলেন। টানা টানা মর্মস্পর্শী চোখ। লম্বা, রোগা ছিপছিপে। বিয়েবাড়ি গিয়ে, দাদু তো ফিটন থেকে নেমে বারবাড়িতে পুরুষ আমন্ত্রিতদের মধ্যে গদীয়ান হলেন। তাঁর বিশাল চেহারা, সোনার তারের জংলা কাজ করা জামিয়ার শাল, হীরের বোতাম, আংটি এবং পরিচয়—সব মিলিয়ে দর্শনীয়। ওদিকে দিদিমা যখন মেয়ে মহলে গেলেন, তাঁর জায়গা হল আশ্রিতা ও দাসী শ্রেণীর মহিলাদের পাশে। তাদেরই সঙ্গে খেতে বসলেন তিনি। এদিকে যাওয়ার সময় হয়ে এল। ভিতর বাড়ির উঠোনে এসে বারবাড়ির দাসী ডাক পাড়ল—'ওগো আঁদুল রাজবাড়ির রানীমা, তুমি কোথায় গো। রাজাবাবু যে ডাকছেন গো! দিদিমা তাড়াতাড়ি গৃহকর্ত্রীর হাতে উপহারের বাক্সটি দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। মূলত দিদিমা এ ব্যাপারে কিছুমাত্র অপমানিতবোধ করেননি, কারণ তিনি ছিলেন আপন সম্মানেই সম্মানিতা। কিন্তু দিদিমার এই অপমানের উত্তর পরদিন নাকি দাদু পাঠিয়েছিলেন। ওই ফিটন গাড়িতেই। দিদিমার সমস্ত গয়নার বাক্স ও তাঁর নামে লেখা জমির দলিল কবালা সেই সমৃদ্ধ প্রজার বাড়ি। নেমতন্ন ও সম্মানের জন্য। এই শিশিরকুমারী, যশোরের কন্যাই আমার প্রথম ভূমি। আমার সত্য, আমার আদর্শ আমার 'বন্দে মাতরম'।

অপমানও যে মানুষকে ভিতরে সম্মানিত করে এটা শিশিরকুমারীরই শিক্ষা। অপমান অসম্মান ও মিথ্যাকে অস্বীকার করার সাহস শিশিরকুমারীর ছিল। কথামৃতের কলিযুগে, 'সত্যই যে ঈশ্বর' এটাই তাঁর কাছ থেকে পাওয়া আমার উত্তরাধিকার। ছোটবেলা থেকেই কোথাও বেরোনো বারণ, কারও সঙ্গে মেশা বারণ তাই বই-ই আমার সঙ্গী ছিল। আমাদের লাইব্রেরিতে চোদ্দ হাজার বই ছিল। শেক্সপীয়র-এর সোনালী সংস্করণ ছিল, ছিল বিদেশী কবিদের কমপ্লিট ওয়ার্কস। আবার নাটক নভেল বেদ পুরাণ সংহিতার বাংলা সংস্করণ। 'হিরদাসের গুপ্ত কথা', 'লন্ডন রহস্য', দীনেন্দ্রকুমার রায়ের 'ব্লেক অ্যান্ড স্মিথ' এবং অবশ্যই সমস্ত বটতলার বই। একটি আলমারির চাবি কিন্তু আমাদের লাইব্রেরিয়ান কিছুতেই খুলতেন না। কিন্তু একদিন সেই চাবি আমার হাতে এসে গেল। চাবিটা আমার মা আমাকে দিয়েছিলেন। সে চাবি খুলতেই আমার হাতে এসে গেল এমন এক সম্পদ, যা প্রবেশ করে গেল একেবারে আমার শিকড়ের মধ্যে। যে কোন সময়েই তখন, বিশেষত লাইব্রেরিগুলিতে

পুলিশ সার্চ করত যখন তখন। আমাদের এই লাইব্রেরিটিকে কিছুদিনের জন্য পাবলিক লাইব্রেরি করে দেওয়া হলেও, তখনও জনসাধারণের মধ্যে বই-এর সুরক্ষা বা সম্ভাবনার প্রস্তুতি হয়নি বলে লাইব্রেরিটিকে আবার ব্যক্তিগত করে নেওয়া হয়। কিন্তু সত্যিই পালে বাঘ পড়েছিল। আমাদের বৃদ্ধ লাইব্রেরিয়ান মশাই তখন ওই বইগুলি বাগানে, মাটির তলায় একটি বাক্স করে রেখেছেন। পরে আমার যখন বারো-তেরো বছর বয়স তখন ওই আলমারিটি আমার দখলে আসে এবং আমি সে সময়ের নিষিদ্ধ পুস্তকগুলি দখলে পাই। সেই সময়কার সন্ত্রাসবাদীদের কথা লেখা, খুব অযত্ন করে ছাপা বই, ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডির বই পেয়ে গেলাম। কিংসফোর্ড মামলার ঘটনা আর বিনয়-বাদল-দীনেশের আত্মত্যাগ আমার মনে প্রভাব ফেলেছিল। বিশেষ করে প্রফুল্ল চাকির গলায় দড়ি বাঁধা মৃত্যুর পরে তোলা একটি ফটোগ্রাফ আমাকে রাতের পর রাত ঘুমোতে দেয়নি। কানাইলাল দত্ত, সত্যেন বসুর বীরত্ব, ইংরেজের চর নরেন গোঁসাইকে গুলি করে হত্যা, ফাঁসির আগে ক্ষুদিরাম কানাইলাল দত্তর ওজন বেড়ে যাওয়া, বারীন ঘোষ ও শ্রী অরবিন্দর বোন সরোজিনী ঘোষের জেলখানায় একটি পাকা কাঁঠালের মধ্যে করে বিপ্লবীদের রিভলবার পৌঁছে দেওয়া, একজন অল্পবয়সী বিধবা মহিলা বিপ্লবী, তাঁর সমস্ত সংস্কার ভুলে দেশের কথা ভেবে সধবা সেজে বিপ্লবীদের সহায়তা করতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যান। সেই ননীবালা দেবী এক বিপ্লবী বন্দির স্ত্রী সেজে জেলে দেখা করতে যান একটি মাউজার পিস্তলের খোঁজ নিতে। পুলিশের অকথ্য অত্যাচারে তিনি যখন অন্নজল ত্যাগ করেন তখন গোল্ডি নামে এক পুলিশের স্পেশাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট প্রশ্ন করেন যে কি করলে তিনি অন্নজল গ্রহণ করবেন? উত্তরে ননীবালা বলেন যে, যদি তাঁকে বাগবাজারে পরমহংসদেবের স্ত্রীর কাছে রেখে আসা হয় তাহলে তিনি অন্নজল গ্রহণ করবেন। একথা শুনে বিপ্লবিনী ননীবালা যখন দরখাস্ত লেখেন গোল্ডি তা ছিঁড়ে ফেলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে ননীবালা গোল্ডিকে সজোরে একটি চড় মারেন। পুলিশের অকথ্য অত্যাচারে অকালে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়ে মারা যান দেবব্রত বসু ও স্বামী চিন্ময়ানন্দ। দেবব্রত বসু, যিনি পরে রবীন্দ্রনাথের কাছেও কিছুদিন লুকিয়ে ছিলেন এবং পরে 'ভারতের সাধনা' গ্রন্থটি লেখেন ও স্বামী প্রজ্ঞানন্দ হয়ে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন, এঁরই ভগিনী ছিলেন বিপ্লবী সুধীরা বসু। সাংবাদিক মাখনলাল সেনের কন্যা বাসনা সেন ও প্রফুল্লমুখী বসু এঁরাও ছিলেন বিপ্লবী। বহুবার কারাবরণ করেছেন। কে না ছিলেন বিপ্লব ও বিপ্লবীদের সঙ্গে। সে সময়ে সেক্স ও ভায়োলেন্সের বেসাতী নিয়ে বেরোত না সংবাদপত্র বা পত্রিকা। মানুষকে সচেতন করার জন্য মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়ার জন্য বেরতো খবরের কাগজ। নিবেদিতা 'কর্মযোগিন' সম্পাদনায় যেমন সাহায্য করতেন শ্রী অরবিন্দকে, তেমনি যোগ ছিল তাঁর অনুশীলন সমিতির বিপ্লবী কর্মযজ্ঞে। সে যুগের গণমাধ্যমের মধ্যে সবচেয়ে রোমাঞ্চকর যুদ্ধ ছিল সংবাদপত্রর জন্ম ও টিকে থাকার। সংবাদপত্র জগতের গ্র্যান্ড ওল্ড ম্যান তুষারকান্তি ঘোষ। এই মানুষটি আমি যখন অমৃতবাজারে সাপ্তাহিক 'কলাম' লিখতাম, তখন মাঝে মাঝে আসতেন। অত্যন্ত রসিক ছিলেন। তাঁর কাছে শুনেছিলাম তাঁর পিতা মহাত্মা শিশিরকুমারের কথা। শিশিরকুমার ঘোষ যদিও সঙ্গীতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, তবুও দরিদ্র মানুষের দুঃখ তিনি দেখতে পারতেন না। এই ব্যথা অসহনীয় হয়, যখন নীলকর সাহেবরা অত্যাচার শুরু করে। এরই প্রতিবাদের ফসল 'অমৃতবাজার' পত্রিকা। ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁর জন্মভূমি মাগুরা থেকে সাপ্তাহিক বাংলা অমৃতবাজার পত্রিকা (তাঁর পত্নী অমৃতময়ীর নাম থেকে নেওয়া) প্রকাশিত হতে থাকে। পরে ১৮৭১-এ ম্যালেরিয়া পীড়িত হয়ে কলকাতায় আসেন। তিনি ছিলেন দেশভক্ত, গৌর

ভক্ত পরম ধার্মিক। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে তাঁর অমৃতলোক গমনের পর তাঁর ভাই মতিলাল ঘোষ ও পরে তুষারকান্তি ঘোষ এই ঐতিহাসিক সংবাদপত্রের সম্পাদক হন। ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দের মুদ্রণযন্ত্রের স্বাধীনতালোপ আন্দোলনের সময় বাংলা 'অমৃতবাজার' ইংরেজি হয় ও দৈনিকে পরিবর্তিত হয়। 'অমৃতবাজারে'র সাংবাদিকতা ছিল স্বাধীন ও নির্ভীক। শ্রদ্ধেয় অমিতাভ চৌধুরীর কাছে শুনেছি, অমৃতময়ীর কন্যা আনন্দময়ীর নামেও এই সংস্থা থেকে প্রকাশিত হয়, 'আনন্দবাজার পত্রিকা'। শ্রীমতী সরলাবালা সরকার (শ্রীশ্রীসারদামায়ের আশ্রিতা) তাঁর মাতুলালয়ে গিয়ে অর্থাৎ তুষারবাবুর কাছে কাগজ প্রকাশের ইচ্ছা করলে তাঁকে আনন্দবাজার প্রকাশের অনুমতি দেওয়া হয়। সুরেশচন্দ্র মজুমদার প্রকাশনার দায়িত্ব নেন। শিবরাম চক্রবর্তী 'যুগান্তর' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন। পাঁচশ টাকার বিনিময়ে এই নামটির স্বত্ব কিনে নিয়ে জন্ম হয় 'যুগান্তর' পত্রিকার। কিন্তু সে সময়ে সংবাদপত্র সংখ্যায় খুব কম ছিল না। বরং সাক্ষরতা ও পাঠকের সংখ্যাই ছিল কম। এলোমেলোভাবে সংগ্রহ করা নাম ও যেখানে সেখানে সম্পাদকের নাম পাওয়া যাচ্ছে তাঁদের নামের উল্লেখ করলে সংবাদপত্র ও পত্রিকার একটা ভারতীয় চেহারা পাওয়া যাবে। এবং তুলনা করা যাবে বাংলার সংবাদপত্র ও পত্রিকার সঙ্গে।

স্টেটসম্যান (তদানীন্তন সম্পাদক কে এস র‍্যাটক্লিফ), বেঙ্গল রেকর্ডার, অ্যাডভোকেট, টাইমস অব ইন্ডিয়া, ট্রিবিউন, নিউ ইন্ডিয়া, ডন, ইন্ডিয়ান রিভিউ, মডার্ন রিভিউ, প্রবুদ্ধ ভারত, হিন্দু রিভিউ, ইন্ডিয়ান মিরার, সানডে মিরর, ইন্ডিয়ান সোসাল রিফরমার, ইংলিশম্যান, ইন্ডিয়ান মেসেনজার, (এটি ব্রাহ্মদের মুখপত্র) আর্য, আর্যবালবোধিনী, ইন্ডিয়ান নেশন, ইন্ডিয়ান ডেইলি নিউজ, ইন্ডিয়ান স্পেকটেটার, টুয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরি, ট্রুথ, ডেইলি ক্রনিকাল, পায়োনিয়ার, প্রগ্রেস, ক্রিটিক এবং আরও। এদের মধ্যে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান কাগজ হল স্টেটসম্যান, মর্নিং লীডার, ইংলিশম্যান, ইন্ডিয়ান ডেইলি নিউজ, এলাহাবাদের পায়োনিয়র ও বোম্বাই-এর টাইমস অব ইন্ডিয়া ও বম্বে গেজেট। লাহোর থেকে 'ট্রিবিউন', 'ইস্ট ওয়েস্ট সিন্দ জার্নাল', 'সিভিল অ্যান্ড মিলিটারি গেজেট', মহারাষ্ট্র ও পুনা থেকে বালগঙ্গাধর তিলকের 'মারাঠা', 'পুনা অবজারভার', মাদ্রাজ থেকে 'মাদ্রাজ মেল' ও 'মাদ্রাজ টাইমস', 'মাদুরা মেল', মাদ্রাজ থেকে দেশীয়দের ইংরেজি কাগজ 'মাদ্রাজ স্ট্যান্ডার্ড', 'হিন্দু' এবং বাঙালি পরিচালিত ইন্ডিয়ান নেশন রইস অ্যান্ড রায়ত ও কৃষ্ণকুমার মিত্র সম্পাদিত 'সঞ্জীবনী'।

সংবাদপত্র প্রকাশের ব্যাপারে তখন মাদ্রাজ দ্বিতীয়। বাংলা প্রথম। বাংলায় 'কর্মযোগিন' বের করেন শ্রীঅরবিন্দ। ভগিনী নিবেদিতা তাঁকে অনেক সাহায্য করেন। 'বন্দেমাতরম্‌ও' চলে অরবিন্দ কারারুদ্ধ হওয়া পর্যন্ত। বাংলার জ্বালাময়ী কাগজ হল হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের হিন্দু পেট্রিয়ট। তাঁরই নামের রাস্তায় তাঁর বাসভবনের সামনে দিয়ে যখন যাই, চোখে জল আসে। মনে মনে তাঁকে প্রণাম জানাই আর ভাবি আজকের সাংবাদিক আর সেদিনের সাংবাদিকতার কথা। মনে পড়ে কাশীপ্রসাদ ঘোষ সম্পাদিত 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার' পত্রিকার কথা।

সম্পাদকজীবন গ্রহণ করা মানেই প্রবল চাপ ও দুঃখ গ্রহণ করা। বিশেষত পরাধীন ভারতে। আজ মনে পড়ে কত সম্পাদকের আদর্শের জন্য আত্মবলিদানের কথা। বত্রিশ সিংহাসনের কাহিনীতে আছে, রাজভোজ যখন বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনে বসতে যাচ্ছেন, তখন বত্রিশটি পুতুল তাঁকে বিক্রমাদিত্যের বত্রিশটি আত্মত্যাগ ও ন্যায়বিচারের কাহিনী শুনিয়েছিল। শুনিয়েছিল জীবনের ঝুঁকি ও সর্বস্বদান করে নিঃস্ব হয়ে যাবার কথা। তারপর

বলেছিল, তুমি যদি এমন হতে পার রাজা? যেমন ছিলেন রাজা বিক্রমাদিত্য, তবে যাও বসো ওই সিংহাসনে। তোমার আপন অধিকারে।'

আজও, আজকের সাংবাদিকতার জগতে এই প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয় সাংবাদিকদের। কখনও সম্পাদককে। এমনকি কখনও কখনও স্বত্বাধিকারীকে। কারণ অর্থ ও ক্ষমতার লোভ, রাজনৈতিক ফায়দা ওঠানো দুর্জনেরা ক্রমশ বাড়ছে। কমছে না।

সেইসময় বেরত 'সন্ধ্যা'। সম্পাদক ছিলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। 'সন্ধ্যা' পড়ার জন্য তখন কাড়াকড়ি। বৃটিশ সরকারের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী ছিল অগ্নিবর্ষী। রাজদ্রোহী বলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হলে তিনি বলেন, 'ইংরেজের সাধ্য নেই আমাকে জেল দেয়।' দেশবন্ধু তাঁর জন্য মামলায় দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু জেলেই অসুস্থ হয়ে ক্যাম্পবেল হাসপাতালে তিনি তাঁর শেষ প্রতিজ্ঞাটি রেখে যান তাঁর শেষনিঃশ্বাসের সঙ্গে। ব্রহ্মবান্ধব লিখেছিলেন বন্দেমাতরম সম্পাদক অরবিন্দ ঘোষ সম্বন্ধে--'ইনি বঙ্কিমের ভবানন্দ, জীবানন্দ, ধীরানন্দ স্বামী।' 'বন্দেমাতরমে' রাজদ্রোহিতামূলক কিছু লেখা প্রকাশিত হলে অরবিন্দ অভিযুক্ত হন। এ ব্যাপারে বিপিনচন্দ্র পালকে সাক্ষ্য দিতে ডাকা হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁকে বলেন যে, (১) যদি বিপিনচন্দ্র বলেন যে অরবিন্দ ওই সম্পাদকের নামহীন কাগজের সম্পাদক, তবে কাগজ উঠে যাবে, আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হবে ও অরবিন্দর জেল হবে। (২) যদি অস্বীকার করেন তা মিথ্যাভাষণ হবে, (৩) যদি কোন উত্তর দিতে অস্বীকার করেন, আপনার জেল হবে। বিপিনচন্দ্র তৃতীয় পরামর্শটি মেনে নেন। তাঁর ছ'মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয়। কিন্তু 'বন্দেমাতরম' সম্পাদককে ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকির মজঃফরপুরের কিংসফোর্ড হত্যা ষড়যন্ত্রের পর, ক্ষুদিরামের ফাঁসি ও সমস্তিপুর স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে প্রফুল্ল চাকি হত্যার পর, বোমা তৈরির ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অপরাধে তাঁর গ্রে স্ট্রিটের বাড়ি থেকে হাতে হাতকড়া পরিয়ে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর সঙ্গে গ্রেপ্তার হয় ত্রিশটি তরুণ। যতদিন এই মামলা চলেছে, ততদিন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন আহার, নিদ্রা ছেড়ে লড়েছেন। আদালতের বিচারপতি বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, He is the Maker of criminal law.

সাংবাদিকতা এবং যে কোন প্রগতিমূলক ক্ষেত্রে, আর এক বহুধাবিস্তৃত ব্যক্তিত্ব কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়। ১৮৪০-৭০-এর মাত্র ত্রিশ বছরে পরমায়ুকালে কি না করে গেছেন তিনি। জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত সিংহ বংশে জন্মে কালীপ্রসন্ন ছ'বছর বয়সে পিতৃহীন হন। তিনি বাল্য থেকেই অলৌকিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন এবং এ বিষয়ে অভিভাবক হরচন্দ্র ঘোষ তাঁর গুরু। তের চোদ্দ বছর বয়সেই এই রূপবান মেধাবী বালক, স্বগৃহে Debating Club ও 'বিদ্যোৎসাহিনী' সভা খোলেন। কালীপ্রসন্ন ওই বয়সেই বুঝেছিলেন যে শিক্ষার অভাবই আমাদের সব দুঃখের জড়। তিনি মহাত্মা বেথুনকে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে সহায়তা করেন। ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে তাঁর বিবাহ হয়। বাংলা ইংরেজি ও সংস্কৃতে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল, এ তো হুতোম প্যাঁচার নকসা পড়লে ও 'মহাভারত' অনুবাদে তাঁর আগ্রহ দেখানোতেই পরিস্ফুট হয়। ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি 'বিদ্যোৎসাহিনী' পত্রিকা প্রকাশ করেন ও বাংলা নাটকে গঠন ও পুষ্টির জন্য প্রতিষ্ঠা করেন 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ'। ১৮৫৮-১৮৬৬ পর্যন্ত তিনি বহু কৃতবিদ্য পণ্ডিতের সহযোগিতায় ব্যাসদেবের মহাভারত অখণ্ড বাংলায় অনুবাদ করেন। তিনি আলাদাভাবে গীতা অনুবাদ করেন এবং তা প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পর। ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি 'সর্বতত্ত্ব প্রকাশিকা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পরিত্যাগের পর, তিনি 'বিবিধার্থ সংগ্রহের' সম্পাদনা গ্রহণ করেন। অন্যের দ্বারা সম্পাদিত বহু পত্রপত্রিকাকে তিনি অর্থসাহায্য করতেন। এমনকি উর্দু

পত্রিকাকেও। তিনি লেখকদের উৎসাহ দেবার জন্য কাগজে প্রবন্ধের বিষয় ও তার ওপর সেই সেকালে ২০০ টাকা পর্যন্ত পুরস্কার ঘোষণা করতেন। বহু অবৈতনিক বিদ্যালয়, দুঃস্থ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মেধাবী ছাত্রদের পাঠের জন্য, মাতৃভাষার উন্নতি সাধনের জন্য, দুর্ভিক্ষে, জনহিতকর যে কোন প্রয়াসে, দাতব্য ঔষধালয়ে তাঁর নিয়মিত দান ছিল। ভাল পানীয় জলের জন্য তিনি বিদেশ থেকে বহু সহস্র টাকা ব্যয় করে চারটি ধারাযন্ত্র আনেন। রাজরোষ উপেক্ষা করে তিনি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি মর্ডান্ট ওয়েলস-এর বিরুদ্ধে বহু সহস্র লোকের স্বাক্ষর সহ লন্ডনে সেক্রেটারি অফ স্টেট চার্লস উডের কাছে চিঠি পাঠান। এই ওয়েলস নামক ব্যক্তিটি রেভারেন্ড লঙ সাহেবকে (নীলদর্পণ মামলায় দণ্ডিত) একমাস কারাবাস ও হাজার টাকা জরিমানা করেন। টাকাটা তখনই কালীপ্রসন্ন সিংহ দিয়ে দেন, কিন্তু কখনও ওয়েলস এর বাঙালি জাতি সম্বন্ধে অপমানকর মন্তব্যগুলো ভুলতে পারেননি। বিচারাসনে বসে ওয়েলস বলত, "বাঙালিরা মিথ্যাবাদী ও প্রতারক।" ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে কালীপ্রসন্ন রেভারেন্ড লঙ-এর ভারত ত্যাগ কালে তাঁকে একটি সুন্দর অভিনন্দনপত্রও দেন। বিচারপতি হিসেবে কালীপ্রসন্ন সিংহ সততা, দক্ষতা ও অসামান্য কৃতিত্ব দেখান। অপরিচ্ছন্ন এলাকার জন্য তিনি খোদ বর্ধমানের রাজাকে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা করেন। অথচ রাজা তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধু ও নিজের লেখা 'বিক্রমোর্বশী' নাটক তাঁকে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে উৎসর্গ করেছিলেন। অসাধু ব্যবসায়ী ও পুলিশের কার্যকলাপ নজরে রাখেন ও শাস্তিবিধান করেন। ওজন মাপ ও ব্যবসায় জুয়াচুরি তাঁর সময়ে চলত না। হিন্দু পেট্রিয়ট, 'সোমপ্রকাশ', 'সংবাদ প্রভাকর' তাঁর প্রশংসা করে। নিজের বিচারের ত্রুটিও গোচরে এলে তিনি তা শুধরে নিতে পরান্মুখ হতেন না। কালীপ্রসন্নর সম্পাদনা প্রসঙ্গে আগেও উল্লেখ রয়েছে, তিনি 'পরিদর্শক' নামে একটি দৈনিক কাগজও কিছুদিন সম্পাদনা করেছিলেন। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী ও পরিবার অর্থাভাবে পড়লে কালীপ্রসন্ন ৫০০০ টাকা দিয়ে ওই পত্রিকার মুদ্রণযন্ত্র ও সর্বস্বত্ব কিনে নেন ও কাগজটি চালু করেন। কেবল হিন্দু পেট্রিয়ট নয়, আরও কয়েকটি কাগজও তাঁর ব্যক্তিগত ও আর্থিক আনুকূল্য লাভ করে। 'দূরবীন' নামক একটি উর্দু সংবাদপত্রের স্বত্ব কিনে তাঁর সম্পাদক নবাব আবদুল লতিফ খানকে দিয়ে চালান। এই হল সাংবাদিক কালীপ্রসন্ন সিংহের মাত্র ত্রিশ বছর পরমায়ু। একটি তৎপরতার সংক্ষিপ্ত দিক।

হরিশ মুখার্জির সাঁইত্রিশ বছরেই মৃত্যু হয়। ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে বৈশাখ মাসে তাঁর জন্ম ভবানীপুরে । দারিদ্র্যের জন্য ইউনিয়ন স্কুল ছাড়েন ছ-সাত বছর বয়সে। পিতলের থালা বিক্রি করে চাল কিনে তবে খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হত। 'টলা' কোম্পানিতে দশ টাকা মাসবেতনে একটি চাকরি জোটে। সৈনিক ব্যয়ের অডিট অফিসে পরীক্ষা দিয়ে প্রথম হয়ে ২৫ টাকা মাইনের একটি কেরানির কাজ পান। সেই কাজ ও দক্ষতা দেখে মাইনে বাড়তে বাড়তে ৪০০-এ পৌঁছায়। সাহেবরা তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। কর্নেল চ্যাম্পনিজ তাঁকে খুব ভালবাসতেন। একবার এক রেজিস্ট্রার অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁর সম্বন্ধে বলেন Look at the man. সঙ্গে সঙ্গে তিনি পদত্যাগপত্র দেন। পরে কর্নেল চ্যাম্পনিজ তাঁকে নানাভাবে বুঝিয়ে পদত্যাগ থেকে নিরস্ত করেন। হরিশচন্দ্র বই পড়তে ভালবাসতেন। অফিসের পর 'মেটকাফ' হলে তিনি পড়তে যেতেন। তিনি পাঁচমাসের মধ্যে পঁচাত্তর ভলিয়ুম 'এডিনবরা রিভিউ' পড়ে ফেলেছিলেন। তাঁর অফিসের সিনিয়ররাও তাঁকে বই পড়তে দিতেন। ডক্টর ডফ-এর মনোবিজ্ঞানের বিষয়ে বক্তৃতা শুনতে যেতেন। আইন এত ভাল জানতেন যে

শম্ভুনাথ পণ্ডিত পর্যন্ত অবাক হয়েছিলেন। কেরানিগিরি করে, ইংরেজের দাসত্ব করেও হরিশচন্দ্রের রাজনৈতিক কার্যকলাপ সাহেবদের বাধা পায়নি। হরিশচন্দ্র কিন্তু গভর্নমেন্টের কার্যকলাপ দোষ গুণ নিয়ে বলতেন ও লিখতেন। কাশীপ্রসাদ ঘোষের 'হিন্দু ইনটালিজেনসার', ইংলিশম্যান, ফিনিক্স হরকরায় তিনি ইংরেজিতে লিখতেন। ঠাকুরদের দ্বারা পরিচালিত 'বেঙ্গল রেকর্ডারেও' লিখতেন তিনি। ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে হিন্দু পেট্রিয়টে একা লিখে আগ্রহী পাঠক পেলেন না। সাহেবরা দেশী লোকের লেখা ইংরেজি পড়ত না। আর দেশী লোকের ক'জনই বা তখন ইংরেজি বুঝত? একশো দেড়শ গ্রাহক। কাগজ চলে মাইনের টাকায়। পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ তাঁকে সাহায্য করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নির্লোভ হরিশচন্দ্র সে সাহায্য নেননি। অক্ষরগুলো পুরনো আর ভাঙা হওয়ার জন্য ছাপা লেখা ভালভাবে পড়াও যেত না। পরে প্রতাপচন্দ্র তাঁকে কিছু নতুন টাইপ কিনে দেন। পরের ধন নিলে যদি স্বাধীনতা যায়। যদি কুরুচিকে প্রশ্রয় দিতে হয় — এই ছিল স্বাবলম্বী হরিশচন্দ্রের ভয়। সিপাহী যুদ্ধের সময় হিন্দু পেট্রিয়ট একা লড়াই করে যায়। দেশের অহিতকর কোন প্রস্তাব মেনে নেয় না। ইংরেজরা যখন কলকাতাবাসীর নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব আনে, 'হরিশচন্দ্র তার তীব্র প্রতিবাদ করেন। লর্ড ক্যানিং তখন দেশের বড়লাট, সিসিল বিডন ভারত সরকারের সেক্রেটারি। লর্ড ক্যানিং হোম ডিপার্টমেন্ট থেকে, ষোলই মে ১৮৫৭-তে ঘোষণা করেন যে তাঁরা এ দেশের মানুষের ধর্মে হস্তক্ষেপ করবেন না। হরিশ এর ভূয়সী প্রশংসা করেন। কিন্তু ১৮৫৭-তে একবছরের জন্য মুদ্রণযন্ত্র আইন পাশ হলে দেশীয় ও বিদেশী সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব হয়। বিদ্রোহের পর দেশ কোম্পানির দখল থেকে মহারানী ভিক্টোরিয়ার দখলে আসে। লর্ড ক্যানিং-এর দীর্ঘ সনদে আশা পূরণ ও শান্তির প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। হরিশচন্দ্র এইসময় তাঁর লেখনীকে করেছিলেন যুদ্ধের কামান, এবং লেখাকে বারুদ। কিন্তু হরিশচন্দ্রের সাংবাদিক বিশ্লেষণী-যুদ্ধের সমাপ্তি তখনও হয়নি, নীল বিদ্রোহ শুরু হয় তারপর-পরই। নানা অত্যাচার ও ঘটনার ঘনঘটার পর ইন্ডিগো কমিশন বসে। তাতে হরিশচন্দ্রকে জবানবন্দি দিতে হয়। সেই দীর্ঘ জবানবন্দির শেষে হরিশচন্দ্র স্পষ্ট বলেন যে নীল চাষ প্রজাদের পক্ষে ক্ষতিকর বলে আমি মনে করি। শত শত দরিদ্র প্রজা ভবানীপুরে তাঁর কাছে আসত। আশ্রয় নিত। দুঃখ জানাত। তিনি তাঁদের খেতে দিতেন। থাকতে দিতেন। দুঃখের কথা শুনতেন। দরখাস্ত লিখে দিতেন।

কিন্তু বাংলার দুর্ভাগ্য যে এমন মানুষ এমন দরদী সাংবাদিক, শেষে ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের ১৪ জুন মাত্র সাঁইত্রিশ বছরে লোকান্তরিত হলেন। মৃত্যুর পর তাঁর বসতবাড়িটি পর্যন্ত ঋণের কারণে বিক্রি হয়ে যাচ্ছিল। বৃদ্ধা মা ও স্ত্রীকে তিনি পথের কাঙালি করে যান। কেবল ভাবেন দেশের মঙ্গলের কথা।

আজ এই গৌরবময় ইতিহাস, এই মহৎ সাংবাদিক ও সম্পাদকদের কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে সাহসী লেখকদের কথা, মনে পড়ে লর্ড কার্জনের ভারতীয়দের চরিত্র হননের প্রতিবাদে নির্ভীক বীর নারী সিস্টার নিবেদিতার লেখা সাহসী প্রতিবাদের কথা, মনে পড়ে নির্ভীক স্টেটসম্যান সম্পাদক র‍্যাটক্লিফের নিবেদিতার সেই লেখা ছাপানোর সাহসের কথা। আর দেখি, স্বাধীনতার পরে বাংলার সংবাদপত্রে এল কি ধরনের স্বাধীনতা? কেমন ধরনের নির্ভীকতা? আজকের সংবাদপত্র কি সত্যিই হরিশ মুখার্জির উত্তরসূরী। কালীপ্রসন্নর ঐতিহ্যের অধিকারী? ব্রহ্মবান্ধব বা শ্রীঅরবিন্দের মত ভয়শূন্য? আজ কি মনে পড়ে না 'লাঙ্গল', 'ধূমকেতু'র জ্বালাময়ী সম্পাদকীয় লেখা কাজি নজরুল ইসলামকে, যিনি সম্পাদকীয়র জন্য বরণ করেছিলেন কারাজীবন। বলেছিলেন,

কারার ঐ লৌহকপাট
ভেঙে ফেল কররে লোপাট
রক্ত-জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদী।

কোথায় এমন লেখক? কোথায় এমন সম্পাদক? পাঠক তো আজ দিশেহারা। তারা দিশা খুঁজছে।

কোথায় এমন সব মানুষ — যাঁকে রবীন্দ্রনাথ জেলখানায় লিখেছিলেন — 'অনশন ভাঙো, তোমাকে দেশের প্রয়োজন।' আজ খবরের কাগজের প্রকৃত মালিক 'হৌস'। সম্পাদকের চেয়ে স্বত্বাধিকারীর মুখ বেশি স্পষ্ট। লেখক ও কর্মচারীরা সেই বন্ধ ঘরের অন্ধকারের রাজার নির্দেশে লাঠি ঘোরানোর খেলা খেলেন। আজ আমরা কোন 'সম্পাদকীয়' পথনির্দেশ বা প্রতিবাদী লেখা পাই না। সারা বাংলার ফোর্থ স্টেটের আজ সামনে কোন আদর্শ নেই, দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বণিকের মানদণ্ড ধনিকের রাজদণ্ড হয়ে। 'যো হুকুম' বলবার জন্য লালায়িত লেখকদের ফেরুপালের মধ্যে একটা 'সিংহ'-ও নেই। সব ভিতরে ক্যাসেট ভরা পুতুল এবং ব্রেন ওয়াশড্ ভেড়ুয়ার দল। মাস-মাইনের বদলে যা বলাও বলি। যা করাও করি। আজ ফোর্থ স্টেট, রাজনৈতিক দলাদলিতে বিভক্ত ও অধিকৃত। গোপন বিদেশী আঁতাতে সেক্স ও ভায়োলেন্সে ভরা, কেচ্ছার ঘটনা আর ঘৃণ্য দলাদলির আস্তানা। সমগ্র বিশ্ব তার পরিত্যক্ত বাতিল ডাস্টবিনের ডালা যেন আমাদের এই উপমহাদেশের দিকে খুলে দিয়েছে। আর আমরা লোলুপ-ক্ষুধার্ত ভিখারির মত সেইসব বাতিল উচ্ছিষ্ট নিয়ে কাড়াকড়ি করে ছাপছি। একটা স্বাধীনতা পাওয়া উন্নয়নশীল দেশে, ফোর্থ স্টেট দেশবাসীর মনস্কতাকে কি একচুল এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছে। আজ ভারতের বৃহত্তম টাকা রোজগারের মাধ্যম চলচ্চিত্রর দিকে ফিরুন। বড় বড় পরিচালকদের অর্থাভাবে তুলনায় কমার্শিয়ালিটির কি নির্লজ্জ শোভাযাত্রা। এইসব ছবি কেবল ভারতে নয়, রমরম করে চলে বহির্ভারতে। মিডল ইস্টে। সেখানে মানুষ কোন ভারতের প্রতিচ্ছবি দ্যাখে? কমার্শিয়াল থিয়েটার, ওয়ান-ওয়াল, যাত্রাও তাই। যেখানে নারী মাংস বিতরণের অঢেল ব্যবসা। কাঁচা নির্জলা ধেনো। মোটা দাগের অবাস্তবতা। কেন্দ্রীয় সরকারের আওতায় এখনও আছে দূরদর্শন ও বেতার। পরাধীন ভারতে যে চাপ ও নিষেধাজ্ঞার মধ্যে বেতার কাজ করত, আজকে তা করছে একটা আমলাতন্ত্রের ভীতিতে। প্রমোশন ও ট্রান্সফারের লোভ ও আতঙ্ক — এখন যে যায় লঙ্কায় তাকেই বানিয়ে দিচ্ছে রাবণ। আমাদের দেশের মূল সমস্যাগুলি মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার সবচেয়ে বড় মাধ্যম বেতার। শতকরা শত পার্সেন্ট মানুষের কাছে পৌঁছানো কোন ব্যয়সাধ্য ঘটনাই নয়। পৃথিবীর কোথাও এতগুলি ভাষায় বেতার অনুষ্ঠান প্রচার হয় না। বহির্বিশ্বের জন্যও বেতার বিদেশী বহু ভাষায় ব্রডকাস্ট করে। কিন্তু আমার দীর্ঘ বেতার অভিজ্ঞতায় ইন্দিরা গান্ধী নন্দিনী শতপথী, আই কে গুজরাল ও অজিত পাঁজার মত মননশীল তথ্য ও বেতারমন্ত্রী আমি পাইনি। কিন্তু মন্ত্রিত্ব উজ্জ্বল হলেও ঘোরপ্যাঁচ তৈরির যড়যন্ত্রী তলার আত্মস্বার্থপর আমলাতন্ত্র। তাই নিখুঁত প্ল্যান যখন সিজেরিয়ান করে ভূমিষ্ঠ হয়, তখন তা হয়ে দাঁড়ায় এক বিকলাঙ্গ সন্তান। অন্যদিকে দূরদর্শন। আজ দূরদর্শন দেখে কে? নির্জীব, নীরস, ভুল বানান, ভুল বাক্যগঠন, শব্দ ব্যবহারের এলোমেলো ভাব — অকথ্য সিরিয়াল আর ফর্মান অনুযায়ী ফর্মুলাগত মৃতসব ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম।

কাজ জানলেই কি কাজ করার আবহাওয়া পাওয়া যায়। বাধা-নিষেধের সঙ্গে লড়তেই

তো দিন যায়। বেশি চলতি স্রোতের বিরুদ্ধে গেলেই ট্রান্সফার। কলকাতা থেকে যাও 'লে'-তে কিংবা পাসিঘাটে', 'আন্দামানও' হতে পারে — সেখানে নিজের ক্রিয়েটিভিটি দ্যাখাও গিয়ে।

অথচ একটা সময় ছিল যখন, বেতার, থেকেই প্রচারিত হয়েছিল সমরেশ বসুর বিতর্কিত উপন্যাস 'বিবরের' রিভিউ। বুদ্ধদেব বসুর বিতর্কিত কাব্যনাটক 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী'। বেতারে উদঘাটিত হয়েছিল দার্শনিক কার্লমার্কসের দেড়শ বছর পূর্তির ওপর তিনটি প্রবন্ধমালা, মাও-সে-তুং এর কবিতা, হো চি মিনের কবিতা, ফিডেল কাস্ত্রোর কবিতা। কই কোন শাস্তির খাঁড়া তো নেমে আসেনি। সূর্য সর্বজ্ঞ কিন্তু তার দ্বারা গরম হওয়া বালির তাপই অসহনীয়। বলা হয়েছে সাম্প্রদায়িকতা, ব্যক্তির পাবলিসিটি, কোন শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের প্রতি ডেরোগেটারি বিশেষণ প্রয়োগ ও অশ্লীলতা চলবে না। ভাষা উচ্চারণ ও প্রয়োগের উন্নতিসাধন। বেতার সে ভূমিকা পালন করে। 'চাষা', 'কুলি', 'চাকর', 'হরিজন', 'ঝি,', 'মুটে', 'মেথর', এই জাতীয় বহু শব্দ — কথায় কথায় 'মাইরি', 'শালা', 'হারামি' বা ইত্যাদি ইত্যাদি ভাষা বেতারে যখন নিষিদ্ধ — তখন ওই ধরনের শব্দে দূরদর্শন মুখরিত। দূরদর্শনের বানান ভুলের অভিযোগ তো বহু ব্যক্তির মুখে শুনেছি। তাই আমাদের স্বদেশী মিডিয়া স্বাধীনতার পরেও, প্রকৃত স্বাধীনতায় পা রাখতে পারেনি। আমরা যা দেখি তা জীবনানন্দ দাশের কথায়—ব্যবহৃত ব্যবহৃত ব্যবহৃত হয়ে শুয়ারের মাংস হয়ে গেছে। মা মিডিয়া নয় মেডুসা। ইউরিপিডিস এর 'মীডিয়া'। অথচ মিডিয়া পারত শিক্ষা, সাক্ষরতা ও একতা প্রতিষ্ঠার বাহন হতে। এখন আবার মিডিয়া পুতুলনাচের প্রথম শ্রেণীর, প্রথম সারির টিকিট কেনা যাচ্ছে বিদেশী মদতে। ডলার, মার্ক, পাউন্ড কিংবা ইয়েনে। তাই সকালে উঠে আমরা যখন সংবাদপত্র পড়ি তখন তার তারিখটা না দেখে নিলে বুঝতে পারি না সেটা কালকের, আজকের অথবা আগামী দিনের? যা অনুষ্ঠান দেখি বা শুনি তাও ফেসলেস ডেটলেস — পাঁচবছর আগের না পরে বোঝা যায় না। তবু রেডিও খোলা থাকে দূরদর্শন ছবি দেখায়, বাড়িতে কিছু আওয়াজ হয়—গরু হোক গাধা হোক মানুষ হোক কিছু ছবিপত্তর তো দেখা যায়।

আজ তাই আমাদের নতুন জেনারেশনের কাছে কাগজ বা টিভি বা বেতার বাতিল। অবসলিট। খেলার পাতাটায় একটু চোখ বোলানো। কোন 'লালু' বা 'রাবড়ি'র চেয়ে তাদের কাছে এখন অনেক প্রিয় 'কেবল্'। তবু তো 'কেবল্'-এ বৈচিত্র্য আছে, আছে ঝাঁ চকচক ব্যাপার-স্যাপার। মুখে চিউইংগাম, সামনে 'ভি' টিভির ন্যাংটো নাচ — একটা ঝাল গরগরে ব্যাপার, তাই না? তরুণ প্রজন্ম এই 'কেবল্' জননীর কোলেই মানুষ (?) হয়ে উঠছে। ইনি আসলে তারকা না কংসের পাঠানো 'তাড়কা' — তা কেই বা জানেন। সবাই তো এখন সন্ধেবেলা 'মোহন কাপুরের' সঙ্গে জুয়া খেলেন — চাকা ঘোরে, সে চাকার নাম 'হুইল অফ মিসফরচুন'।

কিন্নর রায়

স্বাধীনতা, যেমন মনে হয়

আমার রেল চাকুরে বাবা প্রায়ই বলতেন, তোমাদের সৌভাগ্য তোমরা স্বাধীন দেশে জন্মেছ। সেটা ষাট দশকের গোড়ার কথা। চালের দাম বাড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে অন্য জিনিসও। 'সোসালিস্টিক প্যাটার্ন'-এর সমাজ গড়তে চাওয়া জহরলাল নেহরু বড় আবেগে কতদিন আগেই না বলেছিলেন, কালোবাজারি, মজুতদারদের ল্যাম্প পোস্টে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেয়া হবে। সেই স্বপ্নের ল্যাম্প পোস্ট আর পোঁতা হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পেরিয়ে আসা খণ্ডিত ভারতের সামনে তখন পার্টিশান, রিফিউজি, কলোনি, রিফিউজি কার্ড, এরকম আরও কত কত নতুন শব্দ — বিশেষ করে এই পশ্চিমবাংলায়। হয়ত বা ও বাংলাতেও — তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আমাদের মধ্যবিত্ত জীবনকে নেড়েচেড়ে, ভেঙে দিয়ে গেছিল। প্রায় মুছে যাওয়া মূল্যবোধ, অবক্ষয় — যেমনটি পড়েছিলাম প্রবোধকুমার সান্যালের 'অঙ্গার' গল্পে, যা নিয়ে মৃণাল সেন ছবিও করেছিলেন অনেক পরে — সত্তরে এসে, 'কলকাতা ৭১' ছবির দ্বিতীয় গল্পটি ছিল 'অঙ্গার'। প্রথমটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আত্মহত্যার অধিকার'। তৃতীয় সমরেশ বসুর 'এসমাগলার'। সে যাক গে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আমাদের জীবনে অনেক নতুন নতুন শব্দ এনেছিল — ব্ল্যাক আউট, সাইরেন, অল ক্লিয়ার, এ আর পি, টমি, মিলিটারি ডিসপোজাল, ব্ল্যাক মার্কেট, হোর্ডিং, কনট্রোল, রেশন আরও কত কি! দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চুকেবুকে যাওয়ার পর কলকাতার ফুটপাথে মিলিটারি ডিসপোজালে বিক্রি হত প্যারাসুটের কাপড়, কনডেনসড্ মিল্ক, টিনের মাছ-মাংস, মাখন, জ্যাম, পেতলের কেরোসিন ল্যাম্প, মশা তাড়াবার স্মোক বম্ব, মিলিটারি ইউনিফর্ম, টুপি, জুতো, অন্য ধরনের ল্যাম্প। এছাড়া অনেক কিছু ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ লাগার পর লোহার অভাবে আলপিনের বদলে বেল কাঁটার ব্যবহার চালু হয়েছিল বহু অফিসে। যুদ্ধের বাজারে রাতারাতি গজিয়ে ওঠা অনেক অফিস যুদ্ধের পরই মুখ থুবড়ে পড়েছিল। তার ফলে আরও অনেক নতুন নতুন বেকার।

এসব কথা বলা এই জন্যে, সেকেন্ড গ্রেট ওয়ার যে সব নতুন নতুন শব্দ আমাদের জীবনে পেরেক ঠোকা করে বসিয়ে দিয়ে গেল, তার সবই থেকে গেল স্বাধীনতার পরেও। বরং সর্ষের তেলে যে শেয়ালকাঁটা মেশানো হয়, আর সেই তেল খেলে বেরিবেরি রোগে পা মুখ ফুলে যায়, তা আমরা আরও বেশি করে জেনে গেলাম ১৯৪৭ এর ১৫ আগস্টের

পর। চালে কাঁকর, ময়দায় তেঁতুল বিচির গুঁড়ো, চায়ে চামড়ার গুঁড়ো, জিরে গুঁড়োয় নাকি ঘোড়ার গুয়ের ভেজাল — এসব শুনতে পেতাম তখন।

দুধে জল তো ছিল বড় পুরনো ব্যাপার। তা নিয়ে শিব্রাম চক্রবর্তীর সেই বিখ্যাত গল্পও তো আছে। মাসের পর মাস ভেজাল দুধ খাওয়া এক গৃহস্থ অবাঙালি গোয়ালাকে বলেছিল, আসলে তুমি তো জল মেশানো দুধ নয়, দুধ মেশানো জল দাও। তা ঠিক আছে আমি দুধের দাম নয়, গোরুকে যে খড় খাওয়াও তার দাম দিলাম।

টাকা নিয়ে গুনে, নিজের কাপড়ের গেঁজেয় সাজিয়ে রাখতে রাখতে সেই গোয়ালা একটুও না ঘাবড়ে জবাব দিয়েছিল — আসলে খড়ের দাম কেন, আপনি তো খড়ির দাম থেকে অনেক বেশি টাকা দিলেন। আপনাকে তো এতদিন দুধ বলে আসলে খড়ি গোলা জলই দিয়েছি।

মহাভারতের অশ্বত্থামাকে দ্রোণাচার্য পিটুলি গোলা খাওয়াতেন দুধের বদলে। বলতেন, এটাই দুধ। দুঃস্থ, সৎ, দরিদ্র ব্রাহ্মণ পিতা এর থেকে আর কী-ই বেশি করতে পারতেন (দয়া করে 'দলিত' সত্তার ভাবনায় চিহ্নিত এলিটরা আবার এটিকে বর্ণ হিন্দুদের পক্ষে সাফাই বলবেন না যেন)।

স্বাধীনতার দুধের বদলে শুধুই খড়িগোলা পেয়েছি — এমন একটা বিশ্বাসবোধ থেকে আমরা অনেকেই দেখতে পেয়েছিলাম ১৯৪৭-এর পর একটি দশক কেটে গিয়েছে। তেভাগা, তেলেঙ্গানা, 'এ আজাদি ঝুটা হ্যায়'-এর সময় পেরিয়ে আসা পশ্চিমবঙ্গে তখনও বিধানচন্দ্র রায়, অতুল্য ঘোষ, নির্মলেন্দুবাবু (বদু)-দের প্রভূত দাপট। না ভাঙা কমিউনিস্ট পার্টি (সি পি আই) ১৯৫২ সালের প্রথম নির্বাচনে অংশ নিয়েছে, তেলেঙ্গানার অস্ত্র নামিয়ে রেখে। পান্নালাল দাশগুপ্ত, হেনা গাঙ্গুলি (হিরণ্ময় গাঙ্গুলি), বিন্ধ্যা সিং, অমর রাহা — এরকম অনেকের নেতৃত্বে দমদম-বসিরহাট করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে আর সি পি আই। কট্টর স্তালিন বিরোধী, কবি সৌমেন ঠাকুরের সঙ্গে তীব্র মতভেদ হয়ে গেছে পান্নাবাবুদের। পরে তো পান্নাবাবুও এই রাজনৈতিক বিশ্বাস থেকে সরে গিয়ে গান্ধীবাদী হিসেবে গ্রাম-উন্নয়নে নামলেন। আজও তিনি সমান সক্রিয়। গ্রামোন্নয়ন, পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলনে, আশ্চর্য নির্লোভ জীবন যাপনে তিনি এখনও অনেকের আদর্শ।

এখন মাঝে মাঝে মনে হয়, 'এ আজাদি ঝুটা হ্যায়' বলে রাস্তায় না নেমে কমিউনিস্ট পার্টি যদি 'জেন্টল কলোশাশ' জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে স্বদেশ পুনর্গঠনে নামত! একথা আরও বেশি মনে পড়ে যখন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের লেখায় পাই জওহরলাল কাকদ্বীপ মামলায়, ফাঁসির হুকুম হয়ে যাওয়া সি পি আই-এর জঙ্গীনেতা কংসারি হালদারের ফাঁসি মকুব করানোর জন্যে বারে বারে অনুরোধ করেন পশ্চিমবাংলার তখনকার মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়কে।

সত্যিকারের বড় বড় পুলিশ মিলিটারির অত্যাচার নিশ্চয়ই হয়েছে তেলেঙ্গানা, তেভাগার কমিউনিস্ট কর্মী, নেতাদের ওপর। সাধারণ কৃষকও আক্রান্ত হয়েছেন। চন্দন পিঁড়ির ঘটনা, শহিদ অহল্যা, পুলিশি বর্বরতা — সবই তো ইতিহাস হয়ে আছে। কিন্তু এও তো ঠিক দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আমাদের এই ভারত ছাড়া কোথায় সংসদ, খবরের কাগজ শাসক দল ও বিরোধীদের বড় বড় কেলেঙ্কারি ফাঁস করেছে? দেবজ্যোতি বর্মনের বিড়লাবাড়ির আর্থিক অসঙ্গতি প্রকাশ করার মাধ্যম ছিল তো 'যুগবাণী' (নামটি ঠিক লিখলাম তো?) নামের একটি প্রায় অখ্যাত কাগজ। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোন দেশে এভাবে সংসদ কার্যকর থেকেছে স্বাধীনতার পরপরই। বিপুল চাপের সামনে দেশকে

ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক কাঠামোর ধাঁচে রাখার সাহস যাঁরা দেখিয়েছিলেন, থাক না সেই গণতন্ত্রে, ধর্মনিরপেক্ষতায় কিছু জল — কিন্তু প্রতিবেশী আর কোন দেশে এই নিরীক্ষা হয়েছে?

স্বাধীনতার ৫০ বছর পর কালাহাণ্ডি, বোলাঙ্গির মত ঘটনা হয় আমাদের এই দেশে। আবার দেশের খবরের কাগজ, অন্যান্য মাধ্যম, সংসদই তা ফাঁস করে দেয়। নিন্দা করে। কেউ কেউ বলতে পারেন, এটা 'আই ওয়াশ' — কিন্তু ধীরে হলেও মানুষের উন্নতি হয়েছে। গ্রামের মানুষ গায়ের জামা, হাতঘড়ি, জুতো, সাইকেল, এমন কি টেলিভিশন, স্কুটারের স্বাদও পেয়েছেন। তবু বর্ণান্ধতা, ধর্মান্ধতা আছে। বোম্বাই দাঙ্গায়, মিরাটে, অযোধ্যার বাবরি মসজিদ ভাঙায় প্রশাসন ধর্মনিরপেক্ষ থাকতে পারেনি। পি এ সি গুলি চালিয়ে বিশেষ ধর্মের মানুষদের খুন করে মিরাটে। কাশ্মীর, অন্ধ্র, বিহার, দণ্ডকারণ্য, বা অন্য কোথাও কোথাও জারি থাকে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। বিহারে রণবীর সেনা, সানলাইট সেনা ও অন্যান্য সেনারা বেছে বেছে খুন করে দলিতদের। কিন্তু তবু বলতে হয় ভারতের সংসদীয় ব্যবস্থা, সংবাদপত্র ও কিছুটা ধর্মনিরপেক্ষ শাসন কাঠামো প্রতিবেশী রাষ্ট্রদের কাছে আদর্শ হতে পারে বৈকি।

স্বাধীনতার পর প্রথম দশক পেরোনোর অনেক আগেই তেলেঙ্গানা, তেভাগা, দমদম-বসিরহাট ও কাকদ্বীপ ষড়যন্ত্র মামলার অভিযুক্তরা জেল থেকে ছাড়া পান। জওহরলাল নেহরু তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী, বিধানচন্দ্র রায় মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবাংলার। মুরগির পেটে মুরগি ঢুকিয়ে রোস্ট করে খান জওহরলাল — এমন প্রায়ই শুনতাম তখন। কাগজে সে সময় প্রায়ই বেরোত নেহরুর পর কে? এমন কি যৌথ নেতৃত্বে দেশকে শাসন করার প্রস্তাবও এসেছিল তখন। বিধানচন্দ্রের নামে তাঁর বিরোধীরা ছড়া বানিয়েছিলেন :

'আবার এসছে নলিনী বিধান
বাংলার নারী হও সাবধান।'

ষাটের গোড়া থেকেই একটু একটু করে চালের দাম বাড়ছিল। সঙ্গে অন্যান্য জিনিসের দরও। তবুও তখন ষাট, সত্তর পয়সা কিলো খুব ভালো চাল। চল্লিশ পঞ্চাশ পয়সাতেও এক কিলো চাল পাওয়া যায়। নুন তিন নয়া পয়সায় কিলো। একটা দু নম্বর খাতা দু আনা। চার নম্বর চার আনা। লিচু শ এর হিসেব। একশো লিচু দু টাকা, তিন টাকা। জামের কুড়ি দশ নয়া পয়সা, বারো নয়া পয়সা। টাকায় পাঁচটা ল্যাংড়া আম পাওয়া যায়। হাঁসের ডিমের জোড়া আট আনা। ফাটা হলে তিরিশ চল্লিশ পয়সা। কাটা পোনার কিলো চার টাকা। মাত্র চার আনায় (পঁচিশ পয়সা) এক জোড়া ফুলকপি পাওয়া যায়। ঝুনো নারকেল এক টাকা জোড়া। ভাঙা অর্ধেক নারকেল মালা পনের কুড়ি পয়সা। শীতে আলুর কিলো কুড়ি-পঁচিশ পয়সায় নামে। বাড়তে বাড়তে তা পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর পয়সা হয় গরমে। পাঁচ নয়া পয়সায় মিষ্টি মোচা পাওয়া যায়। এক ফালি কুমড়োরও তাই দাম। পটল পঁচিশ পয়সা কিলো। রসগোল্লা, সন্দেশ টাকায় আটটা — মানে দু আনা পিস। এক টাকার কিনলে একটা ফাউ। দানাদার এক আনা মানে ছ'নয়া পয়সা। গুজিয়া তিন নয়া পয়সা। এক টাকার বড় রাজভোগ একটা। দোকানে ছ'নয়া পয়সা, দশ নয়া পয়সার মিষ্টি দই চাইলে ময়রা বাঁকা চোখে তাকায় না। বরং খানিকটা দইয়ের জল মাটির হাঁড়িথেকে কেটে দিয়ে দেয়। দু পয়সার মুড়ি-মুড়কিতে পেট ভরা জল খাবার হয়। গোরুর দুধের সের এক টাকা। মোষের দুধ দেড় টাকা। দু পয়সার বাদাম চানাচুর চাইলে মুদি দোকানি সহজেই দিয়ে দেয়। এক নয়া পয়সায় পাওয়া যায় টক-মিষ্টি মিটার লজেন্স। তিন নয়ায় মর্টন, লর্ডস বা প্যারীর

কাগজ মোড়া লজেন্স। রান্নায় বা লুচি ভেজে খাওয়ার শাদা রঙের ভয়সা নাকি ভৈঁসা ঘি, দশ টাকা কিলো। গাওয়া ঘি পনেরো টাকা। ভাতে মেখে সেই ঘি অনেক মধ্যবিত্তর মেনুতে। কোনো কোন পরিবারে ঘি কখনও কখনও আসে বিহারের সাহেবগঞ্জ বা অন্য অনেক 'দিহাত' থেকে। 'লক্ষ্মী ঘি', 'বিশ্বনাথ ঘি', 'শ্রী ঘি'-ও বিক্রি হয় টিন বন্দি করে। চার সাড়ে চার টাকায় এক কিলো সর্ষের তেল। বারো আনা এক টাকা সের মসুর ডাল, তিন নয়া পয়সায় কাঁচা লঙ্কা, আদা পাওয়া যায় বাজারে। এক টাকা চার আনা হলে তিন জনের সংসারে দৈনিক বাজার হয়ে যায়।

তবু ষাটের গোড়ায় ১৯৬২-র চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ আমাদের জীবন খানিকটা উল্টে পাল্টে দিয়ে গেল। ১৯৬৪-তে ভাঙল কমিউনিস্ট পার্টি। যদিও তার ভাঙনের ছবি ফুটে উঠেছিল বাষট্টির পর পরই। স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ আইন নিয়ে সেই সময় সাধারণ মানুষ বেশ বিপদে পড়েন। আর তার ফলে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী মোরারজি দেশাইয়ের নাম অনেকটাই খারাপ হয়ে যায়।

ষাটের এই যে জিনিসপত্রের দাম, যেখানে খাসির মাংস আড়াই-তিন টাকা কিলো, কচ্ছপের মাংস দেড় টাকা পাঁচসিকে (তখন বাজারে কচ্ছপ কেটে মাংস বিক্রি করা বৈধ ছিল। আর মূলত উড়িষার মানুষ কচ্ছপের মাংস বিক্রি করতেন)। তবু কি মানুষ যথেষ্ট পরিমাণ খেতে পেতেন? পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বহু জয়নাদ শুনতে পেতাম কিন্তু গ্রামে বন্যা বা খরা হলেই মানুষ ভিক্ষে করতে শহরে চলে আসতেন। ঘন ঘন বন্যা, খরা হতোও। গলায় হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে ময়লা, জীর্ণ কাপড় পরা মানুষ ন্যাংলা বাচ্চার হাত ধরে 'বন্যায় ভেসে গেছে ঘর' বলে শহরে ভিক্ষা চাইতেন। সত্যি বলতে কি, গত কুড়ি বছরে পশ্চিমবাংলার শহরের রাস্তায় ভিক্ষা করা লোকজন অনেক কমে গেছে। ষাটের দশকে এসব হতে হতেই সাতষট্টির খাদ্য আন্দোলন চলে আসে। তারপরই পশ্চিমবাংলার প্রথম অকংগ্রেসি যুক্তফ্রন্ট সরকার। তারও পরে নকশালবাড়ি।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চা হে কে বাঁচিতে চায়/দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে কে পরিবে পায়/ঐ শুন ঐ শুন ভেরীর আওয়াজ হে ভেরীর আওয়াজ...' আমরা বাল্যকালে পড়েছি। কিংবা নজরুলের 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু ...' 'চল চল চল উর্দ্ধ গগনে বাজে মাদল' অথবা রবীন্দ্রনাথের বহু দেশাত্মবোধক গান। বাবা তাঁর কৈশোরে দেখা পঞ্চম জর্জের করোনেশানে কলকাতার বাড়ি বাড়ি আলো জ্বালাবার গল্প করতেন। সরকার থেকে প্রদীপ, মোমবাতি কেনার জন্যে অনুদান দেয়া হয়েছিল প্রত্যেক পরিবারকে দু টাকা এক টাকা, এরকম কিছু। আর বলতেন আই এ পাশ করার পর কলেজে দু বছরের ডিগ্রি কোর্স পড়ার সময় তাঁদের অবশ্য পাঠ্য ছিল বাইবেল। তার জন্যে নম্বর থাকত। এসব বলতে বলতেই ১৯২৪-এর শ্রাবণ মাসে জন্মানো আমার বাবা বলতেন তোমাদের সৌভাগ্য তোমরা স্বাধীন দেশে জন্মেছ। এটুকু বলার পরও কখনও কখনও ক্রমাগত বাজার দর বাড়া দেখে ক্ষোভে-দুঃখে তিনি আবারও বলে উঠতেন — এর থেকে ব্রিটিশ রাজত্ব অনেক সুখের ছিল।

পূর্ব বাংলায় ভিটে মাটি অনেকটা স্বপ্ন হারিয়ে আসা অনেকের মতোই আমার বাবাও একেবারেই পছন্দ করতেন না জহরলাল নেহরু আর মহাত্মা গান্ধীকে। তাঁর অন্ধ আনুগত্য ছিল সুভাষচন্দ্রে। খানিকটা শ্যামাপ্রসাদে। কিছুটা বল্লভভাই প্যাটেলে। ফজলুল হক, সুরাবর্দিদের সঙ্গে 'জয়েন্ট বেঙ্গল'-এর স্বপ্ন দেখা শরৎ বসুও তাঁর চোখে 'প্যাট্রিয়ট'। কাশ্মীরের নিশাতবাগে বন্দি অবস্থায় জনসংঘ নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপ্যাধ্যায় মারা যান

কেওড়াতলায় তাঁর মৃতদেহ দেখে এসে আমরা বাবা ও পিসেমশাই সেদিন সারা দিন কিছু খাননি। কংগ্রেসকে কখনই ভোট দেননি বাবা। তাঁর ভোট পেয়েছে কমিউনিস্টরা। কখনও জনসংঘ।

পূর্ববাংলা ছেড়ে আসার অপমান, কষ্ট, বাবাকে সারাজীবন ছিন্নভিন্ন করেছে বহু বাঙালির মতোই। ঢাকার মানিকগঞ্জ সাব ডিভিসানের পাটগ্রামে আমাদের পৈতৃক বাড়ি শেষ পর্যন্ত পদ্মাগর্ভে চলে গেছিল — দেশভাগের পর, এটুকু বলে বাবা শান্তি পেতেন। তবে জনসংঘকে ভোট দিলেও তাঁকে কখনও উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদী হতে দেখিনি। তিনি ভোট দিতেন সুদর্শন, সুবক্তা, হাওড়ার নরসিংহ দত্ত কলেজের অধ্যাপক হরিপদ ভারতীকে। যিনি একবারও হাওড়া কেন্দ্রের লোকসভা আসনে দাঁড়িয়ে জিততে পারেননি। যেমন পারেননি কবি, সুদর্শন সুবক্তা সৌমেন ঠাকুর। পরে হরিপদ ভারতী তাঁর নির্বাচন কেন্দ্র বদল করলে বাবার দুটো ভোটই পেত মার্কসবাদী কমিউনিস্টরা — লোকসভা ও বিধানসভায়। ততদিনে এক কমিউনিস্ট পার্টি ভেঙে দু টুকরো হয়ে গেছে।

এসব কথা বলা এই জন্যে আমার বাবা নেহাতই একজন ছাপোষা বাঙালি মধ্যবিত্তের প্রতীক ছিলেন। যিনি সৎভাবে বিশ্বাস করতেন সুভাষচন্দ্র এসে দেশের হাল ধরলে আমাদের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। 'জাগৃহি' কাগজে 'শৌলমারির সাধু কি নেতাজি' পড়ে তিনি উত্তেজিত হতেন। বালক ব্রহ্মচারীর 'কড়া চাবুক'-এও মাঝে মাঝে 'নেতাজি-সংবাদ' থাকত। বাবার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতার কুড়ি বছর পরেও আমরা স্বপ্ন দেখতাম কোনো ২৩শে জানুয়ারি বা ১৫ আগস্টে সুভাষ সত্যিই এসে দাঁড়াবেন মনুমেন্ট ময়দানে। আমাদের সব দুঃখ, কষ্ট, অভাব তিনি দূর করে দেবেন তাঁর জাদুচিরাগে। কিছু হুজুগে মানুষও সেই সময় সুভাষচন্দ্রকে বরণ করার জন্য ২৩ জানুয়ারি, ১৫ আগস্ট গিয়ে দাঁড়াতেন ময়দানে। তারপর হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরতেন। এমন কি সত্তরে, নকশালবাড়ির 'বজ্রনির্ঘোষের' বেশ কয়েক বছর পর আমাদের বালির অনেকের মুখে আমি শুনেছি চারুবাবুর এই পরিকল্পনার পেছনে 'তিনি' নিশ্চয়ই আছেন। কারণ তাঁকে শেষ দেখা গিয়েছিল চীনে। মাও-সে-তুঙের চীনে। আমার মা একটা কবিতার কয়েকটি লাইন মাঝে মাঝেই বলতেন :

'অভাগা আমি সন্তান তোর
ছাড়িয়া চলিনু ভারত ভূমি
আবার আসিব মুক্ত করিতে
বিদায় দে মা ললাট চুমি...'

এ কবিতা কি সুভাষের 'মহানিষ্ক্রমণ' উপলক্ষ করে কেউ লিখেছিলেন? বাবার কালো রঙের বড় স্টিল ট্রাঙ্কের একেবারে নিচের দিকে দুটো জাতীয় পতাকা ছিল। একটা খাদির, অন্যটা সস্তার সিল্কের। আর ছিল সুভাষচন্দ্রের একটা বড় ছাপা ছবি — আগাগোড়া সামরিক পোশাকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। মাথায় টুপি, পায়ে বুটপট্টি। বাঙালির স্বপ্নের 'নেতাজি'।

বাবা কোনদিন তিনরঙা জাতীয় পতাকা তুলতে দেননি আমাদের বালি শান্তিরাম রাস্তার বাড়ির ছাদে। বাবা বলতেন, স্বাধীনতা এখনও আসেনি। তখনও লেখাই হয়নি শামসুর রাহমানের 'তোমায় পাবার জন্যে স্বাধীনতা...'

আমার মামাবাড়ির একটা বড় স্বদেশি ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল। আমার মায়ের জ্যাঠামশাই শশধর রায় ছিলেন যুগান্তর দলে। তিনি ছিলেন বরিশাল শংকরমঠের অনুগামী। পৈতের ঘর থেকে তিনি সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। তাঁর সন্ন্যাস জীবনের নাম ছিল আত্মানন্দ ব্রহ্মচারী। জীবনের শেষ দিকে তিনি থাকতেন কালিঘাটের হিন্দু মিশনে। পরে গড়িয়ার কামডহরিতে

তিনি 'মানবশক্তি অনুশীলন মন্দির' নামে একটি সংগঠন তৈরি করেন। যেখানে বেদপাঠ ও বেদের নতুন নতুন ব্যাখ্যা দেয়া হতো। ১৯৭২-এর সরস্বতী পুজোর দিন তিনি মারা যান শেঠ সুকলাল করনানি হাসপাতালে। সেরিব্রাল হয়েছিল: সেটা ছিল স্বাধীনতার ২৫ বছর পূর্তির বছর।

মা বলতেন তাঁর সাধু জ্যাঠামশাইয়ের বাড়িতে অন্তরিন থাকার কথা। নয়ত দূরে অন্য কোথাও অন্তরিন। বার বার জেল বাস। রিভলবার নিয়ে ধরা পড়া। বাড়িতে পুলিশ আসা। আমার দাদামশাই প্রয়াত হরিপদ রায় ফরিদপুরে আকসা-ভোজেশ্বরের উপ্‌সি হাইস্কুলে শিক্ষকতা করতেন। প্রেসিডেন্ট ছিলেন ইউনিয়ন বোর্ডের। তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল বিপ্লবীদের।

মায়ের জ্যাঠতুতো ভাই (শ্রীরাম রায়ের ছেলে) দীনেশ মামার যোগ ছিল বিপ্লবী দলের সঙ্গে। তিনি পাড়ার থিয়েটারে ফিমেল রোল করতেন। আবার ঘন গলায় আবৃত্তি করতেন — 'ওহে মৃত্যু মোরে কি দেখাও ভয়/ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়......' নিজের চওড়া বুকে হাত ঠুকে ঠুকে তিনি এসব লাইন বলতেন বলে শুনেছি। স্বাধীনতার পর পরই তাঁর মৃত্যু হয় টিউবার কুলোসিসে।

চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক গণেশ ঘোষকে বেশ কাছ থেকে দেখি সত্তর দশকের প্রায় শেষ পর্বে। কালিঘাটে গলির ভেতর একখানা ফালি ঘরে গণেশবাবু থাকতেন। তখনও তিনি সি পি আই (এম)-এর রাজ্য কমিটির সদস্য। কয়েক বছর আগেও লোকসভা সদস্য ছিলেন। শাদা ফুলহাতা শার্ট, ধুতি, সেকেন্ড ক্লাস ট্রাম, চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। নমস্কার নিতে চাইতেন না। গলার স্বর সামান্য সরু। ওঁর ঘরের দেয়ালে মাস্টারদা সূর্য সেনের ছবি দেখেছিলাম। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ছিলেন কি? জোর করে গণেশবাবুকে প্রণাম করে বলতাম, আপনাকে ছুঁয়ে আসলে মাস্টারদাকে স্পর্শ করতে পারি। তার অনেক আগেই চারুবিকাশ দত্তের 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন' পড়েছিলাম। মা পাতা উল্টে উল্টে দেখাতেন শহিদ হরিগোপাল বল (টেগরা), মতি কানুনগো, বিভু কানুনগো, প্রভাস বল — আরও অনেকের ছবি। জালালাবাদ পাহাড়ে ব্রিটিশ ফৌজের রাইফেল, লুইস গানের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া বাঙালি যৌবন — ১৯৩০-এর ২২ এপ্রিল।

অনুশীলন সমিতির জীবনতারা হালদারকেও সত্তর দশকের শেষে সুস্থ অবস্থায় ঘোরাঘুরি করতে দেখি কলকাতার রাস্তায়। তিনিও সেকেন্ড ক্লাস ট্রামে ঘুরতেন। ছিটের হাফ হাতা শার্ট, ধুতি, পায়ে পা ঢাকা চামড়ার জুতো। ছড়া কেটে কেটে কথা বলার অভ্যেস ছিল জীবনতারাবাবুর। কলকাতার পুরনো খাওয়া-দাওয়া, রাস্তাঘাট, রান্নাবান্না, লোকজনের খবর রাখতেন। ওঁর মৃত্যুর কয়েক বছর আগে একটি সাক্ষাৎকার নিতে তাঁর উত্তর কলকাতার বাড়িতে যাই। বড় বাড়ি। দোতলায় গিয়ে দেখি একটা ছোট, আট হাতি ধুতি পরে তিনি বসে আছেন। বার বার বলছিলেন, ছবি তোলার সময় 'স্মাইল প্লিজ' বলতে হয়। আর বার বার তাঁর মেয়ে নাকি নাতনি — কে আসছে-যাচ্ছে সামনে দিয়ে জানতে চাইছিলেন। নিজের মেয়ে কিংবা নাতনিকে তিনি ঠিক করে চিনতে পারছিলেন না। ততদিনে স্বাধীনতার বয়স চল্লিশ হয়ে গেছে।

রাধারমণ মিত্রও ছিলেন অগ্নিযুগের বিপ্লবী। গান্ধিজীর সাবরমতি আশ্রমেও তিনি ছিলেন। পরে কমিউনিস্টদের সঙ্গে। মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা, কমিউনিস্ট পার্টি, ট্রাম কর্মীদের আন্দোলন, কলকাতা নিয়ে গবেষণা — সব মিলিয়ে রাধারমণবাবু। কলকাতার ঘাট নিয়ে কাজ করার সময় তাঁর সঙ্গে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হয়। তখন থাকতেন বেহালার অজন্তা

সিনেমার কাছে ওল্ড ডগ রেসকোর্স-এর একটি সরকারি হাউজিংয়ের একেবারে ওপর তলায়। পড়তেন স্টেটসম্যান আর গণশক্তি।

স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা এঁরা কেউই খুব খোলাখুলি আলোচনা করতে চাইতেন না। যেমন চাইতেন না আমার সাধুদাদু শশধর রায়। পঁচিশ টাকা করে মাসিক স্টাইপেন্ড দেয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল স্বাধীনতা যোদ্ধাদের ষাট দশকের শেষে। সাধুদাদু তা সবিনয়ে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, মাসে পঁচিশ টাকা বৃত্তি পাওয়ার জন্য আমরা ঘরবাড়ি, জীবন, যৌবন তুচ্ছ করিনি। তাঁর কাছ থেকে লিখিত জবাব পাওয়ার পর মাসিক পঁচিশ টাকার সরকারি অনুদান আর আসেনি। তখন পঁচিশ টাকার দাম কম ছিল না।

সত্তর দশকে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের তাম্রপত্র পাওয়ার আগেই তিনি মারা যান। ভাগ্যিস তাঁকে তাম্রপত্রের বোঝা বইতে হয়নি। কিংবা এটাও তো তিনি ফিরিয়েই দিতেন। যে মর্যাদাবোধ থেকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন পঁচিশ টাকার সরকারি মাসোহারা।

চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহ, কলারপোল, ধলঘাটের সংগ্রাম, রাইটার্সে বিনয়-বাদল-দিনেশের অলিন্দ-যুদ্ধ, বুড়িবালামের তীরে বালির মধ্যে ট্রেঞ্চ কেটে বাঘাযতীনের আত্মবলিদান, ক্ষুদিরামের ফাঁসি, প্রফুল্ল চাকির আত্মোৎসর্গ, ভগৎ সিং, রাজগুরু, শুকদেব, চন্দ্রশেখর আজাদ, রামপ্রসাদ বিসমিল, আসফাকউল্লা, গান্ধিজীর লবণ সত্যাগ্রহ, ডাণ্ডী অভিযান, 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' ডাক, সুভাষচন্দ্রের আই. এন. এ., নৌবিদ্রোহ, রাসবিহারী বসুর সারা ভারতবর্ষ জুড়ে বিপ্লবের চেষ্টা, কানাই, সত্যেনের ফাঁসি — এসব ঘটনা সাল তারিখ অনুযায়ী পর পর সাজানো হল না, কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা ফুল ফোটাতে এর কোনোটাই ফেলনা নয়।

কাকোরি ষড়যন্ত্রের রামপ্রসাদ বিসমিল যখন 'শির ফরোসি কি তমন্না' গেয়ে উঠতেন জেলের মধ্যে কিংবা ফাঁসির আদেশ শুনে দিনেশ-এর ক্রমাগত ওজন বেড়ে যাওয়া আর তাঁর বৌদিকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে লেখা চিঠিগুলো — যাতে তিনি নিজের ডাক নাম 'নসু' ব্যবহার করেছেন, উদ্ধৃতি দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে, আত্মার অবিনাশী তত্ত্বে বিশ্বাসী দীনেশ স্বপ্ন দেখেছেন স্বাধীন ভারতে জন্মাবার, কিংবা ক্ষুদিরাম বসু যখন তাঁর বিচার শুনতে শুনতে আদালতের কাঠগড়ায় ঘুমিয়ে পড়েন, ও বড়জোর ফাঁসিই তো হবে এ আর এমন বেশি কি ভেবে নিশ্চিন্ত থাকেন, আর ১৯৩০-এর ২০শে এপ্রিল চট্টগ্রামের জালালাবাদ পাহাড়ে ব্রিটিশ ফৌজের লুইস গান থামানোর জন্যে বার বার আড়াল থেকে বেরিয়ে গুলি ছোঁড়া টেগরা (হরিগোপাল বল) যখন ঝাঁঝরা হয়ে যায়, আর একেবারে ঘুমিয়ে পড়ার আগে সেদিনের যুদ্ধের কর্ণধার নিজের দাদা লোকনাথ বলকে বলা তাঁর শেষ কথা — সোনা ভাই, আমি চললাম — আর তাঁর উত্তরে মেজর লোকনাথ বলের সেই উচ্চারণ — সোনা ভাই! কে সোনা ভাই! যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের ধর্মই হল মৃত্যু। ডু অর ডাই — চালিয়ে যাও — কিংবা চট্টগ্রামের ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ করে প্রীতিলতার আত্মত্যাগ, শান্তি, সুনীতি, কল্পনার সাহসী চেষ্টা, মাতঙ্গিনী হাজরার শহিদ হওয়া, মেদিনীপুরে অজয় মুখোপাধ্যায়, সুনীল ধাড়াদের নেতৃত্বে ১৯৪২-এর স্বাধীন সরকার, 'বিদ্যুৎবাহিনী' — সব এক সঙ্গে জড় হতে থাকে স্বাধীনতার ৫০ বছরে। আরও আরও কত ঘটনা — গদর পার্টি, কীর্তি কিসান পার্টি — কত নাম না জানা শহিদ!

মনে পড়ে ষাটের দশকের ঘোড়ায় বালি শান্তিরাম স্কুল মাঠে জাতীয় পতাকা তোলা হত জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের উদ্যোগে। আমরা বালি জোড়া অশ্বত্থতলা স্কুল থেকে দলবেঁধে আগস্টের রোদে লাইন করে এসে মাঠের মধ্যে দাঁড়াতাম। শূন্যে পতাকা উঠে

যেত। উড়ত বাতাসে। আমরা সবাই 'জয় হিন্দ, বন্দেমাতরম্' বলতে বলতে অপেক্ষা করতাম কচকচে চালকুমড়োর মিষ্টি টুকরো বা কিশমিশ দেওয়া আধখানা বান রুটির নয়তো গোটা দুই বোঁদের লাড্ডুর। তারপর সিনেমা হলে, 'শ্রীকৃষ্ণ'তেই মূলত -- বিনা পয়সায় সরকারি প্রচার চিত্র। সেখানে হুড়পাড় করে ঢুকে পড়া — পতাকা তোলার জায়গা থেকে ফিরে। দেশের উন্নয়নের নানা ছবি ফুটে উঠত। সিনেমার পর্দায়। ঘণ্টাখানেক দেখানোর পর টিকিট কেটে 'ভুলি নাই', '৪২', 'বাঘাযতীন', নয়তো 'ক্ষুদিরাম'। তখন সিনেমার টিকিট ৩৭ পয়সা। মর্নিং শোয়ের সেই সব সিনেমা দেখতে পারিনি। পকেটে পয়সা ছিল না। বাবা দিতে পারতেন না। তাঁর পক্ষে দেয়া সম্ভবও ছিল না। — এখন বুঝি।

সরকারি প্রচার চিত্র দেখে ডিংসাইপাড়া, গোস্বামী পাড়া হয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফিরতাম। বিনে পয়সায় পাওয়া আধখানা বান রুটি বা বোঁদের লাড্ডু কখন যেন তলিয়ে গেছে খিদের গভীরে। মাথার ওপর আগস্টের দম চাপা মেঘলা আকাশ। কখনও মেঘলা ভাঙা তীব্র রোদ। অনেক বাড়ির ছাদেই পতপতে তেরঙা। আমার শাদা হাফ প্যান্টে প্যারেডের ধুলো। পেটে খিদে।

আমার থেকে সাত বছরের বড় স্বাধীনতাকে তখন কী করে খুব আপন হিসেবে দেখতে পেতাম?

জয়া মিত্র

স্বাধীনতার মুখ

বছর বারো আগে দেখা এক মহিলার কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ে। দক্ষিণ কলকাতার একটি লাইব্রেরিতে তখন আমি নিয়মিত যাতায়াত করতাম। সেখানে দুপুরে খাওয়ারও একটা ব্যবস্থা ছিল। সেই মহিলা ওই লাইব্রেরিতে চাকরি করতেন। আমি তাঁকে কখনও খেয়াল করিনি, জানি না তিনি আমাকে খেয়াল করেছিলেন কি না। একদিন প্রায় শেষ দুপুরে খাবার ঘরে ঢুকেছি, আমার দেরি হয়ে গিয়েছিল। দেখলাম এক মহিলা খাওয়া শেষ করে উঠছেন, টেবিলের ওপর রাখা একটা বড়সড় হ্যান্ডব্যাগ, হলঘরে আর কেউ নেই। আমার খাওয়ার সময়টুকু খেয়াল করলাম মহিলা বসে রইলেন। ব্যাগ থেকে কিছু বার করছেন, ঢোকাচ্ছেন একটু অস্থির মত। চোখে চোখ পড়তে মনে হল কিছু বলবেন, শেষ পর্যন্ত বললেন না। তখনই দেখলাম খুব মার্জিত সুন্দর চেহারা কিন্তু কেমন যেন ম্লান কালিপড়া মত।

করিডোরের কোণে একটু ছোট অ্যান্টিরুম মত জায়গা, সেখানে হাত ধোবার বেসিন। যখন হাত ধুচ্ছি তখন উনি উঠে এসে আমার কাছে দাঁড়ালেন। খুব চাপা গলায়, কিরকম সন্ত্রস্তভাবে জিজ্ঞেস করলেন আমি কোন মেয়েদের সংগঠনে কাজ করি কি না। আমি একটু অবাক হয়ে এই প্রশ্নের কারণ জানতে চাইলে তিনি সেই সন্ত্রস্ত চাপা গলায় তাড়াহুড়ো করে আমাকে এক অদ্ভুত বিপন্নতার কাহিনী শোনান। তিনি কলকাতার কোন একটি অত্যন্ত প্রভাবশালী ধনী পরিবারের পুত্রবধূ। এম এ এবং তারপরও আরও কিছু পড়াশুনো শেষ করবার পর তাঁর বিয়ে হয়েছে। আরও দু'জন অবিবাহিত বোন আছেন তাঁর। বাপের বাড়ি ধনী ও বনেদী, অর্থাৎ 'যা চলছে তা চলতে দেওয়া'তেই বিশ্বাসী।

বিয়ের পর দশ বছর পার হয়ে গিয়েছে—কোন সন্তান জন্মায়নি তাঁর। তাঁর স্বামী কোনমতেই ডাক্তারি পরীক্ষা করাতে রাজি নন। প্রথমে পরোক্ষভাবে এবং পরে যথেষ্ট স্পষ্ট করেই শ্বশুরবাড়ির লোকেরা জানিয়েছেন ছেলের আবার বিয়ে দেবেন এবং ডিভোর্স দেওয়াটা তাঁদের পরিবারের পক্ষে সম্মানহানিকর—সুতরাং সে পথেও যাবেন না। সেক্ষেত্রে অতি সহজ একটিই বিকল্প খোলা থাকে—মেয়েটিকে মেরে ফেলা। ঠিক এই কথাটাই সেই মহিলা বলেছিলেন আমাকে। অসহায় আতঙ্ক ছিল তাঁর মুখে। ব্যাগ খুলে দেখালেন একটা শাড়ি, জামা কিছু টাকার এক মরিয়া সংস্থান নিয়ে সেদিন কাজের জায়গায় এসেছেন তিনি। দু'তিনদিন ধরেই আসছেন আর মনে মনে খুঁজে চলেছেন কাকে বলতে পারেন এই

ভয়ঙ্কর বিপদের কথা। একই সঙ্গে খুব ভয় পাচ্ছিলেন যদি তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা কোনভাবে জানতে পারে এই আশ্রয় সন্ধানের কথা। তাদের পারিবারিক গোপন অভিলাষ বাইরের কোন লোকের কানে পৌঁছতে পারে এমন সন্দেহমাত্রও যদি হয় তবে আর কোন অবকাশই পাবেন না বধূটি।

বাপের বাড়ি গিয়েছিলেন, সেখান থেকে বাড়ির সম্মান রক্ষার দায়িত্ব মনে করিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছু সাহায্য পাননি। ওয়ার্কিং গার্লস মেস কিংবা এমনকি তাঁর সেই কার্যক্ষেত্রের কর্তৃপক্ষও তাঁর শ্বশুরকে অসন্তুষ্ট করতে চান না—সুতরাং 'মানিয়ে চলা'র উপদেশই পেয়েছেন সেসব জায়গা থেকেও। অবশ্য সহজবোধ্য কারণে এরমধ্যে কোথাওই তিনি বলতে পারেননি প্রাণভয়ের কথা। আমাকেও তিনি বারেবারে বলছিলেন 'আপনাকে আমি বলতে পারছি এইজন্য যে আপনি তো আমাকে চেনেন না, আমার স্বামী শ্বশুরের পরিচয়ও জানেন না। তাঁকে আশ্রয় ও ভরসা দিতে পারে এমন কোন নারী সংগঠনের হদিস কি দিতে পারি আমি—এই ছিল তাঁর প্রশ্ন। বলি যে খুব চেষ্টা করব খুঁজে বার করতে। ওরকমভাবে কোন কিছু ঠিক না করে একটা শাড়ি নিয়ে বাড়ি ছেড়ে আসা যায় না বাস্তবে—এতে তাঁর বিপদ বাড়বে—এসব কথা বলে সেদিন বাড়ি ফিরে যেতে বলি তাঁকে। পরের দু'দিন দুই-তিন জায়গায় খোঁজ করে বিফল হই। তারপর আমাকে ফিরে আসতে হল নিজের জায়গায়। একমাস পর আবার যখন সেই লাইব্রেরিতে যাই, তাঁকে দেখিনি। আমি তো তাঁর নামও জানতাম না যে কাউকে জিজ্ঞেস করব।

কিন্তু সেই প্রাণভয়ে ভীত আর্ত মুখখানা, সন্ত্রস্ত দ্রুত কথা বলা আমার মনের মধ্যে এক অসহায়তার ভার হয়ে চেপে আছে এখনও।

ঠিক সেই অবস্থাটা হয়ত আর নেই আজ। রাজ্য সরকার নারী নির্যাতন প্রতিরোধের সেল খুলেছেন, খবরের কাগজগুলি এরকম ব্যাপারে অনেক বেশি দায়িত্বশীল ও সোচ্চার এখন, পাস হয়েছে নতুন কিছু আইনও। আর, এসবের চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও ভরসার কথা এটা যে বেশ কিছু নারী সংগঠন সাহস ও শক্তি নিয়ে তৈরি হয়ে উঠেছেন। কিন্তু তবু, যারা সরাসরি কাজগুলোর সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন কিংবা যেসব মেয়েরা নিজেরা পড়েছেন কোন সঙ্কটে, এই অগ্রগতির পরও বাস্তবে তাঁদের অবস্থাটা ঠিক কি! দু'একটি কেস স্টাডি দেখব আমরা।

তার আগে দেখা যাক গত পঞ্চাশ বছরে মেয়েদের নিরাপত্তার সমস্যার চেহারা পাল্টেছে কতটা কিংবা সত্যিই পাল্টেছে কি না। সূক্ষ্ম কোন তত্ত্ববিচারে না গিয়ে আলোচনা করব মোটামুটি যেসব সমস্যা চোখের সামনে দেখা যায় সেগুলো নিয়েই।

একটা কথা প্রায়ই বলতে শোনা যায়—মেয়েদের ওপরে অত্যাচার নিয়ে এত বাড়াবাড়ি রকমের চেঁচামিচি হত না চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে! বধূহত্যা কিংবা অপরপক্ষে বিবাহবিচ্ছেদের কথা শোনাও যেত না। এখন পান থেকে চুণ খসলেই সেটা নিয়ে চেঁচিয়ে তুলকালাম বাঁধানো হয়। আগে মেয়েদের ধৈর্য, আত্মত্যাগ অনেক বেশি ছিল, এখনকার মেয়েরা অসহিষ্ণু এবং তাদের লজ্জাশরমও কম—যেসব লজ্জার কথা লুকিয়ে রাখার সেসব তারা প্রকাশ্যে টেনে আনে

এইসব কথা মেনে নিয়ে সেগুলো একটু ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখা যাক। সাহিত্যের সাক্ষ্য অর্থাৎ লেখালিখির কথা বাদ দিলেও নিজেদের আগের প্রজন্ম বা মাসিপিসি কাকিমা অন্যান্য পরিচিত মহিলাদের পারিবারিক বা ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষেত্রে দেখব যে কোন দুঃখকষ্ট অবিচার নিঃশব্দে মেনে নেওয়াটাই রীতি ছিল। একটি মেয়েকে সমস্ত দিক থেকে

শেখানো হত—নম্রতা, সহ্য, নিজেকে বঞ্চিত রাখাই মেয়েদের ধর্ম। দেশভাগ ও স্বাধীনতার আগেকার এইসব মেয়েরা সাধারণত বড় পরিবারে, বাড়ির মধ্যেই থাকতেন। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের দুই ক্ষেত্রেই তাদের ব্যক্তি-পরিচয় চাপা থাকত অন্যান্য বিষয়ের নিচে। যুদ্ধ, দেশভাগ তারপর— স্বাধীনতা আমাদের সমাজে অনেক বড়বড় ভাঙচুর ঘটাল। আকস্মিক মূল্যবৃদ্ধি, পরিবারের ওপর ছিন্নমূল হয়ে আসা আত্মীয়স্বজনের চাপ অথবা উদ্বাস্তু হয়ে আসা পরিবার, বিশ্বযুদ্ধের আমল থেকে ধীরে ধীরে মেয়েদের বিধিগত শিক্ষার (academic education) প্রচলন বৃদ্ধি পাওয়া---এসব নানা কারণে মেয়েরা ক্রমশ ঘরের বাইরে বেরোয়, চাকরি করা, পড়াশোনা করা মেয়েদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যরকম বেড়ে ওঠে। শিক্ষা ও আপেক্ষিক স্বাধীনতা এইসব মেয়েকে শেখায় নিজেদের জীবনের দুঃখকষ্টকে, অসম্মানকে 'স্বাভাবিক' বলে না ভাবতে। এক পক্ষের প্রতিরোধবিহীনতা থেকে, ক্রমাগত মেনে নেওয়া থেকে উদ্ভূত যে 'শান্তি' তা চিড় খেতে থাকে। খেয়াল করলে দেখা যাবে শুধু পুরুষ প্রাধান্যের বিরুদ্ধে নয়, জাতিভেদ অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে, রাজনৈতিক প্রামাণিক কেন্দ্রিকতার বিরুদ্ধে—এককথায় বলতে গেলে অধিক ক্ষমতাবানের নিপীড়নের বিরুদ্ধে দলিতদের অসন্তোষ ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। এরই বিশ-পঁচিশ বছরের মধ্যে একদিকে পরিবর্তিত অর্থনৈতিক কাঠামো অন্যদিকে পিতৃপ্রাধান্যের বিরোধিতা---এই দুই ধাক্কায় ভেঙে পড়তে থাকে আমাদের প্রাচীন একান্নবর্তী বড় বড় পরিবার। ব্যক্তিমানুষের স্বর, তার অধিকার ও ন্যায় বিচারের দাবি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। একথা সমাজের 'অস্পৃশ্য' জাতিদের ক্ষেত্রে যেমন সত্যি মেয়েদের ক্ষেত্রেও সত্যি। অর্থাৎ বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ধনতান্ত্রিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের ভাবনা আমাদের সমাজে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। কিন্তু ওপরে, শিক্ষিত সমাজের একটি অংশের মধ্যে এই ভাবনার প্রভাব, স্বাধিকারের দাবি স্পষ্ট হয়ে উঠলেও এই ঔপনিবেশিক, শিক্ষাবিহীন সমাজে মূল ভাবনা সামন্ততন্ত্রেরই অনুসারী।

ফলে একদিকে মেয়েদের সমানাধিকার দেওয়ার এমনকি কখনও কখনও অতিরিক্ত সুরক্ষা দেওয়ার, আইন তৈরি হতে থাকে অন্যদিকে সেই আইন যারা প্রয়োগ করবেন তাদের নিজেদের মানসিকতা রয়ে যায় এসব সংস্কারের বা স্বীকৃতির পরিপন্থী। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এইসব উন্নয়ন কেবল কাগজপত্রেই লেখা রয়ে গেল। তফাৎ হল প্রধানত এই যে মেয়েরা ক্রমশ লুকিয়ে মার খাবার বদলে অত্যাচারের প্রতিবাদ করছেন, এমনকি মৌখিক হলেও, দেশের বিভিন্ন শহর ও গ্রামাঞ্চলে সামাজিক অত্যাচারের প্রতিবাদে মেয়েরা সংগঠিত হচ্ছেন—যেমন আশির দশকে অন্ধ্রপ্রদেশে গ্রামের মেয়েদের বিরাট মাদক-বিরোধী আন্দোলন; ফল হোক বা না হোক মেয়েরা অত্যাচারের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নিচ্ছেন। ইতিমধ্যে সমাজও একজায়গায় দাঁড়িয়ে নেই—সারা পৃথিবীতেই বিষাক্ত ভাইরাসের মত ছড়িয়ে পড়ছে ধনতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ ও তার বেঁচে থাকবার জন্য প্রয়োজনীয় দর্শন—ভোগবাদ। পণ্যবস্তু, ভোগ্যবস্তুর লোভ সমাজের এক বিশাল অংশ মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করছে। এই পণ্যবস্তুর লোভ নতুন করে মেয়েদের বিমূল্যায়ন করছে। তাদের দেখা হচ্ছে পণ্য হিসাবে বাজার হিসাবেও এবং মেয়েদের এক অংশ নিজেরাও নিজেদের ভাবছেন পণ্য-সংস্কৃতির এক আধার। অবশ্য ছেলেরাও নিজেদের এরকম ভাবছেন না এমন নয়। এর ফলে নতুন করে আমাদের ঘর-গৃহস্থালীতে জেগে উঠেছে জিনিসের, ভোগ্যবস্তুর আকাঙ্ক্ষা—লোভ। বিয়েতে বা বিবাহিত জীবনে তার ছাপ পড়ছে। যেনতেন প্রকারে জিনিস পাওয়ার এক মানসিকতা বিয়েতে নতুন ধরনের পণপ্রথা চালু করেছে—পণ

বা টাকার বদলে বেশি বেশি করে চাওয়া হচ্ছে যৌতুক, এমনকি মেয়েরা নিজেরাও চাইছে তা। ফলে আরও বেশি জিনিসের লোভে মেয়েটিকে পীড়ন করা কিংবা এমনকি হত্যা করার ঘটনা ক্রমশই বেড়ে উঠছে। যেহেতু এইসব সম্পর্ক গড়ে উঠবার সময়ে প্রথম প্রাধান্য পাচ্ছে ভোগ্যবস্তু ফলে সম্পর্কের মধ্যে মানসিকতা বা মূল্যবোধের ঘাটতি থাকছে। হিংস্রতা বাড়ছে। পরিবারস্থ নিপীড়নের (domestic violence) সঙ্গে লড়বার একটি দীর্ঘস্থায়ী অস্ত্র অবশ্যই দর্শনগতভাবে ভোগবাদের সঙ্গে লড়া।

অগ্নিনির্বাপনের শ্রেষ্ঠ উপায় হাতের কাছে জলের ব্যবস্থা রাখা—একথা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু যখন যথেষ্ট পরিমাণ কুয়ো-পুকুর খোঁড়া হয়নি ততক্ষণ ঘরের বেড়ায় লাগা আগুন ঠেকাবার জন্য তো অন্যান্য প্রতিবিধান হাজির করতে হয়। মেয়েদের অধিকারের স্বপক্ষে কিংবা মেয়েদের অতিরিক্ত সুরক্ষা দেওয়ার জন্য প্রণীত আইনগুলি বিপন্ন মেয়েদের সাহায্য করবার জন্যই তৈরি হয়েছিল—কোন মেয়ের উপর শারীরিক বা মানসিকভাবে অত্যাচার করা IPC 498 অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে নির্দিষ্ট হয়েছে। কিন্তু তাতে কি সত্যিই পাল্টেছে কিছু? কোনভাবে এই ধারার ভয়ে নিবৃত্ত হয়েছে কেউ? কেন হয়নি, এই ধারার বিরুদ্ধে অত্যাচারকারীকে। তিনি পুরুষ হন বা নারী (একথা আশা করি আজ আর কেউ ভুলবেন না যে শ্বশুরবাড়িতে বৌয়ের ওপর যাঁরা শারীরিক বা মানসিক অত্যাচার করেন তাঁদের অনেকেই নারী! ভুলবেন না কেন না একথা ইতিমধ্যেই বহুবার বলা হয়েছে নারীর অধিকারের বিপরীত পক্ষ পুরুষ নয়, পুরুষতান্ত্রিক চিন্তায় বিশ্বাসী বা অভ্যস্তরা—তাঁরা পুরুষ কিংবা নারী সে কথা অপ্রধান। ঠিক যেরকম নারী প্রধানমন্ত্রী বা শতকরা তেত্রিশজন মহিলা সদস্য দেশকে বা সংসদকে নারীর পক্ষ অবলম্বনকারী করে তোলে না, যেমন আদিবাসী মুখ্যমন্ত্রী কোনক্রমেই সে রাজ্যে প্রকৃতপক্ষে আদিবাসীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেন না) সেই নিপীড়নকারী সমাজের কোন মানসিকতার সুরক্ষা পান সে সম্পর্কে একটি ঘটনা বলি—

শহরে মেয়েদের জন্য আলাদা সুরক্ষা দল মহিলা পুলিশগোষ্ঠীর কেন্দ্র 'নিবেদিতা সেন'-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান হচ্ছে। মঞ্চে শ্রদ্ধেয় মন্ত্রী শ্রীবিনয় চৌধুরী, আই জি, এম পি থেকে নিচে স্থানীয় থানার কনস্টেবলরা পর্যন্ত ধোপদুরস্ত চটপটে হাসিমুখ। মেয়েদের অধিকার তাদের বিপন্নতা নারীর মর্যাদা বিষয়ে মনুর বক্তব্য ইত্যাদি অত্যন্ত সভাশোভনভাবে পরিবেশিত ও গৃহীত হচ্ছে। হঠাৎ সেই সজ্জিত সভাঘরের মাঝামাঝি জায়গায় কিঞ্চিৎ উত্তেজনা। একজন গৃহিনীগোছের ভারিক্কি চেহারার মহিলা খুব উত্তেজিতভাবে কিছু বলবার চেষ্টা করছেন আর সদ্যগঠিত নিবেদিতা সেনের নারী সহায়িকা সদস্যারা তাঁকে বেশ রুক্ষ হাতে চেপে বসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। বিনয়বাবুর হস্তক্ষেপে মহিলা শেষ পর্যন্ত নিজের জায়গায় দাঁড়িয়েই কথা বলতে পারলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল অনেকটা এরকম 'নিবেদিতা সেন মেয়েদের সাহায্য করবে? থানার চৌহদ্দিতে বসে? ওই যে পুলিশ অফিসার (আঙুল দেখিয়ে) আজ এখানে ভাল ভাল কথা বলছেন ওঁর মনে নেই আমি নিজে একটি বিবাহিত মেয়েকে ওঁর কাছে নিয়ে এসেছিলাম—তার স্বামী সাঁড়াশি দিয়ে মেরে তার পিঠে প্রায় ইঞ্চিখানেক গভীর গর্ত করে দিয়েছিল; আর এই অফিসার বলেছিলেন বর মেরেছে তো থানায় আসার কি হয়েছে? বাড়ি যান বাড়ি যান। বাড়িতে গিয়ে তো বৌকে অমন আমিও মারি।'

সভার মাঝখানে এসব কথা হওয়ায় সকলেই একটু অস্বস্তিতে পড়েন কিন্তু ব্যাপারটা বাস্তবে ঠিক এরকমই। আইন থাকলেই বা কি! সে আইন যাঁরা প্রয়োগ করবেন তাঁরা মনে

করেন না মেয়েদের সত্যিই অতটা অধিকার থাকা উচিত। ফলে, স্বভাবতই সেই থানার অধীনস্থ এলাকায় পুনরায় গর্ভধারণে অসম্মত স্ত্রীকে স্বামী মাঝরাত্রে কম্বল চাপা দিয়ে গলা টিপে ধরলে একমাত্র সেই মহিলার ক্লাস সিক্সে পড়া শিশুকন্যাটিই জেগে গিয়ে কান্নাকাটি করে, পরদিন সকালে প্রতিবেশীদের কাছে মিনতি করে তার মাকে রক্ষা করবার জন্য। মহিলার পরিবারে অল্পদিন আগে একটি পাঁচ বছরের শিশুর মা প্রকাশ্যভাবে আগুনে পুড়ে খুন হওয়ার পর সেই পরিবারের পুরুষমানুষদের সাহস অনেক বেড়ে গিয়েছে। তারা বেশ জোরের সঙ্গে ঘোষণা করছেন—দেখে নিলাম বৌ মারলে কিছুই হয় না, খালি দুইমাসের জেলহাজত, তারপর আরেকটা বিয়ে করলেই টাকা পাওয়া যায়। কোন প্রতিবেশী নির্যাতিতা আতঙ্কিত বধূটিকে নিয়ে স্থানীয় কাউন্সিলরের কাছে ও থানায় গেলে একই উপদেশ পান—স্বামীর নামে থানায় ডায়েরি করবেন? শ্বশুরবাড়ি পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়জন সবাই অসন্তুষ্ট হবে, কি দরকার? আপনি বললে অবশ্য আমরা এক্ষুনি গিয়ে তুলে আনব, কিন্তু ভেবে দেখুন—দু'মাস পর তো জামিন পাবেই ঠিকমত ডাক্তারি সার্টিফিকেট দিলে তার আগেও পেতে পারে। তখন কিন্তু রাগে আপনাকে আরও বেশি মারবে। তখন কি করবেন? মেয়েটির মা-বাবা, বোনেরাও তাঁকে 'মানিয়ে থাকা'র কথা বলছেন। তাই আছেন তিনি। মানিয়ে। কোন কোন দিন বিকট ফুলে ওঠা চোখ, ফাটা ঠোঁট কিংবা কালশিটে পড়া পিঠ হাত গলা নিয়ে বেঁচেই আছেন, এখনও।

ভারতীয় সংবিধানে 125 CRPC আইনটি স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে খোরপোষ দেওয়া সংক্রান্ত আইন। সম্প্রতিকালে এই আইন সংশোধিত হয়ে স্ত্রীর প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ প্রায় তিনগুণ বেড়েছে (যদিও একজন মানুষের কোনমতে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার জন্য দেড় হাজার টাকা নিতান্তই অপ্রতুল)। উপরন্তু সুপ্রিম কোর্ট এক রায়ে বলেছেন যেহেতু মামলাগুলি দীর্ঘদিন চলে তাই মামলা চলাকালীনই স্ত্রী ইন্টারিম খোরপোষ পেতে থাকবেন। অথচ লিগাল এড কমিটির হাতে যে কত মামলা জমে আছে খোরপোষের! এমনকি কোর্টের অর্ডার হয়ে গিয়েছে, স্বামী তা পালন করছে না, অধিকাংশ সময়েই মেয়েটিকে বলা হয় এ বিষয়ে নতুন করে কেস করতে। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন! চুঁচুড়ার ইন্দ্রজ্যোতি ভট্টাচার্য অন্য এক বিবাহিত মহিলার সঙ্গে সম্পর্কে লিপ্ত হয়ে স্ত্রী রমা ভট্টাচার্যকে প্রচণ্ড মারধর করতে থাকে তার ব্যক্তিগত গয়নাগাটিও আত্মসাৎ করে। বহুবিধ নির্যাতনের পর শেষে অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীটিকে বাপের বাড়িতে ফেলে দিয়ে যায়। রমার সন্তানের বয়স এখন পাঁচের ওপর। কোর্ট স্ত্রী ও ছেলের ভরণপোষণ বাবদ দু'হাজার টাকা (১৫০০ + ৫০০) দেওয়ার অর্ডার দিয়েছে ইন্দ্রজ্যোতিকে বৎসরাধিক কাল আগে। সে একজন ব্যবসায়ী এবং তার দাদা আইনজীবী। তিনি কোর্টের মর্যাদা জানেন। আজ পর্যন্ত দশটি টাকাও পায়নি রমা। বৃদ্ধ রিটায়ার্ড বাবা ও মায়ের সংসারে সংকুচিত রমা ক্রমাগত চোখের জল ফেলে আর ভাবে কি করে ছেলেকে লেখাপড়া শেখাবে, তাকে বড় করবে। তবু, রমার পাশে তার মা-বাবা, দাদা-বৌদি আছেন, তাঁরা অন্তত ভরসা জোগান। শত শত রমার পাশে কেউ নেই। কি হবে তাদের? এরকম বর্ণনাতীত উদাহরণ আমাদের সবারই সামনে আছে।

কাগজ-কলমে মর্যাদা ও অধিকার পাওয়া, সমাজের বাস্তবতায় সেইসব অধিকার ও ন্যায়বিচারের অর্থহীনতা—এই দুইয়ের মাঝখানে কোন সামঞ্জস্য বিধানের অপেক্ষায় দেশের এই নাগরিকেরা আর তাদের সন্তানরা আর কতদিন অপেক্ষা করবে? যতদিন আমরা, শিক্ষিত সুযোগ পাওয়া লোকেরা এই রোগের বিধ্বংস ও মারণক্ষমতা সম্যক বুঝতে না পারব, অসহ্য অধৈর্য হয়ে চাপসৃষ্টি করতে না পারব—কোন অর্থ থাকবে না উন্নয়নমূলক

আইন প্রণয়ন কিংবা আসন সংরক্ষণের। 'যেখানে ছিল সেখানেই' তো থাকে না কোন কিছুই, মেয়েদের অবস্থাও থাকবে না, হতে থাকবে ক্রমশ জটিল, খারাপ। আর সমাজের অর্ধেক অংশ যদি খারাপ থাকে তাহলে বাকি অর্ধাংশের সুস্থ থাকা, ভাল থাকার প্রশ্ন অবান্তর।

দশ-বারো বছর আগে দেখা সেই লাইব্রেরির মহিলা বেঁচে আছেন কি না কিংবা কতদিন বেঁচেছিলেন জানি না। কিন্তু ওরকম বহু মেয়ে ও তাদের শিশুদের মুখ দেশের 'স্বাধীনতা'র সামনে সারি সারি সব জিজ্ঞাসা চিহ্নের মত জেগে আছে।

সত্যব্রত দত্ত

সংসদ কাঠামোর অনন্যতা ও উদ্ভাবন

'বাংলার আইনসভা চিতাভস্ম থেকে নবদেহ লাভ করে রূপকথার ফিনিক্স পাখির মতো উঠে আসবে।' কথাটা বলেছিলেন আজ থেকে অনেকদিন আগে ১৯১২ সালে বাংলার তৎকালীন ছোটলাট ফ্রেডরিক ডিউক বৃহৎ বঙ্গ বিধানসভার সর্বশেষ অধিবেশনে। বঙ্গভঙ্গ তখন সবেমাত্র রদ হয়েছে, ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত হয়েছে। বাংলার আইনসভা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ওড়িশা ও বিহার প্রদেশে নতুন আইনসভা গঠিত হতে চলেছে! বাংলার খণ্ডিত আইনসভার গুরুত্ব হ্রাস পাবে সদস্যরা এই আশঙ্কা প্রকাশ করলে ছোটলাট তাদের আশ্বাস দিয়ে বলেন, সংসদীয় রীতিনীতি প্রবর্তনে বাংলা এক অনুকরণযোগ্য ভূমিকা নেবে, অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।

বস্তুত ঔপনিবেশিক আমলে ভারতের সংসদ কাঠামোর বিবর্তনে বাংলা এক বিশেষ ভূমিকা নেয়! এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় ১৮৬২ সালে স্থাপিত হয় বাংলার আইনসভা! ইংরেজ শাসকদের উদ্দেশ্য ছিল, সমাজের উচ্চতর বিহারী কিছু ভারতীয়কে আইনসভার আসনে মনোনীত করে রাজানুগত্য আদায় করা এবং বিদেশী শাসনের ভিত্তি শক্ত করা। প্রথম কয়েক দশক ভারতীয় সদস্যদের রাজানুগত্যে কোনও ঘাটতি ছিল না ; রাজ-বন্দনা, ইংরেজস্তোত্র ও তাঁবেদারিতে শাসকদের সন্তুষ্ট রাখতেই দেশীয় সদস্যরা ছিলেন সদাব্যগ্র। কিন্তু খুব বেশিদিন ভারতীয়রা বিদেশি শাসকদের তল্পিবাহক হয়ে থাকেননি! আইনসভার প্রতিবাদের কণ্ঠ ক্রমশ সোচ্চার হতে থাকে! বিংশ শতাব্দীর বিশের দশক থেকে বিধানসভা হয়ে ওঠে বাংলা রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু! অনেক উজ্জ্বল বাঙালি মনীষার সমাবেশ ঘটে বাংলার বিধানসভায়। এঁদের অনেকেই ছিলেন সুবক্তা ও দক্ষ সংসদবিদ। বুদ্ধিদীপ্ত বিতর্ক, সম্ভ্রম ও সৌজন্যবোধ এবং সংসদীয় রীতিনীতির প্রতি মান্যতা ইত্যাদির জন্য বাংলার বিধায়কদের মধ্যে কেউ কেউ কমন্সসভার প্রথম সারির সদস্যদের 'সমপর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য হতেন। সারা ভারতে আইনসভার প্রথম ভারতীয় সভাপতি (স্পিকার) হন একজন বাঙালি — সৈয়দ সামসুল হুদা (১৯২১-১৯২৩)! (উল্লেখ্য, ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর 'আত্মকথা'য় সামসুদ হুদার কাছে অশেষ ঋণ স্বীকার করেছেন। দরিদ্র রাজেন্দ্রপ্রসাদকে নিজের বাড়িতে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন সামসুল হুদা এবং কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতিতে খ্যাতি লাভ করতে সাহায্য করেছিলেন।) আজিজুল হক, জালালুদ্দিন হাশেমি, নৌশেব আলি প্রমুখ অধ্যক্ষের রুলিং এখনও সংসদ পরিচালনার

নির্দেশক হিসেবে স্বীকৃতি পায়। নৌশের আলির রুলিং-এর নজির টেনে ১৯৬৭ সালে অধ্যক্ষ বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করে রাজ্যপাল ধরমবীর কর্তৃক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে মুখ্যমন্ত্রী পদে নিয়োগ অবৈধ ও অসাংবিধানিক বলে ঘোষণা করেন! সুভাষচন্দ্র বসু, চিত্তরঞ্জন দাশ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ তেরোজন কংগ্রেস সভাপতি বাংলার বিধানসভার সদস্য ছিলেন। নাজিমুদ্দিন, সুরাবর্দী, আবুল হাশিম প্রমুখ মুসলিম লিগের সর্বভারতীয় নেতা বিধানসভার আসন অলংকৃত করেছিলেন। বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় প্রথম কমিউনিস্ট সদস্য যিনি ১৯৩৭ সালে বিধানসভায় নির্বাচিত হন। তেভাগা আন্দোলন খ্যাত রূপনারায়ণ রায়ও বিভাগ-পূর্ব বিধানসভার সদস্য ছিলেন!

এক কথায় বহুবিধ অনন্যতার জন্য ইংরেজ আমলে বাংলার বিধানসভা সমাদৃত ছিল সারা ভারতে।

ইদানীং কেন্দ্রীয় সংসদ ও বিভিন্ন রাজ্য বিধানসভায় যে সব অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটছে তাতে সংসদ কাঠামোর ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেকেই সংশয় ও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন ; এর প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। সর্বভারতীয় এই প্রবণতা থেকে পশ্চিমবঙ্গও মুক্ত নয়। বিধানসভার ভিতরে সদস্যদের অশোভন আচরণ, বীভৎস বাচনভঙ্গি, সহিষ্ণুতা ও সৌজন্যবোধের দ্রুতলয় ও চমক দেখানোর আধিক্য ইত্যাদি জনসাধারণের মধ্যে আইনসভা সম্বন্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। একাধিকবার সর্বভারতীয় অধ্যক্ষ সম্মেলনে সংসদ কাঠামোর অবক্ষয়ের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। আইনসভার এই দ্রুত অবমূল্যায়ন সংসদ ব্যবস্থাকে এক চরম সংকটের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। মনে রাখতে হবে আইনসভার সংকটের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে বৃহত্তর রাজনৈতিক সংকট ; কারণ, ভারতীয় সংবিধানে যে রাজনৈতিক কাঠামোর নির্দেশ দেওয়া আছে তা একান্তভাবে আইনসভা-নির্ভর। জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতার অভিব্যক্তিরূপে আইনসভা — সংসদ বা পার্লামেন্টই ভারতের সর্বক্ষমতার অধিকারী। স্বভাবতই সংসদ কাঠামোর সংকট সামগ্রিক সংকটের সূচনা করে।

স্বীকার করতে হয় সংসদ ব্যবস্থার অনেক সমালোচনা আছে; এর উপযোগিতা সম্বন্ধেও নানা প্রশ্ন আছে! আইনসভা 'শুয়োরের খোঁয়াড়' বলেও কেউ কেউ একে নস্যাৎ করে দেন। কিন্তু এটা অস্বীকার করার পথ নেই যে স্বাধীনতা-পরবর্তী দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর রাষ্ট্রীয় জীবনের পক্ষে ক্ষতিকারক অন্য ব্যবস্থার উদ্ভব প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছে সংসদ ব্যবস্থা! সুতরাং সমাজের পক্ষে শুভ ফলদায়ক বিকল্প ব্যবস্থার উদ্ভব না হওয়া পর্যন্ত সংসদ কাঠামোর সংস্কার করে একে সংকটমুক্ত করার ব্যাপারে রাজনৈতিক স্তরে সমচেতনা ও প্রয়াস একান্তভাবে প্রয়োজন।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচ্য নিবন্ধে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিগত পঞ্চাশ বৎসরের, বিশেষ করে বামফ্রন্ট আমলের দুই দশকের (১৯৭৭-৯৬), কাজকর্মের আলোচনা করে সংসদ কাঠামোয় এর ভূমিকা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

দেশ বিভাগে পর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার প্রথম অধিবেশন হয় ১৯৪৭ সালের ২১ নভেম্বর! সদস্য সংখ্যা তখন কমে গিয়ে দাঁড়ায় ৯০তে। সংসদীয় রাজনীতিতে নতুন শক্তিবিন্যাস ঘটে! বিধানসভার ইউরোপীয় গোষ্ঠীর অস্তিত্ব লুপ্ত হয়! মুসলিম লিগ সদস্যারা ঘোষণা করেন, তাঁরা ধর্মনিরপেক্ষ ও প্রগতিশীল দৃষ্টিতে সব কিছু বিবেচনা করবেন। দুজন কমিউনিস্ট সদস্য, জ্যোতি বসু ও রতনলাল ব্রাহ্মণ বিধানসভায় যথেষ্ট সক্রিয় ছিলেন। কিন্তু ১৯৪৮ সালে কম্যুনিস্ট পার্টি বেআইনি ঘোষিত হওয়ার পর বিধানসভার খুব কম অধিবেশনে তাঁরা যোগ দিতে পারেন! প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হন গান্ধীবাদী কংগ্রেস নেতা প্রফুল্লচন্দ্র

ঘোষ কিন্তু কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফলে ছ-মাসের মধ্যেই তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়। কংগ্রেস পরিষদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়. ১৯৪৮ থেকে ১৫ বৎসর ডাঃ রায় ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপর মুখ্যমন্ত্রী হন প্রফুল্লচন্দ্র সেন। স্বাধীনতার পর প্রথম দুই দশক সরকার পরিচালনার দায়িত্বে থাকে কংগ্রেস দল। বিরোধী দলনেতা হিসেবে জ্যোতি বসু এবং কমিউনিস্ট দলের বিশেষ ভূমিকা পরিলক্ষিত হয় বিধানসভায়। ১৯৬৭ সালে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গঠিত হয় প্রথম অকংগ্রেসি যুক্তফ্রন্ট সরকার ; উপমুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন জ্যোতি বসু। ১৯৭১ পর্যন্ত (মধ্যে তিনবার রাষ্ট্রপতি শাসন এবং তিন মাস প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের মুখ্যমন্ত্রীত্ব ছাড়া) অকংগ্রেসি সরকারই পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন থাকে। ১৯৭২-এর নির্বাচনে কংগ্রেস দল আবার ক্ষমতায় ফিরে আসে এবং মুখ্যমন্ত্রী হন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগে এই পর্বে সি পি আই (এম) বিধানসভায় অনুপস্থিত থাকে। ১৯৭৭ সাল থেকে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বামফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গে সরকার পরিচালনার দায়িত্বে আছে, বিরোধী দল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে কংগ্রেস। আইনসভার প্রসঙ্গে ফিরে এসে বলতে হয় আমাদের দেশে সাধারণ লোক, এমনকি রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যেও আইনসভার গুরুত্ব সম্বন্ধে চরম অজ্ঞতা ও উদাসীনতা বিদ্যমান। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার কার্যবিবরণী প্রকাশিত হয়নি প্রায় এক দশক, দুষ্প্রাপ্য ও দলিলপত্র সংরক্ষণের কোনও ব্যবস্থা নেই। অথচ ইংরেজ আমলে আইনসভা প্রণীত আইন বাংলা, হিন্দি উর্দু ও ওড়িয়া ভাষায় অনুবাদ করে সাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হত ; সভার কার্যবিবরণী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে পাঠানো হত। আইনসভার অধোগতির জন্য প্রাথমিক দায়িত্ব নিশ্চয়ই জনপ্রতিনিধিদের। প্রচার মনস্কতা ও সংবাদ শিরোনামায় স্থান পাওয়ার উদগ্র বাসনা তাদের মধ্যে বেড়েই চলছে। গণমাধ্যমগুলির দায়িত্বও কম নয়। উত্তেজক ও চমক দেওয়া সংবাদ পরিবেশনে পত্র-পত্রিকার অধিক উৎসাহ। আইনসভার ভাল কাজ সেজন্য লোকচক্ষুর আড়ালেই রয়ে যায়।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিগত পঞ্চাশ বৎসরের কার্যাবলীর পর্যালোচনা করতে দেখা যায় এই সভার ভূমিকা নেহাত অগৌরবের নয়। দেশ বিভাগের অব্যবহিত পূর্বে ১৯৪৬ সালে গঠিত আইনসভার কাঠামোই স্বাধীনতা পরবর্তী চার বৎসর (১৯৪৭-১৯৫১) বজায় থাকে। ১৯৫২ সালে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের পর ইংরেজ আমলের আইনসভার বিলুপ্তি ঘটে। ভারতের সাংবিধানিক ব্যবস্থায় গুণগত পরিবর্তন সূচিত হয়। সংসদনির্ভর গণতন্ত্র হয়ে ওঠে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিচালিকা শক্তি। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অভিমুখীনতায় নতুন শক্তিবিন্যাস ঘটে।

১৯৪৭-১৯৫১ পর্বের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার প্রথম প্রস্তাবে (২৩ নভেম্বর ১৯৪৭) মহাত্মা গান্ধী ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে বলা নিবেদন করে বলা হয় "পশ্চিম বাংলার ব্যবস্থা পরিষদ এই প্রথম অধিবেশনে প্রদেশের সকল অধিবাসীকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেই এবং স্বাধীনতা লাভের জন্য যাঁহারা অশেষ দুঃখবরণ ও প্রাণত্যাগ করিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছে।" ভারতের খসড়া সংবিধান ওই সময় বিভিন্ন রাজ্য আইনসভায় মতামত দেওয়ার জন্য পাঠানো হয়। বিধানসভায় এ নিয়ে সাতদিন বিতর্ক চলে। আলোচনা হয় যথেষ্ট উচ্চমানের। সদস্যরা বেশ কিছু গঠনমূলক প্রস্তাবও রাখেন। জ্যোতি বসু তাঁর বক্তৃতায় বলেন, যেহেতু-প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সংবিধান-প্রণয়নকারী পরিষদ (গণপরিষদ) নির্বাচিত হয়নি, সেজন্য স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার এক্তিয়ার এই পরিষদের নেই। তিনি 'অগণতান্ত্রিক ও কর্তৃত্বপূর্ণ'

খসড়া সংবিধানের প্রত্যাখ্যান দাবি করেন, কারণ এতে নির্দেশাত্মক নীতিকে আদালতের এক্তিয়ার বহির্ভূত করে রাখা হয়েছে, প্রদেশগুলিকে অবশিষ্ট ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় কক্ষ বিলুপ্ত করা হয়নি, ইত্যাদি। বিধায়ক হরিপদ চট্টোপাধ্যায় সমালোচনা করে বলেন, 'এই সংবিধান যাঁরা তৈরি করেছেন তাঁরা অর্থশালীদের লোক।' তিনি অভিযোগ করেন, যে স্বরাজ এলো তা বড়লোকের। 'কৃষক-প্রজা-মজুর যে তিমিরে সে তিমিরেই থাকল।' হুসেন আর বেগম (মুসলিম লিগ) শরিয়তের বিধান অনুযায়ী মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের বিশেষ সংস্থান রাখার অনুরোধ জানান। যেহেতু সদস্যরা সর্বসম্মত কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের প্রস্তাব অনুযায়ী আলাপ-আলোচনার পূর্ণ বিবরণী গণপরিষদের সভাপতির নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাছাড়া এই পর্বে পশ্চিমবঙ্গ নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন নিয়ে বিধানসভায় তীব্র বাদানুবাদ হয়। মাধ্যমিক শিক্ষা বিল, বর্গাদার বিল, কালোবাজারি বিল ও বাজেট আলোচনায় সরকারকে কয়েকবার বিরোধীদের বক্তব্য মেনে নিতে দেখা যায়। জমিদারি প্রথা বিলুপ্তির দাবিতেও সদস্যরা সোচ্চার হন।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পনেরো বৎসর মুখ্যমন্ত্রীত্বকালে বিধানসভা যথেষ্ট সচল ছিল। জ্যোতি বসু ১৯৫২ সালে 'প্রধান বিরোধী দলের নেতা' হিসেবে স্বীকৃতি পান, ১৯৫৭ সালে 'বিরোধী পক্ষের নেতা'। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য সংখ্যা বিধানসভায় তখন ৫১, কংগ্রেসের ১৫২। বিরোধী সদস্যদের মধ্যে ছিলেন বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, সোমনাথ লাহিড়ী, গণেশ ঘোষ, সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, হেমন্ত বসু, সুবোধ ব্যানার্জি, দাশরথি তাঁ প্রমুখ দক্ষ বিধায়ক এবং ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ অতীন বসু প্রমুখ প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রিয়রঞ্জন সেন ছিলেন কংগ্রেস দলে। তবে বিধানসভায় তাঁকে বিশেষ ভূমিকা নিতে দেখা যায়নি। ঝানু সংসদবিদ হিসেবে বিরোধী ও কংগ্রেস দলের অনেকেরই খ্যাতি ছিল। এই পর্বে ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলন (১৯৫৩), রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশ (১৯৫৫), গোয়া মুক্তি আন্দোলন (১৯৫৫), বঙ্গ-বিহার সংযুক্তিকরণ (১৯৫৬), খাদ্য সমস্যা, শিক্ষক আন্দোলন, পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত নানা প্রশ্নে বিধানসভাকে উত্তাল হতে দেখা যায়। এর মধ্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও সরস মন্তব্য বিধানসভার উত্তপ্ত আবহাওয়াকে অনেক সময়ই হালকা করে দিতে সক্ষম হয়। যেমন, একদিন দাশরথি তাঁ এক প্রশ্ন করে ডাঃ রায়কে জিজ্ঞেস করেন, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কে হবেন? ডাঃ রায় উত্তর দেন ; দাশরথি তাঁ, তবে অনারারি! দাশরথি তাঁর জবাব : আনারারি হোক, যাই হোক, ঢেউ গুনবার কাজ পেলে, বুদ্ধি থাকলে জাহাজ আটকেও প্রচুর আয় করা যায়। ডাঃ রায় উত্তরে বলেন, 'সে অভ্যেস আপনার নিশ্চয়ই নেই ; আপনি তা পারবেন না।' দাশরথি তাঁ-র প্রত্যুত্তর : 'পারব না কেন? এই পাঁচ বছরে আপনাদের কাছে শিখলাম কি?' সদস্যদের হাসিতে বিধানসভা ফেটে পড়ে। এই ধরনের আর অনেক নজির আছে কার্যবিবরণীতে। বিবিধ স্পর্শকাতর বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করে, মুলতুবি প্রস্তাব এনে সরকারকে বিব্রত করতেও সক্ষম হন বিরোধীরা।

দীর্ঘ দুই দশক এক নাগাড়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার পর কংগ্রেস শাসনের অবসান হয় ১৯৬৭ সালে। চতুর্থ বিধানসভার নির্বাচনে জয়লাভের পর সি পি আই (এম), সি পিআই ও বাংলা কংগ্রেস ইত্যাদি ১৪টি রাজনৈতিক দল নিয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয় মার্চ মাসে। বিধানসভায় কংগ্রেস এখনও প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী, সদস্য সংখ্যা ১২৭। কিন্তু কয়েক মাস পরই রাজ্যপাল ধরমবীর যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করে প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে

মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে '৬৭-র ২৯ নভেম্বর বিধানসভার অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনে অধ্যক্ষ বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ঐতিহাসিক রুলিং-এ ঘোষণা করেন, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত করা অসাংবিধানিক ও অবৈধ। অধ্যক্ষ বলেন, যুক্তফ্রন্ট সংখ্যালঘিষ্ঠ কি না তা যাচাই করার ক্ষমতা বিধানসভার। বিধানসভার এই অধিকার ও ক্ষমতা লঙঘন করার কোনও এক্তিয়ার নেই রাজ্যপালের। প্রফুল্ল ঘোষকে শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ করতে হয়।

১৯৬৯-এর মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর পঞ্চম বিধানসভায় যুক্তফ্রন্ট ২১৪টি আসন লাভ করে। কংগ্রেস পায় ৫৫। রাজ্যপাল ধরমবীরের সঙ্গে সরকারের সংঘর্ষ চলতেই থাকে। বিধানসভার প্রথম অধিবেশনেই রাজ্যপালের ভাষণ থেকে ধরমবীর পূর্ববর্তী যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করার সমালোচনা সমন্বিত অংশটুকু বাদ দিয়ে দেন। এ নিয়ে তুমুল বিতর্ক হয় ওই সময়। কয়েকদিন পর ২১ মার্চ বিধানসভায় পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের বিলুপ্তি সংক্রান্ত এক প্রস্তাব পাশ হয় এবং পার্লামেন্টের অনুমোদন পাওয়ার পর ১ আগস্ট ১৯৬৯ পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিধান পরিষদ বিলুপ্ত হয়। পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার (দ্বিতীয় সংশোধন) আইনও এই পর্বের বিধানসভায় গৃহীত হয়। কিন্তু যুক্তফ্রন্টের মধ্যেই অন্তর্দ্বন্দ্ব ক্রমশ প্রকট হয়ে ওঠে। মুখ্যমন্ত্রী অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় সরকারকে 'বর্বর' আখ্যা দিয়ে নিজের সরকারের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ শুরু করেন। ১৩ মাস পর যুক্তফ্রন্ট সরকার পদত্যাগ করে এবং পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন ঘোষিত হয়।

১৯৭১ এর নির্বাচনে সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট বিধানসভায় ১২৩টি আসন পায়। কংগ্রেস দল পায় ১০৫। কিন্তু অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সহায়তায় অজয় মুখার্জিই সরকার গঠন করেন কিন্তু এই সরকার মাত্র তিন মাস ক্ষমতায় থাকে। পরবর্তী ১৯৭২ এর নির্বাচনে কংগ্রেস ক্ষমতায় ফিরে আসে। স্বাধীনতার পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে ১৯৭২ এর ১৪-১৫ আগস্ট মধ্যরাত্রে বিধানসভার এক বিশেষ অধিবেশন বসে।

১৯৭৭ সালে বিধানসভার নির্বাচনে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসে ২২৯টি আসন পেয়ে। এবং পরবর্তী সবকটি নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখে। কংগ্রেস সংসদীয় দলের নেতা বিরোধীপক্ষের নেতা হিসেবে স্বীকৃতি পান। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কাঠামোয় মার্কসবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত বামপন্থী সরকারের দুই দশকের বেশি সময় ধরে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার নজির পৃথিবীতে নেই। স্বভাবতই বিধানসভায় বামপন্থীদের ভূমিকা ভারত ও বহির্বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সন্দেহ নেই, বিগত চারটি বিধানসভা—অষ্টম (১৯৭৭), নবম (১৯৮২), দশম (১৯৮৭), একাদশ (১৯৯১) এবং বর্তমান দ্বাদশ (১৯৯৬) বিধানসভায় নানা নাটকীয় ও নিন্দনীয় ঘটনা ঘটেছে। এতদ সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট গরিষ্ঠ বিধানসভার দুই দশকের ভূমিকার পর্যালোচনা করলে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে এই দুই দশকে বিধানসভা যথেষ্ট ইতিবাচক ভূমিকা নিয়েছে। অন্তত বিষয় ভিত্তিক কমিটি (সাবজেক্ট কমিটি) ব্যবস্থার প্রবর্তন করে পশ্চিমবঙ্গ সারা ভারতে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। পশ্চিমবঙ্গের এই প্রয়াস সমাদৃতও হয়েছে।

বিধানসভার এই দুই দশকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও জনহিতকর আইন পাশ হয়েছে। যে সমস্ত আইন প্রণীত হয়েছে তার মধ্যে ভূমিসংস্কার ও পঞ্চায়েত-সংক্রান্ত সংশোধনী আইন বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। ১৯৯৪ ও ১৯৯৫ সালে পঞ্চায়েত আইন সংশোধন করে কৃষি, জলসেচ, স্বাস্থ্য, ভূমিসংস্কার, সমবায়, প্রাণিসম্পদ বিকাশ প্রভৃতি ২৯টি বিষয়

বিকেন্দ্রীকরণ মারফত রাজ্য সরকারের এক্তিয়ার থেকে পঞ্চায়েতের কাছে ন্যস্ত করা হয়। এটা করা হয় ভারতীয় সংবিধানের ৭৩তম সংশোধনের নির্দেশে। পঞ্চায়েতের কাজে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণে পশ্চিমবঙ্গ সারা ভারতে এক নজির সৃষ্টি করে এই সংশোধনী আইন পাশ করে। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় প্রণীত আইনের বাৎসরিক গড় বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও কেরালার চেয়ে অনেক বেশি হয় এই দুই দশকে।

আইন সভার প্রথম এক ঘণ্টা নির্ধারিত থাকে প্রশ্নোত্তরের জন্য। সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনা এবং জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িত নানা বিষয়ে প্রশ্ন করেন বিধায়করা। প্রশ্নোত্তরের বিষয়েও এই পর্বের বিধানসভার বিশিষ্টতা পরিলক্ষিত হয়। বিধানসভায় গৃহীত প্রশ্নের শতকরা ৮০ ভাগের উত্তর দেওয়া হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে। তাছাড়া দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব, বাজেট বিতর্ক, অনাস্থা প্রস্তাব, রাজ্যপালের ভাষণ-সংক্রান্ত আলোচনা ইত্যাদির সুযোগ নিয়ে বিরোধী পক্ষ সরকারি কাজের অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি জনসমক্ষে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন।

উপরন্তু অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় গত দুই দশকে পশ্চিমবঙ্গে অনেক কম অর্ডিন্যান্স জারি হয়েছে। আইনসভাকে পাশ কাটিয়ে অর্ডিন্যান্স জারির এক মারাত্মক প্রবণতা ইদানীং ভারতে পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিহারে একদিনেই ৫৬টি অর্ডিন্যান্স জারি হয়েছিল বলে প্রকাশ। পশ্চিমবঙ্গে গত দুই দশকে অর্ডিন্যান্স জারি হয়েছে ১১৮। ইদানীং অর্ডিন্যান্স জারির হার আরও হ্রাস পেয়েছে। যেমন ১৯৮৭-৯১-এ অর্ডিন্যান্স জারি হয়েছে ২২টি এবং ১৯৯২-৯৫ এ ১৬টি। তুলনামূলক হিসাবে দেখা যায় ১৯৮২-৮৭-র মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ৫৪টি অর্ডিন্যান্স জারি হয়েছে। অন্যদিকে প্রায় একই সময় কেরালা ২৭২টি অর্ডিন্যান্সের আশ্রয় নিয়েছে, আর বিহারও উত্তরপ্রদেশে বলবৎ হয়েছে যথাক্রমে ১৬৪ ও ১৫৭টি অর্ডিন্যান্স *(লোকসভা কর্তৃক প্রকাশিত জার্নাল অব পার্লামেন্টারি ইনফরমেশন থেকে সংগৃহীত তথ্য)।*

১৯৯৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় প্রবর্তিত বিষয়ভিত্তিক কমিটি ব্যবস্থা সংসদ কাঠামোর ক্ষেত্রে এক অনন্য সংযোজন বলে বিশেষজ্ঞ মহলে স্বীকৃতি পেয়েছে। কেন্দ্রীয় সংসদ এবং কেরালা বিধানসভার সীমিত ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি ছাড়া ভারতের অন্য কোনও রাজ্যে এই ধরনের কমিটি ব্যবস্থা নেই। সরকার ও বিরোধীপক্ষের সদস্যদের নিয়ে এই কমিটিগুলি গঠিত হয়। বিধানসভার উত্তপ্ত আবহাওয়ার মধ্যে যে সব বিষয়ের আলোচনা বা সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয় না, কমিটি কক্ষে তা সহজেই করা যায়। আইনসভার বৈধতা ও প্রাসঙ্গিকতা প্রতিষ্ঠায় বিষয়ভিত্তিক কমিটির গুরুত্ব সেজন্য তত অপরিসীম।

শুরুতে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পঞ্চায়েত বিভাগ নিয়ে গঠিত হলেও বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে বিষয়ভিত্তিক কমিটির সংখ্যা দশ। রাজ্য সরকারের অধিকাংশ বিভাগই এখন কমিটির নিয়ন্ত্রণাধীন। প্রত্যেক কমিটিতে অধ্যক্ষ কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীসহ পনেরোজন সদস্য থাকেন। বিষয়ভিত্তিক কমিটির বিভাগের ক্ষমতাও যথেষ্ট বিস্তৃত। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় বাজেট-সংক্রান্ত আলোচনা ও সিদ্ধান্তে বিধানসভার ভূমিকা এতদিন ছিল আনুষ্ঠানিক। বিষয়ভিত্তিক কমিটি বাজেট সম্বন্ধে বিধানসভার ভূমিকাকে অনেকটা অর্থবহ করতে সক্ষম হয়েছে। বিধানসভায় বাজেট পেশ হওয়ার পর বিষয়ভিত্তিক কমিটিকে সংশ্লিষ্ট বিভাগের বাজেট পর্যালোচনা করে চার সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট দিতে হয়। ফলে বিধায়করা বাজেটে বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখে বিধানসভার বাজেট আলোচনাকে অর্থবহ করতে পারেন। দ্বিতীয়ত, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের বিষয়ভিত্তিক কমিটি ও দপ্তর-সংক্রান্ত কেন্দ্র ও রাজ্যের বিভিন্ন পরিকল্পনা পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারে। তৃতীয়ত, প্রশাসনিক স্তরে

কাজকর্মের উন্নতির জন্য কমিটি পরামর্শ দিয়ে থাকে এবং চতুর্থত, কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার কী কী ব্যবস্থা নিলেন সে সম্বন্ধে বিধানসভায় রিপোর্ট পেশ করতে হয় (এ টি আর—অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট)। ১৯৯৪-৯৫, ১৯৯৫-১৯৯৬ ও ১৯৯৬-৯৭ সালে কয়েকটি কমিটি যথেষ্ট পরিশ্রম করে বিধানসভার কাছে মূল্যবান রিপোর্ট পেশ করেছে। বিষয়ভিত্তিক কমিটিগুলি সক্রিয় হলে বিধায়করা শুধু বিধানসভায় নয়, প্রশাসন ব্যবস্থাও কার্যকর ভূমিকা নিতে পারেন। আইনসভার কাছে প্রশাসনের দায়বদ্ধতা এবং প্রয়োজনে আইনসভার সহায়তা পাওয়ার নিশ্চয়তা দেয় বিষয়ভিত্তিক কমিটি।

বিধানসভা বা পার্লামেন্টের প্রকাশ্য অধিবেশন দেখে বা পরিবেশিত সংবাদ পড়ে এর কার্যকারিতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা করা সম্ভব নয়। দূরদর্শনে পার্লামেন্টের প্রকাশ্য অধিবেশনের সম্প্রসারণ দেখানোর ফলে জনসাধারণের মনে আইনসভা সম্বন্ধে বরঞ্চ বিরূপ প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি হয়েছে। আজকের ভারতীয় পরিস্থিতিতে আইনসভা একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে আশা করা যায় না। সমাজের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সঙ্কটের প্রতিফলন ঘটতে আইনসভার অভ্যন্তরে বিধায়কদের আচার-আচরণে। আইনসভাকে সাবলীল করতে পারে রাজনৈতিক দল এবং সদা-সতর্ক জনমত।

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভাও যাতে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় যথাযথ ভূমিকা নিতে পারে তার জন্য প্রয়োজন বিধানসভার কাঠামোগত কিছু সংস্কার, পদ্ধতিগত পরিবর্তন এবং প্রকাশ্য অধিবেশনের সময়সীমা কমিয়ে এর একটি ব্যবস্থাকে সক্রিয় করা। তবে ইতিমধ্যে বিষয়ভিত্তিক কমিটি ও অন্যান্য পরিবর্তন মারফত বিধানসভাকে যে আরও অর্থবহ করা হয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না।

অ রূ প দা স

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা

১৯৪৭-১৯৯৭ সাল। মাঝে ৫০ বছর। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে এই দীর্ঘ সময়ে ঘটে গেছে নানা ঘটনা। যার সাক্ষ্য বহন করছে বিধানসভা। ১৯৪৭-র ১৫ আগস্ট রাজ্যের প্রথম মন্ত্রিসভা শপথ নেয় বিধানসভা ভবনে। সেই থেকে একের পর এক মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে, ভেঙে গেছে, ফের শপথ নিয়েছে। কলকাতায় গঙ্গার ধারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা ভবনটি সবক্ষেত্রেই থেকে গেছে নীরব সাক্ষী। পরিষদীয় আইনের নানা জটিলতা মাঝে মাঝেই স্পর্শ করেছে বিধানসভাকে। আর এই বিধানসভার ৫০ বছরের নানা ঘটনা, মন্ত্রিপরিষদ, অধ্যক্ষদের নাম বা তাঁদের ভূমিকা, সদস্যদের আচরণ, এই দীর্ঘ সময়ে গড়ে ওঠা নানা ধরনের রাজনৈতিক বিন্যাস স্বল্প পরিসরে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি এই নিবন্ধে।

আইনসভা—শুরু থেকে আজ

ভারতের আইনসভার গোড়াপত্তন আজ থেকে ১৩৫ বছর আগে। কলকাতা তখন সারা ভারতের রাজধানী। ব্রিটিশ সরকার আইনসভা গঠনের সিদ্ধান্ত নিল। সেই মত তৈরি হল আইন : ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট, ১৮৬১। পরের বছরই তৈরি হয় ভারতের প্রথম আইনসভা।

১৮৬২ সালের ১৮ই জানুয়ারি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদ বা লেজিসলেটিভ কাউন্সিল অব বেঙ্গলের যাত্রা শুরু হয়। সভার জায়গা ঠিক হয় বাংলা লাটসাহেবের বাড়ি। এখনকার ন্যাশনাল লাইব্রেরি যেখানে, সেখানেই থাকতেন লাটসাহেব। প্রতি শনিবার সভা বসত।

দিনে দিনে আইনসভার সদস্য সংখ্যা বাড়তে লাগল। ১৯২১ সালে পরিষদের জন্য প্রেসিডেন্ট ও ডেপুটি প্রেসিডেন্ট নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়। বড়লাটের ক্ষমতা অনেকটাই খর্ব হল এর সঙ্গে। সভার স্থান পরিবর্তন করা হয়। বেলভেডিয়ারে বড়লাটের বাড়ি থেকে সভা চলে এল টাইন হলে। এই টাউন হলে ব্যবস্থাপক পরিষদের কাজ চলেছিল টানা দশ বছর।

তবে আজকের যে বিধানসভা ভবন সেটি তৈরি ১৯৩১ সালে। ওই বছরই ৯ ফেব্রুয়ারি নতুন ভবনের উদ্বোধন হয়। তারপর থেকেই ওখানে চলে আসছে বিধানসভার কাজকর্ম।

১৯৩৫ সালে আইনসভার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট, ১৯৩৫ অনুযায়ী সভাকে ত্যাগ করা হয় দু-ভাগে। একটির নাম হয় লেজিসলেটিভ

কাউন্সিল, অপরটির লেজিসলেটিভ অ্যাসেমব্লি। ওই সময়ই আইনসভার সদস্যদের জন্য বেতন ব্যবস্থা, সংরক্ষিত আসন, রাজনৈতিক দলের অনুপ্রবেশ ইত্যাদি চালু হয়।

স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার প্রথম অধিবেশন বসে ১৯৪৭ সালের ২১ নভেম্বর। ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ হন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। এক বছরের মাথায় তিনি পদত্যাগ করলে মুখ্যমন্ত্রী হন কংগ্রেসের ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়।

১৯৫২ সালে দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচনী কেন্দ্র ঠিক হয় ২৩৮টি। কংগ্রেস জয়ী হয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করে ১৩ জুন। মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। তারপর থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত আমৃত্যু তিনি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী।

১৯৫৭ সালের নির্বাচনে আসন সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২৫২টিতে। তারপর ১৯৬৭-তে মোট নির্বাচনী কেন্দ্র হয় ২৪০টি। ১৯৭৭ সাল থেকে ওই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৯৪টি।

১৯৬৭ সালে রাজ্যে প্রথম অ-কংগ্রেসি মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। ক্ষমতায় আসে বামপন্থী দলগুলিকে নিয়ে গঠিত যুক্তফ্রন্ট। তবে এই যুক্তফ্রন্ট বেশিদিন টেকেনি। প্রফুল্ল ঘোষের বিশ্বাসঘাতকতায় তা ভেঙে যায়। তাঁর নেতৃত্বে গঠিত হয় পি ডি এফ সরকার। অধ্যক্ষ বিজয় ব্যানার্জির এক ঐতিহাসিক রুলিং-এর ফলে প্রফুল্ল ঘোষ মন্ত্রিসভা বেকায়দায় পড়ে। ঐতিহাসিক ওই রুলিং নিয়ে দেশজোড়া আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। সংসদীয় ইতিহাসে সৃষ্টি হয়েছিল নতুন নজির। বিধানসভা ভবনে ঢুকে প্রফুল্ল ঘোষের নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভাকে দেখে তিনি জানান, রাজ্যপাল রায় দিলেও বিধানসভায় অধ্যক্ষই প্রধান। অতএব সরকারকে গরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে হবে। এই বলে তিনি বিধানসভা মুলতবি ঘোষণা করেন। প্রকৃতপক্ষে সেদিন অধ্যক্ষ শ্রীব্যানার্জি গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ হিসাবে তাঁদের ভূমিকাকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করেছিলেন। এর ফলে বিধানসভা ভেঙে যায়, রাজ্যে ১৯৬৮-র ২০ ফেব্রুয়ারি জারি হয় রাষ্ট্রপতি শাসন।

১৯৬৯ সালের নির্বাচনে ফের যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় ফিরে আসে। ওই বছরই ২১ মার্চ পশ্চিমবঙ্গের বিধান পরিষদ তুলে দেওয়া হয়। তবে যুক্তফ্রন্ট বেশিদিন ক্ষমতায় থাকতে পারে না। ১৯৭০-এর ১৬ মার্চ ইস্তফা দেন মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জি। ৩০ জুলাই বিধানসভা ভেঙে দিয়ে ফের রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয় রাজ্যে। ১৯৭১ সালে নির্বাচনের পর কংগ্রেসের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে অজয় মুখার্জি মুখ্যমন্ত্রী হলেও চার মাসের মাথায় ২৮ জুন পদত্যাগ করেন। রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয় ২৯ জুন ১৯৭১ সালে। এই বিধানসভাতেই ১৯৭২ সালে স্বাধীনতার ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে রাত্রিকালীন অধিবেশন বসেছিল।

১৯৭৭ সালে রাজ্যে সূচনা হয় নতুন পরিবর্তনের। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসে। সেই থেকে টানা পাঁচ-পাঁচটি নির্বাচনে জিতে বামফ্রন্ট এখনও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত এই রাজ্যে। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুও পর পর পাঁচবার বামফ্রন্টকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

৫০ বছরের রাজনৈতিক ওঠা-নামা

১৯৫১ সালে সংসদে গৃহীত জনপ্রতিনিধি আইন অনুসারে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্ক ভোটদান ও নির্বাচনী ব্যবস্থা চালু করা হয়। সেই অনুযায়ী দেশে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫২ সালে। পশ্চিমবঙ্গে ২৩৮টি আসনে ভোট হয়। প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ১৩৭৩ জন। নির্বাচন হয় জানুয়ারি মাসে। চলে তিন সপ্তাহ ধরে।

প্রথম নির্বাচন। মানুষের নির্বাচন সম্পর্কে সচেতনতাও ছিল কম। তার ওপর ফসল কাটার

মরশুম। ফলে ভোট পড়েছিল মাত্র ৪২ শতাংশ। প্রধানত শহর ও শিল্পাঞ্চলের মানুষই ভোট দিয়েছিলেন।

মোট ২৩৮টি আসনের মধ্যে ২৩৭টিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কংগ্রেস পেয়েছিল ১৪৯টি। প্রদত্ত ভোটের ৩৯ শতাংশ জমা পড়েছিল কংগ্রেসের ঝুলিতে। কংগ্রেস-বিরোধী শক্তি না হলেও দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসাবে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ৮৭টিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কমিউনিস্টরা পেয়েছিল ২৮টি আসন। তাদের ভাগে পড়েছিল ১০.৭৬ শতাংশ ভোট। কমিউনিস্টদের পরেই তৃতীয় বৃহত্তম দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে ফরওয়ার্ড ব্লক। পেয়েছিল ১১টি আসন। এছাড়া অন্যান্য বামপন্থী দলগুলিও বেশ সাফল্য লাভ করেছিল এই নির্বাচনে। কলকাতা, ২৪ পরগনা, হুগলি ও হাওড়া জেলাতেই কমিউনিস্ট পার্টি এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রভাব লক্ষ করা যায়। বেশি আসন তারা এই জেলাগুলি থেকেই আদায় করে নিয়েছিল। মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষদের একাংশ ও শ্রমিকদের ওপর এদের প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট। এই নির্বাচনে আর একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হল সাম্প্রদায়িক দলগুলির ক্ষমতাবৃদ্ধি। জনসংঘ বা হিন্দু মহাসভার মতো কট্টর হিন্দুত্ববাদী দল একযোগে লাভ করেছিল ১৩টি আসন। যাই হোক না কেন, প্রথম নির্বাচনে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল সীমিত ক্ষমতা নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় বৃহত্তম দলের সম্মান পাওয়া। কেননা নির্বাচনের মাত্র কয়েক মাস আগেই কমিউনিস্ট পার্টির ওপর থেকে বেআইনি আদেশ প্রত্যাহার করা হয়।

দ্বিতীয় বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৭ সালের মার্চ মাসে। নির্বাচন পর্ব শেষ হতে সময় লাগে একমাস। ১৯৫৬ সালে সংসদে গৃহীত ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশ অনুসারে বিহারের কিছু অংশ যুক্ত হয় পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে। ফলে রাজ্যের আয়তন এবং জনসংখ্যা দুইই বৃদ্ধি পায়। আসন সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২৫২-তে।

নির্বাচনে কংগ্রেসকে হারাতে বিরোধী দলগুলি নিজেদের মধ্যে বিস্তর আলাপ-আলোচনা করেও ব্যর্থ হয়। তৈরি হয় তিনটি কংগ্রেস-বিরোধী জোট বা মোর্চা। কমিউনিস্ট পার্টি, পি এস পি, আর এস পি, ফরওয়ার্ড ব্লক ও মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক — এই ৫টি দলের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে সংযুক্ত বামপন্থী নির্বাচনী কমিটি। এই জোট প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল ২২৪টি আসনে।

দ্বিতীয় জোটটি গড়ে উঠেছিল আর সি পি আই (ঠাকুর), জনসংঘ, হিন্দু মহাসভার একাংশ বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসীকে নিয়ে। এই মোর্চার নাম ছিল সংযুক্ত গণতান্ত্রিক গণফ্রন্ট।

আর তৃতীয় জোট হিসাবে নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল এস ইউ সি, বলশেভিক পার্টি, ডেমোক্র্যাটিক ভ্যানগার্ড ও ৫টি ছোট বামপন্থী দল মিলে সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট। প্রার্থী দিয়েছিল ৪৫টি আসনে। লোহিয়াপন্থী সোস্যালিস্টরাও নির্বাচনে লড়াই করেছিল।

অন্যদিকে, কংগ্রেস ২৫১টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। নির্বাচনে কংগ্রেস পেয়েছিল ১৫২টি আসন। আর বৃহত্তম বিরোধী জোটের অন্যতম শরিক কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি ঘটেছিল লক্ষণীয়ভাবে। ১০৩টি আসনে লড়ে কমিউনিস্ট পার্টি পেয়েছিল ৪৬টি আসন। মোট ভোটারের ১৭.৮২ শতাংশ সমর্থন আদায় করেছিল কনিউনিস্টরা। সংযুক্ত বামপন্থী নির্বাচনী কমিটি পেয়েছিল মোট ৮০টি আসন। গণফ্রন্ট কোনও আসন না পেলেও সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্টকে মাত্র ২টি আসন নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। আর ওই ২টি আসনই পেয়েছিল এস ইউ সি।

দ্বিতীয় বিধানসভা নির্বাচনে আকর্ষণীয় লড়াই হয়েছিল কলকাতার বউবাজার কেন্দ্রে।

তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে ওই কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী ট্রাম শ্রমিক আন্দোলনের নেতা মহম্মদ ইসমাইলের। মর্যাদার ওই লড়াইয়ে ডাঃ রায় অবশেষে মাত্র ৫১১টি ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছিলেন। তবে ডাঃ রায় বউবাজার ছাড়াও বাঁকুড়ার শালতোড়া কেন্দ্রে লড়াই করেও জিতেছিলেন।

এই নির্বাচনে কংগ্রেস পূর্বের নির্বাচনের তুলনায় ৭ শতাংশ ভোট বেশি আদায় করে নিতে পারলেও আসন সংখ্যা কিন্তু সেই অনুপাতে বাড়াতে পারেনি। অন্যদিকে, কমিউনিস্ট পার্টির ৭ শতাংশ ভোট হ্রাস সত্ত্বেও আসন সংখ্যা বেড়েছিল ১৮টি। দ্বিতীয় নির্বাচনেই সুস্পষ্ট হয়েছিল যে, রাজ্যের শিল্পাঞ্চল ও শহরে কংগ্রেসের শক্তি ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। বৃহত্তর কলকাতার শিল্পাঞ্চল, আসানসোল, রাণীগঞ্জের কয়লাখনি অঞ্চল, খড়্গপুরের রেল শ্রমিক অধ্যুষিত অঞ্চল বা ডুয়ার্সের চা বাগানগুলি মোট ৬৫টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস পেয়েছিল মাত্র ২৪টি। বাকিগুলি আদায় করে নিয়েছিল বামপন্থীরাই।

এছাড়া, এই নির্বাচনে আর একটি বৈশিষ্ট্য হল, সাম্প্রদায়িক দলগুলির শক্তি হ্রাস। প্রথম নির্বাচনে হিন্দু মহাসভা ও জনসংঘ ১৩টি আসন পেলেও দ্বিতীয় নির্বাচনে ১টি আসনও পায়নি। অথচ দুটি দল মোট ৭১টি আসনে লড়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী ঐতিহ্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এখান থেকেই।

নির্বাচনের পর কমিউনিস্ট পার্টি বিধানসভায় প্রধান বিরোধী দলের মর্যাদা পায়। বিরোধী দলনেতার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পান জ্যোতি বসু।

১৯৬২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় তৃতীয় বিধানসভা নির্বাচন। চলে ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এই নির্বাচনে ভোট দিয়েছিলেন প্রায় ১ কোটি মানুষ। মোট প্রার্থী ছিলেন ৯৬১ জন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় নির্বাচনের মাঝে পশ্চিমবঙ্গে গণ-আন্দোলন ব্যাপক আকার নেয়। মাঝের পাঁচটি বছরে উত্তাল হয়ে ওঠে গোটা রাজ্য। তবে তৃতীয় নির্বাচনেও কংগ্রেস-বিরোধী জোট দানা বাঁধতে পারেনি। পি এস পি নির্বাচনে জোট বাঁধতে অনাগ্রহ দেখায়। ফলে পি এস পি-কে বাদ দিয়েই ছটি বামপন্থী দল মিলে গড়ে ওঠে নির্বাচনী ঐক্য। জোটের শরিক ছিল কমিউনিস্ট পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক, মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক, আর এস পি, আর সি পি আই এবং বলশেভিক পার্টি। এই জোটের পক্ষ থেকে বিকল্প সরকার গড়ার প্রস্তাব তুলে ধরে চালানো হয়েছিল ব্যাপক প্রচার। মোট ২২৯টি আসনে লড়াই করেছিল এই জোট। অন্যদিকে, পি এস পি এককভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল ৮৭টি আসনে।

কংগ্রেস এককভাবে নির্বাচনে অংশ নিয়ে ২৫২টি আসনে প্রার্থী দেয়। জয় হয় ১৫৭টি আসনে। ভোট পায় ৪৬.১ শতাংশ। অন্যদিকে, কমিউনিস্ট পার্টি ১৪৬টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পায় ৫০টি আসন। ভোট পায় ২৪.৯ শতাংশ। ফরওয়ার্ড ব্লক ১৩টি, মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক ১টি, আর এস পি ৯টি এবং আর সি পি আই ২টি আসন পায়। অর্থাৎ বিরোধী বামপন্থী জোট দখল করে ৭৫টি আসন।

পুরুলিয়ায় এবারও লোকসেবক সংঘ নির্বাচনে অংশ নিয়ে পেয়েছিল ৪টি আসন। দ্বিতীয় নির্বাচনের তুলনায় এই দলের আসন সংখ্যা কমে যায় ৩টি। পি এস পি একক শক্তিতে অর্জন করে ৫টি আসন। নির্বাচনের ফলাফলে কংগ্রেসের সাফল্য স্বীকৃত হলেও তাদের ভোট গত নির্বাচনের তুলনায় ১.০৪ শতাংশ হ্রাস পায়। কিন্তু আসন বাড়ে ৫টি।

অন্যদিকে, কমিউনিস্ট পার্টির আসন ও ভোট সংখ্যা দুই-ই বৃদ্ধি পায় লক্ষণীয়ভাবে। দ্বিতীয় নির্বাচনের তুলনায় ৪টি আসন বেশি পাবার পাশাপাশি ভোটও বেড়ে যায় ৫ লক্ষের মতো। পরিসংখ্যান বলে, প্রথম বিধানসভা নির্বাচনের তুলনায় আবার ১৪.১৮ শতাংশ ভোট

বেড়েছিল কমিউনিস্টদের। বামপন্থী জোটের অন্য দুই শরিক ফরওয়ার্ড ব্লক এবং আর এস পি-র সাফল্যও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় নির্বাচনের মতো তৃতীয় নির্বাচনেও হিন্দু মহাসভা ও জনসংঘ ১টি আসনও পায়নি। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি কূল পায় না পশ্চিমবঙ্গে। আর এটাও স্পষ্ট হয়েছিল যে, এ রাজ্যের মানুষ দিনে দিনে প্রগতিমুখিন হয়ে উঠছেন। বিরোধী জোটে যোগ না দিয়ে এস ইউ সি পূর্বের দুটি নির্বাচনের সাফল্য ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়। একটি আসনও পায় না তারা। আর স্বতন্ত্র পার্টি প্রথম নির্বাচনে অংশ নিয়ে বিনা সাফল্যে সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

তৃতীয় নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, কমিউনিস্ট পার্টির সাফল্য কংগ্রেসের তুলনায় অনেক ব্যাপক হয়েছিল। রাজ্যের ১৬টি জেলার মধ্যে ১৪টি জেলায় কমিউনিস্টরা তাদের প্রভাব বিস্তার করে। বর্ধমান জেলায় কমিউনিস্টরা ১০টি আসন দখল করে কংগ্রেসকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে ঠেলে দেয়। এই জেলাতেই কংগ্রেসের তৎকালীন শ্রমমন্ত্রী আবদুস সাত্তারের পরাজয় ঘটেছিল কমিউনিস্ট প্রার্থী মোহন ঠাকুরের কাছে।

দিনে দিনে কংগ্রেসী শাসনের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ বাড়তে থাকে। চতুর্থ নির্বাচনের আগে ওই পুঞ্জীভূত ক্ষোভ বিস্ফোরণের আকার নেয়। কংগ্রেসের অভ্যন্তরেও দেখা দিল দ্বন্দ্ব। অন্যদিকে কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৬৪ সালে দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। মতাদর্শগত বিরোধ দেখা যায় নির্বাচনী প্রচারে। এই রাজনৈতিক পটভূমিতে কংগ্রেস-বিরোধী সার্বিক বামপন্থী ঐক্য গড়ে ওঠে না। তৈরি হয় দুটি বামপন্থী ফ্রন্ট। সি পি আই (এম)-র নেতৃত্বে ৭টি দল নিয়ে গঠিত হয় সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট বা ইউ এল এফ। আর অন্যদিকে, সি পি আই-এর নেতৃত্বে ৪টি দল নিয়ে নির্বাচনে অংশ নেয় বামপন্থী গণফ্রন্ট বা পি ইউ এল এফ।

১৯৬৭-র চতুর্থ বিধানসভা নির্বাচনে আসন সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২৮০-তে। মোট প্রার্থী ছিলেন ১,০৫৮ জন। ভোট পড়ে ৬৬.১০ শতাংশ। কংগ্রেস সবকটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পায় ১২৭টি আসন। অর্থাৎ ভোট পেয়েছিল ৪১.৩ শতাংশ। লক্ষণীয়ভাবে কংগ্রেসের জনসমর্থন হ্রাস পায়, ধাক্কা খায় মারাত্মক। তৃতীয় নির্বাচনের তুলনায় আসন কমে ৩০টি। শুধু তাই নয়, কংগ্রেসের জেতা আসনের মধ্যে মাত্র ৩৯টিতে চূড়ান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। বাকিগুলিতে কংগ্রেস-বিরোধী ভোটের পরিমাণ ছিল বেশি।

অন্যদিকে ফ্রন্ট শরিকরা ৫৪.৬ শতাংশ ভোট পেয়ে যে ১৪৬টি আসন দখল করে, তার মধ্যে চূড়ান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল ৮২টি কেন্দ্রে। পরিসংখ্যান জানাচ্ছে, পি এস পি-র সঙ্গে ফ্রন্টের জোট হলে ৫০টির বেশি আসন কমে যেত কংগ্রেসের। বামপন্থীদের মধ্যে সি পি আই (এম) ১৩৫টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পেয়েছিল ৪৩টি আসন। আদায় করে নিয়ে ছিল ১৮.৫ শতাংশ ভোটারের সমর্থন। ইউ এল এফ জোটের অন্য শরিকরা পেয়েছিল যথাক্রমে আর এস পি ৬টি, এস ইউ সি ৪টি, মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক ১টি, এস এস পি ৭টি, ওয়ার্কার্স পার্টি ২টি এবং আর সি পি আই ২টি আসন। অন্যদিকে, পি ইউ এল এফ জোটের সি পি আই ১৬টি এবং বাংলা কংগ্রেস পেয়েছিল ৩৪টি আসন। বাকি দুটি শরিকের মধ্যে ফরওয়ার্ড ব্লক আসন পেয়েছিল ১৩টি। এই নির্বাচনে জয়ী ৯ জন নির্দল প্রার্থীর মধ্যে ৮ জন পরে যুক্তফ্রন্টকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত নেন।

চতুর্থ নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে কংগ্রেসের বিকল্প হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে প্রতিষ্ঠা হয় যুক্তফ্রন্ট সরকার। একটানা কংগ্রেসি শাসনের প্রথম অবসান ঘটল। নির্বাচনে দলত্যাগী কংগ্রেসীরা বাংলা কংগ্রেস নামে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। এবং যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনে এই বাংলা কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ না করলে অপূর্ণ থেকে যায়। নবগঠিত

বাংলা কংগ্রেসের কর্ণধার অজয় মুখার্জির নেতৃত্বে গঠিত হয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা। সরকারে যোগ দেয় সি পি আই(এম), সি পি আই, আর এস পি, এস ইউ সি, এস এস পি, গোর্খা লিগ, লোকসেবক সংঘ, পি এস পি ছাড়াও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্ল ঘোষসহ ৮ জন নির্দল সদস্য। মন্ত্রিসভার সদস্যরা শপথ নেন ১৯৬৭ সালের ৩ মার্চ।

তবে রাজ্যের প্রথম অকংগ্রেসী সরকার বেশিদিন স্থায়ী হয় না। যুক্তফ্রন্টের মধ্যে নানা মতানৈক্য, সংঘাত অপমৃত্যু ঘটায় সরকারের। কয়েকটি দলের উগ্র সি পি আই (এম) বিরোধী মনোভাবও এর জন্য অনেকাংশে দায়ী। সরকার এক বছর টিকতে না টিকতেই ১৯৬৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয় রাজ্যে।

এর ফলে ১৯৬৯ সালে প্রথম অন্তর্বর্তী নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হয়। ভোট হয় ৯ ফেব্রুয়ারি। অবশ্য এই সময়ের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। যুক্তফ্রন্ট ভেঙে কংগ্রেস বিরোধী ঐক্য আরও সুদৃঢ় হয়। ১৪টি দল নিয়ে ফের গঠিত হয় যুক্তফ্রন্ট।

পঞ্চম বিধানসভা নির্বাচনে ভোট পড়েছিল ৬৬.৫১ শতাংশ। প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় মূলত কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্তফ্রন্টের। ৪১.৩২ শতাংশ ভোটারের সমর্থন আদায় করে নিতে পারলেও কংগ্রেসের আসন সংখ্যা কমে যায় মারাত্মকভাবে। ২৮০টির মধ্যে পায় ৫৫টি আসন।

অন্যদিকে, সি পি আই (এম) ৯৭টি আসনে লড়াই করে দখল করে নেয় ৮০টি আসন। ভোট পায় ১৯.৯৭ শতাংশ। সি পি আই পেয়েছিল ৩৬টির মধ্যে ৩০টি, বাংলা কংগ্রেস ৪৯টির মধ্যে ৩৩টি, ফরওয়ার্ড ব্লক ২৮টির মধ্যে ২১টি, আর এস পি ১৭টির মধ্যে ১২টি এবং এস ইউ সি ৭টিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পেয়েছিল ৭টি আসন। এছাড়া, আর সি পি আই ২টি, মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক ১টি, ওয়ার্কার্স পার্টি ২টি, এস এস পি ৯টি, গোর্খা লিগ ৪টি, লোকসেবক সংঘ ৪টি, পি এস পি ১টি, বিদ্রোহী পি এস পি ৪টি, আই এন ডি এফ ১টি এবং পি এস এল ৩টি আসন পেয়েছিল। ১৩ জন নির্দল প্রার্থীকে ফ্রন্ট সমর্থন জানালেও মাত্র ৫ জন জয়ী হয়েছিলেন।

সামগ্রিকভাবে এই নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিপুলভাবে জয়লাভ করে। কেননা, ২৮০টির মধ্যে ১৪ দলের ফ্রন্ট ২১৮টি আসন পেয়েছিল। আর ফ্রন্টের প্রতি জনসমর্থন ঘোষিত হয়েছিল ৪৯.৯ শতাংশ। বোঝাই যাচ্ছে, রাজ্যের মানুষ কংগ্রেসকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলেন। তাদের স্পষ্ট মনোভাব প্রতিফলিত হয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। নতুন জোয়ারের সূচনা হয়েছিল। কিন্তু প্রথম যুক্তফ্রন্টের মত দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টেও দেখা দেয় শরিকী বিরোধ। শেষ পর্যন্ত ১৩ মাসের মাথায় পদত্যাগ করেন মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জি। পতন ঘটে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের। ১৯৭০-র ১৩ মার্চ রাজ্যে বলবৎ হয় রাষ্ট্রপতি শাসন। আন্দোলনে আন্দোলনে উত্তাল হয়ে ওঠে গোটা রাজ্য। দাবি ওঠে নির্বাচনের। রাজ্য জুড়ে আইন-শৃঙ্খলার দ্রুত অবনতি ঘটে। বাড়তে লাগল গুপ্ত হত্যা ও সন্ত্রাস।

যুক্তফ্রন্ট সরকার ফের ভেঙে যাওয়ায় ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে দ্বিতীয়বার অন্তর্বর্তী নির্বাচনের কথা ঘোষণা করা হয়। বামপন্থী ও কংগ্রেস বিরোধী দলগুলির মধ্যে সে অর্থে কোন নির্বাচনী ঐক্য গড়ে ওঠে না। বাংলা কংগ্রেস এবার যুক্তফ্রন্ট ছেড়ে কংগ্রেসের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধে। বামপন্থীরা দুটি ফ্রন্টে ভাগ হয়ে নির্বাচনে অংশ নেয়। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, যুক্তফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জি বরাহনগর তারই মন্ত্রিসভার উপ-মুখ্যমন্ত্রী সি পি আই (এম)-র জ্যোতি বসুর বিরুদ্ধে প্রার্থী হন।

ষষ্ঠ নির্বাচনে ভোট পড়ে ৬০.৯০ শতাংশ। গত নির্বাচনের ধাক্কা কাটিয়ে কংগ্রেস এই নির্বাচনে ২৮.২০ শতাংশ ভোট পেয়ে ১০৫টি আসন দখল করে। অন্যদিকে, সি পি আই (এম) ৩১.৯৮ শতাংশ ভোট পেয়ে রাজ্যের সর্ববৃহৎ দলের স্বীকৃতি পায়। আসন সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১১৩। ছয় দলের বামপন্থী জোট পায় ১২৩টি আসন। আর আট বামের জোট পায় ২৫টি আসন। আর এস পি, ফরওয়ার্ড ব্লকের আসন সংখ্যা কমে যায়। দুটি দলই পায় ৩টি করে আসন। সি পি আই-কে মাত্র ১৩টি আসন নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। এছাড়া অন্যান্য দলগুলির মধ্যে এস ইউ সি ৭টি, মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক ২টি, আর সি পি আই ৩টি, গোর্খালিগ ২টি আসন পায়। মুসলিম লিগের আসন বেড়ে দাঁড়ায় ৭টিতে।

এই নির্বাচনের আগে শ্যামপুকুর কেন্দ্রের ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী জননায়ক হেমন্ত বসু প্রকাশ্য দিবালোকে রাস্তার ওপর খুন হন। কংগ্রেসীরা খুন করলেও দায় এসে পড়ে সি পি আই (এম)-এর ঘাড়ে। নির্বাচনের আগেই অবিশ্বাসের মাত্রা তৈরি হয়ে যায় দু-দলে মধ্যে। নির্বাচনের ফলাফলে সি পি আই (এম) সর্ববৃহৎ দল হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেও তাকে সরকার গড়তে ডাকা হয়নি চক্রান্ত করে। অবশ্য আর এস পি ও এস ইউ সি ছয় ও আট বামের জোট মিলে সরকার গঠনের প্রস্তাব দিলেও সি পি আই এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের আপত্তিতে তা বাতিল হয়ে যায়।

শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের নেতৃত্বে এক কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। মুখ্যমন্ত্রী করা হয় অজয় মুখার্জিকে। বিজয়সিং নাহার হন উপ-মুখ্যমন্ত্রী। এই মন্ত্রিসভার স্থায়িত্বও বেশিদিন হয় না। এরপরই দ্রুত পরিবর্তন ঘটে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতির। কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পাঠান রাজ্যের দায়িত্ব দিয়ে। কিন্তু অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে দ্রুত। রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ে চূড়ান্ত আকারে।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে সবচেয়ে কলঙ্কময় নির্বাচন হল ১৯৭২ সালের ১০ মার্চ। একে নির্বাচন না বলে 'প্রহসন' বলা শ্রেয় ; নির্বাচন হল এক টালমাটাল রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে। পুলিশ আর কংগ্রেসের মিলিত প্রয়াসে নানা নাটকীয় ও বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটেছিল এই নির্বাচনে। বরানগর কেন্দ্রে ভোট চলাকালীন সি পি আই (এম) প্রার্থী জ্যোতি বসু নাম প্রত্যাহার করে নিলেন। ওই কেন্দ্রে জয়ী হন সি পি আই-র শিবপদ ভট্টাচার্য। বহু জায়গায় সি পি আই (এম) প্রার্থীদের 'রিগিং' করে হারানো হয়।

সপ্তম বিধানসভা নির্বাচনে ভোট পড়েছিল ৬০.৮২ শতাংশ। কংগ্রেসের সহযোগী হিসাবে সি পি আই এই নির্বাচনে লড়েছিল। কংগ্রেস ভোট পায় ৪৯.০৮ শতাংশ। আগের নির্বাচনের ১০৫টি আসন বেড়ে দাঁড়ায় ২১৬টিতে। সি পি আই পায় ৩৬টি আসন। সি পি আই (এম) মাত্র ১৩টি আসন পেয়ে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখে। কিন্তু সি পি আই (এম)-র পক্ষে জনসমর্থন ছিল ২৭.৪৫ শতাংশ ভোটারের। আর এস পি ৩টি আসন পেলেও অন্যান্য বামপন্থী দলগুলি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। এস ইউ সি পেয়েছিল ১টি আসন। গোর্খালিগ ও মুসলিম লিগ পেয়েছিল যথাক্রমে ২টি ও ১টি আসন। কংগ্রেসের রেকর্ড জয়কে 'কারচুপির জয়' আ্যাখ্যা দিয়ে বামপন্থীরা একযোগে বিধানসভা বয়কট করে। বিজয়ী বামপন্থী প্রার্থীরা শপথ গ্রহণ পর্যন্ত করেননি। কংগ্রেস বেশ কয়েক বছর পর ফের ক্ষমতার স্বাদ পায়। মুখ্যমন্ত্রী হন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়।

এরপরের ঘটনা আরও নাটকীয়। ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থা জারি হয় দেশজুড়ে। ২ বছর পর জরুরি অবস্থা তুলে নিলে দেশব্যাপী নির্বাচন ঘোষণা করা হয়। ফল হয় বিপরীত।

কংগ্রেস ক্ষমতাচ্যুত হয় কেন্দ্র থেকে। '৭৭-র মার্চে কেন্দ্রে গঠিত হয় জনতা সরকার। জুন মাসে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন ঘোষিত হয়।

সম্পূর্ণ ভিন্ন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে অষ্টম বিধানসভা নির্বাচন হয় পশ্চিমবঙ্গে। কংগ্রেস তখন গোটা দেশেই বিপর্যয়ের মুখে। বামপন্থীরা মিলে গঠিত হয় ৬ দলের বামফ্রন্ট। সি পি আই (এম) ছাড়াও এই ফ্রন্টে ছিল আর এস পি, ফরওয়ার্ড ব্লক, আর সি পি আই, বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেস ও মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক। সি পি আই ফ্রন্টে যোগ না দিয়ে এককভাবে নির্বাচনে লড়াই করে।

নির্বাচনী কেন্দ্রের সংখ্যা ২৮০ থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ২৯৪। ভোট পড়েছিল শতকরা ৫৫.৮৭ ভাগ। এই ভোটে জনগণ কংগ্রেসকে দূরে সরিয়ে দেয়। তাদের রায় সুস্পষ্টভাবে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যায়। কংগ্রেসের ভোটসংখ্যা নেমে আসে ২৩.২০ শতাংশে। আসন পায় মাত্র ২০টি। আর সি পি আই পেয়েছিল ২টি আসন।

অন্যদিকে, বামফ্রন্ট বিপুল ভোটে জয়ী হয়। ৫ বছরে কংগ্রেসী অপশাসনের হাত থেকে মুক্তি পেতে মানুষ বামপন্থীদেরই বিকল্প হিসাবে খুঁজে নেয়। ফ্রন্টের অন্যতম শরিক সি পি আই (এম) একক নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। ৩৫.৬২ শতাংশ ভোটারের সমর্থনে সি পি আই (এম) পেয়েছিল ১৭৭টি আসন। এছাড়া ফ্রন্টের অন্যান্য শরিকদের মধ্যে ফরওয়ার্ড ব্লক ২৭টি, আর এস পি ২০টি, মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক ৩টি, আর সি পি আই ৩টি আসন পায়। আর জনতা দল পেয়েছিল ২৯টি আসন। ১৯৭৭ সালের নির্বাচনের মধ্য দিয়েই রাজ্যে প্রকৃত বামফ্রন্টের যাত্রা শুরু হয়। মুখ্যমন্ত্রী হন জ্যোতি বসু।

১৯৮২ সালের নির্বাচনের আগে বামফ্রন্টে যোগ দেয় সি পি আই। এছাড়া ডি এস পি ও পশ্চিমবঙ্গ সোস্যালিস্ট পার্টি বামফ্রন্টে আসে। ছয় দলীয় ফ্রন্ট পরিণত হয় নয় দলীয় ফ্রন্টে।

নবম বিধানসভা নির্বাচনে ৭৫.০৪ শতাংশ ভোটারের রায় পাওয়া গিয়েছিল। ২৪৯টি কেন্দ্রে প্রার্থী দিয়ে কংগ্রেস পায় ৫৩টি আসন। আগের নির্বাচনের তুলনায় অবস্থা কিছুটা ভাল হয়। সমর্থন বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৩৫.৭০ শতাংশ ভোটারের।

সি পি আই (এম) এই নির্বাচনেও সমানভাবে নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা লাভ করেছিল। ১৯৭৭-র তুলনায় আসন সংখ্যা কমে গেলেও ভোটের হার বৃদ্ধি পেয়েছিল। সি পি আই (এম) পায় ৩৫.৮০ শতাংশ ভোট। বামফ্রন্টের শরিক সি পি আই-র আসন সংখ্যা ২ থেকে বেড়ে হয় ৭। ফরওয়ার্ড ব্লক ২৮টি এবং আর এস পি ১৯টি আসন পায়। এই নির্বাচনে বামফ্রন্টের অনেকগুলি ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত পরাজয় ঘটে। কাশীপুর কেন্দ্রে তথ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং রাসবিহারী কেন্দ্রে ডঃ অশোক মিত্র পরাজিত হন।

পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষে ১৯৮৭ সালে অনুষ্ঠিত হয় দশম বিধানসভা নির্বাচন। আগের নির্বাচনের মতোই বামফ্রন্টের ঐক্য অটুট থাকে। ৭৫.৬৬ শতাংশ ভোট পড়ে।

কংগ্রেসের আসন সংখ্যা ফের কমে যায়। নেমে আসে ৪০-এ। অন্যদিকে, সি পি আই(এম) নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা পাবার পাশাপাশি আসন সংখ্যা বেড়ে যায়। ১৮৭টি আসন পায় সি পি আই (এম)। ফ্রন্টের অন্যান্য শরিকরা মোটামুটিভাবে তাদের পূর্বের অবস্থান ধরে রাখে। সি পি আই-র আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

ফের নির্বাচন হয় ১৯৯১ সালে পাঁচ বছর মেয়াদ শেষের আগেই। ভোট পড়ে ৭৬.৬৬ শতাংশ। কংগ্রেস পায় ৪৩টি আসন। মোট ৩৫.১১ শতাংশ ভোটারের জনসমর্থন পায় কংগ্রেস। অন্যদিকে, সি পি আই (এম) ৩৫.৩৭ শতাংশ ভোটারের সমর্থন নিয়ে পায়

১৮২টি আসন। ফ্রন্টের অন্যান্য শরিকদের মধ্যে ফরওয়ার্ড ব্লক এবং আর এস পি আসন সংখ্যা ধরে রাখতে পারলেও সি পি আই-র আসন কমে যায়।

এই নির্বাচনে কংগ্রেস জি এন এল এফ-এর সঙ্গে আসন সমঝোতা করেছিল। ৪টি আসনে সমঝোতা হয়েছিল ঝাড়খণ্ড পার্টির সঙ্গেও।

ভোটারদের বিপুল সংখ্যক অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে দ্বাদশ বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যাশিতভাবে বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। পর পর পাঁচবার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন জ্যোতি বসু।

এই নির্বাচনে ভোট দেয় ৮২.৮৯ শতাংশ মানুষ। রাজনৈতিক সচেতনতার এত বড় লক্ষণ এর আগে পরিলক্ষিত হয়নি। অপ্রত্যাশিতভাবে কংগ্রেসের আসন সংখ্যা ৪৩ থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ৮২-তে। ভোট পায় ৩৯.৪৮ শতাংশ।

আর বামফ্রন্টের প্রধান শরিক সি পি আই (এম) শতাংশের হিসাবে ভোট বেশি পেলেও বেশ কয়েকটি আসন হারায়। সি পি আই (এম) ৩৬.৪০ শতাংশ ভোট পেয়ে ১৫০টি আসনে গরিষ্ঠতা অর্জন করে। কমে যায় ৩২টি আসন। সামগ্রিকভাবে বামফ্রন্টের আসন ১৯৯১-র তুলনায় কমে ৪২টি। তবে বামফ্রন্টের অন্যান্য শরিকদের ততটা ক্ষতি হয় না। তারা আগের অবস্থানই ধরে রাখে বা রাখতে সক্ষম হয়।

বিধানসভার কিছু কথা

স্বাধীনোত্তর বিধানসভায় টুকিটাকি অনেক ঘটনাই ঘটেছে। বা অন্যভাবে বলতে গেলে নানা নজির সৃষ্টি হয়েছে। পদত্যাগ করেছে মুখ্যমন্ত্রী থেকে মন্ত্রী, অধ্যক্ষ নিজ ক্ষমতা বলে রুলিং দিয়েছেন, বা কখনও কখনও মার্শাল ডেকে বের করে দিতে হয়েছে উচ্ছৃঙ্খল সদস্যকে। বহিষ্কার বা সাসপেন্ডও হয়েছেন অনেক। এক্ষেত্রে অধ্যক্ষকে কড়া হাতে পরিচালনা করতে হয়েছে সভা। গত বছর এক কংগ্রেস সদস্য তো প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে গামছা আর গেঞ্জি পরে বিধানসভায় ঢুকেছিলেন।

১৯৪৭-র ১৫ আগস্ট গঠিত মন্ত্রিসভা থেকে এক মাসের মধ্যে পদত্যাগ করেন দেবেন্দ্রনাথ পাঁজা, রাধানাথ দাস ও বিমলচন্দ্র সিনহা। ২ সেপ্টেম্বর এরা পদত্যাগ করার ৬ দিন পর ৮ সেপ্টেম্বর সরে যান নিকুঞ্জবিহারী মাইতি। এরপর ১৯৪৮-র ২৩ জানুয়ারি রাজ্যের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ইস্তফা দিলে ডঃ বিধানচন্দ্র রায় মুখ্যমন্ত্রী হন। ওই মন্ত্রিসভায় কিরণশঙ্কর রায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হলেও ১৯৪৯-র ২০ ফেব্রুয়ারি মন্ত্রিত্ব থাকাকালীন মারা যান। এর আগে মারা যান মন্ত্রী মোহিনীমোহন বর্মন।

১৯৫৮-র মার্চ মাসে তৎকালীন কংগ্রেস মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। তিনি ছিলেন আইন দপ্তরে মন্ত্রী। এরপর মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জি পদত্যাগ করতে বাধ্য হলে বিশ্বাসঘাতক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মুখ্যমন্ত্রী হন। ১৯৬৯-র দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার মন্ত্রী নিরঞ্জন সেনগুপ্ত তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। আবার এই মন্ত্রিসভা থেকে সি পি আই (এম)-এর আবদুল্লা রসুল ইস্তফা দিলে ওই দলেরই মহম্মদ আমিন মন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন। ১৯৭২-এ সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন অরুণকুমার মৈত্র।

এরপর ১৯৮৫ সালে দ্বিতীয় বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন শ্রমমন্ত্রী কৃষ্ণপদ ঘোষ। এর আগে ১৯৮৩ সালে অর্থমন্ত্রী হিসাবে মন্ত্রিসভায় যোগ দেন ডঃ অশোক মিত্র। কিন্তু ১৯৮৬-র জানুয়ারি মাসে তিনি মন্ত্রিসভা থেকে সরে আসেন। ১৯৮৫ সালে সুন্দরবন

অঞ্চল উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী সি পি আই (এম)-র প্রভাসচন্দ্র রায়ের জীবনাবসান হয়। ১৯৮৬ সালে ফরওয়ার্ড ব্লকের শিক্ষামন্ত্রী শম্ভু ঘোষ মারা যান। ১৯৮৬ সালে অসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লকের রাম চ্যাটার্জির জীবনাবসান ঘটে। তবে ১৯৮২ সালে বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠনের এক বছরের মধ্যে বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রী সি পি আই (এম)-র শঙ্কর গুপ্ত মারা যান।

১৯৮৭ সালে গঠিত মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দেন পূর্তমন্ত্রী আর এস পি-র যতীন চক্রবর্তী। তাঁর জায়গায় আসেন ওই দলেরই মতীশ রায়। তবে তিনি পরের মন্ত্রিসভার সদস্য থাকাকালীন মারা যান। মন্ত্রী হন ওই দলেরই ক্ষিতি গোস্বামী। মারা যান সি পি আই (এম)-র মন্ত্রী অম্বরিশ মুখার্জিও। তবে চতুর্থ বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভার সবচেয়ে নাটকীয় ঘটনা হল ১৯৯৩ সালে তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের পদত্যাগ। পরের বছরই তিনি ফের ওই দপ্তরেই ফিরে আসেন।

অনন্য নজির

পশ্চিমবঙ্গের দ্বাদশ বিধানসভা নির্বাচন একটি কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে রইল। এই নির্বাচনে সাতগাছিয়া কেন্দ্রে ফের জয়ী হয়েছেন জ্যোতি বসু। গড়ে তুললেন এক অনন্য নজির। অবিভক্ত বাংলায় ১৯৪৬ সালে সীমাবদ্ধ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে রেলওয়ে শ্রমিক কেন্দ্র থেকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির হয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হয়েছিলেন জ্যোতি বসু। সে হিসাবে নির্বাচনী সংগ্রামে জ্যোতি বসু ৫০ বছরে পদার্পণ করলেন।

স্বাধীন ভারতে প্রথম নির্বাচনে ১৯৫২ সালে বরাহনগর কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মন্ত্রিসভার শিক্ষামন্ত্রী হরেন্দ্রনাথ চৌধুরীকে পরাস্ত করে জ্যোতি বসু দ্বিতীয়বারের জন্য নির্বাচিত হন। স্বীকৃতি পান বিধানসভার বিরোধী দলনেতার। ১৯৫৭, ৬২, ৬৭, ৬৯, ৭১ সালে বরাহনগর কেন্দ্র থেকেই জয়ী হয়েছিলেন জ্যোতি বসু। এরমধ্যে ৬৭ এবং ৬৯ সালে জয়ী হয়ে বসু যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার উপমুখ্যমন্ত্রী হন। ১৯৭২ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস রিগিঙের আশ্রয় নেয়। এই প্রহসন নির্বাচনকে প্রত্যাখ্যান করেছিল সি পি আই (এম)। জ্যোতি বসুও বরাহনগর কেন্দ্রে ভোটের জালিয়াতি দেখে বেলা ১২টার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়ান।

১৯৭৭ সালে জ্যোতি বসু সাতগাছিয়া কেন্দ্র থেকে জয়ী হন। গঠিত হল বামফ্রন্ট সরকার। জ্যোতি বসু তার মুখ্যমন্ত্রী। এরপর বসু সাতগাছিয়া কেন্দ্র থেকে প্রতিটি নির্বাচনেই জয়ী হয়েছেন। কোন অঙ্গরাজ্যে পরপর পাঁচবার মুখ্যমন্ত্রী হয়ে তিনি গড়ে তুলেছেন এক অনন্য রেকর্ড।

মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ও পনেরো বছর রাজত্ব করেছিলেন। দেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৪৮ সালে তিনি মুখ্যমন্ত্রী হন। আমৃত্যু তিনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের। ১৯৬২ সালে তিনি মারা যান। এর মাঝে ১৯৫২, ৫৭ এবং ৬২ সালের নির্বাচনে তিনি জয়ী হন।

স্বাধীনতা-উত্তর

বিধানসভার অধ্যক্ষ

১৯৪৭—৫২ সাল : ঈশ্বরদাস জালান
১৯৫২—৫৭ সাল : শৈল মুখার্জি
১৯৫৭—৬২ সাল : শঙ্করদাস ব্যানার্জি
১৯৬০—৬২ সাল : বঙ্কিমচন্দ্র কর
১৯৬২—৬৭ সাল : কেশবচন্দ্র বসু
১৯৬৭—৭১ সাল : বিজয়কুমার ব্যানার্জি
১৯৭১—৭৭ সাল : অপূর্বলাল মজুমদার
১৯৭৭—৮২ সাল : মনসুর হবিবুল্লাহ
১৯৮২—৮৭ সাল : হাসিম আব্দুল হালিম
১৯৮৭—৯১ সাল : হাসিম আব্দুল হালিম
১৯৯১—৯৬ সাল : হাসিম আব্দুল হালিম
১৯৯৬— : হাসিম আব্দুল হালিম

উপাধ্যক্ষ

১৯৪৭—৬৬ সাল : আশুতোষ মল্লিক
১৯৬৬—৬৭ সাল : নরেন্দ্রনাথ সেন
১৯৬৭—৬৮ সাল : হরিদাস মিত্র
১৯৬৯—৭০ সাল : অপূর্বলাল মজুমদাব
১৯৭১—৭২ সাল : পীযূষকান্তি মুখার্জি
১৯৭২—৭৭ সাল : হরিদাস মিত্র
১৯৭৭—৮৭ সাল : কলিমুদ্দিন শামস্
১৯৮৭—৯১ সাল : অনিল মুখার্জি
১৯৯১—৯৬ সাল : অনিল মুখার্জি
১৯৯৬— : অনিল মুখার্জি

এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের চেয়ারম্যান ১৯৫২-৬৫ সাল পর্যন্ত ছিলেন সুনীতিকুমার চ্যাটার্জি। এরপর ১৯৬৫-৬৯ সাল পর্যন্ত চেয়ারম্যান ছিলেন প্রতাপচন্দ্র গুহ রায়। আবার প্রতাপচন্দ্র গুহ রায় ১৯৫২-৬৫ সাল পর্যন্ত বিধানপরিষদের ডেপুটি চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৬৫ সালে তিনি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ায় উপেন্দ্রনাথ বর্মন ১৯৬৫-৬৯ সাল পর্যন্ত, পশ্চিমবঙ্গের বিধান পরিষদ ১৯৬৯-র ২১ মার্চ তুলে দিয়ে পুরোপুরি কর্তৃত্ব দেওয়া হয় বিধানসভাকে।

মন্ত্রিসভা ১৯৪৭-র ১৫ আগস্ট

ডঃ প্রফুল্লকুমার ঘোষ : মুখ্যমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্র ও শিক্ষা দপ্তরের দায়িত্বে
ডঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জি : বাণিজ্য ও শ্রম এবং শিক্ষা
যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা : অর্থ
হেমচন্দ্র নস্কর : কৃষি, বন, মৎস্য
নিকুঞ্জবিহারী মাইতি : সেচ, পূর্ত ও গৃহ নির্মাণ এবং জলপথ
কমলকৃষ্ণ রায় : সমবায় ঋণ, ত্রাণ
রাধানাথ দাস : অসামরিক সরবরাহ
কালিদাস মুখার্জি : ভূমি এবং ভূমিরাজস্ব
মোহিনীমোহন বর্মন : বিচার এবং আইন
বিমলচন্দ্র সিনহা : স্বাস্থ্য এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার

মন্ত্রিসভা ২৩ জানুয়ারি ১৯৪৮

ডঃ বিধানচন্দ্র রায় : মুখ্যমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্র, স্বাস্থ্য, স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসিত সরকার।
নলিনীরঞ্জন সরকার : অর্থ, বাণিজ্য ও শিক্ষা
রায়হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী : শিক্ষা
বিমলচন্দ্র সিনহা : পূর্ত, গৃহনির্মাণ এবং যোগাযোগ
নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার: বিচার আইন
মোহিনীমোহন বর্মন : ভূমি ও ভূমিরাজস্ব
কালিপদ মুখার্জি : শ্রম
হেমচন্দ্র নস্কর : বন এবং মৎস্য
ভূপতি মজুমদার : সেচ এবং জলপথ
প্রফুল্লচন্দ্র সেন : অসামরিক সরবরাহ
নিকুঞ্জবিহারী মাইতি : সমবায়, ঋণ, ত্রাণ এবং পুনর্বাসন
যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা : কৃষি এবং পশু চিকিৎসা
কিরণশঙ্কর রায় : পুলিশ

কংগ্রেস মন্ত্রিসভা ১৯৫২-র ১৩ জুন

ডঃ বিধানচন্দ্র রায়	মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র, উন্নয়ন, চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য, অর্থ বাণিজ্য ও শিল্প।
যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা	: কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প
হেমচন্দ্র নস্কর	: বন এবং মৎস্য
অজয়কুমার মুখার্জি	: সেচ এবং জলপথ
শ্যামাপ্রসাদ বর্মন	: আবগারি
খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	: পূর্ত ও গৃহনির্মাণ
রাধাগোবিন্দ রায়	উপজাতি কল্যাণ
রেণুকা রায়	: উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন
প্রফুল্লচন্দ্র সেন (বিধান পরিষদ)	: খাদ্য, ত্রাণ ও সরবরাহ
রফিউদ্দিন আহমেদ	: কৃষি ও সমবায়
পান্নালাল বোস	: শিক্ষা
কালিপদ মুখার্জি (বিধান পরিষদ)	: শ্রম
সত্যেন্দ্রকুমার বসু	: বিচার ও আইন ভূমি ও ভূমিরাজস্ব
ঈশ্বরদাস জালান	: স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার

প্রতিমন্ত্রী

সতীশচন্দ্র রায়সিংহ	: পরিবহন
সত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষমৌলিক	: স্বরাষ্ট্র
জীবনরতন ধর (পরে পূর্ণমন্ত্রী হন)	: কারাগার
গোপিকাবিলাস সেনগুপ্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী হন)	: প্রচার এবং জনসংযোগ
তরুণকান্তি ঘোষ	: উপনগরী, ত্রাণ এবং পুনর্বাসন
ডঃ অমূল্যধন মুখার্জি (পূর্ণমন্ত্রী হন)	: চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য
সৌরীন্দ্রমোহন মিত্র	: বাণিজ্য ও শিল্প
তেনজিঙ ওয়াঙদি	: উপজাতি কল্যাণ
ব্রিজেশচন্দ্র সেন	: উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন
সমরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়	: খাদ্য, ত্রাণ ও সরবরাহ
রজনীকান্ত প্রামাণিক	: খাদ্য ত্রাণ ও সরবরাহ
মোঃ আব্দুস সাত্তার	কৃষি ও সমবায়
চিত্তরঞ্জন রায় (বিধানপরিষদ)	সমবায় শাখা
পূরবী মুখার্জি	: শিক্ষা, উদ্বাস্তু, ত্রাণ এবং পুনর্বাসন
শিবকুমার রায়	: শ্রম
দেবেন্দ্রচন্দ্র দে	: স্বরাষ্ট্র, পরিষদীয়

কংগ্রেস মন্ত্রিসভা ১৯৫৭

ডঃ বিধানচন্দ্র রায়	: মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র, অর্থ, শিক্ষা, উন্নয়ন, সমবায়, কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প।
প্রফুল্লচন্দ্র সেন	: খাদ্য, ত্রাণ ও সরবরাহ, উদ্বাস্তু ত্রাণ এবং পুনর্বাসন
কালিপদ মুখার্জি (বিধানপরিষদ)	: পুলিশ
খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	: পূর্ত, গৃহনির্মাণ ও আবাসন
অজয়কুমার মুখার্জি	: সেচ ও জলপথ
শ্যামাপ্রসাদ বর্মন	: আবগারি
রফিউদ্দিন আহমেদ	: কৃষি, পশুপালন এবং বন
ঈশ্বরদাস জালান	: স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার পঞ্চায়েত
বিমলচন্দ্র সিনহা	: ভূমি এবং ভূমিরাজস্ব
ভূপতি মজুমদার	: বাণিজ্য এবং শিল্প, উপজাতি কল্যাণ
সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়	: বিচার, আইন এবং উপজাতি কল্যাণ
রায়হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী (বিধানপরিষদ)	: শিক্ষা
জনাব আব্দুস সাত্তার	: শ্রম
অর্ধেন্দুশেখর নস্কর	: স্বরাষ্ট্র
আশুতোষ ঘোষ (বিধানপরিষদ)	: খাদ্য, ত্রাণ এবং সরবরাহ
হেমচন্দ্র নস্কর	: মৎস্য ও বন

রাষ্ট্রমন্ত্রী

পূরবী মুখার্জি : কারাগার, উদ্বাস্তু ত্রাণ এবং পুনর্বাসন

তরুণকান্তি ঘোষ (পূর্ণ মন্ত্রী হন) : উন্নয়ন, উদ্বাস্তু, ত্রাণ পুনর্বাসন, কৃষি খাদ্য উৎপাদন, মৎস্য এবং বন।

অনাথবন্ধু রায় : স্বাস্থ্য

শ্যামাপ্রসাদ ভট্টাচার্য : ভূমি ও ভূমিরাজস্ব

প্রতিমন্ত্রী

সতীশচন্দ্র রায়সিংহ : পরিবহন

সৌরীন্দ্রমোহন মিশ্র : শিক্ষা

তেনজিঙ ওয়াঙদি : উপজাতি কল্যাণ

সমরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় : কৃষি, পশুপালন, বন

রজনীকান্ত প্রামাণিক : ত্রাণ ও সরবরাহ

চিত্তরঞ্জন রায় : সমবায় (বিধানপরিষদ)

জনাব সৈয়দ কাজিমআলি মির্জা : কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প

মহম্মদ জিয়াউল হক : স্বাস্থ্য

মায়া ব্যানার্জি : উদ্বাস্তু, ত্রাণ ও পুনর্বাসন

চারুচন্দ্র মহান্তি : খাদ্য, ত্রাণ ও সরবরাহ

জগন্নাথ কোলে (পূর্ণমন্ত্রী হন) : প্রচার ও মুখ্য সচেতক

নরবাহাদুর গুরুঙ : শ্রম

কংগ্রেস মন্ত্রিসভা ১৯৬২

ডঃ বিধানচন্দ্র রায় : মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র, অর্থ, উন্নয়ন, বাণিজ্য ও শিল্প, মৎস্য এবং আবাসন।

প্রফুল্লচন্দ্র সেন : খাদ্য, কৃষি ও সরবরাহ

কালিপদ মুখার্জি (বিধানপরিষদ) : পুলিশ, প্রতিরক্ষা, বিশেষ, পাসপোর্ট এবং সংবাদ মাধ্যম

খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত : পূর্ত

অজয়কুমার মুখার্জি : সেচ ও জলপথ

ঈশ্বরদাস জালান : আইন

রায়হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী (বিধানপরিষদ) : শিক্ষা

পূরবী মুখার্জি : কারাগার এবং সমাজকল্যাণ

শ্যামাদাস ভট্টাচার্য : ভূমি এবং ভূমিরাজস্ব

জগন্নাথ কোলে : প্রচার, আবগারি এবং পরিষদীয়

ডঃ জীবনরতন ধর : স্বাস্থ্য

শৈলকুমার মুখার্জি : স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার এবং পঞ্চায়েত, সামাজিক উন্নয়ন এবং উপজাতি কল্যাণ

আভা মাইতি : উদ্বাস্তু, ত্রাণ এবং পুনর্বাসন

এস এম ফজলুর রহমান : পশুপালন এবং পশু-চিকিৎসা পরিষেবা

বিজয়সিং নাহার : শ্রম

তরুণকান্তি ঘোষ : ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, সমবায়, বন

রাষ্ট্রমন্ত্রী

সৌরীন্দ্রমোহন মিশ্র : শিক্ষা

তেনজিঙ ওয়াঙদি : পশুপালন এবং পশুচিকিৎসা

সমরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় : প্রতিরক্ষা

চারুচন্দ্র মোহান্তি (বিধানপরিষদ) : সমবায়

অর্ধেন্দুশেখর নস্কর : আবগারি

আশুতোষ ঘোষ (বিধানপরিষদ) : উন্নয়ন এবং মৎস্য

ব্রিজেশচন্দ্র সেন : আবাসন

ডঃ প্রবোধকুমার গুহ : শ্রম

ডঃ সুশীলরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় : স্বাস্থ্য

প্রমথরঞ্জন ঠাকুর : উপজাতি কল্যাণ

প্রতিমন্ত্রী

সৈয়দ কাজিমআলি মির্জা : পূর্ত

মহম্মদ জিয়াউল হক : স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত এবং পঞ্চায়েত
মায়া ব্যানার্জি : শিক্ষা
তারাপদ রায় : সেচ ও জলপথ
রাধারানী মাহাতব : কারাগার এবং সমাজকল্যাণ
কানাইলাল দাস : ভূমি ও ভূমিরাজস্ব
সাকিলা খাতুন : উদ্বাস্তু, ত্রাণ এবং পুনর্বাসন
মুক্তিপদ চ্যাটার্জি : শিক্ষা
জয়নাল আবেদিন : স্বাস্থ্য
মহেন্দ্রনাথ ডাকুয়া : বাণিজ্য এবং শিল্প

কংগ্রেস মন্ত্রিসভা ১৯৬২-র ৯ জুলাই মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পর

প্রফুল্লচন্দ্র সেন : মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র, উন্নয়ন, খাদ্য, সরবরাহ ও কৃষি
খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত : পূর্ত ও আবাসন
অজয়কুমার মুখার্জি : সেচ ও জলপথ
ঈশ্বরদাস জালান : আইন
কালিপদ মুখার্জি : পুলিশ, সংবাদ মাধ্যম এবং পাসপোর্ট
রায়হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী : শিক্ষা
(পরে বিধানপরিষদের সদস্য রবীন্দ্রলাল সিনহাকে ওই দপ্তরে নিয়ে আসা হয়)
তরুণকান্তি ঘোষ : বাণিজ্য ও শিক্ষা, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প, সমবায়
শঙ্করদাস ব্যানার্জি : অর্থ, পরিবহন
পূরবী মুখার্জি : কারাগার, সমাজকল্যাণ
শ্যামাপদ ভট্টাচার্য : ভূমি এবং ভূমিরাজস্ব
জগন্নাথ কোলে : প্রচার, আবগারি, পরিষদীয় এবং মুখ্যসচেতক
ডঃ জীবনরতন ধর : স্বাস্থ্য
শৈলকুমার মুখার্জি : স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার এবং পঞ্চায়েত, সামাজিক উন্নয়ন এবং উপজাতি কল্যাণ
আভা মাইতি : ত্রাণ, উদ্বাস্তু এবং পুনর্বাসন
এস এম ফজলুর রহমান : পশুপালন, পশুচিকিৎসা, মৎস্য এবং বন
বিজয়সিং নাহার : শ্রম

রাষ্ট্রমন্ত্রী

সৌরীন্দ্রমোহন মিত্র : শিক্ষা
তেনজিঙ ওয়াঙদি : পশুপালন এবং পশুচিকিৎসা
সমরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় : কৃষি
চারুচন্দ্র মোহান্তি : খাদ্য এবং সরবরাহ
চিত্তরঞ্জন রায় (বিধানপরিষদ) : সমবায়
অর্ধেন্দুশেখর নস্কর : আবগারি
আশুতোষ ঘোষ (বিধানপরিষদ) : পরিবহন
ব্রিজেশচন্দ্র সেন : উন্নয়ন, পূর্ত এবং আবাসন
প্রমথকুমার গুহ : শ্রম ও স্বাস্থ্য
প্রমথরঞ্জন ঠাকুর : উপজাতি কল্যাণ
ডঃ সুশীলরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় : স্বাস্থ্য

প্রতিমন্ত্রী

সৈয়দ কাজেম আলি মোল্লা : পূর্ত
জিয়াউল হক : স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন এবং পঞ্চায়েত
মায়া ব্যানার্জি : শিক্ষা
তারাপদ রায় : সেচ এবং জলপথ
রাধারানী মোহাতব : কারাগার এবং সমাজকল্যাণ
কানাইলাল দাস : ভূমি এবং ভূমিরাজস্ব
জয়নাল আবেদিন : স্বাস্থ্য
শাকিলা খাতুন : উদ্বাস্তু পুনর্বাসন এবং ত্রাণ
মুক্তিপদ চ্যাটার্জি : শিক্ষা
মহেন্দ্রনাথ ডাকুয়া : বাণিজ্য এবং শিল্প

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ১৯৬৭

মন্ত্রী	দপ্তর
অজয়কুমার মুখার্জি (বাংলা কংগ্রেস)	মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র
জ্যোতি বসু [সি পি আই (এম)]	উপমুখ্যমন্ত্রী, অর্থ এবং স্বরাষ্ট্র (পরিবহন)
সোমনাথ লাহিড়ি (সি পি আই)	পরিষদীয়, তথ্য জনসংযোগ এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন
হেমন্তকুমার বসু (ফরওয়ার্ড ব্লক)	পূর্ত ও আবাসন
প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ (নির্দল)	খাদ্য, সরবরাহ ও কৃষি
জাহাঙ্গির কবীর (বাংলা কংগ্রেস)	উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও বন
হরেকৃষ্ণ কোঙার [সি পি আই (এম)]	ভূমি এবং ভূমিরাজস্ব
বিশ্বনাথ মুখার্জি (বিধানপরিষদ) (সি পি আই)	সেচ এবং জলপথ
সুশীলকুমার ধাড়া (বাংলা কংগ্রেস)	বাণিজ্য এবং শিক্ষা, সামাজিক উন্নয়ন
অমরপ্রসাদ চক্রবর্তী (বিধানপরিষদ) (ফরওয়ার্ড ব্লক)	আবগারি, বিচার ও আইন, সংবাদ মাধ্যম, পাসপোর্ট
ননী ভট্টাচার্য (আর এস পি)	স্বাস্থ্য
নিরঞ্জন সেনগুপ্ত [সি পি আই (এম)]	উদ্বাস্তু ত্রাণ এবং পুনর্বাসন, স্বরাষ্ট্র (কারাগার)
বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত (লোকসেবক সংঘ)	পঞ্চায়েত, ত্রাণ এবং সমাজকল্যাণ
দেওপ্রকাশ রাই (গোর্খা লিগ)	উপজাতি কল্যাণ
জ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্য (ওয়ার্কার্স পার্টি)	শিক্ষা
সুবোধ ব্যানার্জি (এস ইউ সি)	শ্রম
কাশিকান্ত মৈত্র (সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টি)	পশুপালন, পশুচিকিৎসা, মৎস্য এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প
নিশীথনাথ কুণ্ডু (প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টি)	সমবায় এবং ত্রাণ
চারুমিহির সরকার (বাংলা কংগ্রেস)	অসামরিক প্রতিরক্ষা এবং অন্যান্য

প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট মন্ত্রিসভা নভেম্বর, ১৯৬৭

মন্ত্রী	দপ্তর
প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ	মুখ্যমন্ত্রী এছাড়া অন্য দুই মন্ত্রীর দপ্তরগুলি ব্যতীত সমস্ত
হরেন্দ্রনাথ মজুমদার	কৃষি, সামরিক উন্নয়ন সেচ এবং জলপথ, পশুপালন এবং পশু চিকিৎসা, মৎস্য
ডঃ আমীরআলি মোল্লা	স্বাস্থ্য, বন

কংগ্রেস-প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট জোট মন্ত্রিসভা ১৫ জানুয়ারি ১৯৬৮ থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮

মন্ত্রী	দপ্তর
ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ	মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র, খাদ্য এবং সরবরাহ, উন্নয়ন এবং পরিকল্পনা
ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র (কংগ্রেস)	পরিষদীয়, বিচার ও অর্থ
খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (কংগ্রেস)	সেচ এবং জলপথ
অমিয়কুমার কিসকু	শিক্ষা, তফশিলি জাতি ও উপজাতি কল্যাণ এবং সমাজকল্যাণ
হরেন্দ্রনাথ মজুমদার	বাণিজ্য এবং শিক্ষা, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প, পশুপালন, পশুচিকিৎসা এবং মৎস্য
বিনোদবিহারী মাঝি (কংগ্রেস)	উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন এবং ত্রাণ
ডঃ আমীরআলি মোল্লা	স্বাস্থ্য
বিজয়সিং নাহার (কংগ্রেস)	আবগারি, বন এবং পরিবহন
গঙ্গাধর প্রামাণিক	শ্রম এবং তথ্য ও জনসংযোগ
ডঃ নলিনাক্ষ সান্যাল	স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, পঞ্চায়েত জনমাধ্যম, পাসপোর্ট, সংবিধান

এবং নির্বাচন,
পরিষদীয় এবং ক্রীড়া
আব্দুস সাত্তার : ভূমি ও ভূমিরাজস্ব
রবীন্দ্রনাথ সিনহা :
(বিধান পরিষদ) (কংগ্রেস)
দাশরথি তা : কৃষি, সামাজিক উন্নয়ন
এবং সমবায়

রাষ্ট্রমন্ত্রী

খগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : কারাগার, বন
চণ্ডীপদ মিত্র : সমবায়, পর্যটন
জগদানন্দ রায় : তফসিলি জাতি,
উপজাতি কল্যাণ,
সমাজকল্যাণ
রাজেন্দ্রসিংহ সিংহী : পরিবহন

দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ১৯৬৭

অজয়কুমার মুখার্জি : মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র
(বাংলা কংগ্রেস)
জ্যোতি বসু : উপমুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র
[সি পি আই (এম)] (পুলিশ এবং প্রশাসন)
হরেকৃষ্ণ কোঙার : ভূমি এবং ভূমিরাজস্ব
[সি পি আই (এম)]
নিরঞ্জন সেনগুপ্ত : উদ্বাস্তু, ত্রাণ ও
[সি পি আই (এম)] পুনর্বাসন এবং কারাগার
কৃষ্ণপদ ঘোষ : শ্রম
[সি পি আই (এম)]
সত্যপ্রিয় রায় : শিক্ষা
[সি পি আই (এম)]
আব্দুল্লাহ রসুল : পরিবহন
[সি পি আই (এম)] (বিধানপরিষদ)
প্রভাসচন্দ্র রায় : মৎস্য
[সি পি আই (এম)]
গোলাম ইয়াজদানি : পাসপোর্ট এবং
[সি পি আই (এম)] অসামরিক
কৃষ্ণচন্দ্র হালদার : আবগারি
[সি পি আই (এম)]
চারুমিহির সরকার : সামাজিক উন্নয়ন
(বাংলা কংগ্রেস)

ভবতোষ সোরেন : বন
(বাংলা কংগ্রেস)
সুশীলকুমার ধাড়া : বাণিজ্য ও শিল্প
(বাংলা কংগ্রেস)
সোমনাথ লাহিড়ি : স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন,
(সি পি আই) উন্নয়ন এবং পরিকল্পনা
বিশ্বনাথ মুখার্জি : সেচ এবং জলপথ
(সি পি আই)
রেণু চক্রবর্তী : সমবায় ও
(সি পি আই) সমাজকল্যাণ
আব্দুর রেজ্জাক খান : ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ
(সি পি আই)
কানাইলাল ভট্টাচার্য : কৃষি ও সামাজিক
(ফরওয়ার্ড ব্লক) উন্নয়ন
শম্ভু ঘোষ (ফঃ বঃ) : কুটীর ও ক্ষুদ্রশিল্প
ভক্তিভূষণ মণ্ডল : আসন ও বিচার
(ফরওয়ার্ড ব্লক)
যতীন চক্রবর্তী : পরিষদীয়
(আর এস পি)
ননী ভট্টাচার্য : স্বাস্থ্য
(আর এস পি)
সুবোধ ব্যানার্জি : পূর্ত
(এস ইউ সি)
বিভূতি দাশগুপ্ত : পঞ্চায়েত
(এল এস এস)
দেওপ্রকাশ রাই : তফশিলি জাতি,
(গোর্খা লিগ) উপজাতি কল্যাণ
জ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্য : তথ্য ও জনসংযোগ
(ওয়ার্কার্স পার্টি)
সুধীনকুমার : খাদ্য ও সরবরাহ
(আর সি পি আই)
সুধীরচন্দ্র দাস : পশুপালন ও
(পি এস পি) পশুচিকিৎসা

রাষ্ট্রমন্ত্রী

প্রতিভা মুখার্জি : সড়ক
(এস ইউ সি)
রাম চ্যাটার্জি : ক্রীড়া
(মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক)
বরদা মুখার্জি (বি পি) : পর্যটন

গণতান্ত্রিক জোট মন্ত্রিসভা ১৯৭১

অজয়কুমার মুখার্জি (বাংলা কংগ্রেস)	মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র
বিজয়সিং নাহার [কংগ্রেস (আর)]	: উপমুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র, উন্নয়ন, পরিকল্পনা, তথ্য ও জনসংযোগ
তরুণকান্তি ঘোষ [কংগ্রেস (আর)]	: অর্থ, পরিবহন
আব্দুস সাত্তার [কংগ্রেস (আর)]	: ভূমি ও ভূমিরাজস্ব, আবগারি
জয়নাল আবেদিন [কংগ্রেস (আর)]	: স্বাস্থ্য, কৃষি
সন্তোষ রায় [কংগ্রেস (আর)]	: পূর্ত, আবাসন
এ বি এ গনিখান চৌধুরী [কংগ্রেস (আর)]	: সেচ, জলপথ
গোপাল দাস নাগ [কংগ্রেস (আর)]	: শ্রম
অজিতকুমার পাঁজা [কংগ্রেস (আর)]	: আইন, বিচার, পরিষদীয়
জগদানন্দ রায় [কংগ্রেস (আর)]	: সমবায়
শান্তিকুমার দাশগুপ্ত [কংগ্রেস (আর)]	: ক্ষুদ্র, কুটির শিল্প, কারখানা
আব্দুর রউফ আনসারি [কংগ্রেস (আর)]	: স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, পঞ্চায়েত
সীতারাম মাহাতো [কংগ্রেস (আর)]	: ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ
কমলনাথ হেমব্রম [কংগ্রেস (আর)]	: সরবরাহ, বন
কাশীকান্ত মৈত্র (এস এস পি)	: খাদ্য, সরবরাহ, পশু চিকিৎসা
সুধীরচন্দ্র দাস (পি এস পি)	: পশুপালন, পশু চিকিৎসা
দেওপ্রকাশ রাই (গোর্খা লিগ)	: তফসিলী জাতি, উপজাতি কল্যাণ, পর্যটন
এ কে এম হাসানুজ্জমান (মুসলিম লিগ)	: কৃষি, সামাজিক উন্নয়ন
আলহাজ নাসিরুদ্দিন খান (পি এস পি)	: কৃষি
প্রবোধচন্দ্র সিনহা (পি এস পি)	: মৎস্য, পঞ্চায়েত

রাষ্ট্রমন্ত্রী

আনন্দমোহন বিশ্বাস [কংগ্রেস (আর)]	: অর্থ, উদ্বাস্তু ত্রাণ পুনর্বাসন
ঈশ্বর তিরকি [কংগ্রেস (আর)]	: অসামরিক প্রতিরক্ষা
রথীন তালুকদার [কংগ্রেস (আর)]	: উন্নয়ন ও পরিকল্পনা
গোবিন্দচন্দ্র নস্কর [কংগ্রেস (আর)]	: স্বাস্থ্য, কৃষি
শামায়ুন বিশ্বাস (মুসলিম লিগ)	: কৃষি

কংগ্রেস মন্ত্রিসভা ১৯৭২

সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়	: মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র, তথ্য ও জনসংযোগ, ওয়াকফ, যুবকল্যাণ
আব্দুস সাত্তার	: কৃষি সামাজিক উন্নয়ন
জয়নাল আবেদিন	: রাষ্ট্রায়ত্ত, কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প
মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জি	: শিক্ষা
এ বি এ গনিখান চৌধুরী	: বিদ্যুৎ, সেচ ও জলপথ
তরুণকান্তি ঘোষ	: বাণিজ্য-শিল্প, পর্যটন
শঙ্কর ঘোষ	: অর্থ, উন্নয়ন, পরিকল্পনা
গুরুপদ খান	: ভূমি ও ভূমিরাজস্ব
সীতারাম মাহাতো	: বন, পশুপালন, পশুচিকিৎসা, আবগারি
কাশীকান্ত মৈত্র	: খাদ্য ও সরবরাহ
অরুণকুমার মৈত্র	: সমবায়, মৎস্য, কারুশিল্প
ডঃ গোপালদাস নাগ	: শ্রম
জ্ঞানসিং সোহনপাল	: পরিবহন, কারাগার পরিষদীয়
অজিতকুমার পাঁজা	: স্বাস্থ্য
সন্তোষ রায়	: ত্রাণ, সমাজকল্যাণ, মৎস্য
ভোলানাথ সেন	: পূর্ত আবাসন

রাষ্ট্রমন্ত্রী

প্রদীপ ভট্টাচার্য : শ্রম
আনন্দমোহন বিশ্বাস : কৃষি, সামাজিক উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, আইন ও বিচার
প্রফুল্লকান্তি ঘোষ : পৌরসভা, পঞ্চায়েত, ক্রীড়া
ডঃ ফজলে হক : স্বরাষ্ট্র, উন্নয়ন এবং পরিকল্পনা তথ্য ও জনসংযোগ
ডেনিস লাকরা : ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ
সুব্রত মুখোপাধ্যায় : স্বরাষ্ট্র, উন্নয়ন, পরিকল্পনা, তথ্য ও জনসংযোগ, যুবকল্যাণ
গোবিন্দচন্দ্র নস্কর : স্বাস্থ্য
রামকৃষ্ণ সারোগি : পূর্ত ও আবাসন
অতীশচন্দ্র সিনহা : রাষ্ট্রায়ত্ত, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প, প্রতিমন্ত্রী
অমলা সোরেন : শিক্ষা
গজেন্দ্র গুরুং : বাণিজ্য শিল্প, পর্যটন
সুনীতি চট্টরাজ : বিদ্যুৎ, সেচ, জলপথ

প্রথম বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ১৯৭৭

জ্যোতি বসু [সি পি আই (এম)] : মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র, উন্নয়ন, বিদ্যুৎ এবং পার্বত্য বিষয়ক
কৃষ্ণপদ ঘোষ [সি পি আই (এম)] : শ্রম
ডঃ অশোক মিত্র [সি পি আই (এম)] : অর্থ, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা, আবগারি
প্রভাসচন্দ্র রায় [সি পি আই (এম)] : সেচ এবং জলপথ, সুন্দরবন এলাকা উন্নয়ন
অমৃতেন্দু মুখার্জি [সি পি আই (এম)] : প্রাণীসম্পদ বিকাশ, পশু চিকিৎসা
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য [সি পি আই (এম)] : তথ্য ও সংস্কৃতি
প্রশান্তকুমার শূর [সি পি আই (এম)] : স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, নগর ও পৌর উন্নয়ন
রাধিকারঞ্জন ব্যানার্জি [সি পি আই (এম)] : উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন, ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ
বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী [সি পি আই (এম)] : ভূমি ও ভূমিরাজস্ব এবং ভূমিসংস্কার
চিত্তব্রত মজুমদার [সি পি আই (এম)] : কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প
মহম্মদ আমিন [সি পি আই (এম)] : পরিবহন
পার্থ দে [সি পি আই (এম)] : প্রাথমিক শিক্ষা, মধ্যশিক্ষা এবং গ্রন্থাগার
হাসিম আব্দুল হালিম [সি পি আই (এম)] : আইন ও বিচার
পরিমল মিত্র [সি পি আই (এম)] : বন ও পর্যটন
ডঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য (ফঃ বঃ) : শিল্প ও বাণিজ্য, অধিগৃহীত সংস্থা, বন্ধ ও রুগ্ণ শিল্প
শম্ভুচরণ ঘোষ : শিক্ষা
ভক্তিভূষণ মণ্ডল (ফঃ বঃ) : মৎস্য ও সমবায়
কমলকান্তি গুহ (ফঃ বঃ) : কৃষি
যতীন চক্রবর্তী (আর এস পি) : পূর্ত ও আবাসন
ননী ভট্টাচার্য (আর এস পি) : স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা
দেবব্রত ব্যানার্জি (আর এস পি) : পঞ্চায়েত ও কারা
সুধীনকুমার (আর সি পি আই) : খাদ্য ও সরবরাহ
ভবানী মুখার্জি [সি পি আই (এম)] : পরিষদীয়

রাষ্ট্রমন্ত্রী

নিরুপমা চ্যাটার্জি : তফশিলি জাতি, উপজাতি কল্যাণ
শম্ভুনাথ মাণ্ডি [সি পি আই (এম)] : তফশিলি জাতি, উপজাতি কল্যাণ
শিবেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী [সি পি আই (এম)] : পরিবহন
মহম্মদ আব্দুল বারি [সি পি আই (এম)] : প্রাথমিক, মাধ্যমিক শিক্ষা এবং গ্রন্থাগার

কান্তি বিশ্বাস [সি পি আই (এম)] : যুবকল্যাণ এবং পাসপোর্ট

রাম চ্যাটার্জি (মার্কসবাদী ফঃ বঃ) : অসামরিক প্রতিরক্ষা

তামাঙ দাওয়া লামা [সি পি আই (এম)] : পার্বত্য বিষয়ক উন্নয়ন ও পরিকল্পনা

দ্বিতীয় বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ১৯৮২

জ্যোতি বসু [সি পি আই (এম)] : মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র, অর্থ, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা (১৯৮৩-র জুন থেকে অর্থ দপ্তরের মন্ত্রী হন ডঃ অশোক মিত্র)

কৃষ্ণপদ ঘোষ [সি পি আই (এম)] : শ্রম

বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী [সি পি আই (এম)] : ভূমি এবং ভূমি সংস্কার, পঞ্চায়েত সামাজিক এবং গ্রামীণ উন্নয়ন

যতীন চক্রবর্তী (আর এস পি) : পূর্ত এবং আবাসন

ডঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য (ফরওয়ার্ড ব্লক) : শিল্প ও বাণিজ্য, শিল্প পুনর্গঠন এবং অধিগৃহীত সংস্থা

কানাই ভৌমিক (সি পি আই) : ক্ষুদ্র সেচ, কম্যান্ড এলাকা উন্নয়ন ও কৃষিভিত্তিক শিল্প

ননী ভট্টাচার্য (আর এস পি) : সেচ ও জলপথ

দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় (আর এস পি) : ত্রাণ, সমাজকল্যাণ ও কারা

রাধিকারঞ্জন ব্যানার্জি [সি পি আই (এম)] : খাদ্য, সরবরাহ, ত্রাণ

কান্তি বিশ্বাস [সি পি আই (এম)] : প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা

নির্মল বসু (ফঃ বঃ) : সমবায়

শম্ভুচরণ ঘোষ (ফঃ বঃ) : শিক্ষা

কমল গুহ (ফঃ বঃ) : কৃষি, গ্রামীণ জল সরবরাহ ও জলনিকাশি

অমৃতেন্দু মুখার্জি [সি পি আই (এম)] : প্রাণীসম্পদ বিকাশ, পশু চিকিৎসা, উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন

ভবানী মুখার্জি [সি পি আই (এম)] : পরিবেশ

রবীন মুখার্জি [সি পি আই (এম)] : পরিবহন

পরিমল মিত্র [সি পি আই (এম)] : বন ও পর্যটন

প্রভাসচন্দ্র রায় [সি পি আই (এম)] : সুন্দরবন এলাকা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা

প্রশান্তকুমার শূর [সি পি আই (এম)] : স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, নগরোন্নয়ন পৌরোন্নয়ন, নগর জল সরবরাহ ও জলনিকাশি

সৈয়দ আবুল মনসুর হবিবুল্লা [সি পি আই (এম)] : আইন ও বিচার

ডঃ অশোক মিত্র [সি পি আই (এম)] : অর্থ, উন্নয়ন এবং পরিকল্পনা

নীহার বসু (ফঃ বঃ) : সমবায় (কানাই ভট্টাচার্যের মৃত্যুর পর)

রাষ্ট্রমন্ত্রী

মহম্মদ আব্দুল বারি [সি পি আই (এম)] : প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা

ছায়া বেরা [সি পি আই (এম)] : সামাজিক শিক্ষা, অপ্রচলিত শিক্ষা, গ্রন্থাগার

সুভাষ চক্রবর্তী [সি পি আই (এম)] : যুবকল্যাণ, ক্রীড়া

নিরুপমা চ্যাটার্জি [সি পি আই (এম)] : ত্রাণ

রাম চ্যাটার্জি (মার্কসবাদী ফঃ বঃ) : অসামরিক প্রতিরক্ষা

শিবেন্দুনারায়ণ চৌধুরী [সি পি আই (এম)] : পরিবহন

শান্তিরঞ্জন ঘটক [সি পি আই (এম)] : শ্রম

রামনারায়ণ গোস্বামী [সি পি আই (এম)] : জনস্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মসূচী

শঙ্কর গুপ্ত [সি পি আই (এম)] : বিদ্যুৎ

তামাঙ দাওয়া লামা [সি পি আই (এম)] : পার্বত্য বিষয়ক

সুনীলকুমার মজুমদার : ভূমি ও ভূমিসংস্কার
[সি পি আই (এম)]
আব্দুল রেজ্জাক মোল্লা : সুন্দরবন উন্নয়ন
[সি পি আই (এম)]
ডঃ অম্বরিশ মুখার্জি : চিকিৎসা শিক্ষা
[সি পি আই (এম)] স্বাস্থ্য এবং সরবরাহ
বিমলানন্দ মুখার্জি : আবগারি
(আর সি পি আই)
কিরণময় নন্দ : মৎস্য
(পঃ বঃ সোস্যালিস্ট পার্টি)
প্রভাসচন্দ্র ফাদিকার : তথ্য ও সংস্কৃতি
[সি পি আই (এম)]
পতিতপাবন পাঠক : পরিষদীয়
[সি পি আই (এম)]
অচিন্ত্যকৃষ্ণ রায় : খাদ্য ও সরবরাহ
[সি পি আই (এম)]
বনমালি রায় : তফশিলি জাতি ও
[সি পি আই (এম)] উপজাতি কল্যাণ
শৈলেন সরকার : স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও
[সি পি আই (এম)] নগরোন্নয়ন
প্রবীর সেনগুপ্ত : বিদ্যুৎ (শঙ্কর গুপ্তের
[সি পি আই (এম)] মৃত্যুর পর)
প্রলয় তালুকদার : ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প
[সি পি আই (এম)]

তৃতীয় বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ১৯৮৭

জ্যোতি বসু : মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র, পার্বত্য
[সি পি আই (এম)] উন্নয়ন ও পরিকল্পনা,
অধিগৃহীত সংস্থা, শিল্প
ও বাণিজ্য, আবাসন শিল্প
পুনর্গঠন, উচ্চশিক্ষা
বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী : ভূমি ও ভূমিসংস্কার,
[সি পি আই (এম)] পঞ্চায়েত, সামাজিক
ও গ্রামীণ উন্নয়ন
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : তথ্য ও সংস্কৃতি, পৌর,
[সি পি আই (এম)] নগর ও পৌরোন্নয়ন
অসীমকুমার দাশগুপ্ত : অর্থ, আবগারি, উন্নয়ন
[সি পি আই (এম)] ও পরিকল্পনা
প্রশান্তকুমার শূর : স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ,
[সি পি আই (এম)] উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন

প্রবীর সেনগুপ্ত বিদ্যুৎ, নগর ও গ্রামীণ
[সি পি আই (এম)] জল সরবরাহ,
পয়ঃপ্রণালী
কানাই ভৌমিক : ক্ষুদ্র সেচ, কমান্ড
(সি পি আই) এলাকা উন্নয়ন,
কৃষিভিত্তিক শিল্প
কিরণময় নন্দ : মৎস্য
(পঃ বঃ এস পি)
যতীন চক্রবর্তী : পূর্ত
(আর এস পি)
দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় : সেচ ও জলপথ
(আর এস পি)
বিশ্বনাথ চৌধুরী : ত্রাণ, সমাজকল্যাণ ও
(সি পি আই) কারা
নির্মলকুমার বসু : খাদ্য ও সরবরাহ
(ফঃ বঃ)
কমলকান্তি গুহ কৃষি
(ফঃ বঃ)
ভক্তিভূষণ মণ্ডল : সমবায়
কান্তি বিশ্বাস : প্রাথমিক ও মাধ্যমিক
[সি পি আই (এম)] শিক্ষা
সুভাষ চক্রবর্তী : ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ,
[সি পি আই (এম)] পর্যটন
শ্যামল চক্রবর্তী : পরিবহন
[সি পি আই (এম)]
আব্দুল কায়ুম মোল্লা : আইন ও বিচার
[সি পি আই (এম)]
দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া : তফশিলি জাতি,
[সি পি আই (এম)] উপজাতি উন্নয়ন
আব্দুল বারি : বৃত্তিমূলক ও বয়স্ক
[সি পি আই (এম)] শিক্ষা মাদ্রাসা, হোম,
সংখ্যালঘু ও হজ
অচিন্ত্যকৃষ্ণ রায় : ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প
[সি পি আই (এম)] নগর জল সরবরাহ ও
জলনিকাশি
শান্তিরঞ্জন ঘটক : শ্রম
[সি পি আই (এম)]
অম্বরিশ মুখোপাধ্যায় : পরিবেশ ও বন
[সি পি আই (এম)]

রাষ্ট্রমন্ত্রী

সৈয়দ ওয়াহেদ রেজা : অসামরিক প্রতিরক্ষা
(সি পি আই)
তামাং দাওয়া লামা : পার্বত্য উন্নয়ন
[সি পি আই (এম)]
প্রভাস ফদিকার : প্রাণীসম্পদ বিকাশ ও
[সি পি আই (এম)] পশু চিকিৎসা
মহেশ্বর মুর্মু : তফশিলি জাতি,
[সি পি আই (এম)] উপজাতি উন্নয়ন
ছায়া বেরা : ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ
[সি পি আই (এম)]
বনমালী রায় : পরিবেশ
[সি পি আই (এম)]
আব্দুল রেজ্জাক মোল্লা : সুন্দরবন উন্নয়ন ও
[সি পি আই (এম)] পরিকল্পনা
রমনীকান্ত দেবশর্মা : ভূমি ও ভূমিসংস্কার,
[সি পি আই (এম)] পঞ্চায়েত, সামাজিক
উন্নয়ন গ্রামীণ উন্নয়ন
সরল দেব (ফঃ বঃ) : গ্রন্থাগার, বইমেলা

চতুর্থ বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ১৯৯১

জ্যোতি বসু : মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র, শিল্প
[সি পি আই (এম)] ও বাণিজ্য, পার্বত্য
বিষয়ক, অসামরিক
প্রতিরক্ষা এবং দমকল
বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী : ভূমি ও ভূমিসংস্কার,
[সি পি আই (এম)] পরিকল্পনা ও উন্নয়ন
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : পৌর ও নগর উন্নয়ন,
[সি পি আই (এম)] তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর
শ্যামল চক্রবর্তী : পরিবহন
[সি পি আই (এম)]
অসীমকুমার দাশগুপ্ত : অর্থ
[সি পি আই (এম)]
প্রশান্তকুমার শূর : স্বাস্থ্য, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন
[সি পি আই (এম)]
শান্তিরঞ্জন ঘটক : শ্রম
[সি পি আই (এম)]
সুভাষ চক্রবর্তী : ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ,
[সি পি আই (এম)] পর্যটন
প্রবীর সেনগুপ্ত : ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প
[সি পি আই (এম)]
মেহবুব জাহেদি : প্রাণীসম্পদ বিকাশ,
[সি পি আই (এম)] সংখ্যালঘু বিষয়ক ও
ওয়াকফ
সূর্যকান্ত মিশ্র : পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন
[সি পি আই (এম)]
গৌতম দেব : আবাসন, জনস্বাস্থ্য,
[সি পি আই (এম)] কারিগরি
শঙ্কর সেন : বিদ্যুৎ ও অপ্রচলিত
[সি পি আই (এম)] শক্তি, বিজ্ঞান ও
কারিগরি
অচিন্ত্য রায় : প্রাথমিক ও মাধ্যমিক
[সি পি আই (এম)] শিক্ষা
সত্যসাধন চক্রবর্তী : উচ্চশিক্ষা
[সি পি আই (এম)]
অম্বরিশ মুখার্জি : বন ও পরিবেশ
[সি পি আই (এম)]
পতিতপাবন পাঠক : অধিগৃহীত সংস্থা ও
[সি পি আই (এম)] শিল্প পুনর্গঠন
দীনেশ ডাকুয়া : তফশিলি জাতি ও
[সি পি আই (এম)] উপজাতি কল্যাণ
আব্দুল কায়ুম মোল্লা : আইন
[সি পি আই (এম)]
নীহার বসু (ফঃ বঃ) : কৃষি
কলিমুদ্দিন শামস : কৃষি বিপণন
(ফঃ বঃ)
সরল দেব (ফঃ বঃ) : সমবায়
ছায়া ঘোষ (ফঃ বঃ) : ত্রাণ
নীরেন দে (ফঃ বঃ) : খাদ্য ও সরবরাহ
দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় : সেচ
(আর এস পি)
মতীশ রায় : পূর্ত
(আর এস পি)
বিশ্বনাথ চৌধুরী : কারা, সমাজকল্যাণ
(সি পি আই)
ওমর আলি : ক্ষুদ্র সেচ
(সি পি আই)
কিরণময় নন্দ : মৎস্য
(এস পি)

প্রবোধচন্দ্র সিনহা : পরিষদীয়
(ডি এস পি)

আব্দুল রেজ্জাক মোল্লা : সুন্দরবন উন্নয়ন
[সি পি আই (এম)] জলসংরক্ষণ

রাষ্ট্রমন্ত্রী

বনমালী রায় : বন ও পরিবেশ
[সি পি আই (এম)]

ছায়া বেরা : পরিবার কল্যাণ
[সি পি আই (এম)]

মহেশ্বর মুর্মু : ঝাড়গ্রাম উন্নয়ন
[সি পি আই (এম)]

বিদ্যুৎ গাঙ্গুলি : শিল্প ও বাণিজ্য
[সি পি আই (এম)]

অশোক ভট্টাচার্য : পৌর ও নগর উন্নয়ন
[সি পি আই (এম)]

সুবোধ চৌধুরী : প্রাণীসম্পদ বিকাশ ও
[সি পি আই (এম)] বন উন্নয়ন

আনিসুর রহমান : প্রাথমিক ও মাধ্যমিক
[সি পি আই (এম)] শিক্ষা, মাদ্রাসা এবং
সংখ্যালঘু বিষয়ক

বংশগোপাল চৌধুরী : বৃত্তিমূলক শিক্ষা
[সি পি আই (এম)]

খগেন্দ্রনাথ সিনহা : আবাসন, জনস্বাস্থ্য,
[সি পি আই (এম)] কারিগরি

তপন রায় : গ্রন্থাগার
[সি পি আই (এম)]

উপেন কিস্কু : তফশিলি জাতি ও
[সি পি আই (এম)] উপজাতি কল্যাণ

অঞ্জু কর : বয়স্ক শিক্ষা
[সি পি আই (এম)]

গণেশ মণ্ডল : সেচ
(আর এস পি)

পঞ্চম বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ১৯৯৬

জ্যোতি বসু : মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র,
[সি পি আই (এম)] পার্বত্য উন্নয়ন বিষয়ক

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : স্বরাষ্ট্র (পুলিশ), তথ্য
[সি পি আই (এম)] ও সংস্কৃতি দপ্তর

সূর্যকান্ত মিশ্র : ভূমি ও ভূমি সদ্ব্যবহার
[সি পি আই (এম)] গ্রামীণ উন্নয়ন ও
পঞ্চায়েত

অসীমকুমার দাশগুপ্ত : অর্থ, উন্নয়ন,
[সি পি আই (এম)] পরিকল্পনা ও আবগারি

শঙ্কর সেন : বিদ্যুৎ, বিজ্ঞান ও
[সি পি আই (এম)] প্রযুক্তি

শান্তিরঞ্জন ঘটক : শ্রম
[সি পি আই (এম)]

সুভাষ চক্রবর্তী : পরিবহন, ক্রীড়া
[সি পি আই (এম)]

মহম্মদ আমিন : সংখ্যালঘু বিষয়ক,
[সি পি আই (এম)] ওয়াকফ উর্দু আকাদেমি
ও হজ

কান্তি বিশ্বাস : বিদ্যালয় শিক্ষা,
[সি পি আই (এম)] মাদ্রাসা, উদ্বাস্তু, ত্রাণ ও
পুনর্বাসন

গৌতম দেব : আবাসন, জনস্বাস্থ্য,
[সি পি আই (এম)] কারিগরি

পার্থ দে : স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ
[সি পি আই (এম)]

বিদ্যুৎ গাঙ্গুলি : শিল্প ও বাণিজ্য

সত্যসাধন চক্রবর্তী : উচ্চশিক্ষা
[সি পি আই (এম)]

আব্দুল রেজ্জাক মোল্লা : খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ,
[সি পি আই (এম)] হর্টিকালচার, সুন্দরবন
বিষয়ক

দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া : তফশিলি জাতি ও
[সি পি আই (এম)] উপজাতি ও অনুন্নত
সম্প্রদায় কল্যাণ

ছায়া বেরা : স্বনিযুক্তি প্রকল্প (নগর),
[সি পি আই (এম)] কর্মবিনিয়োগ, ই এস আই

অশোক ভট্টাচার্য : পৌর, নগর উন্নয়ন,
[সি পি আই (এম)] এইচ আর বি সি, শহর
ও নগর পরিকল্পনা

মানবেন্দ্র মুখার্জি : যুবকল্যাণ, পরিবেশ,
[সি পি আই (এম)] পর্যটন

ভক্তিভূষণ মণ্ডল : সমবায়
(ফঃ বঃ)

নরেন দে (ফঃ বঃ) : কৃষি

দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় : সেচ
(আর এস পি)
ক্ষিতি গোস্বামী : পূর্ত
(আর এস পি)
নন্দগোপাল ভট্টাচার্য : জলসম্পদ উন্নয়ন, কৃষিভিত্তিক শিল্প
(সি পি আই)
কিরণময় নন্দ : মৎস্য
(এস পি)
প্রবোধচন্দ্র সিনহা : পরিষদীয়
(ডি এস পি)
মৃণাল ব্যানার্জি : শিল্প পুনর্গঠন, অধিগৃহীত সংস্থা
[সি পি আই (এম)]
প্রলয় তালুকদার : ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প
[সি পি আই (এম)]
বংশগোপাল চৌধুরী : কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ
[সি পি আই (এম)]
আনিসুর রহমান : প্রাণীসম্পদ বিকাশ
[সি পি আই (এম)]
নিশীথ অধিকারী : আইন
[সি পি আই (এম)]
যোগেশচন্দ্র বর্মন : বন
[সি পি আই (এম)]
বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র : কৃষি বিপণন
(ফঃ বঃ)
কলিমুদ্দিন শামস : কৃষি বিপণন
(ফঃ বঃ)
সত্যরঞ্জন মাহাতো : ত্রাণ
(ফঃ বঃ)
বিশ্বনাথ চৌধুরী : কারা, সমাজকল্যাণ
(সি পি আই)

রাষ্ট্রমন্ত্রী

উপেন কিসকু : তফসিলি জাতি, উপজাতি ও অনুন্নত সম্প্রদায় কল্যাণ
(ফঃ বঃ)
অঞ্জু কর : জনশিক্ষা প্রসার
[সি পি আই (এম)]
মহেশ্বর মুর্মু : বিশেষ উপজাতি অঞ্চল ও ঝাড়গ্রাম বিষয়ক
(ফঃ বঃ)
নিমাই মাল : গ্রন্থাগার
[সি পি আই (এম)]
শ্রীকুমার মুখার্জি : অসামরিক প্রতিরক্ষা
(সি পি আই)
কমলেন্দু সান্যাল : ভূমি ও ভূমিসদ্ব্যবহার, গ্রামীণ উন্নয়ন, পঞ্চায়েত
[সি পি আই (এম)]
সুশান্ত ঘোষ : পরিবহন
[সি পি আই (এম)]
মিনতি ঘোষ : স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা
[সি পি আই (এম)]
গণেশ মণ্ডল : সেচ
(আর এস পি)
মনোহর তিরকে : পূর্ত
(আর এস পি)
বীরেন সেন : আবগারি
[সি পি আই (এম)]
প্রতীম চ্যাটার্জি : দমকল
(মার্কসবাদী ফঃ বঃ)
বিলাসীবালা সহিস : বন
[সি পি আই (এম)]

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভোটচিত্র ১৯৫২-১৯৯৬

সাল	আসন	মোট ভোটার	ভোট পড়েছে	শতকরা হার
১৯৫২	২৩৮	১২৪৮৯২৭০	৭৪৪২২৫	৫৯ ৬
১৯৫৭	২৫২	১৫২১৬৫৩২	১০৪৬৯৮০৩	৬৮.৮০
১৯৬২	২৫২	১৮০০৫৬৩৫	১০০০২৭৮৬	৫৫ ৫৫
১৯৬৭	২৮০	২০২৪০০৯৮	১৩৩৭৮৪২৮	৬৬.১
১৯৬৯	২৮০	২০৬৮৫৩১০	১৩৭৫৮০৭২	৬৬.৫
১৯৭১	২৮০	২২০৩৪৮৩৮	১৩৬৪১৫৩৫	৬১ ৯
১৯৭২	২৮০	২২৫৫৪২৭৬	১৩৭১৮৫৩৫	৬০.৮
১৯৭৭	২৯৪	২৬০৩২৯৭৪	১৪৫৯১৫৪৬	৫৬.১
১৯৮২	২৯৪	২৯৮৯৭৬১৯	২২৯৮৪৬৮৫	৭৯.৯
১৯৮৭	২৯৪	৩৫৩৪৪০৪৯	২৬৭৪২৫৬৩	৭৫ ৬৬
১৯৯১	২৯৪	৪১৪২৬৯৫৮	৩১৭৫৯৭৯৩	৭৬ ৬৬
১৯৯৬	২৯৪	৪৫৬৩৫৯৯১	৩৭৮১৬৫৫৫	৮২.৮৯

বিধানসভা নির্বাচন (১৯৫২—১৯৯৬)

দলগত অবস্থা

দল	১৯৫২	১৯৫৭	১৯৬২	১৯৬৭	১৯৬৯	১৯৭১	১৯৭২	১৯৭৭	১৯৮২	১৯৮৭	১৯৯১	১৯৯৬
কংগ্রেস (যুক্ত)	১৪৯	১৫২	১৫৭	১২৭	৫৫	১০৫	২১৬	২০	—	—	—	—
কংগ্রেস (আই)	—	—	—	—	—	—	—	—	৪৯	৪০	৪৩	৮২
সি পি আই (এম)	—	—	—	৪৩	৮০	১১৩	১৪	১৭৭	১৭৪	১৮৭	১৮২	১৫০
সি পি আই	—	—	—	১৬	৩০	১৩	৩৫	২	৭	১১	৬	৬
কমিউনিস্ট পার্টি (যুক্ত)	২৮	৪৬	৫০	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ফরওয়ার্ড ব্লক (মার্কসবাদী)	২	২	১	১	১	২	—	৩	২	২	২	২
জনতা	—	—	—	—	—	—	—	২৯	—	—	১	—
গোর্খা লিগ	—	২	২	২	৪	২	২	২	১	—	—	—
মুসলিম লিগ	—	—	—	—	৩	৭	১	—	১	—	—	—
এস ইউ সি	১	২	—	৪	৭	৭৮	১	৪	২	২	২	২
অন্যান্য	৪৭	৪১	২৩	৭১	৭২	২৯	৮	৪৫	১৫	৯	১৪	১৫
মোট	২৩৮	২৫২	২৫২	২৮০	২৮০	২৮০	২৮০	২৯৪	২৯৪	২৯৪	২৯৪	২৯৪

ঘ ট না ব লী

১৫ আগস্ট ১৯৪৭—১৫ আগস্ট ১৯৯৭

ভারতের স্বাধীনতার ৫০ বছরই কেবল নয়, আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর নানান জটিলতা সংক্ষুব্ধ বিশ শতকের এই দ্বিতীয় পর্ব। বিদেশী শাসনমুক্তি, মহাকাশে জয়যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় মানুষের জীবনে ডেকে এনেছে দুর্যোগ। বিশেষ করে, ভারতীয় রাজনীতির অবক্ষয়ের ছবিটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে এই ঘটনাপঞ্জীতে চোখ বোলাতে গিয়ে।

· *চিহ্নিত ঘটনার সঠিক তারিখ সম্পর্কে সংশয় থাকায় উল্লেখ করা হল না। কিন্তু ঘটনাবলীর উল্লেখ অনিবার্য।*

১৯৪৭

আগস্ট : ১৪ — পাকিস্তান সৃষ্টির একদিন পরে ১৪ আগস্টের মধ্যরাতে স্বাধীন ভারতের জন্ম। স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেন এবং পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মহম্মদ আলি জিন্না। স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর শপথ নেন জওহরলাল নেহরু। বিভক্ত ভূখণ্ডের দুপারে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু। ১৫ — পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের শপথ গ্রহণ। ১৭ — প্রথম ব্রিটিশ সেনা দলের ভারত ত্যাগ। ২৯ — বি আর আম্বেদকরের সভাপতিত্বে খসড়া সংবিধান রচনা কমিটি গঠিত।

সেপ্টেম্বর : ১ — ভারতীয় স্ট্যান্ডার্ড টাইম প্রবর্তন। ২০ — পাকিস্তানের কাশ্মীর আক্রমণ।

অক্টোবর : ২৭ — কাশ্মীরের রাজা হরি সিং এবং ভারত সরকারের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত এবং কাশ্মীরে ভারতীয় সেনা প্রেরণ।

নভেম্বর : ২১ — পাতিয়ালা মহারাজের উপদেষ্টা কাপুর সিং স্বতন্ত্র শিখ রাজ্য খালিস্তানের দাবি তোলেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার জাতীয়করণ।

চীন মুক্ত। চিয়াং কাইশেকের ফরমোজা দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ।

১৯৪৮

জানুয়ারি : ১ — কাশ্মীরে পাকিস্তানি উপজাতি হামলার বিরুদ্ধে ভারত নিরাপত্তা পরিষদে অভিযোগ পেশ করে। ১৩ — হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্য গান্ধীজির শেষ অনশন শুরু। ১৪ — বার্মার স্বাধীনতা লাভ। ১৫ — পাকিস্তান কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে নিরাপত্তা পরিষদে আবেদন জানায়। ২০ — নিরাপত্তা পরিষদ কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের জন্য তিন সদস্যের কমিটি গঠন করে। ৩০ — গান্ধীজি গুলিতে নিহত।

ফেব্রুয়ারি : ৪ — রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘকে ভারত সরকার নিষিদ্ধ করে। ৬ — সিংহলের স্বাধীনতা লাভ। ২১ — রাষ্ট্রপতিকে খসড়া সংবিধান অর্পণ।

মার্চ : ২৬ — পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি ঘোষিত।

এপ্রিল : ১৩ — ওড়িশার নতুন রাজধানী ভুবনেশ্বরের ভিত্তি স্থাপন।

মে : ১৪ — প্যালেস্টাইনে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা।

জুন : ২০ — মাউন্টব্যাটেনের ভারত ত্যাগ। ২১ — প্রথম ও সর্বশেষ গর্ভনর জেনারেল হিসাবে চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীর শপথ গ্রহণ। ২২ — ইংলন্ডের রাজার ভারত সম্রাট খেতাব ত্যাগ।

জুলাই : ৭ — প্রথম সরকারি শক্তি কেন্দ্র দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন গঠিত। ১১ — রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার। ১৭ — সরকারি কাজে নারী-পুরুষ বৈষম্য রদ।

সেপ্টেম্বর : ১১ — পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মহম্মদ আলি জিন্নার মৃত্যু। ১৮ — হায়দরাবাদে ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে নিজাম বাহিনীর আত্মসমর্পণ।

নভেম্বর : ৩ — রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় জওহরলাল নেহরুর প্রথম ভাষণ ২৫ — ন্যূনতম বেতন আইন পাশ। ২৪ — হিন্দুমহাসভার কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্যপদ ত্যাগ করেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি।

ডিসেম্বর : ১০ — সাধারণ সভায় মানবাধিকার স্বীকৃতির প্রস্তাব গৃহীত।

১৯৪৯

জানুয়ারি : ১ — জম্মু ও কাশ্মীরে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা। ১৫ — ভারতের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন লেঃ জেঃ কে. এম. কারিয়াপ্পা।

মার্চ : ২ — সরোজিনী নাইডুর দেহান্তর।

মে : ১৭ — ভারতীয় সাংবিধানিক পরিষদের অনুমোদনে ভারতের কমনওয়েলথ গোষ্ঠীভুক্ত থাকার সিদ্ধান্ত।

সেপ্টেম্বর : ৯ — ভারতের জাতীয় ভাষা হিন্দি — এই সিদ্ধান্ত গৃহীত। ১৫ — দ্রাবিড় কাজাগাম দলের হিন্দি প্রসঙ্গে মতপার্থক্য।

নভেম্বর : ১৫ — গান্ধী হত্যার জন্য নাথুরাম বিনায়ক গড়সে এবং নারায়ণ দত্তাত্রেয় আপ্তের ফাঁসি। ২৬ — ভারতীয় গণ পরিষদে সংবিধানে অনুমোদিত।

ডিসেম্বর : ৩০ — চীনের নতুন সরকার এবং ভারতের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত।

১৯৫০

জানুয়ারি : ৪ — ভারত ও আফগানিস্থানের মধ্যে বন্ধু ও মৈত্রী চুক্তি সাক্ষরিত। ১৯ — 'জনগণমন' ভারতের জাতীয় সঙ্গীত স্বীকৃত। — ভারত-পাকিস্তান রেলওয়ে যোগাযোগ স্থাপিত। ২৪ — ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত। ২৬ — ভারত সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ঘোষিত। — সংবিধান চালু হল। অশোকস্তম্ভের সিংহচক্র জাতীয় প্রতীক। ২৮ — ভারতে সুপ্রিম কোর্টের উদ্বোধন।

ফেব্রুয়ারি : ২৭ — কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে কমিউনিস্ট পার্টি বৈধ ঘোষিত।

এপ্রিল : ১৮ — আচার্য বিনোবা ভাবের ভূদান আন্দোলন আরম্ভ।

মে : ২ — ফরাসি চন্দননগর ভারত সরকারের অধিগ্রহণ।

জুলাই : ১ — কমিউনিস্ট চীনকে ভারতের স্বীকৃতি।

অক্টোবর : ৭ — মাদার টেরিজার মিশনারিজ অফ চ্যারিটি প্রতিষ্ঠা।

ডিসেম্বর : ৫ — শ্রীঅরবিন্দের দেহান্তর। ১৫ — সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের দেহান্তর। — প্রথম প্লানিং কমিশন গঠিত।

১৯৫১

ফেব্রুয়ারি : ৯ — স্বাধীন ভারতে প্রথম জনগণনা শুরু। ২৫ — ভারত-পাকিস্তান বাণিজ্য চুক্তি সাক্ষরিত।

মার্চ : ৪ — নতুন দিল্লিতে প্রথম এশীয় গেমস অনুষ্ঠিত। — ১১টি দেশের ৪৮৯ প্রতিযোগীর যোগদান।

জুন : ৯ — প্ল্যানিং কমিশন প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া প্রকাশ করে। ২৬ — দিল্লি-মস্কো সরাসরি টেলিফোন যোগাযোগ স্থাপিত।

আগস্ট : ১৮ — ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির উদ্বোধন। ২৫ — স্বাধীন ভারতে প্রথম সাধারণ নির্বাচন শুরু। — সংবিধানের প্রথম সংশোধন।

সেপ্টেম্বর : ৯ — আইনমন্ত্রী আম্বেদকরের পদত্যাগ।

ডিসেম্বর : ৫ — অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেহান্তর।

১৯৫২

জানুয়ারি : ২৫ — বোম্বাইয়ে প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব শুরু। — ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ পুনরায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত।

ফেব্রুয়ারি : ২ — মাদ্রাজের চিপক স্টেডিয়ামে প্রথম টেস্টে ভারতের কাছে হেরে যায় সফরকারী এম সি সি। ২৩ — এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং মিসলেনিয়াস প্রভিশনস অ্যাক্ট পাস।

এপ্রিল : ২৪ — ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ ভারতের উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

আগস্ট : ৫ — ভারত-পাক বাণিজ্য চুক্তি সাক্ষরিত।

অক্টোবর : ১৯ — তেলুগুদের জন্য স্বতন্ত্র অন্ধ্র রাজ্যের দাবিতে শ্রীরামুলু পোট্টির আমরণ অনশন শুরু এবং ১৯ ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু।

ডিসেম্বর : ২১ — প্রথম ভারতীয় সৈফুদ্দিন কিচলুর সোভিয়েত ইউনিয়নের লেনিন পুরস্কার লাভ।

১৯৫৩

জানুয়ারি : ২৯ — সঙ্গীত নাটক আকাদেমি প্রতিষ্ঠা।
মে : ২৯ — তেনজিং নোরগে এবং এডমন্ড হিলারীর এভারেস্ট বিজয়।
জুন : ২৩ — শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আকস্মিক মৃত্যু।
আগস্ট : ১ — পার্লামেন্টে গৃহীত আইনবলে ভারতের সমস্ত বিমান পরিবহন সংস্থার জাতীয়করণ। — দুটি স্বতন্ত্র সংস্থা এয়ার ইন্ডিয়া এবং ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স গঠিত।
অক্টোবর : ১ — স্বতন্ত্র অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য গঠিত — রাজধানী হায়দরাবাদ। ৭ — পাঞ্জাবের রাজধানী চণ্ডীগড়ের উদ্বোধন।
ডিসেম্বর : ২ — ভারত-রাশিয়া বাণিজ্য চুক্তি সাক্ষরিত।

১৯৫৪

জানুয়ারি : ২৫ — এম. এন. রায়ের দেহান্তর।
ফেব্রুয়ারি : ৩ — কুম্ভমেলায় পায়ে চাপা পড়ে ৫০০-র বেশি লোকের মৃত্যু হয়।
মার্চ : ১২ — সাহিত্য আকাদেমির উদ্বোধন।
এপ্রিল : ২৯ — তিব্বত চীনের অঙ্গ -- ভারত সরকারের স্বীকৃতি -- ভারত-চীন পঞ্চশীল চুক্তি।
মে : ৮ — ভারত সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে চন্দননগর পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হবে।
জুন : ২৫ — চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ. এন. লাই-এর দিল্লি আগমণ। ২৮ — চীন-ভারত উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রীদের মধ্যে চুক্তি সাক্ষরিত।
অক্টোবর : ১৯ — বেজিং-এ চেয়ারম্যান মাও সেতুঙ্ এবং প্রধানমন্ত্রী নেহরুর সাক্ষাৎ
নভেম্বর : ১ — ফরাসি অধিকৃত পণ্ডিচেরী, মাহে, কারিকল এবং ইয়ানন ভারতের হাতে হস্তান্তর।
* — ভিয়েতনামে যুদ্ধ শুরু।

১৯৫৫

মার্চ : ১৭ — ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড ইনস্টিটিউশন (সার্টিফিকেশন মার্কস) রেগুলেশন অ্যাক্ট ১৯৫৫ চালু।
জুন : ১ — আনটাচ এবিলিটি (অফেন্স) আইন কার্যকরী -- তামিলনাড়ুর আবাদি কংগ্রেসে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ গঠনের সিদ্ধান্ত।
জুলাই : ১ — ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার জাতীয়করণ — নতুন নাম হয় স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। ১৫ — জওহরলাল নেহরুর ভারতরত্ন সম্মান লাভ।
নভেম্বর : ১৮ — প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী নিকোলাই বুলগানিন এবং সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারি নিকিতা ক্রুশ্চভের ভারত সফর শুরু।
* — বান্দুং সম্মেলন।

১৯৫৬

জুন : ১৮ — হিন্দু উত্তরাধিকার আইন গৃহীত। মহিলাদের সম্পত্তিতে অধিকার স্বীকৃত।
আগস্ট : ৪ — প্রথম পরমাণু গবেষণা রিঅ্যাক্টর চালু। ৩১ — রাজ্য পুনর্গঠন বিলে রাষ্ট্রপতির সম্মতি। অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য পুনর্গঠিত।
সেপ্টেম্বর : ১ — জীবনবীমা রাষ্ট্রীয়করণ। জীবনবীমা নিগম গঠিত। ১৭ -- ও এন জি সি প্রতিষ্ঠিত।
অক্টোবর : ১৪ — ২ লক্ষ শিডিউলড কাস্ট নবনারী সহ ডঃ বি. আর আম্বেদকরের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ।
নভেম্বর : ১ — মধ্যপ্রদেশ গঠিত। ২৯ — চিনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই বার দিনের ভারত সফরে আসেন।

ডিসেম্বর : ৬ — ডঃ বি আর আম্বেদকরের লোকান্তর।
* — ব্রিটেন ও ফ্রান্স কর্তৃক সুয়েজ আক্রমণ।
* — প্রেসিডেন্ট নাসের সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করেন।

১৯৫৭

জানুয়ারি : ২২ — ভারত-পাক বাণিজ্য চুক্তি।
ফেব্রুয়ারি : ২৪ — ভারতে দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন।
মার্চ : ২২ — জাতীয় পঞ্জিকা গৃহীত।
এপ্রিল : ১ — ডাকটিকিট এবং পোস্টেজ স্টেশনারি দ্রব্য বিক্রয়ে দশমিক ব্যবস্থার প্রবর্তন। ৫ — কেরালায় প্রথম কমিউনিস্ট সরকার গঠিত।
মে : ১০ — দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন রাজেন্দ্রপ্রসাদ। ১৩ — রাধাকৃষ্ণণ দ্বিতীয়বার উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত।
আগস্ট : ১৬ — প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের শতবর্ষ পালিত।
অক্টোবর : ৪ — মহাকাশে রাশিয়ার প্রথম উপগ্রহ প্রেরণ।
নভেম্বর : ১৪ — নেহরুর জন্মদিন শিশুদিবস হিসাবে ঘোষিত। * — দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন।
ডিসেম্বর : ২০ — সানফ্রান্সিসকো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ‘পথের পাঁচালী’ পুরস্কৃত।

১৯৫৮

জানুয়ারি : ২১ — কপিরাইট আইন চালু।
ফেব্রুয়ারি : ৫ — ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতি হো চিন-মিনের দিল্লি পদার্পণ। ২২ — মৌলানা আবুল কালাম আজাদের লোকান্তর।
এপ্রিল : ২২ — অ্যাডমিরাল আর ডি কোঠারি নৌবাহিনীর প্রথম ভারতীয় প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত।
অক্টোবর : ১ — ওজন ও পরিমাপে মেট্রিক পদ্ধতি প্রবর্তিত।
ডিসেম্বর : ১ — আন্তর্জাতিক বিলিয়ার্ড প্রতিযোগিতায় উইলিয়াম জোনস প্রথম ভারতীয় বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন।

১৯৫৯

ফেব্রুয়ারি : * — অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেড গঠিত।
মার্চ : ১৭ — ভারতে দলাই লামাকে উপস্থিত। ৩১ — ভারতে দলাই লামার আশ্রয় দিতে ভারত সরকার স্বীকৃত।
জুলাই : ৩১ — কেরালার প্রথম কমিউনিস্ট সরকার বরখাস্ত।
আগস্ট : ৩১ — পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে ৮০ জন শহিদ।
সেপ্টেম্বর : ১৫ — নতুন দিল্লিতে প্রথম টেলিভিশন চালু — স্বতন্ত্র পার্টি গঠিত।

১৯৬০

ফেব্রুয়ারি : ১১ — সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভের দিল্লি আগমন।
এপ্রিল : ১১ — ভারত-চীন সীমান্ত বিরোধ মীমাংসার জন্য চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই-এর দিল্লি আগমন।
মে : ১ — বোম্বাই ভেঙে মহারাষ্ট্র ও গুজরাট গঠিত।

১৯৬১

মার্চ : ৪ — ভারতের প্রথম বিমানবাহী যুদ্ধজাহাজ আই এন এস বিক্রান্তের যাত্রা শুরু।

অক্টোবর : ২ — শিপিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া গঠিত।

ডিসেম্বর : ১৯ — পর্তুগীজ উপনিবেশ গোয়া দমন দিউ মুক্ত এবং ভারতভুক্তি।

১৯৬২

* — তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন। * — তৃতীয়বার কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করেন জওহরলাল নেহরু।

জুলাই : ১ — ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের দেহান্তর। ৯ — পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর শপথ নেন প্রফুল্লচন্দ্র সেন।

এপ্রিল : ১২ — রাশিয়া কর্তৃক মহাকাশে মানুষ প্রেরণ। ভোস্টক-১ মহাকাশযান। * — পৃথিবী পরিক্রমা শেষে প্রথম মহাকাশচারী য়ুরি গ্যাগারিনের প্রত্যাবর্তন।

সেপ্টেম্বর : ১৯ — উত্তর সীমান্তে ভারত-চীন সংঘর্ষ।

নভেম্বর : ২১ — চীনের একতরফা যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা।

১৯৬৩

জানুয়ারি : ৯ — স্বর্ণনিয়ন্ত্রণ আইন চালু। ৩১ — ময়ূর ভারতের জাতীয় পক্ষী স্বীকৃত।

ফেব্রুয়ারি : ২৮ — ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের দেহান্তর।

মার্চ : ১৩ — প্রথম অর্জুন পুরস্কার প্রবর্তন।

নভেম্বর : ২১ — ভারতের প্রথম পরীক্ষামূলক ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপন।

ডিসেম্বর : ১ — নাগাল্যান্ডের রাজ্য মর্যাদার স্বীকৃতি।

* — আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জন কেনেডি আততায়ীর গুলিতে নিহত।

১৯৬৪

মার্চ : ৩১ — বোম্বাই-এ বৈদ্যুতিক ট্রাম চালু।

এপ্রিল : ১১ — ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিধাবিভক্ত -- সি পি আই এবং সি পি আই [এম] দুটি স্বতন্ত্র পার্টির সৃষ্টি।

মার্চ : ২৭ — জওহরলাল নেহরুর দেহান্তর।

জুন : ৯ — লালবাহাদুর শাস্ত্রী ভারতের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত।

১৯৬৫

এপ্রিল : ৯ — কচ্ছের রানে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ শুরু।

মে : ২০ — প্রথম ভারতীয় দলের মাউন্ট এভারেস্ট আরোহণ।

জুন : ৩০ — ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ বিরতি।

সেপ্টেম্বর : ১ -- ছাম্বা ও দেওরা অঞ্চলে পাকবাহিনীর অনুপ্রবেশ। ২৩ — যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা।

১৯৬৬

জানুয়ারি : ৪ — তাসখন্দে লালবাহাদুর শাস্ত্রী ও আয়ুব খানের বৈঠকে পাক-ভারত শান্তি আলোচনা শুরু। ১১ — তাসখন্দে লালবাহাদুর শাস্ত্রীর দেহান্তর। ১৯ — ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেস সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচিত। ২৪ — ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ গ্রহণ। — এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান দুর্ঘটনায় পরমাণু বিজ্ঞানী হোমি ভাবাসহ ১১৬ জনের মৃত্যু।

মে : ৮ — কলকাতায় রবীন্দ্রসদন মঞ্চের উদ্বোধন।

জুন : ৬ — টাকার ৩৬.৫ শতাংশ মুদ্রামূল্য হ্রাস।

সেপ্টেম্বর : ১০ -- অখণ্ড পঞ্জাব ভেঙে পঞ্জাব ও হরিয়ানা রাজ্য গঠিত।

নভেম্বর : ১৭ — রীতা ফারিয়া বিশ্বসুন্দরী নির্বাচিত।

* — সোভিয়েত মহাকাশযান লুনা ৯-এর চন্দ্রাবতরণ।

১৯৬৭

ফেব্রুয়ারি ১৫ — চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন শুরু।

মার্চ : ১২ — ইন্দিরা গান্ধী দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত।

মে : ৬ — ডঃ জাকির হোসেন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত। উপরাষ্ট্রপতি ভি. ভি. গিরি। ২৩ — নকশালবাড়িতে কৃষক আন্দোলন শুরু।

জুন : ৫ — আরব-ইজরায়েল যুদ্ধ।

অক্টোবর : ১২ — জম্মু ও কাশ্মীর ন্যাশনাল কনফারেন্সের ওয়ার্কিং কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে জম্মু ও কাশ্মীরের ভারতভুক্তির প্রতি সমর্থন জানায়।

নভেম্বর : ১ — ভাষার ভিত্তিতে হরিয়ানা পঞ্জাব থেকে বিচ্ছিন্ন। ২১ — পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার বরখাস্ত।

১৯৬৮

ফেব্রুয়ারি : ২০ — পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি।

মে : ২ — পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড বিল পাশ।

আগস্ট : ২৩ — পঞ্জাবে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি।

অক্টোবর : ১৬ — মেডিসিন ও মাইকোলজিতে হরগোবিন্দ খোরানা যুগ্মভাবে নোবেল পুরস্কার জয়ী।

নভেম্বর : ২২ — লোকসভায় মাদ্রাজ রাজ্যের নতুন নাম তামিলনাড়ু অনুমোদন।

* — মার্টিন লুথার কিং নিহত।

* — রবার্ট কেনেডি নিহত।

১৯৬৯

জানুয়ারি : ১৪ — মাদ্রাজ রাজ্যের নতুন নাম তামিলনাড়ু।

এপ্রিল : ১ — তারাপুরায় প্রথম পরমাণু শক্তি কেন্দ্রের উদ্বোধন।

মে : ৩ — রাষ্ট্রপতি জাকির হোসেনের মৃত্যু -- অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি।

জুলাই : ১৯ — ১৪টি প্রধান বাণিজ্য ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ। ২১ — আর্মস্ট্রং ও অলড্রিনের চন্দ্রাবতরণ।

আগস্ট : ২৪ — ভারতের চতুর্থ রাষ্ট্রপতি হিসাবে ভি ভি গিরি শপথ গ্রহণ। — জি. এস. পাঠক উপরাষ্ট্রপতি – কংগ্রেস দলে ভাঙন -- জগজীবন রামকে সভাপতি করে ইন্দিরা গান্ধীর নতুন কংগ্রেস পার্টি গঠন।

অক্টোবর : ১-২৩ — বছর ভারত সফরে আসেন খান আবদুল গফর খান।

নভেম্বর : ১৯ — কনরাড ও বিনেব চন্দ্রাবতরণ।

১৯৭০

ফেব্রুয়ারি : ১৪ — ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ সুপ্রিম কোর্টে অবৈধ ঘোষিত -- ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের জন্য রাষ্ট্রপতির অর্ডিন্যান্স জারি।

অক্টোবর : ৯ -- ভাবা পরমাণু কেন্দ্রে ইউরেনিয়াম উৎপাদন।

নভেম্বর ১৭ -- লুনা-১৭ এবং লুনাখাদ-১-এর চন্দ্রাবতরণ। ২১ — অধ্যাপক সি. ভি. রমনের দেহান্তর।

ডিসেম্বর · ৭ পাকিস্তানে প্রথম সাধারণ নির্বাচন। — ব্যাঙ্ককে ৬ষ্ঠ এশিয়ান গেমস।

১৯৭১

জানুয়ারি : ২৫ -- হিমাচল প্রদেশ রাজ্য গঠিত। ৩০ -- ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের ফকার ফ্রেন্ডশিপ বিমানকে জোর করে লাহোরে নামানো হয়।

ফেব্রুয়ারি : ৮ — কে এম মুনসির জীবনাবসান। — লোকসভা নির্বাচনে ইন্দিরা কংগ্রেসের জয়লাভ -- প্রধানমন্ত্রীর শপথ নেন ইন্দিরা গান্ধী।

মার্চ : ২৬ — বাংলাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু।

এপ্রিল : ২০ — গাভাসকরের নেতৃত্বে ভারতীয় দলের ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে রাবার জয়।

মে : ১৩ — ভিজাগাপত্তনমে প্রথম সাবমেরিন ঘাঁটি চালু।

আগস্ট : ৯ — ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে ২০ বছরের শান্তি, মৈত্রী এবং সহযোগিতা চুক্তি।

ডিসেম্বর : ৩ — পশ্চিম পাকিস্তানের ভারত আক্রমণ। -- রাষ্ট্রপতির জরুরী অবস্থা ঘোষণা -- বাংলাদেশকে ভারতের স্বীকৃতি -- বাংলাদেশ মুক্তি বাহিনীর সহযোগিতায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর বাংলাদেশ অভিযান। ১৪ — ঢাকায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ। ১৭ — যুদ্ধের অবসান।

১৯৭২

জানুয়ারি : ১ — রাজন্যভাতা বিলোপ। ২০ — মেঘালয়কে রাজ্য স্বীকৃতি -- অরুণাচল প্রদেশ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ঘোষিত। ২১ — মণিপুর ও ত্রিপুরার রাজ্য স্বীকৃতি -- মিজোরাম কেন্দ্রশাসিত এলাকা ঘোষিত।

মার্চ : ১৯ — বাংলাদেশ-ভারত ২৫ বছরের মৈত্রী, শান্তি ও সহযোগিতা চুক্তি।

এপ্রিল : ১৫ — জয়প্রকাশ নারায়ণের কাছে মধ্যপ্রদেশ ডাকাতদলের আত্মসমর্পণ।

মে : ১ -- কয়লাখনি (রান্নার কয়লা) জাতীয়করণ। ২০ — দ্বিতীয় হাওড়া সেতুর শিলান্যাস করেন ইন্দিরা গান্ধী।

জুন : ২৮ — সিমলায় ভারত-পাক শীর্ষ সম্মেলন শুরু।

জুলাই : ২৭ — সি পি আই (এম-এল)-এর প্রতিষ্ঠাতা চারু মজুমদারের জীবনাবসান।

সেপ্টেম্বর : ১৮ — ভারত সরকার শ্রমিকদের ন্যূনতম বোনাস ৪ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৮.৩৩ শতাংশ ঘোষণা করেন।

ডিসেম্বর : ১৯ — ময়দানে পাতালরেল প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। ২৫ — সি. রাজাগোপালাচারীর জীবনাবসান।

১৯৭৩

জানুয়ারি : ১ — জীবনবীমা জাতীয়করণ। ২ — জেনারেল এস এইচ এফ জে মানেকশ ফিল্ড মার্শাল।

মে : ১ — কয়লাখনি (অ-জ্বালানি) জাতীয়করণ। ৩১ — দিল্লির কাছে বিমান দুর্ঘটনায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কুমারমঙ্গলম নিহত।

অক্টোবর : — আরব-ইজরায়েল ৪র্থ যুদ্ধ।

নভেম্বর : ১ — মহীশূরের নতুন নাম কর্ণাটক।

***** — শিল্পী পিকাসোর জীবনাবসান।

১৯৭৪

ফেব্রুয়ারি : ৪ — আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর জীবনাবসান। ১০ — আমেদাবাদে খাদ্য

আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশের গুলিবর্ষণ।

এপ্রিল : ১৭ -- গণতন্ত্র রক্ষায় জয়প্রকাশ নারায়ণের নতুন দল গঠন।

মে : ৭ -- দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সহধর্মিণী বাসন্তী দেবীর জীবনাবসান। ১৮ -- রাজস্থানের পোখরানে পরমাণু বিস্ফোরণ।

জুলাই : ১৭ - বিহার বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার জন্য জয়প্রকাশ নারায়ণের আন্দোলন শুরু।

আগস্ট : ২৩ --- ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ ভারতের পঞ্চম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত। — বি. ডি. জাত্তি উপরাষ্ট্রপতি।

ডিসেম্বর : ১ -- সুচেতা কৃপালনীর জীবনাবসান।

* — স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম নির্বাচন।

* — রাষ্ট্রসংঘের সদস্যপদ লাভ করে বাংলাদেশ।

১৯৭৫

জানুয়ারি : ২ — সমস্তিপুর রেলস্টেশনে বোমা বিস্ফোরণে রেলমন্ত্রী এল. এন. মিশ্র নিহত। ১০ — প্যালেস্তাইন মুক্তি সংস্থাকে ভারতের স্বীকৃতি। ১১ — বোম্বাই হাইয়ের তৃতীয় রিগে তেলের সন্ধান।

মার্চ : ৬ — জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে সংসদ অভিযান। ১৫ --- পাকিস্তানকে হারিয়ে ভারতের হকিতে বিশ্বকাপ জয়।

এপ্রিল : ৫ — তাইওয়ানে প্রেসিডেন্ট চিয়াং কাইশেকের জীবনাবসান। ১৫ — লোকসভা অভিমুখে জয়প্রকাশ নারায়ণের অভিযান। -- কম্বোডিয়ার সিহানুক সরকারকে ভারতের স্বীকৃতি। ১৭ — প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের জীবনাবসান। ১৯ — সোভিয়েত ইউনিয়নের একটি উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে ভারতের প্রথম উপগ্রহ আর্যভট্ট উৎক্ষেপণ।

মে : ১৬ — চোগিয়ালের বিরুদ্ধে সিকিমের জনগণের বিদ্রোহ -- সিকিমের ভারতভুক্তি।

জুন : ১২ — রায়বেরিলি কেন্দ্র থেকে ১৯৭১ সালে ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচন অবৈধ ঘোষণা। ২৫ — ইন্দিরা গান্ধীর আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা ঘোষণা।

জুলাই : ১ — ইন্দিরা গান্ধীর ২০ দফা অর্থনৈতিক কর্মসূচী ঘোষণা।

আগস্ট : ৫ — আর. এস. এস. আনন্দমার্গ, জামাত-ই ইসলামি এবং আরও ২৩টি সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ভারত সরকার। বিদেশী মুদ্রা সংরক্ষণ ও চোরাচালানের কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইন (কফেপোসা) সংসদে অনুমোদিত। মিশা বিলে সংসদের অনুমোদন। ১৫ — বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট মুজিবর রহমান সপরিবারে নিহত।

সেপ্টেম্বর : ২৬ — রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং লোকসভার স্পিকারের নির্বাচনকে আদালতের বিচারের এক্তিয়ারের বাইরে রাখতে সংবিধান (৩৯তম) সংশোধন বিল ১৯৭৫ সংসদে অনুমোদিত -- কলকাতা ও মাদ্রাজ টিভি চালু -- নারী পুরুষের সমমজুরীর সপক্ষে অর্ডিন্যান্স জারি।

অক্টোবর : ২ — কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ নেতা কামরাজের জীবনাবসান। ২৪ — বেগার শ্রমিকপ্রথা বন্ধে অর্ডিন্যান্স জারি।

নভেম্বর : ১০ — অ্যাঙ্গোলার স্বাধীনতা লাভ। ২৫ -- সুরিনামের স্বাধীনতা লাভ।

ডিসেম্বর : ২৭ — কয়লা খাদে ধস নামায় ধানবাদে ৩৭২ জনের মৃত্যু। ২৯ — দেবকান্ত বড়ুয়া কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত।

* — সুয়েজ খাল পুনরায় মুক্ত।

* — মোজাম্বিকের স্বাধীনতা লাভ।

* — চীনে নতুন সংবিধান প্রবর্তন।

* — আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ।

১৯৭৬

জানুয়ারি : ৮ — চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই এর জীবনাবসান। ৯ — সংবিধানের ১৯তম ধারায় গ্যারান্টি দেওয়া সাতটি অধিকার রাষ্ট্রপতির আদেশে স্থগিত। ১৩ — কপিলাবস্তুতে খননকার্য। ২৪ — বার্মাশেল জাতীয়করণ — নতুন নাম ভারত রিফাইনারিজ।

ফেব্রুয়ারি : ১৭ — শহরাঞ্চলে জমির ঊর্ধ্বসীমা আইন বলবৎ। ২০ — বোম্বাই হাইতে উৎপাদন শুরু।

এপ্রিল : ১ — দূরদর্শনের সৃষ্টি।

আগস্ট : ১৯ — কবি নজরুল ইসলামের ঢাকায় জীবনাবসান।

সেপ্টেম্বর : ৯ — মাও সেতুঙের জীবনাবসান।

নভেম্বর : ২ — ভারত একটি সমাজতন্ত্রী ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ঘোষণা করে সংবিধানের ৪২তম সংশোধনী বিল লোকসভায় অনুমোদিত।

ডিসেম্বর : ১ — অ্যাঙ্গোলার রাষ্ট্রসংঘ সদস্যপদ লাভ।

* — শম্ভুমিত্রের ম্যাগসেসে পুরস্কার লাভ।

১৯৭৭

জানুয়ারি : ১৮ — রাষ্ট্রপতি লোকসভা ভেঙে দেন। — ইন্দিরা গান্ধী ঘোষণা করেন — মার্চে নির্বাচন। ২০ — জনতা পার্টি গঠিত।

ফেব্রুয়ারি : ১ — উপকূলরক্ষী বাহিনী গঠিত। ২ — ইন্দিরা মন্ত্রিসভা থেকে জগজীবন রামের পদত্যাগ। ৩ — রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও নির্বাচনী প্রচার চালাতে জরুরী অবস্থা শিথিল। ১১ — রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আহমেদের জীবনাবসান। — বি ডি জাত্তি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি।

মার্চ : ১৬ — ১৫টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে নির্বাচন শুরু। ২১ — ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন জারি হওয়া আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার। ২২ — জনতা পার্টি ও তার সহযোগীদের লোকসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা। — ইন্দিরা গান্ধীর পদত্যাগ। ২৪ — ভারতের প্রথম অকংগ্রেসি মন্ত্রিসভার প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মোরারজী দেশাই-এর শপথ গ্রহণ।

এপ্রিল : ১৭ — স্বতন্ত্র পার্টি জনতা পার্টির সঙ্গে মিশে যায়। ৩০ — কংগ্রেস শাসিত নয়টি রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি। — জনতা পার্টি আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত।

মে : ২৯ — ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের জীবনাবসান।

জুলাই : ৫ — পাকিস্তানে সামরিক শাসন। ১০ — ভারতরত্ন ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রত্যাহার। ২১ — নীলম সঞ্জীব রেড্ডি ভারতের ষষ্ঠ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত।

সেপ্টেম্বর : ২৭ — উদয়শঙ্করের জীবনাবসান। ২৯ — গঙ্গাজল বন্টন সম্পর্কে ভারত বাংলাদেশ চুক্তি।

অক্টোবর : ৩ — ইন্দিরা গান্ধী গ্রেপ্তার। ৭ — নতুন সোভিয়েত সংবিধান গৃহীত। — ভিয়েতনামের রাষ্ট্রসংঘ সদস্যপদ লাভ।

নভেম্বর : ৫ — ইন্দিরা গান্ধী গ্রেপ্তার ও নিঃশর্ত মুক্তি।

* — আর এস এস এবং আরও ২৬টি সংগঠনের ওপর জারি হওয়া নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়।

* — ত্রিবান্দ্রমে এ. কে. গোপালনের মৃত্যু।

১৯৭৮

জানুয়ারি : ১ — আরব সাগরে ভারতীয় বিমান দুর্ঘটনায় ২১৩ জন নিহত। ১৬ — এক হাজার, পাঁচ হাজার ও দশ হাজার টাকার কারেন্সি নোট বাতিল।

ফেব্রুয়ারি : ১৯ — সঙ্গীতশিল্পী পঙ্কজকুমার মল্লিকের জীবনাবসান।

জুন : ১৮ -- পাকিস্তানের অধিকৃত কাশ্মীরের সঙ্গে চীনের সিনকিয়াংয়ের সংযোগরক্ষাকারী কারাকোরাম সড়ক উন্মুক্ত।

সেপ্টেম্বর : ১৮ - ক্যাম্পডেভিডে মিশর-ইজরায়েল চুক্তি।

অক্টোবর : ১ -- মেয়েদের বিবাহের বয়স ১৮ এবং ছেলেদের ২১ ঘোষণা। ৩ — ভারতের প্রথম এবং বিশ্বের দ্বিতীয় টেস্ট টিউব বেবির জন্ম কলকাতার বেলভিউ নার্সিং হোমে।

ডিসেম্বর : ১৯ — লোকসভা থেকে ইন্দিরা গান্ধীকে বহিষ্কার। -- লোকসভা অধিবেশন স্থগিত না হওয়া পর্যন্ত সময়কালের জন্য কারাদণ্ড। ২৬ — জেল থেকে ইন্দিরা গান্ধী মুক্ত।

১৯৭৯

জানুয়ারি : ৩ — দিল্লিতে সপ্তম চলচ্চিত্র উৎসব শুরু। ৬ --- থুম্বা থেকে মৌসুমি বায়ু সংক্রান্ত প্রথম পরীক্ষামূলক 'রোহিণী-২০০' রকেট উৎক্ষেপণ।

ফেব্রুয়ারি : ১১ — আন্দামান নিকোবরের সেলুলার জেল জাতীয় স্মারক ঘোষিত। ১৭ — চীনের ভিয়েতনাম আক্রমণ।

মার্চ : ৩ — চীনের ভিয়েতনামে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা।

এপ্রিল : ৪ — পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলি ভুট্টোর ফাঁসি। ১১ — জামসেদপুরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ১২০ জন নিহত।

মে : ১ — কে. পি. এস. মেননের লেনিন শান্তি পুরস্কার লাভ।

জুন : ৩ — ভারতের দ্বিতীয় উপগ্রহ 'ভাস্কর' উৎক্ষেপণ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন।

জুলাই : ৩ — দ্বিতীয় হুগলি সেতুর কার্যারম্ভ। ১৫ — প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই-এর পদত্যাগ। ১৭ — জগজীবন রাম জনতা পার্টির সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচিত। — জনতা (স) ও কংগ্রেস কোয়ালিশনের নেতারূপে চরণ সিং প্রধানমন্ত্রী। — জগজীবন রাম লোকসভায় বিরোধী দলের নেতা।

আগস্ট : ২১ — রাষ্ট্রপতি নীলম সঞ্জীব রেড্ডি লোকসভা ভেঙে দেন। ৩১ — উপরাষ্ট্রপতিপদে এম হিদায়েতুল্লা নির্বাচিত।

অক্টোবর : ৮ — জয়প্রকাশ নারায়ণের জীবনাবসান। ১৭ — মাদার টেরিজার নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ।

নভেম্বর : ১৩ — নেলসন ম্যাণ্ডেলার নেহরু পুরস্কার গ্রহণ।

১৯৮০

জানুয়ারি : ১০ — ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস (ই) লোকসভায় দুই তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতা পেল। ১৪ — কেন্দ্রে ইন্দিরা গান্ধীর নতুন মন্ত্রিসভার শপথ। ১৮ — অসমে হিংসাত্মক আন্দোলন -- সেনা তলব। ২৫ — মাদার টেরিজার ভারতরত্ন লাভ।

ফেব্রুয়ারি : ১৭ — তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, বিহার, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, পঞ্জাব ও গুজরাটে রাষ্ট্রপতির শাসন।

এপ্রিল : ২ — অটলবিহারী বাজপেয়ীকে সভাপতি করে ভারতীয় জনতা পার্টি গঠন। ৫ — আসাম উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষিত। ১৫ — আরও ছটি বেসরকারি ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ। ১৭ — রোডেশিয়ার স্বাধীনতা লাভ -- নতুন নাম জিম্বাবোয়ে।

মে : ৪ — যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট টিটোর মৃত্যু।

জুন : ১৩ — সঞ্জয় গান্ধী কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত। ২৩ — সঞ্জয় গান্ধী বিমান দুর্ঘটনায় নিহত। ২৪ — প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরির জীবনাবসান।

জুলাই : ১৮ — ভারতের এস এল ভি-৩ রকেট রোহিণী-১ উপগ্রহকে কক্ষপথে স্থাপন। -- টিভিতে পরীক্ষামূলকভাবে রঙিন ছবি প্রদর্শন। ২৪ -- চিত্রশিল্পী উত্তমকুমারের জীবনাবসান।

২৯ — মস্কোয় ভারতীয় হকি দলের ওলিম্পিকে স্বর্ণপদক লাভ। ৩১ — সঙ্গীতশিল্পী মহম্মদ রফির জীবনাবসান।
সেপ্টেম্বর : ১৪ — মারুতি কোম্পানি জাতীয়করণ।
ডিসেম্বর : ৮ — সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট লিওনার্দ ব্রেজনেভের নয়াদিল্লি সফর।
* — ইরাক-ইরান যুদ্ধ শুরু।

১৯৮১

জানুয়ারি : ১৭ — মিজোরামের পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা।
এপ্রিল : ১৩ — এস. এ. ডাঙ্গে দল থেকে বহিষ্কৃত।
মে : ৩০ — বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান নিহত।
জুন : ৬ — বাগমতী নদীর ওপর ট্রেন দুর্ঘটনায় ৮০০ জনের মৃত্যু। ২৪ — ভারতের প্রথম পরীক্ষামূলক টেলিযোগাযোগ উপগ্রহ 'অ্যাপল'-এর ফ্রেঞ্চ গায়ানার কৌরী থেকে উৎক্ষেপণ ও কক্ষপথে স্থাপন। ২৬ — ভারতের তৃতীয় এয়ারলাইনস বায়ুদুতের যাত্রা শুরু। ৩০ — অসমে রাষ্ট্রপতির শাসন।
সেপ্টেম্বর : ২৯ — পাঁচজন খালিস্তানি জঙ্গি ১১৭ জন যাত্রীবাহী ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনসের বোয়িং ৭৩৭ ছিনতাই করে লাহোরে নিয়ে যায়। ৬৬ জনকে মুক্তি দেয়। ৩০ — পাকিস্তানী কমান্ডোরা পাঁচ বিমান ছিনতাইকারীকে নিরস্ত্র করে।
অক্টোবর : ২১ — কেরালায় রাষ্ট্রপতির শাসন।
ডিসেম্বর : ২৮ — মাদ্রাজ ও পেনাং-এর মধ্যে সমুদ্রতলদেশ দিয়ে কেবলসংযোগ স্থাপন।

১৯৮২

জানুয়ারি : ১৪ — ২১ জন অভিযাত্রীর উত্তর মেরুতে উপস্থিতি। ১৯ — মিজো জাতীয় ফ্রন্ট ও তার সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলি অবৈধ ঘোষিত।
মার্চ : ১৭ — কেরলে রাষ্ট্রপতির শাসন। ১৯ — অসমে রাষ্ট্রপতির শাসন। ২১ — এন টি রামরাও অন্ধ্রপ্রদেশে তেলুগুদেশম পার্টি গঠন করেন।
এপ্রিল : ১০ — ইনস্যাট-১এ কক্ষপথে স্থাপিত।
মে : ১৯ — পশ্চিমবঙ্গ, হরিয়ানা, হিমাচলপ্রদেশ ও কেরালা বিধানসভায় নির্বাচন সম্পন্ন।
জুলাই : ২৫ — সপ্তম রাষ্ট্রপতির শপথ নেন জ্ঞানী জৈল সিং। ৩০ — শ্রীলঙ্কায় জরুরী অবস্থা ঘোষণা।
আগস্ট : ১৫ — নিয়মিত রঙিন ছবি প্রদর্শন শুরু। লাইভ ন্যাশনাল প্রোগ্রাম দিল্লি থেকে প্রচার শুরু।
সেপ্টেম্বর : ৯ — শেখ আবদুল্লার জীবনাবসান।
অক্টোবর : ৮ — ভারতীয় বিমানবাহিনীর ৫০তম বার্ষিকী উদ্‌যাপন।
নভেম্বর : ১৫ — আচার্য বিনোবা ভাবের জীবনাবসান। ২৯ — সি পি আই(এম) নেতা প্রমোদ দাশগুপ্তর জীবনাবসান।
* — বাংলাদেশের সামরিক অভ্যুত্থান। জেনারেল এরশাদের ক্ষমতা দখল।

১৯৮৩

জানুয়ারি : ৭ — ত্রিপুরায় নির্বাচনে বামফ্রন্টের ক্ষমতা দখল। ২৫ — আচার্য বিনোবা ভাবের মরণোত্তর ভারতরত্ন প্রাপ্তি। ৩১ — কলকাতায় প্রথম ভাসমান ড্রাইডক চালু।
ফেব্রুয়ারি : ১৮ — আসামের নেইলি হত্যাকাণ্ডে ৫০০ জন নিহত।
জুন : ২৫ — একদিনের ক্রিকেট খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে ভারত বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন — প্রুডেনশিয়াল কাপ জয়।

আগস্ট : ৩১ — ইনস্যাট ১বি উৎক্ষেপণ।

অক্টোবর : ১৯ - মুম্বাইয়ের ১৩টি কাপড় কলের পরিচালন ভার কেন্দ্রীয় সরকারের অধিগ্রহণ -- সুতিবস্ত্রে লাগাতার ধর্মঘটের অবসান। ২২ — সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় ঊর্ধ্বতন বয়সসীমা ২৮ থেকে কমিয়ে ২৬ বছর করা হয়।

* — পদার্থ বিদ্যায় বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখরের নোবেল পুরস্কার লাভ।

১৯৮৪

জানুয়ারি : ১ — ব্রুনেই-এর স্বাধীনতা লাভ।

এপ্রিল : ৪ — দুই মহাকাশচারীর সঙ্গে স্কোয়াড্রেন লীডার রাকেশ শর্মার মহাকাশ ভ্রমণ।

মে : ২৩ — কুমারী বাচেন্দ্রী পাল প্রথম এভারেস্ট জয়ী ভারতীয় মহিলা।

জুন : ২ — পঞ্জাব নিয়ন্ত্রিত এলাকা ঘোষিত। ৫ — অপারেশন ব্লু স্টার শুরু। ৭ — দিল্লি ও শ্রীনগরে হিংসাত্মক কার্যকলাপ।

জুলাই : ৫ — ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনসের এয়ারবাস ছিনতাই করে লাহোরে অবতরণ। ১০ — পঞ্জাব সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের শ্বেতপত্র প্রকাশ।

আগস্ট : ২ — মীনামবক্কম বিমানবন্দরে বোমা বিস্ফোরণে ৩২ জন নিহত। ২২ — আর বেঙ্কটরমণ ভারতের অষ্টম উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত। ২৬ — ৬৮ জন যাত্রী এবং ৬ জন কর্মীসহ ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনসের বোয়িং ৭৩৭ বিমান ছিনতাই -- ৬ জন শিখ ছিনতাইকারীর সংযুক্ত আরব আমীরশাহী কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ। ৬৮ জন যাত্রী মুক্তি পায়।

সেপ্টেম্বর : ১৬ — স্বর্ণমন্দির থেকে সেনা প্রত্যাহার। অকাল তখত মেরামতি সম্পূর্ণ।

অক্টোবর : ২৪ — বাণিজ্যিকভাবে ভবানীপুর থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত মেট্রোরেল চালু। ৩১ — নিজের দেহরক্ষীর হাতে ইন্দিরা গান্ধী নিহত। প্রধানমন্ত্রীর শপথ নেন রাজীব গান্ধী।

নভেম্বর : ২ — ইন্দিরা গান্ধী হত্যার জের হিসাবে দেশব্যাপী দাঙ্গাহাঙ্গামা। ১২ — রাজীব গান্ধী কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত। ২৫ — প্রাক্তন উপপ্রধানমন্ত্রী ওয়াই বি চবনের জীবনাবসান।

ডিসেম্বর : ৩ — ভূপাল গ্যাস ট্রাজেডি -- ৩০০০ জন মৃত -- ৫০ হাজার মানুষকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। ২৪-২৭-২৮ — নির্বাচনে লোকসভায় ইন্দিরা কংগ্রেস তিন চতুর্থাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় মন্ত্রিসভা গঠন করে। প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী।

* — বাংলাদেশে সামুদ্রিক ঝড়ে প্রায় ১০ হাজার লোক মারা যায়।

১৯৮৫

ফেব্রুয়ারি : ১ — প্রথম তিনটি টেস্ট ম্যাচের প্রত্যেকটিতে সেঞ্চুরি করে মহম্মদ আজাহারউদ্দিনের রেকর্ড সৃষ্টি। ১৪ — ডঃ নগেন্দ্র সিং আন্তর্জাতিক আদালতের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত।

মার্চ : ১ — অ্যান্টি-ডিফেকশন বিল চালু। ১০ — রবি শাস্ত্রী বেনসন হেজেস কাপে চ্যাম্পিয়নদের চ্যাম্পিয়ন ঘোষিত এবং সুনীল গাভাসকর অধিনায়ক পদ থেকে সরে যান।

জুন : ৩ — কেন্দ্রে পাঁচ দিনের সপ্তাহ চালু। ২৩ — আটলান্টিক মহাসাগরে এয়ার ইন্ডিয়ার বোয়িং ৭৪৮ বিমান কণিষ্ক ভেঙে পড়ায় ৩২৯ জনের মৃত্যু।

আগস্ট : ৭ — ওয়ার্ল্ড অ্যামেচার বিলিয়ার্ড চ্যাম্পিয়ন গীত শেঠি। ২৬ — নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের বৈঠক।

১৯৮৬

জানুয়ারি : ১৫ — অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল কে এম কারিয়াপ্পা অশরারি ফিল্ড মার্শাল নিযুক্ত। ২২ — ইন্দিরা গান্ধীকে খুনের অভিযোগে সতবন্ত সিং, বলবীর সিং এবং কেহল সিং-এর প্রাণদণ্ডের আদেশ।

মার্চ : ৮ — এল. কে. আদবানি বিজেপি-র সভাপতি নির্বাচিত। ১৬ — কুখ্যাত অপরাধী চার্লস শোভরাজ এবং আরও ছয় জন বন্দির তিহার জেল থেকে পলায়ন।

এপ্রিল : ৭ — চার্লস শোভরাজ এবং সঙ্গী ডেভিড হল গোয়ার সোকুসাতে ধৃত। ১৮ — অতুল্য ঘোষের জীবনাবসান।

মে : ১ — খালিস্থান জাতীয় পরিষদ ও খালসা দল নিষিদ্ধ। ৫ — বিতর্কিত মুসলিম মহিলা বিল লোকসভায় পাশ। ৯ — এভারেস্টশৃঙ্গ জয়ী তেনজিং নোরগের জীবনাবসান। — মুম্বাই-এর একটি হাসপাতালে ভারতের প্রথম এড্স রোগীর মৃত্যু।

জুলাই : ৬ — জগজীবন রামের (৭৮) জীবনাবসান।

আগস্ট : ৭ — মুম্বাই-এর কে. ই. এম. হাসপাতালে ২৩ বছর বয়সী শ্যামজী চাওলার প্রথম ভারতীয় টেস্ট টিউব বেবীর জন্ম। ১০ — অপারেশন ব্লুস্টারের সেনাধ্যক্ষ জেনারেল এ. এস. বৈদ্য পুনেতে নিহত। সার্ক সচিবালয় কাঠমাণ্ডুতে স্থাপনের সিদ্ধান্ত।

সেপ্টেম্বর : ৫ — ভূপালের আদালতে ইউনিয়ন কার্বাইডের বিরুদ্ধে ভারত সরকারের ক্ষতিপূরণ মামলা দায়ের। ৬ — জম্মু ও কাশ্মীরে ৬ মাসের জন্য রাষ্ট্রপতি শাসন। ৩০ — সিওল এশিয়াডে পি. টি. উষার স্বর্ণপদক লাভ।

অক্টোবর : ২ — রাজঘাটের অনুষ্ঠানে রাজীব গান্ধীকে হত্যার ব্যর্থ চেষ্টা। ২৭ — কর্ণাটকের কারওয়ারে দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম নৌ ঘাঁটি 'সিবার্ড'-এর ভিত্তি স্থাপন।

ডিসেম্বর : ১০ — অরুণাচল প্রদেশের পূর্ণ রাজ্য মর্যাদা। ক্রেতা সংরক্ষণ বিল এবং তৎসংক্রান্ত আরও সাতটি বিলে সংসদের অনুমোদন।

১৯৮৭

ফেব্রুয়ারি : ২৮ — মিজোরামের পূর্ণ রাজ্য মর্যাদা।

মার্চ : ৭ — আমেদাবাদ টেস্টে সুনীল গাভাসকরের দশ হাজার রান পূর্ণ।

এপ্রিল : ৭ — সুপ্রিম কোর্টে বিখ্যাত শাহবানু মামলার রায়। ১২ — প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ভি. পি. সিং-এর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ। ২৩ — সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বলা হয় ১৯৫৬ সালের হিন্দু উত্তরাধিকার আইন অনুসারে সম্পত্তির ওপর হিন্দু বিধবাদের মালিকানার অধিকার থাকবে।

মে : ১১ — পঞ্জাবে রাষ্ট্রপতির শাসন। ৩০ — গোয়া ভারতের ২৫তম রাজ্যে পরিণত। দমন ও দিউ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ঘোষিত।

জুন : ৪ — সুইডিশ সরকারের তদন্তে প্রকাশ বোফর্স কোম্পানি ভারতের সঙ্গে অস্ত্র বিক্রয়ের চুক্তির সময় কয়েকজনকে কমিশন দিয়েছে। ১৭ — রাষ্ট্রপতি জৈল সিং ইন্ডিয়ান পোস্টাল (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল লোকসভায় পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠান।

জুলাই : ১৭ — কংগ্রেস থেকে ভি পি সিং-এর পদত্যাগ। ১৮ — লোকসভার সদস্যপদ ত্যাগ করেন অমিতাভ বচ্চন। ২৫ — আর ভেঙ্কটরমন অষ্টম রাষ্ট্রপতির শপথ নেন। ২৯ — রাজীব গান্ধী এবং শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্টের মধ্যে কলম্বো চুক্তি স্বাক্ষর। ৩০ — (IPKF) ভারতীয় শান্তি রক্ষা বাহিনীর শ্রীলঙ্কায় অবতরণ।

আগস্ট : ২ — বিশ্বনাথন আনন্দ এশীয়দের মধ্যে প্রথম বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়ন। ২১ — শঙ্করদয়াল শর্মা উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত।

সেপ্টেম্বর : ৪ — আঠার বছরের রূপ কানোয়ার সতী হিসাবে আত্মবিসর্জন দেন।

অক্টোবর : ১৩ — চিত্র ও সঙ্গীতশিল্পী কিশোরকুমারের জীবনাবসান।

নভেম্বর : ২-৫ — কাঠমাণ্ডুতে তৃতীয় সার্ক সম্মেলন।

ডিসেম্বর : ১১ — ভূপাল আদালত নির্দেশ দেয় ১৯৮৪ সালের গ্যাস দুর্গতদের ৩৫০ কোটি টাকা ত্রাণ সাহায্য দেবে ইউনিয়ন কার্বাইড।

১৯৮৮

জানুয়ারি : ২০ — পেশোয়ারে খান আবদুল গফ্ফর খানের জীবনাবসান।

ফেব্রুয়ারি : ২৫ — ভারতের প্রথম ভূমি থেকে ভূমি পরীক্ষামূলক ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ।

মার্চ : ১৭ — ভারতের প্রথম দূরসঞ্চারী উপগ্রহ IRSIA উৎক্ষেপণ।

এপ্রিল : ১ — ভারতের শারজা কাপ জয়।

জুন : ২ — অভিনেতা রাজকাপুরের জীবনাবসান। ২৫ — জ্যোতি বসু চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর শপথ নেন।

জুলাই : ২৮ — জাতীয় ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ন সৈয়দ মোদিকে গুলি করে হত্যা।

আগস্ট : ২ — ইন্দিরা গান্ধী হত্যা মামলায় সুপ্রিম কোর্টে সতবন্ত সিং ও কেহর সিংহের মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা বহাল। ৬ — সাতটি বিরোধীদল নিয়ে রাষ্ট্রীয় মোর্চা গঠিত। ২২ — দার্জিলিঙে নির্বাচিত পার্বত্য পরিষদ গঠনের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে জি এন এল এফের চুক্তি স্বাক্ষর।

সেপ্টেম্বর : ৭ — মিজোরামে রাষ্ট্রপতির শাসন। ১৮ — বার্মায় সেনাবাহিনীর ক্ষমতা দখল।

নভেম্বর : ১৬ — প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রকে ভারতের স্বীকৃতি। ১৮ — সোভিয়েত নেতা মিখাইল গর্ভাচভের তিনদিনের ভারত সফর।

ডিসেম্বর : ১৫ — দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদের নির্বাচনে জি এন এল এফের বিপুল ভোটে জয়লাভ। ১৮ — রাজীব গান্ধীর চীন সফর। -- সংসদে ভোটাধিকারের বয়স ২১ থেকে ১৮ সংশোধন বিলে অনুমোদন (৬২তম সংশোধন) ২৯ — ইসলামাবাদে চতুর্থ সার্ক সম্মেলন।

১৯৮৯

জানুয়ারি : ৬ — ইন্দিরা গান্ধী হত্যায় অভিযুক্ত সতবন্ত সিং এবং কেহর সিং-এর ফাঁসি। — শেষ ভারতীয় ব্যারন লর্ড সিং-এর দেহান্তর।

ফেব্রুয়ারি : ২ — সত্যজিৎ রায়ের ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লিজিয়ন দ্য অনার লাভ। ১৪ — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিয়ন কার্বাইডকে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয় ভূপাল গ্যাস বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের ৪৭০ মিলিয়ন ডলার (৭১৫ কোটি টাকা) ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

মার্চ : ৯ — পি এল ও চেয়ারম্যান ইয়াসের আরাফতের দুদিনের ভারত সফর। ২৪ — নয়াদিল্লি কানপুরের মধ্যে সুপার ফাস্ট ট্রেন শতাব্দী এক্সপ্রেসের যাত্রা শুরু।

মে : ২২ — মধ্যবর্তী দূরত্বের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র অগ্নির পরীক্ষামূলক নিক্ষেপ।

জুলাই : ২৪ — বফর্স কামান চুক্তির ব্যাপারে কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেলের রিপোর্ট নিয়ে লোকসভার অধিকাংশ বিরোধী সদস্যের পদত্যাগ।

আগস্ট : ৫ — পঞ্চায়েতি রাজ ও নগরপালিকা বিল লোকসভায় পাশ।

সেপ্টেম্বর : ২০ — এল টি টি ই-র বিরুদ্ধে IPKF-এর সশস্ত্র অভিযান স্থগিত। -- শান্তিরক্ষী বাহিনী প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত। ২৭ — শ্রীহরিকোটা থেকে ভারতের ভূমি থেকে ভূমি ক্ষেপণাস্ত্র 'পৃথ্বী' উৎক্ষেপণ। — শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জীবনাবসান। ৩০ — ভারতে নির্মিত প্রথম সাবমেরিন আই এন এস পালকির বোম্বাই থেকে যাত্রা শুরু।

নভেম্বর : ১০ — বাবরি মসজিদে শিলান্যাস।

ডিসেম্বর : ২ — ভি. পি. সিং প্রধানমন্ত্রীর শপথ নেন। উপ-প্রধানমন্ত্রী দেবীলাল। ১৮ — ভারতের প্রধান বিচারপতি রূপে বিচারপতি সব্যসাচী মুখার্জির শপথগ্রহণ। ২৯ — লোকসভায় প্রসারভারতী লোকপাল বিল পেশ।

১৯৯০

জানুয়ারি : ১২ — সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার বয়সসীমা বাড়িয়ে ২৬ থেকে ২৮ করা হয়।

ফেব্রুয়ারি : ১১ — দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ নেতা নেলসন ম্যান্ডেলার ২৭ বছর পর মুক্তিলাভ।
মার্চ : ৯ — লালুপ্রসাদ যাদবের নেতৃত্বে বিহারে জনতা দলের সরকার গঠন। ২৪ — IPKF শেষ দলের শ্রীলঙ্কা ত্যাগ।
এপ্রিল : ৭ — নেতা মঙ্গেশকরের দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার লাভ।
আগস্ট : ৭ — ভারত সরকার কর্তৃক মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ এবং অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য ২৭ শতাংশ চাকরি সংরক্ষণের নীতি ঘোষণা। ৮ — মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ রূপায়ণের বিরুদ্ধে বিহারে হিংসাত্মক বিক্ষোভ। ১৫ — ভারতের মাঝারি দূরত্বের ভূতল থেকে আকাশে উৎক্ষেপণ ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা। ৩০ — লোকসভায় সর্বসম্মতিক্রমে প্রসার ভারতী বিলে অনুমোদন।
সেপ্টেম্বর : ৫ — রাজ্যসভায় প্রসার ভারতী বিলে অনুমোদন। ২৫ — বিজেপি সভাপতি এল. কে. আদবানির সোমনাথ থেকে অযোধ্যা রথ যাত্রা শুরু। — প্রফুল্লচন্দ্র সেনের জীবনাবসান।
অক্টোবর : ১ — মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করার ওপর সুপ্রিম কোর্টের স্থগিতাদেশ। ১৫ — দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রপ্রধান নেলসন ম্যান্ডেলার পাঁচদিনের ভারত সফর শুরু। ১৯ — এক অর্ডিন্যান্স মাধ্যমে অযোধ্যার বিতর্কিত ভূমিখণ্ড ও সংলগ্ন জমি ভারত সরকারের অধিগ্রহণ। ২৩ — অযোধ্যার পথে বিহারের সমস্তিপুরে এল. কে. আদবানিকে গ্রেপ্তার করায় জোট সরকারের ওপর থেকে বিজেপি সমর্থন প্রত্যাহার করে। ৩০ — অযোধ্যার বাবরি মসজিদের দিকে করসেবার উদ্দেশ্যে আগত জনতার ওপর নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিবর্ষণ—কয়েকজন নিহত ও আহত।
নভেম্বর : ২ — বাবরি মসজিদে করসেবকদের হানা। নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিবর্ষণ—কয়েকজন নিহত। ৫ — জনতা দলে ভাঙন। ৭ — এগার মাসের ভি. পি. সিং মন্ত্রিসভা আস্থাভোট লাভে ব্যর্থ। ভি. পি. সিং-এর পদত্যাগ। ১০ — প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন চন্দ্রশেখর। কংগ্রেস (ই) সমর্থন জানায়। উপপ্রধানমন্ত্রী দেবীলাল। ১৬ — চন্দ্রশেখর আস্থাভোটে জয়ী। ২৮ — আসামে রাষ্ট্রপতির শাসন।
* — পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীর মিলন।
* — পাকিস্তানে বেনজির মন্ত্রিসভা বরখাস্ত।

১৯৯১

জানুয়ারি : ৩০ — তামিলনাড়ুতে রাষ্ট্রপতির শাসন।
মার্চ : ৬ — প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখরের পদত্যাগ। ১৩ — রাষ্ট্রপতি লোকসভা ভেঙে দেন। ২৫ — জনগণনায় (১৯৯১) প্রকাশ ভারতের জনসংখ্যা ৮৪ কোটি ৪০ লক্ষ।
এপ্রিল : ১৮ — হরিয়ানায় রাষ্ট্রপতির শাসন।
মে : ২১ — শ্রীপেরমবুদুরে রাজীব গান্ধী নিহত। ২৯ — পি. ভি. নরসিমা রাও কংগ্রেস (ই) সভাপতি নির্বাচিত।
জুন : ১১ — পঞ্জাব 'উপদ্রুত এলাকা' ঘোষিত এবং পশ্চিমসীমান্তে সেনা সমাবেশ। ১৮ — ১০ম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন পি ভি নরসিমা রাও। ২৯ — পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ।
আগস্ট : ৭ — শ্রীহরিকোটায় 'পৃথ্বী-৩' ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা। ১৬ — মণিপুরের চূড়াচাঁদপুরে ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের বোয়িং ৭৩৭ ভেঙে পড়ায় ৬৯ জন আরোহী নিহত।
সেপ্টেম্বর : ১৪ — অসম 'উপদ্রুত এলাকা' ঘোষিত। আলফা জঙ্গিদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর 'অপারেশন রাইনো' অভিযান। ২৮ — মধ্যপ্রদেশে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী শঙ্কর গুহনিয়োগী নিহত।
অক্টোবর : ১১ — মেঘালয়ে রাষ্ট্রপতির শাসন। ২০ — উত্তরপ্রদেশে তিনটি উত্তরাঞ্চলীয় জেলায় ভূমিকম্পে নিহত একহাজার মানুষ। ২৫ — এলাহাবাদ হাইকোর্ট উত্তরপ্রদেশ সবকারকে নির্দেশ দেয় অযোধ্যার অধিকৃত জমিতে যেন স্থায়ী কাঠামো নির্মাণ না করা হয়। ৩১ — করসেবকরা বাবরি

মসজিদের কাঠামোর ওপর পতাকা উত্তোলন করে।

নভেম্বর : ১৯ — মহিলাদের বিষয়ে তিনটি কমিশন গঠিত। ২৯ — নতুন শিল্প ও অর্থনৈতিক নীতির বিরোধিতায় বামপন্থী ইউনিয়নগুলির ডাকে শিল্প ও ব্যাঙ্ক ধর্মঘট।

ডিসেম্বর : ১১ — বিজেপি সভাপতি মুরলী মনোহর যোশী কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর 'একতা' যাত্রা শুরু করেন।

১৯৯২

জানুয়ারি : ১২ — নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এবং মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে ভারতরত্ন প্রদান।

ফেব্রুয়ারি : ৩ — টেস্ট ক্রিকেটে কপিল দেবের ৪০০তম উইকেট লাভ পার্থ টেস্টে। রিচার্ড হেডলির উইকেট লাভের সংখ্যা ৪৩১।

মার্চ : ১১ — নেতাজী কন্যা ডঃ অনিতা বি বোস-পাফ-এর 'ভারতরত্ন' উপাধি গ্রহণে অস্বীকার। ১২ — ভারত মহাসাগরে ভারত-মার্কিন যৌথ নৌ মহড়ার সিদ্ধান্ত। ১৬ — সমগ্র শিল্পকর্মের জন্য সত্যজিৎ রায়ের অস্কার পুরস্কার লাভ। ২০ — সত্যজিৎ রায়কে ভারতরত্ন প্রদান। ২৬ — তিন বিঘা নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে চুক্তি। ২৯ — বিশেষজ্ঞ কমিটি ঝাড়খণ্ড অঞ্চলের জন্য স্বশাসিত পরিষদ গঠনের সুপারিশ করে।

এপ্রিল : ৩ — নাগাল্যান্ডে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি। ২৩ — সত্যজিৎ রায়ের জীবনাবসান।

মে : ১২ — শ্রীমতী সন্তোষ যাদবের এভারেস্ট শৃঙ্গ জয়। ১৪ — ভারতে এল টি টি ই নিষিদ্ধ। ২৮ — ভারত-মার্কিন নৌ মহড়া শুরু।

জুন : ৪ — শেয়ার দালাল হর্ষদ মেহতা ও তার সহযোগীরা গ্রেপ্তার। ২৬ — ভারত-বাংলাদেশ চুক্তি অনুসারে বাংলাদেশকে তিনবিঘা করিডর লিজ।

জুলাই : ২৫ — নবম রাষ্ট্রপতি হিসাবে ডঃ শঙ্করদয়াল শর্মার শপথগ্রহণ। ৩০ — রবিশঙ্করের ম্যাগসেসে পুরস্কার লাভ।

আগস্ট : ১৯ — কে আর নারায়ণন উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত।

অক্টোবর : ৯ — প্রাক্তন সেনাপ্রধান এ এস বৈদ্যর হত্যাকারী সুখা ও জিন্দার পঞ্জাব জেলে ফাঁসী। ১০ — দ্বিতীয় হাওড়া ব্রিজ বিদ্যাসাগর সেতুর উদ্বোধন।

ডিসেম্বর : ৬ — মৌলবাদীরা বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে। ৭ — অযোধ্যাকাণ্ডের প্রতিক্রিয়ায় বহু নিহত . লোকসভার বিরোধী নেতার পদ থেকে আদবানির ইস্তফা। অযোধ্যা ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় দেশজুড়ে মৃত ১০০০। ১০ — আর এস এস, বিশ্বহিন্দু পরিষদ, বজরং দল ও জামাত-ই-ইসলামি নিষিদ্ধ। ১৬ — অযোধ্যাকাণ্ডের নিন্দা করে সংসদে প্রস্তাব গৃহীত।

১৯৯৩

জানুয়ারি : ৭ — অযোধ্যার বিতর্কিত এলাকা সংলগ্ন ৬৭.৭০৩ একর জমি সরকারের অধিগ্রহণ এবং বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টে প্রেরণ। ১১ — মুম্বাই ও আমেদাবাদে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা।

ফেব্রুয়ারি : ২০ — দুটি রোহিনী-৫৬০ ক্ষেপণাস্ত্র শ্রীহরিকোটা থেকে সাফল্যের সঙ্গে উৎক্ষেপণ। — প্রাবন্ধিক নীরদ সি. চৌধুরীর সি.বি.ই উপাধি লাভ।

মার্চ : ১২ — ধারাবাহিক গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে বোম্বাইয়ে প্রায় ৩০০ জন নিহত। ১৬ — কলকাতার বউবাজারে বোমা বিস্ফোরণে ৭০ জন নিহত।

২০ — অন্ধ্রে নকশালপন্থী সংগঠন জনযুদ্ধ গোষ্ঠীর (PWG) প্রতিষ্ঠাতা কোন্ডাপাল্লি সীতারামাইয়া ধৃত। ২৪ — বোম্বাই বিস্ফোরণের সঙ্গে মেমন পরিবারের ৬ জনের করাচি পলায়ন।

এপ্রিল : ১ — দূরদর্শনের দ্বিতীয় চ্যানেলের সূচনা। ৮ — বিশ্বহিন্দু পরিষদ দপ্তরে সি বি আই হানা।

১১ — চন্দন কাঠের চোরাকারবারী জঙ্গলদস্যু বীরাপ্পনকে ধরার জন্য তামিলনাড়ু ও কর্ণাটক সরকারের যৌথ টাস্কফোর্স গঠন ৪০ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা। ২০ — শ্রীহরিকোটা থেকে রোহিণী ৫৬০ রকেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ। ২১ — ভারত সরকারিভাবে ঘোষণা করে, বোম্বাই বিস্ফোরণে পাকিস্তান জড়িত।

জুন : ১৬ — হর্ষদ মেহতা ঘোষণা করেন, তিনি পি ভি নরসিমা রাওকে এক কোটি টাকা দিয়েছেন।

আগস্ট : ১৫ — দূরদর্শনের পাঁচটি চ্যানেলের উদ্বোধন। — নাট্যকার উৎপল দত্তের জীবনাবসান।

সেপ্টেম্বর : ৮ — সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয় ২৭ শতাংশ চাকরি সংরক্ষণ করতে হবে ও বি সি-দের জন্য। ২৯ — জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠিত। ৩০ — কর্ণাটক-মহারাষ্ট্রে ভূমিকম্পে ২১ হাজার মানুষের মৃত্যু। লাতুরসহ ৪০টি গ্রাম ধ্বংস হয়ে যায়।

নভেম্বর : ১৬ — সন্ত্রাসবাদীরা আত্মসমর্পণ করায় হজরতবাল মসজিদ মুক্ত। ২১ — ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন হয় ৫০ বছর পরে। ২৮ — জে আর ডি টাটার (৮৯) জেনেভায় জীবনাবসান।

১৯৯৪

জানুয়ারি : ২ — গোর্খা পার্বত্য পরিষদে জি এন এল এফের বিপুল জয়। ৩ — ইসলামাবাদে ভারত-পাক আলোচনা সমাপ্ত। ৪ — সঙ্গীত পরিচালক আর ডি বর্মন প্রয়াত।

ফেব্রুয়ারি : ৮ — কপিল দেবের ৪৩২টি উইকেট লাভ করে রেকর্ড সৃষ্টি।

মার্চ : ৯ — ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রথম নায়িকা দেবিকারানী রোয়েরিখ (৮৭) প্রয়াত।

এপ্রিল : ১৫ — ভারত অন্যান্য ১২৪টি দেশের সঙ্গে গ্যাট চুক্তিতে সাক্ষর করে।

মে : ২১ — ম্যানিলায় সুস্মিতা সেন মিস ইউনিভার্স নির্বাচিত।

আগস্ট : ৫ — মুম্বাই বিস্ফোরণে অন্যতম অভিযুক্ত ইয়াকুব আবদুল রাজাক মেমন ধৃত। ৬ — হজরতবালের দায়িত্ব নিল মুসলিম ওয়াকফ ট্রাস্ট। ২৬ — মেমন পরিবারের আরও ছয় সদস্য আটক। ৩০ — ত্রিপুরা পঞ্চায়েত নির্বাচনে বামফ্রন্টের বিপুল জয়।

সেপ্টেম্বর : ২৪ — সুরাটে প্লেগে ৩৬ জনের মৃত্যু।

অক্টোবর : ১৫ — অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের জন্য শঙ্করাচার্যকে নিয়ে নয় সদস্যের ট্রাস্ট গঠন।

নভেম্বর : ১৯ — মিস ইন্ডিয়া ঐশ্বর্য রাই দক্ষিণ আফ্রিকার সানসিটিতে মিস ওয়ার্ল্ড প্রতিযোগিতায় জয়ী। — লেঃ জেঃ শঙ্কর রায়চৌধুরী সেনাপ্রধান নিযুক্ত।

১৯৯৫

জানুয়ারি : ১২ — ভারত-আমেরিকা প্রতিরক্ষা চুক্তি। ১৪ — বিশ্বহিন্দু পরিষদের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি। ২৬ — নেলসন ম্যান্ডেলার ভারত আগমন।

এপ্রিল : ১০ — মোরারজী রণছোড়জী দেশাই (৯৯)-এর জীবনাবসান।

মে : ১১ — চরার-ই-শরিফ-এ সন্ত্রাসবাদীরা আগুন ধরিয়ে দেয়।

জুন : ৫ — ভারত-মার্কিন তিন সপ্তাহব্যাপী যৌথ নৌ মহড়া। ২৬ — মধ্যপ্রদেশ ব্যাঘ্ররাজ্য ঘোষিত। ৩০ — সি এন এন নিউ চ্যানেলের উদ্বোধন।

জুলাই : ৩০ — ঝাড়খণ্ড স্বশাসিত জেলাপরিষদ গঠনের নোটিশ জারি।

আগস্ট : ৯ — শিবু সোরেনের সভাপতিত্বে ঝাড়খণ্ড স্বশাসিত জেলাপরিষদের কাজ শুরু। ২০ — ফিরোজাবাদে পুরুষোত্তম এক্সপ্রেস ও বাল্মিকী এক্সপ্রেসে সংঘর্ষে ২০০ জনেরও বেশি মৃত্যু। ২৩ — কলকাতায় প্রথম সেলুলার ফোন চালু। ৩১ — পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী বিয়ন্ত সিং সহ ১৫ জন গাড়িবোমা বিস্ফোরণে নিহত।

সেপ্টেম্বর : ৫ — ত্রিশ সদস্যের লাদাখ স্বশাসিত পরিষদ গঠিত। ২৭ — দিল্লিতে সেলুলার ফোন চালু। বিহারের ধানবাদে কয়লাখনি দুর্ঘটনায় ৭৩ জন নিহত।

অক্টোবর : ১৮ — উত্তরপ্রদেশে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি।

নভেম্বর : ১৩ — সুপ্রিম কোর্ট ডাক্তারদের ক্রেতা সুরক্ষা আইনের আওতায় আসার কথা ঘোষণা করে।

ডিসেম্বর : ৭ — দেশীয় প্রযুক্তিতে নির্মিত ইনস্যাট ২-সি মহাকাশে প্রেরণ। ১৮ — নয়াদিল্লিতে সার্ক বিদেশ মন্ত্রীদের সম্মেলন শুরু। ১৯ — পুরুলিয়ায় বিমান থেকে অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ।

১৯৯৬

জানুয়ারি : ৯ — ভারতীয় প্রযুক্তিতে তৈরি 'অর্জুন' ট্যাঙ্কের কার্যারম্ভ। ১০ — দিল্লিতে ২৭তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব শুরু। ১৬ — এল. কে. আদবানিসহ অন্য ছয় জন রাজনীতিকের বিরুদ্ধে হাওয়ালা মামলার চার্জশিট দাখিল করে সি. বি. আই এবং তিনজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রির বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিলের জন্য কেন্দ্রের অনুমতি প্রার্থনা।

ফেব্রুয়ারি : ২ — পোর্টব্লেয়ারে দূরদর্শন কেন্দ্রের উদ্বোধন। ১৩ — কলকাতায় উইলস বিশ্বকাপ ক্রিকেটের উদ্বোধন।

মার্চ : ২৮ — জে. কে. এল. এফ. বেআইনি ঘোষিত।

এপ্রিল : ১৮ — গোরক্ষপুরে ট্রেন দুর্ঘটনায় ১০০ জন মৃত।

মে : ২ — গডম্যান চন্দ্রস্বামী গ্রেপ্তার। ২৮ — প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর ১৩ দিনের সরকারের পতন।

জুন : ১ — দেবগৌড়ার নেতৃত্বে ২১ সদস্যের মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ। ৫ — ২২ বছর মামলা চলার পর অর্চনা গুহনিয়োগী মামলায় অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার রুণু গুহনিয়োগীর এক বছর কারাদণ্ড ও ২ হাজার টাকা জরিমানা। ১০ — হাওয়ালা মামলায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজিত পাঁজাসহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে চার্জশিট।

সেপ্টেম্বর : ২০ — কংগ্রেস (ই) সভাপতি হলেন সীতারাম কেশরী।

অক্টোবর : ১৭ — উত্তরপ্রদেশে রাষ্ট্রপতির শাসন।

ডিসেম্বর : ১২ — ভারত-বাংলাদেশ জলবণ্টন চুক্তি।

১৯৯৭

জানুয়ারি : ৩ — কংগ্রেস সংসদীয় দলের সভাপতি নির্বাচিত হন দলের সভাপতি সীতারাম কেশরী।

মার্চ : ২৮ — দিল্লিতে নেলসন ম্যাণ্ডেলার হাত থেকে মহাশ্বেতা দেবী জ্ঞানপীঠ পুরস্কার গ্রহণ। ৩০ — জোট সরকারে সমর্থন প্রত্যাহার করেন সীতারাম কেশরী।

এপ্রিল : ১১ — লোকসভায় আস্থাভোট দেবগৌড়া সরকার পরাস্ত। পক্ষে ১৫৮, বিপক্ষে ২৯২। ভোটদানে বিরত ৬ জন। ১৯ — যুক্তফ্রন্টের নেতা নির্বাচিত হলেন বিদেশমন্ত্রী ইন্দ্রকুমার গুজরাল। ২১ — প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন ইন্দ্রকুমার গুজরাল।

জুন : ১৭ — ভূষি কেলেঙ্কারির ব্যাপারে লালুপ্রসাদ যাদবের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের জন্য সি বি আইকে অনুমতি দেন রাজ্যপাল এ. আর. কিদোয়াই। ২০ — বাসু ভট্টাচার্যের জীবনাবসান।

জুলাই : ১ — কলকাতায় সায়েন্স সিটির উদ্বোধন। ২৫ — দশম রাষ্ট্রপতি পদে শপথ নেন কে. আর নারায়ণন। লালুপ্রসাদের পদত্যাগ। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন রাবড়ি দেবী।

আগস্ট : ১৫ — স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্যাপন।

* — মহাশ্বেতা দেবীর ম্যাগসেসে পুরস্কার লাভ।